বিষয় সূচী।

১ম বর্ষ।

আশ্বিন, ১৩২৯—ভাদ্র ১৩৩০।

—*(০)*—

চিত্র সূচী।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ, আশ্বিন ১৩২৯ ১ম সংখ্যা।

বিষয় সূচী।

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। „ প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। „ অমৃতলাল বসু।
৬। রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ
এম, এ, বি, এল।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। „ রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। „ মৃণালকান্তি ঘোষ।
১৩। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। „ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৫। „ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
১৬। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। „ হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম।
১৮। „ কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। „ যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। „ হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। „ মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। „ মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। „ নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ,
এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

(ক্রমশঃ)

১ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩২৯। { ১ম সংখ্যা

সম্পাদকের নিবেদন।

বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়া **মাধবী** প্রকাশিত হইল।

বহুদিন অবধি মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে এক-খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের বাসনা, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে আমাদের অন্তরে জাগিয়াই বিলীন হইতেছিল; বঙ্গবাণীর অনুকম্পায় আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা আজ **মাধবী**তে মূর্ত্তিমতী হইল। গ্রাহক, লেখক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলীর সমীপে আজ তাই সর্ব্বাগ্রে আমরা এই সদ্যোজাতা শিশু-পত্রিকার নিমিত্ত স্নেহাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা জনে জনে আপন স্নেহের পীযূষধারায় **মাধবী**কে তৃপ্ত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়া তুলুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

মফঃস্বল হইতে পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান কিরূপ বিঘ্নবহুল ও আয়াসসাধ্য, তাহা আমাদের অবিদিত নহে; তথাপি আমরা কেন যে এই পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম তাহার কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ আবশ্যক। বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের এই অতীত গৌরবময়ী জন্মভূমির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সেই অত্যুজ্জ্বল রসধারা আজ কালবশে আমাদের জেলায় বিলুপ্তপ্রায় হইলেও এখনও তাহা নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে এখনও এই জেলার পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গভারতীর অনেক সিদ্ধ সেবক মিলিতে পারে। ভাষামাতৃকার সেবায় ইঁহাদের এই অকপট আত্মত্যাগ লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া নিভৃত কাননান্তরালে বনমল্লিকার ন্যায় প্রতিনিয়ত ঝরিয়া পড়িতেছে! দেশের এই প্রচ্ছন্ন সাহিত্য-প্রতিভার সংরক্ষণ ও বিকাশসাধন আজিকার স্বাবলম্বনের যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্য সাধন বাঙ্গলার জেলায় জেলায় প্রচারিত মাসিক পত্রিকাগুলির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য সাধনেই **মাধবী**র প্রচারে ব্রতী হইলাম। ভরসা করি মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এই সদুদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সহায়তা করিবেন। ইহাতে একদিকে যেমন জেলার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে একটা সাহিত্যচর্চ্চার বিশিষ্ট সুযোগ ঘটিবে অন্য দিকে তেমনই আবার দেশের নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইবে।

আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য নবীন লেখকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং জাতীয় সাহিত্য-ধারার সহিত এই জেলার সাহিত্য সেবা প্রয়াসের সংযোগ সাধন। এই পবিত্র বঙ্গভূমিতে ভাষামাতৃকার প্রাণ আজ দেশের বুকের উপর ছড়াইয়া আছে; জাতির সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা বুকে পুরিয়া মা আমার আজ নবজীবন লাভ করিতেছেন। এই প্রাণৈশ্বর্য্যময়ী

বিচিত্রভাবভূষিতা মায়ের আরাধনায় বঙ্গমাতার ঋত্বিকবৃন্দ যে বিপুল উপায়ন সম্ভার রচনা করিতেছেন, আমাদিগকে তাহার সহিত ঘনিষ্ট সংশ্রব রাখিতে হইবে। জেলার বাহিরের বিশিষ্ট লেখকবর্গের সহিত ভাববিনিময় এই নিমিত্ত অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা এই উদ্দেশ্য সাধনে বাঙ্গলার খ্যাতনামা লেখক মাত্রেরই সহায়তা ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছি। যাঁহারা কৃপা করিয়া উৎসাহ ও উপদেশ দানে মাধ্বীর শিরে স্নেহাশিষ বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটী তালিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

আমাদের সামর্থ্যের অনুপাতে মফঃস্বলে বসিয়া সকল সময়েই যে মাধ্বীকে চিত্রবহুল করিতে পারিব, এরূপ আশা করিতে পারি না; তথাপি আমরা প্রতিমাসে একখানি করিয়া সুরঞ্জিত চিত্র প্রদানের চেষ্টা করিব। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগো মহাশয় বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বয়ং ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে দিয়া মাধ্বীর নিমিত্ত চিত্রাঙ্কণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মাধবীর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটী এবং প্রথম ছবিখানি ইহাঁরই দুইটী ছাত্র শ্রীমান শম্ভু সাহা ও শ্রীমান সুধাংশু ভূষণ ঘোষের অঙ্কননৈপুণ্যের নিদর্শন। আমরা হেমবাবুর এই অকৃত্রিম ত্যাগ ও সহানুভূতির নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব।

উপসংহারে নিবেদন এই যে দেশের নবজাগরণের যুগে গৃহে গৃহে জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া বঙ্গভারতীর সেবা ও অর্চ্চনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধন-পথ রচনায় উদ্দেশ্যে আমাদের এই দীন অকপট আয়োজন। শ্রীভগবতীর কৃপায় আমাদের এই আয়োজন সফল হউক—প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞান বিজ্ঞানের সমাবেশে, প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীর ভাবের মিলনে মাধ্বী আবালবৃদ্ধবণিতার স্নেহ ও সহানুভূতি অধিকার করুক, এই মাত্র আমাদের আকিঞ্চন।

আগমনী।

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল)

শরৎ এসেছে ফিরে,
আয় মা জননি! বাংলার আজি ব্যথিত বক্ষোনীড়ে।
নর কঙ্কালে ভরা,
বঙ্গ-শ্মশানে আয় মা আজিকে সকল-দুঃখ-হরা!
জ্বলিছে হেথায় নিয়ত চুল্লী দহিয়া সকলি ধীরে,
ছিন্ন করিয়া বিকট দশনে মৃত্যু নাচিয়া ফিরে!
এখনো লুকায়ে র'বি?
দেখিতে কি চাস্ মহাপ্রলয়ের সব ডুবে যাওয়া ছবি!

ডুবেছে অতল তলে
সোণার ধান্য—ডুবে গেছে আরো লক্ষ চোখের জলে!
ক্রন্দন শুধু আজ;
সর্ব্বনাশের ভৈরব-গীতি উঠে জলরাশি মাঝ!
উছল বন্যা জল তরঙ্গে ডুবায়ে দিয়াছে দেশ,
গৃহহারা আসি মুক্ত বাতাসে পেতেছে শয্যা শেষ;
অন্নহীনের দল,
তোর সাড়া পেয়ে বড় বেশী আজ বাধায়েছে কোলাহল।

মরণ শিয়র পরে',
মহামারী যে গো নিয়ত নিঠুর বিকট হাস্য করে;
দাঁড়াবি না মাগো আসি?
ফুটে উঠিবে না পাণ্ডুর মুখে মৃত্যু-জয়ের হাসি?
অসহ শোকের কঠিন পেষণে দীর্ণ বক্ষ ধরি'
অন্ধকারের নির্জ্জন কোণে রয়েছে যাহারা পড়ি,'
কোলে তুলে নিতে তারে,
মায়ের মতন আসিবি না কি গো মর্ত্ত্যবাসীর দ্বারে?

মা! তোর পূজার লাগি,
আজিও শেফালি পড়িছে ঝরিয়া আকুল শরণ মাগি;
তবুও লুকাতে চাস্?
চামর দুলায়ে নদীর কিনারে ঐ যে দুলিছে কাশ্!
বর্ষার ঘন কালিমা টুটেছে কনক কিরণে তোর,
অরুণ হাস্য পড়েছে ছড়ায়ে যামিনী হইতে ভোর!
যদিও দেউল ভাঙ্গা,
আয় মা! হৃদয়ে—নবীন জীবনে হউক সে আজি রাঙা!

মাতৃপূজা।

আবার সেই শরৎকাল সমাগত। বর্ষাপগমে নভস্তল নির্ম্মল হইয়াছে। শারদচন্দ্রিকা স্বীয় প্রভায় দিগন্ত বিচ্ছুরিত করিয়া মানবের চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন করিতেছে। প্রস্ফুটিতা কুমুদিনী ও উৎফুল্ল মল্লিকা সৌরভ বিকীরণ করিয়া মনের পবিত্রতা সমাধান করিতেছে। বনরাজি ভৃঙ্গমালার কূজনহেতু মনোরম হইয়াছে। শস্য পরিপক্ব হইয়া মনোহর দেখাইতেছে। বর্ষাকালে নদী গর্ব্বভরে স্ফীত হইয়াছিল, এক্ষণে ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী পঙ্কশূন্য হইয়াছে। আকাশে বলাকাশ্রেণী বিচরণ করিতেছে না, পয়োদপংক্তি ইন্দ্রধনুরমণীয় নহে, কিন্তু তথাপি আকাশের কি শোভা হইয়াছে! খণ্ড খণ্ড অভ্রবৃন্দের দ্বারা আতপবাধা নিবারিত হইতেছে। আকাশমার্গ সরোজবায়ুরম্য এবং বিরলম্বুকণব্যাপ্ত হইয়া আরামপ্রদ হইয়াছে। কে বলে ইহা অকাল? কে বলে ইহা মায়ের আগমনের উপযুক্ত সময় নহে?

মাগো! তুমিই শুক্লযজুর্বেদোক্ত অম্বিকা দেবী (১)। তুমিই কেনোপনিষদুল্লিখিত উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা (২)। তুমিই ব্রহ্মস্বরূপিণী; তোমা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ উদ্ভব হইয়াছে। তুমিই শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ, ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম, পঞ্চভূত ও অপঞ্চভূত, বেদ ও অবেদ। তুমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, ও বিশ্বদেব দ্বারা বিচরণ কর; তুমি মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সোম, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ও প্রজাপতিকে ধারণ করিয়া আছ। তুমি সর্ব্বত্র বাস কর, জগতের পিতারও জননী (৩)। অগ্রে তুমিই একাকিনী ছিলে; তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ; কামকলা ও শৃঙ্গারকলা নামে খ্যাত হইয়াছে। তোমা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ ও সকল স্থানের বাদিত্রবাদিগণ উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি চারিদিকে উৎপাদন করিয়াছ, ভোগ্য উৎপাদন করিয়াছ, শক্তি বিষয়ক সমস্ত উৎপাদন করিয়াছ। অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সমস্তই উৎপন্ন করিয়াছ। তুমিই সেই পরাশক্তি, সেই শাম্ভবী বিদ্যা, তুমিই প্রণব। তুমিই পুরত্রয় ও শরীরত্রয় ব্যাপিয়া অভ্যন্তর ও বহির্দেশ উদ্ভাসিত করিতেছ। তুমি প্রত্যক্‌চৈতন্য, আত্মা; আবার তুমিই অসত্য ও অনাত্মা। ব্রহ্মসম্বিৎ, ভাবাভাবকলা বিনির্মুক্ত চিৎবিদ্যা সচ্চিদানন্দলহরী, মহাত্রিপুরসুন্দরী, বহিরন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও এক স্বরূপে প্রকাশমানা। তুমিই সত্য ললিতা নামে আখ্যাত. তুমিই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম। তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" "যোঽহমস্মি" "সোঽহমস্মি" এই সকল শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তুমিই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী, বালাম্বিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ম্বরকল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী, তিরস্করিণী, রাজমাতঙ্গী, অশ্বারূঢ়া, প্রত্যঙ্গিরা, ধূমাবতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ও ব্রহ্মাণ্ডকলা। (৪) তুমিই মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী পরমা বিদ্যা; আবার তুমিই সংসারবন্ধের হেতুভূতা, সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী (৫)। তুমি নিত্যা হইলেও

(১) এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা (৩।৫৭)

(২) স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।

শঙ্করভাষ্য:— সর্ব্বেষাংহি শোভমানা শোভনতমানাং বিদ্যা তদা বহুশোভমানেতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেনেশ্বরেণ সহবর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগম।

(৩) দেব্যুপনিষদ্। (৪) বহ্বৃচোপনিষদ্।

(৫) সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী।

যখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূত হও, তখন তোমাকে উৎপন্ন বলা যায়। (১)।

মাগো! পুরাকালে পতিপূজার জন্য বসন্তপুষ্পাভরণ বহন করিয়া—পদ্মরাগমণির পরিবর্ত্তে অশোক কুসুম, সুবর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ণিকার প্রসূন এবং সিন্দুবার পুষ্পগুচ্ছ মুক্তাকলাপের ন্যায় ধারণ করিয়া—সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায়, হস্তস্থিত অরবিন্দের দ্বারা ভ্রমরকে নিবারণ করিতে করিতে গমন করিয়াছিলে (২) এসো মা! এক্ষণে শারদশ্রী বহন করিয়া লীলাকমল হস্তে ধারণ করিয়া স্মিতমুখে পিতাকে আনন্দিত করিতে, পুত্রগণকে সম্ভাবিত করিতে এই হতভাগ্য দেশের দারিদ্রদৈন্য বিমোচন করিতে তোমার সেই মহিমময় মূর্ত্তিতে দেখা দাও। তোমার শিরোদেশে জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে; তোমার মুখ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এবং নয়নত্রয় বিশিষ্ট; তোমার বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় এবং দেহ সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত। তোমার দন্ত সমূহ মনোহর, পয়োধর পীন ও উন্নত; তোমার দশবাহু মৃণালের ন্যায় সুখসংস্পর্শ। তুমি ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মূর্ত্তিতে আমাদের মানস পটে উদিত হও (৩)। তোমার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি; বাম বাহুতে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ ও পরশু বিদ্যমান রহিয়াছে। নিম্নে বিচ্ছিন্নশিরা মহিষাসুরস্বরূপ পাপরাশি; তাহার হৃদয় শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন, অন্ত্র নির্গত হইয়াছে; তাহার অঙ্গ রক্তারক্তীকৃত; তাহার নয়নদ্বয় আরক্ত ও বিস্ফারিত এবং সে নাগপাশের দ্বারা বেষ্টিত, তাহার কেশকলাপ তুমি ধারণ করিয়া আছ। তোমার দক্ষিণ পাদ সিংহের উপর এবং বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপর সংস্থিত। তুমি প্রসন্নবদনা, অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা এবং অষ্টশক্তি পরিবৃতা (৩)। তোমার উন্নত অঙ্গুষ্ঠনখ প্রভাব ভূমিতলে বিন্যস্ত হইলে মনে হয় যেন চরণদ্বয় রাগ উদ্গিরণ করিয়া স্থলপদ্মের শোভা ধারণ করিয়াছে। তোমার লীলামনোহর গতি রাজহংসানু-কারিণী। বাহুদ্বয় শিরীষপুষ্প অপেক্ষাও সুকোমল; কণ্ঠবিলম্বিনী মুক্তামালার দ্বারা স্তনদ্বয়ের শোভা বিবৃদ্ধ হইয়াছে। স্বভাবলোলা লক্ষ্মী যখন চন্দ্রে অবস্থান করেন তখন পদ্মগুণ ভোগ করিতে পারেন না, পদ্মাশ্রিতা হইলে চান্দ্রমসী শোভা প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু তোমার মুখে অবস্থানহেতু উভয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যদি পুষ্প প্রবালোপহিত হয়, মুক্তাফল অমলবিক্রমে অবস্থান করে তাহা হইলে তোমার বিশদ হাস্যের কথঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারে। তোমার স্বর অমৃতস্রাবী, নয়ন প্রবাতনীলোৎপল তুল্য। তোমার সুদীর্ঘ ও সুশোভিত ভ্রূযুগল যেন অঞ্জনযুক্ত তুলিকার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। তোমার মনোহর কেশকলাপ দেখিয়া চমরীগণের বালপ্রিয়ত্ব শিথিল হইয়াছে। (৪)

পরমব্রহ্মে সর্ব্বদা লীলা সনাতনী নিত্যরূপিণী প্রকৃতি নিত্যা। যেরূপ অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং সূর্য্যে প্রভা, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সহিত নিত্যসংযুক্তা। যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণব্যতীত কুণ্ডল গঠন করিতে সক্ষম হয় না, কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন।

(১) দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ ঐ

(২) কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গ ৫৩.৫৬॥ শিবপুরাণ দশম অধ্যায়।

(৩) দুর্গার ধ্যান। মৎস্যপুরাণ ২৬০। ডাক্তার ডাণ্ডারকারের মতে মৎস্যপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরাণ। গরুড় পুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ১৩৪ অধ্যায়। অগ্নি পুরাণ ৫০ অধ্যায়।

(৪) কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ ৩১।৩৪।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮॥=

দেবীপুরাণ পঞ্চাশৎ অধ্যায় দেখুন।

তিনি সকল শক্তিরূপিণী, তাঁহার দ্বারা সকল লোক শক্তিমান্। "শক্" শব্দ ঐশ্বর্য্যবাচক এবং "তি" শব্দ পরাক্রমবাচক; যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন (১)। তুমিই সেই পরা প্রকৃতি, বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। তুমিই দেবীগণের বীজস্বরূপা ঈশ্বরী ও মূল প্রকৃতি (১)। তুমি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা গুণাশ্রয়া গুণময়ী (২)। তোমা ব্যতীত শিবের স্পন্দন করিবারও ক্ষমতা নাই (৩)।

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অসুরাধিপতি মহিষের শতবর্ষব্যাপী ঘোরযুদ্ধ হইয়াছিল। মহাবীর্য্য অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইলে দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহেশ্বর ও বিষ্ণু যেখানে ছিলেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন। দেবগণ নিজেদের দুরবস্থার বিষয় কীর্ত্তন করিলে বিষ্ণু ও মহেশ্বর কুপিত হইলেন। তাহার পরে বিষ্ণু, শঙ্কর ও ব্রহ্মার বদন হইতে মহৎ তেজ বিনির্গত হইল। অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও ঐ প্রকার মহৎ তেজ বিনির্গত হইলে সেই তেজঃপুঞ্জ একত্রে মিলিত হইল। দেবগণ দেখিলেন সেই তেজোরাশি জলন্ত পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। সেই তেজোরাশি একত্রে মিলিত হইলে এক নারীরূপ অভ্যুদিত হইল। শাম্ভব তেজ দ্বারা সেই নারীর মুখমণ্ডল, যম ও বিষ্ণুর তেজ হইতে তাহার কেশ ও বাহু সকল, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে কটিদেশ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথ্বীতেজ দ্বারা নিতম্ব, ব্রহ্মতেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি সকল এবং বসুদিগের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতিতেজে দন্ত সমূহ, অনলতেজে নয়নত্রয়, সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে ভ্রূদ্বয়, পবনতেজে কর্ণদ্বয় উৎপন্ন হইল। (৪) সেই দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধ করিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। দুর্গ নামে রুরুতনয় অসুরকে বধ করিয়া দুর্গাদেবী নামে বিখ্যাত হইলেন (৫)। দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, সংসার বন্ধন, কর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতি ভয় এবং হস্তৃ-বাচক শব্দকেও যিনি হনন করেন তিনিই দুর্গা (৬)। পক্ষান্তরে, স্মরণমাত্রই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম রিপুসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে। (৭)। মহিষাসুর বধের জন্য দেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর দিন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; পরে শুক্লা সপ্তমীতে দেবগণের তেজে দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমী তিথিতে দেবগণ তাঁহাকে নানাভরণে ভূষিত করিয়াছিলেন। নবমী তিথিতে তিনি নানাবিধ উপচারে পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। (৮) সেইজন্য আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে পূজা বিহিত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে—মহাবল কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে দেবতারা চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—প্রভো! এই কুম্ভকর্ণ সুদুর্মদ পঞ্চ লক্ষ কোটি রাক্ষসবীরপরিবৃত হইয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিবে; অতএব আমরা রামের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিব। ব্রহ্মা ভাবিলেন—কৃষ্ণ

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়। মহানির্বাণতন্ত্র চতুর্থ উল্লাস ১০ শ্লোক।
কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ দ্বাদশ অধ্যায়। ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায় ২৫ শ্লোক।

(২) দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী।

(৩) শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্ নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। আনন্দলহরী ১ দেবীভাগবত প্রথম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় দেখুন।

(৪) দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী। দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়েও প্রায় এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

(৫) দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী। কাশীখণ্ড ৭২ অধ্যায়।

(৬) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়।

(৭) দেবী পুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

(৮) কালিকা পুরাণ দেখুন। বরাহ পুরাণের মতে শক্তি ত্রিবিধ।—ব্রাহ্মী শক্তি শ্বেতবর্ণা, বৈষ্ণবী শক্তি রক্তবর্ণা এবং রুদ্রশক্তি কৃষ্ণবর্ণা। বৈষ্ণবী শক্তিই মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন—৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫ অধ্যায় দেখুন।

পক্ষের অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব শুক্র পক্ষ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে রাবণ বধ হইবে না। আর, দেবীর আদেশ বা দৃষ্টি ব্যতীতও রাবণ বধ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু রাবণ শুক্র পক্ষ পাইলে কোন দিন যদি দেবীপূজা করে তাহা হইলে রাবণবধ হয় না; অতএব দেবীকে কৃষ্ণ পক্ষেই প্রবোধিত করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন—শ্রীরামের রাবণ জয়ের নিমিত্ত আমাদের সকলেরই স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক; তোমরাও কর, আমিও করি। কিন্তু ভগবতীর বোধন ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিলে ব্রহ্মা ও দেবগণ ভক্তিপূর্ব্বক দেবী আত্মা-শক্তিকে স্তব করিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সত্ত্বরূপা সনাতনী দেবী শক্তি কুমারীরূপে দেবগণকে দর্শন দিয়া বলিলেন—দুর্গা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তোমাদিগকে বলি শুন। আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করিবে; তোমাদের উপরোধে এ সময়েও তিনি বোধিতা হইবেন। বোধন স্তব এবং প্রণাম করিয়া সেই শিবাকে পূজা করিবে। তাহাতে তোমাদের এবং মহাত্মা রামের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া কুমারী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ভূতলে আসিয়া সুদুর্গম নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষ দেখিলেন; আর দেখিলেন সেই বিল্ববৃক্ষের একটি মনোহর পত্রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুচারু নবমাল্যভূষিতা, বিম্বোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, সুরুচিরা এক অচিরপ্রসূতা বালিকা নিদ্রিত; তাহার শরীরে আবরণ নাই। দেবীর চরিত্রজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দেবগণের সহিত প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। সেই মহেশ্বরী ব্রহ্মকৃতস্তবে প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বালভাব পরিত্যাগ করিয়া যুবতীরূপ ধারণ করিলেন। তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেবতাগণের দৃষ্টিপথে উপনীত হইলেন, তাঁহার নাম হইল উগ্রচণ্ডা বা চণ্ডী। চণ্ডী তাহাদিগকে অভীষ্ট বিষয় কীর্ত্তন করিতে বলিলে ব্রহ্মা বলিলেন—রাবণের বধের নিমিত্ত এবং রামের প্রতি অনুগ্রহের জন্য দেবি! অকালে (১) তোমার বোধন করিয়াছি। অতএব অদ্য শুভ আশ্বিন মাসের আর্দ্রাযুক্ত কৃষ্ণনবমী তিথি, অদ্য হইতে রাবণ বধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে আমরা পূজা করিব; তার পর আমরা বিসর্জন করিলে যথাস্থানে যাইবেন। যাবৎ সৃষ্টি থাকিবে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সুর অসুরাদি তাবৎ এইরূপে আপনাকে পূজা করিবে। দেবি! আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে মহাপূজার জন্য আপনার বোধন লোকে করিবে।

দেবী বলিলেন—মহামতে ব্রহ্মন্! তথাস্তু। তুমি, আমায় বোধন করিলে; তোমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য আমি করিব। কুম্ভকর্ণ আজ মরিবে, অতিকায় ত্রয়োদশী তিথিতে লক্ষ্মণাস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিবে। রাবণ চতুর্দ্দশীতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। লক্ষ্মণ অমাবস্যা নিশীথে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবে। প্রতিপদে মকরাক্ষ, দ্বিতীয়াতে দেবান্তকাদি রাক্ষসেরা নিহত হইবে। অনন্তর দিব্য রাম শরাসনে আমি সপ্তমী তিথিতে প্রবিষ্ট হইব। তৎপরে অষ্টমীতে রামরাবণে যুদ্ধ হইবে। অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তক সমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে। রাবণের শিরঃ সমূহ পুনঃ পুনঃ উত্থিত এবং নিপতিত হইবে। শুক্লা নবমী তিথির অপরাহ্নে রাবণবধ হইবে। জয়যুক্ত রাম দশমীতে পরমানন্দযুক্ত হইবেন। (২) অদ্য যেমন আমার পূজা করিবে এইরূপ পঞ্চদশ দিন আমার পূজা মহোৎসব হইবে। অদ্য হইতে শুক্লষষ্ঠী পর্য্যন্ত তের দিন ব্যক্তিগণ বিল্ব বৃক্ষে আমার পূজা করিবে। সপ্তমীতে গৃহে আনিয়া

---

(১) রঘুনন্দন তাঁহার তিথি তত্ত্ব নামক গ্রন্থে "অকালে" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অকাল ইতি তু রাত্রিত্বেন দক্ষিণায়নস্য। তথা চ শ্রুতিঃ—তপস্তপস্যৌ শৈশিরাবৃতুঃ। মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতুঃ। শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মিকাবৃতুঃ। অথৈতদুত্তরায়ণং দেবানাং দিনং। নভাশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতুঃ। ইষশ্চ উর্জশ্চ শারদাবৃতুঃ। সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ। অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিতি, এবঞ্চ

রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
তথৈব মানবাঃ কুর্য্যুঃ প্রতি সংবৎসরং নৃপ॥

(২) এই জন্য ঐ তিথিতে রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হয়।

পূজা করিবে। তৎপরে দুই দিন নানাবিধ বলি, পূজা ও জাগরণাদির দ্বারা আমার পূজা করিবে। মহাষ্টমীতে উপবাস করিয়া এবং নবমীতে বলিদান দ্বারা আমার পূজা ভক্তি সহকারে করিবে। কোটি যোগিনীর পূজাও ঐ দুই দিন কর্ত্তব্য। অষ্টমীনবমীর সন্ধিক্ষণ আমার পূজার বৎসর তুল্য কাল, তন্মধ্যে নবম ক্ষণ আবার কল্প স্বরূপ কাল। অষ্টমী ও [illegible] এই দুই দিন পূজা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কর্ত্তব্য। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যুদ্ধ, ক্রয়, বিক্রয়, মূল্যস্থিরীকরণ বা কর্ষণাদি এ সময়ে কর্ত্তব্য নহে। তৎকালে ঘৃতাক্তবিল্বপত্র দ্বারা পরমাদরে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ পূজা করিবে সে সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ হইবে। মহাবিপদ হইতে পার করেন বলিয়া সেই অষ্টমীর নাম মহাষ্টমী; আর মহাসম্পদ প্রদান করেন বলিয়া সেই নবমীর নাম মহানবমী। যে কোনও কর্ম্মের আরম্ভ বিজয়া দশমীতে প্রশস্ত। হে ব্রহ্মন্ সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত তিথি চতুষ্টয়ে যথাক্রমে মূলা পূর্ব্বষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইলে তৎকালে পূজার বহু ফল হয়। (১)

দেবীভাগবতে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায় না। তাহার মতে মহর্ষি নারদ রাবণের বিনাশার্থ রামকে নবরাত্র ব্রত করাইয়াছিলেন। "ঐ ব্রতে নব রাত্রি উপবাসী থাকিয়া যথাবিধানে জপহোমাদিসম্বলিত ভগবতীর অর্চনা করিতে হয়। দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত ও পবিত্র পশুবলি সমূহ প্রদান পূর্ব্বক জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে।" মহর্ষি নারদ আচার্য্য হইয়া রামকে এই ব্রত করাইয়াছিলেন। দেবী ভগবতী তাহাদের ভক্তিতে সন্তুষ্টা হইয়া মহাষ্টমীর নিশীথকালে সিংহবাহনে অবস্থান করতঃ তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ব্রত সমাপন করিয়া বিজয়াদশমীদিবসে বিজয়পূজা সম্পাদন করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। (২)

মহাভাগবত পুরাণের মতে রামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মের দ্বারা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। দেবী তাহাকে ছলনা করিবার জন্য একটি পদ্ম তিরোহিত করেন। তখন রামচন্দ্র ইন্দীবরসদৃশ স্বীয় নয়ন উৎপাটন করিয়া দেবীর পূজায় নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। উত্তরকালে এই আখ্যান কৃত্তিবাস স্বপ্রণীত রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

শরৎকালে মহাপূজার উৎপত্তির বিষয় কথিত হইল। বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর হইল এই পূজার প্রচলন হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও শারদীয়া পূজার উল্লেখ আছে (৩)। মৎস্যপুরাণধৃত দুর্গার মূর্ত্তিনির্ম্মাণব্যবস্থা দেখিলে দুর্গাপূজার প্রাচীনত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

দেবীর বোধনমন্ত্র (৪) পাঠ করিলে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে বিজিগীষু নরপতিবৃন্দ শত্রুনাশ জন্য দেবীর পূজা করিয়া দিগ্বিজয়জন্য বহির্গত হইতেন। এখনও ভারতবর্ষে নানাস্থানে বিজয়াদশমীর দিন সৈন্য পরিদর্শন (Review of troops) হয় এবং রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হয়। শরৎকালই যুদ্ধ যাত্রার প্রশস্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হইত। কালিদাস লিখিয়াছেন—

> সরিতঃ কুর্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
> যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তসংশক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥

রঘু বংশ চতুর্থ সর্গ ২৪ শ্লোক

সম্ভবতঃ এই সময়েও শক্তির পূজা করিয়া রাজগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন।

> "দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপ।
> তস্য সংবৎসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥" (৫)

(১) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব খণ্ড ২১।২২ অধ্যায়।

(২) দেবীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ত্রিংশ অধ্যায়।

(৩) শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী

(৪) ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীং।
শক্রেণাপিচ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

(৫) তিথিতত্ত্ব উদ্ধৃত বচন।

যে রাজা দশমীতিথিকে উত্তীর্ণ করিয়া বিজয়ার্থ প্রস্থান করে সেই রাজার সেই বৎসর কোথাও বিজয় লাভ হয় না। নিজে যাত্রা না করিলে অন্ততঃ খড়্গাদির যাত্রা করাইতে হইবে।

কার্য্যবশাৎ স্বয়মাগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ॥ (১)

কোন্ দিকে যাইতে হইবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহা লিখিত হইয়াছে—

হস্তাং গতে তু মিত্রে যয়া দিশা খঞ্জনং নৃপো পশ্যেৎ।
গচ্ছেত্তয়া প্রয়াতস্তু ক্ষিপ্রমরাতির্বশমুপৈতি॥ (২)

সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে গমন করিলে খঞ্জন পক্ষীকে যে দিকে গমন করিতে রাজা দেখিবেন সেই দিকে প্রয়াণ করিলে শত্রু শীঘ্র বশীভূত হয়।

প্রাচীনকালে জয়ার্থী রাজগণের নীরাজনাবিধি করিতে হইত। তৎসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে জয়ার্থী হইয়া আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধ কার্ম্মুকাদি শস্ত্র ও ধ্বজাছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলিপ্রদানান্তে পরদিবস পুনর্বার পূর্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে:—হে ভদ্রকালি! মহাকালি! দুর্গে! দুর্গতিহারিণি! ত্রৈলোক্যবিজয়ে! চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্না হইয়া আমার শান্তির ও জয়ের হেতু হও। তৎপরে নীরাজনা বিধি আচরণ করিবে। ঈশানদিকে তিনটি তোরণযুক্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যেদিন সূর্য্য চিত্রানক্ষত্র ত্যাগ করিয়া স্বাতীতে গমন করিবেন সেই দিন হইতে যে কয়দিন স্বাতীতে অবস্থিতি করিবেন সেই কয়দিন উক্ত মন্দিরে ব্রহ্মাদিদেবতা ও অষ্টগজের পূজা করিবে এবং পুরোহিত হোম করিবেন। অনন্তর অষ্টকুম্ভের অর্চ্চনা করিয়া কুম্ভস্থজল দ্বারা অশ্ব ও গজদিগকে স্নান করাইয়া তাহাদিগকে স্নান করিবে। অনন্তর প্রথমে গজদিগকে নির্গত করাইয়া পরে গৃহমধ্যে রাজচিহ্নাদির পূজা করিয়া বিজয়ার্থ অন্যান্য সকলের নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। (৩)

মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশে উমা দেবীর বর্ণনা থাকিলেও উপরোক্ত প্রকার পূজার বিষয় বর্ণিত হয় নাই। দেবীর পূজা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও দেবীপুরাণ দ্রষ্টব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্বেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্কন্দ ও ভবিষ্যপুরাণে এই পূজা ত্রিবিধা বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা॥
রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈ র্জপযজ্ঞৈঃ বিনা তু যা॥
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা॥ (৪)

আজকাল রাজসিকপূজারই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে দুর্গাদেবীর রাজসিক-পূজার বিধান উক্ত হইয়াছে (৫) বলিদানের দ্বারা দুর্গাদেবীর প্রীতি হয়। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা করেন (৬)॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

অর্চ্চকস্য তপোযোগাৎ অর্চ্চনস্যাতিশয়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥

যিনি অর্চ্চনা করিবেন তাহার তপোযোগ থাকিলে এবং অর্চ্চনার আতিশয্য হইলে প্রতিমার মনোজত্ব বশতঃ দেবতার সান্নিধ্য হয়। আজকাল

---

(১) তিথিতত্ত্বধৃত রাজমার্ত্তণ্ডবচন।

(২) তিথিতত্ত্বধৃত জ্যোতিষ বচন। গরুড় পুরাণের পূর্ব খণ্ডে ১৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে রাজা শত্রুনাশের জন্য ষষ্ঠ্যাদিতে অযাচিতব্রত করিয়া নবমীতে জপহোম সমাপনপূর্বক কুমারীদিগকে ভোজন করাইবেন (৩ শ্লোক)

(৩) অগ্নিপুরাণ ২৬৮ অধ্যায় ১৬-২৩ শ্লোক।

(৪) তিথিতত্ত্বধৃত বচন।

(৫) প্রকৃতি খণ্ড ৬৪ অধ্যায় এবং ৬৫ অধ্যায়।

(৬) যো যং হন্তি স তং হন্তি চেতি বিদোক্তমেব। কুর্বন্তি বৈষ্ণবীপূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥ ঐ ৬৫।১২

ইহার কোনটাই হয় না। সুতরাং কতকগুলি প্রাণহীন ও প্রকৃতউচ্চারণহীন মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজার উপযুক্ত ফল লাভ হয় না।

এই দুর্গাপূজার অন্য একদিকে দৃষ্টিপাত করুন। দুর্গাদেবীই মূলাধারস্থ পৃথিবী, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জল, মণিপুরস্থ অগ্নি, অনাহতস্থ অনিল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশ এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রান্তর্গত মন—এই সমস্ত এবং অন্যান্য সকল কুলপথ ভেদ করিয়া সহস্রার পদ্মে উপনীত হইয়া পতির সহিত বিহার করেন। তৎপরে স্বীয় চরণযুগল হইতে বিগলিত অমৃত-প্রবাহ দ্বারা এই বিস্তৃত ষট্‌চক্রাত্মক শরীর ও তত্রতত্রস্থিত দেবতাগণকে প্লাবিত করিতে করিতে পুনর্বার মূলাধার চক্রে আসিয়া স্বীয় শরীরকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকার সর্পসদৃশ করিয়া বিবরযুক্ত কুলকুণ্ডে শয়ন করেন। (১) এই নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া সহস্রার পদ্মের দিকে গমন করাই দেবীর বোধন। এবং পুনরায় মূলাধারে প্রাপন তাঁহার বিসর্জ্জন। (২)

দেবীর প্রকৃত স্থান সহস্রার পদ্মে—

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকাঃ।
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলম্‌॥ ৪৬
অস্যাস্তে শিশুসূর্য্যসোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী।
শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধাভাগৈককরূপা পরা।

(১) মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং।
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥
সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং।
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি॥
আনন্দ লহরী ৯।১০

(২) ষট্‌চক্রনিরূপণ ৫২,৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোক দেখুন।

বিদ্যুদ্দামসমানকোমলতনুর্নিত্যোদিতাধোমুখী
পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা॥৪৮
নির্বাণাখ্যকলা পরাৎপরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধোদয়া
চন্দ্রার্দ্ধসমানভঙ্গুরবতী সর্বার্কতুল্যপ্রভা॥৪৯॥ (১)

সেই শূন্যস্থল শিবভক্তগণ শিবের স্থান বলেন, বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্থান বলেন, অন্য সকলে হরিহর উভয়ের স্থান বলেন, দেবীর পাদপদ্মভক্তগণ উহাকে দেবীর স্থান বলেন, এবং অন্য মুনিগণ ঐ স্থানকে নির্ম্মল প্রকৃতিপুরুষের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ৪৬॥

এই স্থানে বালারুণের ন্যায় আভাবিশিষ্টা পরিশুদ্ধা মৃণালতন্তুর শতাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্মা, শ্রেষ্ঠা, বিদ্যুদ্দামের সমানা, কোমলতনু, সতত প্রকাশমানা অধোমুখী চন্দ্রের ষোড়শীকলা বিদ্যমান আছে। উহার অধর হইতে পূর্ণানন্দপরম্পরাপূর্ণ সুধাধারা সতত বিগলিত হইতেছে॥৪৮॥

তাহারও মধ্যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতরা নির্বাণনাম্নী কলা বিদ্যমান আছে; তাহা সহস্রধাবিভক্ত কেশাগ্রের একাংশ-তুল্য সূক্ষ্মা। তিনি সর্বভূতের দেবতাস্বরূপিণী ভগবতী ও তাহার স্ফুরণে নিত্যজ্ঞানের উদয় হয়; তাহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় ভঙ্গযুক্তা এবং তাহার জ্যোতিঃ দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রোজ্জ্বল॥৪৯॥

তবে আবার বলি—এসো মা! এই দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত ভারতে আবার সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে, সেই জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দাও। আমরা ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন; তোমার পূজার প্রণালী জানি না; তোমাকে পূজা করিবার মত সামর্থ্যও আমাদের নাই। তোমার মহিমা বুঝিতে আমাদের শক্তি নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদের বল নাই, আমাদের স্তব করিবার ভাষা নাই। আমাদিগকে ভাষা দাও, বল দাও, মেধা দাও; আমাদিগকে

(১) ষট্‌চক্রনিরূপণ।

তোমার নাম উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য দাও। কিছুই না দাও, অন্ততঃ একবার স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দাও। আমরা একবার মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়া দুঃখ ভুলিতে চাই, শোক ভুলিতে চাই, তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। আমরা মাকে পাইতে চাই; অন্যাকাঙ্খা করি না। মাতঃ তোমার আগমনে অশুভ বিদূরিত হইবেই।

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে॥

মহাসঙ্গীত।

(লেখক—শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ)

সৃষ্টির আদিমে যবে কুহেলির ঘন অন্ধকারে,
মহাসিন্ধু মগ্নছিল মাঝ;
কিছুরি বিদ্যুৎঝলে বিরাজিলে তুমি একদিন,
জ্যোতির্ম্ময় রাজ অধিরাজ!
অঙ্ক হ'তে ল'য়ে বিমোহিনী বীণা, তারে তারে তাঁ'র
নিপুণ অঙ্গুলি স্পর্শে করিলে গো বিচিত্র ঝঙ্কার;
অমনি মূর্চ্ছিত বিশ্ব গাহিল ওঙ্কার; তব আগে
নব জাত মনুষ্য সমাজ।

মানব মানবী কণ্ঠে ফুটিল সে কি অপূর্ব্ব ভাষা,
ছুটে কাল অনন্ত অপার—
বুকে লয়ে বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ, গাহি গান
মহিয়সী কীর্ত্তি মহিমার।
উদাত্ত নিপুণ স্বরে সে সঙ্গীত চন্দ্র তারকায়,
মহানন্দে নাচে বসু, তান লয় সুর মূর্চ্ছনায়;
ঝর্ঝরে নির্ঝরে ঝরে, জীব কণ্ঠে সুস্বর সপ্তক
শূন্যে বাজে বসন্ত বাহার।

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু গরজিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে,
বীজ মন্ত্র প্রণব ওঙ্কার
[illegible] তটপুরে—[illegible] তুলি তরঙ্গাদি
দিগন্তর পূর্ণ চারি ধার।
চঞ্চল [illegible] সে সঙ্গীতের স্রোত,
দুলাইয়া [illegible] ওতপ্রোত;
[illegible], বুলবুলি, পাপিয়া, কোকিল,
[illegible] বাজে কি [illegible]!

না জানি সে আমাদের কোন শুভ মুহূর্ত্তে তুমি গো,
হে মায়াবী বিশ্ব অধিরাজ!
করুণার স্নেহে ছাড়ি, অপসারি গাঢ় তমোরাশি
বিরাজিলে মহাসৃষ্টি মাঝ।
নাহি জানি কি মহাসঙ্গীত তুমি করিলা ঝঙ্কার,
নিবিড় বন্ধন দিয়ে বেঁধে দিলে নিখিল সংসার!
স্মরিলে স্তম্ভিত হৃদি, এক একটা বিরাট আকার!
প্রতি পলে শত নব সাজ।

আশ্রয়-নির্ণয় *

(লেখক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস)

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যিনি প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বাঙ্গলায় যে এক বিরাট 'সহজিয়া' সাহিত্যের প্রচার হইয়াছিল তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও তথ্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হইতে হইবে। নতুবা এই শ্রেণীর সাহিত্যকে রুচি হিসাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দিলে সে ইতিহাস সম্পূর্ণ ও সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বাঙ্গলার পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ধর্ম্মসাহিত্য আপাততঃ যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই সহজিয়া ধর্ম্মের ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য পাওয়া যায়। এই উপকরণ আবার অনেকটা কল্পিত অথবা অনুমানসাপেক্ষ। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক তাহার উপর নির্ভর করিয়া সহজিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই ধর্ম্ম বা সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে গেলে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় এখনও যে সকল অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হস্তলিখিত সহজিয়া পুঁথি আছে তাহার অনুসন্ধান ও সংগ্রহ আবশ্যক। আমাদের অবহেলার ফলে এই জাতীয় অনেক পুঁথি এতদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহা সংগ্রহ হইলে তাহার মধ্য হইতে এই ধর্ম্ম বা সাহিত্যের অনেক উপাদান মিলিতে পারে। বঙ্গ সাহিত্যসেবী মাত্রেরই এই বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে কালে তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

সহজিয়া ধর্ম্ম একটা স্বতন্ত্র কোনও ধর্ম্ম নহে; ইহা প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই শাখা বিশেষ এবং প্রাচীন বৌদ্ধ মতের অন্যতম সাধনা। বাঙ্গলায় এখনও বৌদ্ধতন্ত্রের অবাধ রাজত্ব চলিয়াছে; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইহারা অজ্ঞাত ভাবে বৈষ্ণব ধ্বজার নীচে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাধনা ও অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। "সহজিয়া" 'কর্ত্তাভজা' 'কিশোরী ভজক', 'রামবল্লভী' "বাউল" 'আউল' প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে ইহারা বিভক্ত। সহজিয়া সম্প্রদায়ের 'আনাদ সাধন' নামক একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তক খানি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নারীপূজার বিধান প্রচলিত আছে এবং যাহা অমর কবি চণ্ডীদাসের বিচিত্র কবিতার ছন্দে প্রচারিত হইয়াছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন কোন পাণ্ডা খৃষ্টপূর্ব্ব বিংশত শতাব্দী হইতে সেই নারীপূজা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৃহৎ তরুবর যখন ব্রাহ্মণ্য আক্রমণে ধ্বংস মুখে পতিত হইল, তখন শত শত বৎসর যাবৎ যে মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার শিকড় রহিয়া গেল; এবং সেই শিকড় হইতে নূতন নূতন অঙ্কুর জন্মিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র খড়দহ গ্রামে ২৫০০ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা হিন্দু সমাজের দরজা ঠেলিয়া তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পার নাই; লোকচক্ষুতে একান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া সমাজের বাহিরেই অবস্থান করিতেছিল। বীরভদ্রের কৃপায় ইহারা বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। (১)

সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত অতীব নিগূঢ় ও উদার। ইহাদের মতানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানব দেহের মধ্যেই বিরাজমান। অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাহার অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর প্রেমেতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম পর্য্যাপ্ত

* হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়।

(১) বঙ্গবাণী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

হয়। প্রকৃতি সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। এই সাধন পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। কাম রিপুর উপভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা উহার শান্তি সাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মতে যখন সেই প্রেম পরিপক্ক হয় তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে। সহজ সাধনে পরকীয়া রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু শিষ্যা উভয়ে এই দুই অংশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাসলীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। এই সম্প্রদায়ের মতানুসারে গুরু দুই প্রকার— দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু; তন্মধ্যে শিক্ষা গুরুই প্রধান (২)

আমাদের আলোচ্য "আশ্রয় নির্ণয়" পুঁথি খানির রচয়িতা শ্রীসনাতন দাস গোস্বামী। পুঁথিখানির যে প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি তাহার তারিখ ১৮ই কার্ত্তিক ১২০৮ সাল; সুতরাং প্রতিলিপি খানি ১২১ বৎসরের। প্রতিলিপিতে মূল গ্রন্থরচনার তারিখ না দেওয়া থাকিলেও আমরা রচয়িতার কাল নির্ণয় করিয়া মূল গ্রন্থখানির রচনার একটা যুগ নির্দ্দেশ করিতে পারি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দ্বিতীয় কোনও সনাতন গোস্বামীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ পুঁথিখানির মধ্যে যে সহজিয়া ধর্ম্মের সাধন প্রণালীর কতিপয় সঙ্কেত দেখিতে পাই তাহা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ যে যুগে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও সহজিয়া ধর্ম্মসাধক সনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেই সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল। (৩) রচনার প্রণালী ও পুঁথির মধ্যে মধ্যে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোকোদ্ধার লক্ষ্য করিলে এই পুঁথি খানি যে পণ্ডিতপ্রবর গোস্বামী সনাতনেরই রচনা এ বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া পড়ে। সে যুগে 'দাস' উপাধি ভক্ত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দীনতা সূচক ছিল; সুতরাং 'দাস গোস্বামী' উপাধি দেখিয়া অন্য ব্যক্তিকে রচয়িতা রূপে ধারণা করা সঙ্গত হইবে না। কলতঃ যতদিন না দ্বিতীয় কোনও সনাতন গোস্বামীর আবিষ্কার হইতেছে ততদিন আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীকেই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

সনাতন গোস্বামী ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। ইনি কর্ণাটরাজ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত (৪)। ইনি গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন। ইঁহার অপর ভ্রাতার নাম শ্রীরূপ গোস্বামী। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত পার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। প্রতিভাবান কবি ও শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। (৫) ইঁহার আবির্ভাবকাল হিসাব করিয়া দেখিলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের ভিতরে এই গ্রন্থ খানি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

"আশ্রয় নির্ণয়" পুঁথি খানির বর্ণিত বিষয়সমূহ বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকের নিকট অমূল্য।

আমরা বাহিরের লোক; ইহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদে অনধিকারী হইলেও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিসাবে এই প্রাচীন পুঁথি খানির কীট ঝাড়িয়া—ম্যাগনিফাইং গ্লাসে ক্ষুদ্র বা লুপ্তপ্রায় অক্ষরগুলি চিনিয়া লইয়া— কোনও স্থলে বা লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বারা গাঁথিয়া ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিলে সহজিয়া ধর্ম্ম মতের অনেক লাভজনক উপকরণ পাইতে পারিব। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সহজিয়া ধর্ম্মসাধকের সাধনপ্রণালীর অনেকগুলি সঙ্কেত সংক্ষেপে অথচ বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্তির প্রভাব হ্রাস হওয়াতে—প্রকৃত বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্ব হওয়াতে— তথাকথিত ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সহজিয়া ধর্ম্মটীকে নিজেদের ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার উপায়

(২) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—১৭২-৭৬ পৃঃ ১৭৮-৭৯ পৃঃ

(৩) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"

(৪) "ভক্তি রত্নাকর প্রথম তরঙ্গ।

(৫) কবি কর্ণপুর কৃত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়"।

স্বরূপে যেরূপ সহজ ও সরল করিয়া তুলিয়াছেন, গ্রন্থখানি পাঠে এই ধর্মটী তাদৃশ সহজ ও সরল ছিল না বলিয় স্পষ্টই অনুমিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত চণ্ডীদাসের কথ মনে পড়ে—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে ?
তিমির আঁধার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে।

* * *

অভাগিয়া কাকে, বাহু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিকা কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চুক্ত মুকুলে।

* * *

সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥

আর আধুনিক সহজিয়া ধর্মোপাসকগণ যে এই ধর্ম বা তাহার মর্ম আদৌ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া—

সুধাকর দেখি, খদ্যোত যেমন,
সমতেজ হতে চায়,
শত শত কোটী করয়ে উদয়,
তবু তার যোগ্য নয় ;
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে কুরয়ে আশ ;
শিব নৃত্য দেখি, ভূতগণ নাচে
দেখের সমাজে হাস।

সেইরূপ মানব সমাজে কেবল উপহাস বা লাঞ্ছনার পাত্র হন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সহজ সাধন রহস্য অতীব নিগূঢ় ; প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে ইহা সুসাধ্য হইলেও সাধারণ ভক্তগণের পক্ষে এই সাধন দুঃসাধ্য বলিলেও চলে। সাধক চণ্ডীদাস নিজে এই ধর্ম সাধন করিয়া বলিতেছেন—

যখন সাধন, করিয়া তখন
এড়ায় টানিবা খাস।
তাহা হইলে, মন বায়ু সে
আপনি হইবে বশ।
তা হলে কখন না হবে পতন
জগৎ বোঝিবে বশ
বেদ বিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে
ব্রজের নিত্য ধন পায় সেই জন
তাহার উপর কে ?
সদানন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগল কিশোর রূপ,
প্রেমের আচার নয়ন গোচর
জানয়ে রসের কূপ ;
চণ্ডীদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দ ভোরা
নয়নে নয়নে থাকে দুইজনে
যেন জীয়ন্তে মরা॥

আশ্রয় নির্ণয় গ্রন্থে সহজিয়া ধর্ম সাধনের যে সমূহ সঙ্কেত বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে সাধক কবি চণ্ডীদাসের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। গোস্বামী মহাশয় আশ্রয় নির্ণয় করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে আশ্রয়ের প্রকার ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

আশ্রয় পঞ্চপ্রকার :— নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়। সাধনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; সুতরাং প্রবর্ত্তক ভক্তের পক্ষে নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয় ; সাধক ভক্তের পক্ষে ভাবাশ্রয় ; সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় অবলম্বনীয়। আবার আলম্বন বা উদ্দীপনের অভাব ঘটিলে ভক্তের আশ্রয় লাভ সফল হয় না ; সুতরাং প্রবর্ত্তক ভক্তের নাম ও মন্ত্র হইলে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া তাহাকে সাধুসঙ্গ রূপ আলম্বন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তন রূপ উদ্দীপনার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ সাধক ভক্ত সখির চরণ আশ্রয় করিয়া সেবা ও পরিচর্য্যা রূপ আলম্বন এবং রাধাকৃষ্ণ দর্শন রূপ উদ্দীপনার সাহায্যে সাধনায় অগ্রসর হইবেন। সিদ্ধ ভক্ত আবার সেইরূপ রাধিকার চরণ আশ্রয় করিয়া সখিসঙ্গরূপ আলম্বন এবং নিম্নোক্ত পঞ্চপ্রকার উদ্দীপনের প্রভাবে

সর্ব্বদা অপ্রাকৃত আনন্দে বিভোর থাকিবেন॥

* সিদ্ধ ভাবের পঞ্চপ্রকার উদ্দীপন যথা :— নবীন মেঘ; কানড় পুষ্প; ভ্রমর; কোকিল এবং ময়ূরের কণ্ঠ।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় রাগ কয় প্রকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ ভক্তের হিসাবে কোন রাগ কাহার অবলম্বনীয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন; যেমন প্রবর্ত্তকের পক্ষে নাম রাগ, শ্রদ্ধারাগ; সাধকের লীলারাগ; সিদ্ধের পক্ষে প্রেম রাগ ও প্রাপ্তি রাগ। সাধন বিষয়ে সাধক ও সিদ্ধ ভক্তের প্রত্যেকের আবার দেশ কাল ও পাত্র আছে; যথা

> সাধকের দেশ হয় নবদ্বীপ স্থান
> কাল কলি; পাত্র শ্রীচৈতন্য ভগবান;
> সিদ্ধের দেশ হয় শ্রীবৃন্দাবন,
> কাল দ্বাপর; পাত্র শ্রীনন্দনন্দন;

তাহার পর ভক্তি ভাব ও প্রেম লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ভক্তি লাভের উপায় শ্রীগুরু চরণ আশ্রয়; ভাব লাভের উপায় মন্ত্রাশ্রয়; ভাবের অন্তরে দুই প্রকার সেবা; যেমন সাধক ও সিদ্ধরূপে সেবা; এই সেবা ও মন্ত্রই ভাব প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট উপায়। ভক্তি ও ভাবের পর প্রেম। প্রেম লাভের উপায় শ্রীমতী রাধিকার চরণ আশ্রয়; ভাবের অন্তরে এই সেবা নিহিত—প্রেমের অন্তরেও সেইরূপ যেমন আসক্তি বিদ্যমান; আসক্তি না হইলে প্রেম জন্মিতে পারে না। আসক্তি অর্থে পরকীয়া ভাবে আসক্তি; আসক্তির পাত্র একমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

ভক্ত কবি এই প্রসঙ্গে রতি, রস, ও ক্রিয়ার অর্থ কি, প্রত্যেকের প্রকার বিভেদ, প্রকার হিসাবে পাত্র বিচার এবং এই পাত্রগণের ধাম নির্ণয় প্রভৃতি অনেক প্রকার বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা অনধিকারী হইলেও স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অধিকারী পাঠক তাহার মধ্য হইতে হয়ত কোনও লাভজনক উপকরণ পাইতে পারেন।

> ত্রিবিধ প্রকার রতি, তিন মত কয়;
> সামর্থা, সাধারণি, সমঞ্জসা হয়॥
> সামর্থা রতির পাত্র শ্রীমতী রাধিকা।
> সমঞ্জসা রতির পাত্র রুক্মিণী দেবিকা।
> সাধারণির পাত্র কুব্জা তার নাম।
> বিবরিয়া কহি শুন এ তিনের ধাম॥
> সামর্থা রতির ধাম শ্রীবৃন্দাবনে।
> কৃষ্ণ সুখের সুখী তেঁহ অন্য নাহি মনে॥
> সামঞ্জসা রতির ধাম দ্বারিকা নগরী।
> শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পতি ভাব করি॥
> অতএব রুক্মিণীকে সমঞ্জসা ধরি।
> সাধারণি রতির ধাম মথুরা নগরী॥
> সাধারণি কোন এবে শুনহ বিচার।
> কৃষ্ণ প্রাপ্তি রাগ নহে অন্তরে তাহার॥
> নিজ সুখ লাগি চাহে কৃষ্ণকে সম্ভোগ।
> কৃষ্ণ সুখ লাগি নাহি করে তেঁহ রাগ॥

অনন্তর ব্রজের পঞ্চ ভাব, যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর; প্রত্যেক ভাবের পাত্র কে, তাঁহার ধাম কোথায় ইত্যাদি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন মধুরের পাত্র শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী তাঁহার ধাম চার প্রকার যথা—শ্রীবৃন্দাবন, গোলক, মথুরা ও দ্বারকা। শ্রীবৃন্দাবনের পাত্র স্বয়ং শ্রীভগবান; মথুরায় পাত্র শ্রীবাসুদেব এবং দ্বারকায় পাত্র শ্রীনারায়ণ।

আমরা এতক্ষণ ভক্ত কবি বর্ণিত সাধনার যে সঙ্কেত সমূহের উল্লেখ করিয়াছি তাহা সাধনার আদি ও মধ্য ভাগে বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য। সাধনার তৃতীয় বা শেষ স্তরে উপনীত হইলে ভক্ত সাধকের অবস্থার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সুতরাং এই স্তরের বিশেষ অবস্থায় বিবর কবি মহাভাবলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন—ভাব দুই মত হয়; ভাব আর মহাভাব; ভাবের পাত্র, গোপীগণ; মহাভাবের পাত্র শ্রীমতী রাধিকা।

ভাব কি? পরকীয়া; উজ্জ্বল পরকীয়া। কোন্ উজ্জ্বল? রসোজ্জ্বল। কোন্ রস? প্রেমরস। কোন্ প্রেম? বিলাস প্রেম। কোন্ বিলাস? মধুর বিলাস। কোন্ মধুর? যুগল মধুর। কোন্ যুগল? শ্রীরাধাকৃষ্ণ

যুগল।

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলমধুর প্রেমের বিলাস সম্ভোগ করিতে হইলে সাধককে রজ্জ্বোজ্জল পরকীয়া ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ভক্ত সাধক চণ্ডীদাসের ভাষায় রামীর উক্তি এই মতেরই সত্যতা প্রতিপাদন করে :—

আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঁই সে তোমায় গুরু মানি॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধামাধব সঙ্গে, আনন্দে কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব॥

প্রকৃত রাগানুগ ভক্তের দেহ দুই প্রকার—সাধক দেহ ও সিদ্ধ দেহ। সাধক কামানুগ হইবেন; সিদ্ধ কামরূপ হইবেন। এই কাম ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ইচ্ছা নহে; ভক্ত কবিরাজ মহাশয় যাহাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা বলিয়া প্রেম নামে অভিহিত করিয়াছেন ইহা তাহারই নামান্তর। সাধনার শেষ স্তরে প্রকৃত ভক্ত সাধক কামরূপ অর্থাৎ "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা"ময় হইবেন। দাস গোস্বামী মহাশয় এই কামের অর্থ করিয়াছেন—"কৃষ্ণ সুখের কাম" বা কামনা। গোস্বামী মহাশয় প্রশ্নোত্তরছলে এই স্থলে আরও কয়েকটী পদের অর্থ দিয়াছেন। যথা, ভাব কি? মধুর ভাব। স্বভাব কি? প্রকৃতি। ব্যবসা কি? শৃঙ্গার। রূপ কি? উজ্জ্বল গৌর। আনন্দ কি? উত্তর; অর্থাৎ ভক্ত সাধকের শেষ অবস্থা।

সাধনার স্তর অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্ত ত্রিবিধ আখ্যা লাভ করেন; যথা—

প্রবর্ত্তকের সাধক আখ্যান
সাধকের মঞ্জরী আখ্যান
সিদ্ধের সখি আখ্যান,

এই মধুর ভাব, প্রকৃতি, শৃঙ্গার, প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ পাঠক চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত দেখিতে পাইবেন। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। সাধক প্রকৃতিভাবে, সখীভাবে, সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে—পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরী বা সখীরূপে আপনাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই সহজিয়া সাধন সিদ্ধ হয় না। ভক্ত চণ্ডীদাস তাই যখন বাশুলী দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব"?

বাশুলি দেবী উত্তর করিয়াছিলেন—

"বাশুলী কহিছে কহিব কি
মরিয়া হইবে রজক ঝি
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥"

বস্তুতঃ সাধন হিসাবে বাশুলী দেবী কথিত এই মৃত্যু দেহান্তর গ্রহণ নহে; আপনার স্বভাবজ পুরুষ ভাবের বা আচারের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। যাঁহারা সহজিয়া ধর্ম্মের নামে সহজেই নাসিকা কুঞ্চনে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই স্থলে এই ধর্ম্মের সাধনা কিরূপ উচ্চাঙ্গের এবং তাহা কত কঠোর তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারেন। ভক্ত চণ্ডীদাসের ভাষায়—

যেমন দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।

তেমনই প্রকৃত সাধক নারীর মধ্যে যে বিষ ও অমৃত একত্র রহিয়াছে সাধনার বলে তিনি তাহা হইতে

অমৃত টুকুই পান করিতে সক্ষম হইয়েন। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগে এই ধর্ম্মসাধনা বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইলেও যে সহজিয়া ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইয়া সাধকপ্রবর চণ্ডীদাস একদিন তাঁহার প্রণয়-পাত্রীকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়নের তারা ॥

* * * * *

ও রূপমাধুরী পাশরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ,
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস ॥

সে ধর্ম্মের মধ্যে যে নাসিকা কুঞ্চনের কোন ব্যাপার থাকিতেই পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির নির্দ্দেশ করিয়া সাধনার স্তর হিসাবে সাধকের দশটী দশার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আমূল তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠকগণ দেখিবেন সাধক মাত্রেই প্রকৃতিপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া 'ধনি' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

দশ দশা; যথা—

প্রথম দশায় ধনির বাড়য়ে লালসা।
দ্বিতীয় দশায় ধনি উদ্বেগ মানসা ॥
তৃতীয় দশায় ধনি করে জাগরণ।
চতুর্থ দশায় ভাব, না সরে বচন ॥
পঞ্চমে জীবন্মৃত দশা, উচ্চ ভাব হয়।
ষষ্ঠ দশায় ধনির বৈরাগ্য তা' কয় ॥
সপ্তম দশায় ব্যাধি অশেষ প্রকার।
অষ্টমে উন্মাদ চেষ্টা কি কহিব আর ॥
সেই ত নবম দশা বড়ই বিষম
অন্তরে ব্যাকুল কৃষ্ণ বাহিরে অচেতন ॥
অতএব দশম দশায় সহিতে না পারি।
তেঁঞি সে মরিতে চায় তমালের বেড়ি ॥

গোস্বামী মহাশয়ের মতে সাধকের প্রধানতঃ তিনটী দশা যথা:—

১। অন্তর দশা ২। অর্দ্ধবাহ্য ৩। বাহ্যদশা।

ইহাদের পরিচয় স্বরূপ গোস্বামী মহাশয় বলিতেছেন—

অন্তর দশায় করে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
অর্দ্ধবাহে করে তেঁহ প্রাণ প্রবর্ত্তন ॥
অন্তঃদশায় ভোর কিন্তু বাড়ে কাম।
সে দশা কহি ভক্তির অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥

এই তিন দশায় কৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ এই পঞ্চগুণের স্ফুরণ হয়। এই পঞ্চগুণের ধাম পঞ্চেন্দ্রিয় যথা—নেত্র, অধর, নাসিকা, কণ্ঠ, অঙ্গ।

আবার পঞ্চগুণ পঞ্চ প্রকারের—যথা, মোদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন ও মোহন। ইহাদের প্রত্যেকেরও ধাম আছে। গোস্বামী মহাশয় তাহার উল্লেখ না করিলেও অনুসন্ধিৎসু-পাঠক চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাহা পাইবেন।

ভক্ত কবি এইখানেই একরূপ তাহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। সব-রস-সার শৃঙ্গার-রসের আশ্রয় লাভের সঙ্কেত প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার আলোচনায় নিরস্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিতীয় কোন সনাতন দাস গোস্বামী না পাওয়া অবধি আমরা স্বনামখ্যাত সনাতন গোস্বামী মহাশয়কেই এই পুঁথিখানির রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। অবশ্য গ্রন্থের ভাষার হিসাবে আমাদের এই ধারণা এখনও সংশয়মূলক তাহাও স্বীকার করিতেছি। এই বিষয়ে বিধিমত আলোচনা ব্যতিরেকে কোনও অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই আমরা দৃঢ়নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম। আশা করি পাঠকবর্গের মধ্যে রসজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু কেহ এই মীমাংসায় সচেষ্ট হইবেন।

উপসংহারে নিবেদন এই, যে রস ভক্ত চণ্ডীদাসের

ভাষায়,—

———না বুঝে কেহ।

যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥"

অরসিক, অনধিকারী আমরা সে রস উপলব্ধি করিতে একান্ত অক্ষম। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন "জীয়ন্তে মরা" না হইলে এই সহজ সাধনার অধিকারী হইতে পারা যায় না—প্রকৃত মানুষও হওয়া যায় না। আমরা এখনও সে অবস্থা লাভ করিতে পারি নাই—লাভ করা সহজ—সাধ্যও নহে। তবে অনধিকারী হইলেও গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ভক্ত কবি এই সহজিয়া ধর্ম্মসাধনার যে কয়টী সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন তাহারই একটা পরিচয় দিলাম মাত্র। দু' এক স্থলে সেই সঙ্কেত বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে সাধক প্রবর চণ্ডীদাসের গীতি কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। অক্ষম অনধিকারীর পক্ষে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই বলিয়াই তাহা করিয়াছি।

এই পরিচয় পাঠে যদি পাঠকগণের মধ্যে একজনেরও হৃদয়ে এই প্রাচীন সহজিয়া ধর্ম্মের রহস্য উদ্ঘাটনে অনুরাগ জন্মে তাহা হইলেই আমি আমার শ্রম সফল বোধ করিব।

ভক্তি ও ঘৃণা।

(লেখক—শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর)

ঊর্দ্ধে ছুটে উৎস সম ভক্তি হৃদি উদ্ঘাটি'
স্বরগ পানে টানিতে চাহে হৃদয়ে,
ঘৃণা সে নামে প্রপাত সম মর্ম্ম শিলা উৎপাটি'
হৃদয়ে নীচে আনিতে চাহে নিরয়ে।
ভক্তি সে যে চিৎকমলে করে অনবগুণ্ঠিত
অমল দলে গন্ধ মধু বিতরি'
ঘৃণা তাহারে সসঙ্কোচে মুদারে করে কুণ্ঠিত,
অন্ধকারে অসিত দলে আবরি'।

নিষ্কৃতি।

(লেখক—শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু)

নীহারিকা বাতায়ন সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে তাহার দিগন্তপ্রসারিত শব্দহীন মরুময় প্রান্তর, যেন ভগবানের একটা অভিশপ্ত রাজ্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। দূরে অতি দূরে দৃষ্টির সীমাপ্রান্তে শূন্যময়ী নীলিমার ঘন আবরণ যেন একটী বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকার মতই শোভা পাইতেছিল। মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরস্পর সম্বন্ধহীন গুটীকয়েক বৃহৎ বৃক্ষ ও কয়েক খানি বাঙ্গলা সেই অসীম শূন্যতার ভয়ঙ্করী সৌন্দর্য্যকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মনোরম করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। পৌষের দারুণ শীত আন্তরিক শুষ্ক বায়ুসংযোগে ... প্রীতিবন্ধনহীন ভীষণ প্রান্তরের উপর দিয়া নির্ব্বিরোধে ছুটাছুটি করিতেছিল।

সমদর্শী ভগবানের মনোরম দৃষ্টির মধ্যে এমন ভীষণ নির্জ্জন স্থান থাকিতে পারে, একথা নীহারিকা ইতি পূর্ব্বে বোধ হয় কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। নীহারিকা ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতে ছিল না যে তাহার অতি আদরের স্নেহময়ী দিদি আজন্ম সহরে পালিত হইয়াও কেন এই সৌন্দর্য্যহীন নির্জ্জন স্থানে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসিল। যে স্থানে পশু ... সঙ্কোচ বোধ করে সেখানে তাহার দিদি

যে কিসের আশায় তাহার ভবিষ্যৎ সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়া দিবার মানস করিয়াছে তাহার কারণ সেই সদা হাস্যময়ী চঞ্চলা নীহারিকার মাথায় কিছুতেই আসিল না। যে দিদি তাহাকে এতটুকু বেলা থেকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড়টী করিয়াছে, যার যত্নে ও স্নেহে সে আজ পর্য্যন্ত মাতৃ-হীনতার অভাব এক দিনের তরেও বুঝিতে পারে নাই, তার ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনা করিতেই নীহারিকার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। দু'দিন পরে কলিকাতার এক লক্ষপতির একমাত্র পুত্রকে বিবাহ করিবে, কল্পনায় তাহার আনন্দকোলাহল-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্বামী গৃহ মানশ্চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল; কল্পনার সেই স্নেহময়ী ছবির পার্শ্বে তাহার মাতৃস্বরূপা অগ্রজার এই মরুময় নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে সঙ্গীহীন ক্ষুদ্র কুটীরখানি যেন ধন-জনযৌবনগর্ব্বিতা গরীয়সী রাজধানীর পার্শ্বে ছিন্ন-বস্ত্রপরিহিতা ম্লানমুখী কাঙ্গালিনীর মতই দেখাইল। সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীহারিকা গৃহ মধ্যে উপবিষ্টা অগ্রজার দিকে তাকাইল—একটী চেয়ারে প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তির মত তাহার দিদি প্রমীলা সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। মুখে তাহার এক অব্যক্ত করুণ ভাব,—যেন অন্তঃস্থলে সযত্ননিহিত বহু দিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ঈষৎ আভাষ তাহার সেই সরল মুখখানির ছড়াইয়া রহিয়াছে। পলকশূন্য সুন্দর ইন্দীবরতুল্য নয়নদ্বয়ে একটা স্থির বিষাদ যেন অঙ্কিত। নীহারিকার কোমল অন্তঃকরণ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—ছুটিয়া গিয়া তাহার দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল; আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, "দিদি, দিদি, তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমি এখানে থেক না দিদি; তুমি ফিরে চল, এখানে থাকলে কিছুতেই বাঁচবে না।"

প্রমীলা অনুজার স্নেহালিঙ্গনে প্রবুদ্ধ হইয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীহারিকার রক্তিম গণ্ডে তর্জ্জনী দ্বারা মৃদু আঘাত করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "না বোন, তা আর হয় না, আমাকে এখানে থাকতেই হ'বে। এই আমার অদৃষ্ট, অদৃষ্টের উপর কি কারও হাত আছে বোন? তুই আমার জন্যে ভাবিস নি—আমি মরব না। আমার মত কঠিনার মরণ এত সহজে হ'বে না।"

নীহারিকা—"দিদি, আমার মুখ চেয়ে তুমি এখান ছেড়ে চল। আমি যে তোমাকে ছেড়ে কখনও থাকিনি। তোমার আদরে স্নেহেই এত বড় হয়েছি। তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না—না—তা সে যেখানেই হোক।"

প্রমীলা—"তা বোন আমি কি আর চিরকাল তোকে আগলে ব'সে থাকবো। আজ বাদে কাল শ্বশুর বাড়ী যাবি; স্বামীর আদর সোহাগ পেলে আমার এই আদর যত্নের কথা মনেও পড়বে না।"

নীহারিকা—"না দিদি, এমন যায়গায় তোমাকে রেখে আমি কোথাও থাকতে পারব না, স্বর্গে গিয়েও না।"

প্রমীলা—"দূর পাগলি, ও কথা কি বলতে আছে? শ্বশুরবাড়ীই মেয়ে মানুষের আপনার বাড়ী, আর স্বামীর সঙ্গই রমণীর পক্ষে স্বর্গ; মা বোন ক'দিনের জন্য?"

নীহারিকা—"তাই বুঝি তুমি এই রকম করে' স্বামীর ঘর করতে এসেছ? স্বামীর ঘর স্বর্গ হ'তে পারে, তাই বলে' এমন যায়গায় এমন ভয়ঙ্কর স্থানে না,—কখনও নয়; আমি হ'লে ত এমন স্বামীর ঘরে একদণ্ডও থাকতুম না। ধন্যি তুমি মেয়ে যা হো'ক তোমার কি সবই উল্টো—সবই আলাদা ধরণের!"

প্রমীলা করুণকাতর নয়নদু'টী নীহারিকার মুখের উপর স্থাপিত করিল; খানিক স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "বোন সকলেরই কি সমান অবস্থা হয়? তা যদি হ'ত তা হলে এ পৃথিবীই স্বর্গ হ'ত। যে যেমন কপাল করে এসেছে তাকে সেই রকমই ত কর্ত্তে হ'বে। তাকে অসন্তুষ্ট হ'তে নেই, হ'লে পাপ ভিন্ন পুণ্য নেই। আর আমার ত ইনি রয়েছে; তাকে বুকে করে, আমার সুদীর্ঘ দিনগুলো এক রকম কেটে যাবে।"

নীহারিকা—"হোক্ পাপ তা' বলে আমি হ'লে

দু দণ্ড এমন জায়গায় থাকতে পারতুম না। দু'দিন মোটে এসেছি আবার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। দিদি, আমার মিনিও কি এমন যায়গায় ভাল থাকতে পারবে? আহা কচি মেয়ে, সঙ্গী অভাবে যে শুকিয়ে যাবে।"

প্রমীলা শিহরিয়া উঠিয়া একটী ক্ষুদ্র বিছানায় শায়িতা মিনির দিকে স্নেহভরে চাহিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কি করব ভাই, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। অবশ্য এটা আমার নিজের জন্যে যে নয় তাও জানিস্ ভাই। যার জন্যে আমায় থাকতে হ'বে, যার জন্যে আমি ঘর দোর সাজিয়ে নিয়ে আশা পথ চেয়ে বসে আছি, তার যে এ রকম স্থান ভিন্ন থাকবার স্থান নেই। আমাকে তার শান্তির জন্যই এই রকম নির্জ্জন স্থান খুঁজে বার করতে হয়েছে। তা বাস্তবিক, তুই কেন আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট পাস্; তুই কালই চলে যা—বিশেষ তোর বিয়ে হ'তে আর মোটে এক মাস দেরি রয়েছে; তোর এখন এখানে থাকা ভাল দেখায় না। মামা, মামীকে বলিস্ আমি ভাল আছি, মিনি ভাল আছে—আর স্বামীর সোহাগ আদরের মাঝখানে যদি সময় পাস্ ত মাঝে মাঝে এক খানা করে চিঠি দিস্।" প্রমীলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, নীহারিকাও স্থির থাকিতে পারিল না। হৃদয়ের কতখানি বেদনা তাহার দিদি নীরবে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে তাই ভাবিতেই সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খাটের উপর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে মিনিও ব্যাপার না বুঝিলেও মাসীর ক্রন্দনে যোগদান করিতে একটুও বিলম্ব করিল না।

২

তখন গোধূলি। সমস্ত দিন চরাচর বিশ্বের উপর আপনার শক্তি সঞ্চালন করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল রক্তিম আননে সূর্য্যদেব তখন প্রণয়িনী সন্ধ্যা রাণীর অঞ্চল ছায়ে তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত দেহখানি শীতল করিবার আশায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে ছিলেন, প্রিয়া মিলনাশায় তাঁহার উৎফুল্ল গণ্ডযুগলের রক্তিম আভা সারা বিশ্বময় যেন এক খানি সোণালী রঙের পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব মিলনে প্রতিবন্ধক হইবার আশঙ্কায় বোধ হয় নিশানাথ পশ্চাৎ হইতে অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিতেছিল এবং দুষ্ট পবনও তাহার উদ্দাম নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া শান্ত শিষ্ট শিশুটীর মত ইতস্ততঃ চলা ফেরা করিতেছিল। প্রমীলা বারান্দার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব মিলন-শোভা তাহার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি আনিয়া দিতেছিল। কাল তাহার স্বামী আসিবে। তিন বৎসর সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কি হৃদয়ভরা যাতনা, কি জীবনভরা নৈরাশ্য, কি দারুণ লজ্জা লইয়া ফিরিয়া আসিবে, তাহা ভাবিতেই প্রমীলার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সে আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। নীহারিকা ও সে দু'টী মাতৃহারা ভগ্নী পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া পিতার অযাচিত আদর যত্নে ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রমীলার তখন চার পাঁচ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। মিনি তখন দুই বৎসরের শিশু। স্বামী বিজনকুমারের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় ও শ্বশুরেরও প্রমীলাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব হওয়ায় বিজনকুমার প্রমীলার চিরসাথীভাবে শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিত। চিত্রকর বিজনকুমার সারাদিন চিত্রাঙ্কনেই ব্যস্ত থাকিত। নবোঢ়া স্নেহময়ী পত্নীর রূপ যৌবন, অগাধ ভালবাসার কোনটাই তাহাকে তাহার অধ্যবসায় হইতে এক চুল হঠাইতে পারিত না। যশোলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিকট দাম্পত্য জীবনের সকল সুখই সে বলি দিয়াছিল। নবাগত যৌবনের বুকভরা প্রেম, সাজিভরা আদর স্নেহ লইয়া ডালি দিতে গিয়া প্রমীলা চিত্রাঙ্কনের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য কতদিন তাহার স্বামীর তীব্র তিরস্কারে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক ধারে যেমন যশ তাহার হস্তগত হইতেছিল অন্য ধারে একটী আবেগ-ভরা হৃদয় যে ক্রমে ক্রমে তাহার হস্ত হইতে দূরে

চলিয়া যাইতেছিল তাহা বিজনকুমার একদিনের তরেও ভাবিবার অবসর পায় নাই; এমনই বিভোর এমনি আত্মহারা হইয়াছিল সে! প্রমীলা যখন লাঞ্ছিতা হইতেছিল তখন তাহাদেরই পাড়ার এক ধনী পিতৃ-বন্ধুর সন্তান বিদেশে পাঠ সাঙ্গ করিয়া ঘরে আসিল। বরাবর পরস্পরের পরিবারবর্গের ভিতর ঘনিষ্ঠতা থাকায় সে প্রমীলাদের বাটীতে পূর্ব্বের মতই যাতায়াত করিতে লাগিল; তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যে যাতায়াতে এমন বিশেষ কিছু ছিল না যাহা লোক চক্ষে দুষনীয় হইতে পারে। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ এই যাতায়াতেই প্রমীলার ভাগ্যচক্রে একটা ভীষণ আবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। যুবক নীহারিকাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়া ফেলিল। সদাহাস্যময়ী চঞ্চলা নীহারিকার নিকট তাহার হৃদয়ভাবের কোনও আভাষই সেই লাজুক যুবকের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহার অন্তর-নিহিত যত ভালবাসার কথা প্রমীলাকে বলিতে আদৌ লজ্জা হইত না। নীহারিকার সৌন্দর্য্য বর্ণনা, নীহারিকার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা—নীহারিকা তাহার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে—নীহারিকার সুখ শান্তির জন্য সে কতখানি চিন্তিত—এই সমস্ত সে প্রমীলার নিকট অনর্গল বকিয়া যাইত। বলিবার সময় তাহার সেই বালকসুলভ সুন্দর মুখখানি উৎসাহে লাল হইয়া উঠিত, আয়ত লোচনযুগল কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিত! ধৈর্য্যশীলা একদৃষ্টে সেই সুন্দর আননখানির দিকে, সেই পদ্ম-পলাশ তুল্য চোখ দু'টার দিকে বিহ্বল ভাবে তাকাইয়া থাকিত। তখন তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই যে তাহার প্রায় সমবয়সী এই যুবক, যাহাকে কিশোর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার এই সরল মধুময় ব্যবহারে তাহার চিত্তে সহানুভূতি ছাড়া অন্য কোনও ভাব আনিতে পারে; একদিনের তরেও মনে হয়নি যে তাহার বালকসুলভ কথাবার্ত্তা একাগ্রমনে শুনিবার মধ্যে তাহার অসীম ধৈর্য্যশীলতা ছাড়া আরও গভীরতম কিছু লুকায়িত থাকিতে পারে। যখন বুঝিল তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—ভ্রম সংশোধনের অবসর পর্য্যন্ত সে হারাইয়া বসিয়াছে।

একদিন যখন এমনই ভাবে সেই যুবক তাহার নিভৃত কক্ষে তাহার সম্মুখে বসিয়া নীহারিকার মমতাহীন কঠোর পরিহাসে জর্জ্জরিত হইয়া সেইদিনকার ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে আবেগভরে প্রমীলার সম্মুখে জানু পাতিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া তাহার প্রতি নীহারিকার এই ভাব দুর করিয়া দিবার জন্য, নীহারিকাকে তাহার করিয়া দিবার জন্য, তাহার সেই শিশুসুলভ সুন্দর চোখ দুটী অতি কাতর ভাবে প্রমীলার মুখের উপর স্থাপিত করিল—সেইদিন নীহারিকার প্রতি এই যুবকের অগাধ ভালবাসা প্রথম সেই উপেক্ষিতা লাঞ্ছিতা রমণীর মনে এক অব্যক্ত যাতনার সৃষ্টি করিল—সেইদিন আচম্বিতে প্রমীলা বুঝিতে পারিল সে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে—তাহার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বুভুক্ষু হৃদয় মন ওই একটুখানি বালকের পদতলে সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার ফল তাহাকে আজীবন ভোগ করিতে হইবে। তাহারই ফলে তাহার এই নির্জ্জন কারাবাস, তাহারই ফলে এই নবীন বয়সে ওদাস্য ও নৈরাশ্য আসিয়া তাহার কোমল হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। জগতে আর কোনও সুখের আশা নাই, আছে কেবল বেদনাভরা স্মৃতির তাড়না আর আনন্দহীন একঘেয়ে সুদীর্ঘ জীবন।

তাহার স্বামী যে কখন গৃহের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা সেই যুবক বা প্রমীলা কাহারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ যখন মস্তকে দারুণ আঘাত পাইয়া বিকট আর্ত্তনাদে প্রমীলার সুখস্বপ্ন নিমেষে কোথায় উড়াইয়া দিয়া সেই যুবক রক্তাক্তকলেবরে লুটাইয়া পড়িল, তখন প্রমীলা সভয়ে দেখিল তাহার স্বামী রোষকষায়িত লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া একটী যষ্টি হস্তে মৃত্যুর মূর্ত্তিমান দূতের মত দাঁড়াইয়া আছে! তাহার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—আত্ম সমর্থনার্থ একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না! তাই যখন তাহার স্বামী যুবকের ভূলুণ্ঠিত নিস্পন্দ

দেহের নিকট গিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া উন্মাদের মত বলিয়া উঠিল, "হাঃ হাঃ হাঃ এক ঘা লাঠির ভর সইতে পারবে না গুপ্ত প্রণয় ক'রতে এসেছে! আমার কাছে এক ঘা লাঠি খেয়েই নিষ্কৃতি পেলি—যা ভগবানের কাছে গিয়ে কি ক'রে পার পাবি তাই ভাবগে যা," তখন প্রমীলা একটী মাত্র অস্ফুট চীৎকার করিয়া সেই মৃত দেহের বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল—তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার পর একমাস সে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে এধার ওধার করিয়া যেদিন পুনরায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তখন শুনিল তাহার স্বামী খুনের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া হাজতে রহিয়াছে। তাহার পিতা বৃদ্ধবয়সে এই কঠিন আঘাত সহ্য করিতে অপারগ হইয়া পর লোক প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার এই রোগের জন্য মোকর্দ্দমা মুলতুবি রহিয়াছে। তাঁহার সেই দুর্ব্বল দেহ মন লইয়া আদালতের কোলাহল, উকিলের জেরা, জগতের লোকের নির্ম্মম কঠোর পরিহাসের হাত এড়াইয়া সে যখন শুনিল তাহার স্বামীর তিন বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে—সেইদিন সে আবার শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তবে তাহার সান্ত্বনার মধ্যে এই ছিল যে সেই চপলা মুখরা পরিহাসপ্রিয়া নীহারিকা সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে তাহার প্রতি মৃত যুবকের ভালবাসার কথা ও তাহার পরিহাসকে উপেক্ষা ভাবিয়া প্রমীলার নিকট কেবল সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্যই যাতায়াতের কথা প্রকাশ করিয়া তাহার কলঙ্ক মোচন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জগতের আর সকলে বিশ্বাস করিলেও তাহার স্বামী যে এ কথার আদৌ আস্থা স্থাপন করেন নাই, তাহা সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আসামীর মুখ ভাব দেখিয়াই বুঝিয়াছিল।

তাহার পর এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর তাহার যে কি ভাবে কাটিয়াছে, তাহা কেবল সে আর তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। জীবনের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, কেবল তাহার কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞানই বোধ হয় তাহাকে জীবিত রাখিতে এতদিন সমর্থ হইয়াছে। তাহার স্বামীর ফিরিয়া আসিবার ও ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রতি তাহার পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাহার এই দুর্ব্বিসহ মানসিক পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে স্বামীর ফিরিবার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার স্বামী যে কয়েদ-খালাসীর কলঙ্কিত জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালেই কাটাইতে চাহিবেন, তাহা যেন পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াই সে খুঁজিয়া এইরূপ নির্জ্জন স্থান বাহির করিয়াছে। তাহার স্বামীর উপার্জ্জনের পথ যে চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না; কিন্তু তাহাতে সে কাতর ছিল না। তাহার পিতৃদত্ত টাকা বিস্তর ছিল; তাহার সুদ হইতে মাসে তিন চারিশত টাকা খরচ করিলেও তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না।

কাল তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিবে। কাল হইতে তাহাকে পত্নীত্বের গুরু কর্ত্তব্যভার মস্তকে করিয়া স্নেহ-প্রেমহীন সুদীর্ঘ দিনগুলি কাটাইতে হইবে—কর্ত্তব্য-পালন ও সেবার দ্বারা সে তাহার স্বামীকে যতটুকু সুখ যতটুকু শান্তি দিতে পারে; কারণ তাহা ছাড়া দিবার মত আর কিছুই ছিল না। তাহার হৃদয়মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি আজ তিন বৎসর হইল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; এতটুকু শিকড় পর্য্যন্ত নাই যে তাহা আর শতচেষ্টাতেও পুনর্জ্জীবিত হয়।

৩

ষ্টেশনটী অতি ক্ষুদ্র। একজন বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টার ও একটী মাত্র জমাদার লইয়া ষ্টেশনের ষ্টাফ (staff)। কয়লার খনির অদূরবর্ত্তী বলিয়া ষ্টেশনে একটী মাত্র প্যাসেঞ্জার গাড়ী দিনে একবার মাত্র থামে।

গাড়ী থামিতেই প্রমীলা আগু বাড়াইয়া গাড়ীর নিকট গেল। একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাহার স্বামী অবতরণ করিলেন। ওঃ কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! একেবারে চেনাই যায় না। মস্তকের কেশরাশি অশীতিপর বৃদ্ধের কেশের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছে—দেহ কঙ্কাল-সার, চক্ষু কোটরগত, পৃষ্ঠদেশ কুব্জের মত বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। তেত্রিশ বৎসর বয়সে মানুষ যে এরূপ বৃদ্ধ

এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে তাহা স্বপ্নেরও অতীত! প্রমীলা ইতিহাসে পড়িয়াছিল যে ফ্রান্সের একজন রাণীকে তাহার সম্মুখ হইতে রাজাকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া যাইবার সময় পরদিন তাহাকেও গিলাটিনে তাহার মস্তক দিতে হইবে বলিয়া জানান হইয়াছিল। পরদিন যথা সময়ে তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাণীর স্বভাবসুলভ সুন্দর সুচিক্কণ কেশরাশি একরাত্রের মধ্যেই একেবারে শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। এই ঘটনা পাঠ করিবার সময় প্রমীলা কি একবারও ভাবিয়া ছিল যে তাহারই জীবনে তাহারই স্বামীর এইরূপ ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইবে?

করুণাপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল! একি দৃষ্টি! যেন জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের ন্যায় তাহার কোটর-গত চক্ষু দুইটী ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিতেছিল—দৃষ্টিতে বুকভরা নৈরাশ্য, জীবনভরা ঘৃণা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে! প্রমীলা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, দৃষ্টি অবনত করিতে বাধ্য হইল।

হা-হা শব্দে হাসিয়া বিজনকুমার বলিয়া উঠিল, "কিগো, বুঝি যাকে দেখতে এসেছিলে, নিতে এসেছিলে, ঠিক তাকে না পেয়ে দুঃখু হ'ল। এ অকর্ম্মণ্য বুড়োকে বোধ-হয় পছন্দ হ'চ্ছে না—নয়?" স্বরে তীব্র শ্লেষ মিশান কথাগুলি তপ্ত লৌহ-শলাকার মত প্রমীলার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিল। প্রমীলা কাতরভাবে স্বামীর দিকে তাকাতেই তাহার মুখে যে তীব্র পৈশাচিক হাসি দেখিল তাহাতে তাহার বুক শুকাইয়া গেল। এই স্বামীকে লইয়া তাহাকে এই বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিতে হইবে। ওঃ ভগবান! কি এত পাপ সে করিয়াছে যে তাকে এত কঠিন শাস্তি দিচ্ছ! ভগবান! এত করিয়া সে যে মনকে দৃঢ় করিয়াছে যে এখন হইতে ভালবাসা না দিতে পারিলেও সেবা যত্নের দ্বারা তাহার স্বামীকে সুখ শান্তি দিবার যথা-সাধ্য চেষ্টা করিবে। ভগবান! তাহার হৃদয়ে বল দাও, যেন কর্ত্তব্য পালনে তাহার ত্রুটি না হয়।

প্রমীলা স্বামীর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "চল বাইরে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—বাড়ী চল।"

বিজন—"বাড়ী যাব হাঃ হাঃ হাঃ; কোথায় বাড়ী? এখানে? এখানে তোমাকে বাড়ী করতে কে বল্লে? এখানে কি মানুষ আসে? এমন স্থানে মানুষ বাঁচতে পারে নাকি?" প্রমীলার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অতি কষ্টে ক্রন্দন রোধ করিল। যথাসম্ভব সহজ স্বরে বলিল, "তুমি এর পরে নির্জ্জনে থাকতে চাইবে মনে করেই আমি খুঁজে খুঁজে এই যায়গা পছন্দ করেছি। আগে চল ঘর দেখবে, তার পর পছন্দ না হয়, তুমি যেখানে যেতে বলবে সেই খানেই আমি নিয়ে যাব।"

বিজন—"ও হো হো কি হিতৈষিণী গো! আমার ভরা যৌবনে সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উন্নতি ব্যর্থ ক'রে দিয়ে এখন আমার সুখ শান্তি খুঁজছে। বলিহারি বাঃ! বাকী আছে ত এই নৈরাশ্যপূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য, নিষ্ফল জীবনটা, তাও কি নেবার ইচ্ছে আছে নাকি? গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা দেখলে যে সন্দেহ হয়!"

এর পর আর কথা চলে না। প্রমীলার এত যত্নের, এত চেষ্টার, এত সংযমের কি এই প্রতিদান! ভগবান! মনের অগোচর পাপ নাই, সে জানে; কিন্তু সামান্য ক্ষণিকের মোহের জন্যও কি এইরূপ কঠোর জীবনব্যাপী শাস্তিই তুমি দিয়ে থাক? পৃথিবীতে তো অনেক কায়-মনোবাক্যে পাপী সে দেখিয়াছে, কিন্তু কই তারা ত এত কষ্ট এত শাস্তি পায়নি। তবে কি এ তার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল? প্রমীলা কিছু না বলিয়া বিজনের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একটা গরুর গাড়ীতে স্বামীকে উঠিতে বলিল। বিজন হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি গরুর গাড়ী? একখানা ঘোড়ার গাড়ীও কি ঠিক ক'রে রাখতে পার নি, নিদেন একখানা টোঙ্গাও ত রাখতে হয়। আমার হাড় ক'খানা গুঁড়ো না করে তোমার তৃপ্তি হ'চ্ছে না দেখছি।"

প্রমীলা আর সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ভাঙ্গা স্বরে জানাইল যে সেখানে গরুর গাড়ী ব্যতীত কোনও প্রকার যানই পাওয়া যায় না। বিজন কোনও কথা না বলিয়া গাড়ীতে উঠিল। সমস্ত রাস্তা উভয়ের কোনও কথোপকথন হইল না। গৃহে পৌঁছিয়া গৃহের

সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া বিজন কুমার কথঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিল।

৪

"মা, বাবা ভারি দুষ্টু। আমি বাবার কাছে যা'ব না। বাবা একটুও আদর করে না, তোমার মত চুমু খায় না, কেবল বকে আর মারতে আসে। হাঁ মা, বাবাকে দেখে তোমার ভয় হয় না? আমার ত বড় ভয় হয়। বাবার চোখ দুটো কেমন জ্বলে দেখেছ?"

মিনি বড় মিথ্যা কথা বলে নাই। বাস্তবিকই মিনিকে দেখিলে বিজন কুমার রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিত। মিনিকে তাহার নিকট আসিতে দিতে প্রমীলাকে বারম্বার বারণ করিয়া দিয়াছিল। ইহার কারণ যে কতদূর সাংঘাতিক তাহা প্রমীলার বুঝিতে বাকী ছিল না। কিন্তু সে একটী কথাও বলিত না। নীরবে দৃঢ় চিত্তে সে কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিল। প্রমীলা মিনির কথায় মাত্র একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "চুপ কর ক্ষেপি ও কথা বলতে আছে? তিনি যে গুরুলোক। তিনি তোমার দুষ্টুমি দেখলে বকবেন না? ওঁর খুব অসুখ হ'য়েছিল কিনা তাই চোখগুলো অমন দেখায়। জ্বর হ'লে চোখ লাল হয়,' দেখিস্ নি? ভাল হ'লে আর রাগ করবেন না। তোকে কত আদর করবেন।"

মিনি—"না মা, তুমি আমায় চিরকাল ভালবেসো, আমি বাবার কাছে যেতেও চাইনে, বাবার ভালবাসাও চাইনে। বাবাকে দেখলে আমার বড় ভয় করে।"

প্রমীলা মিনিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "চুপ কর মা, এখনই শুনতে পাবেন। শুনতে পেলে মনে কত দুঃখু করবেন। রাগ হ'লে তোকেও বকবেন আর আমাকেও বকবেন।" মিনি—"মা, বাবা যখন তোমাকে বকেন তখন কিন্তু আমার ভারি কান্না পায়। আচ্ছা, আমি না হয় দুষ্টুমি করি বলেই বকেন, কিন্তু তুমি ত দুষ্টুমি কর না, তোমাকে কেন বকেন? হাঁ মা, বাবা যখন তোমার কাঁধে ভর দিয়ে চলেন তখন তোমার ভারি লাগে, কষ্ট হয়, না?" পাশের ঘর হইতে প্রমীলার ডাক পড়িল, প্রমীলা মিনির ক্ষুদ্র গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া স্বামীর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

বিজন কুমার ইদানীং এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল যে প্রমীলার সাহায্য ব্যতীত তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। পূর্ব্বে বরং একটু আধটু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার আহার, শয়ন, বেড়ান সমস্তই প্রমীলার সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। তাহার সেই শীর্ণ শরীর আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেজাজ আরও খিট্‌খিটে হইয়াছে। পান হইতে চুণ খসিবার যোটি নাই। সর্ব্বদাই খুঁটি নাটি লইয়া প্রমীলার উপর অজস্র গালি বর্ষণ চলিতেছে। কথাটী বলিবার যো নাই অথচ চুপ করিয়া থাকিবারও যো নাই। মেয়েটাকে তো দুচক্ষে দেখিতে পারে না। কাছে গেলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, অকথ্য গালাগালি করে। দেখিয়া শুনিয়া প্রমীলার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সে এই গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে সুতরাং যথা সম্ভব সহিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আর বুঝি পারে না। ধৈর্য্যেরও বুঝি একটা সীমা আছে। আর—এতই কি অপরাধ সে করিয়াছে। মুহুর্ত্তের মত মনের একটী বিকার উদয় হইতে না হইতেই ঘটনার তাড়নায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কেবল তাহার স্মৃতিটুকু পূর্ণ দাহিকা শক্তি লইয়া অন্তরের নিভৃত প্রদেশে সিঁদ কাটিতেছে, আর বুভুক্ষিত উপেক্ষিত প্রাণের মধ্যে অন্তরের সমস্ত পূজা সমস্ত ভালবাসা, ঢালিয়া দিবার মত একটি মাত্র মনোহর চিত্র অঙ্কিত হইতে না হইতেই ত তাহা নির্ম্মম হিংসুকের সজোর তুলিকা ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। সে চিত্রের ত সামান্য রেখা পর্য্যন্ত সারা অন্তরের আর কোনও স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, তবে কি পাপে ভগবান তাহার এই কঠোর শাস্তি। স্বামীর প্রতি ভালবাসা ছাড়া যে টুকু কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকের আছে তাহা হইতে ত সে-এক চুল এদিক ওদিক হয় নাই। স্বামীর সেবা, স্বামীর যত্ন, স্বামীর সন্তোষ বিধানই ত সে তাহার ধ্যান জ্ঞান করিয়াছে। কিন্তু তথাপি কেন সে তাহার স্বামীর দ্বারা উৎপীড়িতা ও লাঞ্ছিতা হইতেছে। তাহার এই অক্লান্ত সেবা ও হাড়ভাঙ্গা

পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা ত নাইই, একটা মিষ্ট কথাও কি বলিতে কষ্ট বোধ হয়। সারাদিন কটু কথা, শ্লেষ ও বিদ্রূপ। তার অত বড় একটা মহান যশস্বী জীবন যে কেবল তাহারই পাপে, তাহারই দোষে নষ্ট হইয়া গেল এই কথা দিনান্তে তাহাকে একশ'বার শুনাইয়াও তাহার স্বামীর তৃপ্তি হইত না। অসুরের ন্যায় বলবান দেহ যে কেবল তাহারই দোষে আজ অকাল বার্দ্ধক্যভারে জর্জ্জরিত কঙ্কালসার তাহাও বিশেষ করিয়া প্রমীলাকে বুঝাইয়া দিতে বিজন কুমার ক্ষান্ত ছিল না। আজ আট দশ দিন এই ভাবটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রমীলার মাঝে মাঝে মনে হইত বুঝি সে পাগল হইয়া যাইবে। এত যন্ত্রণা, অত অবজ্ঞা এত বিদ্রূপ কি মানুষে সহ্য করিতে পারে।

বিজন কুমারের নিকট যাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "মেয়েকে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল? যেমন মা তার তেমনি মেয়ে। গলা টিপে মেরে ফেললে তবে ঠিক হয়। তা উচ্ছে গাছে কি আর আম ফলে।"

প্রমীলা, "আচ্ছা, তুমি মেয়েটাকে অমন কর কেন বল দেখি। ও তোমার কি করেছে?"

বিজন, "কি ক'রেছে? তোমরা যে কি করনি তাই আমি জানতে চাই। কি ক'রেছে? কি বাকী রেখেছ। আমার জীবনের আশা ভরসা, আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে অর্জ্জিত অক্ষুণ্ণ যশ, সব চেয়ে বড় আমার সুনাম সমস্ত চর্ব্বণ ক'রে বসে আছ। যা নিয়ে লোকে বেঁচে থাকে তার কি বাকী রেখেছ? চিরদিন যে রোগ কাকে বলে তা জানতো না তাকে তার জীবনের মধ্যাহ্নে তিন তিনটী বছর ঘানি গাছে ঘুরিয়ে তাকে অস্থি পঞ্জর সার ক'রেছ, বাতে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু ক'রে ফেলেছ—আর বেশী কি করতে চাও বাকী আছে প্রাণটা—তা তোমাকে আর বেশী দিন কষ্ট করতে হবে না অল্প দিনেই এটা আপনি শেষ হয়ে যাবে।" বলিতে বলিতে বিজন কুমার হাঁফাইয়া উঠিল। দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। প্রমীলা তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া পাখা করিতে করিতে বলিল, "সবই বুঝি, আমার দোষেই তোমার যত কষ্ট। তা কি ক'রবে বল অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই। তুমি আমাকে ভুল বুঝছ কেন? তোমার উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হ'য়েছে, তাতে কি হ'য়েছে, আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়েছে চল না হয় দুদিন স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে বেড়িয়ে আসি। মনটাকে চাঙ্গা কর, ভগবানের উপর নির্ভর কর। তার পর দেখ আমি তোমাকে আমার সেবা যত্নে কেমন অল্প দিনেই ভাল ক'রে তুলতে পারি। যশের আকাঙ্ক্ষা কর, এখান থেকেই তোমার ছবি আঁকবার কাজ বেশ ভাল চলতে পারবে। যা যা চাও, সবই আমি আনিয়ে দেব। ভিন্ন নাম দিয়ে বাজারে বা'র করলেই চলবে। তোমার সুন্দর ছবির হাত, খুব অল্প দিনেই নাম কিনে ফেলবে। এখন চল আমার কাঁধে ভর দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসবে। চল বাইরে বেশ জ্যোচ্ছনা। মনটা ঠাণ্ডা হ'বে এখন।"

বিজন কুমার, "হা হা হা, বেড়াতে যাব যাব যাব, খুব অনেক দূর যাব, এতদূর যাব যে বোধহয় ফিরে আসতে আর সামর্থ্যে কুলুবে না। (উত্তেজিত ভাবে) যাও যাও আমার সুমুখ থেকে সরে যাও। কাল সাপিনী তোকে দেখলেও আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠে। আমি আমাকে ঠিক রাখতে পারি না। দূর হ দূর হ।" চক্ষে অঞ্চল দিয়া নীরবে নতবদনে প্রমীলা গৃহের বাহির হইয়া গেল।

আজ একটা হেস্তনেস্ত না করিলেই নয়। সে আজ মন দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে থাকিলে সেও প্রাণে বাঁচিবে না তাহার স্বামীকেও বাঁচাইতে পারিবে না। মাঝখান থেকে তার স্বামীরও নিজের শেষের ক'টা দিন আরও দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে। আর তার সাধের মিনি সেও কখনও বাঁচিবে না। ইদানীং মিনি সঙ্গী অভাবে ও পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। না, মিনিকে রক্ষা করিতেই হইবে, তাহার একমাত্র আদরের ধন, তাহার ভগ্ন ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনার সামগ্রী মিনিকে যেমন করিয়া হউক বাঁচাইতে হইবে। তাহার মরা হইবে না। মিনির জন্য তাহাকে বাঁচিতে হইবে। তাহাকে পলাইতে হইবে। তাহার স্বামীর সুখ শান্তি নষ্ট করিতে আর সে তাহার সমুখে থাকিবে না। আজ ত স্পষ্টই সে বলিয়া দিয়াছে যে

তাহার উপস্থিতিই তাহার স্বামীকে আরোগ্য হইতে দিতেছে না। তবে আর কি জন্ত সে এখানে থাকিবে। যা'র জন্য এই নির্জ্জন মরুপ্রদেশে থাকা, সেই যখন স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে বিদায় দিতেছে—তখন আর দ্বিধা কি? কর্ত্তব্য স্বামী সেবা? তা সকলের ভাগ্যে ত আর হয় না। আর যার সেবা করিবে সেই যখন বিদায় দিতেছে তখন ত তার কর্ত্তব্যের শেষ হইয়া গিয়াছে।

মিনিকে পূর্ব্ব হইতেই তার পরিচারিকার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে। রাত্রে বিজনকুমার ঘুমাইলে সে পরিচারিকার গৃহে যাইবে। তথা হইতে সে মিনিকে লইয়া ছুইটী ষ্টেশন পরের ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী ধরিয়া একেবারে সোজাসুজি কলিকাতায় চলিয়া যাইবে।

তাহার সমস্ত টাকার অর্দ্ধেক বাহির করিয়া আনাইয়াছে, তাহা বিজনকুমারের ডেস্কের ভিতর রাখিয়া দিয়াছে। একখানি চিঠি লিখিয়া বিজনকুমারের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। বিজনকুমার চেয়ারে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি নেহাইত অসহায় দেখাইতেছিল। প্রমীলার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কি উচিৎ কার্য্য করিতেছে। এই শিশুর অপেক্ষাও অসহায় পঙ্গু স্বামীকে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে একাকী ফেলিয়া পলাইতেছে। এটা কি তাহার পক্ষে স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন হইতেছে? কর্ত্তব্যের কথা মনে হইতেই তাহার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐ শীর্ণ রক্তশূন্য মুখখানি আর কিছু করিতে না পারুক রাশি রাশি গরল উদ্গিরণ করিতে খুব মজবুত। না আর দ্বিধা নয়, ধীরে ধীরে গলবস্ত্র হইয়া নিদ্রিত স্বামীকে প্রণাম করিয়া প্রমীলা কম্পিতপদে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে প্রকৃতির প্রলয় কাণ্ড চলিতেছে, আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাতে শীতকাল। অন্তরে অসম্ভব উত্তেজনা স্বত্তেও প্রমীলার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে চলিতে লাগিল। পরিচারিকার গৃহে পৌছিয়া দেখিল সে জাগিয়া বসিয়া আছে। খাটে মিনি নিদ্রা যাইতেছিল, পরিচারিকা প্রমীলার নিষেধ স্বত্বেও শুষ্ক বস্ত্র আনিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল। উঠিয়া মিনির খাটের উপর গিয়া বসিল, বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আজকার ষড়যন্ত্রের কথা সে কিছুই জানে না। আর একজনও ত কিছুই জানে না। মিনিও যেমন জাগিয়া উঠিয়া সবই জানিতে পারিবে, আর একজনও তেমনই নিদ্রা ভঙ্গে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। আর সে যে বালিকার পিতা, তাহারই স্বামী। বালিকার মুখে যে তাহার পিতার মুখের সাদৃশ্য রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। তাই ত সে একি করিতেছে। এই কি তাহার পতি ভক্তি দেখান হইতেছে? সে সামান্য মনকষ্ট, সামান্য বাক্য যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া পীড়িত, রুগ্ন শিশুর মত অসহায় স্বামীকে কার তত্বাবধানে রাখিয়া যাইতেছে? তার অভাবে যে তাহার স্বামীর একদণ্ডও চলিবে না। খাওয়া, বসা, চলা, ফেরা সব বিষয়ই যে তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার স্বামীর পক্ষে অসম্ভব। সে সামান্য কটু কাটব্যের ভয়ে পলাইতেছে, আর তার স্বামী যে অহর্নিশি কি কষ্ট ভোগ করিতেছে তা কি সে একবারও মনে ভাবিয়াছে? অকালে জরাগ্রস্থ, সুদীর্ঘ ভবিষ্যত জীবন স্বত্বেও কর্ম্মে অক্ষম, পঙ্গু, আশা ভরসা হীন, যশহীন, উপার্জ্জন হীন, পর নির্ভর, কলঙ্কময় জীবন এ সমস্ত কি মানুষকে ঠিক রাখিতে পারে? আর এ সকলের কারণ ত কতকটা সে নিজে। জ্ঞাত ভাবেই হউক, আর অজ্ঞাত ভাবেই হউক, তাহারই কৃতকার্য্যের জন্যই ত তাহার স্বামীর আজ এই অবস্থা। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া সতী, সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিয়াও সে আজ কি করিতে যাইতেছে? এতক্ষণ হয় ত তাহার স্বামীর তৃষ্ণা পাইয়াছে; সামান্য একটু জলের জন্য কাতর ভাবে তাহাকে ডাকিতেছে; গলায় এমন জোর নাই যে বাহিরের ঘরে নিদ্রিত পরিচারকের কর্ণে সে ক্ষীণ স্বর পৌছিবে বিশেষতঃ এই দুর্য্যোগময় নিশীথ। প্রমীলা আর

ভাবিতে পারিল না। ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজ গৃহাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। ঘন ঘন বজ্রাঘাতের শব্দের মধ্যেও যেন সে তাহার পিপাসাতুর স্বামীর কাতর আহ্বান শুনিতে পাইতেছিল। এই যে গৃহ—এই যে দরজা—এই যে উঠান—এই, এই যে তাহার স্বামীর শয়ন কক্ষ! এই কক্ষ হইতেই ত সে অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে জন্মের মত বিদায় লইয়া গিয়াছিল। এই যে তাহার স্বামী সেই ভাবেই নিদ্রা যাইতেছে। দৌড়িয়া গিয়া টেবিল হইতে পত্র খানা লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বাতায়ন পথে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল। কই জীবিতের মুখ ত এত সাদা হয় না। তবে কি—তবে কি—নিকটে গিয়া স্বামীর গায়ে হাত দিতেই তাহার সংশয়ের আর বিন্দুমাত্র কারণও রহিল না। তাহার স্বামী যেন তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়াই তাহাকে আজ হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি দিয়া তাহার কথিত সেই দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। একটা বিকট আর্ত্তনাদে সমস্ত ঘরখানি কাঁপাইয়া প্রমীলা তাহার মৃত স্বামীর স্পন্দনহীন দেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সন্তবাণী।

(জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ)

(শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ)

কমল জলে বাস করে, কিন্তু
রবি শশী বহুদূরে আকাশে থাকে।
এ দূরত্বে কিছু এসে যায় না।
যার কাছে তোমার মন আছে
তুমি তার পাশেই আছ বলে জানবে।

(তুলসী সাহেব)

ভক্তি করা কাপুরুষের কাজ নয়। যে নিজ হাতে নিজের মাথা কেটে দিতে পারে সেই ভক্তির পথে চলতে পারে। অহঙ্কার সমূলে বিনাশ না করলে এ পথে চলবার যো নাই।

(কবীর)

ভক্তি ঠিক খড়োর ধারের মত, সুখ দুঃখের আঘাতে একে ঠিক রাখা চাই; নইলে ডিগ্‌মিগ্ করলেই এ ভেঙ্গে যায়।

(কবীর)

* * *

সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় ভগবানের দিকে টান রাখবে, তাঁকে ধরে থাকবে তা'হলে তোমার অভাবের ব্যবস্থা তিনিই করবেন। পতিব্রতা যদি পরবার কাপড় না পায়, তা'হলে পতিরই লাজ জানবে।

(কবীর)

* * *

একজন ভক্ত এক সাধুর বাড়ীতে অতিথি হলেন। ভক্তটী খুব বিদ্বান্, কিন্তু সাধুজী বড় একটা লেখাপড়ার ধার ধারতেন না। সাধুর ঘরে যে রুটী ও নুন ছিল তাই তিনি যত্ন করে অতিথিকে খেতে দিলেন। অতিথিও যেই খেতে বসবেন অমনি বাইরে একজন অন্ধ ভিক্ষুক বড়ই করুণ স্বরে খাবার চাইতে লাগল। অতিথির সম্মুখে যে রুটী ছিল সাধুজী তাই নিয়ে ভিক্ষুককে দিলেন। অতিথি ত চটে লাল; তিনি বললেন "তুমি কেমন সাধু? অতিথিকে এমন করে অপমান করলে?" লেখাপড়া জানলে তুমি কখন এমন ব্যবহার করতে না।" ঠিক এই সময়ে সাধুজীর একজন ভক্ত শিষ্য সেখানে অনেক ভাল ভাল খাবার জিনিষ নিয়ে উপস্থিত হলেন; তখন তিনি অতিথি ও শিষ্যকে নিয়ে বেশ করে ভোগ লাগালেন। হাত মুখ ধোয়ার পর সাধুজী অতিথিকে বললেন, "দেখুন আপনি প্রকৃত ভক্ত বটে, কিন্তু শুধু প্রীতি থাকলে হবে না। প্রীতির সঙ্গে প্রতীতি বা বিশ্বাস থাকা চাই। আপনি কি মনে করেন যে ভিক্ষুককে খেতে দিলে ভগবান আপনাকে না খাইয়ে রাখতেন?" বিদ্বানের মুখে আর কথাটি নাই। তিনি সব বুঝতে পেরে সেই বিশ্বাসী ভক্তের পায়ের ধূলো নিয়ে আপনাকে ধন্য মনে করলেন।

কর্ণগড়ের ইতিকথা।

(লেখক—শ্রীঅতুল চন্দ্র বসু, বি, এল)

দশবৎসর পূর্ব্বে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে কর্ণগড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। দর্শন করিয়া নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। সে বিশাল রাজপুরীর অবকীর্ণ সমাধির পার্শ্বে বসিয়া সেদিন কত কথাই না চিন্তা করিয়াছিলাম, চপলা কল্পনা চক্ষের সম্মুখে কত অপূর্ব্ব দৃশ্যই না ধরিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। সে ধ্বংসীভূত ইষ্টকস্তূপ যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া এক বিপুল নয়নাভিরাম নগর সৃষ্টি করিল। নগরীর চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাকার। প্রাকার বেষ্টন করিয়া পরিখা। পরিখা বেষ্টন করিয়া দীর্ঘকায় ঘনসন্নিবিষ্ট বনরাজি। নগরী মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত রাজপ্রাসাদ। দ্বারে সশস্ত্র সান্ত্রী। প্রাসাদাভ্যন্তরে বিস্তৃত দরবারকক্ষ, অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া মহার্ঘ বসন ভূষণে সজ্জিত নৃপতি বার দিয়া বসিয়াছেন। দূরে সম্মুখে অর্থী প্রত্যর্থীগণ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব আরজী পেশ করিতেছেন। রাজপথ জনাকীর্ণ, উৎসবমুখরিত। সজ্জিত পণ্যবীথিকায় পণ্যবিক্রেতাগণ নাগরিকগণকে হাসিমুখে পণ্য বিক্রয় করিতেছে। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা আরতির শব্দ। গৌরকায় উন্নতদেহ ব্রাহ্মণগণ গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রাজ্যের প্রজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। কি সুখময়, কি শান্তিময় দৃশ্য! দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল—দেখিলাম নগরী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। রাজ্যমধ্যে ক্ষণেকের নিমিত্ত "সাড়া" পড়িয়া গেল। অস্ত্রে বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া সৈন্যগণ দুর্গরক্ষার্থ দুর্গশিখরে আরোহণ করিল। প্রাকারশীর্ষে সৈন্যগণ বর্শা তরবারি হস্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছে। সুন্দর অশ্বে চড়িয়া কনকোজ্জ্বল বর্ম্মে শোভিত হইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ শিরে ধরিয়া কুমার-প্রতিম সেনাপতি রণবেশে বাহির হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সহস্র তূর্য্যনিনাদে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ক্ষণেকের জন্য আকাশ ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইল। অস্ত্রের ঝনঝনে, অশ্বের গর্জ্জনে, সৈন্যের তর্জ্জনে দিগন্ত ক্ষণেকের জন্য কম্পিত হইল, মেদিনী মুহূর্ত্তের জন্য টলিল; তারপর সব শেষ, শত্রু পরাজিত, বিধ্বস্ত। জয়গাথা গাহিতে গাহিতে সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। জয়গাথা গাহিতে গাহিতে পুরাঙ্গনারা লাজাঞ্জলি দিয়া বিজয়ী সৈন্যগণকে বরণ করিল। রাজা সেনাপতিকে পার্শ্বে বসাইয়া পাণ আতর দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজ্য মধ্যে সপ্ত দিবানিশি আনন্দ স্রোত বহিল। হাস্য কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল। আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। এবার শোচনীয় দৃশ্য—রাজা রাজকার্য্যে অমনোযোগী, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, প্রজাগণ অনাহারে কঙ্কালসার, তার উপর অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীগণের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত। রাজ্যে সৌন্দর্য্য নাই, সে উৎসব নাই, সে শ্রী নাই। দস্যু তস্করগণের উপদ্রবে প্রজাগণ সশঙ্কিত। রাজদ্বারে প্রতীকারের আশা নাই দেখিয়া প্রজাগণ স্ব স্ব ধনপ্রাণ রক্ষার আশায় স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া রাজ্য ত্যাগ করিল রাজ্য শ্মশান হইল। কেবল প্রাসাদ ও অট্টালিকা সমূহ অতীত গৌরবের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাও বা কতদিন। কালের নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারাও মৃত্তিকার সহিত নিজ অঙ্গ মিশাইয়া দিল। দারুণ বেদনায় হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল—তন্দ্রা ভাঙ্গিল। দেখিলাম উন্মুক্ত আকাশ পানে শূন্য দৃষ্টি অর্পন করিয়া কর্ণগড়ের সমাধিস্তূপের মধ্যে বসিয়া আছি। কর্ণগড়ের অতীত গৌরবের ইতিহাস, কর্ণগড়ের পতনের ইতিহাস জানিবার জন্য প্রাণ আকুল হইল। কিন্তু কোথায় জানিব? কে বলিবে? তারপর বহুদিন

বহু প্রাচীন ব্যাক্তিকে কর্ণগড় সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কত অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছি। তাহার মধ্য হইতে যাহা সার তাহাই সঙ্কলন করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। "মেদিনী বান্ধবের" খণ্ডে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীটুকু কোন কারণে প্রকাশিত হয় নাই। আজ দশবৎসর পরে মেদিনীপুরে আবার সাহিত্য ক্ষেত্রে জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমার সেই পুরাতন প্রবন্ধটী নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি আপনাদের মনঃপূত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কর্ণগড় মেদিনীপুর নগরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে প্রায় ছয় মাইল দূরে পারাং নদীর তীরে অবস্থিত। কর্ণগড়ে আগ্যাশক্তি মহামায়া বিরাজমানা। কর্ণগড় পীঠস্থান, ইহাই কর্ণগড়ের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। বহুকাল হইতে কর্ণগড় হিন্দু তীর্থস্থল বলিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানে বিখ্যাত। এরূপ সমগ্র দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে কতকালের জীবন প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীশ্রী৺দণ্ডেশ্বর মহামায়া কর্ণগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ দেশ বিদেশ হইতে লোকে মহামায়া দর্শন লাভাশায় কর্ণগড়ে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু যে রাজা নিজ রাজ্যমধ্যে এই জাগ্রত দেব দেবী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। আজ মহামায়ার অস্তিত্বের সঙ্গে কর্ণগড়ের অস্তিত্ব বিজড়িত কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন কর্ণগড় ছিল কিন্তু মহামায়া তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সে কতকালের কথা কে বলিবে?

জনশ্রুতি কর্ণগড় মহাভারত বর্ণিত, কৌরব সভার দাতাকর্ণের রাজধানী। দাতাকর্ণের নামানুসারে এই স্থানের নাম কর্ণগড় হইয়াছে। আমাদের সহর সীমান্তবর্ত্তী গোপগিরিও বিরাট রাজার দক্ষিণ গোপগৃহ বলিয়া প্রথিত। যদি জনপ্রবাদ সত্য হয় তাহা হইলে মৎস্য ও অঙ্গদেশ এক দেশ ভুক্ত হইয়া পড়ে। আজকাল ঐতিহাসিক গবেষণার দিনে কর্ণগড়কে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া চালাইতে গেলে আমার নিতান্ত উপহাস ভাজন হইতে হইবে। তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কর্ণগড় এমন এক মহাপ্রাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত নগরী যিনি একদিন ব্যাস বর্ণিত অঙ্গ রাজার সহিত তুলিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালের কর্ণগড়রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে উত্তরে বিষ্ণুপুর, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান ও পশ্চিমে ঘাটশিলা, অন্ততঃ এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী দ্বাবিংশতি পরগণাবিশিষ্ট বিস্তৃত প্রদেশ কর্ণগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে উক্ত দ্বাবিংশতি পরগণার অন্তর্গত তৈলিক, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, গোপ, শৌণ্ডিক, প্রভৃতি অধিবাসীবর্গ কর্ণগড়স্থিত স্ব স্ব জাতীয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এক একটী বিশিষ্ট বংশকে সর্দ্দার বা পরামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। কর্ণগড়ের অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সব পরামাণিকের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলেও তাহাদের পূর্ব্ব মান গৌরব এখনও ধ্বংসস্তূপের কুক্ষিগত হয় নাই। এখনও কাননাবৃত বিনষ্ট নগরীর ক্ষুদ্র পল্লী মধ্যে তাহাদের বিমলিন গৌরব প্রভার নিপ্রভ রশ্মি অল্পে অল্পে নিস্থত হইতেছে। একাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত সর্দ্দারের পরামাণিকত্বই রাজা কর্ণের দ্বাবিংশ পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তারের জলন্ত নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আধুনিক ঝাড়গ্রাম, লালগড়, শিলদা প্রভৃতি যে কর্ণগড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

কর্ণগড়ের প্রতিষ্ঠাকাল নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় নাই। রাজাগণ কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বা কর্ণগড় কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে কর্ণগড় বিষ্ণুপুর রাজ্যের সমসাময়িক। বহুকাল ধরিয়া কর্ণগড় ও বিষ্ণুপুরের প্রাধান্য লইয়া যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কখনও

বিষ্ণুপুরাধিপতি বিজয়গর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছেন কখনও বা কর্ণগড়াধিপ জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া রাজলক্ষ্মীকে বহন করিয়া আনিয়াছেন। বিষ্ণুপুর রাজ্য অতি প্রাচীন। বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট আকবর যখন বঙ্গদেশ জয় মানসে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে বীরবর মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, অনেক রাজপুত বীর তাঁহার সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তাঁহার সৌভাগ্যান্বেষী বহু অনুচর বাঙ্গালায় রহিয়া যান। তাহাদের মধ্যেই কয়েকজন অদ্ভুত-কর্ম্মা পুরুষ বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে রাজ্য পাট স্থাপন করেন। বিষ্ণুপুরাধিপতি তাহাদের অন্যতম। আবার হইতে পারে যে মুসলমান আক্রমণে নির্জ্জিত হইয়া গৃহশূন্য আশ্রয়শূন্য অনেক রাজকুমার স্বদেশ বাসভূমি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গল খণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ অপেক্ষাকৃত নিরীহ জঙ্গলবাসীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া অল্পে অল্পে ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়া অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিরূপে পরিগণিত হয়েন। কর্ণগড় ও বিষ্ণুপুর এই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কর্ণগড়ের ধ্বংসাবশেষ :—বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নগরী পারাং নদীর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। নদীর উত্তর দিকে রাজপ্রাসাদ অন্তঃপুর প্রভৃতি সংস্থিত ছিল—এই ভগ্নস্তূপ প্রায় এক ক্রোশ বিস্তৃত হইবে। দক্ষিণ পার্শ্বে লুপ্তপ্রায় প্রাচীরাংশ ও কয়েকটি ভগ্ন মন্দির ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল দণ্ডেশ্বর মহামায়ার মন্দির এখনও কালের প্রবল প্রতাপ উপেক্ষা করিয়া দেব শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। মন্দির সম্মুখে এক অপূর্ব্ব যোগমণ্ডপ, প্রস্তরগ্রথিত,—ত্রিতল—মন্দির ও মণ্ডপ-গঠন-প্রণালী উড়িষ্যাদেশীয় পদ্ধতি অনুরূপ। মণ্ডপ হইতে কিয়ৎ-দূরে এক ভগ্ন পঞ্চরত্ন মন্দির; মন্দিরে বিগ্রহ নাই কেবল কয়েকটি বনগুল্ম শিরে ধরিয়া মন্দিরটি আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। কর্ণগড়ের প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রভৃতি সর্ব্ব-ধ্বংসী কালের কুক্ষিগত হইলেও কর্ণগড় এখনও প্রাকৃতিক দৃশ্যে রমণীয়। গড়ের কৃত্রিম শোভা গিয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতি দেবী কর্ণগড়কে এমনই মনোমত সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে যে দেখিলে মন প্রাণ বিমোহিত হয়। কর্ণগড়ে প্রচণ্ড নিদাঘেও চির বসন্ত বিরাজমান। এক অনাবিল শান্তিস্রোত কর্ণগড়ে চিরপ্রবাহিত। ইহা মহামায়ার মহিমা কি না কে বলিবে।

রাজবংশ—রাজা কর্ণ ও তাঁহার কতিপয় বংশধর গণের বিবরণ দুর্জ্ঞেয়। উক্ত বংশের জনৈক রাজা ইন্দ্র-কেতুর পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দ্রকেতুর দুই সহোদর—ইন্দ্র-কেতু ও চন্দ্রকেতু। রাজ্য লইয়া দুই ভ্রাতায় বিবাদ হয়। ফলে রাজ্য বিভক্ত হয়। চন্দ্রকেতু রাজ্যের উত্তরাংশ পাইলেন; চন্দ্রকোণা তাঁহার রাজধানী হইল। কর্ণগড় ইন্দ্রকেতুর রহিল। ইন্দ্রকেতুর পুত্র নরেন্দ্রকেতু। ইনি আনন্দপুরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি মনোহর গড় নির্ম্মাণ করেন। বিধ্বস্ত গড়ের প্রাচীর পরিখা এবং বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীর ধ্বংস চিহ্নমাত্র এখনও সেই অতীত স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। গড়ের উভয় পার্শ্বে রেয়ুরাড়ি ও কাঁচগেড়্যা নামক দুইটি গ্রাম অবস্থিত; বিলুপ্ত গড়ের পার্শ্বে পরে পরে তিনটি পুষ্করিণী ও ভগ্ন দুর্গের সামান্য নিদর্শন ব্যতীত রাজা নরেন্দ্রকেতুর সমুদয় কীর্ত্তিই সর্ব্বগ্রাসী কাল উদরস্থ করিয়াছে। পুষ্করিণীগুলি এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত একটি সিংহদ্বারের ভগ্না-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে তাহাকে "দরজা-গোড়া" নামে অভিহিত করে।

রাজা নরেন্দ্রকেতুর সময় দস্যু তস্করের অত্যন্ত উপদ্রব হয়। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি দস্যু হস্ত হইতে প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষার্থ লোধা জাতীয় একজন সর্দারের হস্তে সমস্ত রাজ্য শাসন ভার অর্পণ করেন এবং স্বয়ং কর্ণগড় পরিত্যাগ করিয়া নবনির্ম্মিত গড়ে

অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন।

উক্ত সর্দারের আত্তিত্তে লোধা, নিবাল লালগড় অন্তর্গত ডানটিকরি গ্রামে; উক্ত সর্দারের প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিত না। বহু সমরে জয় লাভ করিয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাকে রণবীর বা রণা বলিয়া ডাকিত। রণার আরাধিত দেবীর নামই রঙ্কামায়। রণার জন্মভূমি ডানটিকরি গ্রামে এখনও দেবীর সু উচ্চ প্রকাণ্ড শূন্য মন্দির ও যোগাসন দেখিতে পাওয়া যায়। নানকার মহাল নামে অভিহিত স্থান সমূহ রণার জায়গীর ছিল। গোদাপিয়াশালের পশ্চিমে রণাগড়, আমড়াকুচির পূর্ব্বে রণাডাঙ্গা, শীলদার অন্তর্গত ক্যাকো প্রভৃতি নানাস্থানে রণার বাসস্থান ছিল। রণা অপুত্রক। তিনি অভয়া চরণ নামক এক মাঝির ছেলেকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অভয়া বীরপুরুষ ছিলেন। নিঃসন্তান রাজা নরেন্দ্রকেতু অভয়ার দুর্দ্দম প্রতাপ ও অসাধারণ যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। এইখানে রাজা কর্ণের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সমাপ্তি।

রাজা অভয় স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শালবনি থানার অন্তর্গত সাতপাটি নামক গ্রাম হইতে অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে "অভয়া গড়" নামে একটী গড় প্রস্তুত করেন। রাজা অভয়ার সেই সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ গড় এখন বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ইনি স্বনির্ম্মিত গড়ে অভয়া নাম্নী একটী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দিরে সমানীতা।

রাজা অভয়ার পুত্র—সুমাত্র সিংহ। তিনি গোদাপিয়াশালের নিকট কুঞ্জগড় নামক এক গড় নির্ম্মাণ করেন। সে গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

"সুমাত্রসিংহের পুত্র জামদার সিংহ। গোদাপিয়াশালের পশ্চিমদিকস্থ রণাগড়ের পূর্ব্বে এখন যেখানে জমীদারী কোম্পানীর কুঠী, তাহার কিছু দূরে জামদার গড় নামক একটী গড় প্রতিষ্ঠা করেন। গড়টী সুদৃঢ়ভাবে ছিল। কিন্তু ওয়াটসন কোম্পানীর যেচ্ছাদপূর্ব্বক উক্ত গড় ভাঙ্গিয়া আপনাদিগের কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জামদার সিংহ নিজ নামাঙ্কিত গড়ে জামদরী নাম্নী এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। সে মন্দির আজও বিদ্যমান। নাড়াজোলাধিপতির ব্যয়ে আজও দেবী পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে।

জামাদার সিংহ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার পুত্র জিৎ সিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। জিৎ সিংহ অভয়া বংশের শেষ রাজা। এই সময়ে কর্ণগড়ের নৃপতিবৃন্দ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহারা বাঙ্গলার নবাবকেও ছাপাইয়া উঠিতেন। এই কারণেই বোধ হয় নবাব সরকার হইতে একজন দূত কর্ণগড়ে প্রেরিত হয়। রাজা জিৎ সিংহের শাসনকালে প্রতাপ সিংহ নামক একজন দূত কর্ণগড়ে অবস্থান করিতেন।

জিৎ সিংহের সেনাপতির নাম রণসিংহ মহাপাত্র। ইহার বাটী মেদিনীপুর সহরের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে কমলাপুর গ্রামে। রাজ্যে সেনাপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। একদা রণসিংহ কর্ণগড় হইতে কমলাপুর যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে দেখিলেন কতকগুলি লোক একটী রোরুদ্যমান বালকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রণসিংহ জিজ্ঞাসায় জানিলেন বালকটী পশ্চিম দেশীয়, পিতামাতার সহিত পুরী ধামে গমন করিতেছিল পথি মধ্যে দারুণ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার পিতামাতা উভয়েই গতাসু হইয়াছে। নিঃসহায় বালক তাই ক্রন্দন করিতেছে। রণসিংহ উক্ত বালটাকে সুশ্রী ও সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এবং বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। বালকের নাম লক্ষণ সিংহ। লক্ষণ সিংহ সম্বন্ধে অনেক মনোহর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মেদিনীপুর ইতিহাস প্রণেতা একটী কিম্বদন্তী তুলিয়া দিয়াছেন আমি শুধু একটী উদ্ধৃত করিলাম। আমার বিবেচনায় মহুয়ার জনশ্রুতি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। লক্ষণ সিংহ অল্পকাল মধ্যেই শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। রণসিংহ লক্ষণ

সিংহের অসাধারণ রণকৌশল দেখিয়া এতই বিমুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন এবং স্বজাতীয় স্বরূপীয় এক সদ্গোপ কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই লক্ষণ সিংহই কর্ণগড়ের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মেদিনীপুর ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ পাল উক্ত কিম্বদন্তীর বিবরণ বোধ হয় অবগত ছিলেন না তাহা হইলে কর্ণগড় রাজবংশীয়গণের কাহারও কাহারও মহাপাত্র উপাধি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন না। লক্ষণ সিংহের বংশধরগণ যাহারা রাজোপাধি বঞ্চিত ছিলেন তাঁহারা রণসিংহের পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে।

রাজা জিৎ সিংহ অপুত্রক ছিলেন কিন্তু স্বৈরী জাতীয়া এক উপপত্নীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মিয়া ছিল। রাজা সেই কুলটার প্ররোচনায় উক্ত জারজ সন্তানকে রাজসিংহাসন প্রদানের অভিলাষ করেন। দূত প্রতাপ সিং সে প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া লক্ষণ সিংহের সুযোগ্য পুত্র রঘুবীরকে সিংহাসন প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। জিৎ সিংহ দূতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। প্রতাপ সিংহ প্রাণ ভয়ে দেশে পলায়ন করিতেছিলেন, রাজা সংবাদ পাইয়া অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং আনন্দপুরের পশ্চিমে তাহাকে ধৃত ও নিহত করেন। যে স্থানে প্রতাপ সিংহ নিহত হয়েন সে স্থান এখনও "প্রতাপ দারোগার বন" নামে অভিহিত হয়।

এদিকে নবাব দূতের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া জিৎ সিংহকে দণ্ডিত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জিৎ সিংহের নিজ সৈন্যদল লক্ষণ সিংহের পক্ষপাতী। নিরুপায় হইয়া জিৎ সিংহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের প্রায় ১০ ক্রোশ পশ্চিমে রামপুর নামক স্থানে পলায়ন করেন। এদিকে নবাবী সৈন্যদল লক্ষণ সিংহের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষণ সিংহের পুত্র রঘুবীর সিংহকে কর্ণগড় রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইতিহাসে রঘুবীর রঘুনাথ নামে আখ্যাত হইলেও শিবায়ণ প্রণেতা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে রঘুবীর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণবীর
যাহার পুণ্যের বলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর।

১৬৭২ খৃঃ রঘুবীর কর্ণগড়ের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন।

"মেদিনীপুর ইতিহাস" প্রণেতা ত্রৈলোক্য বাবুর মতে লক্ষণসিংহ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন কথা সত্য তাহা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ। তিনি লিখিয়াছেন উড়িষ্যারাজার অধীন খয়রারাজা সুরতসিংহ যবন সংগ্রামে উক্ত প্রধান রাজার সাহায্য করণার্থ স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ লক্ষণ সিংহকে প্রেরণ করেন। লক্ষণ সিংহ পাঠান সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে উড়িষ্যা ভূপতি লক্ষণ সিংহের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কর্ণগড়াদি প্রদেশের রাজত্ব এবং তৎসহ একজন বলীয়ান সৈন্য প্রেরণ করেন। কথা সত্য হইলে উড়িষ্যাধিপকে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ বলিতে হইবে। যে সুরত সিংহ তাঁহার সাহায্যার্থে নিজ সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন উড়িষ্যা-ধিপ যে সেই প্রভুভক্তির বিনিময়ে সুরত সিংহকে সিংহাসন চ্যুত করিবেন তাহা অবিশ্বাস্য।

রঘুবীর সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজা রাম-সিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। রাজা রামসিংহের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী শোভাসিংহের বিদ্রোহে উৎপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব বাস যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া রামসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা রাম-সিংহের রাজত্বকাল প্রারম্ভে কর্ণগড় রাজ্যে দস্যু তস্করের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। দেশ উৎসন্ন প্রায়। রামসিংহ প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষার্থ আবাসগড় নামক

একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এবং কর্ণগড় দুর্গের নানা উন্নতিসাধন করিয়া তাহা সুগভীর পরিখাবেষ্টিত ও দৃঢ়তর করেন। আবাসগড় মেদিনীপুর সহরের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখন দেখিলে আবালগড় মাত্র উদ্যান-বাটিকা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এখনও ইহার তিন দিকে পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান। একদিকে এখনও অগাধ জল তাহা রাজার বাঁধ নামে পরিচিত। আবাস গড়ে অনেকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, যথা—ধাতুময়ী দশভুজা, জয়দুর্গা, গৌরী, শ্যামসুন্দর, রাধাশ্যাম, মদনমোহন ইত্যাদি। কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের বিখ্যাত রাজা মোহনলাল খান এই গড়ের অনেক সৌষ্ঠব সাধন করেন। রাজা রামসিংহ একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নবাব দরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কেশপুরের নিকট রামসাগর নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। সরোবর অদ্যাপি বিরাজমান। তাঁহারই রাজসভার কবি রামেশ্বর শিবায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কর্ণগড়ের বিখ্যাত পঞ্চমুণ্ডি যোগমণ্ডপ তাঁহারই নির্ম্মিত। এই যোগমঞ্চে বসিয়া কবি রামেশ্বর যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭১১ খৃঃ রাজা রামসিংহ পরলোক গমন করেন।

রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহ। যশোবন্ত এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁহার রাজত্বকালেই কর্ণগড় সুখ সমৃদ্ধির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। যশোবন্ত যে কেবল চতুর রাজনীতিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ধর্ম্মবলেও অজেয় ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র বলিত। কথিত আছে একদিন যশোবন্ত মহামায়া মন্দিরে ধ্যানমগ্ন, অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরের রাজা অতর্কিত আক্রমণে কর্ণগড়ের বহির্দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। শত্রু পক্ষের জয়োল্লাসে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। বুঝিলেন পরিত্রাণ অসম্ভব। তিনি আবার বিপত্তারিণীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অভয়া অভয় প্রদান করিলেন, দৈববলে বলী হইয়া যশোবন্ত যুদ্ধে গমন করিলেন, যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন—এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কেহ কখন দেখে নাই। লোকে ইহাকে দেব দেবীর যুদ্ধ বলিয়া থাকে। রাজা যশোবন্তের সভাপণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত কবি রামেশ্বর এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক কবিতা রচনা করেন :—

"মহামায়া মদনমোহনে ঠেলাঠেলি।
দ্বিজ রামেশ্বর ভনে কলিকালে কেলি"॥

রাজা যশোবন্ত সিংহ বঙ্গের রাজনৈতিক গগনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। যে সময় রাজা যশোবন্ত সিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন সে সময় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল—সে সময় সুপ্রসিদ্ধ দুষ্ট রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আরঙ্গজেবের কুটিল রাজনীতির প্রভাবে যে সাম্রাজ্য আকেন্দ্র বিকম্পিত হইয়াছিল, তাহা তদীয় অযোগ্য বংশধরগণের অযোগ্যতায় ও অদূরদর্শিতায় অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে—মোগল সম্রাটের অস্তিত্ব কেবল মাত্র উপাধিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সময়ে সকলেই বিদ্রোহী, প্রত্যেক জায়গীরদারই স্ব স্ব প্রদেশে স্বাধীন নৃপতি। কোন বিচার নাই, শৃঙ্খলা নাই; দেশ সম্পূর্ণ অরাজক। এই ঘোর অরাজকতার সময় যশোবন্ত অদ্ভুত ক্ষমতা, অসামান্য বুদ্ধি প্রভাবে স্বীয় রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

শাসনকার্য্য শিক্ষার জন্য তিনি বহুদিন বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দীনের সময় তিনি ঢাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন। যশোবন্তের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে রাজকার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে যশোবন্তের গুণগানে সমস্ত ঢাকা প্রদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা যশোবন্ত সিংহ নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুকরণে ঢাকায় ৮/ মণ চাউল বিক্রয় করিয়া ঢাকা নগরীর পশ্চিম দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়াছিলেন। ইতিহাসে সেজন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

যশোবন্ত যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ, তদ্রূপ সাহিত্য সেবী ছিলেন, তাঁহারই উৎসাহে শিবায়ণ সম্পূর্ণ হয়। রাজা যশোবন্ত ১৭৪৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

ইঁহাকে রাজকার্য্যে রাজা মানসিংহ ও রাজা তোডর মল্লের সমান আসন প্রদান করা যাইতে পারে। রাজা যশোবন্ত মেদিনীপুরে নরপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রাজা যশোবন্তের পুত্রের নাম অজিৎ সিংহ। অজিৎ সিংহ একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পনর হাজার ছিল। সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ও সুদূর মানভূম সিংহভূম তাঁহার পদানত হইয়াছিল। অজিৎ সিংহ মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পত্নীদ্বয় রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণিকে রাখিয়া অজিৎ সিংহ পরলোক গমন করেন। তখন দেশে ভয়ানক অরাজকতা। মোগল প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে; তখন ইংরাজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সময় চুয়াড়েরা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কর্ণগড় রাজধানী আক্রমণ করে। রাণীদ্বয় ভীত হইয়া রাজা যশোবন্তের মাতুলপুত্র নাড়াজোলাধিপতি ত্রিলোচন ঘোষের শরণাপন্ন হয়েন। যে স্থানে তাঁহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়, অদ্যাপি সেই স্থান রাণী পাটনা বলিয়া বিখ্যাত। স্থির হয় রাণীদ্বয়ের মৃত্যুর পর কর্ণগড় রাজসিংহাসন নাড়াজোলপতির অধিকার ভুক্ত হইবে এবং নাড়াজোলপতি কর্ণগড় রাজ্য রক্ষা করিবেন। রাণী ভবাণী স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে কালকবলিত হন। কিন্তু রাণী শিরোমণি ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। রাণী শিরোমণির শেষ অবস্থা অতীব শোচনীয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বাহাদুর মিরজাফরের নিকট হইতে মেদিনীপুর জেলার শাসন ভার প্রাপ্ত হয়েন। রাণীর যে সকল সৈন্য ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন। তাহারা জীবনোপায়শূন্য হইয়া দস্যু তস্করের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহারা চুয়াড় নামে অভিহিত ও চুয়াড় দলভুক্ত হইয়া লুণ্ঠন ব্যবসা আরম্ভ করে। রাণীকে এই সব গোলযোগের কারণ মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দিনী করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে একদল সৈন্য কর্ণগড় রাজভবন আক্রমণ করিল। রাণী ও তাঁহার প্রধান অমাত্য নাড়াজোলের জমীদার চুণীলাল খাঁন আত্ম সমর্পণ করিলেন। বৃটীশ সৈন্য গড় বাড়ী ও মণিমুক্তা সমস্ত লুণ্ঠন করিল; কর্ণগড় একদিনে শ্রীহীন হইয়া গেল। রাণী ও তাঁহার অমাত্য বন্দীকৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। এই সঙ্কট সময়ে রাজা আনন্দ লাল খান বহু পরিশ্রমে রাণীর ও স্বীয় পিতৃব্যের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। কিন্তু রাণী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আবাস গড়ে ধর্ম্মকার্য্যরত থাকিয়া জীবন লীলা সম্বরণ করেন। এইখানে কর্ণগড় রাজবংশের শেষ হইল। কর্ণগড় রাজত্ব নাড়াজোলের সহিত মিলিত হইল। মেদিনীপুরে রাণী শিরোমণির রাজ্যপাট সংস্থাপিত হইল; কিন্তু কর্ণগড়ের গৌরব ধ্বজা উত্তরাধিকারী বিহীন হইয়া ধূলি রাশিতে লুটাইয়া পড়িল।

রাণী শিরোমণি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপবতী রমণী ছিলেন। এক কথায় তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালার বিদুষী রমণী স্বনামধন্যা রাণী ভবাণীর সহিত তুলিত করা যাইতে পারে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাণী শিরোমণির রাজত্বের অবসান হয়। তদবধি কর্ণগড় শ্রীহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। মেদিনীপুরের রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় পুরবাসীবর্গ সকলে মেদিনীপুরে চলিয়া আসে। কর্ণগড় নিজের অতীত গৌরবস্মৃতি বুকে ধরিয়া আজ শত বৎসরের ও ঊর্দ্ধকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কালের কঠোর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ধূলিশায়ী হইয়াছে; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বগৌরব ভুলিতে পারে নাই। তাই জনসাধারণের তীব্র দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার নিমিত্ত বনগুল্মের আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহার সমাধি-নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম বলিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে কর্ণগড়ের যে বিবরণ প্রদান করিলাম, তাহার সবটাই যে ধ্রুব ঐতিহাসিক সত্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার বাসনা আমার নাই। আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার যুগ আসিয়াছে; আশা করি কোন মহাত্মা আমার সংগৃহীত এই সামান্য উপকরণ লইয়া কর্ণগড়ের এক প্রামাণিক ইতিহাস গঠন করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই আমি নিজ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপেক্ষা।

(লেখক—৺সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।)

এ কি পরমাদ !!
বিশ্ববিজয়ী চঞ্চল আঁখি
মাগি নিল অবসাদ !
সুখের দেখি নিমেষের তরে,
রেখেছিনু আঁখি ও আনন' পরে
ইথে অপরাধ ?
স্বভাবের ধারা মধু লালসা,
কারে দিব অপবাদ ?

এ কি পরিহাস !
চপল চরণ চমকি থামিল
না মিটিল কোন আশ ;
অগ্রসারি আমি আসিনু বসিতে,
কক্ষ নিলয়ে প্রতিমা পূজিতে,
চির অভিলাষ ;
মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটালি যে সখি,
সুতীখন-উপহাস !

এ কি অনাচার !
কৈশোর তটে যৌবন বাঢ়
ঊর্ম্মি বিথারি তার।
মত্ত গরবে রহিবি কি তোর;
বৃথাই ঝরিবে লাবণি কি তোর,
এ কি অবিচার।
সম্মুখে প্রিয় ! বিফলে শুখাল
ফুল মালতী হার !

এ কি পরিতাপ !
পায়ে ধরি বঁধু কেঁদে ফিরে যাবে
এত টুকু নাহি তাপ !
যক্ষের মত সঞ্চিত মধু
বক্ষে রাখিবি, পাবে না বঁধু,
বৃথা অনুতাপ !
কৃপণের ধন কোন কাজে লাগে
বিধাতার অভিশাপ !

এ কি ব্যবহার !
যাচিয়া চরণে ঢালিনু অর্ঘ্য
চাহিলিনা একবার !
প্রণয়ী মিনতি চরণে দলিলা,
পরের তরে রাখিলে তুলিয়া,
ফিরিলিনা আর !
যৌবন গেলে, প্রাণ মরমে
রহিবে বেদনা তার।

কথার মূল্য।

(রূপ কথা।)

বারিধির বুকের কাছে বাসা করেছিল এক বণিক; তার আকুল তরঙ্গ ভঙ্গ দেখবার জন্য নয়, তার পণ্য ভরা তরী গুলি সেই নৃত্য তালে কেমন যায় আসে তাই দেখ্‌বার জন্য আর সেগুলি তীরে ভিড়তে না ভিড়তে তার ঐশ্বর্য্য গুলি লুটে নিতে। নীল সাগরের ঢেউএ ঢেউএ লাল টুক্‌ টুকে বালারুণের লাল আলো কেমন ঝিক্‌ মিক্‌ করত, পূর্ণিমা রাতে সারা গায় জোছনা মেখে অত বড় বুক খানা কেমন করে' বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ত এসব দেখবার তার মোটেই অবসর ছিল না। বণিকের আর তিনটি ছেলে ছিল বাপেরই মত; এসব রূপের চেয়ে হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যের রূপ দেখেই তারা বিভোর। ছোট ছেলেটি ছিল দল ছাড়া। সে ছিল তার বাপ মা ভাইদের কাছে সৃষ্টি ছাড়া আর লক্ষ্মী ছাড়া। সে এক ধারে একলাটি দূরে সাগর কূলে বসে' সেই অসীম পারাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে তার উদার প্রাণটা কোন্‌ অসীমের পানে ছুটিয়ে দিত কে জানে! সে মাণিক ভরা তরীর দিকে চাইত না। সে চাইত ডুব দিয়ে সেই অতল তলের মাণিক তুলতে। এমনি করে' কিছুদিন যায়। বণিক দেখলে ছোট ছেলেটার বিষয় কাজে আদৌ মন নাই কেবল বয়ে যাচ্ছে। বণিক তাকে ফেরাবার জন্য এক মতলব আঁটলে। চার পুত্রকে ডেকে প্রত্যেককে চার হাজার টাকা দিয়ে বললে, "এই টাকা নিয়ে বিদেশে যাও, কার কেমন ব্যবসা বুদ্ধি দেখব, কে কত টাকা লাভ করতে পার এক বছর পরে এসে তার হিসেব হবে এবং সেই হিসেবে তোমাদিগকে পুরষ্কার দেব।"

তিন জন আহ্লাদে যে যার পথ খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ছোটটি ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে চলেছে; উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে অতল জল রাশি আর সামনে পেছনে দূরে শুধু বালু বেলার আকুল বুক খানা কার স্নেহের আশায় মেলে রয়েছে। একেই সে পথ খুঁজে পাচ্ছিলনা তার পর সাঁঝের আঁধার ঘিরে ঘিরে একবারই যেন তার পথ রোধ করে দাঁড়া'ল। এক জায়গাতেই খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত চরণে সে সেই বালির মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। ঝির ঝির করে বাতাস এসে তার গায়ে মাথায় স্নেহ হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেল। নিঝুম রাতে দু'ফোটা তপ্ত চোখের জল গায়ে পড়তে শিউরে জেগে উঠে দেখে কে একটী স্নেহ-ময়ী রমণী তাকে কোলে করে' বসে আছে। রমণী আদর করে তাকে তার ছোট্ট কুটীর খানিতে নিয়ে গেল। রমণী প্রৌঢ়া, রূপের জোয়ার ভাটার টানে অনেক দূর নেবে গেছে কিন্তু তার কনক রেখা টুকু এখনও মেলায় নি। বণিক পুত্রের পরিচয় পেয়ে রমণীর অনেক দিনের অনেক কথাই মনের চারদিকে ভিড় করে আস্‌তে লাগ্‌ল আর মাঝে মাঝে চোখের কোনটা সজল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। বণিকপুত্র ফিরে তার পরিচয় জান্‌তে চাইল তখন সে ভারি মুস্কিলে পড়ে গেল। তার যে পরিচয় দেবার কিছুই নেই, যে টুকু আছে তা বুকের আগুণে পুড়িয়ে ফেলবার জিনিস, মুখ ফুটে বলবার নয়। অনেক পীড়াপীড়িতে অস্ফুট স্বরে সে যেটুকু বললে বণিক পুত্র তাতেই শিউরে উঠ্‌ল, রমণী দুহাতে মুখ ঢেকে পাগলের মত বসে রইল, সে পোড়ামুখ আর তার দেখাবার ইচ্ছা ছিল না। রমণী পতিতা হলেও অনেক দিনের অনুশোচনায় তার প্রাণের সব ময়লাটুকু কেটে গিয়েছিল। বণিক পুত্র যেতে চাইতেই রমণী চেঁচিয়ে কেঁদে বললে, এই পিশাচীর ভেতরেও মায়ের প্রাণ আছে, সেখানে কোন দাগই পড়েনি তোমায় আমি সেইটুকু দিয়ে ঢেকে রাখ্‌ব, তুমি আমায় ছেড়ে পালিও না। অনেক দিনের পর আমায় শুকনে

বুকখানা ভরে' স্নেহের, পীযূষধারা উছলে উঠেছে, দুখিনী আমি তোমায় তাই পান করিয়ে জীইয়ে রাখ্‌ব। মাতৃত্বের গৌরবে তখন তার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা ঘিরে এক অপরূপ লাবণ্য ফুটে উঠেছে। স্নেহকাতর বণিক পুত্র সেই মহিমময়ী মূর্ত্তির সাম্‌নে লুটিয়ে পড়্‌ল; রমণী আকুল আগ্রহে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধর্‌ল। এম্‌নি করে কিছুদিন যায়; মনে পড়ে গেল তার ব্যবসার কথা। কোন অভিজ্ঞতাই তার নাই। নতুন মায়ের কাছে যখন সে বিদায় চাইল তখন রমণী বল্‌লে সে তার সারা জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা দিয়ে চারটি মাত্র অমূল্য কথা সংগ্রহ করেছে, সেই চারটী কথার দাম চার হাজার টাকা; যদি কিন্‌তে চাও উহাই তোমার অমূল্য মূলধন হবে, সারা জীবনে তাই দিয়ে অনেক ঐশ্বর্য্য আহরণ করতে পার্‌বে। বণিক পুত্র ভাব্‌লে তাই ভাল, বাপ ভাই যে ব্যবসা নিয়ে পাগল তা তার জীবনেও হবে না। রমণী এক একটা কথা বল্‌তে লাগ্‌ল আর সে একটি হাজার করে' টাকা তার পায়ের তলায় রেখে দিতে লাগ্‌ল। ক্রমে চারটি কথার সঙ্গে সঙ্গে বণিক পুত্রের সম্বল চার হাজার টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। কথা চারটি এই—"যখন যেমন তখন তেমন" "দেখ্‌বে শুনবে বল্‌বে নাকো কায়," "যে যায় রত কইবে তার মত," "যাচা অন্ন ছাড়্‌তে নেই।" কথাও শেষ হয়ে গেল, টাকাও শেষ হয়ে গেল, বণিক পুত্র যেতে চাইল কিন্তু তখনও এক বছর পূর্ণ হয় নাই, রমণী অনেক সাধ্য সাধনা করে তার স্নেহের নিবিড় ছায়ায় তাকে ঘিরে রাখ্‌ল। এদিকে এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে তার প্রাণের পিশাচ প্রকৃতিটা এক একবার উঁকি মারতে লাগ্‌ল। রমণীর সঙ্কল্প ছিল কথার মূল্য বোঝাবার জন্য সে যে টাকাটা নিয়েছে সে তার স্নেহাস্পদকে আবার ফিরে দিয়ে কৃতার্থ হবে। কিন্তু দেওয়া জিনিষ ফিরে নিতে বণিক পুত্র যখন একবারেই রাজী হ'লনা তখন রমণী তাড়াতাড়ি সব নিয়ে গিয়ে দেবতার পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। তিনি ত আর পতিতার দান বলে অবহেলা কর্‌বেন না। বর্ষ শেষে বণিকপুত্র চলে গেল; রমণীর বহুদিনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে অবাধে চোখের জলের বাণ ডেকে উঠ্‌ল।

চার ভাই ফিরে এসেছে। কেউ বা দশ হাজার কেউ বিশ হাজার কেউ পাঁচ হাজার লাভ করেছে; ছোটটি এক বারবনিতার মোহে পড়ে চারটি কথা কিনে এনেছে। অর্থ লোলুপ পিতা কোন কথাই শুন্‌লেনা, ছোট ছেলেকে কুপুত্র বলে ত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে দূর হয়ে যেতে হুকুম দিলে। মায়ের কাতর অনুনয় ও ব্যর্থ হ'ল। জন্মের মত শেষ বিদায় নিয়ে সাগর তীরে দাঁড়িয়ে একবার আবাল্যের স্মৃতি ভরা গৃহখানির দিকে ফিরে চাইতেই দেখে মা তার সাগর প্রমাণ স্নেহ বুক নিয়ে ছুটে এসেছে। লুকিয়ে একটি মোহর এনে ছেলের আঁচলে বেঁধে দিয়ে বল্‌লে অসময়ের জন্য এই সম্বলটি রইল। মাথার উপর দুহাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌ল, তুই রাজা হয়ে মা'র কোলে ফিরে আসিস্‌। ঘুরে ঘুরে বণিক পুত্র এক জঙ্গলের ধারে সন্ন্যাসীর আড্ডায় এসে পড়লে। ভাব্‌ল সংসার বন্ধন যখন কেটে গেছে তখন এদের সঙ্গই সব চেয়ে ভাল। দলে মিশে গিয়ে ভিক্ষা করে দিন যাপন করে; আর ভগবানের নাম গেয়ে একরকম করে' দিন কেটে যায়। একদিন এক সন্ন্যাসী মরে গেল। কেউ আর তার সদ্গতি করতে চায় না। সবাই যুক্তি করলে বণিক পুত্রের ঘাড়ে ঐ কাজের ভারটা চাপান যাক্‌। বণিক পুত্রকে বলতে তা'র মনে হ'ল "যখন যেমন তখন তেমন"। অমনি রাজী হয়ে একাই সে মৃতদেহ দড়ি বেঁধে নদীর ধারে টেনে নিয়ে গেল। সৎকার করতে গিয়ে কৌতুহল বশে জটা হাত্‌ড়ে দেখে তার মধ্যে সাত সাতটা মাণিক। বণিক পুত্র সেগুলি যত্নে লুকিয়ে রেখে কাজ শেষ করে সন্ন্যাসীর দলে আর ফির্‌ল না একবারে নগরে গিয়ে মায়ের দেওয়া মোহর ভাঙ্গিয়ে এক বাড়ী ভাড়া করে কর্‌লে তারপর সেই সাত

মাণিক নিয়ে সেখানকার রাজাকে উপহার দিলে। রাজা ভারি খুসী। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বণিক পুত্র আত্ম পরিচয় গোপন করে অনাথ বলে পরিচয় দিল। অপুত্রক রাজার গোপন প্রাণের কোনে বাৎসল্য স্নেহ জেগে উঠল। তাকে আদর করে পোষ্য পুত্র করবে বলে নিজের বাড়ীতে ঠাঁই দিল। রাজার দ্বিতীয় পক্ষের রাণী ছিল সাক্ষাৎ পিশাচিনী। রাজার ঐশ্বর্য্য, পতির বুকভরা আদর উপেক্ষা করে সে গোপনে সহর কোটালের প্রতি অনুরক্তা। একদিন হঠাৎ বণিক পুত্রের তাদের দুজনকে এক সঙ্গে বসে' থাকতে দেখে; হঠাৎ মনে হ'ল রাজাকে বলি আবার মনে হ'ল "দেখ্‌বে শুনবে বল্‌বে নাকো কায়" কাজেই সব কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল এবং প্রথম জীবনের শিক্ষা অনুসারে শত দোষ থাকা স্বত্বেও ছোট রাণীকে মায়ের মত ভক্তি করতে লাগলে। এদিকে রাণীর অপরাধী মন সর্ব্বদাই সন্দেহ করতে লাগল, কখন বা সে রাজাকে বলে দেয়; তা'হলেই সর্ব্বনাশ। তাই রাণী শুধু তাকে এ পৃথিবী থেকে সরাবার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে লাগলেন। হায় নারী চরিত্র! রাজাকে অনেক হাসি কান্না মান অভিমানের ছলা কলা দেখিয়ে রাণী বেশ বুঝিয়ে দিলেন বণিক পুত্র অত্যন্ত অসচ্চরিত্র এবং এমন কি তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করতেও প্রস্তুত; অতএব তাকে ধ্বংস করতেই হবে। রাণী বল্‌লেন দূরে একটা পুকুর আছে সেখানে রাত্রে গেলেই ব্রহ্মদৈত্য ঘাড় মুড়ে দেয়, নিশা রাত্রে সেখানে থেকে জল এনে খেলে তোমার রোগ সারবে বলে বণিক পুত্রকে সেখানে পাঠিয়ে দাও। রাজা দেখলেন যুক্তিটা বেশ সোজা আর সুন্দর; তখনই বণিক পুত্রকে ডেকে তাঁর অসুস্থতা ও ঔষধের কথা বলে দিলেন। সানন্দে বণিক পুত্র সম্মতি দিয়ে নিশা রাত্রে সেখানে জল আন্‌তে গেলেন। যেয়ে দেখেন এক ব্রহ্মদৈত্য ও এক প্রেতিনীতে খুব ঝগড়া বেধেছে। প্রেতিনী বলছে তোমার সঙ্গে আমার মিলটা বড়ই অসমান ও অশোভন হয়েছে। এমন সময় বণিক পুত্রকে দেখে উভয়েই তাকে মধ্যস্থ মান্‌লে। তখন তার মনে হ'ল "যে যায় রত কইবে তার মত"। বণিক পুত্র শত মুখে মিলনের প্রশংসা করে তাদিগকে স্বর্গের চাঁদ হাতে এনে দিল। তারা খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই? সে বল্‌ল, এক ঘটি জল। তারা বলল, জল নাও আর সাত ছালা মোহর নিয়ে যাও। বণিক পুত্র বল্‌ল, কেমন করে তা নিয়ে যাব। তারা বল্‌ল, আমাদিগকে স্মরণ কল্লেই যখন যেখানে চাইবে সেই খানেই আমরা মোহর পৌঁছে দেব। তাই হবে বলে বণিক পুত্র জল নিয়ে ফিরে এল।

রাণী দেখল তার কৌশল বিফল হ'ল। রাজাকে বল্‌লে বণিক পুত্রকে একখানি চিঠি দিয়ে আমার ভাইএর কাছে পাঠিয়ে দাও এবং কোন নাম না দিয়ে লিখে দাও সে পত্রবাহককে তিনি যেন পত্র পাঠ কেটে ফেলেন আর বণিক পুত্রকে বলে দাও জরুরী পত্রের উত্তর যেন সে শীঘ্র নিয়ে আসে। তখন অনেক বেলা হয়েছে রাজার আদেশে বণিক পুত্র না খেয়ে দেয়ে শুষ্ক মুখে নগরের মধ্য দিয়ে চলেছে। নগরের মধ্যে সহর কোটালের বাস। সে খেয়ে দেয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে আরামে তামাকু সেবন করছিল বণিক পুত্রকে শুষ্ক মুখে হন্ হন্ করে যেতে দেখে সাগ্রহে কারণ জিজ্ঞাসা করে সব শুনলে। তার কষ্ট দেখে সহর কোটালের দয়া হ'ল; বণিক পুত্রকে বল্‌লে অনেক বেলা হয়েছে আমার আহার্য্য প্রস্তুত আছে তুমি আহার কর আমি তোমার পত্রের উত্তর এনে দিচ্ছি। বণিক পুত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে একবার ইতস্ততঃ করল্ পরক্ষণেই মনে হ'ল, "যাচা অন্ন ছাড়তে নেই।" তখন ভাবলে ক্ষতি কি, উত্তর পেলেই হ'ল, কাজেই সহর কোটালকে পত্রখানি দিয়ে আহারে মনোনিবেশ করলে। দিনের আলো ক্রমে নিবে এল তবুও সহর কোটালের দেখা নাই। বণিক পুত্র উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, ভাবলে বুঝিবা সে পত্রের উত্তর নিয়ে একবারে রাজবাড়ীতে ফিরে গেছে। সেও রাজ

বাড়ীতে ফিরে এল। রাণী তাকে সশরীরে ফিরে আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে পত্রের উত্তর চাইলে তারপর যা বিবরণ শুন্‌ল তাতে গোপন প্রাণের মর্ম্মন্তুদ যাতনা অতি-কষ্টে চেপে শয়ন কক্ষে গিয়ে গোপনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। এতেও তার শিক্ষা হ'ল না। প্রতি-হিংসা দশগুণ জলে উঠ্‌ল। যেমন করে' হোক্ বণিক পুত্রকে বিনাশ করতেই হবে। আবার নূতন মায়াজাল বিস্তার করবার জন্য রাজার কাছে গেলেন। অন্দরের মধ্যে একটি পুরাতন কূপ আছে সেটি প্রাণঘাতী কণ্টকে পূর্ণ করে' বণিক পুত্রের অগোচরে রাজবাড়ীর সকলকে কড়া হুকুম দেওয়া হ'ল প্রত্যুষে যে সেই কূপের নিকট প্রথমে যাবে তাকেই কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবে, এমন্‌কি রাজা কি রাণী পর্য্যন্ত যদি যায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। রাজ্যের কোন বিশেষ মঙ্গল উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে এইটাই সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। এদিকে পূর্ব্ব রাত্রে বণিক পুত্রকে ডেকে রাজা শুষ্ক মুখে বল্‌লেন তাঁর কালব্যাধি কোন মতেই উপশম হচ্ছে না, অন্দরের কূপ হ'তে অতি প্রত্যুষে এক ঘটি জল তাকে নিজে হাতে তুলে এনে পান করাতে হবে। বণিক পুত্র তৎক্ষণাৎ তার সম্মতি জানিয়ে শয়ন কক্ষে চলে গেল। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙ্গে দেখে অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি উঠে জল তুল্‌তে যাবে এমন সময় ভয়ানক শৌচের বেগ হ'ল। সম্বরণ কর্‌তে না পেরে ভাবলে আগে শৌচ কার্য্য সেরে পরে শুদ্ধ হয়ে জল আন্‌তে যাবো বণিক পুত্র তদনু-সারে শৌচাগারে চলে গেল। রাণীর সারা রাত্রি বুকের ভেতর আগুন জলেছে, চোখের পলক ও বুঝি পড়েনি, নিদ্রা ত দূরের কথা। প্রভাতের আলো দেখা দিতেই তিনি কেবল ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে লাগ্‌লেন; কেবল অপেক্ষা করছেন কতক্ষণে বণিক পুত্র জল আন্‌তে যাবে। একবার, দুবার দেখলেন বণিক পুত্র অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে আবার ফিরে এসে রুদ্ধ নিশ্বাসে খানিকক্ষণ বসে রইলেন আবার প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়লেন। এবার দেখলেন বণিক পুত্র শয্যা ত্যাগ করে গেছে, ছুটে গিয়ে দূর থেকে দেখলেন কূপের কাছেও নেই। সব মহল গুলো তাড়াতাড়ি ঘুরে যখন কোথাও তার সন্ধান মিল্‌ল না তখন নিশ্চয় তার বিনাশ হয়েছে কল্পনা করে পৈশাচিক আনন্দে প্রাণটা নেচে উঠ্‌ল। ছুটে গিয়ে একবার নয়ন ভরে' সে দৃশ্য দেখবার লোভ সম্বরণ করা সুকঠিন হয়ে পড়ল। কূপের নিকট আনত হয়ে দেখতে যেতেই পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে সেখানে যে ছিল সে কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল। বণিক পুত্র ইতিমধ্যে জল তুলতে এসে দেখেন হায় হায়! একি দৃশ্য রাণী কূপের মধ্য হইতে যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করছেন আর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকাঘাতে রুধির ধারায় কূপের জল রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বণিক পুত্র উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠ্‌ল। তখন সকলেই ছুটে এসে তাঁকে তুলে ফেল্‌লে। রাজাও পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে। রাণীর তখন মুমূর্ষু অবস্থা মৃত্যুর করাল ছায়া তখন তার সব দর্প, অহঙ্কার, প্রতিহিংসা শান্ত করে দিয়েছে। গভীর অনুশোচনায় তার বুক ফেটে যেতে লাগল। রাজাকে কাছে ডেকে আনু-পূর্ব্বিক তার সমস্ত পাপের কথা খুলে বলে, রাজার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়ে বণিক পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে অনন্তের কোলে চলে পড়ল। বণিক পুত্রের চরিত্র গুণে মুগ্ধ হ'য়ে রাজা তাকে যৌবরাজ্য দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করার মনস্থ করলেন। ভাল করে পরিচয় নিয়ে জানলেন তার বাপ মা ভাই সকলেই আছে। অমনি তাদিগকে সসম্মানে আনবার জন্য লোক পাঠান হ'ল।

আজ নগর জুড়ে উৎসবের আনন্দ কোলাহল। বণিক পুত্র আজ সাত মাণিক উপহার দিয়ে জনক জননীর চরণ বন্দনা করল। মা ছেলেকে কোলে করে সিংহাসন আলো করে বসলেন। সাগর কূলেরকুটীর বাসিনী মায়ের কথাও আজ সে ভোলেনি। দুখিনী দূর থেকে ভুবনমোহন রূপ দেখতে লাগল আর তার দু চোখ বেয়ে পুলকাশ্রু শ্রাবণের ধারায় মত বয়ে পড়তে লাগল।

ঠাকুর দাদা।

কলাবিদ্যা।

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন করায় যে ভাষা, নিশ্চল নির্ব্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে? ভাষার তপস্যায় বলীয়ান মানুষ পাথরের কারাগার থেকে বার করে' নিয়ে এল যে ভাষাকে চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী—তারই চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল—কথা, ছবি, মূর্ত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, ইত্যাদি কলাবিদ্যা।

বঙ্গবাণী—শ্রাবণ ১৩২২। শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কৃষকের উন্নতি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি এ দেশ কৃষি প্রধান দেশ, সুতরাং শিল্প অপেক্ষা কৃষির কথাই এ দেশে অধিক প্রয়োজনীয়। কৃষকের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে মহাত্মাজীর উপদেশ মত অবসর কালে চরকা ধরিতে হইবে। চরকা ভিন্ন তাহাদের অভাবের হাত হইতে আশু মুক্তির অন্য উপায় নাই; তাহারা বৎসরে সব কয়মাস চাষ করে না। যে কয়মাস বসিয়া থাকে সে কয়মাস তুলা উৎপন্ন করিতে ও চরকা কাটিতে অনায়াসে পারে। তাহার পর তাহাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ঋণমুক্ত হওয়া। সকল দেশেই কৃষক ঋণ লইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের মত কোথাও এমন ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন নাই, অপরিণামদর্শী কৃষকও নাই। এ দেশের কৃষক দুই পয়সা অধিক রোজগার করিলে কারিগরের মত দুইদিন ঘরে বসিয়া থাকে, কাজে বাহির হয় না, অথবা ভাল মাছ ও ভাল বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করে। এমন দেখা গিয়াছে কৃষক দিনে ১৲ এক টাকা রোজগার করিয়া ৸০ আনার মাছ কিনিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, অথচ ঘরে মাছ ভাজিবার তেল নাই। এই অপরিণামদর্শিতা দূর করিতে হইবে। ইহা একদিনে যাইবার নহে, অভ্যাস করিতে হইবে। অপরিণামদর্শিতার ফলে কৃষক সঞ্চয়ী হয় না বলিয়া বাজারে তাহার credit থাকে না, তাই দুর্দ্দিনে কর্জ্জসংগ্রহ করিতে হইলে তাহাকে অত্যধিক হারে সুদ দিয়া মহাজনের নিকট ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। মহাজন একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যে হারে যত বেশী টাকা ধার দিবে, কৃষককে তাহাতে কখনও দিবে না। এরূপ মহাজনের ঋণে কৃষকের হাল হেলে—এমন কি ঘরের ঘটি বাটীও বেচিতে হয়। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে পরিণামদর্শী হইতে হইবে, চরকা চালাইতে হইবে এবং সমবায় প্রথার সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে Co-operative Credit Society কৃষকের উপকার সাধন করিতেছে। কৃষকেরা একটু বুঝিতে শিখিলে আপনারাই এই ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকের সাহায্যে ও পরামর্শে যৌথব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারে। মহাজনের সুদের হার শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ। আবার বিশেষ স্থলে শতকরা ১২৫৲ ১৫০৲ ২০০৲ টাকা সুদও দেখিতে পাওয়া যায়। কো অপারেটিভ ক্রেডিট প্রথায় এই অত্যাচার নিবারিত হইতেছে, কৃষকরা যদি নিজে সমবায় প্রথা প্রবর্ত্তন করে তাহা হইলে কালে নিশ্চয়ই উহা শুভফলপ্রসূ হইবে।

বসুমতী শ্রাবণ ১৩২৯। শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু।

সুসন্তান লাভের উপায়।

গর্ভস্থ সন্তান ও মাতার মধ্যে একমাত্র শোণিত সঞ্চালন দ্বারাই সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার ভাবী জীবনের আচার ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে গর্ভাবস্থায় জননীর সচ্চিন্তা ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানের পররর্ত্তী সর্ব্ব প্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য— আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ ঐ সময় তিনি যে যে দ্রব্য আহার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজ শরীরের ন্যায় সন্তানের শরীরেও শোণিতে পরিণত হইবে। ঐ শোণিতেই সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে।

শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক। মাতা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্ব্বি, চা, কাফি. নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে তাহার পবিত্র সুন্দর প্রিয়দর্শন সন্তান উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই মঙ্গলজনক নহে।

সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে সন্তান উৎপাদনের ও স্তন্যদানের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধানে থাকা আবশ্যক।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর। একাল পর্য্যন্ত মাতার সংযমে থাকা একান্ত আবশ্যক।

সহবাসের সময় পিতামাতার মনের ভাব যেরূপ থাকিবে, সন্তানের মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। মাতার মনে বিশেষ কোন ধারণা হইলে সন্তান তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা জন্মিলে যদি কোন ইন্দ্রিয়সংস্রব নাও থাকে তথাপি ঐ ধারণাবশতঃ তাহার সন্তান ঐ পর-পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে। মাতার সর্ব্বপ্রকার মানসিক অবস্থা বা ধরণা সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বদা মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করে সেই স্ত্রী বোবা এবং স্থূল সন্তান প্রসব করে। যে স্ত্রী সর্ব্বদা অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রী নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও চক্ষু-রোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে। সর্ব্বদা লবণ রস ভক্ষণ করিলে সন্তানের অল্প বয়সেই চর্ম্মের লোলতা কেশের পক্কতা অথবা টাক পড়া রোগ হইয়া থাকে। যে স্ত্রী সর্ব্বদা ঝাল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রীর অতি দুর্ব্বল অল্প-শুক্র বা অনপত্য (যাহার সন্তানোৎপাদন শক্তি নাই) ও বিবিধ চর্ম্মরোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে। সর্ব্বদা তিক্তরস ভক্ষণ করিলে সন্তান দুর্ব্বল ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়। কষায় রস ভক্ষণ করিলে সন্তান নানাবিধ রোগগ্রস্ত হয়।

যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা পুরুষ সংসর্গ করে তাহার সন্তান, কাণা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ অথবা স্ত্রৈণ হইবে।

যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা মদ্যপান করে সেই স্ত্রীর সন্তান অস্থিরচিত্ত হয়।

সর্ব্বদা মাংসপ্রিয়া গর্ভিনী যে সন্তান প্রসব করে সেই সন্তান ধীরে ধীরে চক্ষুর নিমেষ ফেলে ও তাহার চক্ষুর পীড়া হয়।

গর্ভিনী সর্ব্বদা শোকপরায়ণা হইলে তাহার সন্তান ভীত, ক্ষীণ বা অল্পায়ু হইবে। গর্ভিনী চৌর্য্যশীলা হইলে সন্তান অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদা কলহ ও মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্রোধশীলা হইলে সন্তান সর্ব্বদা ক্রোধশীল ও কপটাচার হয়। যে স্ত্রী সর্ব্বদা নিদ্রা পরতন্ত্র হয় সেই স্ত্রী মূর্খ তন্দ্রালু সন্তান প্রসব করে। যে গর্ভিনী সর্ব্বদা বাক্যের দ্বারা শরীর সঞ্চালন দ্বারা ঝগড়া করে, সেই স্ত্রীর অপস্মার (হিষ্টিরিয়া) রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে। যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা পরদ্রব্যের অভি-লাষ করে, সেই স্ত্রীর পরের পীড়াদায়ক অত্যন্ত ঈর্ষ্যাবান অথবা স্ত্রৈণ সন্তান হয়। গর্ভিনী হস্ত পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ বিস্তার করিলে উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে।

গর্ভবতী রমণী নিয়মিতভাবে স্নান ও গাত্র ধৌত করিবে এবং মানসিক সমস্ত প্রবৃত্তি সংযত রাখিতে বিশেষ যত্ন করিবে। কোন রিপুকেই প্রশ্রয় দিবে না। সুস্থ ও পবিত্র মনে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে এবং আশা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কাল হরণ করিবে।

ডাঃ শ্রীকামাখ্যা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বাস্থ্য-সমাচার, বৈশাখ ১৩২৯।

জীবনের তিন বন্ধু। *

ধর্ম্ম, গুণ ও যশ তিনটী মানব জীবনের উপাস্য ও লভ্য। কোন ইংরাজ কবি এই তিনটীকে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও গুণ দুই প্রবীর বন্ধু। যশ তাঁহাদিগের চির বন্ধু—অত্যাগ সহন। যশের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও তিনি গুণ ও ধর্ম্মের অভেদ্য অনুচর বা সহচর। বিদ্যা, বিত্ত, শিল্প প্রভৃতির জ্ঞান বা মানবের পুরুষার্থ ইহাদিগকে ছাড়িয়া লাভ হয় না; ঘরে বসিয়াও হওয়া কঠিন। মনের মত বস্তু সন্ধান বা সংগ্রহ করিতে এই তিন বন্ধু পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণে বাহির হইলেন। 'ধর্ম্ম'—প্রবীর, মুরুব্বি হইয়া আর দুই জনকে সঙ্গে লইলেন। গুণ ও যশ অনুগামী হইলেন। পথে গুণের মনে পড়িল যদি বিদেশে 'বিভূমে' আমাদের একান্তই ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়—হইবার কথাও বটে—তবে কে কোথায় থাকিব, তাহা ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। তিনি অপর দুই বন্ধুকে সেই কথা বলিলেন। তবে নিজের কথাও পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলেন—

"সঙ্গ ছাড়া হই যদি আমি,
আমার নিজের কথা বলে রাখি ভাই—
যে দেশের কৃষীবল শিল্পে দিবে মন
পূজিবে বাণীর বীণা যাব সেই দেশে।"

ধর্ম্মও কি কয়েন—নিজের কথা বলিলেন :—

"শুন, বন্ধু, নিত্য সরলতা
কিম্বা বদান্যতা যথা ধনিজন ঘরে;
রাজার সদস্যগণ যথা দোষ হীন
"যাইব তথায় আমি; কিম্বা শুন ভাই
"কায়মনোবাক্যে নিত্য স্বার্থহীন ভাবে
সাধারণ হিতে মন দিবে যেই জন;
কিম্বা ঋষি, মহা-ঋষি, জ্ঞানিজন যথা
"তথায়(ই) যাইব আমি, ভাবিয়াছি মনে।
"থাকুক সুরম্য সৌধে বৃথা আড়ম্বর;
নির্জ্জন কুটীরে আমি করিব বসতি
"ধন লোভ কিম্বা গর্ব্ব হতে বহু দূরে
"সুখ শান্তি যেই খানে নিয়ত বিরাজে।

দুই জনের কথা শেষ হইল। ধর্ম্ম ও গুণ যথাযথ নিজেদের মিলন স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। যশ বড়ই ফাঁপড়ে পড়িলেন—তিনি জানেন সংসারে তাঁহার অবস্থান বড় সহজ নহে—সুবিধারও নহে। বিশেষতঃ বন্ধুহীন হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত ও থাকিতে পারেন না; কি আর বলিবেন, বলিলেন :—

তোমরা থাকিবে সত্য, প্রিয় বন্ধুগণ
কিন্তু কে * * পাইবে সন্ধান
চঞ্চল আমার? তাই রেখো চোখে চোখে,
বারেক হারালে আর পাবে না আমায়!

তাই বলিতেছিলাম, এই তিনটী উপাস্যবস্তুই মানব জীবনের জীবনী শক্তির মূল, উপাস্য ও লভ্য। আর্য্যকবিও বোধ হয় তাই—প্রাচীনকালে গাহিয়াছিলেন—

স জীবতি গুণাঃ যস্য যস্য ধর্ম্মঃ স জীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্॥ •

---

*Cunningham on "Reputation" হইতে সঙ্কলিত।

• চাণক্যনীতি দর্পণ—(নেপালী পুস্তক) পণ্ডিত রাম নারায়ণ শর্ম্মা। বারাণসী। ১৯১২ খৃঃ অব্দ।

অর্থাৎ ধার্ম্মিক ও গুণবানেরাই অমর—তাহা না হইলে মানুষের জীবন বৃথা। চলাচল মিদং সর্ব্বং—মানবের সকলই এমনকি জীবন পর্য্যন্ত চঞ্চল; কেবল মাত্র "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি॥"

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)
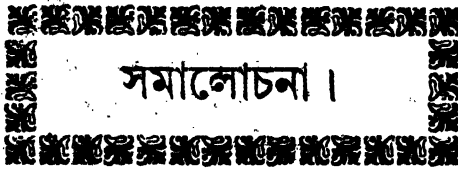
সমালোচনা।

সন্তবাণী—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা; এই পুস্তিকাখানিতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কয়েকটী সাধু মহাত্মার কতিপয় বচন প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাবলীর সঙ্কলয়িতা প্রবীন সাহিত্যসেবী শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ এবং প্রকাশক সুকবি শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল মেদিনীপুর। সংগৃহীত বচনগুলি অতি উপাদেয়, সরল, ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বলিয়া আবালবৃদ্ধ বনিতার উপযোগী হইয়াছে। ভক্ত ও সাধক মাত্রেই এই পুস্তিকাখানি পাঠে বিশেষ তৃপ্ত ও উপকৃত হইবেন। মূল্য যৎসামান্য; ছয় পয়সা মাত্র।

"ভক্ত বন্ধু মহাত্মি"—রচয়িতা শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল। মেদিনীপুর কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় পয়সা মাত্র।

বাঙ্গলা বৈষ্ণবসাহিত্যে "ভক্ত মাল" গ্রন্থের ন্যায় উৎকল সাহিত্যে "দাঢ্য ভক্তিরসামৃত" নামে একখানি উপাদেয় ভক্ত-জীবনী-সংগ্রহ আছে। ভক্তপ্রবর প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ খানি হইতে কতকগুলি ভক্তের চরিত্র বাঙ্গলা ভাষায় "ভক্তের জয়" গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তিকা খানি সেই "ভক্তের জয়" গ্রন্থের একটী চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। পুস্তিকাখানির বিশেষত্ব এই যে "ভক্তের জয়"এর ন্যায় ইহা শ্রেণী-বিশেষের পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত না হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিমিত্ত সরল মধুর ও কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল আখ্যায়িকাটীর কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া—চরিত্রটীর সম্পূর্ণ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া লেখক নিপুণ তুলিকাস্পর্শে ভক্তটীকে মনোজ্ঞভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে পাঠ করিতে করিতে অশ্রু সম্বরণ দুরূহ হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা সাহিত্যে "কথিকা"র ভাষায়এই শ্রেণীর ভক্ত জীবনী প্রচার এই প্রথম। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

সত্যানন্দ।

নিবেদন।

(লেখক—শ্রীনলিনী নাথ দে)

দাও যদি মোরে তুমি ওগো মহেশ্বর!
অভিশপ্ত বিধবা জীবন;
মায়ের মতন করি গড়িও অন্তর,
মুছাইব পরের বেদন।

আমারে দলিবে যদি হে মনোমোহন
ব্যর্থময় কঠিন পেষণে;
চন্দন করিয়া মোরে করিও সৃজন,
চূর্ণ হয়ে নন্দিব ভুবনে।

মৃত্যু যদি দিবে মোরে হে নিখিল প্রিয়
তিলে তিলে সুতীব্র জ্বালায়;
ধূপ জন্ম দিয়া তবে আমারে রচিয়ো,
দিব প্রাণ তোমার পূজায়।

মেদিনীপুর মতি প্রেস হইতে শ্রীফকির দাস চন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর শাখা হইতে শ্রীফকির দাস চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩২৯ ২য় সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। „ প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। „ অমৃতলাল বসু।
৬। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। „ রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। „ মৃণালকান্তি ঘোষ।
১৩। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। „ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৫। „ অলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
১৬। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। „ হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম।
১৮। „ কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। „ যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। „ হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। „ মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। „ মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। „ নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার কান্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ, এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী।
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
২৯। রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৩০। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।
৩১। শ্রীপবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। (ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৷৶০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০ আনা। নমুনার জন্য ।৶০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোণীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোণীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপঃ—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তণ করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মাধবী

শিল্পী-শ্রীমানববন্ধু কানুনগো] কর্ণগড়—মহামায়ার মন্দির [মেদিনীপুর-আর্টডেন

Bharatvarsha Ptg. Works.

১ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২৯। | ২য় সংখ্যা।

পন্থা।

ভয় নাই রে পথিক !
আগে দেখাইয়া চলে দশদিক,
চড়িয়া মানস রথে,
ধেয়ে চল্ অলক্ষ্যের পথে,
নীলকান্ত বেদিকায় নীল আস্তরণ,
করিয়া স্থাপন,
দাঁড়াইয়া রয়েছে মরণ ;
হ'য়ে অগ্রসর,
ভয় নাই শুষ্ক পত্র করিছে মর্ম্মর।
অচল অটল অন্ধকার,
বিশাল উরস তার করিয়া বিস্তার,
দাঁড়াইয়া আছে আজি মূর্চ্ছিত মানসে তোর করিবারে চেতনা সঞ্চার,
ছুটে চল মুছে যাবে সব হাহাকার।

ভয় নাই ভয় নাই রে পথিক !
আঁধারের বুক চিরি উঠিয়াছে কোলাহল তীব্র মর্ম্মান্তিক,
তুই কেন ম্রিয়মান ?
মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে হিয়ার তোরেই সে করিছে আহ্বান।
অশান্ত বাসনা যত,
চল নিয়ে গুটাইয়া পাথেয়ের মত।
শ্রান্ত ক্লান্ত দু'চরণ ?
বুকে হেঁটে চল তবে অরণ্যানী করিতে লঙ্ঘন।
ঘিরে আসে দাবানল ?

ভস্ম করে' দেবে? তাই এত সন্তর্পণ? তাই এত আকুল বিহ্বল?
ওই যে রে মরণের অশ্রুকণা, ওই যে রে রিক্তের সম্বল!
ওই খানে বেজে উঠে তার ঘোষণার বিশাল ডিণ্ডিম,
ওই খানে ছেয়ে আছে তার স্নেহধারা, অফুরন্ত, অনন্ত, নিঃসীম।

ভয় নাই ভয় নাই কিছু. ধেয়ে চল্ রে পথিক!
পর্ গলে হাড় মালা, সাধিতে মরণ ব্রত হ'রে কাপালিক,
স্নেহ মায়া দেরে বিসর্জ্জন;
বিরাট আঁধারে সুপ্ত মৃত্যু দেবতার কর্ উদ্বোধন।
ভুলে যা রে কাল দেশ,
চেতন জড়ের আজ একত্রেতে কর্ সমাবেশ,
নিত্য সত্য কর আবিষ্কার,
কৃত্রিম পদ্ধতি যত পিছু ফেলে হ'রে আগুসার,
কান পেতে শোন্ দেখি মৃদু মৃদু কেন ওঠে বীণার ঝঙ্কার!
সে যে তোরি অভ্যর্থনা,
ভুলে যারে অপবাদ লোকের গঞ্জনা।

ভয় নাই ভয় নাই বৃথা কেন চিন্তা মনে মনে রে পথিক!
তুইও কি সাধনার পথে হবি আজ গতানুগতিক!
চেয়ে দেখ আঁধারের বিরাট সভায়,
জ্বলে দীপ মণি বেদিকায়,
ধেয়ে চল্ পাবি হোথা মৃত্যুর সন্ধান,
ওই খানে হবে তোর জীবনের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ।
নাই হোথা বন্ধনের ভয়,
নাই অপচয়,
নাই হোথা অসত্যের জয়,
নাই হোথা বাদ বিসংবাদ,
আছে সত্য শিব ও সুন্দর, আছে শুধু অমৃতের মধুর আস্বাদ।
ভয় নাই চল্ ধেয়ে রে পথিক!
আজ যদি পিছু যাস্ ধিক্ তোরে ধিক্ শত ধিক্।

শ্রীভুবন চন্দ্র আর্য্যশিরোমণি।

কাব্য ও দর্শন।

কাব্য ও দর্শন এই দুইটী বিষয় এমন ভিন্ন প্রকারের এবং একে অন্যের সহিত এমন সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিপরীতপথাবলম্বী যে আমার এই অদ্ভুত নামকরণেই হয় ত আমার এই প্রবন্ধ পড়বার মত ধৈর্য্য অনেক পাঠকেরই থাক্‌বে না। তারপর আবার আমার কাণ্ডজ্ঞান এত কম, যে আমার মনের ভাবগুলির প্রকাশ-ভঙ্গিমার রকমে আমি কি বল্‌তে চাই—তা কাউকে হয় ত বলা হবে না।

আবার আমি যদি বলি যে এই দুইটী জিনিষ মানুষের একই মনোবৃত্তি হ'তে উদ্ভূত, তাহ'লে হয় ত আপনারা হেসে গড়িয়ে পড়বেন অথবা কবির দলের সর্দ্দার মহাশয় আমাকে থেমে যেতে বলবেন, অর্থাৎ কি না He will rule me out of order; অথবা লগুড় হস্তে তাড়া করবেন—কেন না মূর্খস্য লাঠৌষধি। এত সব ভাবনা সত্ত্বেও আমি কিন্তু কি যেন একটা মনের মিল এদের মধ্যে চিরদিনই পেয়ে আস্‌ছি, সেইটিই আপনাদের কাছে বল্‌তে চাই। আমার অবশ্য ভুল হওয়া সম্ভব তাই বলে আপনারা কি বুঝিয়ে দিবেন না? আমি কোথায় যে একটু মিল পাচ্ছি, আমি ঠিক তা উপলব্ধি কর্‌তে পাচ্ছি না। তাই আপনাদের কাছে আমি হয় ত আমার মনের ভাব ঠিক প্রকাশ কর্‌তে পারব না।

আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্যবোধই মানুষকে কবি ও দার্শনিক করে। সুতরাং উভয়টি এক সৌন্দর্য্যবোধ হতে জন্ম গ্রহণ করে ও যুগে যুগে এই একই প্রাণের ভাব নিয়ে এত নানা ভাবের কবি ও নানা মতের দার্শনিক পৃথিবীতে এসেছেন ও আস্‌বেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ সকল দেশে এক রকম নয়, সব মানুষের মধ্যে একই ভাব খেলে না—তাই কাব্য এত সরল ও দর্শন এত নীরস ও ভিন্ন প্রকারের।

প্রথম হয় ত মনে হতে পারে এ সৌন্দর্য্য কোথায়? সুন্দর পদার্থটিই সুন্দর, না আমার মন সুন্দর বলে তাই সে সুন্দর। একবার মনে হয় জিনিষটাই সুন্দর। প্রস্ফুটিত গোলাপ সুন্দর, পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, প্রভাতের অরুণিমা সুন্দর, প্রাবৃটের ঘনকৃষ্ণমেঘমালা সুন্দর, গিরিশৃঙ্গের সবুজ শিখরদেশ সুন্দর, লবণাম্বুরাশির উত্তাল তরঙ্গমালা সুন্দর। আমি তাদের সুন্দর করতে পারি না তারাই সুন্দর, শুধু আমার মনের উপর তাদের সৌন্দর্য্যের ছাপ পড়ে যায়। মনটা যেন একটা Tabula rasa অর্থাৎ Empty tablet, তার উপর শুধু একটা দাগ বসে যায়; তাই আমরা সৌন্দর্য্যবোধ করি ও পরে সৌন্দর্য্যের পূজা করি। কিন্তু তাতেও আবার একটা গোল লেগে গেল। কৈ? সব জিনিষকে ত সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সব লোক সুন্দর বলে না। সৌন্দর্য্যের বিষয়ে অত্যন্ত মতের অনৈক্য দেখতে পাই। আমাদের দেশের কালো চুলে, কালো চোখে যেমন সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে, সোনালি চুলে ও কটা চোখে আবার অন্য দেশের লোককে তেমনি মুগ্ধ করে। আমার একটী বন্ধুর কাছে একবার শুনেছিলাম যে দার্জ্জিলিং পাহাড়টা নাকি মোটেই সুন্দর নয়, একেবারে dry, তিনি তা একেবারেই পচ্ছন্দ না করে' সেখান থেকে চলে এলেন। আবার দেখুন এত সব সুন্দরের কথা উঠ্‌তেই হয় ত যে যার প্রিয়ার ব্রড়ানম্র ভঙ্গিমা ও চোখের কোণেরই চাহনিটুকুই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলে মনে মনে ভাবছেন, তার যতই কেন বাঁকা পা, চেপ্‌টা নাক আর টেরা চোখ না হউক। কোন কবি শরৎকালের পূর্ণিমার চাঁদে বিভোর হয়ে থাকেন আর একজন হয় ত "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" সব চেয়ে সুন্দর দেখেন। তা হলে এখন বড়ই গোলমালের কথা এই হচ্ছে যে কোন্‌টি সুন্দর তাও যদি বোঝা না যায়

তবে আমার আপনার উপায় কি? আমাদের যে ছাই সৌন্দর্য্যবোধই নাই; লোকে যদি বলে এটা সুন্দর তবে তাই মেনে নিতে হবে। তত্ত্বদর্শী কবি নাকি বলেছেন—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা"

"সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর" সুন্দর হোক্ চাই না হোক্ তিনি মনে মনে তাকে সুন্দর বললেন আর আমাদেরও তাই মেনে নিতেই হবে, যে হেতু আমরা অন্ধ।

আবার দেখুন নূতন চিত্রকলাপদ্ধতিতে যে সব চোথা চোথা হাত পা, মাথার পিছন দিক পর্য্যন্ত টানা চোখ আর তার অষ্টবক্র ভঙ্গিমা দেখি, তাদের ভিতরে সৌন্দর্য্য থাকুক চাই না থাকুক, আমাদের তা' সুন্দর বলে মান্‌তেই হবে—যেহেতু বড় বড় সব শিল্পী নাকি তাদের সুন্দর বলেছেন।

এখন এমন বিষয় গোলমালে প্রথমেই ত সৌন্দর্য্য বোধটা কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে। তার পর হতে হবে কবি—আবার তারও পরে দার্শনিক। কাজেই আমার এক একবার মনে হচ্ছে দরকার নাই আর কবির সঙ্গে আর দার্শনিকের সঙ্গে দেখা করে; এখান হতেই রণে ভঙ্গ দেওয়া যাক্। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়, আরম্ভ করে কাপুরুষ হলে চল্‌বে না।

এখন দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্য্য বাহিরেও নয়, ভিতরে ও নয়, দুইটির সংমিশ্রণে। এক কথায় কথাকাটাকাটি বন্ধ রেখে এখানে এই পর্য্যন্ত বললেই হতে পারে বোধ হয় যে, যা ভালো লাগে তাই সুন্দর, সুতরাং এই ভালো লাগায় যদি মতভেদ হয় তবে সৌন্দর্য্যবোধেও অনৈক্য হবে, তার আর উপায় নাই। এই ভাল লাগার ব্যাপারটা সাধারণতঃ আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। নব বধূর কোমল কর পল্লবের প্রথম স্পর্শ সুন্দর, নিঝুম রজনীতে দূরাগত বংশীধ্বনি সুন্দর, অসংখ্য তারকাখচিত সুনীল আকাশ সুন্দর, আবার ঔদরিকের কাছে সুমিষ্ট সুখাদ্য সব চেয়ে সুন্দর। কিন্তু আমার মনে হয় সৌন্দর্য্য জিনিষটি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, আরও একটা গভীর স্তরে যেয়ে আঘাত কচ্ছে; এবং সেইটিই যেন সেখান থেকে জন্ম লাভ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেটা এমন কিছু যা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না— যেন প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন ভাবে সে এসে মনের সাম্‌নে হাজির হচ্ছে।

তাই শ্রীরাধিকা বোঝাতে না পেরে বল্‌ছেন :—

সখিরে কি পুছ্‌সি অনুভব মোয়
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

এখন যেন মনে হচ্ছে যে সৌন্দর্য্য জিনিষটা মনের একটা গভীরতম প্রদেশ হতেই উঠে নানা ভাবে বিকশিত হয়।

কাব্যে আমরা সৌন্দর্য্যবোধে একটা তন্ময়তা দেখ্‌তে পাই। কবি বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ উপাসক। যা' কিছু সুন্দর তাই নিয়ে কবি বিভোর হতে পারেন, যা' কুৎসিৎ তা' তাঁর কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না। যিনি কবি তিনি সুন্দরকে উপলব্ধি কর্‌তে পারেন এবং তারপরে আমাদের মত অর্ব্বাচনের জন্ম তাই আবার প্রকাশ করে বলে যান; তা' নইলে যে আমাদের চলে না। আমরা যে অন্ধ, আমরা যে না বলে দিলে বুঝতে পারব না কোনটা সুন্দর। আবার দেখি অনেক কবি যেন কি বল্‌তে চান, তা' বলে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না; বিভোর হয়ে আছেন কিন্তু সবটা বলা চলে না, তার প্রাণের অনুভূতির একটা ইঙ্গিত মাত্র দিতে পারেন। কিন্তু সেটা এমন একটা হেঁয়ালির মত হয়ে প্রকাশ পায়, যে তাতে করে কবির ঠিক প্রাণের আবেশ বুঝতে ধর্‌তে পারা যায় না; যার যেমন চিন্তার ধারা সে সেই রকম বুঝে নেয়। অনেক সময় হয় ত কবি ছাড়া আর কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। তাই কবি দুঃখে গেয়েছেন—

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী! ইত্যাদি
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?

প্রকাশ করে বলতে পারুক চাই না পারুক, মানুষ কিন্তু জন্ম থেকেই স্বভাবকবি। যা কিছু সুন্দর যা কিছু মনোমোহন তাতেই শিশুকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করে। সুন্দরকে সেও দেখ্‌তে ভাব্‌তে বুঝ্‌তে চায়, কিন্তু পারে না। তাই শুধু দেখেই তার তৃপ্তি। তার পরে ক্রমে এটি সুন্দর ওটি কুৎসিৎ এই সব প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ করে। তার পর এই উপলব্ধি ক্রমশঃ কাব্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুন্দর ছাড়া আর কিছু আমরা কাব্যে পাই না, চাই ও না বোধ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যাদের সুন্দর বলে প্রথম দিন থেকে বুঝ্‌তে শেখে যেমন ফুল, চাঁদ, মলয়, কোকিলের কুহুরব, তাদের নিয়েই কাব্যের আরম্ভ, পরে প্রাণের যাহা সুন্দর, মানুষের আত্মার যাহা মধুর, চিন্তার যাহা মনোরম, তাই দিয়ে কবি নিজে অনুপ্রাণিত হয় ও মনুষ্যজাতি ও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রেরণা দিয়ে আসে। তাই প্রেম সুন্দর, সেই প্রেমের ভিতর কবির গানে স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, পরে ভগবৎপ্রেম জাগিয়ে তোলে।

অন্য দেশের কবির খবর আমি বড় একটা জানি না; আমাদের বাংলার কবিদের সঙ্গেও আমার বড় একটা পরিচয় নাই। তথাপি আমার মনে হয় সব সুন্দরের ভিতর দিয়ে চিরসুন্দরকে চাওয়া ও পাওয়াই আমাদের দেশের যেন চিরকালের নিয়ম। অবশ্য চিন্তার ধারা ধাপে ধাপে উঠ্‌তে থাকে ও একেবারে লাফিয়ে উঠেই সেই চিন্ময় সত্য শিব সুন্দরের কল্পনা কর্‌তে পারে না। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অনেক কবির মধ্যে দেখ্‌তে পাই ও সেইটিই যেন কাব্যের চরম উৎকর্ষ, এইটে মনে হয়।

বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস যে প্রেমের গান গেয়েছেন তাতে কি শুধুই একটা কামজ মোহকেই বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, না এর ভিতরে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণ রাধিকার এই প্রেম যদি সেই ভাবেই দেখতে হয় তবে অবশ্য সৌন্দর্য্যের অনেক ব্যাখ্যা পেতে পারি, কিন্তু বৈষ্ণবগণ যেন তাহার মধ্যে আরও কিছু দেখতে পান। তাঁরা যা চান তা আরও কিছু গভীর, আরও মনোজ্ঞ; কিন্তু সেইটিই হয় ত কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সৌন্দর্য্যের এমন সরস ও সরল চিত্র বড় বেশী দেখি নাই। যথা প্রথম যৌবনের চিত্রে বিদ্যাপতি গেয়েছেন :—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
কর দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

চণ্ডীদাস রাধিকার রূপ বর্ণনায় গেয়েছেন :—

দেখিয়া তোক রূপসী
গোর শরীর মৃগী সব ভুরি আখী।
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ বিজুলী
বদন সংপুণ চান্দ সব তোর দেখি॥
কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজ মুকুতার হারে
যেন শোভা করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাতা আও নাহি সরে॥

প্রেমের চিত্রগুলিও অত্যন্ত মধুর ও প্রাণস্পর্শী; তাহা নূতন করে বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন। যথা :—

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়॥
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥ বিদ্যাপতি।

উদাহরণ দিয়ে আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি কর্‌তে চাই না। প্রত্যেক গান এমনি সুন্দর, এমনি মধুর। এই সব অতি সাধারণ গানের চেয়ে আরও অনেক অনেক গভীর ভাবমূলক কবিতা আমরা বৈষ্ণব কবিদের কাছে পেয়েছি। যদি এদের ভিতরেও কবিদের প্রাণের একটা ভগবৎপ্রেমের আদর্শ দেখতে পাই অথবা বৈষ্ণবগণ দেখতে পান, তবে তাদের সমস্ত গানে একটা মহৎ আদর্শের ছবি তাঁরা দেখতে পাবেন তাতে সন্দেহ নাই

কিন্তু আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যা তাতে এসব ব্যাখ্যা করে তেমন কিছু লাভ দেখতে পাই না; আর এমন হয় ত অনেকে আছেন যারা এগুলির মধ্যে খালি অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবেন না। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন যে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে অশ্লীলতা কিছুই নাই, কামের কোন স্পর্শ নাই, এটা একেবারে নিখুঁত ভগবৎপ্রেম। অবশ্য এমন একটা মত বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি বৈষ্ণব কবিগণ এই মত নিয়েই লিখে থাকেন তবে দেখা যাচ্ছে এই সব কাব্য ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভক্তগণ বলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা, রাজা, সারথি, উপদেষ্টা নানারূপে পৃথিবীর পাপী তাপীদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে তারা অন্ধ, কেউ তাকে চিন্‌তে পার্‌লে না। তাই তিনি সুন্দর মোহন রূপ ধরে ও বাঁশীর গানে জগৎবাসীকে মুগ্ধ করে নিজের কাছে টেনে নিলেন। কবিগণ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যেন সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাওয়ার বুঝবার এবং পাওয়াবার ও বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ছেন। এই মতের সঙ্গে সকলেই একমত হবেন তা আমি আশা করি না; কিন্তু যদি বাস্তবিকই এই উদ্দেশ্য নিয়ে বৈষ্ণব কবিগণ গেয়ে থাকেন তবে তাঁদের কাব্যে আর দর্শনে কোন প্রভেদ ত দেখতে পাই না। দার্শনিক ত এই জিনিষটিকেই ভাল করে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করে।

দুটি একটা আধুনিক কবির আলোচনা করে দেখতে চাই যে তাদের কাব্যেও এই ভাবের পরিচয় পাই কি না, তারা সুন্দরের ভিতর দিয়ে চিরসুন্দরকে উপলব্ধি কর্‌তে চান কি না।

১। প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে ;

এই খানে কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ সকল সৌন্দর্য্যে ভগবানের সত্তা দেখতে পাচ্ছেন ও দেখাতে চাচ্ছেন।

২। তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস নির্ম্মল উজ্জল কান্ত
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
এস এসহে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখ সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে ;
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।

সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে, নব নব রূপের ভিতর দিয়ে, কবি যা পেতে চান দার্শনিকও তাই চায়। এর মধ্যে এতটুকু প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু চাওয়ার ভঙ্গীতে, বলবার রকমারিতে।

৩। আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ ভাঙ্গা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে:

আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।

কবির প্রাণ বর্ষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে এই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এখানেও কবি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

৪। এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয় হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোণার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ' পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই ত তোমার প্রেম ওগো
হৃদয় হরণ!

প্রভাত আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে;
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ।

প্রত্যেক সুন্দর জিনিষটি দেখে মন সেই শিব সুন্দরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, আর তাঁর হৃদয় তাঁর চরণ ছুঁয়েছে। ইহাই দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ কল্পনা।

৫। এস হে সজল ঘন,
বাদল বরিষণে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।
এস হে গিরি শিখর চুমি
ছায়ায় ঘিরি কানন ভূমি;
গগন ছেয়ে এস হে তুমি
গভীর গরজনে।
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন
পুলক-ভরা ফুলে।
উছলে উঠে কল রোদন
নদীর কূলে কূলে।
এস হে এস হৃদয়-ভরা
এস হে এস পিপাসা-হরা
এস হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এস মনে।

জগতের যাহা কিছু গম্ভীর ও মহনীয় তাহাই ইন্দ্রিয়কে জাগিয়ে দিয়ে মনের মধ্যে অসীমের একটা ছায়া এনে ফেলে দেয়। কবি এই অনুভূতিটিকে তাই প্রাণে সজীব করে রাখতে চাচ্ছেন। দার্শনিক এইটুকু পেতেই যুক্তির জালে জড়িয়ে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছেন; কিন্তু কবি সহজ বিশ্বাসে তাঁর কল্পনায় সেই প্রাণের জিনিষটুকু পেয়ে যাচ্ছেন।

৬। রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

চির-জীবন সৌন্দর্য্যের উপাসনা করে'—গান গেয়ে এখন সেই রূপের ও সৌন্দর্য্যের ভিতর ডুবে থেকে অরূপের সন্ধান চাচ্ছেন। রূপের উপাসনা করে আশা মিটে নাই, পিপাসার তৃপ্তি হয় নাই,—তাই সেই রূপের মধ্যে যে রূপ সব রূপের সেরা, সেই অরূপের জন্য কবির প্রাণ কেঁদে উঠেছে। দার্শনিক সেই অরূপকেই জানতে চায়।

৭। আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্‌না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক্ পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক্ হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখি তারা।
হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।
ছড়িয়ে পড়া আশা গুলি,
কুড়িয়ে তুমি লওগো তুলি
গলার হারে দোলাও তারে—
গাঁথা তোমার করে সারা।

কবি সকল রসের, সকল সৌন্দর্য্যের অবসান করতে চান তাঁরই মধ্যে, যার জন্য দার্শনিকগণ যুগে যুগে অশেষ রকম যুক্তির অবতারণা—করেছেন ও কচ্ছেন।

রবীন্দ্র নাথের গানের উদাহরণ দিয়ে আর ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাতে চাই না; কিন্তু কত গানে কত ছন্দে তিনি একই কথা বলতে চেয়েছেন, তার সব গুলি বললেও বেশ প্রাণের তৃপ্তি হয় না। গাইতে যদি হয় তবে এমনি করে গাওয়া চাই। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে থেকে যদি তারই মধ্যে সব চাওয়ার সব পাওয়ার অবসান হয় তবে কিছুই পাওয়া হয় না। তাই কবি সকল রসের মধ্যে সেই অমৃতের সন্ধান পেতে চেয়েছেন যাতে সমস্ত রস ডুবে যাবে, সব চাওয়ার শেষ হবে।

একথা অবশ্য সত্য নয় যে সমস্ত কবিই এই অসীমকে চাওয়ার জন্যই উপাসনা করে, কিন্তু তাই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; তবে অধিকার ভেদে চাওয়া পাওয়া আছে—ও তাই সবাই এমন করে অসীমের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে অসীমের কাছে পৌছে যায় না।

অনেক কবি শুধু স্বদেশ প্রেম গেয়ে গাওয়া শেষ করেছেন। তাঁরাও কই এমন করে অরূপের ধ্যান করেন নি, তবে তাঁরা কি কবি ন'ন? তাঁরাও কবি, তবে তাঁরা এমন করে তাঁদের গানের শেষ করেছেন যাতে আরও কিছু বলবার যেন ছিল, এই বলাই শেষ বলা নয় এমন মনে হতে পারে। আর স্বদেশপ্রেম জিনিষটাও ঠিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছাড়া হতে পারে বলে ত আমার বিশ্বাস হয় না। আমার দেশের যা কিছু সুন্দর আমার কাছে যা কিছু মধুর, আমার যা কিছু মহনীয়, সেইটাকে যে প্রাণে প্রাণে বুঝতে চেষ্টা করা, তার মধ্যেও সৌন্দর্য্যের সাড়া না পেলে আর কিছু দেখতে পারা যায় না; আর তা না হলে স্বদেশপ্রেমের গান তেমন করে প্রাণ মাতায় না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশপ্রেমের অনেক গান গেয়েছেন; তাঁর লেখার ভিতরে, আমি যা বলছি তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে চাই।

"মেবার পতন" নাটকখানায় আমরা তিনটি নারী চরিত্র পেয়েছি। কল্যাণীতে পতিপ্রেমের আদর্শ, ও মানসীতে বিশ্বপ্রেম ওরফে ভগবৎপ্রেমের আদর্শ অত্যন্ত মনোরম করেই কবি চিত্রিত করেছেন। যে বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তাতে কল্যাণীর চরিত্র

বিশেষ ভাবে লেখবার আবশ্যক নাই। সত্যবতী স্বদেশ প্রেমের উন্মাদনা জাগিয়ে মেবার জন্য প্রথমেই যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেইখানে চারণদের সঙ্গে মেবারের সৌন্দর্য্যে স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছেন—

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় স্খলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর,
   সবার সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর ;
   যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
   যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর ;
   মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চ শির,
   তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
   মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির,
   স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর ;
   মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর,
   শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্র শুচিতে কে সম মেবার সুন্দরীর ?
   মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চ শির,
   তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

স্বদেশের সৌন্দর্য্যে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন, দেশবাসীকে তাতে মুগ্ধ করেছেন।

তার পর মানসীর চরিত্রের সঙ্গে যখন আমরা প্রথম পরিচিত হই সেখানে মানসী বলছে—কি মধুর ভিখারিণীর ঐ "জয় হোক্"। জয় ভেরীর চেয়ে ও প্রবল, মাতার আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর।

অজয়। এত সুখ কিসে মানসী ?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ, শরতের নদীর চেয়েও পরিপূর্ণ। এরে ভিখারিণী আমায় আশীর্ব্বাদ করে গেছে।

অজয়। তুমি আর কাউকে ভালবাসো !

মানসী। মানুষ মাত্রকেই ভালবাসি।

অজয়। নিষ্ঠুর !

মানসী। কেন অজয় ! তোমায় ভালবাসি বলে কি—আমার আর কাউকে ভাল বাসতে নেই ? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয় খানি গ্রাস করতে চাও ? কি স্বার্থপর !

অজয়। তুমি এত বালিকা মানসী !

মানসী। তুমি আমার তিরস্কার করছো। আমার কি অপরাধ অজয় ? আমি মানুষ মাত্রকেই ভালবাসি এই আমার অপরাধ ? তবে সেই অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

অজয়। ভালবাসো মানসী ! তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করে নাও। আর আমি কোন কথা কহিব না। শুধু আমি। আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চাই। আমার কথা রয়ো। বিদায় দাও মানসী।

এখানে দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম কত মধুর কত মনোরম করে কবি চিত্রিত করেছেন।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে আর্ত্তনাদের সেবায় মুগ্ধ হয়ে অজয় বল্‌ছে—কি জ্যোতি মানসী !

মানসী। কোথায় ?

অজয়। তোমার মুখে, এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে, একি জ্যোতিঃ ! ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-মেঘান্তরিত স্থির নীলাকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার একি মূর্ত্তি ! একটা সৌন্দর্য্য ! একটা গরিমা ! একটা বিস্ময় !

দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে মানসী একাকী গাহিতেছিলেন :—

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর পরশে।
শূন্য ভুবন পূর্ণ পুষ্পিত, দশদিক কলরব মুখরিত,
গগন সুখে, চন্দ্র সূর্য্য তারকা মধু বরষে।
চাহ অমনি নব বিকশিত পুষ্পিত বন পলকে,
হাস উজল সহসা সব বিমল কিরণ ঝলকে ;
শুষ্ক জীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নব যৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণ কান্তি বরণে,

অঙ্গে ঝিরি মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে;
কুসুম হার জড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নব বসন্ত সরলে।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে দার্শনিক প্রথমটা ঠিক এমনি করে মুগ্ধ হয়ে ভাবে, তারপর ক্রমে যুক্তির জাল দিয়ে সেই ভাবটুকুকে ঘিরে বসে থাকে।

তারপর সত্যবতী রাণাকে দ্বিতীয় বার যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন:—

সত্যবতী। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।

রাণা। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্যবতী। উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয় তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের সব উর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হতে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হলে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কার্য্য কর্ত্তে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্যবতী। রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়—অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ব্বার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হস্তে সঁপে দেবো? আর এ যে সে রত্ন নয়—আমার যথা সর্ব্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণ ভয়ে বিনা যুদ্ধে শত্রু করে সঁপে দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক্। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্‌বেন?

কি সুন্দর মনোহর ভাব! জনসাধারণ মুগ্ধ হবে বিস্মিত হবে, উন্মত্ত হবে। দার্শনিক হয় ত এর মাধুর্য্যের জন্য কোথায় কে মানুষকে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে তাই ভেবে ব্যাকুল হবে।

সত্যবতীর পুত্র অরুণ মাতার মতই স্বদেশপ্রেমে বিভোর, তার একটী চিত্র এখানে বল্‌বার লোভসাম্‌লাতে পার্‌লাম না।

অরুণ। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি জড়ানো আছে। অতীত গৌরবকাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না দাদামশায়?

সগর সিংহ। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো। ওরে কুষ্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত; অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্‌নে, মর্ব্বি।

অরুণ সিংহ। কেন দাদামশায়! আমার কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্ত্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘেরে আছে। অতীত যেন ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর সিংহ। মরেছে। যা ভেবেছি তাই। যত বড় হচ্ছে তত মায়ের আকার ধারণ কর্চ্ছে। ওরে ও রকম করিস্ নে। ঐ করেই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ সিংহ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন?

সগর সিংহ। হাঁ দাদা। সেই তো হোল তার কাল। সে "মেবার" "মেবার" করে ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

অরুণ সিংহ। আমি তাকে খুঁজে বার কর্ব্বো।

সগর সিংহ। এই জঙ্গলের মধ্য থেকে?

অরুণ সিংহ। না দাদামশায়! আর আমি আগ্রায় ফিরে যাব না। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। আর যখন আমার মা এই দেশে, তখন আমার এই ঘর। আগ্রায় এতদিন আমি নির্ব্বাসিত ছিলাম।

সগর সিংহ। যা ভেবেছি তাই। আগ্রায় বাদসার নূতন সাদা পাথরের বাড়ী দেখিস্ নি বুঝি? চল্ ভাই তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ সিংহ। আমি তা দেখতে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর সিংহ। আগ্রায় ৭৮ টা মস্‌জিদ্ আছে। একেবারে ঝক্ ঝক্ কর্চ্ছে।

অরুণ সিংহ। দাদামশায় আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটী ভগ্ন মন্দির

প্রিয়তর। মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে, আমার দীনা জননীর কোলে বসে শাকান্ন খাওয়া ভাল। দাদামশায়! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শত পুণ্য কাহিনী জড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন—ভিক্ষা মেগে খেতে? তারা আপনাকে নিত্য স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পথের ধুলো মিশে আছে। তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মার্চ্ছে। আমার কাছে দাদামশায় পরের দত্ত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্ট।

সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। বেঁচে থাক্ বাপ্! এই ত কথার মত কথা!

সগর। কে সত্যবতী! একি স্বপ্ন! না সত্যবতীই ত! তুমি এখানে মা!

সত্যবতী। যেদিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, তখন বৎস, তোর ছোট হাত দুখানির বন্ধন ছিঁড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবার মহিমা গেয়ে বেড়াই তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর হয়। তুই এখানে এসেছিস শুনে আমি আর থাক্‌তে পারলাম্ না। আমি ছুটে তোকে দেখতে এলাম। এতক্ষণ অন্তরালে থেকে তোর সুধা বাণী শুন্‌ছিলাম; ভাব্‌ছিলাম একি মর্ত্তের সঙ্গীত! এও পৃথিবীতে আছে। তার পরে শেষে আর লুকিয়ে থাকতে পারলাম্ না। পুত্র আমার—সর্ব্বস্ব আমার!

সত্যবতী নিজে যা সব চেয়ে প্রাণে মধুর বলে মনে করেন সেই ভাবটি তার পুত্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন।

তার পর মেবার ধ্বংসের পর এই দুইটি নারীকে দুই ভাবে যখন দেখি তখনই বাস্তবিক কবি যে স্বদেশ-প্রেমের উপর বিশ্বপ্রেমের আসন পেতে দিয়েছেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

সত্যবতী, তাঁহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ গাহিতেছেন—

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপনের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।

এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়
ঘন মেঘ রাশ ঘেরিয়া আকাশ হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।
গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকরব আজ হরষ গান;

ফোটে নাকো ফুল আসেনা আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধু পান;

আর নাহি বয় শিহরি মলয়; আর নাহি হাসে আকাশ চাঁদ
মেবার নদীর ম্লান দুটী তীর করে নাক আর সে কল নাদ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি।
মেবারের বন বিষাদ মগন; আঁধার বিজন নগর গ্রাম;
পুরবাসী সব মলিন নীরব; বিষাদ মগন সকল ধাম;
নাহি করে আর খর তরবার আস্ফালন সে মেবার বীর;
নাহি আর হাসি ম্লান রূপ রাশি ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি।

এ ঘন আঁধার! কিবা আছে তার!
সান্ত্বনা আর কে করে দান,

চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার মহিমা গান;
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবার ধ্বনিয়া যাক্।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি।

যুদ্ধ পরাজয়ে যেন পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য শেষ হয়ে গেছে! আর তার সেই অনুভূতি কি করুণ অথচ কি সুন্দর!

আবার এই ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাণার কন্যা মানসী একাকিনী উদয় সাগরের তীরে বসে বল্‌ছেন—

"আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদুগম্ভীর অনাদি সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর! মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবারিত নীলিমা দেখতে

পাচ্ছি—শতগুণ নির্ম্মল! আমার কর্ত্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসারিত দেখছি।"

পরে কল্যাণীকে বল্‌ছেন :—

"এসো আমরা মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক।

তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করেই সুখী।"

তার পর সত্যবতীতে আর মানসীতে যে কথা হল তাতেই কবি নিজের মতকে ভাল করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে বিশ্বপ্রেমের আসন সকলের উপরে।

সত্য। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই, যে যেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পদ আমাদের হোক্। আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্—যে সে দুঃখে, নৈরাশ্যে, ঝঞ্চার অন্ধকারে, ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নাই।

সত্য। ভাই উচ্ছন্ন যাবে' আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্ব তাকে তুল্‌তে। তবু যদি না পারি ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহা সমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্। দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক্ এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না? আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে; যেদিন তারা যা উচিত যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, ক্রমে ভাইকে ছেড়ে জাতিকে, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বকে ভালো বাস্‌তে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আস্‌বে। জাতীয় উন্নতির পথ শোনিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ কুটিল স্বার্থসেবী হয়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে করে চির জীবন হাহাকার কল্লেও কিছু হবে না।

বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য এক কর্‌লেও স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মত মধুর ভাবের সৃষ্টি হয় না তার জন্য আর কিছু চাই। "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" এদের গড়্‌তে হয়। কবি দেখাতে চেয়েছেন অন্তর ও বাহিরের সব মাধুর্য্যের উপর হচ্ছে বিশ্বপ্রেম ও ভগবৎপ্রেম! বাহ্য জগতের ও মানুষের প্রাণের সব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করেও কবির যেন আশ মিটে না—আবেগ নিরুদ্ধ হয় না, সে আরও কিছুর জন্য লালায়িত হয়, তার প্রাণ আরও কোন সুন্দরের দিকে ধাবিত হয়; যতক্ষণ না সেই চিরসুন্দরের সন্ধান পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার সব গান পেয়েও শান্তি আসে না। আর সেই চিরসুন্দরের সন্ধানে এসেই তার দার্শনিকের সঙ্গে মিলন হয়। তখন দুজন হাত ধরাধরি করে একই পথে অগ্রসর হয়।

আমি দার্শনিক নই—কাজেই সে কি চায়, কি তার প্রাণের কথা তা আমি ভাল জানি না, ভাল বুঝি না, তবু আমার যা মনে হয় তাই সংক্ষেপে একটু বলে আমার এ নীরস প্রবন্ধের উপসংহার করব।

দার্শনিক প্রথম অবস্থায় বহিঃপ্রকৃতির এত সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে হয় ত ভাবতে আরম্ভ করে যে এসব কোথা থেকে এলো, এর সৃষ্টি কর্ত্তা কে? মানুষ ত অত্যন্ত দুর্ব্বল, তার দ্বারা কখনও এটা সম্ভবপর নয়। তবে কে সে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন চিরসুন্দর এমন সুন্দর প্রকৃতি ও এমন সুন্দর মনুষ্যজগৎ সৃষ্টি করেছে। এত বৈচিত্র্য এত মাধুর্য্যের সমাবেশ দেখে মানুষ অবাক হয়ে যুগে যুগে আপনার মনে এই একই প্রশ্ন করেছে; কিন্তু তার মীমাংসা আজও হয় নাই। কত ভিন্ন ভিন্ন উত্তর কত মুনি ঋষিরা দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ তাতে তৃপ্ত হয়নি। তাই আবার সেই একই প্রশ্নের নানারূপ মীমাংসার চেষ্টা করে আসছে।

প্রথম জড় জগতের বাহিরে আর কিছু মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে নাই। তাই এটাকে পঞ্চভূতের একটা সমাবেশ মাত্র মনে করে মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছে। কেহ বা শুধু জল, কেহ বা শুধু অগ্নি, কেহ বা শুধু বায়ু হতে এ সৃষ্টিটা হয়েছে বলে ভাবতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্ত না হয়ে ভিতর দিকে নজর করতে সুরু করে আর এক রকম করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

তাই Socrates এর "Know thyself" Anaxagoras এর Non pactikos এ অন্তর্দৃষ্টির আরম্ভ দেখি। আমরা কিন্তু জড় জগতের উপাসক তেমন করে বেশী ছিলাম না তাই চার্ব্বাকের মত বেশী দিন চলে নাই। কিন্তু তাই বলে সূর্য্যের উপাসনা থেকে আরম্ভ করে বট অশ্বথ বৃক্ষের কাছে মাথা নোয়ান পর্য্যন্ত ব্যাপার আমাদের দেশে আজও চলেছে। এসবের অর্থ বোধ হয় এই—যে মানুষ যা কিছু মহনীয়, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই দেখে তাকেই পূজা করতে আরম্ভ করে। যা সুন্দর তাই পূজনীয়।

এখন ভিতরের দিকে তাকিয়েও কিন্তু সকলেরই সেই একই প্রশ্ন—এই সৌন্দর্য্য কোথা থেকে এলো? আমরা চোখে যা দেখি তার সব দিয়ে এই prima causa (মূল সূত্র) কে ভাবতে বুঝতে চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু তাতে আজও পর্য্যন্ত মীমাংসায় এসে পৌঁছতে পারি নাই।

German দার্শনিক Kant যখন তাঁর বুদ্ধিতে কোথাও এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেন নি, তাঁর Critique of pure reason এ কিছুই পান নি, Critique of practical reasonএ শুধু ethics অথবা নীতিশাস্ত্রের কতগুলি মীমাংসা করলেন কিন্তু তার Æsthetics অর্থাৎ Science of Beauty অথবা সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে তার শেষ মীমাংসার উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। তা না হলে যেন কেমন খাপ ছাড়া হয়ে যায়, বেশ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানেই কি সব মীমাংসার শেষ হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে তাকে ঠিক মনে নিতে পারে নি। আবার Hegel, Schopenhaur Schlier, Lotze সেই একই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দিয়ে চিন্তাশীল জগৎকে বিব্রত করে তুলছে। পারবে কেন এ আবেগকে থামাতে এর শেষ হওয়া ত সম্ভব নয়, এ প্রশ্নের শেষ উত্তর দেওয়া কারো পক্ষে সহজ নয়।

আমার মনে হয় যে এ সব উত্তরে শুধু মনকে চোখ ঠারা ছাড়া আর সম্ভব নয়। আমি এই বিপুল আয়োজনের কারণ খুঁজে অস্থির হয়ে শেষ কালে যা হোক একটা কিছুর দিকে চেয়ে নিজের মনকে শান্ত করতে পারি, কিন্তু আর একজন তাতে সান্ত্বনা পাবে কেন? তার প্রাণের প্রশ্নের উত্তর তাতে সে পাবে কেন? যতই যুক্তির দিকে যায় তত লোক নাস্তিক হতে বাধ্য হয়।

কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন যে ভগবানের ইচ্ছা হতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে, কিন্তু তখনি আর একজন বললে অভাবই ইচ্ছার ভিত্তি। ভগবান তৃপ্ত—পরিপূর্ণ, তাঁর আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কেন?

আবার জগতে যে শোক দুঃখ জরা মৃত্যু দেখতে পাই তা দেখে কারও ঘোরতর সন্দেহ হয় যে এমন একজন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই যাঁর কল্পনা দার্শনিকগণ করে গেছেন।

যতই বিচার কর্ত্তে যাওয়া যায় ততই সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হয়, অথচ কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। আমার এ প্রবন্ধে দার্শনিকদের সুবিধা অসুবিধা ও মতামতের বিচার করা উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং তা থেকে বিরত হতে চাই। আমি শুধু বল্‌তে চাচ্ছিলাম যে দার্শনিকরা যে সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কবি তাই বিভোর হয়ে নানা ভাবে উপভোগ করে নিলেন। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রাণের যোগ আছে। উভয়ে যে কারণে আসরে এসে হাজির হন সেটা আর কিছুই নয় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্য্যবোধ। তাই কোন কোন কবি শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের আখ্যা পেতে পারেন, আবার কোন কোন দার্শনিক কবি ছাড়া আর কিছুই নন। বিশেষ করে England ও Scotland এর যে Intuition School of Philosophy আছে তার সকলেই শুধু কবি বল্‌লেই হয়। যেখানে যুক্তিতে বিপদ দেখেছেন সেইখানেই প্রাণের অনুভূতির দোহাই দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছেন। এ সব কবিতা ছাড়া আর কি বল্‌তে পারা যায়?

সকল মানুষই সৌন্দর্য্যের পূজা করে। তাকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে, প্রাণের বিবিধ অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পায়। কিন্তু এ দেখায় তৃপ্ত হয় না বলেই সে আরো গভীরতম প্রদেশে চলে যেতে যায়। সেই যাওয়ায় সেই চাওয়ায় কবি ও দার্শনিকের মিলন হতেই হবে।

তাই আমার এই নীরস প্রবন্ধের বিষয়টি অদ্ভুত হলেও আমি কবি ও দার্শনিকের মধ্যে যে একটা মিলন দেখেছিলাম তাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। সুন্দরের অনুভূতিকে যেমন যত প্রকারেই প্রকাশ করি না কেন আরও কিছু বল্‌বার থাকে, সব বোঝা, সব বোঝান, সব বলা সব ভাবা যেন শেষ হয় না—আরও কিছু বলবার থাকে বলা শেষ হয় না—তেমনি আমি যে মিলন কাব্যে ও দর্শনে পেয়েছি তা আমি যেন ভাল করে বলতে পারলাম না। আরও যেন কিছু বলবার মত র'য়ে গেল। আপনারা আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ দাশ গুপ্ত।

স্মৃতির-ধারা।

অতীতের শৈলশৃঙ্গে জনম লভিয়া
জীবন ভূখণ্ড বেয়ে স্মৃতির তটিনী,
ছুটিতেছে নিত্য নব উপনদী নিয়া
ক্রমবর্দ্ধমান তনু অশ্রান্তবাহিনী!

কবিজীবনের তট সুশ্যামায়মান
বিতরিছে দুইধারে প্রতুল সম্পদ,
কল্পলোকবাসিগণ করে স্নান পান,
গড়ে তুলে তীরে তীরে সুর জনপদ।

অশ্রুবৃষ্টিপরিপুষ্টা কখনো গম্ভীরা,
বন্যায় উথলি কভু তট উল্লাসিনী;
চন্দ্রিকাপ্রোজ্জ্বলা কভু স্থির শান্ত ধীরা,
গাহিছে অতীত কথা কলনিনাদিনী।

মহাবিস্মরণ — সেই মৃত্যু মহোদধি,
তাতে লুপ্ত হতে চলে — চলে নিরবধি।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিজয়ান্তে।

মা আসিয়াছিলেন, চলিয়া গেলেন।

সম্বৎসর পরে মাত্র তিনটী দিনের নিমিত্ত তোমার মা — আমার মা — জগতের মা আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়া গেলেন। প্রকৃতির কেলিনিকুঞ্জে শরৎসুন্দরী তাহার অনির্ব্বচনীয় ভাবময়ী নীরব ভাষায় মায়ের যে আগমন সঙ্গীত গাহিয়াছিল, আজ সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা মিলাইয়া গিয়াছে! আজ মা চলিয়া গিয়াছেন।

ভাই বাঙ্গালী! আজ বিজয়া দশমী। আজ তোমার বড় দুঃখের দিনও বটে, বড় সুখের দিনও বটে। যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকে — যিনি সর্ব্বভূতে শক্তি, বুদ্ধি, শান্তি, ক্ষান্তি, মেধা স্বরূপে অবস্থিত — যিনি স্বর্গ ও অপবর্গের প্রদানকর্ত্রী— সেই দুর্গারূপিনী সনাতনী মহাশক্তি আজ তোমার স্থূল দৃষ্টির অতীত। বৎসরান্তে তিনটী দিনের জন্য যাঁহার অর্চ্চনা করিতে পাইয়াছিলে— যাঁহার দেবদুর্ল্লভ চরণকমল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভাবিয়াছিলে—

"অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া"

আজ সেই সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্বজননীকে বিসর্জ্জন দিয়া— স্থূলভাবে তাঁহার অভাব বোধ করিয়া—তুমি দুঃখে ম্রিয়মান— বেদনায় কাতর—বিরহে অধীর; আজ তাই তুমি শোকে আত্মহারা হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতেছ। কিন্তু ভাই! তোমার এ শোক ত সাধারণ শোক নহে; সাধারণ শোকে মানুষ ব্যক্তিত্বের বিয়োগে চিরবিরহবেদনাজনিত যন্ত্রনায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া থাকে; কিন্তু তোমার এই শোক — একবার নয়ন মেলিয়া দেখ — দেখিবে এই শোক ফল্গু নদীর ন্যায় তোমার অন্তরের অন্তরে কেমন আনন্দের অমৃত ধারা বহন করিতেছে!

তাই বলিতেছিলাম ভাই বাঙ্গালী! আজ তোমার বড় সুখের—বড় আনন্দের দিন। বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য যেই দশভূজারূপিনী সনাতনী শক্তির মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পে ধূপে তাহার অর্চ্চনা করিয়াছিলে, সেই মহাশক্তির আবার আবির্ভাব বা তিরোভাব কোথায়! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে!
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তী
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ"

— যিনি একাকিনী এই জগতের আধার ভূতা — যিনি পৃথিবীরূপে স্থিতি করিতেছেন, জলস্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে পুষ্ট করিতেছেন — যিনি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বরূপা, বিশ্ব পালন ও ধারণ করিতেছেন — যিনি বিশ্বপতিরও পূজনীয়া — তাঁহার আবার আবির্ভাব ও তিরোভাব কোথায়? তিনি যে সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে বিরাজ করিতেছেন! স্থূলভাবে তাঁহার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আজ তুমি বিষন্ন—কিন্তু সূক্ষ্মভাবে একবার তাঁহার চিন্ময়ীমূর্ত্তি ধ্যান কর—মনোমন্দিরে তাঁহার অবস্থিতি উপলব্ধি কর—দেখিবে ও বুঝিতে পারিবে স্নেহময়ী বিশ্বজননী তেমনই রূপের প্রভায় তোমার হৃদয় আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

বাঙ্গালী! আজ বড় সুখের বড় আনন্দের দিন বটে; কিন্তু দেখিও ভাই! হেলায়—অশ্রদ্ধায় যেন আজ এ আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিও না। মনে রাখিও মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া তুমি তোমার হৃদয়ে চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। তিনটী দিন ধরিয়া মায়ের যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে, সেই প্রতিমার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—বুঝিতে পারিবে মায়ের সেই চিন্ময়ীমূর্ত্তির কেমন সুন্দর আভাস তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে! সিংহারূঢ়া দশভূজা মা আমার দশহস্তে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরকে বধ করিতে উদ্যতা। বামে বাণী, দক্ষিণে কমলা

— সম্মুখে কার্ত্তিকেয়, গণপতি, — উর্দ্ধে শিব; এই দশভূজাই জীবাত্মা স্বরূপ—এই দশপ্রহরণ দশলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম — এই মাহষাসুরই পাপের প্রতিমূর্ত্তি। সঙ্গে বাণী জ্ঞানদায়িনী, — কমলা, ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী — শক্তিধর কার্ত্তিকেয় ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি। সিংহ — প্রবল বীরত্বের প্রতিকৃতি; শিব—শ্রেয় বা তুরীয় ব্রহ্মের মূর্ত্তি স্বরূপ। বীরভক্ত সাধকের জীবাত্মা যখন প্রবল বীরত্ব অবলম্বন করিয়া দশলক্ষণযুক্ত ধর্ম্মরূপ অস্ত্র সাহায্যে পাপাসুর বিনাশে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বিঘ্ন বিনাশ করিবার নিমিত্ত গণপতিদেব ও তাঁহাকে শক্তিশালী করিবার জন্ত কার্ত্তিকেয় আবিভূত হন। তার পর যখন সাধক পাপের বিনাশ করিয়া শ্রেয়ঃ লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন তখন তাঁহাকে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া সিদ্ধিপথে অগ্রসর করাইতে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব। তার পর যখন ভক্ত সাধক সাধনা করিতে করিতে সেই শিবময় ভূমায় বিলীন হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন—যখন "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই বোধ থাকে না তখন সেই শিবস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভীপ্সিত বর প্রদানে চরিতার্থ করেন।

ভাই বাঙ্গালী! ইহাই মাতৃ-পূজার তত্ত্বকথার আভাষ; এই শিবরূপী ব্রহ্মই তোমার মা—অথবা এই মা-ই তোমার শিবরূপী ব্রহ্ম। এই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তিই স্থষ্টিতে ব্রহ্মাণী—পালনে বৈষ্ণবী এবং প্রলয়ে মাহেশ্বরী শক্তি! ভক্ত সাধকের চক্ষে ইনি কখনও মাতা পিতা—কখনও সখা, ভ্রাতা—কখনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরী—আবার কখনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংহার-কারিণী! এই মহাশক্তির সাধনায় যদি তিন দিনে পূর্ণ মনোরথ হইয়া থাক—যদি পাপাসুরকে বধ করিয়া জগন্মাতার আশীর্ব্বাদে শ্রেয়ঃ লাভের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হও, তাহা হইলে বুঝিবে আজ তোমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। বুঝিবে এই আধিব্যাধিপ্রপীড়িত শোকতাপদগ্ধ সংসারে তুমি পাপকে পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইয়াছ। তোমার ধ্যান ধারণা ঘুচিয়াছে—পূজা ফুরাইয়াছে—সকল কর্ম্মের অবসান হইয়াছে! তুমি বিজয়ী বীরের স্থায় আজ সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র—সকল ক্রিয়ার, সকল বন্ধনের উর্দ্ধে অবস্থিত। আজ তোমারই প্রকৃত বিজয়া। নবজাগরণনিকুঞ্জের নবীন পিকের দল তোমরা এই বিজয়ার সাধনায় কি আজ বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইবে না?

বিজয়ার দিনে মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাধকমাত্রেই সকলই বিসর্জ্জন বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। সাধকের তখন আর কোন বাহ্যাড়ম্বর বা স্থূলভাবের পরিচয় প্রদর্শন করিবার অভিলাষ থাকেনা। সর্ব্ববিধ বাহ্য আচার অনুষ্ঠান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টি তখন অন্তর্মুখীন হইয়া মায়ের চিন্ময় মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ হয়। বিসর্জ্জনের ফলে সাধক তখন অনাবিল শান্তি উপভোগে সমর্থ হন। ত্যাগের পর শান্তি অবশ্যম্ভাবী। সাধক এই শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া—এই অপূর্ব্ব শান্তির আস্বাদলাভ করিয়া তখন মধুর বিশ্বজনীন প্রেমে মজিয়া এক অপার্থিব ভাবে বিশ্বের সমস্ত জীবের সহিত আলিঙ্গনে প্রয়াসী হন। এই আলিঙ্গন পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সংস্রববিহীন—এই আলিঙ্গনে হৃদয়নিহিত অপ্রাকৃত প্রেমই আলিঙ্গনরূপে প্রকট হইয়া সুকোমল বাহুবন্ধনে অন্তকে বুকে টানিয়া লয়—পরকে আপন করিয়া লয়—প্রানে প্রানে এক করিয়া দেয়। এই অলিঙ্গনে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, স্বার্থ নাই, কপটতা নাই, জড়তা বা সংকীর্ণতা নাই—আছে শুধু প্রীতি, শুধু প্রেম, শুধু অনাবিল আনন্দের তীব্রমধুর উচ্ছ্বাস! মধুর হইতে মধুরতর,—মধুরতম এই আলিঙ্গন বা কোলাকুলি সাধকের সাধনার শেষ ফল। তাঁহাদেরই অনুকরণে দুর্ব্বল আমরা আজ বিজয়ার দিনে "কোলাকুলি" করিয়া থাকি। হায়! মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখিনা, সেই আলিঙ্গনে ও এই আলিঙ্গনে—সেইভাবে ও এই ভাবে কি প্রভেদ, কি আকাশ পাতাল ব্যবধান বর্ত্তমান।

ভাই বাঙ্গালী! যদি সাধকের ন্যায় এই আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় উত্তমশীল ও যত্নবান হও তাহা হইলে বুঝিবে আজ তোমার বাস্তবিকই কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দিন।

তাহা না হইলে অনন্তকাল ধরিয়া যুগযুগান্ত হইতে বৎসরের পর বৎসর 'শিশিরস্নাত শেফালিকার মৃদুমধুর হাসি লইয়া—প্রস্ফুটিত কমলের সুষমা ছড়াইয়া—দিকে দিকে স্বর্গীয় মাধুরীর উন্মেষ করিয়া শরৎলক্ষ্মী ত মহামায়াকে আনিতেছেন, বৎসর বৎসর ত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিজয়ার মিলনোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু সে আনন্দ কই, সে পরিতৃপ্তি কই, সে সুখের উচ্ছাস কই? এ যেন সকলই কপটতাময়।—অন্তরে এক, বাহিরে আর—এ যেন করিতে হয় বলিয়া করা, না করিলে নয় বলিয়া করা। ইহাতে যেন পূর্ব্বের সে প্রাণের কোনও টান নাই—আন্তরিক ভালবাসার কোনও চিহ্ন নাই— অকৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই! এ বিজয়ার পরিতৃপ্তি—এ মিলনের আনন্দ অনুভব করিতে চাও, এখনও বদ্ধপরিকর হইয়া মহামায়ার প্রকৃত পূজায় তৎপর হও। ঘটে পটেই মায়ের পূজার সমাপ্তি হয় না—বিজয়ার বিসর্জ্জনেই মায়ের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া যায় না—মৃন্ময়ী মার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ময়ী মার অভিব্যক্তি—চৈতন্য স্বরূপিনীর স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। যদি মায়ের সেই চিন্ময়ী রূপের মাধুরী দেখিতে চাও—মায়ের প্রকৃত পূজার অধিকারী হইতে চাও—তোমাকে মায়ের প্রকৃত সন্তান, মায়ের সাধক হইতে হইবে। তেমনই অনুরাগে, তেমনই সরলতায়, তেমনই একনিষ্ঠায় মাকে জাগাইতে হইবে। শুধু মুখের কথায় 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবেনা; মাকে জাগাইতে হইলে আপনা ভুলিয়া "মা-ময়" হইতে হয়, তবে সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপিনীর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখ—বুঝিবে বিশ্বজননী কতরূপে কতভাবে তোমায় কৃপা করেন।

তাই আবার বলিতেছি ভাই বাঙ্গালী! আজ তোমার বড় শুভ দিন—বড় আনন্দের দিন। এমন উৎসব উল্লাসের দিন আর সম্বৎসরে মিলিবে না। আজিকার এই মিলন উৎসবে যেমন সকলে আনন্দে মিলিতে পারিয়াছ, এমন মিলন হয়ত জীবনে আর না ঘটিতেও পারে; কেননা জীবন ক্ষণভঙ্গুর—চপলা চমকের ন্যায় চঞ্চল। এস ভাই এখনও সময় আছে—এখনও পরপারের গোধুলিধুসর সন্ধ্যারতির মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠে নাই—এখনও বেগবতী বৈতরিণীর কুলু কুলু আহ্বান জীবনকে ক্ষুব্ধ ও অস্থির করিয়া তোলে নাই—এস একবার প্রাণপণ উদ্যমে লজ্জা, ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া—হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, বিবাদ, বিসম্বাদ ভুলিয়া—আলস্য সংকীর্ণতা, কপটতা, পরিহার করিয়া বিশ্বমাতার উদ্বোধনে সচেষ্ট হই। ঐ শোন—উপনিষদের সেই অমৃতময়ী বাণী আমাদিগের নিমিত্ত কি শুভবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উঠ জাগ্রত হও। সৎগুরু সমীপে শ্রেয়ঃ অবগত হও।"

এস ভাই! অমৃতের পুত্র আমরা—আনন্দের অধিকারী আমরা—এই বিজয়ার মিলনানন্দে আনন্দময়ীর উদ্বোধনে তৎপর হইয়া আমাদের জন্ম সফল করি।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

সাথী।

আঁধার ঘন
দীঘল রাতি
পিছল অতি পথ,
বাদল বায়ু
গুমরি উঠে
ব্যাকুল মনোরথ;

বিজন পথে
নিশার ডাকে
শুনায়ে আশা বাণী,
আলেয়া আলো
শ্মশান ভূমে
পথিকে লয় টানি!

ঝলকি উঠে,
বিজুলী আলো
চমকি উঠে প্রাণ—
নিবিড় আরো
আঁধার নামে
নীরব সব গান!

পথিক ওগো!
বন্ধু ওগো!
ঘনায়ে এস কাছে,
শিথিল বাহু
ধরিয়া লহ
পিছলি পড়ি পাছে!

শ্রীমুরারি মোহন দাস।

লটারি।

রাতারাতি বড়লোক হইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা রমণীমাত্রেরই থাকিলেও আমার গৃহ-লক্ষ্মীর এই দুর্ব্বলতা বড় বেশী পরিমাণে ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস এবং ইহার পরিমাণটাও তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য তাহার এই খেয়াল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার হেতুতে যে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা বলিতে পারি না; কারণ চির-আদরিণী পুত্রবিহীনা স্ত্রীর প্রথম প্রথম দুই একটা এইরূপ খেয়ালকে তাঁহার মানসিক কষ্ট নিবারণের উপায় বলিয়া বরং প্রশ্রয়ই দিয়াছিলাম। কিন্তু উপরি—বিহীন, মাসিক ষষ্টি মুদ্রা বেতনের কেরাণী-পুঙ্গবের পক্ষে এই খেয়ালের খোরাক যোগান যে ক্রমেই কষ্টদায়ক হইয়া উঠিতে ছিল তাহা অপরের পক্ষে বোধগম্য হইলেও প্রেয়সীকে কিন্তু উক্ত বিষয় এ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া উঠিতে পারি নাই। উপরিওয়ালার বকুনি উদরস্থ করিতে চিরাভ্যস্ত, তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন কেরাণীর পক্ষে একজন বিদুষী রমণীর তর্কজাল ছিন্ন করা একেবারে অসম্ভব বুঝিয়া ইদানীং আমি একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছি। বিশেষ বর্দ্ধমানের একজন ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী ডারবি লটারিতে একটি দশ টাকার টিকিট কিনিয়া একলক্ষ টাকা পাইয়াছে এই কথা যেদিন খবর কাগজে বিঘোষিত হইল তখন হইতে আমার আর কথাটি কহিবার যোটিও রহিল না। সকলে হয়ত বলিবেন যে আমার মত স্ত্রৈণ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। তাহাদের সহিত আমি তর্ক করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক; তবে আমার মত অবস্থায় পড়িলে ও আমার মত গৃহিণী পাইলে তাহাদিগকেও যে আমারই মত বোকা বানিয়া যাইতে হইত, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। ডারবি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সামান্য দোকানের লটারিতে টিকিট কেনার বিরাম নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে কোনটিতেই অখডিম্ব ব্যতীত কিছুই লাভ হয় নাই।

(২)

যুদ্ধের জন্য বাজারের সমুহ দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে, দিন গুজরাণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিরণের আমার টিকিট কেনা সমান ভাবেই চলিয়াছে। ফলে আমাকে আমার চিরপ্রিয় সিগারেটের লোভ ও Whiteway Laidlaw দোকানের পোষাকের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে। থিয়েটার বায়স্কোপ দেখার সখ না থাকিলেও গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিবার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। সে পিপাসাও এখন খবরের কাগজ পাঠে মিটাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সন্ধ্যার সময় বন্ধু বান্ধব মিলিয়া চা পানের বদলে এখন রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত হেদোর বেঞ্চের উপর আকাশের পানে চাহিয়া তারা গুনিয়া কাটাইতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু এই সব স্বার্থত্যাগের কথা গৃহিনীর কর্ণগোচর করার সাহসটুকুর আমার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তিনিও এ পর্য্যন্ত নিজে আমাকে এই সব বিষয় লইয়া কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল যে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার হিতাহিত বিবেচনা শক্তির প্রাখর্য্য জন্মিয়াছে—এতদিনে চা ও সিগারেটের অনুপকারিতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

সখের মধ্যে একটি সখ এখনও পুরা মাত্রায় বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি; সেটি সংবাদপত্র পাঠ। তবে এই সখটি বোধহয় আমার অপেক্ষা প্রবল পক্ষের বেশী ছিল, সেই কারণেই, নতুবা কি হইত বলা যায় না।

সংসারের এইরূপ যখন অবস্থা তখন একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া বাড়ী ঢুকিতেই কিরণময়ী একখানি লেফাপা হস্তে চোখে মুখে একরাশ গর্ব্বমিশ্রিত হাসি মাখিয়া সম্মুখে হাজির। এইরূপ সম্ভাষনটা একপ্রকার আমার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া কতকটা বিস্ময়ে বিমূঢ় গোছের চাহনিতে তার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি লেফাপাখানি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—"এতদিনে তোমার কেবল টাকা খরচ করেই আসছি কখনও কিছু দাওনি বলে তোমার মনে মনে আমার উপর একটা রাগ আছে। এই নাও, এইবার তোমার যত টাকা খরচ

হয়েছে তার চারগুণ টাকা তোমায় আমি দিচ্ছি।"

আমি—"এঁ্যা তাই নাকি? ডারবির ফলত এখনও বেরোয় নি। তবে টাকা কোথা থেকে এল? এই খামের ভেতর টাকা আছে নাকি? কত টাকা আছে কিরণ?"

কিরণ "সাধে কি তোমায় বোকারাম বলি।"

হ্যাঁ—একটা কথা আপনাদিগকে বলিতে ভুলিয়াছি, বিবাহের পর, বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে, কবে কোন ফাঁকে যে কিরণময়ী আমার বুদ্ধিহীনতা টের পাইলেন তাহা বলিতে পারিনা; কিন্তু তিনি আমায় মধ্যে মধ্যে "বোকারাম" শব্দে অভিহিত করিতে লাগিলেন এবং আমিও তাহার এই নূতন দেওয়া নামের অযোগ্যতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বাকবিতণ্ডা করিতে সাহস করি নাই। হঁ্যা, কিরণময়ী বলিলেন—"সাধেকি তোমায় বোকারাম বলি। তোমার ঘটে যদি এতটুকুও বুদ্ধি আছে। ওতে টাকা নেই, টাকা নেই, টাকা পাওয়া যাবে তার খবর আছে।"

আমি—কেন টাকা পাওয়া যাবে? কোত্থেকে? কত টাকা কিরণ? লাখ দুলাখ নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাহ'লে হয়ত এতক্ষণ আমাকে ডাক্তার ডাকতে ছুটতে হোত।

কিরণ—কেন আমাকে কি ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী পেয়েছ যে লাখ দুলাখ টাকা পাওয়ার খবর পেয়ে মূর্চ্ছা যাব?

আমি—না—না—তা-নয়—তা-নয়—তবে—

কিরণ—"চিঠিটা খুলেই দেখ না?" লেফাপাখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম। বোম্বাই সহরের একটি সাহেবি দোকানের সেলের লটারিতে আমার গৃহলক্ষ্মী একটি গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া মায় সাজ সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সকল মালামাল প্রেরিত হইয়াছে ও দুই এক দিবসের মধ্যেই মদীয় ভবনে উপস্থিত হইবে। পত্র হইতে মুখ তুলিয়া কিরণের দিকে চাইতেই সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল (এইরূপ হাসিটিও আমার নিকট নূতন); বলিল, "কেমন এখন তোমার টাকা সুদে আসলে আদায় হইবে ত?"

আমি—টাকা কোথা কিরণ? এ যে গাড়ী ঘোড়া। ৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণী আমি জুড়ী গাড়ী নিয়ে কি করব?

কিরণ—ঐ গাড়ীতেই টাকা হবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে দেব এখন"

স্বল্প বেতনের মসীজীবি বলিয়াই হউক অথবা যে কারণেই হউক আমার বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে কিরণের একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আমি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি: সেই কারণেই কোনও কার্য্য করিবার সময় আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া কিরণ অগ্রে সেই কার্য্য সমাধা করিয়া পরে আমায় খবর দিত। সেই অভ্যাসের বশেই বোধ হয় গাড়ী ঘোড়ার সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া আমার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে গেল।

৩

দু'দিন যে কি ভাবে কাটিল তাহা আর কি বলিব। কিরণ যে কি ব্যবস্থা করিতেছে তাহা বলে না, আমারও সে বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত দুঃসাহসের সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ভাবনার হাত হইতে ত এড়াইতে পারি না। হঠাৎ যখন কিরণের গাড়ী ঘোড়া আমার এই জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন লোককে কি বলিয়া জবাবদিহি করিব বা করপোরেশনের হাত এড়াইয়া কোথায় কিভাবেই বা রাখিব তাহাও কোনও মতে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। আফিসে অন্যমনস্কতার দরুণ বন্ধুদের নিকট উপহাস ও সঙ্গে সঙ্গে উপরিওয়ালার কঠোর তীব্র ভৎসনা নীরবে উদরস্থ করিতেছিলাম। সেদিন একটি ঠিকে ভুল হওয়ায় ছোট সাহেবের নিকট কোন দীর্ঘকর্ণ পশুবিশেষের আখ্যায় অভিহিত হইয়া কেরাণী জীবনের উপর একটা দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখি একটি বৃহৎ শ্মশ্রুধারী ভীষণকায় মুসলমান আমার খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া দিব্য আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুরুট ফুঁকিতেছেন। মনের ভাবটা যে তখন আমার কিরূপ হইল তাহা

বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। আমার পদশব্দ পাইয়া আগন্তুকটি তাহার ভাঁটার ন্যায় দুইটি রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া "দংষ্ট্রী ময়ূখৈ সকলানি কুর্ব্বন" গোছের হাসি হাসিয়া সেলাম জানাইলেন। আমার ত সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে গরগর করিতেছে। ঈষৎ কঠোর ভাবেই তাহাকে তাহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে আমাকে একটি খবরের কাগজ দিল ও তাহাতে লাল কালিতে দাগ দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন আমাকে পড়িতে অনুরোধ করিল। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়াই ত চক্ষু স্থির। তাহাতে লেখা আছে যে একটি অতি উত্তম গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া আমার বাড়ীর ঠিকানায় বিক্রয় হইবে, খরিদ্দার আবশ্যক। এ যে কাহার কার্য্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই জন্যই আমাকে গাড়ী ঘোড়ার বিষয় ভাবিতে নিষেধ করে। মাল কোথায় তার ঠিক নাই, খরিদ্দার উপস্থিত! ফ্যাসাদের উপর ফ্যাসাদ। আগন্তুকটি বলিল, "বাবু সাহেব আমি একজন খরিদ্দার। আমি গাড়ী ও ঘোড়াগুলি একবার দেখিয়া আপনার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া যাইব। আপনি ত এই মাত্র কাছারী থেকে এলেন। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনার আস্তাবল কোথায় বলুন, আমি নিজেই না হয় গিয়ে দেখে আসি; আপনি ততক্ষণ জল টল খান।"

রাগে ও লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কি উত্তর দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্দরের দিকে আমার বিদুষী গৃহিণীর সন্ধানে ছুটিলাম। আজ একটা বোঝা পড়া করিতেই হইবে। এ ঘর ও ঘর করিয়া কোথাও না পাইয়া শেষে রান্নাঘরের ভিতর প্রেয়সীকে আবিষ্কার করিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ওগো বাইরে কে এক পোড়া মুসলমান এসেছিল। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ ত? ঝি বল্লে যে সেটা ডাকাত। আমরা ভয়ে রান্নাঘরের ভেতর কপাট বন্ধ করে' বসে আছি। ডাকাতটা গেছে ত? কিছু নিয়ে যায় নি ত?"

এত দুঃখেও হাসি আসিল। দৃঢ়তার সহিত হাসি চাপিয়া কঠোর রূঢ়স্বরে বলিলাম "আমি তাকে কেন তাড়াতে যাব? আর আমি তাড়ালেই বা সে যাবে কেন? তুমি তাড়াও গে যাও।"

কিরণ—ওমা! সে কি গো? আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি কি-গো? তোমার আজ হয়েছে কি? আমি সে ডাকাতটাকে নেমন্তন্ন করেছি?

আমি—না ত কি? এই বিজ্ঞাপনটি কে দিয়েছিল—আমি? রাগিয়া খবরকাগজখানা একটু সবেগেই কিরণের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

ঔৎসুক্যের আধিক্যহেতু কিরণ আমার এই দুঃসাহসের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিজ্ঞাপনটি পড়িল। ব্যাপারটা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উৎফুল্ল ভাবে বলিল "এ বিজ্ঞাপন আমিই দিয়াছিলুম কিন্তু তা'বলে অমন ডাকাতটাকে গাড়ী ঘোড়া বিক্রী করব বলেছিলুম কি?

আমি—বলি টাকা দিয়ে জিনিষ কিনবে তা মন্দ-চেহারার লোককে যে তুমি জিনিষ বিক্রী করিবেনা, একথাটা ত তা'র জানা ছিল না, থাকলে হয়ত আসত না। এখন কি করবে কর। সে গাড়ী ঘোড়া দেখে তবে দর-দাম করতে চায়। এখনি তাকে মাল দেখাতে হবে। এখন কি করে তাকে বিদেয় করবে কর। গাড়ী ঘোড়া কোথায় তার ঠিক নাই খদ্দের ডেকে হাজির! একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

এতদিনে বোকারাম বলার শোধ লইয়াছি মনে করিয়া একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। কিরণ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল "তা—আমি কি করব। গাড়ী ঘোড়া কোথায় রাখবে, কি করবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলে, তাই না আমি ও রকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আজ যেমনি গাড়ী ঘোড়া এসে পড়বে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিক্রী করে দেব। রাখবার জন্য আর তোমার কোনই ভাবনা ভাবতে হবে না। ভাগ্যেতেই না আমি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলুম, এখন রাগ করলে কি করব?

বিচিত্রতা-অন্তর্হিত ভগ্ন ইষ্টকস্তুপ, দেব দেবীর নামীয় স্থান, এবং শুষ্কপ্রায় সরোবর, এবং জন কোলাহলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর নীরবতাময় জঙ্গল—যাহাতে শ্বাপদ সমাগম শঙ্কায় পর্য্যটকগণকে সতর্ক পদ বিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা দৃষ্টে, এবং ধন-জন-মর্য্যাদা-বিহীন উচ্চ বংশের বংশধরগণের কীট-দুষ্ট পুরাতন দলিল ও তাহাদের ক্ষীণ জ্যোতি ও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দৃষ্টে যতদূর সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

মানসিংহের এদেশে আগমনের কারণ।

১। বাঙ্গলার পাঠান শাসনকর্ত্তা সামসুদ্দিনের সময় ধীরে ধীরে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্নাংশে ভৌমিকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াস পান। ষোড়শ শতাব্দির মধ্য ভাগে সমুদয় ভৌমিকগণের অভ্যুদয় হয়। সম্রাট আকবর সাহের রাজত্ব কালে এই সমুদায় ভৌমিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া, আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হন এবং আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশজন ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাহারা এক সময়ে যেরূপ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিল তাহা আজিও বঙ্গের কুটীরে কুটীরে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল রাজবিদ্রোহী ভৌমিকদিগের মধ্যে সাঁতৈল-রাজ রামকৃষ্ণ গঙ্গানদীর উত্তরে, যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য গঙ্গার দক্ষিণে, এবং চাঁদ রায় কেদার রায় প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধিস্বরূপ মুসলমান নবাব দ্বারা বঙ্গ দেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার সাধারণ প্রজা ও দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত; এইজন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনতায়, পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসৈন্য ও তাহাদের গমনোপযোগী যান সকল প্রস্তুত থাকিত। আইন্‌—ই—আকবরি গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী ৮০১১৫০ জন পদাতিক ১৭০ টী হস্তী, ৪২৬০ টী কামান, ৪৪৮০ নৌকা, সম্রাটের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে পারিতেন। আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে, তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সহিত ঐ সকল ভূম্যাধিকারীর অসম্মিলন এবং রাজা টোডর মল্লের অন্যায় বন্দোবস্ত ভূম্যাধিকারীদিগের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই সকল বিদ্রোহ দমনার্থ রাজা মানসিংহ রাজপ্রতিনিধিরূপে এদেশে আগমন করেন।

২। পাল বংশের রাজত্বকাল হইতেই উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিবিধ পার্ব্বত্য দস্যুদল নিয়ত বারেন্দ্র ভূমির উপর আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিল। ঐ সকল দস্যুদিগের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য করতোয়াতটে নানা স্থানে প্রান্ত দুর্গ বর্ত্তমান ছিল। অত্যাপি স্থানে স্থানে ঐ সকল পুরাতন দুর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চাটমহর থানার অধীন নবগ্রাম বা নওগাঁয় ঐরূপ দুর্গের ভগ্নাবশেষ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় কতকগুলি বলবান নির্ভীক সাহসী ব্যক্তিও দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করিত। ইহাদিগের মধ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নিমগাছি নিবাসী বেণীমাধব রায় ওরফে পণ্ডিতা ডাকাইত নামক জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরমাসুন্দরী পত্নীকে একজন মুসলমান সর্দার হরণ করায় ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া নানা জাতীয় কতকগুলি হিন্দু লাঠিয়াল জোটাইয়া এক ডাকাইতের দল সৃষ্টি করিয়া সমস্ত বারেন্দ্রভূমিতে ডাকাইত করিতেন। তাঁহার অত্যাচার শেষে এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহার এই অত্যাচার কাহিনী সুদূর সম্রাট দরবারে পৌছিলে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সম্রাট রাজা মানসিংহকে এদেশে প্রেরণ করেন।

৩। ঐ সময় বর্ত্তমান পাবনা অঞ্চলে "পবনা" ডাকাইত, রামা শ্যামা ডাকাইত, লোকের প্রতি অত্যাচার, গৃহদাহ, রমণী হরণ, চুরি, ডাকাতি রাহাজানী প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিয়া অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল দুষ্ট দলপতির অধীনে বহুসংখ্যক

লাঠিয়াল যোদ্ধা ছিল। ইহারা আবশ্যকমত ভৌমিকদিগের সৈন্যের কার্য্যও করিত। সাঁতৈল রাজ রামকৃষ্ণের, বরবার "মধা" বা "মরে" রাজা, ধলসরের 'জাণ্ড' রাজা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদিগের অধীনতায় ইহারা ক্ষুদ্র বংশ দণ্ডের অসীম শক্তি প্রদর্শন করাইত। এখনও এই পূর্ব্ববঙ্গে মহরম প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে মুসলমান ও অন্য নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ লাঠিখেলার নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করাইয়া অর্থ গ্রহণ করে। এই লাঠিখেলায় সময় কি প্রকারে লাঠি দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে ও আততায়ির অত্যাচার হইতে কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে তাহার কৌশল প্রদর্শন করায় এবং মাল ক্রোক ও উভয় পক্ষীয় জমা জমি লইয়া বিবাদের সময় লাঠি চালাইবার নানারূপ কৌশল ও ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে। কিম্বদন্তী এই যে এদেশের জমিদার বা ভূম্যধিকারীদিগের অধীনতায় যে সকল লাঠিয়াল থাকিত জমিদারগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর বাহির হইলে অথবা বিবাহ উৎসবে ঐ সকল লাঠিয়াল তাহাদের সহিত কুচ-কাওয়াজ করিতে করিতে গমন করিত। বর্ত্তমান পরদার জমিদারের অধীনতায় বহু লাঠিয়াল থাকিত। ইংরাজ রাজত্বের কিছু দিন পর্য্যন্তও ঐ জমিদারগণ রাজপ্রতিনিধির সাক্ষাৎ সময়ে ৩০০ শত লাঠিয়াল লইয়া গমন করিত এবং তাহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ছিল।

এই সকল লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওস্তাদ থাকিত। প্রত্যেক সমাজে বা দুই তিন গ্রাম লইয়া একজন ওস্তাদ থাকিত। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে ছোট বড় ভেদে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত, এবং কোন কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তাহার পদ বন্দনা করিয়া এবং সাক্ষাৎ না পাইলে তাহার নাম স্মরণ করিয়া যাইত। গারসি রাত্রে বা তৎপর দিবস প্রাতে এই সকল লাঠিয়ালদিগের পরীক্ষা হইত; এবং গুণানুসারে "সর্দ্দার", "বীর", "হাতী" প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করা হইত। অবস্থাপন্ন লোকে ও আমোদপ্রিয় লোকে ইহাদিগকে কাপড়, শাল বনাত প্রভৃতি কেহ কেহ বা অর্থও উপহার দিত। এখনও গারসি রাত্রে পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে লাঠিখেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সকল লাঠিখেলার জন্য ঢোলও কাঁসির বাদ্য হইত। ওস্তাদ বাদ্যকরগণ ঠিক মত খেলা সম্পন্ন করিতে পারিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইত। ভাল ঘন গিঁটযুক্ত সোজা শিলা বংশ দণ্ডের দ্বারা এই সকল লাঠি প্রস্তুত হইত এবং তাহার গিঁট গুলি সুন্দররূপে পালিস করিয়া তৈল দ্বারা পাকাইয়া কাল করা হইত তাহাতে বংশদণ্ড পাকিয়া সুন্দর ও দৃঢ় হইত। কেহ কেহ বা রৌপ্য দ্বারা লাঠি বাঁধাইয়া লইত। এপ্রকার লাঠি প্রত্যেকেরই অন্ততঃ একখানি করিয়া থাকিত; এতদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী বা জমিদারদিগের ঘরে বহু পরিমাণে জমা থাকিত; এবং আবশ্যক মত তাহার সদ্ব্যবহার করা হইত। ছোট, বড় চিকণ, মোটা নানা প্রকারের লাঠি প্রস্তুত হইত ও ঐ সকল লাঠি প্রত্যহ রোজ মাজা ঘসা ও তৈলসিক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক সুরক্ষিত স্থানে রাখা হইত।

এক কালে যে বংশদণ্ড দেশশাসনকার্য্যে বা বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিত, এক্ষণে কুকুর, বিড়াল, ক্ষুদ্র হিংস্র জন্তু তাড়াইবার জন্যও তাহা কাহারও এক খানা নাই বা থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান রাজবিধান সে বিধানের উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ জনসাধারণকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছেন। এককালে এই বংশদণ্ড দ্বারাই ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি নিহত হইত; এক্ষণে পালে পালে শূকর কৃষকের কষ্টার্জ্জিত ক্ষেত্রশস্য নষ্ট করিতেছে কিন্তু তাহাকে তাড়াইবার বা বধ করিবার কোন শাসন দণ্ড বর্ত্তমান নাই। রাখিলেও রাজশক্তির মুখপাত্র গ্রাম্য ক্ষুদ্র রাজ কর্ম্মচারীও তজ্জন্য পীড়ন করিয়া থাকে; এবং গোপনে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা তাহাকে রক্ষা করিতে বলিয়া থানার বাবুদিগকে সংবাদ দেয় ও নিজের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া লাঠিরক্ষাকর্ত্তাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই প্রকারে সে শক্তিশালী বংশদণ্ডের বাঙ্গালার প্রতি ঘর হইতে বিলোপ হইয়াছে। কোন কালেই সেরূপ বংশদণ্ডের আর নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা

নাই। বাঙ্গালী কোন সময়ে ঐরূপ ক্ষমতা পাইলেও, তখন আর তাহা চালনা করিবার শক্তি কিছুতেই পাইবে না। "যে যায় হারায় তাহা পুন নাহি পায়।"

ঐ সকল পাঠিয়ালগণ অত্যন্ত সাহসী ও বলশালী ছিল। ইহাদের দলে মুসলমান, চাঁড়াল, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি ছিল। এবং বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ উচ্চ বংশোদ্ভবগণও এইরূপ লাঠির কৌশল অভ্যাস করিয়া ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। এইরূপে ডাকাতি করিয়া এই দেশের অনেক ব্যক্তি পরবর্ত্তী সময়ে জমিদারী আইন কানুনে জমিদার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন ভূম্যধিকারীর সদর খাজনা নবাব সরকারে পাঠাইবার সময় তাহা লুণ্ঠন করিয়া নিজ নামে সম্পত্তি গ্রহণ করার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা জল স্থল উভয় স্থানেই দস্যুতা করিত। পথিকদিগের গলায় গামছা মোড়া দিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিত। এখনও পাবনা জেলার কোন কোন উচ্চ বংশে "গামছা মোড়া" বলিয়া অখ্যাতি আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। জলপথে দস্যুতা করার জন্য ইহাদের লম্বা ছিপ নৌকা থাকিত। ইহারা ডাকাতি করিয়া যাইবার পূর্ব্বে মহা সমারোহে কালী পূজা করিত ও তাহাতে সময় সময় নরবলিও দিত। ইংরাজরাজের সুশাসনে এই সকল ডাকাইত দলের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধন হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল ডাকাইতদিগের বাড়ী, কালীবাড়ী, পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ ভূমি খণ্ড, ইষ্টক স্তূপ এখনও কিম্বদন্তী জনশ্রুতি ও জমিদারদিগের দলিলাদিতে অবগত হওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সকল ডাকাইতদিগের চুরি, রাহাজানী প্রভৃতি এত বৃদ্ধি পায় যে, জনসাধারণের হাহাকার সুদূরে সম্রাটের কর্ণগোচর হইয়াছিল। আকবর বাদসাহের সময় পর্য্যন্তও এই সকল দস্যুদল দমন হয় নাই; কারণ তৎকালীন জমিদার ও ভৌমিকগণ তাহাদিগকে দমনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন।

৩। বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ পাঠান উড়িষ্যায় বাস করিতেছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই বাঙ্গলা দেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। এবং বাঙ্গলা দেশে আপতিত হইয়া লুণ্ঠনাদি অত্যাচার করিত। যে সময় বাঙ্গলা দেশের লোক তাহাদিগের জন্যও অত্যন্ত অশান্তিতে কাল যাপন করিত।

আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃঃ অব্দে সেলিম জাহাঙ্গির নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গির পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ভৌমিকগণের বীরত্বকাহিনী জ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশই তাহাদের উদ্ধত ব্যবহারের কথা তাহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল; বিশেষতঃ এই সময় হুগলীতে অবস্থিত বাদসাহের কর্মচারী যশোর রাজ—প্রতাপাদিত্যের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বাদসাহ কর্ণগোচর করেন। এই সময় প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায়ও দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে প্রতাপাদিত্যের দুর্ব্যবহারের কথা নিবেদন করেন। বাদসাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাইশ জন আমিরসহ এবং বহু গজাশ্বনিযুক্ত বাদসাহী সৈন্যসহ ঐ সকল বিদ্রোহী ভৌমিকদিগের দমনার্থ এবং অত্যাচারী দস্যু ও পাঠানদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ অম্বরাধিপতি রাজা মান সিংহকে দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন।

মান সিংহ ১৬০৫ খৃঃ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া বহু গজাশ্বাদিযুক্ত রণসম্ভার ও সৈন্যাদি লইয়া প্রথমে পূর্ব্ব বঙ্গের ডাকাইত ও ভৌমিকদিগকে দমনার্থ ঢাকা অভিমুখে গমন করেন। এই অভিযান সময়ে বর্ত্তমান পাবনা জেলার দেড় মাইল পশ্চিমে ছাওনি গ্রামে গঙ্গা নদী তীরে এক ছাওনি করেন, বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে; রেনেল সাহেবের ম্যাপ ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ম্যাপ দৃষ্টে বোধ হয় ঐ সময় ঐ স্থান দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল। ম্যাপেও ঐ স্থানে পুরাতন গঙ্গা নদীর ড্যাম্স বলিয়া উল্লেখ আছে।

ঐ সময় এই গঙ্গা হইতে চাট মোহর, ধামার, অষ্টমণিষা, হাণ্ডিয়াল পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থান জলময় ছিল। ক্রমে বহু [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোঁতা ও গঙ্গা নদী

উল্লিখিত ডামস রাখিয়া দক্ষিণে নদীয়া জেলার উত্তর পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ গঙ্গা নদী পদ্মানদী নাম করণ হইয়া পুনরায় পাবনা জেলার ভিন্ন প্রদেশে উপনীত হইয়াছে এবং পদ্মার পলি মাটিতে ঐ সকল খাল বিল, নদী ও ডামস শুষ্ক হইয়া এক্ষণে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান জলময় হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি একাল পর্য্যন্ত জাগরুক করিতেছে। যে স্থানে মানসিংহ ছাওনি করেন বলিয়া জনশ্রুতি ও ভগ্নাবশেষ ইষ্টক স্তূপ ও মানসিংহের নামীয় কালী বাড়ী, পুষ্করিণী প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ স্থানে মানসিংহের ছাওনি করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই স্থানেই পবনা ডাকাইতের লীলা ক্ষেত্র ছিল এবং তৎকালে এই সকল স্থানে সাঁতৈল রাজা রামকৃষ্ণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং বিখ্যাত রামা শ্যামা ডাকাইতগণ ও এই জেলার স্থানে স্থানে তাহাদের অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে স্থানে রাজা মানসিংহ ছাওনি করেন বহুকাল পর্য্যন্ত সে গ্রাম "ছাওনি" নামেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্তও ঐ স্থান ছাওনি বলিয়াই উল্লিখিত হইত। রাণী ভবানীর দত্ত পুরাতন ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে ছাওনি শব্দেরই উল্লেখ আছে। মানসিংহ এস্থানে আসিবার পূর্ব্বে এই সকল স্থান সাঁতৈল রাজের অধিকারভুক্ত ছিল; পরে সাঁতৈল রাণী, রাণী সর্ব্বাণীর ও কোন কোন স্থান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সীতারাম রায়ের ও তৎপর নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় পুরাতন দলিলাদি দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১০১৪ সালের জাহাঙ্গির বাদসার মোহর সম্বলিত ফার্সিতে লিখিত এক দানপত্র সাঁতৈলরাণী বা সন্ন্যাল বংশের অন্যতম শাখার পূর্ব্বপুরুষ রাজারাম শর্ম্মার নামে এখনও কীটদষ্ট অবস্থায় তাঁহার বংশধরগণের গৃহে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তাহাও মানসিংহের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী সময়ের। তৎপর ১১০২ সালের পরগণে ধুলদি সরকার মহম্মদাবাদ উল্লেখে সীতারাম রায়ের মোহর সম্বলিত দানপত্রেও ১১১৪ সালের সাঁতৈল রাণী সর্ব্বাণীর ভূমি দান পত্রে ছাওনি শব্দেরই উল্লেখ আছে।

কালক্রমে ঐ ছাওনি" শব্দের ও-কার ত-রূপে পরিণত হইয়া এক্ষনে ছাওনির স্থলে উক্ত স্থান ছাতনি নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পুরাতন ছাওনির ভগ্নাবশেষ ইষ্টকস্তূপ কিম্বদন্তীতে রাজা মানসিংহের ছাওনি বলিয়া একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে! ঐ সময় এইস্থানে কোন বাসস্থান ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু এই স্থানের প্রায় একমাইল উত্তরে যে সকল পুরাতন ভিটা "ডাকাইত মারীর ভিটা" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে তাহাতে বোধ হয় ততদুর পর্য্যন্ত নদীই ছিল; পরে ক্রমে চড়া রাখিয়া নদী দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং বর্ত্তমান পদ্মার চরের ন্যায় বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মৃত্তিকা পরিষ্কার এবং কূপাদি খননে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই সময় বর্ত্তমান পাবনা প্রভৃতি স্থানে কোন জন পদ থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১৫৮০ খৃঃ রাজাটোডর মল্ল, ১৬৫৮ খৃঃ সুলতান সুজা, ১৭২২ খৃঃ মুরসিদ কুলি খাঁ সমস্ত বাঙ্গলা দেশ সরকার, পরগণা, চাকলা, মহাল, মৌজা প্রভৃতিতে বিভাগ করেন। তাহাতে সমৃদ্ধশালী পাবনায় কোন স্থান বর্ত্তমান ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য বোধ হয় মানসিংহের আগমনের পরেই এই সকল স্থান বহুজনসঙ্কুল পণ্যসম্ভারসমান্বিত নগরে পরিণত হইয়া ছিল।

রাজা মানসিংহ দ্বিতীয় বার বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তা হইয়া এদেশে আগমন করিয়া মাত্র ৮মাস কাল এদেশে বাস করিয়া ছিলেন; সুতরাং এই অল্প সময় মধ্যে তাঁহার এত কীর্ত্তি এস্থানে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। আকবর বাদসাহের সময়ও তিনি পূর্ব্ববঙ্গে অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই কারণ উড়িষ্যা বেহার প্রভৃতি স্থানেই ঐ সময় তাঁহাকে নানা প্রকার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কালী বাড়ী, রাজার, জঙ্গল, দীঘিকা, উপাধি ও জায়গীরাদি দেওয়া

দৃষ্টে বোধ হয় তিনি নিতান্ত কম দিন এখানে বাস করেন নাই; ডাকাইতদিগকে দমন, সাঁতৈল রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন, ইত্যাদি কারণে তাঁহার অথবা তাঁহার অমাত্য দিগের এস্থানে দীর্ঘ দিন বাস অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান এই ছাওনির পশ্চিমপার্শ্ববর্ত্তী পাড়া বা গ্রাম হেম্মৎপুর বা হেম্মাতপুর, এক্ষণে যাহা হিমাইতপুর বলিয়া বিখ্যাত তাহা তৎকালীন রাজা মানসিংহের সহ-কারী বাইশ জন আমিরের মধ্যে হেম্মৎ খাঁ নামক আমীরের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া একাল পর্য্যন্ত কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। রাণী সর্ব্বাণী ও তৎপরে রাণী ভবাণীর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে "হেম্মতপুর" নামই লিখিত আছে। হিমাইতপুরে খাঁ উপাধিধারী সেই সময়ের মুসলমান বংশ কয়েক ঘর এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহাকে খাঁ পাড়া বলে। ক্রমে তাহারা এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগের সহিত সামাজিকসূত্রে মিলিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা সে কালীন পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া খ্যাতি বর্ত্তমান আছে।

এই ভগ্নাবশেষ ছাওনির উত্তর দিকে একটী অপ্রশস্ত, নাতিদীর্ঘ নিম্ন জোলা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জমিদারের চিঠা ও দলিলাদিতে তাহাকে দ্বারনদী বলে। সম্ভবতঃ গঙ্গা হইতে খাল কাটিয়া রাজবাড়ীর ভিতর দ্বার পর্য্যন্ত আনা হইয়া ছিল।

মৌজে বাজার ও বাজারিয়া ঘাট বলিয়া দুইটী স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দলিলাদিতে এবং জনশ্রুতি তাহা মানসিংহের বাজার ছিল বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে।

মানসিংহের স্থাপিত বহু দেবীর ভগ্নাবশেষ বাড়ীতে এখনও এস্থানের লোকে পূজা ও বলি দিয়া থাকে। তন্মধ্যে "মদন কামদেব" ও মানসিংহের কালী বাড়ী" দুইটী এখনও লোকে মান্য করে ও পূজা দেয়।

জনশ্রুতি যে এই স্থানের দুই ক্রোশ উত্তরে ময়েপাড়া গ্রামে যে মঘা বা ম'রে রাজার বাড়ীর ভগ্নাংশ শেষ বর্ত্তমান আছে, উক্ত রাজার অনেক লাঠিয়াল ও পোষা ডাকাইত ছিল। মানসিংহের আগমনে উক্ত রাজা তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাহার কন্থার সহিত রাজা মানসিংহের বিবাহ হয়। ঐ স্থান বিলের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, সেজন্য মানসিংহ তথা হইতে ছাওনি পর্য্যন্ত এক সুবৃহৎ রাস্তা প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে এবং রাজা মানসিংহের জাঙ্গাল নামে বিখ্যাত।

এতদ্ব্যতীত এই ছাওনির চতুষ্পার্শ্বে বহু স্থানে বহু পুকুর ও দীঘি বর্ত্তমান আছে; তাহা মানসিংহের প্রস্তুত দীঘি ও পুকুর বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে।

জনশ্রুতি যে ব্রজমোহন রায় রাজা মানসিংহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজা মানসিংহ এখান হইতে ঢাকা গমন করিলে তাঁহার অমূলক মৃত্যুসংবাদ প্রচারে তিনি তদীয় বহু ধন রত্ন লইয়া পলায়ন করেন। পাবনার জোড় বাঙ্গলা ইঁহারই প্রস্তুত। কেহ কেহ বলেন মানসিংহ এখানে আসিলে ব্রজমোহন রসদাদি সরবরাহ করিতেন এবং পরে ক্রোড়পতি হন; সেজন্য তাহার নাম ব্রজমোহন ক্রোড়ী নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্বে পাবনার নিম্নগামী ইচ্ছামতী নদীর বাঁক অত্যন্ত বক্র ছিল; সেজন্য পদ্মানদী হইতে সহজে ইচ্ছামতী নদীতে যাইবার জন্য পদ্মা হইতে ইচ্ছামতী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্রে সাহেবের কুঠীর দক্ষিণ দিয়া এক খাল ঐ সময় কর্ত্তিত হইয়াছিল ও সে দিক দিয়া সহজে নৌকা যাতায়াত করিত ও মানসিংহের রসদাদি ঐ রাস্তায় গমন করিত। ঐ খাল এখনও কোষাখালি নামে বিখ্যাত।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অষ্টমনসা প্রভৃতি অনেক গ্রামের বহু ব্যক্তি মানসিংহের প্রদত্ত উপাধি ও জায়গীরাদি পাওয়ার অনেক নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বে যে স্থানে রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধিগণ গমন বা অবস্থান করিতেন সে স্থান বহুজনসঙ্কুল বিপণিপূর্ণ মনোরম নগরে পরিণত হইত। নানা স্থান হইতে নানা দেশীয় লোক সেই নগরে ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরী প্রভৃতির জন্য বসতি স্থাপন করিয়া থাকে।

কুসুমাঞ্জলী ও তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের সমাজসংস্কারক পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর নিম্নতন পঞ্চম পুরুষ সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ ভাদুড়ী এবং দামনাশের শিখাই সান্ন্যাল বাঙ্গলার নবাব সামসুদ্দিনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্যেই সামসুদ্দিন ৭৪৩ হিজরীতে সাঃ অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ঐ সকল ভাদুড়ী এবং সান্ন্যালগণের সহায়তায় ও চেষ্টাতেই তিনি স্বাধীন হইয়াছিলেন ; এজন্য সামসুদ্দিন তাঁহাদিগকে দুইটী প্রকাণ্ড জায়গীর প্রদান করেন। এই জায়গীর হইতেই চলন বিলের দক্ষিণে সান্ন্যালগড় বা সাঁতোড় বা সাঁতৈল রাজবংশের সৃষ্টি।

এই রাজবংশের শেষ রাজা রামকৃষ্ণ এবং তাহার স্ত্রী রাণী সর্ব্বাণী। রাজা মানসিংহ যেস্থানে ছাওনি করেন ঐ স্থান পর্য্যন্ত অর্থাৎ গঙ্গা নদীর উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত সাঁতৈল রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা মানসিংহের ছাওনি করার পরবর্ত্তী কালেই উক্ত সান্ন্যাল বংশের বংশধর রাজারাম শর্ম্মা রাণী সর্ব্বাণীর নিকট বহু ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সেই বংশের বংশধরের গৃহে রাণী সর্ব্বাণীর বহু দানপত্র এখনও কীট-দষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

এই ভাদুড়ী বংশের অন্যতম শাখা বর্ত্তমান হিমাইতপুরের চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মোহন বল্লভ ভাদুড়ী * সাঁতৈল রাজার নিকট হইতে বহু ব্রহ্মোত্তর ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে তৎকালে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুই বংশের বংশধরগণই এই ছাওনির আদিম অধিবাসী। তাহাদের গৃহে এখনও ঐ সময়ের কীট-দষ্ট বহু পুরাতন দলিল বর্ত্তমান আছে। এবং সেই সকল দলিলই এই আখ্যায়িকার মূল ভিত্তি।

এককালে যে স্থান রাজসমাগমে নানাপ্রকার বাণিজ্য ও আমোদ আহ্লাদে ও জনকোলাহলে মুখরিত থাকিত, সে স্থান কিরূপ সৌন্দর্য্যশালী ছিল তাহা লোকচক্ষুর অতীত হইলেও সকলেরই মানসপটে সে স্মৃতি জাগিয়া উঠে ; সুতরাং তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কালের কুটীল চক্রে সেই আনন্দকোলাহলের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর নীরবতাময় জঙ্গলাচ্ছাদিত ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকস্তূপ ও জনশ্রুতি সেই মহাপ্রতাপান্বিত বঙ্গশাসনকর্ত্তা অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহের অতীত গৌরব ও সৌধ-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছে।

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৮ চৈত্র সংখ্যা— পণ্ডিত মোহনবল্লভ ভাদুড়ী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সন্তবাণী

(জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ-সংগ্রহ।)

ধনবান সেও ত দুঃখী ; আর নির্ধন—সে ত দুঃখের কূপ। ভগবানের চরণে দীন ভক্তজন ছাড়া আর কেহই এ জগতে সুখী নয়।

(সহজো বাঈ।)

* * *

কামারের সাঁড়াশা—এই আগুনে, এই জলে। মানুষের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। এই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ পার হতে পারলেই ত মানুষ।

(সহজো বাঈ।)

* * *

জিভ্ যেমন মুখের মধ্যে থাকে, এ সংসারেও ঠিক তেমনি ভাবে থাক্‌বে। জিভ্ কত ক্ষীর সর নবনীর আস্বাদ নিয়ে থাকে; কিন্তু তবুও ত সরু মোটা হয় না।

(সহজো বাঈ।)

* * *

ভগবান অঙ্গসঙ্গ আছেন এ দৃঢ় বিশ্বাস যার আছে তার কখনও চিত্ত ভঙ্গ হয় না।

(কবীর।)

* * *

স্ত্রীর লাজ যেমন পতির, ভক্তজনের লাজ তেমনি ভগবানের; তিনি সব রকমেই ভক্তজনকে রক্ষা করে থাকেন।

* * *

চার জন ভক্ত মিলে একদিন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীভক্ত ছিলেন। কথায় কথায় খাঁটি ও পূর্ণ ভক্তি কাকে বলে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠল। একজন বললেন যে খাঁটি ও পূর্ণ ভক্তির লক্ষ্য এই যে ভক্ত দুঃখ কষ্টকে ভগবানের দেওয়া মনে করে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করে থাকেন। স্ত্রী ভক্ত বললেন "না, তা নয়—এতে অহঙ্কারের গন্ধ আছে। আর একজন বললেন—"যে দুঃখ কষ্টেও ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর গুণগান করে সেই প্রকৃত ভক্ত।" তখন সেই স্ত্রীলোকটি বললেন, "এর চেয়ে যদি কিছু বড় থাকে ত তাই বল।" তৃতীয় ব্যক্তি তখন বললেন, "যে দুঃখ কষ্ট মালিকের দেওয়া মনে করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, তার ভক্তিই খাঁটি।" স্ত্রীভক্ত এ উত্তরেও সন্তুষ্ট হলেন না; এর চেয়ে যদি কিছু বড় থাকে তাই তিনি শুনতে চাইলেন। অপর তিন জন আর কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না; তাঁরা বললেন, "আপনিই বলুন, আমরা ত আর কিছু ভেবে পাই না।" তখন সেই স্ত্রীভক্ত বললেন,—"যিনি ভগবানের ধ্যান স্মরণে এমন মগ্ন থাকেন যে দুঃখকষ্টের খেয়ালই তাঁর মনে উদয় হয় না, তিনিই যথার্থ ও পূর্ণ ভক্ত।" সকলেই স্ত্রীভক্তের এই উত্তর শুনে বড়ই খুসী হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলেন।

* * *

এক কুলীন মহাত্মার একটী ভক্তিমতী সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হলে তিনি তার জন্য একটী সৎপাত্র খুঁজতে লাগলেন। অনেক ধনীসন্তান মেয়েটিকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তাঁর কাছে আনাগোনা করতে লাগলো। কিন্তু মহাত্মাজী সবাইকে উপেক্ষা করে একজন গরীব ভক্তের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর মেয়েটী বাপের কাছে বিদায় হয়ে পতির ঘরে এসে উপস্থিত। এসেই দেখে যে একটী ঘরে আধখানা রুটী ও আধ গেলাস জল আছে। তখন সে তার স্বামীকে জিজ্ঞেস কর্‌লে "এসব এখানে রেখেছ কেন? তার স্বামী বল্‌লে" কাল আধখানা রুটী ও আধগেলাস জল খেয়েছি, বাকীটুকু আজকার জন্য রেখে দিয়েছি।" এইকথা শুনেই মেয়েটি বাপের ঘরে যেতে চাইল; তখন সে গরীব বেচারা বল্‌লে—"এ ত আমি আগেই জানি তুমি বড়ঘরের মেয়ে; এ গরীবের সঙ্গে তোমার পোষাবে কেন?" তখন তার স্ত্রী উত্তর দিল, "না, না—তা নয়। বাবা বলেছিলেন যে এক জন বিশ্বাসী ভক্তের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন; আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই কি বিশ্বাস? ভগবানের উপর এমন ভরসা নাই যে কাল কি খাব তার জন্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে?" এই উত্তর শুনে স্বামী ত প্রথমে অবাক্। তার পর ভগবান্ যে তাকে এমন স্ত্রীরত্ন দিয়েছেন তাই মনে করে তার চোখে জল এল। ভক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে বল্‌লে—"তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভক্তি বিশ্বাস এখনও খুব কাঁচা। তাই ভগবান্ দয়া করে আমার শিক্ষার জন্য তোমাকে এ দীনের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে চুপ্ করে রইল; আর বাপের বাড়ীর নামটিও কর্‌লে না।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যাবর্ত্তন। *

(ক)

"আর ওষুধ খাব না।"

"কেন কমলা ?"

"কেন তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না—"

"ছিঃ কমলা, ও কথা বলতে আছে। ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।"

কমলা একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল "আর কেন ওষুধ খাওয়াবে ? ওষুধ খেয়ে কি আর বাঁচব—বরং জ্বালা বাড়বে।"

"ওষুধ খেলে কি তোমার জ্বালা বাড়ে কমলা" ? তবে আর ওষুধ খাওয়াব না—" কথা গুলিতে যে কত খানি বেদনা ও অভিমান মিশ্রিত ছিল কমলার তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার কথাগুলি স্বামীর বুকে এমন শেলের মত আঘাত করিবে। তাহার প্রাণের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল—কহিল, "কই দাও।"

ওষুধ সেবন করিয়া কমলা কহিল "মাধু কোথায় ?" বিনোদ ঔষধের শিশি এবং গেলাস টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কমলার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কহিল "কেন ?" "তারা বুঝি ঝিয়ের কাছে আছে ?"

"হ্যাঁ কমলা ; তাদের কি ডেকে দেব ?"

"না থাক্" বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কমলা পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান বিনোদবিহারী আজ পাঁচ বৎসর হইল কমলাকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই কমলা এই গৃহের কর্ত্রী। বিনোদের সংসারে কেহ ছিল না বাল্যকাল হইতেই সে মাতৃ-হীন ; সংসারে অন্য কেহ ছিল না বলিয়া কমলার দ্বিরাগমনের পর হইতেই সংসারের সমস্ত ভার তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তাহার দুইটি সন্তান, প্রথম মাধুরী আড়াই বৎসরের,—দ্বিতীয়টী—খোকা, এক মাসের ; তাহার জন্মের পর কমলা, শয্যাগত।

অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। বিনোদ ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়াও কমলাকে বাঁচাইতে পারিল না। সেদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা ; সারাদিন আকাশ গুমট থাকিয়া বৈকাল হইতে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে। কমলার অবস্থা বড় খারাপ। বিনোদ গালে হাত দিয়া কমলার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ভাবিতেছিল ; কন্যা মাধুরী মায়ের কোলের নিকট বসিয়া, মুখ পানে চাহিয়া কখন হাসিতেছিল, কখন বা তাহাকে ঠেলিয়া মায়ের কোলে শয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। বিনোদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাহার প্রাণে আজ গভীর আঁধার নামিয়াছে। আষাঢ়ের সন্ধ্যার মত তাহার মুখখানি ম্লান ও বিষণ্ণ। সে একদৃষ্টে কমলার মুখপানে চাহিয়া ডাক্তারের কথা ভাবিতেছিল। হায় ! ডাক্তার যে আজ জবাব দিয়া গিয়াছে।

কমলা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, স্বামী বিষণ্ণমুখে তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছেন। সে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া কহিল "ওগো অত ভাবছ কেন ? অত ভেবো না, আমি যাচ্ছি ; আবার আসব ; তোমায় ফেলে কি থাকতে পারি ?" কমলার চক্ষে ধারা প্রবাহিত হইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল "তুমি পুরুষ মানুষ, যদি একটুতেই কাতর হবে তা'হলে আমি চলে গেলে এদের দেখবে কে ? আহা এরা যে—"কমলা আর বলিতে পারিল না একটা চাপা রোদনের দীর্ঘশ্বাস তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপাইয়া দিল। বিনোদ এতক্ষণ নিজেকে কোন মতে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না ; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। কমলা খানিক মৌন রোদনের পর একটু সুস্থ হইয়া কহিল, "ছি কেঁদনা, এরা রইল, এদের খুব যত্ন ক'রো, আহা—হ্যাঁ দেখ, ঐ আলমারীর মধ্যে আমার গলার হার আছে, মা বিয়েয়

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সময় যে নূতন নেকলেস দিয়েছেন তা বাক্সর মধ্যে রেখেছি, সমস্ত গহনা ছেলে মেয়ের বিয়েতে ভাগ করে দিও; তবে নেকলেসটা মাধুরীকে দিও আর একটী কথা—বিয়ে হওয়া অবধি তুমি যে সব চিঠি লিখেছিলে, সেগুলো একটী নীল ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছি। সেটা আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে যে বাক্স আছে তার মধ্যে আছে; দেখো, সেগুলো নষ্ট কোরো না।" কথাগুলি বলিয়া কমলা অত্যন্ত হাঁফাইয়া পড়িল। বিনোদ তাড়াতাড়ি একটু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন; কিন্তু সে ঔষধে আর কোন উপকার হইল না; কমলা ক্রমে ২ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। আর কথা ফুটিল না। মধ্যরাত্রে একবার স্বামীর পানে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

(খ)

বাড়ীর পাশে নরেশ বাবু প্রফেসর বাস করিতেন। তিনি এবং তাহার পত্নী বিনোদের বিপদের সময় যথেষ্ট সাহায্য করিলেন—ছেলে মেয়েদের দেখা শোনা, আদর যত্ন, দিন কতক বেশ চলিল। কিন্তু মানুষের যখন ভাগ্য বিপর্য্যয় হয় তখন তাহাকে চারিদিক হইতে দুঃখ কষ্ট যেন গ্রাস করিয়া বসে। নরেশ বাবুর নিকট হইতে সে যে সাহায্যটুকু পাইতেছিল তাহা হইতে অচিরে বঞ্চিত হইল। নরেশ বাবু ভাগলপুরে বদলি হইয়া গেলেন, তিনি অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী; কাজেই স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। বিনোদ তখন মাতৃহারা সন্তান দুটী লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল। ছেলেদের দেখিবে কে? নরেশ বাবুরা ছিলেন—অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাইতেছিল, এবার হইতে সে টুকুও গেল।

বিনোদ আফিসে চাকুরী করিত। বাড়ীতে দুর্ঘটনা হইলেও অফিসের কাজ কামাই করিবার উপায় নাই; নিয়মিত ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসে থাকিতে হইত। সকাল বিকাল সে ছেলেদের বুকে করিয়া রাখিত, কিন্তু অফিসে থাকা সময়টুকু ছেলে মেয়েদের রাখিবে কাহার কাছে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক দূরসম্পর্কীয়া পিসিকে আনাইয়া তাঁহার হাতে সন্তানগণকে সমর্পণ করিয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

পিসিমার হাতে ছেলেদের সমর্পণ করিয়া বিনোদ যদিও কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, কিন্তু আফিস হইতে ফিরিয়া নিত্য একবার ছেলে মেয়েকে বুকে না করিলে তাহার প্রাণের মধ্যে যেন আকুলি বিকুলি করিতে থাকিত। ছেলে মেয়েরাও সন্ধ্যার পর পিতাকে না দেখিতে পাইলে অত্যন্ত কান্নাকাটি করিত। এই রকম করিয়া ২।৩ বৎসর কাটিয়া গেল। বিনোদ কমলার শোক ভুলিতে পারে নাই, কিন্তু ঝড়ের প্রবল বেগটা সামলাইয়া লইয়াছে।

একদিন বৈকালে বিনোদ প্রফুল্লমুখে বাড়ী আসিয়া পিসিমাকে কহিল—"ছেলেরা কোথায়?"

"কোথায় বেড়াতে গেছে। কেন?"

"কোথায় বেড়াতে গেছে"? বলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে বিনোদ পিসিমার পানে চাহিল।

"বল্‌ছি—তুই হাত মুখ ধুয়ে জল খেতে বস্।"

বিনোদ হস্ত মুখ ধৌত করিয়া জলযোগে বসিল। পিসিমা নিকটে বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে কহিলেন— "হ্যাঁরে বিনু, আমি যে খাটতে পারি নে বাবা? বুড়ো হাড়ে কি আর সংসারের খাটুনী, ছেলে মেয়ের আব্দার সহ্য করা যায়? তুই বল্‌না, আমার কি এখন এ সব কর্ব্বার সময়"? বলিয়া কৌতুহলপূর্ণ নয়নে বিনোদের মুখের পানে চাহিলেন। বিনোদ খানিকটে মিষ্টি মুখের ভিতর পুরিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন 'কি কর্ব্বে পিসি মা, আর কটা বছর এই রকম ক'রে কাটিয়ে দাও।"

"না বাবা, আর পার্ব্ব না, আমার বয়স কি কম হ'লরে—সেই দশ বছর বয়স হ'তে খেটে আস্‌ছি আর আজ ষাট বছর, আর কি এ সব ভাল লাগে? কোথায় তীর্থে তীর্থে ঘুরব না তোর সংসারে আড়ষ্ট হ'য়ে এক মেয়ে কাজ করে যাব? আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি কিছু নেই রে বিনু?"

বিনোদ জলযোগ শেষ করিয়া কহিল "তবে কি কর্ত্তে চাও পিসিমা, দেখছ ত আমার সংসারের অবস্থা, এই অবিলি সংসার ফেলে রেখে তুমি কেমন করে যাবে

"পিসিমা"? পিসিমা মনে মনে ভাবিলেন ইহাতে কিছু হইবে না—স্ত্রীলোকের মহা অস্ত্র বাহির করিতে হইবে; তিনি তখন একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সে সাধ্বি গেছে—সে সতী লক্ষ্মী; আহা অমন বৌ যে অনেক সাধ্য সাধনায় হয় রে বিনু," বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, পরে নিজেই অশ্রুসম্বরণ করিয়া কহিলেন "বাবা! সে সতী সাধ্বীর স্থান যে অপূর্ণ রাখ্‌তে নেই রে; আমি বল্‌চি সেই রকম টুকটুকে একটী বৌ ঘরে নিয়ে আয়; যদি বলিস ত আমি সম্বন্ধ করি—ঠিক একবারে অবিকল সেই রকম একটী মেয়ে আছে, মেয়েটী খুব ভাল, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তোর সংসারও বজায় থাক্‌বে আর মেয়ে ছেলেকে দেখ্‌তেও পারবে; আমিও তীর্থ ধর্ম্ম কর্ত্তে পারব; কি বলিস্?" এক মুহূর্ত্তে বিনোদের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। সে নীরবে একটা দীর্ঘ শ্বাস চাপিয়া উঠিয়া গেল।

(গ)

বিনোদকে নীরবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পিসিমা ভাবিলেন বিনোদের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিনোদের জন্য কন্যা স্থির করিলেন; কিন্তু বিনোদ এক কথায় বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। সে স্পষ্ট একদিন কহিল "গাছের যে ডালটা ভেঙ্গে যায় সেটা কি আর জোড়া লাগে পিসিমা! যদি লাগ্‌ত তা'হলে তোমরা সম্বন্ধ কর্ত্তে পার্ত্তে; কিন্তু তা যখন হয় না তখন এ বিবাহও হতে পারে না। বিয়ে করে' ছেলে মেয়েকে পর করে দিতে অন্যে পারে, কিন্তু আমি পারব না।" পিসিমা মনে মনে ভাবিলেন "ডাকিনী বাছাকে এখনও যাদু করে রেখেছে।"

বিনোদ বাহিরে আসিয়া দেখিল খোকা কাদা লইয়া মাটির পুতুল প্রস্তুত করিতেছে। সে প্রথমটা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া, চুম্বনে বিস্মিত করিয়া দিল। তার পর উন্মুক্ত জানালা দিয়া বাইরের আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কত কি ভাবিল, শেষে মৃত্যু শয্যায় শায়িতা একান্ত আপনার সেই জীবন সঙ্গিনী কমলার কাতরতা-মাখা মুখখানি তাহার বুকের পরতে পরতে জাগিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল কমলা একদিন বলিয়াছিল "ওগো আমি মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে ক'রো"; দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। খোকা অবাক হইয়া পিতার মুখ পানে তাকাইয়া কি ভাবিল; শেষে কাঁদিয়া কচি কচি দুটী হাত দিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল।

এই রকম হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। পিসিমা শত চেষ্টা করিয়াও যখন বিনোদের মত ফিরাইতে পারিলেন না, তখন একদিন বিনোদের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বিনোদ নাবালক সন্তান দুটী লইয়া সংসারের প্রবল তুফানে আবার নিক্ষিপ্ত হইল।

(ঘ)

প্রফেসর নরেশ বাবু ভাগলপুরে আসিয়া একটী কন্যারত্ন লাভ করিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র, তিন জনই কৃতবিদ্য। নরেশ বাবুর বড় সাধ ছিল একটী কন্যা হয়। ভগবানের দয়ায় কন্যাটী লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শেষ সন্তান এবং কামনা পূরণ হইয়াছে ভাবিয়া নরেশ বাবু কন্যাটীকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। বৃদ্ধবয়সে কন্যাটী লইয়া বেশ সুখেই দিন কাটিতেছিল। একদিন তাহার পত্নী কথায় কথায় স্বামীকে কহিলেন "দেখ আজ প্রায় ১৩।১৪ বৎসর দেশ ছাড়া, চল দেশে যাই। তোমার ত ছুটী হয়েছে। নরেশবাবু একেই আরামপ্রয়াসী মানুষ; সংসারে তাঁহার পত্নী না থাকিলে হয় ত কাহারও ভাগ্যে নিয়মিত আহার জুটিত কি না সন্দেহ; এ হেন নরেশ বাবু যে সহজে কোথায় একা থাকিবেন তাহার পত্নী বেশ ভাল রকমই জানিতেন; সুতরাং আজ নরেশ বাবুকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন নরেশ বাবু পত্নীর কথায় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; কহিলেন "দেশে? দেশে কেন? এখানে ত বেশ আছ, এখান থেকে আমি একপাও নড়তে পারব না; তোমরা যদি যেতে চাও

যাও, আমি কিন্তু কোথাও যেতে পারব না।" পত্নী জানিত স্বামীকে ছাড়িয়া তাহার কোথাও যাইবার উপায় নাই; কাজেই তিনি তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন "আমি যে হাঁফিয়ে উঠেছি এখানে থেকে থেকে ; দেশের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠছে। আহা! বিনোদের কথা ভাব দেখি,—"সে যে কি কচ্ছে" নরেশ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তা হয় না গিন্নী; সে হবে না। আমার এখন কোন মতেই যাওয়া হতে পারে না।" পত্নী বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। একটু পরেই নবমবর্ষীয়া কন্যা সুরমা ছুটিয়া আসিয়া নরেশ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিল।

সুরমাকে দেখিয়া নরেশবাবুর মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন "কি রে পাগলি, হঠাৎ ছুটে এলি কেন রে?" সুরমা পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—চল বাবা," কাল আমরা দেশে যাই।"

"দেশ কোথায়?"

"কেন? মা যে বল্লে আমাদের দেশ আছে, বাড়ী আছে—চল বাবা, দেরি কর্য়ো না; কালই আমরা যাব বুঝলে?"

"কেনরে তোর এখানে মন টেক্‌ছে না?"

"না বাবা! দেশের বাড়ী ছেড়ে কি বিদেশে থাক্‌তে মন যায়?"

গিন্নীমেয়ের মত কথা বলিয়া যখন সুরমা পিতার কোলে মুখ লুকাইল, তখন নরেশবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

(৬)

পিসিমা চলিয়া যাইবার পর সুখে দুখে আরও অনেক দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু আজও বিপদ যেন ছায়ার মতনই বিনোদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

আষাঢ় মাস। বৃষ্টি অবিরাম টিপ্ টিপ্ করিয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস আসিয়া ঘরের দরজা জানালা গুলি খট্ খট্ শব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। আজ বিনোদ আফিস যায় নাই। মাধুরীর রেমিটেণ্ট ফিবার। আর খোকা সুকুমারের বসন্ত। বাড়ীতে ছেলে মেয়ের অসুখ; অন্য আর কেহ সাহায্য করিবার লোক নাই, বিনোদ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া কমলার শোক সহ্য করিয়াছে কিন্তু আর পারিতেছে না। ছেলেদের বেদনাকাতর মুখখানি দেখিলেই তাহার ফুকারিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে আর ভাবে কমলা! কোথায় তুমি? একবার এস, এসে তোমার ছেলে মেয়ের ভার নাও, আমি যে আর পেরে উঠ্‌ছিনে। সে ভাবিতে ভাবিতে বালকের মত কাঁদিয়া ফেলে। সেদিন সকালে যখন ডাক্তার মাধুরীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেল "টাইফয়েড" হইয়াছে, তখন বিনোদের আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কেবলি ভাবিতে লাগিল "কমলার দান বুঝি রাখিতে পারিলাম না, একি কর্লে ভগবান"!

যে সময় বিনোদ মাধুরীর শিয়রে অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে বসিয়া মাধুরীর মাথায় জলপটি দিতেছিল, সেই সময় নরেশ বাবু গাড়ী করিয়া সেই রাস্তা দিয়া বাড়ী ফিরিতে ছিলেন।

বিনোদের বাড়ীর রাস্তায় গাড়ী আসিতেই সুরমা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইতেছিল এযে তাহার বড় পরিচিত রাস্তা। তারপর যখন গাড়ী বিনোদের বাড়ীর সুমুখে আসিয়া পৌছাইল তখন সুরমার মনে হইল এই ত তাহার বাড়ী। সে গাড়োয়ানকে কহিল "গাড়ী থামাও, গাড়ী থামাও।"

নরেশ বাবু মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন "গাড়ী থামাবে কিরে পাগলী? আরও ২।৩ খানি বাড়ী ছাড়ালে তবে আমাদের বাড়ী"। সুরমা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—উঁহু: এই বাড়ী; এই গাড়োয়ান শুন্‌তে পাস্‌নে? গাড়ী থামা শিগ্‌গির," সুরমার চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল; সুরমা গাড়ী হইতে নামিয়া পিতাকে কহিল "নাম, বাবা"। নরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন "বলিস্ কিরে পাগলী এযে বিনোদের বাড়ী!" সুরমা মুখবিকৃতি করিয়া কহিল "তা জানিনে, তবে এই হচ্ছে আমার বাড়ী; তুমি নেমে এস"—বলিয়া সে এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া বিনোদের বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ বাবু কন্যাকে চিনিতেন। কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া সস্ত্রীক নামিয়া আসিলেন। পিতা মাতাকে সঙ্গে লইয়া সুরমা চিরপরিচিতার মত নীচের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। সম্মুখেই বিনোদের কক্ষ।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিনোদ গালে হাত দিয়া মাধুরীর শিয়রে বসিয়া আছে। বিনোদের চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মাথার চুলগুলি শুষ্ক খুষ্ক, মুখ খানি শুষ্ক, ঠোঁট দুটী লাল টক্ টক্ করিতেছে; দৃষ্টি উদাস। সুরমা বিনোদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল "মাধুর কি জ্বর হয়েছে"? বলিয়া সে মায়ের মত মাধুরীর গায়ের তাপ লইয়া শিহরিয়া উঠিল—এত জ্বর! বিনোদ অন্যমনস্ক ছিল। সুরমার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া—উঠিল, ভাবিল—কমলা কি ফিরিয়া আসিল! পরক্ষণে তাহার ভ্রম ঘুচিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, কমলা ত নহে—এযে ৮।৯ বৎসরের একটী বালিকা তাহার নিকট দাঁড়াইয়া; সঙ্গে নরেশ বাবু এবং তাঁহার পত্নী। নরেশ বাবুকে দেখিয়া বিনোদ উঠিয়া আসিল। বিনোদের শীর্ণদেহ এবং পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। "আপনারা এসেছেন, আমার দশা দেখুন" বলিয়া বিনোদ কোঁচার খুটে চক্ষু ঢাকিল।

সুরমা খানিক মৌন নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বিনোদের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিল। দেখিল তাহার একটী ছোট খাটো খোকা চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের দাগ। নরেশ বাবুও সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন; সুরমা আরো খানিক মৌন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মায়ের নিকট সরিয়া আসিয়া কহিল "মা! এই আমার ঘর বাড়ী"—বলিয়া সে যেন একটু লজ্জিত হইল।

নরেশ বাবু সুরমার কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা পাগলী ত।" সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল "না বাবা, আমি একটুও মিথ্যে বলিনি, আমার কথা বুঝি অবিশ্বাস কচ্ছেন? এই দেখুন, ওই আলমারীতে আমার বিয়ের সময় মা আমায় যে হার উপহার দিয়েছিলেন সেই হার আছে, তার পর আমার হাতের আংটী এবং সমস্ত গহনা এই বাক্সর মধ্যে আছে আরও কত কি—; যত বলিতে লাগিল এবং দেখাইতে লাগিল তত সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

সুরমা বিনোদের নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "তুমিও চিন্তে পারলে না! সেই সেদিনকার কথা—"এখন বার বছর পূর্ণ হয় নি! আমি ত যাবার সময় ব'লে গিছলাম আমি আবার ফিরে আসব; দেখ, আমি আমার কথা রেখে আবার ফিরে এসেছি; যাও বাহিরে যাও; মা—বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বাবাকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে বসাও যাও।"

নরেশ বাবু এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া সুরমার কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "চল্ এখন বাড়ী চল্, খেয়ে দেয়ে আসিস্ এখন।" সুরমা ধীর অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তা কি হয় বাবা, ছেলে মেয়েরা সব ভুগছে; তা ছাড়া উনি উপবাস করে আছেন—এখন আমি কেমন করে যাব? আমি সত্য বলছি এ সব আমার"। পরে বিনোদের পানে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"ওঠ, অবাক হয়ে দেখছ কি আমি এসেছি! আর তোমাকে ছেলে মেয়ের ভার নিতে হবে না। এখন ওঠ"। তার পর বিনোদকে তুলিয়া দিয়া মাধুরীর শিয়রে বসিয়া পড়িল। সকলেই কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূকের মত নির্ব্বাক হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে সুরমার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীব্রজ মাধব রায়।

শিল্প-স্বরাজ।

ইহাই ধন বিজ্ঞানের সহজ পথ এবং ইহাই সিদ্ধির পথ। মানুষ আজ কলের সাহায্যে মানুষকে অত্যাচার করিতেছে বলিয়া, মানুষ ও শিল্পব্যবস্থার দোষ না দিয়া এবং কলের দোষ মনে করিয়া আমরা যদি শুধু হাতুড়ী রেত নেহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকি তাহা হইলে ইহা নিতান্ত হাস্যকর দেশ কালকে অগ্রাহ্য করার কাজ হইবে। তাহা আধ্যাত্মিকেরও বিপরীত হইবে। কারণ যে অধিকতর বিশ্রামের অবসর কলের ব্যবহারসাপেক্ষ, তাহা না পাইলে জীবনটা শুধু জীবনযাত্রার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে; উচ্চতর জীবনের কোন সুযোগই ঘটিবে না।

ভারতবর্ষের একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ভূমি-ব্যবস্থায়, তাহার জাতি পঞ্চায়েতে ও ব্যবসায়ে, তাহার গ্রাম্য শাসন, তাহার সমাজ দল ও শ্রেণীর সমবায়ে, তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনে একটা স্বাবলম্বী সমূহ ভাব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এদেশে আমরা কল করখানা এমন ভাবে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি যাহা আমাদের সমাজ গ্রন্থিছিঁড়া দূরে থাক তাহাকে নূতন করিয়া বুনিয়া ধন বিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়মানুসারে একটা সরল আত্ম-নির্ভর সমবায়—জীবনের সূত্রপাত করিবে। আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্ব-ভোগ, সমূহের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত। আমাদের পুষ্করিণী বাঁধ সাধারণের, আমাদের জল সেচন নালী ও গোচারণ ভূমির উপর সাধারণের অধিকার। বিদ্যালয় ও মন্দিরের কার্য্যকলাপে, গ্রাম্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থায়, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান প্রতিষ্ঠায় আমরা সেই একই সমূহ ভাবের কার্য্যকারিতা দেখি। তাহাকে কি আমরা বর্ত্তমান শিল্প প্রণালীর ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিতে পারি না, যাহাতে শিল্প অত্যাচারী না হইয়া সমাজের সেবক হয়?

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯।

শিল্প শব্দের বুৎপত্তি।

শিল্প মানব চিত্ত-বৃত্তির ভাব সম্পদের বাহ্য বিকাশ—মানবপ্রতিভাপ্রসূত এক অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল। ভারতবর্ষে পুরাতন সাহিত্যে "শিল্প" শব্দের বুৎপত্তি যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে ইহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"শিল্পং কৌশলং শীল সমাধৌ।"

"শীল্ সমাধৌ"—(উর্ণাদি-সূত্রানুসারে ক্ত-প্রত্যয়ে) নিপাতনে "শিল্প" শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে সমাধির—চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার উল্লেখ করিয়া শিল্পকে একাগ্রতাসমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই বুৎপত্তি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন,—সে কৌশল মানবচিত্তবৃত্তির একাগ্রতাসমুদ্ভাবিত। তাহা অনুকৃতি নহে,—সৃষ্টি।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২৯।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কথা।

অকুতোভয়তা।

সমাজ সংস্কার কার্য্যে রাজনারায়ণ বাবু কখনই পেছপাও হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইবার পরে নিজের পরিবারে ইহা অকুতোভয়ে প্রচলিত করেন। রাজনারায়ণ বাবু তখন মেদিনীপুর স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। মেদিনীপুরেও এই লইয়া কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তখনকার উকীল সরকার হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু জানেন না কি তিনি বাংলা ঘরে বাস করেন অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাহা পুড়াইয়া দিতে পারি। সে সময় এই লইয়া একটা একটা দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইতে পারে, এই আশঙ্কাও হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন যে এইজন্য তিনি ও তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক উত্তরপাড়া বাসী বাবু যদু নাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন) ইহারা দুইজনে মেদিনীপুরের নিকটে জঙ্গলে যাইয়া দুইটা মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসেন। "যদি দাঙ্গা হয় সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।" রাজনারায়ণ বাবুর এই ক্ষাত্র ভাবটা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। আমি যখন তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করি, তখন রাজনারায়ণ বাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে। শরীরটাও যে খুব দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই বয়সে সেই শরীর লইয়া সেই প্রথম দেখার দিনেই কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন—"আমি বেশী দিন বাঁচব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।"

স্বাদেশিকতা।

এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে এই বিদ্যামন্দিরের ভিতরে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একদিন ছিল যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তানেরা বাংলা ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কহিতেন না, পত্র ব্যবহারও করিতেন না। অথচ সেই যুগেই কৃতবিদ্য রাজনারায়ণ বাবু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বাঙ্গলা ভাষাটা চালাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তাঁহাদের এক সভা ছিল। এই মজলিসে সভ্যদিগকে খাঁটি বাঙ্গলাতে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এ সকল কথোপকথনে ইংরাজী শব্দের বুকনী দেওয়া একবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও সভ্য কোনও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহার জন্য তাঁহার অর্থদণ্ড হইত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের জন্য বোধ হয় এক পয়সা জরিমানা দিতে হইত। এই উপায়ে সভার অর্থাধারে বেশ দু'পয়সা সঞ্চিত হইত। এই সকলই রাজনারায়ণ বাবুর আযৌবনসিদ্ধ স্বাদেশিকতার প্রমাণ।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

বঙ্গবাণী—কার্ত্তিক, ১৩২৯

কার্ত্তিক মাসের কৃষি।

এই সময় শীতের আবাদ ভরপূর আরম্ভ হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় আর বাকি রাখা উচিত নহে। মূলা, শালগাম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, মটর, নাবী জাতীয় সীম, শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য এই মাসের প্রথমে যেন আর বাকী না থাকে। বেগুণ চারা ইতিপূর্ব্বেই বসান হইলে সেগুলি এক্ষণে দাঁড় বাঁধিয়া আবশ্যকমত জল দিবে। কপি চারা যাহা ক্ষেতে বসান হইয়াছে তাহাতে এ সময় মাটী দিতে হইবে ও পাকা পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলু বসান না হইলে আলু বসাইবে এবং গতমাসে যাহা বসান হইয়াছে তাহাতে এখন দাঁড় বাঁধিবে ও জল দিবে।

মটর, বরবটী, ছোলা, মুগ, মসুর, তিল, খেসারি প্রভৃতি কৃষিশস্য বীজ কার্ত্তিকের প্রথম হইতে বপন

আরম্ভ করিবে। ধনে, মেথি, মৌরি, রাধুনী, মুগ, কালজিরা এই সময় বপন করিতে হয়। উচ্ছে, পটল, তরমুজাদি বসান না হইলে বসাইবে। কার্পাস গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া আবশ্যকমত জলসেচন করিবে। গাছ এক হাত পরিমাণ হইলেই ডগা ভাঙ্গিয়া দিবে; তাহাতে গাছ বেশ ঝাড় বাঁধে।

বর্ষা শেষ হইয়াছে, এখন কলমের গাছ নির্ভয়ে বসান যাইতে পারে। এই সময় গাছের গোড়া কোপাইয়া গাছের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

এই সময় সর্ব্বপ্রকার মরসুমি ফুল বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্ব্বিনা, পিটুনিয়া এষ্টারসান, সুইট-পি, ডেইজি, ডেনাস, ফ্লাক্স, মেরিগোল্ড, পপি প্রভৃতি ফুল বীজ অতি শীঘ্র বপন করা উচিত। অষ্টার প্যান্সি গত মাসে বৃষ্টির জন্ত বপনের সুবিধা না পাইলে এখনই বসান উচিত। এই সময় মরসুমি ফুল টবে করিতে হইলে গাছের পাতা পচা সার ১ ভাগ, গোবর সার ১ ভাগ, খৈল পচা সার ½ ভাগ, পুকুরের কাল পচা পাঁক মাটি ½ ভাগ, বালি মাটি ½ ভাগ, ভাল আটাল মাটি ½ ভাগ একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া নিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া চালনি দ্বারা ছাঁকিয়া নিবে, পরে এই মাটি টবে রাখিয়া ২।৪ দিন উহাতে অল্প অল্প জলের ছিটা দিয়া মাটি ভিজাইয়া লইবে। এই মাটি শুকাইয়া গেলে জমির মাটির মত টবের মাটি বেশ পাইট করিয়া নিয়া ভাল সতেজ চারা বসাইবে। মরসুমি ফুল গাছের শিকড় অত্যন্ত কোমল, সর্ব্বদা উহার মাটি আল্গা ও সরস রাখা দরকার। গাছে যাহাতে ভালরূপ আলো বাতাস রোদ ও শিশির পায়, এমন স্থানে টপ রাখিয়া দেওয়া উচিত। যত্ন করিলে যে কোন মরসুমি ফুল টপে বেশ ভালরূপ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ৮।১০ দিন রৌদ্র ও শিশির খাওয়াইয়া গোড়ায় সার ও নূতন মাটি এই দিতে হয়। গোড়া খোলা অবস্থায় উহাতে কলি চূণের ছিটা দিলে গাছের বেশ উপকার হয়।

সম্মিলনী—আশ্বিন, ১৩২৯।

কোনটা আগে?

সমাজ দেহের জোঁক।

ওরে সম্রাট শূন্য সমাজ কাদী দুঃখ যে তোর চারিধার॥
ঘুচবে কি সব, পাস যদি তুই রাষ্ট্রনীতির অধিকার?
শাসক সাপে ধন্দ তোদের নিজেদের নেই সহযোগ
জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহে ঢুকছে তোদের নানা রোগ।
শান্তি নিলয় পল্লী ছেড়ে কল্লি বাসা সহর মাঝে,
শিশুতে কলম চাইতে ধূলা, ধোঁয়া খেতে সকাল সাঁঝে।
তোর অভাবে গ্রামগুলি সব এক হয়ে যায় শ্মশান সাথে,
ছেলের পালে ব্যাধির তরে দিচ্ছে তুলে যমের হাতে।
শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুর নদী, কুকুর—তারও শুষ্ক জিভ,
চামচিকা বাস মন্দিরে সব, বেলপাতা আর পায়না শিব।
কারোর ঘরে অতিথ হলে দেখিয়ে দিচ্ছে অন্য বাড়ী,
অন্ন সত্রে আজকে যে সে কাঁদছে বসে শূন্য হাঁড়ী!
নর নারী পড়ছে লুটে মরণ রথের চাকার তলে;
দিবস রাত্র শ্মশান বুকে চিতাই শুধু ধূ ধূ জ্বলে।
ঘরের পাশে ঝোপ ঝাড়েতে সাপ শিয়ালে নিচ্ছে বাসা;
পল্লীরাণীর কুঞ্জখানি মঞ্জু শোভায় দেখায় খাসা!
ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্লেগ, বসন্ত মহামারী—
শমন রাজার টেক্স আদায় কচ্ছে সেথায় বাড়ী বাড়ী।
পুঞ্জে পুঞ্জে মশা মাছি গুঞ্জরিয়া বেড়ান সেথা;
(দেশোদ্ধারে চাঁদা আদায় কচ্ছে হেথায় দেশের নেতা!)
হাতুড়ে আর অশিক্ষিত বদ্যি যত বিদ্যানিধি,
দিচ্ছে বড়ী নাড়ী টিপে পার্কাসনে দেখছে হৃদি।
রোগীর রুধির শুষচে রোগ তারাও শোষে অন্যধারে,
রোগ যদিও দয়া করে ডাক্তারে তার দফা সারে।
উকীল বদ্যি—এঁদের মত ডাকাকে তাদের কে কর্ত্তে পারে?
মারেন এঁরা ধনে প্রাণে চাপেন যখন যাদের ঘাড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

স্বাস্থ্য সমাচার—আশ্বিন, ১৩২৯।

* ষ্টেথস্কোপের পরিবর্ত্তে বুকের উপর আঙ্গুলের ঘা দিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া হৃদপরীক্ষার নাম Parcussion.

মৃত্যুর পর *

মৃত্যুর পর কি হয় তাই নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। অনেকে অনেক রকম বলে। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সক্রেটিস যাহা বলিয়াছিলেন আজ তাহাই আপনাদিগকে বলিব।

আর্মেনিয়াসের পুত্র আর নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হয়। দশ দিন পরে যখন নিহত ব্যক্তিদের শরীর সমাধির জন্য লইয়া যাওয়া হয় তখন সমস্ত শরীরই গলিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, কেবল আরের শরীর তখনও সতেজ দেখা গেল। তাহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া দ্বাদশ দিবসে চিতায় আরোহণ করাইলে সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পরলোকে কি দেখিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে বলিল—তাহার দেহ হইতে আত্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যান্য আত্মার সহিত একত্রে বহুদূর গমন করিয়া অবশেষে এক রহস্যময় স্থানে উপনীত হইল। তথায় পৃথিবীতে :পরস্পর সংলগ্ন দুইটি রন্ধ্র ছিল এবং ঠিক তাহার সম্মুখ ভাগে ঊর্দ্ধে স্বর্গেও সেইরূপ দুইটি রন্ধ্র ছিল। এই রন্ধ্র সমূহের মধ্যে বিচারকগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া সাধুগণকে ডানদিকে স্বর্গের মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় যাইতে আদেশ করিতেছিলেন এবং তাঁহারা যে আদেশ প্রচার করিতেছিলেন সেই আদেশের চিহ্ন তাহাদের সম্মুখে সংযুক্ত করিয়া দিতেছিলেন। যাহারা অসাধু তাহাদিগকে বামদিকে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় যাইতে আদেশ করিতেছিলেন এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের অসৎকার্য্যের নিদর্শন বহন করিতে হইতেছিল। যখন আর সেই স্থানে উপনীত হইল তখন তাহাকে পরলোকের কার্য্যবিবরণী লইয়া ইহলোকে আসিবার জন্য আদেশ করা হইল। এবং তজ্জন্য সেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করিতে তাহাকে আদেশ করা হইল। আর সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল—একদিকে আত্মাগণ বিচার ফল প্রকাশ হইবার পর স্বর্গের রন্ধ্র ও তৎসম্মুখস্থিত পৃথিবীর রন্ধ্র দিয়া প্রয়াণ করিতেছিল; এবং অন্য দুইটি রন্ধ্রে আত্মাগণ পৃথিবী হইতে উত্থান সময়ে ধূলিধূসরিত ও ক্লিষ্ট এবং স্বর্গ হইতে অবতরণ সময়ে বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। প্রত্যেক আত্মাই যাত্রামলিন রূপে দেখা যাইতেছিল। তাহারা সানন্দে এক সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে যাইয়া তথায় বাস করিতেছিল। যাহারা পরস্পর পরিচিত ছিল তাহারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করিতেছিল। যাহারা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে যাহারা পৃথিবী হইতে উত্থিত তাহারা স্বর্গের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এবং প্রথমোক্ত আত্মাগণও শেষোক্ত আত্মাকে পৃথিবীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যাহারা পৃথিবী হইতে সমাগত তাহারা পৃথিবীর নিম্নভাগে গমনকালীন যে সমস্ত উৎকট দুঃখভোগ করিয়াছিল এবং যে ভীষণ দ্রব্য দেখিয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ সহকারে তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। যাহারা স্বর্গ হইতে সমাগত তাহারা নানাবিধ উপভোগ এবং সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য বর্ণনা করিতেছিল। এই সকল সবিস্তারে বর্ণনা করা অতি আয়াসসাধ্য। তবে আর বর্ণিত প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় বলা যাইতে পারে। তাহারা যে সকল পাপ এবং ব্যক্তিগত হানি করিয়াছে, সময় উপস্থিত হইলে

---

* The Republic of Plato নামক গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

তাহার প্রত্যেকটির জন্য দশগুণ প্রতিশোধ সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে দণ্ডের চক্রপ্রবর্ত্তন করা হইত; কারণ, মনুষ্যজীবন শতবর্ষ পরিমিত ধরিয়া প্রত্যেক অপরাধের দশগুণ দণ্ড দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। যথা—যাহারা অনেকগুলি হত্যা করিয়াছে বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা নগর ও সৈন্যগণকে শত্রুকবলিত করিয়াছে বা নগর ও সৈন্যগণকে দাসত্বে উপনীত করিয়াছে বা দুষ্টকার্য্যে সহায় হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেক অপরাধের জন্য দশগুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আবার যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে এবং সাধু ও পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়াছে তাহারা সেই নিয়মানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। যাহাদের জন্মের অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আর্ম্ম যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আর্ম্ম বলেন,—অসাধুতা, পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা এবং নিকট আত্মীয়ের হত্যার জন্য দণ্ড অতি কঠোর এবং সাধুতার ও বশ্যতার পুরস্কার অত্যন্ত মহৎ। একটি আত্মা অন্য একটি আত্মাকে যখন আডিয়াস দি গ্রেটের বিষয় জিজ্ঞাসা করে তখন আর্ম্ম তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। সেই সময়ের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আডিয়াস প্যাম্ফিলিয়া নামক নগরের রাজা ছিল। সে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে হত্যা করিয়া রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অন্যান্য অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। যে আত্মাকে আডিয়াসের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে উত্তর দিল—"আডিয়াস এখানে আসে নাই এবং এখানে আসিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, আমরা যে সকল ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছি ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। যখন আমরা নানা দুঃখভোগ করিয়া রন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই সময়ে আডিয়াস ও অন্যান্য প্রজাপীড়ক রাজাকে দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে কয়েকজন অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত সাধারণ ব্যক্তিও ছিল। যখন এই সকল ব্যক্তি তখন আরোহণ করিবে বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইতেছিল তখনই রন্ধ্র বিবরে প্রবেশ হইতেছিল। যখন কোন ভীষণ পাপী বা যাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই এইরূপ কোনও ব্যক্তি আরোহণ করিবার ইচ্ছা করে তখন রন্ধ্র বিবর হইতে বৃষের ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি উত্থিত হয়। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ভীষণদর্শন অগ্নিপ্রাতম ব্যক্তি সেই শব্দের অর্থ বুঝিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে কোমরে ধারণ করিয়া লইয়া যায়। আডিয়াস ও অন্য কয়েকজনকে তাহারা হস্তপদে ও মস্তকে বন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করতঃ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছিল এবং রাস্তার নিকটে টানিয়া আনিয়া কণ্টকাকীর্ণ গুল্মের উপর ঘর্ষিত করিতেছিল। তৎকালে যাহারা সেই রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া সেই ভীষণদর্শন পুরুষগণ কেন ঐরূপ করিতেছে তাহা বলিতেছিল এবং সেই সকল পাপীগণকে যে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে তাহাও তাহারা বলিতেছিল। আমরা নানারকম ভয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে রন্ধ্রবিবরের নিকট যাইলে সেইরূপ শব্দ হয় সেই ভয়ে আমরা অস্থির হইলাম। যখন সেই শব্দ হইল না এবং আমরা আরোহণ করিতে কৃতকার্য্য হইলাম, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।" যে সকল দণ্ড ও যাতনা সহ্য করিতে হয় উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার কতক হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবার পুরস্কারের মাত্রাও কম নহে।

আত্মাগণ সাতদিন উক্ত ক্ষেত্রে উপনীত হইবার পর তাহাদের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা উক্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অষ্টম দিনে তাহারা পুনরায় যাইতে আরম্ভ করে এবং তিন দিন গমন করিয়া চতুর্থ দিনে যে স্থানে উপস্থিত হয় তথা হইতে তাহারা একটি সরল আলোকস্তম্ভ দেখিতে পায়। সেই আলোক কতকটা ইন্দ্রধনুর ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর এবং পৃথিবী ও স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরও একদিন গমন করিয়া তাহারা উক্ত আলোকস্তম্ভের নিকট উপনীত হয় এবং তাহার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে তাহারা উক্ত আলোকস্তম্ভ আকাশের সহিত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ দেখিতে পায়। এই আলোকের দ্বারা সমস্ত আকাশ সংহত হইয়া আছে। শেষ ভাগে প্রয়োজনের দণ্ড দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে এবং তদ্বারাই বিশ্বের আবর্ত্তন

চলিতেছে। সেই দণ্ডের মধ্যভাগস্থিত যষ্টি ও উপরিভাগ ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত এবং তৎসংযুক্ত আটটি বৃত্ত ইস্পাত ও অন্যান্য উপাদানে নির্ম্মিত। সেই দণ্ড প্রয়োজনের জানুর উপর নিরন্তর ঘুরিতেছে। প্রত্যেক বৃত্তের উপর একজন গায়িকা দণ্ডায়মান; সে সেই বৃত্তের সহিত ঘুরিয়া এক একটি স্বর গাহিতেছে। এইরূপে আটটি স্বর একত্রিত হইয়া একটি সঙ্গীত উৎপন্ন হইতেছে। আরও তিনজন সমান দূরে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। তাহারা প্রয়োজনের কন্যা এবং অদৃষ্ট নামে অভিহিত। তাহাদের নাম ল্যাকেসিস, ক্লোথো এবং এট্রপস্। তাহারা শ্বেত-পরিচ্ছদে শোভিত এবং মাল্যে বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গায়িকাগণের সহিত একতানে গান করিতেছে; তন্মধ্যে ল্যাকেসিস অতীত বিষয়, ক্লোথো বর্ত্তমান বিষয় এবং এট্রপস ভবিষ্যৎ বিষয় গান করিতেছে। ক্লোথো তাহার দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মধ্যে মধ্যে সেই দণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের বৃত্তপ্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া দিতেছে; এট্রপস তাহার বামহস্তের দ্বারা মধ্যে মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বৃত্তসমূহ ধারণ করিয়া সেইরূপে ঘুরাইয়া দিতেছে এবং ল্যাকেসিস উভয়ের মধ্যে অন্যতম হস্তের দ্বারা প্রত্যেকটী পর্য্যায়ক্রমে ধারণ করিয়া ঘুরাইয়া দিতেছে। আত্মাগণ উপস্থিত হইতে, প্রথমে ল্যাকেসিসের নিকট যাইতে বাধ্য করা হয়। একজন দোভাষী তাহাদিগকে প্রথমতঃ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তৎপরে ল্যাকেসিসের ক্রোড় হইতে জীবনের নানাপ্রকার ভাগ্য ও কল্পনা সংগ্রহ করিয়া উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল—"প্রয়োজনের কন্যা ল্যাকেসিস এইরূপ বলিতেছেন—"অয়ি অল্পজীবী আত্মাগণ! নবোদ্ভূত মানবগণ তাহাদের মরজীবনের চক্রপ্রবর্ত্তন করিবে। তোমাদের ভাগ্য তোমাদিগকে দেওয়া হইবে না; তোমরাই তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। যে প্রথম ভাগ্য আকর্ষণ করিবে তাহার সেই ভাগ্য অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। পুণ্যের কোনও প্রভু নাই; যে পুণ্যকে সম্মান করে সে অধিক পুণ্য প্রাপ্ত হইবে, যে তাহাকে অবহেলা করে, সে অল্প পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে নির্ব্বাচনের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রহিল। ভগবান্ নির্দ্দোষী। এই কথা বলিয়া সেই দোভাষী সেই সঙ্ঘের মধ্যে ভাগ্য নিক্ষেপ করিল। প্রত্যেক আত্মা নিকটস্থ ভাগ্য তুলিয়া লইল, কিন্তু আরকে নিষেধ করায় সে তুলিল না। প্রত্যেকে ভাগ্য তুলিবার পর তাহার নম্বর দেখিল। তৎপরে জীবনের কল্পনাসমূহ তাহাদের নিকট রাখা হইল। এই সকল কল্পনা সংখ্যায় আত্মা অপেক্ষা অনেক অধিক। সেখানে অনেক রকম কল্পনা ছিল; সর্ব্বপ্রকার জীবিত বস্তু এবং সর্ব্বপ্রকার জীবিতমনুষ্যের জীবনকল্পনা ছিল। তন্মধ্যে কতক চিরস্থায়ী রাজগণের, কতক অস্থায়ী রাজগণের জীবনকল্পনা ছিল; যাহারা শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য অথবা বল এবং ক্রীড়াকৌশলের জন্য অথবা উচ্চবংশের জন্য অথবা সুকৃতী পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য প্রসিদ্ধ এরূপ ব্যক্তিরও জীবনকল্পনা ছিল। আবার যাহারা অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যে স্ত্রীলোকপ্রসিদ্ধ ও যাহারা অপ্রসিদ্ধ তাহাদেরও জীবনকল্পনা ছিল। কিন্তু কোনও অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; কারণ জীবন পরিবর্ত্তনের সহিত আত্মারও পরিবর্ত্তন হয়। এই সময়ে দোভাষী এইরূপ বলিল:—"যিনি শেষেও আসিয়াছেন তিনিও যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করেন এবং কঠোরভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন তাহার জন্য খারাপ জীবন নির্ব্বাচিত হয় নাই এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন। যিনি প্রথমে আসিয়াছেন তিনি যেন অসাবধানতার সহিত নির্ব্বাচন না করেন এবং যিনি শেষে আসিয়াছেন তিনি যেন হতাশ না হয়েন। এই কথা বলিবামাত্র যিনি প্রথম ভাগ্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন তিনি অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতম প্রজাপীড়নপূর্ণ রাজত্ব নির্ব্বাচন করিলেন; তিনি এইরূপ লোভী ও চিন্তাশূন্য ছিলেন যে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আদৌ বিশেষরূপ বিবেচনা করিলেন না এবং দেখিলেন না যে অদৃষ্টক্রমে অন্যান্য দুর্ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে তাহার পুত্রগণকে ভক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে অবকাশমত যখন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন তখন তিনি বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং দোভাষীর পূর্ব্ব-

বক্তৃতা ভুলিয়া গিয়া নিজের উপর দোষ না দিয়া ভাগ্য ও অদৃষ্টের উপর দোষনিক্ষেপ করিলেন। তিনি স্বর্গগত আত্মাগণের মধ্যে অন্যতম এবং পূর্ব্বজন্মে সুনিয়মিত রাজ্যে বাস করার অভ্যাসবশতঃ কিয়ৎপরিমাণ পুণ্যলক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জ্ঞানবশতঃ কোনও কার্য্য করেন নাই। আর্‌র বর্ণানুসারে স্বর্গ হইতে আগত অর্দ্ধাধিক আত্মা উক্তপ্রকারে আত্মপ্রতারিত হইয়াছিল। কারণ, তাহারা দুঃখের কশাঘাত সহ্য করেন। যাহারা পৃথিবী হইতে সমাগত তাহাদের অধিকাংশ আত্মা এইরূপ অসাবধানতার সহিত নির্ব্বাচন করে না, কারণ তাহারা নিজে দুঃখভোগ করিয়াছে এবং অপরকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াছে। প্রত্যেক আত্মা কিরূপে নিজের জীবন নির্ব্বাচন করে তাহার দৃশ্য বিস্ময়কর, বিষাদপূর্ণ ও হাস্যোদ্দীপক। সাধারণতঃ পূর্ব্বজীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আত্মাসমূহ চালিত হয়। আর্‌র দেখিলেন অর্ফিয়স্ হংসের জীবন নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, কারণ স্ত্রীলোকের দ্বারা তাহার মৃত্যু ঘটায় তিনি স্ত্রীলোকদিগকে এত ঘৃণা করেন যে তাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। থামিরসের Thamyras আত্মা বুলবুল পক্ষীর জীবন নির্ব্বাচন করিয়া লইল। Telarman টেলামনের পুত্র আজাক্স Ajax সিংহের জীবন নির্ব্বাচন করিয়া লইল, কারণ একিলিসের Achilles অস্ত্রযুদ্ধবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়া তিনি মানব জীবন লইতে ইচ্ছা করিলেন না। এগেমেম্নন Agamainnon তাহার দুঃখের জন্য মানব মাত্রকেই এত ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন যে তিনি ঈগল পক্ষীর জীবন নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। আটলাণ্টার Atlantar আত্মা কুস্তীগির জীবনে বহু সম্মান দেখিয়া তাদৃশ জীবন নির্ব্বাচন করিলেন। প্যানোপিয়সের পুত্র ইপিয়সের Epeus আত্মা চতুরা স্ত্রী শিল্পীর জীবন বরণ করিয়া লইলেন। থার্সাইটিস Thercites নামক যে ব্যক্তি সঙ সাজিত সে বানরের জীবন বাছিয়া লইল। অডিসিয়স্ Odyseus পূর্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া উচ্চ আশা পরিত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ ঘুরিয়া অন্বেষণ করিয়া অবশেষে শান্ত জীবন বরণ করিয়া লইলেন। কতকগুলি জন্তু মনুষ্য জীবন এবং কতকগুলি মনুষ্য পশুজীবন নির্ব্বাচন করিয়া লইল।

এইরূপে আত্মাগণ জীবন নির্ব্বাচন করিয়া একে একে ল্যাকেসিসের নিকট অগ্রসর হইল। তিনি সেই সকল আত্মার জীবন রক্ষা ও নির্ব্বাচনের সন্তোষ বিধান জন্য অদৃষ্টকে প্রত্যেক আত্মার সহকারী করিয়া দিলেন। এই অদৃষ্ট সেই আত্মাকে প্রথমতঃ তাহাকে ক্লোথোর নিকট লইয়া গিয়া তাহার হস্তের নিম্নভাগ দিয়া এবং সেই দণ্ডের ভ্রাম্যমান গতির অবিভাগ দিয়া লইয়া গেল। তৎপরে তাহাকে স্পর্শ করিয়া এট্রপসের নিকট লইয়া যাইয়া ক্লোথোর নির্দ্দিষ্ট ভাগ্য অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া দিল। তৎপরে সেই আত্মা প্রয়োজনের সিংহাসনের নিম্নদেশ দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে আর্‌র এবং সমস্ত আত্মা চলিয়া গেলে তাহারা বৃক্ষাদি ও উদ্ভিদ জন্য ভীষণ উত্তাপের মধ্য দিয়া বিস্মৃতির ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই সময়ে সন্ধ্যাসমাগত হইলে তাহারা ঔদাসীন্য নদীর তটে উপস্থিত হইলেন। এই নদীর জল কোনও পাত্রে রাখা যায় না। সমস্ত আত্মাকেই এই জলের কিয়ৎ-পরিমাণ পান করিতে হয়। কিন্তু যাহাদের প্রজ্ঞা অল্প তাহারা প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়া থাকে। এবং জলপান করিলেই সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটে। তাহারা সকলে মধ্যরাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলে ভূমিকম্প ও বজ্রনির্ঘোষ হইল এবং ক্ষণেকের মধ্যে আত্মাগণ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে বাহিত হইল। আর্‌কে কোনও জলপান করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল ; কিন্তু সে কিপ্রকারে এবং কোন্ পথে স্বীয় দেহে উপনীত হইল তাহা বলিতে পারে না। সে এই কথামাত্র বলিতে পারে যে উষাগমে সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল যে চিতার উপর শয়ন করিয়া আছে।

—•(•)•—

সমালোচনা।

ভক্ত নন্দ।

ভগবানের রাজ্যে সকল সৃষ্টির সার এই মানুষ; আবার এই মানুষের মধ্যে সেরা হচ্ছে বিশ্বাসী ভক্ত। বিশ্বাস ও অনুরাগের তারতম্যেই ভক্তের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে পশু ও দেবভাব একাধারে দুইই আছে। মানুষ এই বিশ্বাস ও অনুরাগের পার্থক্যে পশু ও দেব পর্য্যায়ভুক্ত হয়। অতি বড় হীণ, ঘৃণ্য ও পতিতও এই বিশ্বাস ও আন্তরিকতার বলে তার বাঞ্ছিতের কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। সমাজের বিধি নিষেধ, আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়া পদ্ধতির হাত এড়িয়ে সে তখন আপনাকে সকলের মধ্যে এবং সকলের মাঝে তার সেই রসময়ের লীলামাধুর্য্য দেখে নবজীবনের একটা নূতন সত্ত্বা অনুভব করে।

ভক্ত চরিত্রের এই রহস্যটী সম্প্রতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ভক্ত নন্দ' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। রচয়িতা শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাকা হাতের নিপুণ তুলিকায় এই চরিত্র খানি এমনি মধুর ও মনোজ্ঞ হয়ে ফুটেছে যে চোখের জলে শেষ না করে থাকতে পারবেন না। রচনার ভাব ভাষা ত সুন্দরই—সব চেয়ে সুন্দর তার কবিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গিমা। আমরা একটু নমুনা দিলাম :—

"নাম করতে করতে নন্দের কেমন যেন একটা ভাবান্তর হয়ে এল। সে যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে যেন নটরাজ প্রেম মূর্ত্তিতে বিরাজ করছে। তার বোধ হত—নদীর জলে, গাছের পাতায়, আকাশের নীলিমায়, সূর্য্যের কিরণে, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্রের সুদূর চঞ্চলালোকে নটরাজ নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে তাকে যেন ডাকছে। কি যেন স্বর্গের প্রেম এসে নন্দের পাষাণ প্রাণটা গলিয়ে তার সব কালিমা ধুয়ে মুছে তাঁর সারা বুকটা অমৃত ধারায় ভরে দিয়েছে আর তার প্রাণ-ভরা প্রেম যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সামান্য পিঁপড়ে দেখলে সে তাদের খাবার জন্য চিনি ছড়িয়ে দেয়; পথে কাঁটা দেখলে সে সরিয়ে রাখে, পাছে কারও পায়ে বিঁধে; ক্ষুদ্র কীট দেখলে মনে হয় কারও পায়ের নীচে পিষে যাবে, অমনি তাকে যত্নে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেয়। ছোট ছোট ছেলে দেখলে ত কথাই নাই; নিজেও ঠিক ছোট ছেলের মত হয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে ও হাত তালি দিয়ে 'শিব 'শিব' বলে নাচতে তার কতই না আনন্দ হয়। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! নাম যে নামীকে এমন করে টেনে আনতে পারে—নামের প্রভাবে যে নামীর রূপ এমন করে চোখে প্রাণে জেগে উঠে তা যে তাঁকে ভক্তি ক'রে তাকে সেই বুঝতে পারে।"

আজকালকার লঘুসাহিত্যপ্রিয় পাঠক সমাজে যিনি এই শ্রেণীর সরস রচনায় পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট ক'রে তাঁদের ভক্তজীবনী শোনাতে পারেন তিনি আমাদের নমস্য। শ্রদ্ধের গ্রন্থকার এইরূপ রচনায় বাঙ্গলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আশা করি ভক্ত পাঠক মাত্রেই দশ পয়সা দক্ষিণা দিয়া এই অপূর্ব্ব চরিত্রের সুধার রসাস্বাদে ত্রুটি করিবেন না।

পঞ্চ শস্য—সংগ্রাহক শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ। ১নং বিবি রোজিও লেন কলিকাতা হইতে শ্রীব্রজেশ চন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লেখক প্রদীপ, প্রবাহ, জন্মভূমি, অনুসন্ধান, নব্যভারত, সাহিত্য সেবক ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে এই "পঞ্চ শস্য" সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি সূচনায় লিখিয়াছেন "অতীতের স্মৃতির উন্মেষকল্পে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে এই বিবেচনায় ইহার প্রতি কোন সহৃদয় পাঠকের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িলে আপ্যায়িত হইব।" আমাদের মতে শুধু অতীতের স্মৃতির উন্মেষ কেন, বর্ত্তমান সাহিত্যসাধনারও অনেক ইঙ্গিত পাঠক ইহাদের মধ্যে পাইবেন। পুণ্য-চরিত, প্রাচীন-কবি, ভক্তি-প্রসঙ্গ, বঙ্গ-সাহিত্য, কাব্য-সুন্দরী এই পাঁচ ভাগে পঞ্চশস্য বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রতি ভাগে দুইটী করিয়া সন্দর্ভ দেওয়া হইয়াছে। সন্দর্ভ গুলি বেশ সরল প্রাঞ্জল ও ভাববহুল রচনা; যেন উষার আলোকের ন্যায় স্নিগ্ধ—সৌরকিরণস্নাত শিশির বিন্দুর ন্যায় সমুজ্জ্বল। জীবনী, কথা সাহিত্য, ভগবদ্ভক্তি,

স্বদেশ-প্রেম, নাট্য ও কাব্য বিশ্লেষণের একত্র মধুর সমাবেশে গ্রন্থখানি খুব মনোজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি এইরূপ শ্রেণীর গ্রন্থ ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সৎসাহিত্য প্রচারে সহায়তা করিবেন।

সত্যানন্দ।

সেবার পথে—

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসের লেখা। দাম চার আনা মাত্র। মেদিনীপুর হিতৈষী প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীমন্মথ নাথ নাগ মহাশয়কে ধরে' বিনাপয়সায় ছাপিয়ে নিয়েছেন আর তেমনি বিক্রীর টাকাটা কাগজ ও বাঁধাই খরচা বাদে সবটাই মেদিনীপুর তত্ত্বসভার মন্দির তৈরীর জন্য উৎসর্গ করেছেন। কাজেই-এটা তত্ত্বসভারই ৩ নং গ্রন্থ বলে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মুদ্রাকর ও গ্রন্থকার উভয়েই সেবার পথে। এ পথটা ও যদি অনেকে ধরেন তাহ'লে দেশের অনেক সদনুষ্ঠান জোগে থ কৃতে পারে।

এই বইখানি শ্রদ্ধাভাজন G. S. Arnudale সাহেবের "The way to Service" অবলম্বনে লেখা। লেখক সিদ্ধ সেবক ও মহাপুরুষদের অমূল্য উপদেশ গুলি থেকে অম্লান সুরভি ফুলগুলি বেছে বেছে দেববাঞ্ছিত একটি মালা গেঁথেছেন। এমন কঠিন ধর্ম্ম-কথা-গুলি এমন সোজা-মিষ্টি বাঙ্গলায় প্রকাশ করা কম বাহাদুরী নয়। সেবার মধ্য দিয়ে যে ভগবানকে পাওয়া যায় আর দেশের মস্ত কাজ করা যায় এটা বোধ হয় অনেকেই মানবেন।

"ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা তাঁর সৃষ্ট জগৎ সমূহের সেবার দ্বারাই সাধিত হয়"।

* * * * * *

"পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যাহার কোন না কোন অভাব না আছে। আবার এমন কেহও নাই যে কিছু না কিছু না দিতে পারে"।

আমাদের মত চোখ থাকতে কানাগুলোকে এই-রকম পথ যিনি যত দেখিয়ে দিতে পারেন ততই দেশের মঙ্গল। লেখক মঙ্গলদীপ ধরে' অনেকটা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"(ক) সেবা করাই জীবনের সবচেয়ে বেশী আনন্দ ভাবিও।

(খ) তোমার চেয়ে কোন উন্নত-শক্তি তোমায় সেবার পথে চালিত করিতেছেন ও সেবার শক্তি প্রদান করিতেছেন ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিও।

(গ) তোমার মধ্যে যে ঐশী শক্তি বিরাজমান অপরের মধ্যেও তাহার সত্তা আছে ইহা স্বীকার করিও"।

* * * * * *

"একটি ক্ষুদ্র দীপের রশ্মিরেখা যেমন বিরাট অন্ধকারের আবরণের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে, একটি ক্ষুদ্র সেবাও সেইরূপ বিপুল স্বার্থপরতার মাঝে আপন ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া থাকে"।

। গৃহে গৃহে এমনি আলোকের রেখা ফুটে উঠুক আর সকলে চার আনা পয়সার সেবা দিয়ে দেশের এই তত্ত্ব সভাটাকে গড়ে তুলুন এই টুকুই আমাদের আকিঞ্চন।

ঠাকুর-দাদা।

প্রার্থনা।

চাহিনা হইতে আমি বীরের শোভন,
খরসান কৃপাণ উজ্জ্বল,
করিয়ো আমারে প্রভু! যষ্টি কুণ্ঠন,
স্থবিরের পরম সম্বল।

ক'রোনা আমারে দেব! ভূষা মণিময়
সাজাইতে রমণী ধনীর;
ক'রো মোরে স্বল্পমূল্য শঙ্খের বলয়
সুমঙ্গল চিহ্ন এয়োতীর।

ক্রোটন করিয়া মোরে ক'রোনা বিফল
বিধবার মত রূপ যায়,
করিয়ো আমারে নাথ! তুলসীর দল
তব পদ পূজার সজ্জায়।

শ্রীঅচিন্ত্য নাথ দে।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ। অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ৩য় সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। ,, প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। ,, অমৃতলাল বসু।
রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। ,, রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
১৩। ,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। ,, কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। ,, হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম।
১৮। ,, কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। ,, যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। ,, হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। শ্রীযুক্ত মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। ,, মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। ,, নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ, এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী।
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
২৯। রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৩০। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩।৵৹ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৹ আনা। নমুনার জন্য ।৵৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২৷৹ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম প্রতি মাসে		১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি মাসে		২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কেনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

শিল্পী—শ্রীমানববন্ধু কানুনগো]

মেদিনীপুর সহরে জলপ্লাবন

[মেদিনীপুর আর্টডেন

Bengal Art Studio & Printing Ltd.—82, Nimtola Ghat Street, Calcutta.

১ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। { ৩য় সংখ্যা।

পূজার আয়োজন।

১।

মার্জ্জনা করি দেরে তোরা আজ সারা গৃহ প্রাঙ্গন,
দুয়ারে এঁকে দে লক্ষ্মী মাতার চরণ আলিম্পন ;
আন ত্বরা করি দুর্ব্বা শ্যামল,
পেলব চুত পল্লবদল,
পাত্র ভরিয়া পূজার অর্ঘ্য সিন্দুর চন্দন ;
আজিকে হবে যে কমলা মাতার গৃহে গৃহে আগমন।

২।

গোময় প্রলেপে মরায়ের তল করিয়া পরিষ্কার,
পানলই শালি ধান্যের বিঁড়ে সাজায়ে দে ভারে ভার ;
তীর্থ সলিলে করিয়া পূর্ণ,
মঙ্গল ঘট ভরে দে তূর্ণ,
ধুপাধারে ধূপ করি ভরপুর কর পূজা আয়োজন;
আজিকে হবে যে কমলা মাতার গৃহে গৃহে আগমন।

৩।

চয়ন করিয়া গাঁদাফুল তোরা সাজি ভরে আজ আন,
করিতে হবে যে সোনার বরণী মা'র শ্রীচরণে দান ;
ঘৃত দীপ জ্বালি তুলসীর তল,
স্নিগ্ধ আলোকে করে দে উজ্জল,
থালি চুড় চুড় ফল মূল ভরি কর আজি নিবেদন ;
শঙ্খ স্বননে ঘোষনা কররে কমলার আগমন।

৪।

থাকিসনে তোরা ওলো এয়োতীরা মুখ ভার করি আজ,
বাঁধি কুন্তল ক্ষৌম বস্ত্রে করে নে সকাল সাজ,
মাঠ হতে আজ এসেছে ধান্য,
তারি তণ্ডুলে কর নবান্ন,
হাসিমুখে তোরা শ্রীচরণতলে করে দেরে নিবেদন,
সারা বছরের দৈন্য নাশিতে আজি মা'র আগমন

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ।

মাধ্যন্দিন শতপথব্রাহ্মণের কালনির্ণয়।

—*(*)*—

হিন্দুমাত্রেরই বেদ অতি আদরের সামগ্রী। শ্রদ্ধাবান্ হিন্দুর চক্ষে ইহার ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই। বেদের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসকগণ পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন এবং বৈদান্তিকগণ উত্তরমীমাংসা বা ঔপনিষদ দর্শন সঙ্কলন করিয়াছেন। বেদসমূহ বিরাটপুরুষের নিঃশ্বাসতুল্য (১)। আবার ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (২)। এই বিরাট বেদগ্রন্থ লক্ষশ্লোক সমন্বিত (৩) ও চতুষ্পাদ। অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে এই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত দেখিয়া ব্যাসদেব পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় চারিভাগে বিভাগ করেন। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের অন্যতম শাখা। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ একপ্রকার ছিল; বেদব্যাস ঐ যজুঃ প্রধান বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল (৪)। মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদতরুর সপ্তবিংশতিশাখা প্রণয়ন করিলেন। তিনি এই সমুদয় শাখা বহুশিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গুরুসেবাপরায়ণ পরমধর্ম্মজ্ঞ শিষ্য ছিলেন। পূর্ব্বে ঋষিগণ এইরূপ নিয়ম করিলেন যে অদ্য যিনি আমাদের মহামেরুস্থিত সমাজে আগমন না করিবেন, সপ্তরাত্রির পর তিনি ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই এই নিয়ম পালন করিলেন কিন্তু বৈশম্পায়ন একাকী ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় ভাগিনেয়কে পদের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং শিষ্যদিগকে বলিলেন তোমরা আমার জন্য ব্রহ্মহত্যাপহ ব্রত আচরণ কর। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন এই সকল ব্রাহ্মণ অল্পতেজস্বী, ইহাদিগকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই, আমিই এই ব্রত আচরণ করিব। গুরু এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন তুমি দ্বিজগণের অবমাননাকারী, অতএব আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ কর। এই সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে তুমি তেজোহীন বলিতেছ; আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তোমার ন্যায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তদনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—আপনাকে ভক্তিবশতঃ আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম। আমারও আর আপনার নিকট অধ্যয়নে প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি এই গ্রহণ করুন। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া রুধিরাক্ত সাকার যজুর্ব্বেদ উদ্গিরণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তিত্তিরিপক্ষীর রূপধারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এই জন্য উক্ত যজুর্ব্বেদশাখা তৈত্তিরীয় নামে অভিহিত। যে ব্রাহ্মণগণ বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যাপাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন তাহাদের শাখা চরকাধ্বর্য্যু শাখা নামে প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ পাইবার অভিলাষী হইয়া দিবাকরের স্তব করিলেন। সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বর দান করিতে উদ্যত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন— আমার গুরুও যাহা জানে না ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন। দিবাকর তাঁহাকে বৈশম্পায়ন যাহা জানেন না তাদৃশ অযাতযাম নামক যজুর্ব্বেদ দান করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ এই অযাতযাম যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন তাহারা বাজি শব্দে অভিহিত হয়। এই বাজিপ্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের প্রবর্ত্তক (৫)।

(১) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩)। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২।৪।১০।

(২) উক্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দেখুন।

(৩) বিষ্ণু পুরাণ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থ অধ্যায়, ১ম শ্লোক।

(৪) বিষ্ণু পুরাণ ৩।৪।১১

(৫) বিষ্ণু পুরাণ, তৃতীয় অংশ, পঞ্চম অধ্যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ মতে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণির শিষ্য ছিলেন। ৬।৩।৭

উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় এই দুই প্রধান শাখা। এই দুইটী শাখা শুক্লযজুর্ব্বেদ নামেও অভিহিত হয়। মৈত্রায়নী কঠ প্রভৃতি শাখা শেষোক্ত শাখার অন্তর্গত এবং কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রথমোক্ত শাখার অন্তর্গত।

মন্ত্ররূপ সংহিতা গ্রন্থ কোথায় কি কার্য্যে কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে ব্রাহ্মণসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণসমূহ কর্ম্মকাণ্ড ও ইহার শেষ ভাগ জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হয়। ব্রাহ্মণসমূহকে ভিত্তি করিয়াই উত্তর কালে বেদাঙ্গসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে তৎকালপ্রচলিত আচারব্যবহারের এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণসমূহ বেদের প্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বৈদিক সাহিত্যে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলের অপেক্ষা শতপথ ব্রাহ্মণ বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ইহাতে একশত পথ বা অধ্যায় আছে, এজন্য ইহার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। বাজসনেয় শাখার ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহার অপর নাম বাজসনেয় ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণের কালনির্ণয় করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪টী কাণ্ড আছে। শেষ চতুর্দ্দশ কাণ্ডের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রথমে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে—বেদ অপৌরুষেয়। সুতরাং পুরুষ কর্তৃক বিরচিত না হওয়ায় ইহার কালনির্ণয় করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিলেও কোন্ সময়ে কোন্ ঋষি তাহা প্রথমে দর্শন ও ধারণ করিয়াছিলেন তাহা অনুসন্ধান করায় ক্ষতি নাই, পরন্তু যথেষ্ট লাভ আছে।

কোনও গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে:—

(ক) সেই গ্রন্থের উল্লিখিত জ্যোতিষবচন বা গ্রহাদিসংস্থান বিচার দ্বারা।

(খ) সেই গ্রন্থের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা জাতি আদির বিবরণ হইতে; যদি গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তি বা জাতির সহিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা জাতির ঐক্য দৃঢ়রূপে প্রতীয়মান হয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বা জাতির আবির্ভাব কাল জানা থাকে তবেই এই উপায়ে ফল লাভ হইতে পারে। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নামোল্লেখ পাইলেও এই বিষয়ে অনেকটা সাহায্য হয়।

(গ) সেই গ্রন্থের ভাষা পরীক্ষা দ্বারা। এই উপায় দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে কালনির্ণয় হইতে পারে না। কতকালে ভাষার কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা অনুমানসাপেক্ষ মাত্র। সেই অনুমান কখনও অবিসম্বাদী হইতে পারে না।

(ক) অতএব প্রথমোক্ত উপায় অগ্রে অবলম্বন করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহা দেখা যাউক। শতপথ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় কাণ্ড, প্রথম প্রপাঠক; দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ (১):—

১। তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; কেন না, এই যে কৃত্তিকা ইহাই অগ্নির নক্ষত্র * * *

৩। ইহাই পূর্ব্বদিক হইতে চ্যুত হয় না; অপর সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব্বদিক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। * * *

৬। তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া রোহিণীতেই অগ্নিদ্বয়কে আধান করিয়াছিলেন। * * *

৮। তিনি মৃগশীর্ষে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই যে মৃগশীর্ষ ইহা প্রজাপতির শির * * *

৯। অনন্তর তিনি যে কারণে মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না—ইহা প্রজাপতির শরীর; তাঁহারা যখন ইহাকে ত্রিকাণ্ড ইষু দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। আত্মহীন

(১) পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ অবলম্বন করা হইল। বাহুল্যভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত করা হইল না।

শূণ্য স্থান স্বরূপ এবং অবক্রিয় ও নির্ব্বীর্য্য। সেইজন্য তিনি মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না।

১০। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, এই দেব প্রজাপতির শরীর শূণ্যস্থানস্বরূপ নহে এবং অবক্রিয় নহে। সেইজন্য তিনি মৃগশীর্ষে আধান করিবেনই। তিনি পুনর্ব্বসুদ্বয়ে পুনরাধেয় আধান করিবেন।

১১। তিনি ফাল্গুনীসমূহে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই সমূহ ইন্দ্রের নক্ষত্র, এবং ইহার প্রতি-নাম বিশিষ্ট; কেননা, ইন্দ্র অর্জ্জুন নামে অভিহিত; ইহা ইহার গুহ্য নাম এবং ইহারাও অর্জ্জুনী নামে কথিত। * * *

১২। তিনি হস্তে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; ***

১৩। তিনি চিত্রায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন ***

১৭। দেবগণ সমাগত হইয়া বলিলেন—আমরা চিত্র ভাবে রহিয়াছি যে এতগুলি শত্রুকে আমরা কি করিতে পারিয়াছি। ইহাই চিত্রার চিত্রাত্ব (অদ্ভুতত্ব) যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চিত্রায় আধান করেন, তিনি চিত্রভাবে থাকেন; তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করেন ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়ই এই নক্ষত্রকে (আধানের জন্য) স্বীকার করিবেন। * * *

শতপথ ব্রাহ্মণ, উক্ত কাণ্ড ও প্রপাঠক, তৃতীয় ব্রাহ্মণ:—

১। বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতুগুলি দেবগণ এবং শরৎ হেমন্ত ও শিশির এই ঋতুগুলি পিতৃগণ। যে অর্দ্ধ মাস আপূর্য্যমাণ (শুক্ল) তাহা দেবগণ এবং যাহা অপক্ষীয়মাণ হয় (কৃষ্ণ) তাহা পিতৃগণ। দিবাই দেবগণ এবং রাত্রি পিতৃগণ। আবার দিবার পূর্ব্বার্দ্ধ দেবগণ এবং অপরাহ্ন পিতৃগণ। *

৩। তাহা (সূর্য্য) যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয় এবং সেই সময়ে দেবগণকে অভিরক্ষিত করে। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয় এবং সেই সময়ে পিতৃগণকে অভিরক্ষিত করে।

৪। তাহা যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে তখন তিনি অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ পাপরহিত, যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করেন এবং যদিও অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হন। আর যখন (সূর্য্য) দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে সেই সময়ে যিনি আধান করেন তিনি পাপকে অপহত করিতে পারেন না, কেননা পিতৃগণ পাপরহিত নহেন। পিতৃগণ মর্ত্ত্য; অতএব যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি আয়ুর পূর্ব্বে মৃত হন।

৫। বসন্ত ব্রহ্ম, গ্রীষ্ম ক্ষত্র এবং বর্ষা প্রজা। অতএব ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, কেন না বসন্ত ব্রহ্ম; অতএব ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেন না, গ্রীষ্ম ক্ষত্র; অতএব বৈশ্য বর্ষায় আধান করিবেন, কেন না বর্ষা প্রজা। * * * *

শতপথব্রাহ্মণ, উক্ত কাণ্ড দ্বিতীয় প্রপাঠক, প্রথম ব্রাহ্মণ:—

৯। আদিত্যই সমস্ত ঋতু। যখন ইহা উদিত হন, তখন বসন্ত। যখন গাভীসমূহ দোহনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন গ্রীষ্ম, যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয় তখন বর্ষা। যখন অপরাহ্ন তখন শরৎ; এবং যখন ইহা অস্তগমন করে তখন হেমন্ত।

শতপথব্রাহ্মণ প্রথম কাণ্ড চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থ ব্রাহ্মণ:—

১৩। অনন্তর তিনি "স্বাহা" "স্বাহা" উচ্চারণে যাজ্য পাঠ করিয়া থাকেন। স্বাহাকার যজ্ঞের অন্ত এবং হেমন্ত ঋতু সমূহের অন্ত, কেন না বসন্ত ইহার অপর ভাগে অবস্থিত।

শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৪।২

২৯। মধু ও মাধব দুইটি বসন্ত ঋতু—ঐ দুইটির ইহাই নাম। এইরূপে নাম গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিন্যাস করেন।

ব্রাহ্মণ সমূহে কোথাও পঞ্চ ঋতু, কোথাও ছয়টি ঋতুর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ শীত ঋতুকে হেমন্তের

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। সেজন্য শেষোক্ত ব্রাহ্মণে কেবল মাত্র পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ দেখা গেল।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বসন্ত ঋতু হইতে বৎসরের আরম্ভ হইত এবং শীত ঋতুতে শেষ হইত। আবার ইহাও প্রতীতি হইতেছে যে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে আগমন করিলে পবিত্র সময় বিবেচিত হইত। কৃত্তিকা নক্ষত্রে আধান করিবার বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে আগমন করিবার বিষয়ক নহে; তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ১৮।১৯ মন্ত্র পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে।

বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎ এই তিন ঋতু ভিন্ন অগ্ন্যাধান করিবার বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে এবং কৃত্তিকাদি নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করিবার বিষয় বলা হইয়াছে। সুতরাং কৃত্তিকাদি উপরোক্ত নক্ষত্রে উপরোক্ত ঋতুতে সূর্য্য অবস্থান করেন ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। বসন্তের দুইটি মাস; তন্মধ্যে প্রথম মধু অর্থাৎ চৈত্র মাসই বৎসরের প্রথম মাস ধরিতে হইবে।

উপরে যে ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার (তৃতীয় ব্রাহ্মণের) চতুর্থ মন্ত্র দেখিলে প্রতীতি হয় যে তৎকালে সূর্য্য উত্তর দিকে আবর্ত্তন করিলে বসন্ত-ঋতু-প্রবৃত্তি গণনা করা হইত। এক্ষণে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে "উত্তর দিকে আবর্ত্তন" এই শব্দের অর্থ কি "উত্তরায়ণ" না "নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে প্রয়াণ"?

প্রথমোক্ত অর্থের স্বপক্ষে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে—

(১) শব্দের সরলার্থ ধরিলে 'উত্তর দিকে আবর্ত্তন' এই বাক্যের অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না (১)। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তে আগমন করিলে গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতুর প্রবৃত্তি হইতে পারে, বসন্তের নহে। সুতরাং বসন্তে বৎসরারম্ভ ধরিলে তৎকালে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে প্রয়াণ হইতে পারে না।

(২) যাহারা ক্ষত্রিয় তাহারা চিত্রানক্ষত্রে আধান করিবেন এবং গ্রীষ্ম ঋতুতেও আধান করিবেন। তাহা হইলে চিত্রানক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থানকালীন গ্রীষ্ম ঋতু হওয়া উচিত, অন্যথা উভয় প্রাপ্তি ঘটে না। এই গ্রীষ্মের পর যে বর্ষা ঋতু প্রবৃত্ত হইবে তাহাও উত্তরায়ণের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এক এক ঋতুতে ৪½ নক্ষত্র; কারণ ছয় ঋতুতে ২৭ নক্ষত্র (২)। চিত্রানক্ষত্রকে গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ নক্ষত্র গণনা করিলে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে বর্ষা ঋতুর শেষ নক্ষত্র ধরা যাইতে পারে। এইরূপ গণনা সমীচীন। কারণ পরবর্ত্তী নক্ষত্রের নাম "মূলা"। সম্ভবতঃ ঐ নক্ষত্র এক সময়ে দক্ষিণায়নারম্ভ সূচনা করিত বলিয়া তাহা উক্ত নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এইরূপ গণনায় কৃত্তিকা নক্ষত্রে উত্তরায়ণারম্ভ না হইয়া মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হওয়া উচিত। পূর্ব্বে এক সময়ে ঐরূপই হইত সন্দেহ নাই। পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে লাগিল, কিন্তু চিত্রানক্ষত্র পূর্ব্ববৎ ক্ষত্রগণের অগ্ন্যাধানের উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিল। উপরে যে ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে মৃগশিরা নক্ষত্র প্রজাপতির শির বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতিই সম্বৎসর (৩)। সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণেও প্রাচীন মত অনুসৃত হইয়া মৃগশিরা নক্ষত্র সম্বৎসরের প্রারম্ভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদি কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (Vernal Equinox) বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রের শেষ পাদে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্তি হইবে এবং বিশাখানক্ষত্রে শারদ

(১) মহাভারতে 'আবর্ত্তন' শব্দের অর্থ উত্তর দিকে বা দক্ষিণ দিকে গমন বলা হইয়াছে যথা :—

"অত্রাবৃত্তো দিনকরঃ স্রবসং ক্ষরতে পয়ঃ"

মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্ব ১৯০।১৫

এখানে দক্ষিণ দিক্ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে।

(২) বসুস্তষ্টা ভবোঽজশ্চ মিত্রঃ সর্পোঽশ্বিনৌ জলং।
ধাতা কশ্চায়নাদ্যাঃ স্যুরর্দ্ধপঞ্চমভস্তু ঋতুঃ॥

— বেদাঙ্গজ্যোতিষ

(৩) শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।২।৬

(Autumnal Equinox) হইবে। তাহা হইলে গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যের চিত্রানক্ষত্রে অবস্থান সম্ভবপর হয় না।

(৩) বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবযান পথের বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে—

"তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চিরভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।"

যাহারা এইরূপ পঞ্চাগ্নিজ্ঞানসম্পন্ন (অর্থাৎ গৃহস্থগণ) এবং যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্য (হিরণ্যগর্ভাত্মা ব্রহ্ম) উপাসনা করে তাহারা অর্চির-ভিমানিনী দেবতাতে প্রবিষ্ট হয়, অর্চি হইতে দিনাভিমানিনী দেবতা, দিনাভিমানিনী দেবতা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তথা হইতে যে ছয় মাস উত্তর দিকে আদিত্য আগমন করে সেই মাস সমূহ, তথা হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যুত দেবতা, তথা হইতে তাহাদিগকে মানসপুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বাস করে, তাহাদের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।১ ঐরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮।২৪ দেখুন। এই কারণেই ভীষ্ম মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে হংসরূপী ঋষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়া বলিলেন—

তে তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
গাঙ্গেয়ং ভরতশ্রেষ্ঠং দক্ষিণেন চ ভাস্করম্ ॥ ১০১ ॥
ইতরেতমামন্ত্র্য প্রাহুস্তত্র মনীষিণঃ।
ভীষ্মঃ কথং মহাত্মা সন্ সংস্থাতা দক্ষিণায়নে ॥১০২॥
তানব্রবীচ্ছান্তনবো নাহং গন্তা কথঞ্চন।
দক্ষিণাবর্ত্ত আদিত্যে এতন্মে মনসি স্থিতম্ ॥ ১০৪ ॥
গমিষ্যামি স্বকং স্থানমাসীদ্ যন্মে পুরাতনম্।
উদগায়ন আদিত্যে হংসাঃ সত্যং ব্রবীমি বঃ ॥ ১০৫ ॥

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ১১৯ অধ্যায়।

সেই মনীষী ব্যক্তিগণ সেই মহাত্মা ভরতশ্রেষ্ঠ গঙ্গাতনয় ও দক্ষিণ দিগ্ অবলম্বী সূর্য্যকে দর্শন করিয়া ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া কিরূপে দক্ষিণায়নে প্রয়াণ করিবেন? ভীষ্ম তাহাদিগকে বলিলেন—আমার মনে স্থির আছে যে আদিত্য দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিতে আমি কখনই প্রয়াণ করিব না। হে হংসগণ! তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে আমার পুরাতন স্থান আদিত্য উত্তরায়ণে গমন করিলে আমি গমন করিব।

ভীষ্ম পানীয় চাহিলে ও রাজগণ শীতল বারিকুম্ভে জল আনয়ন করিলে ভীষ্ম বলিলেন—

অপক্রান্তো মনুষ্যেভ্যঃ শরশয্যাং গতোঽস্ম্যহম্।
প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠামি নিবৃত্তিং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১২১ অধ্যায় -১৪ শ্লোক।

আমি মনুষ্যগণ হইতে অপক্রান্ত হইয়া শরশয্যাশ্রয় করিয়াছি। এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের নিবৃত্তি অপেক্ষা করিয়া অবস্থিত আছি। এখানে বলা আবশ্যক যে ভীষ্ম যখন শরশয্যা গ্রহণ করেন তখন কৃষ্ণ পক্ষ দক্ষিণায়ণ সুতরাং ভীষ্ম ঐরূপ বলিলেন। আবার যখন সূর্য্য উত্তর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট গমন করিলে ভীষ্ম বলিলেন

অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যাঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতা।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥ ২৭ ॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥২৮

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭ অধ্যায়

আমি অদ্য ৫৮ রাত্রি নিশিতাগ্রশরের উপর শয়ন করিয়া আছি, তাহা আমার শতবর্ষ বলিয়া মনে হইতেছে। এই সৌম্য (উত্তরায়ণ) মাঘ মাস সমাগত হইয়াছে, ইহার তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট আছে; ইহা শুক্লপক্ষ হওয়াই উচিত। এই সকল ও অন্যান্য কথা বলিয়া ভীষ্মদেব যোগে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহাদের উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষের আগমন মাত্রকেই শুভ বলিয়া বিবেচনা করিলেন (১) এবং ঋষিগণও তাহাই বলিলেন। উপরোক্ত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এই মত দৃঢ় করিতেছে। অতএব বোঝা গেল সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম নহে। যদি উত্তর দিক্‌প্রবৃত্তি মাত্রই পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অগ্ন্যাধান প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম সূর্য্যের উত্তর দিকে গমন মাত্রেই অনুষ্ঠেয় বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি "সূর্য্যের উত্তর দিকে আবর্ত্তন" শব্দের অর্থ 'নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম' হয় তাহা হইলে কতক পুণ্যকর্ম্ম প্রকৃত দক্ষিণায়নের পর অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে।

(৪) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে গবানয়নসত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সংবৎসর সাধ্য যজ্ঞ। শতপথব্রাহ্মণেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে (২)। বিষুবদ্দিন ইহার মধ্যবর্ত্তী প্রধান দিবস (১৮ অধ্যায় চতুর্থ খণ্ড)। উক্ত ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে লিখিত আছে "পুরুষের দেহের যেমন দক্ষিণার্দ্ধ, বিষুবের সেইরূপ পূর্ব্বার্দ্ধ; পুরুষের যেমন বামার্দ্ধ, বিষুবের তেমনই উত্তরার্দ্ধ এবং সেই জন্যই (বিষুবের পরবর্ত্তী ভাগের) নাম উত্তর" "এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা বলেন বিষুবদ্দিনেই এই শাস্ত্র পাঠ করিবে। উক্‌থ সকলের মধ্যে ইহাই বিষুবস্বরূপ। এই শাস্ত্রকেই বিষুব বলে।" ইত্যাদি। এই বিষুবদ্দিনের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন দিনে স্বরসাম গীত হইত (১৮ অধ্যায় ৪র্থ ও পঞ্চম খণ্ড)। তৎপূর্ব্বদিনে অভিজিৎ। (৩)

এই অভিজিৎ নক্ষত্র মকররাশির ৬.৪০ অংশ হইতে ১০.৫৩।২০ অংশ পর্য্যন্ত অবস্থিত। সুতরাং বেশ বোঝা যাইতেছে যে উক্ত সত্র প্রবর্ত্তনকালে ১০।৫৩।২০ অংশের তিন দিন পরে (অর্থাৎ তাৎকালিক সূর্য্যের ১° মধ্যগতি ধরিলে) ১৩।৫৩ অংশে সূর্য্য আগমন করিলে বিষুবদ্দিন হইত। এই বিষুবদ্দিন নিশ্চয়ই (Autumnal equinox) শারদ বিষুবদিন। তাহার ৯০ অংশ পরে অর্থাৎ মেষরাশির ১৩।৫৩ অংশে সূর্য্য আগমন করিলে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি (Winter solstice) হইত। ইহাতে ভরণী নক্ষত্রের আদ্যপাদে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রবৃত্তি ও বৎসরারম্ভ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে কর্কট রাশির উক্ত অংশে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়। উত্তরায়ণের প্রারম্ভ হইতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত যে সকল নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থান করেন, তাহাতে অগ্ন্যাধান বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়।[১] বোধ হয় তাহার কারণ এই যে তৎকালে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থান করিতেন।

এইবার দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিব :—

(১) উপরোক্ত শতপথ ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কণ্ডিকা পাঠে জানা যায় যে সূর্য্য উত্তর দিকে আবর্ত্তন করিয়া দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়। সুতরাং দেবগণ কোথায় অবস্থান করেন তাহা বিচার করা আবশ্যক।

বৈদিক গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে আর্য্যগণ নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে বাস করিতেন। ইহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষোক্ত দীর্ঘতম দিবা ও হ্রস্বতম রাত্রিমানের ভেদ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে (৪)।

সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—

মেষাদাবুদিতঃ সূর্য্যস্ত্রীন্ রাশীনুদগুত্তরম্।
সঞ্চরন্ প্রাগহর্মধ্যম পূরয়ন্মেরুবাসিনাম্॥

বৎসরারম্ভ ধরিতে হয়। কর্কট রাশি হইতে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্তি কোথাও পাওয়া যায় না।

---

(১) উত্তরদিক্ সম্বন্ধে মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে ১১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে।
"উত্তরেতি পরিখ্যাতা সর্ব্বকর্ম্মসু চোত্তরা"। ২৭॥

(২) শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।২।১,২,৩

(৩) কেহ কেহ বলেন 'বিষুবান' শব্দে winter solstice বুঝাইত। তাহাদের মতে সূর্য্য যখন দক্ষিণ সীমায় উপনীত হইতেন তখন ঋষিগণ মনে করিতেন যে সূর্য্য এইবার পড়িয়া যাইবে। এই theory যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিষুবান বৎসরের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় Summer solstice বা দক্ষিণায়নপ্রবৃত্তি হইতে

(৪) এ বিষয়ে মৎস্য পুরাণ ১২৪ অধ্যায় ৭১-৮০ শ্লোক দেখুন

সূর্য্য মেষরাশির আদিতে উদিত হইয়া উত্তর দিকে তিন রাশি ভ্রমণ করিলে মেরুবাসীদের দিবাভাগের প্রথমার্দ্ধ হয়।

মেরৌ মেষাদিচক্রার্দ্ধে দেবাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্‌
সকৃদেবোদিতং তদ্বদসুরাশ্চ তুলা দিগম্‌॥

মেরুতে অবস্থিত দেবগণ মেষাদি চক্রের অর্দ্ধে সূর্য্যকে একবার মাত্র উদিত দেখিতে পায়। সেইরূপ অসুরগণও তুলারাশি হইতে সেইরূপ (একবার) উদিত দেখে। North pole এবং South pole এ একটী দিন ও একটী রাত্রি।

ভূবৃত্ত পাদ বিবরাস্তাশ্চাস্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাভ্যশ্চোত্তরতো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ॥

মেরু তাহাদের উত্তরে এবং তথায় সুরগণ বাস করেন। যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে সূর্য্যের অবস্থানকালই অভিপ্রেত হইতেছে। কিন্তু কূর্ম্ম পুরাণ (১), বরাহ পুরাণ (২), বিষ্ণু পুরাণ (৩) প্রভৃতির মতে দেবগণাশ্রিত সুমেরু পর্ব্বত ইলাবৃত্ত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

(২) জ্যোতিষ বেদাঙ্গের মতে—

প্রপদ্যেতে ধনিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্‌।
সার্পার্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা॥

সূর্য্য এবং চন্দ্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদি বিন্দুতে আসিলে তাহাদের উত্তরায়ণ এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের মধ্য বিন্দুতে আসিলে দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য মাঘ ও শ্রাবণ মাসেই এই দুই বিন্দুতে আসিয়া থাকেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিবিন্দুতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে ভরণী নক্ষত্রের শেষপাদে বাসন্তিকক্রান্তিপাত হইবে।

জ্যোতিষ বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ সমূহ হইতে সঙ্কলিত। সুতরাং ব্রাহ্মণের সময় নির্ণয়ে ইহার মূল্য স্বীকার্য্য। ব্রাহ্মণ সমূহ ইহার পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া ধরিতে হইবে।

(৩) তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে (৪) ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৎসরের আরম্ভ সূচনা করে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মতে উত্তরফাল্গুনী বর্ষের মুখ এবং পূর্ব্বফাল্গুনী দ্বারা পুচ্ছ সংঘটিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ চান্দ্রবৎসর সম্বন্ধীয়। কারণ প্রাচীন আর্য্যগণ চান্দ্র ও সৌর উভয় মতে বর্ষ গণনা করিতেন। এই অনুমান যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে ফাল্গুনী পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তী কালে নিশ্চয়ই উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইত। অপরা কৃত্তিকানক্ষত্রে সৌর বৎসরের প্রারম্ভ এই বাক্য সমন্বয় হয় না। উত্তরায়ণ ফাল্গুণ মাসে আরম্ভ হইলে বৈশাখ মাসে বাসন্তীক্রান্তিপাত হওয়া সম্ভব।

উত্তরায়ণ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আরম্ভ হইলে দক্ষিণায়ন ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে আরম্ভ হয়। প্রকৃত পক্ষে যে সেইরূপই হইত তাহার প্রমাণ এই যে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষকে (অর্থাৎ তৎকালিন দক্ষিণায়নের প্রথম পক্ষকে) অপর পক্ষ বা প্রেতপক্ষ বলে এবং এখনও তাহাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি হয়।

(৪) শতপথ ব্রাহ্মণের সময়ে রোহিণী নক্ষত্রে বৈশাখ মাসের অমাবস্যা হইতে (৫)। তাহা হইলে সূর্য্য মৃগশিরায় গমন করিলে চন্দ্র জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিত ও পূর্ণিমা হইত। তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে। জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (৬)

(১) কূর্ম্ম পুরাণ পূর্ব্ব ভাগ ৪৪।৪৫ অধ্যায়। মৎস্য পুরাণের মতে মেরু সকলের উত্তরে—সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্তু দক্ষিণে ১২৪।৩৮

(২) ৭৫ অধ্যায়। ব্রহ্মপুরাণ ১৮ অধ্যায় ২০ শ্লোক।

মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায় ১২।১৩ শ্লোক। উদ্যোগ পর্ব্ব ষষ্ঠ অধ্যায় ১০-৩১ শ্লোক।

(৩) ২য় অংশ, ২য় অধ্যায় ১৪ শ্লোক। বিষ্ণু পুরাণ প্রক্রিয়াপাদ ৩৪।৩৫ অধ্যায়। অগ্নি পুরাণ ১০৮ অধ্যায়।

(৪) ৭।৪।৮

(৫)। শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।১।১।৭

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণ ৮।২।১।১৬, ৭।৪।২।২৯; ৮।৩।২।৬, ৮।৩।২।৬; ৮।৭।১।১৪ পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হয়।

যদি বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভ হয় তাহা হইলে তৎকালে সূর্য্য মৃগশিরায় অবস্থান করিতেন বোঝা যায়।

(৫) শতপথ ব্রাহ্মণের যে অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় যে কৃত্তিকা বিষুববৃত্তে অবস্থিত ছিল, অন্যথা তাহা "পূর্ব্বদিক হইতে চ্যুত হয় না" একথা বলা হইত না অতএব কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য প্রবেশ করিলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই মত অনুসারে বসন্ত কালে বৎসরারম্ভ কেন হইত তাহার কারণ নির্দ্দেশ হয় না এবং সপ্তর্ষিগণের সহিত বিবাহ বিষয়ও বোঝা যায় না।

বসন্ত ঋতুতে বৎসরারম্ভ কেন ধরা হইত? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে এক সময়ে পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদে সূর্য্য আসিলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সে সময়ে উত্তরায়ণ হইতে বসন্ত ঋতু গণনা ও বৎসরারম্ভ হইত। তৎকালে মৃগশিরায় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। পরে সূর্য্য কৃত্তিকায় আসিলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইলে ও পূর্ব্ববৎ বসন্ত ঋতুতে বৎসরারম্ভ হইতে লাগিল।

শেষোক্ত মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ কোথায় বিরচিত বা বিবৃত হইয়াছিল এবং আর্য্যঋষিগণের ঠিক পূর্ব্বদিক নির্ণয় করিবার কি উপাদান ছিল তাহা না জানিলে কৃত্তিকা বিষুববৃত্তে অবস্থিত বলিয়া উক্ত বচন মাত্র হইতে প্রতিপন্ন হয় না। দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় যুক্তিই প্রবল। কিন্তু তাহা প্রথম অর্থের সমর্থন জন্য যে চতুর্থ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার বিরোধী কিন্তু বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকাল হইতে ব্রাহ্মণ সমূহের রচনাকাল নির্ণয় করা অসঙ্গত হইবে।

যাহারা জ্যোতিষ সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও আলোচনা করেন তাহারা জানেন যে মহাবিষুববিন্দুদ্বয় ঈষৎ গতিশীল। এই গতি বিলোম, অর্থাৎ বিন্দুদ্বয় প্রতি বৎসরে পশ্চাদ্দিকে গমনশীল। ইহাকে ইংরাজীতে Precession of the Equinoxes এবং সংস্কৃত ভাষায় অয়নচলন বা অয়নগতি বলে। Equatorial Protuberance এর উপর সূর্য্য ও চন্দ্রের ও গ্রহগণের ক্রিয়াই ইহার মুখ্য কারণ।

ত্রিংশৎকৃত্বো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্গুণাৎ ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাৎ যদবাপ্যতে॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।
তৎ সংস্কৃতাৎ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়াচরদলাদিকম্॥
— সূর্য্য সিদ্ধান্ত ত্রিপ্রশ্নাধিকার ৯।১০ শ্লোক

এক যুগে রাশি চক্র পূর্ব্বদিকে ৩০×২০=৬০০ বার ভ্রমণ করে। এক যুগের অহর্গণকে ৬০০ দ্বারা গুণ করিয়া ভূদিন বা সৌরদিনের দ্বারা ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই ভাগ ফলের ভুজাংশকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা অয়নাংশ।

আর্য্য জ্যোতিষীগণ প্রতি বৎসরে এই অয়নগতি ৫৪″ বিকলা স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ৫০.২″ বিকলা মধ্যমান। এক্ষণে বাসন্ত বিষুবদিনে সায়নরবিসংক্রান্তি প্রচলিত পঞ্জিকামতে ১১।৮।৩৯।১৮ এবং উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি ৮।৮।৩৯।১৮। যদি ব্রাহ্মণ সমূহের কালনির্ণয়ে কৃত্তিকার প্রারম্ভে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি ধরা যায় তাহা হইলে ০।২৬।৪০ অংশে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইত; অর্থাৎ ১৩৮।০।৪২ অংশ বিলোমগতি হইয়াছে এবং যদি কৃত্তিকার প্রারম্ভে বিষুবদিন ধরা যায় তাহা হইলে ০।২৬।৪০ অংশে বিষুবদিন অর্থাৎ ৪৮।০।৪২ অংশ বিলোমগতি হইয়াছে। আর্য্যজ্যোতিষীগণের ধৃত অয়নগতি অনুসারে যথাক্রমে ৯২০০ বৎসর অথবা ৩২০০ বৎসর পূর্ব্বে শতপথ ব্রাহ্মণের কাল বলিতে হইবে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণের মতে যথাক্রমে ৯৮৯৮ বৎসর ও ৩৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচনাকাল। ভরণী নক্ষত্রের প্রথম পাদে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি ধরিলে ৮৩৪৮ বৎসর বা ৯০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচনাকাল।

(খ) শতপথ ব্রাহ্মণের রাজা জনমেজয় ও জনকের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই জনমেজয় যে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র ছিলেন তাহা জানিবার কিছু মাত্র উপায় নাই।

তিনি কুরুগণের রাজা হইলেও ঐক্য সাধনের অন্য কোনও উপায় নাই। বিদেহরাজ জনক হইলেই তিনি সীতার পিতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যদিও অর্জ্জুনের নামের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা ইন্দ্রের অন্যতম নাম স্বরূপে (১)। যদি শতপথ ব্রাহ্মণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে বিরচিত হইয়াছিল তাহা হইলে অবশ্যই অভূতপূর্ব্ব রোমহর্ষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাইতাম। বৃহদারণ্যকোপনিষদে জনক রাজার সভা বিদ্বজ্জনপূর্ণ ও মহাপ্রাণ যুধাজিৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে সেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে জনমেজয় পরীক্ষিতকে কাবষেয়-তুর ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন (৩৯।৭)। কিন্তু মহাভারতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণে অদ্বিতীয় ধনুর্বিদ্যা পারদর্শী অর্জ্জুনের কোনও অলৌকিক কার্য্যেরই বর্ণনা নাই। সুতরাং কেবলমাত্র নাম সাদৃশ্য ধরিয়া ঐক্যসাধন অসঙ্গত হইবে।

গৌতম ও আসুরির নাম শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতেও পশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে গৌতম শব্দে গৌতম বুদ্ধ এবং আসুরি শব্দে সাংখ্যদার্শনিক কপিলশিষ্য আসুরি (২) অভিপ্রেত হইয়াছে কিন্তু এখানেও নামসাহায্যব্যতীত ঐক্যসাধনের অন্য কোনও উপায় নাই। সাংখ্যদার্শনিক আসুরি যজ্ঞাদি-কর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া গণ্য ছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি নাই; পরন্তু সাংখ্যদর্শন মীমাংসাদর্শনের পরিপন্থী বলা যাইতে পারে। অথচ যেখানে আসুরির উল্লেখ আছে (১।৫।২, ২।৩।১ ইত্যাদি) সেখানেই তিনি যজ্ঞকর্ম্মের উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গৌতমশব্দে শাক্যসম্প্রদায় বুঝিতে হইবে—এইরূপ কোনও অর্থ নাই। ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতম, অহল্যাপতি গৌতম প্রভৃতি অনেক গৌতম ছিলেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত আছে—অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহাঽভ্রূণহা, চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ, পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসঃ অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। ৪।৩।২২। মন্ত্রে শ্রমণ শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালে বিরচিত। কিন্তু এইস্থলে বৌদ্ধযুগে শ্রমণ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ বৌদ্ধগণ 'শ্রমণ' শব্দ সৃজন করেন নাই; পূর্ব্ব হইতে তাহা সংস্কৃতভাষায় ছিল; তাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া রূঢ়ী অর্থে ব্যবহার করিতেন মাত্র। এখানে শ্রমণ শব্দের অর্থ পরিব্রাজক।

আমরা অয়নগণনা দ্বারা যে কালে উপনীত হইয়াছি তাহার অন্যথা হইবার কোনও কারণই দৃষ্ট হইল না। অধিকন্তু অপরাপর গ্রন্থ আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণ সমূহের প্রাচীনত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

পাণিনি 'ব্রাহ্মণ'শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—"পুরাণ-প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ কল্পেষু" (৪।৩।১০৫)। উপনিষদেরও উল্লেখ আছে—"জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে" (১।৪।৭৯)। শেষোক্ত সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় উপনিষদের অনুকরণে অনেকে গ্রন্থরচনা করিতেন। পাণিনির সময়ে তৈত্তিরীয় বারতন্তবীয় ও খাণ্ডিকীয় শাখা বিদ্যমান ছিল (তিত্তিরিবরতন্তুখণ্ডিকোখাচ্ছন্ ৪।৩।১০২)। কলাপী ও বৈশম্পায়নের অন্তেবাসীগণের ও উল্লেখ আছে (কলাপী বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ ৪।৩।১০৪) বৈশম্পায়নের নয়টি শিষ্য— আলম্বি, পলঙ্গ, কমল, ঋচাভ, আরুণি, তাণ্ড্য, শ্যামায়ন, কঠ ও কলাপী। কাশ্যপ, কৌশিক ও শৌনক ঋষির নামোল্লেখ আছে (কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ ৪।৩।১০৩; শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি ৪।৩।১০৬)। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

(১) শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অর্জ্জুনের মহিমাবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রের সহিত তাহার ঐক্যসাধন করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে অর্জ্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

(২) এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥
ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ৭০

আপস্তম্ব বলেন—"কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি"। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"।

জৈমিনি বলেন—"শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"।

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনি অনেক বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক অনেক পণ্ডিতের মতে পাণিনিরও পূর্ব্বতন। তৎপূর্ব্বে আরও নিরুক্তকার ছিলেন। ব্রাহ্মণসমূহ ও নিরুক্তসমূহের মধ্যে অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা মিশর বা আসুরীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন স্বীকার করিলে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের একটী প্রধান অংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০০ বৎসরের পরবর্ত্তী কালে বিরচিত বলা চলে না।

(গ) শতপথ ব্রাহ্মণ প্রাচীন বৈদিকভাষায় বিরচিত; কিন্তু ইহা কতকটা পরিমার্জ্জিত। পাণিনীয় সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা যে ইহা প্রাচীন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাণিনির পূর্ব্বে অনেক বৈয়াকরণ ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে তাহাদের নাম উল্লিখিত আছে। মহেশ নামে এক বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায় এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, অমর ও জৈনেন্দ্র নামক বৈয়াকরণগণের নাম প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে আপিশলি, শাকটায়নের নাম পাণিনিকৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে প্রাঞ্জলভাবে যথারীতি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ ও বিবেচিত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালীও অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মনোহর। সেজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়, জৈমিনীয় বা তলবকার, কৌষিতকী ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহা গোপথব্রাহ্মণ ও সামবেদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের যে পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাষালোচনা হইতে সময়নির্দ্ধারণ প্রায় অসম্ভব। সংস্কৃতভাষা পাণিনির সময়ে প্রায় অবিপক্বতালাভ করিয়াছিল। তাহা এইরূপ পরিণতিলাভ করিতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাণিনির সময়ে বৈদিক প্রয়োগাদি স্বতন্ত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত। সেজন্য পৃথক্ সূত্র রচনা আবশ্যক হইয়াছিল। এই বৈদিক প্রয়োগ পরিত্যাগ ও লৌকিকপ্রয়োগ অবলম্বন করিতে কত সময় লাগিতে পারে তাহা সঠিক অনুমান করিয়া কেহ বলিতে পারে না—ইহাই আমার ধারণা। সেজন্য অয়নগণনালব্ধ সময়ই প্রকৃত সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। তৎসম্বন্ধে যে দুইমত হইতে পারে তদনুসারে উভয়বিধ গণনাই করিয়াছি। আজকাল সকলেই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। তাহারা প্রথমোক্তমত খণ্ডন জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা শেষকথা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভরণীনক্ষত্রের প্রথমপাদে তৎকালে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইত ইহাই সমীচীন বোধ হয়। সেজন্য খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৬৫০০ বৎসর সময়ে শতপথব্রাহ্মণ বিরচিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শ্রীমণীষি নাথ বসু, সরস্বতী এম, এ, বি, এল।

বিহগ।

পিঞ্জর মাঝে বদ্ধ বিহগ মেলিয়া মুক্ত ডানা
উড়িবারে চায় মুক্ত আকাশে, দুয়ারে দিতেছে হানা;
পাখার ঝাপটে ভাঙ্গিবারে চায়
লৌহের কারা পাগলের প্রায়,
বুঝে নাই সে যে কালের নিয়মে বাহিরে আসিতে মানা।

নয়ন সুমুখে প্রাণ খোলা বায়ু কহিতেছে বার বার,
আয় চলে আয় বাহিরের পানে মুক্ত করিয়া দ্বার;
ভেঙ্গে দিয়ে আয় আঁধারের গেহ
কুৎসিৎ, হীন, ঘৃণ্য ও হেয়
হাত তোলা ওই পরের যত্নে ভুলিস্ কেনরে আর!

দাঁড়ের উপর শ্রান্ত বিহগ হেবে মরে আনমনে।
আত্মিতে মমতা মাখান ভবন লৌহের আবরণে॥

শ্রীব্রজমাধব রায়।

দধি।

যে দেশে মাঙ্গলিক দ্রব্যের মধ্যে দধি, শুভ কার্য্যে দধি, সামান্য ভোজনের অনুষ্ঠানেই দধির আবশ্যক হয়, যে দেশে—

"হাতে দই পাতে দই
তবু বলে—
কৈ দই কৈ দই।"

যে দেশে চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই দধির প্রয়োজন, যে দেশে "দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লমাল্যং" যাত্রা কালে প্রয়োজন, যে দেশে সকল প্রকার শুদ্ধাচারে পঞ্চগব্য না হইলে পবিত্রতা সম্পাদিত হয় না, যে দেশে শুধু দধি প্রস্তুত ব্যবসায়ী একটী জাতিই গঠিত হইয়াছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে জাতির উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, সে দেশের এমন এক উৎকৃষ্ট উপকারী দ্রব্যটীর যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা না করিলে, সাময়িক কর্ত্তব্যের ঔদাস্য প্রকাশ করা হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান চিকিৎসক সমাজে যখন দধি একটী উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া আদরণীয় হইয়াছে তখন এ বিষয়ের একটু আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। যদিও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দধি সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জটিল ও সহজ বোধ্য নহে সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অনুষ্ঠান।

দধি কি?—দুগ্ধ উন্মুক্ত স্থানে কিছুকাল রাখিয়া দিলে, বায়ুর উত্তাপ ও কতকগুলি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুগ্ধের ক্ষীর (Lactoes) কে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত করে, এবং সেই অম্ল দ্বারা দুগ্ধের ছানা সংযত হইয়া দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত ইয়েষ্ট নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদ জাত খণ্ড ও কোষিক পদার্থ। কোষাবরণে শ্বেত সার ও তন্মধ্যে প্রটীন পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এই ইয়েষ্ট পচন নিবারক। মদ্য মধ্যে যেরূপ গন্ধ পাওয়া যায় এই ইয়েষ্ট তদনুরূপ গন্ধযুক্ত। স্থানিক উত্তাপের ন্যূনাধিক্যানুসারে ও জীবাণুর আধিপত্যানুসারে দধি ভাল মন্দ হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম শীত ঋতুর উত্তাপের কম বেশ অনুসারে দধিরও আস্বাদ ও গুণ কম বেশ ও প্রস্তুতের সময়ের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা এবং জীবাণু দ্বারা দুগ্ধ স্বভাবতঃ যে দধিতে পরিণত হয় যত্ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করা দধি তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রস্তুতের রকম অনুসারে দধি অনেক প্রকার হইয়া থাকে।

দধিবীজ—সাঁচা, দম্বল, অম্বল প্রভৃতি নামে দধিবীজ অভিহিত হয়। ফল কথা এই বীজ এক প্রকার জীবাণু, যাহাকে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস বা ক্ষীরাম্ল জীবাণু বলে। আমাদের দেশের গোয়ালারা এই বীজ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দম্বলের প্রকৃতি অনুসারে ভাল মন্দ দধি হয়। কারণ এই ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস মধ্যে আরো অনেক উপকারী ও অপকারী জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। শুধু ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস দ্বারা প্রস্তুত ট্যাবলেট বাজারে ক্রয় করিতেও পাওয়া যায়। বহির্দ্দেশের বায়ুতে নানা প্রকার জীবাণু সহ ল্যাকটিক এসিড জীবাণুও বর্ত্তমান থাকে। গোয়ালারা দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিবার জন্য যে মন্থন দণ্ড ব্যবহার করে তাহাতে যথেষ্ট ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস জন্মিয়া থাকে। তাহারা দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লওয়ার পর যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঘোল (বাটার মিল্ক)। এই দণ্ড দ্বারা মাখন তুলিয়া লওয়ার পর তাহা পরিষ্কার না করিয়া ঐ ভাবেই রাখিয়া দিলে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার ব্যাসিলাস ঐ দণ্ডে সঞ্জাত হয়। দধিবীজ অনেক দিন রাখিয়া দিলে তাহাতেও অনেক প্রকার জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে ভাল দধি প্রস্তুত হয় না। সেজন্য দধিতে জল কাটে ও বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দধিবীজ কেবল ল্যাকটিক এসিড

ব্যাসিলাস মাত্র। বাজারের ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ট্যাবলেটও ভাল মন্দ উভয় প্রকারই আছে এবং রক্ষিত দধিবীজ বা বহনও ভাল মন্দ উভয় প্রকারই হইতে পারে। সুতরাং ভাল দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, ভাল দধিবীজ বা ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাসের বিশেষ প্রয়োজন।

দধি প্রস্তুত প্রণালী—দধি প্রস্তুত জন্য যে যে দ্রব্য আবশ্যক হইবে তৎসমস্ত—কড়াই, হাতা, দধি ভাণ্ড, ইত্যাদি সমস্ত গরম জল দ্বারা ভাল ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহাতে আর হস্তার্পণ করিবে না বা গামছা কি অন্য বস্ত্র দ্বারা মুছিতে পারিবে না। কারণ হস্তে কি বস্ত্রে অন্য কোন জীবাণু থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য অন্য জীবাণু সংস্পৃষ্ট হইলে, দধি ও ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ভিন্ন অন্য জীবাণু সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইবে ও তাহার গুণ ও ধর্ম্ম ও আস্বাদ ভিন্ন রূপ হইবে।

যে পরিমাণ দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিতে হইবে সেই দুগ্ধ ঠাণ্ডা জ্বালে আস্তে আস্তে ১৫ হইতে ৩০ মিনিট কাল জ্বাল দিতে হইবে এই জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাতে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ার পর (৯৫° শীতল হইলেই হয়। এই উষ্ণতা মানব শোণিতের উষ্ণতা অপেক্ষা ৩ ডিগ্রী কম) তাহাতে দধিবীজ সংযোগ করিবে অথবা সেরকরা ৪।৫ খানা ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ট্যাবলেট যোগ করিয়া বেশ ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে। অতি শীতল স্থানে অথবা শীতকালে দধি সহজে জমেনা এজন্য ঐসময় উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া উষ্ণ অবস্থায় রাখিতে হয়। যেস্থানে রাখিবে সে স্থানের উত্তাপ অন্ততঃ ৮০° তাপ হইলে ভাল হয় এবং ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে দধি জমিয়া যায়।

দুগ্ধের উত্তাপ ১০৫° এর উপর থাকিলে ও তাহাতে দধিবীজ সংযোগ করিলে সেই দধি খারাপ হইয়া যায়। দুগ্ধের যেরূপ তাপে হাত সহ্য হয় এরূপ তাপে বীজ সংযোগ করা কর্ত্তব্য। শীতলতার আধিক্যে দধি যেমন ভালরূপ জমেনা সেইরূপ অধিক উত্তাপেও দধি নষ্ট হইয়া যায়। অধিক উত্তাপে দধি ফাঁপিয়া কঠিন হয় ও জল কাটে। এই জল পীতাভ হইলে, দধি বিস্বাদ হইয়া যায়, উহার গন্ধ ও আস্বাদ পচা দুর্গন্ধযুক্ত ও অপকারী। সেজন্য দধি ভরিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখার ৮।১০ ঘণ্টার পর যখন দধি জমিতে আরম্ভ করে বা জমিয়া যায় তৎক্ষণাৎ ঢাকনি খুলিয়া দিতে হয়। সে দধি বিস্বাদ হয় না ও বহুক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হয় না।

দধি কতক্ষণে জমিবে তাহার কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। যাহারা প্রতিরোজ দধি প্রস্তুত করে, তাহারা জানে দধিবীজ ও দুগ্ধের রকম অনুযায়ী কতক্ষণে দধি জমিতে পারে; তাহা তাহাদের অনেকটা বিচক্ষণতার সুপরিচায়ক। এরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, অনেক গোয়ালা বেশ ভাল দধি প্রস্তুত করিয়া সুনাম ক্রয় করে আবার কোন কোন গোয়ালা শত চেষ্টাতেও ভাল দধি জমাইতে পারে না। এরূপ হইবার এক মাত্র কারণই বিচক্ষণতা। জগতে এইরূপেই লোকে সুখ্যাতি ও অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকে।

একবার দধি প্রস্তুত হইলে, পুনর্ব্বার দধি প্রস্তুত করিবার সময় ঐ দধি দ্বারাই দধি প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত এই দধি দ্বারা দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দধিবীজ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন নতুবা কিছুদিন পর ঐ বীজে দধি ভাল হয় না।

অনেকে গরম দুগ্ধে তেঁতুল সংযোগে দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেরূপ দধি বড় সুস্বাদু হয় না। দধি বীজ না পাওয়া গেলে কিছু গরম দুগ্ধে তেঁতুল দিয়া সেই দুগ্ধ ৮।১০ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিলে যে দধি প্রস্তুত হয় তাহাই দধিবীজরূপে প্রয়োগ করিলে, ভাল দধি হয়।

দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইয়া বা অম তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা দধি প্রস্তুত করিলে সে দধি সুস্বাদু হয় না। জল সহযোগে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া তদ্দ্বারা দধি প্রস্তুত করিলেও দধি উত্তম হয় না। মিষ্ট সহযোগে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া তদ্দ্বারা দধি প্রস্তুত করিলে সে দধির আস্বাদ মিষ্ট হয় তাহাতে মোটেই অম্লরস টের পাওয়া যায় না। তাহা মুখরোচক

বটে কিন্তু তত উপকারী নহে।

দধি প্রস্তুত সময়ে সর্ব্বদা এক উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দধি প্রস্তুত করিলে দধি ঈষৎ অম্লাস্বাদযুক্ত ও তাহার গন্ধ তৃপ্তিজনক হয় এমত জানিতে পারা যায় কিন্তু ঐরূপে দধি প্রস্তুত করা বহু ব্যয়-সাধ্য ও সাধারণের অসাধ্য।

বৈজ্ঞানিকগণ ও জীবাণুবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যহ ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ট্যাবলেট দ্বারা দধি প্রস্তুত করিলে, তৎসহ অন্য কোন জীবাণু মিশ্রিত হইতে পারে না; সুতরাং দধি ভাল হয় কিন্তু দধিবীজ দ্বারা দধি প্রস্তুত করিলে, তৎসহ সহজেই অন্য জীবাণুমিশ্রিত হইয়া দধি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা সেবনে অপকার হয়। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই বাঙ্গলাদেশের গোয়ালারা অতি উৎকৃষ্ট সুস্বাদু ও সুমিষ্ট মহোপকারী দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে গৃহস্থগণ প্রত্যহ যে দধি প্রস্তুত করে যাহাকে গৃহজাত দধি বলে তাহাও উত্তম ও উপকারী হয়। তাহারা প্রথম দিন অল্প গরম দুগ্ধ কোন বাটীতে রাখিয়া তাহার মধ্যে অল্প তেঁতুল দিয়া রাখিয়া দেয় এবং সেই পাত্রে প্রতি রোজ গরম দুগ্ধ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। এইরূপে প্রতিরোজ ঘরে ঘরে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শীতকালে এই দধি জমিতে কিছু অধিক সময় লাগে কিন্তু দধি ৮।১০ ঘণ্টার পরেও না জমিলে দধি পাত্র কিছুক্ষণ রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে রাখিলেই শীঘ্র জমিয়া যায়। ভালরূপ ঢাকিয়া গরম স্থানে না রাখাই এরূপ বিলম্বে দধি জমার কারণ। একটু সতর্কতা লইলেই এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমাদের সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা অপেক্ষা গৃহলক্ষ্মীগণই এ বিষয়ে উত্তম দক্ষ। গৃহকর্ত্তা দধি সেবন করিয়াই আনন্দিত হন কিন্তু দধি প্রস্তুত প্রণালী তিনি কিছু মাত্র অবগত নন বা শিক্ষা করিতে চেষ্টাও করেন না।

দধির প্রকার—দুগ্ধে জাল দেওয়ার পরিমাণ এবং সাঁচার প্রকৃতি ও সাঁচা দেওয়ার কম বেশ অনুসারে নানা প্রকার দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশভেদে ঐ সকল দধির নানা প্রকার নামও হইয়াছে, যথা—খাসা দধি, রাসী, খড়া, উত্তম খড়া, অমা, চমন, চন্দ্রচূড়, চিনি পাতা ইত্যাদি।

দুগ্ধ অধিকক্ষণ আস্তে আস্তে অল্প অথচ সম পরিমান ভাপে জাল দিয়া অপেক্ষাকৃত লালবর্ণ ও ঘন হইলে তাহা গরম গরম দধিভাণ্ডে ঢাকিয়া সামান্য বীজ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিলে ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে দধি জমিয়া দধির উপরিভাগে বেশ লালবর্ণ সর পড়িয়া যে শক্ত সুস্বাদু দধি হয় তাহাই খাসা বা সবক্ দধি। এই দধি প্রস্তুত করিতে গোয়ালারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। এই দধির দুগ্ধ হইতে আদবেই মাখন তুলিয়া লয় না। এবং এমন সময় দধি প্রস্তুত করে যেন ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দধি জমিতে পারে এবং জমা মাত্রই ঢাকনি উঠাইয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাখে। বড় লোকের বৃহৎ সামাজিক ভোজে এই দধি সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং দধি ভাল হইলে, গোয়ালারা যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে যে নাটোর-রাজ রামকান্তের আদ্যশ্রাদ্ধে যে গোয়ালা ভাল দধি দিয়াছিল তাহাকে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী ৩০০ শত বিঘা ভূমি নাখেরাজ প্রদান করিয়াছিলেন। বলিহারের রাজা তাঁহার কন্যার বিবাহে খিদিরপুরগ্রামের গোয়ালারা উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিত বলিয়া উক্ত গ্রাম কন্যাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলার বহু জমিদারের চাকরাণ প্রাপ্ত গোয়ালা এখনও বাঙ্গলা দেশে অতীতের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সে কালে উত্তম দধি প্রস্তুতের জন্য বহু গোয়ালার মূল্যবান শাল, বনাত, পুরস্কার প্রাপ্তির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

এককালে যে দেশে সর্ব্বজাতির সামাজিক ভোজে বিনা দধিতে ভোজ মঞ্জুর হয় নাই এবং যাহা ভোজের একটী প্রধান উপকরণ ছিল এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণ বাড়ীতেই দধির গুণ কীর্ত্তন ও ভোজনের পর মূল্য নিরূপণ ও গোয়ালার পুরস্কারের ব্যবস্থা হইত কালক্রমে সে নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম হইলেও বাঙ্গলা দেশ

হইতে দধি একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট দুগ্ধের অভাব ও মূল্যাধিক্য হওয়ায় ভেজালের আধিপত্যে সে কালের রসনাতৃপ্তিকর দধি আর পাওয়া যায় না। এবং বর্ত্তমান সময়ে দধি অন্য জাতির সংস্পর্শে হিন্দুর অখাদ্য না হওয়ায় রেল ষ্টিমারে নানা স্থানে রপ্তানি হওয়ায় সুস্বাদু "সবক্" দধি পাওয়া একরূপ দুর্ঘট হইয়াছে। রাজসাহী ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় পুরাকালের সেরূপ দধি এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেবার পাবনা জেলার নাটোর রাজ্যের সভাপতিত্বে যে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হয় তাহাতে সাহিত্যিকগণ সেরূপ দধির রসাস্বাদন করিয়া রসনায় তৃপ্তি সাধন ও সুযশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গোচারণ মাঠের অভাবে ক্রমেই দুগ্ধবতী গাভীর অভাব হওয়ায় দুগ্ধের অভাবে গোয়ালারা সেরূপ দধি প্রস্তুত না করিয়া ভেজাল দধি প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট "সবক্" দধি প্রস্তুত করিতেও তাহারা দুগ্ধ হইতে কতক মাখন তুলিয়া লইয়া, "কটকলা" নামক বৃক্ষের ফল দ্বারা দুগ্ধ রঙ করিয়া, দুগ্ধের সহিত খেজুর গুড় চিনি, মিশ্রি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য সংযোগে দধি প্রস্তুত করিয়া বর্ত্তমান যুগের বাবুদের রসনার তৃপ্তি সাধন করে। তথাপি গোয়ালারা আর সেকালের পুরস্কার প্রাপ্ত হয় না এবং আসল হইতেও কিছু উসুল করিতে বাবুরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। দধির নানা প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া মূল্য কমাইবার চেষ্টা প্রত্যেকেরই থাকে। এই সকল কারণে এখন আর উৎকৃষ্ট "সবক্" বা "খাসা" দধি প্রায় পাওয়া যায় না।

রাগী দধি প্রস্তুত করিতে দুগ্ধ হইতে অধিকাংশ ভাগই মাখন তুলিয়া লইয়া দুগ্ধের এক ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া একটু বেশী দধিবীজ সংযোগে যে দধি প্রস্তুত হয় তাহাকে রাগী দধি বলে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের সামান্য সামান্য ভোজে এবং দরিদ্র মুসলমানদিগের বিবাহ ও খয়রাৎ প্রভৃতির ভোজে এই দধির ব্যবহার হইত। এখানেও এই দধির নাম আছে বটে কিন্তু সেরূপ সুস্বাদু রাগী দধি প্রায় পাওয়া যায় না। একটু বেশীক্ষণ এই দধি থাকিলেই জল কাটে।

খড়া দধিতে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক মাখন তোলা দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং দধি ভরিবার পূর্ব্বেই ঐ গরম দুগ্ধে দধিবীজ মিশ্রিত করিয়া দধি ভাণ্ডে দুগ্ধ ভরিয়া কিছু গরম থাকিতেই ঢাকিয়া দেয়। এই দধির উপরিভাগ দেখিতে বেশ শক্ত দেখা যায় কিন্তু ভাঙ্গিলেই ঘোলের মত পাতলা হয়। সেবনে বেশ ঠাণ্ডা ও মুখরোচক। গরমের দিনে আরামদায়কও বটে।

উত্তম খড়া দধিতে উহা অপেক্ষা জলের ভাগ কম থাকে। এই সকল দধিভাণ্ডের দুগ্ধের উপরিভাগে একটু ঘৃতের ছিটা দিয়া দেখিতে একটু ভাল করে। খড়া অপেক্ষা এই দধি অপেক্ষাকৃত ভাল হয়।

জলা দধি বড়ই আশ্চর্য্য ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল স্থানের গোয়ালারা এই দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। এই দধি সাদা জলের মত পাতলা। ঘোল অপেক্ষাও ইহা পাতলা। গ্রীষ্মকালে পেটের অসুখে এই দধি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের বড়ই আদরণীয় বস্তু। সামান্য মূল্যে ইহা পাওয়া যায়। ইহা সেবনে দধি সেবনের কোন ফল হয় কি না সন্দেহ। এই জলা দধি কি প্রকারে প্রস্তুত করে, গোয়ালারা তাহা সহজে প্রকাশ করে না। লেখক চিকিৎসক বলিয়াই গোয়ালা রোগী ইহার প্রস্তুত প্রণালী বলিয়াছে বটে কিন্তু লেখক তাহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে যত দুগ্ধে দধি প্রস্তুত হইবে তাহার দ্বিগুণ জল কড়াতে জ্বাল দিলে যখন জল ফুটিতে আরম্ভ হইবে তখন মাখন তোলা দুগ্ধ তাহাতে ঢালিয়া দিয়া ও দধিবীজ অনেক পরিমাণে ঐ দুগ্ধে ঢালিয়া দিয়া গরম গরম দধি ভাণ্ডে ঢালিতে হইবে এবং কিছু বেশী গরম থাকিতেই এমন ভাবে ঢাকিবে যেন কোন প্রকারেই উহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। গোয়ালারা কলা পাতা দিয়া তৎপর তাহার উপর অন্য ভারি কাঁথা চাপা দেয়। এই দধি জমিতে প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টার আবশ্যক হয়।

চলন দধি, জলমিশ্রিত মাখন তোলা দুধের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং ইহা উত্তম খড়া দধির অপেক্ষা কিছু ভাল দই ; চিড়া ফলাহারে প্রায়ই গরীব লোকে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। গুড় সহযোগে আহার করে।

চিনিপাতা দই—চিনি সহযোগে দুধে জ্বাল দিয়া দুগ্ধ বেশ মিষ্টি হইলে তাহার সহিত গরম জল অল্প মিশ্রিত করিয়া একটু বেশী দধিবীজ দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে এই দধি আদরের সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে।

দেশভেদে দধি—ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা প্রকার দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বুলগেরিয়ার লোকেরা যে দধি প্রস্তুত করে তাহাতে [illegible] জীবাণু ব্যাসিলাই অধিক থাকে এবং তদ্ব্যতীত তাহাতে অন্যপ্রকার কোকাইও ইষ্টে অধিক থাকে সেজন্য তথাকার দধি উৎকৃষ্ট বলিয়া ডাক্তার মেচ্নিকফ মত প্রকাশ করে।

রাজসাহী ফরিদপুর পাবনায় যে দধি প্রস্তুত হয় তাহা খুব জমাট সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু।

দ্বারভাঙ্গার দধির উত্তম বলিয়া খ্যাতি আছে কিন্তু রাজসাহী ও পাবনার দধি অপেক্ষা তাহা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

পার্ব্বত্য চট্টোগ্রামের গোয়ালারা এক মুখ বদ্ধ বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে কাঁচা দুগ্ধ পুরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখে। দুগ্ধ বেশ জমিয়া গেলে সাবধানে সমস্ত দধি বাহির করে। ইহা বেশ জমাট অবস্থায় খাওয়া যায়। প্রতিদিন একই চোঙ্গায় দধি জমান হয় বলিয়া কোন প্রকার বীজ দিবার আবশ্যক হয় না। ঐ চোঙ্গাতেই যে বীজ থাকে তদ্দ্বারাই দুগ্ধ জমিয়া যায়। গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের কাঁচা দুগ্ধে দধি বেশ জমাট হয়। বাঙ্গলা দেশেও এ প্রকারে অনেক গোয়ালায় মহিষ গরুর "বাথানে" দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গো দুগ্ধের সহিত মহিষ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দধি প্রস্তুত করিলে দধি বেশ শক্ত হয়। সেজন্য বঙ্গদেশের অনেক গোয়ালা গো দুগ্ধ সহ মহিষ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া অনেক স্থলে দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই দধি গো দুগ্ধের দধির ন্যায় সুস্বাদু হয় না।

ত্রিপুরায় মরার ন্যায় এক প্রকার অগভীর মৃত্তিকা পাত্রে দধি প্রস্তুত হয়। এই দধি বেশ জমাট ও মিষ্ট স্বাদযুক্ত এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলেও নষ্ট হয় না।

বাঁকিপুরে এক বৃহৎ পাত্রে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইয়া ঐ অবস্থাতেই রাখিয়া দেয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঐ দুগ্ধ জমিয়া দধি হয় পরে তাহা কাটিয়া লইয়া বিক্রয় বা ব্যবহার করে।

রংপুর অঞ্চলে যে দধি প্রস্তুত হয় সে দধি প্রায়ই পান্‌সে হইয়া থাকে। দুধের গুণানুসারেই নাকি এরূপ পান্‌সে হয় কিন্তু আমাদের দেশের গোয়ালারা বলে যে ঐ প্রকার দধিতে যে দধিবীজ দেওয়া হয় তাহাতে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ব্যতীত আরো নানা প্রকার জীবাণু মিশ্রিত থাকে বলিয়াই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। এদেশে ত অনেক সময় অনেক গোয়ালার ঐ প্রকার পান্‌সে দধি হয় এবং বহু চেষ্টাতে ও সে ঐ প্রকার দধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। যে গোয়ালার এইরূপ দোষ ঘটে সে তাহার দুগ্ধ ভাণ্ড সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন এমন কি নিজের ও দধি ঢাকার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া তবে এরূপ দুর্নামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। ইহাতে বোধ হয় এমন কোন জীবাণু এই দধিবীজে মিশ্রিত হইয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় যে তাহা শীঘ্র দূরীভূত করা দুঃসাধ্য হয়।

দধির উপাদান—ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে দধি বীজাণু নির্ণয় করিয়াছেন সেগুলি গাঁইটযুক্ত ক্রিমি পোকার ন্যায় ছোট এবং তাহারা সচল ও পুষ্ট ও বংশবৃদ্ধিকর।

ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস ট্যাবলেট দ্বারা প্রস্তুত দধিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

প্রোটিড	৪·৭৭
মাখন	৩·৫৭
দুগ্ধ শর্করা	২·৮
অঙ্গার	·৬২
জল	৮৭৮৪

সকল জীবাণুদ্বারা দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে, মনুষ্য, গো, মহিষ, অশ্ব ইত্যাদি সকল প্রকার দধিরই গুণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে গো ও মহিষ দধিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক গোয়ালা ছাগ দুগ্ধও ঐ দুগ্ধের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে।

দই চিড়া—আমাদের দেশে পূর্ব্বে দই চিড়া ফলারের অধিক প্রচলন ছিল এবং অনেক বৃহৎ ব্যাপারে বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ভোজে দই চিড়া ফলার না দিলে সে ভোজই সিদ্ধ হইত না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এখন দই চিড়া প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। এখনও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ ভোজের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে ইহা একেবারে উঠিয়া গেলেও শ্রাদ্ধাদিতে দধির সহিত চিড়া দিয়া প্রথা রক্ষা করার প্রচলন এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

পেটের পীড়া—অতিসার আমাশয় গ্রহণী প্রভৃতি রোগে চিড়া ভাল করিয়া অনেকবার ধুইয়া (৭ বার বা ১০৮ বার) অথবা চিড়ার কাথের সহিত দধি সেবনের ব্যবস্থা ও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত করিয়া—অর্থাৎ ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাসে পরিণত করিয়া সেবন করিলে যেমন পরিপাকের সাহায্য হয় সেইরূপ মালটোজকে মাল্‌ট পরিণত করিয়া প্রয়োগ করিলে সহজে পরিপাক হয় এবং তাহাতে পোষণ কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয়। আমাদের দেশের চিড়াও সেই প্রকার মালটোজকে মাল্‌টে পরিবর্ত্তন করার রূপান্তর মাত্র। বৈদেশিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনে আমরা সেই সদ্য মাল্‌টোজ—চিড়ার পরিবর্ত্তে একণে বৈদেশিক প্রস্তুত একষ্ট্রাক্ট মাল্‌ট ব্যবহারে ও ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত হইয়াছি। কিন্তু সদ্য, স্বদেশী আমাদের দেহের উপযোগী চিড়া ঐরূপ মাল্‌ট অপেক্ষা শতগুণে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাল্‌ট ও চিড়া একই দ্রব্য ও প্রায় একই প্রণালীতে প্রস্তুত। কেবল একষ্ট্রাক্ট মাল্‌ট বিজ্ঞান সঙ্গত নিয়মে প্রস্তুত এবং চিড়া আমাদের ঘরোয়া মতে প্রস্তুত হইলেও তাহা অবৈজ্ঞানিক নহে।

চিড়া—চিড়া প্রস্তুত করিতে দুই তিন দিন ধান্য জলে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে পচান হয় যে, সুস্পষ্ট উৎসেচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই কার্য্য নানা প্রকার জীবাণু সম্মিলনে সম্পাদিত হয়। তৎপর এই ধান্যকে এত উত্তাপ প্রয়োগ করা (ভাজা) হয় যে, পূর্ব্বোক্ত উৎসেচন ক্রিয়াযুক্ত ঐ ধান্যের শ্বেত সার প্রায় শর্করায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় উপস্থিত হয়। এক্ষণে এই অবস্থাপ্রাপ্ত ধান্যের শ্বেতসারের কোষ সকল বিযুক্ত হওয়ার জন্য ঢেঁকিতে পাড় দিয়া প্রবল সন্তাপ প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে সমস্ত শ্বেতসার কোষ সমভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না কিন্তু উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে তাহা করিতে পারা যায়। আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট পাতলা পরিষ্কার চিড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটু যত্নপূর্ব্বক ভাল ঢেঁকিতে প্রস্তুত করিলে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ন্যায় হইতে পারে। ভাল চিড়া প্রস্তুতেও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। যাহা হউক যত্ন পূর্ব্বক চিড়া প্রস্তুত করিলেও তাহার মধ্যে সকলগুলির শ্বেতসার কোষ সমভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না। অপরিবর্ত্তিত চিড়া অর্থাৎ যেগুলির শ্বেতসারের যে সমস্ত কোষ জীবাণু সংযোগে এবং উত্তাপ প্রয়োগ ও ঢেঁকির চাপেও শর্করায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় পরিণত হয় না তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সকল চিড়া হইতে সেগুলিকে বাছিয়া পরিত্যাগ করা অসম্ভব ও অসাধ্য। এজন্য চিড়া পরিষ্কার করিয়া বার বার ধুইয়া পরে জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে রগড়াইলে চিড়ার যেগুলি উদ্দেশ্যানুযায়ী অবস্থায় পরিণত হয় সেগুলি জলে দ্রব হয় ও অন্যগুলি দ্রব হয় না। সেগুলি কাপড় দিয়া ছাকিয়া ফেলিলে যে চিড়ার কাথ হয় তাহা বিলাতী একষ্ট্রাক্ট মাল্টের সমান উপকারী এবং সমান উপাদান বিশিষ্ট। এই কাথ দধি সহযোগে বিশেষ উপকারী বলিয়াই আমাদের দেশে দই চিড়া ফলাহারের এত আদর। যদিও এই বৈজ্ঞানিক কারণ অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী দই চিড়ার ভক্ত কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ ও হিন্দু বিজ্ঞান শাস্ত্র

আমাদের পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের প্রলুব্ধ করিয়া আসিতেছে। এই দধি ও চিড়া সংযোগের উপকারিতা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

দধির গুণ—আয়ুর্ব্বেদোক্ত দধির গুণ—

দধ্যম্লং মধুরং গ্রাহি গুরূষ্ণং বাতনাশনং।
মেদঃ শুক্রবলশ্লেষ্ম পিত্তরক্তাগ্নি শোথকৃৎ॥

দধি অম্লরস, মধুর, রসগ্রাহি (সঙ্কোচক,) গুরু, উষ্ণ, বাত নাশক, মেদকারী, শুক্রবর্দ্ধক, বলজনক, শ্লেষ্ম প্রকোপক, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তদূষক, অগ্নিদীপক, শোথজনক, রুচিকারী ও অরুচিতে প্রশস্ত।

দধি তু মধুরমম্ল মত্যম্লঞ্চেতি

সুশ্রুত।

দধি ৩ প্রকার, মধুর, অম্ল এবং অত্যম্ল।

তৎ কষায় রসং স্নিগ্ধং উষ্ণং।
* * * * * কার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মাঙ্গল্যঞ্চ॥

সুশ্রুত।

সাধারণতঃ দধি, কষায় রস, স্নিগ্ধ উষ্ণ। কৃশতানাশক, শুক্রবৃদ্ধক, বলকারী ও মঙ্গলজনক।

মহাভিষ্যান্দি মধুরং কফমেদো বিবর্দ্ধনং

সুশ্রুত।

মধুর দধি, কফ ও মেদোবর্দ্ধক, সন্ধিস্থলাদির শৈথিল্য এবং শরীরের গুরুত্ব জনক।

কফপিত্তকৃদম্লংস্যাৎ

সুশ্রুত।

অম্লদধি কফ ও পিত্তকারি।

অত্যম্লং রক্ত দূষণং

সুশ্রুত।

অত্যম্ল দধি রক্ত দূষক।

বিদাহি সৃষ্টবিণ্মূত্রং মন্দজাতং ত্রিদোষকৃৎ

সুশ্রুত।

মন্দজাত দধি (যাহা ভাল জমে নাই) বিদাহি, মলনিঃসারক মূত্র রেচক ও ত্রিদোষ জনক।

রোচনং দীপনং বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনং।
পাকেহম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মাঙ্গল্যং বৃংহণং দধি

চরক।

রুচিকারী, অগ্নি দীপক, শুক্রজনক, স্নিগ্ধকারক, বলবর্দ্ধক, বিপাকে অম্ল, উষ্ণ, বাতনাশক, মঙ্গলজনক, ও শরীর বর্দ্ধক।

মন্দকমাভিষ্যন্দকরাণাং চরক।

মন্দ দধি অত্যন্ত অভিষ্যন্দ জন্মায়।

সুশ্রুত ও চরকের মত ব্যতীতও আরও অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দধির অনেক গুণ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে দধি উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, গুরু, অম্লবিপাক, মল সংগ্রাহক, কফ এবং শুক্রবর্দ্ধক।

পাশ্চাত্য মতে দধির গুণ—প্যারিস্ পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক মেচনীকফ ও অন্যান্য জীবাণু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্ত্র মধ্যস্থিত জীবাণু সকলেরও পরিবর্ত্তণ ঘটে। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের পরেই এই সকল জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ যে সকল জীবাণু খাদ্য দ্রব্যের প্রটিডের ধ্বংশকারী ও যাহারা পচণ ক্রিয়া বর্দ্ধক তাহারা বিশেষ ভাবে পুষ্ট হয় ও বংশ বৃদ্ধি করে। যখন কোন পীড়া জন্মে তখন ঐ সকল পচন ক্রিয়াশীল জীবাণুও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নানাপ্রকার রোগের বিষ অন্ত্র মধ্যে উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সকল জীবাণুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ায় বিষ উৎপাদন করে। অন্যান্য জীবাণু তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সুস্থ অবস্থায় অন্ত্র হইতে প্রত্যহ ৮ গ্রাম জীবাণু সাধারণতঃ বহির্গত হয়। কিন্তু অজীর্ণ পীড়াগ্রস্থ লোকের আর ও অধিক এমন কি প্রত্যহ ২০ গ্রাম পর্য্যন্ত ঐরূপ জীবাণু বহির্গত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের রস ঈষৎ অম্লাক্ত, শর্করাযুক্ত পদার্থ এই স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্রের স্রাব ঈষৎ ক্ষারাক্ত এই স্থানে যবক্ষার মূলক পদার্থ বিশ্লেষিত হয়। খাদ্য দ্রব্যের এইরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন সময়ে বিশেষতঃ যবক্ষার জান মূলক পদার্থের পরিবর্ত্তন হওয়ার সময়ে অনেক বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ঐ সকল বিষাক্ত পদার্থ শোধিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে উক্ত বিষাক্ত পদার্থ

সকল দ্বারা অনেক পীড়ার উৎপত্তি হয়। উক্ত বিষাক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে অবস্থান করায় ক্রমে শরীরে বার্দ্ধক্য জনক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে অর্থাৎ দেহের জীবনী শক্তির হ্রাস হয়।

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে অন্ত্র মধ্যে নানা প্রকার রোগ, পচন এবং উৎসেচনোৎপাদক জীবাণু সাধারণতঃ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এই সমস্ত জীবাণু অন্ত্রের অ্যারাক্ত রসে পরিপোষিত হয়। এবং পরিপাকের সাহায্য করে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন উক্ত জীবাণুর অভাবে পরিপাক কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। অন্ত্রের নিম্নাংশে—সিকম এবং কোলনের রস ক্ষারাক্ত এইজন্য ঐসকল জীবাণু ঐ সকল স্থানে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কোন প্রকার ঘটনায় যদি ঐ স্থানের রস ক্ষারাক্ত না হইয়া অম্লাক্ত হয় তাহা হইলেই অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিশুদিগের সবুজ মলযুক্ত অতিসার হওয়া এইরূপ কারণেই উদ্ভূত হয়। বৃদ্ধদিগের অতিসারও এই কারণেই ঘটিয়া থাকা অনুমান হয়।

অধ্যাপক ম্যাচনীকফ এই সকল জীবাণুর বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, ল্যাকটিক এসিড দ্বারা এই সকল ক্ষতি কারক জীবাণুর বৃদ্ধি ও কথঞ্চিৎ হ্রাস করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ম্যাচনীকফ বুলগেরিয়া থাকা সময়ে দেখিতে পান যে তথাকার অধিকাংশ লোক সবল, সুস্থকায়, পরিশ্রমী ও দীর্ঘজীবী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, ঐ সকল লোক প্রতি রোজ দধি সেবন করিয়া থাকে। তিনি ঐ দধি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পান যে, ঐ দধিতে, ক্ষীরাম্ল জীবাণু নানা প্রকার কোকাই ও ইষ্ট (অভিষব) প্রভৃতি আরো অনেক প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং দধির এই সমস্ত জীবাণুর সম্মিলিত ক্রিয়া ফলেই এদেশের লোক এত সবল পরিশ্রমী ও দীর্ঘজীবী।

এই সকল কারণে অধ্যাপক ম্যাচনীকফ ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিত্য ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করাইলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয়, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল কর্ম্মক্ষম থাকে সুতরাং তাহারা বেশ সবল ও পরিশ্রমী হইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের পরেই ইংলণ্ডে এই দধি প্রয়োগের প্রচলন অধিক হইয়াছে।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্ত্র প্রদেশে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস প্রস্তুত করিয়া তথাকার পচন দোষ নিবারণ করা যাইতে পারে। দধি সেবন করাইলে সেই ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগ করা হয়। সেইজন্যই পাশ্চাত্য চিকিৎসাক্ষেত্রে দধি প্রয়োগের এত হুজুগ।

দধির প্রয়োগ—আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা প্রকার পীড়ায় দধি প্রয়োজিত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদাদি নানা গ্রন্থে দধির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

গব্যং দধি চ মাঙ্গল্যং বাতঘ্নং শুচি রোচকং।
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং দীপনং বলবর্দ্ধনং॥

চরক।

গব্য দধি মঙ্গলজনক, বাতনাশক, শুদ্ধ, রুচিকারী, স্নিগ্ধ, পরিপাকে মধুর, অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক।

বাতঘ্নং কফকৃৎ স্নিগ্ধং বৃংহণং নাতিপিত্তকৃৎ।
কুর্য্যাৎ ভক্তাভিলাষঞ্চ দধি যৎ সুপরিস্রুতং॥

চরক।

পরিস্রুত (ছাঁকা দধি) বাত নাশক, কফ জনক, স্নিগ্ধ, শরীর বর্দ্ধক পিত্তের বিশেষ অপকারী নহে, রুচিকারী।

শৃতক্ষীরাত্তু যজ্জাতং গুণবদ্দধি তৎস্মৃতং।
বাত পিত্তহরং রুচ্যং ধাত্বাগ্নি বলবর্দ্ধনং॥

চরক।

জাল দেওয়া দুগ্ধের দধি কাঁচা দুগ্ধের দধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বাতপিত্ত নাশক, রুচিজনক, ধাতু অগ্নি ও বল বর্দ্ধক।

দধিত্বসারং রুক্ষঞ্চ গ্রাহিবিষ্টম্ভি বাতলম্।
দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং রুচি প্রদম্॥

অসার দধি (মাখন তোলা দুগ্ধের দধি) রুক্ষ, সঙ্কোচক, স্তব্ধতা কারক। বাত জনক, দীপন, অত্যন্ত লঘু, কষায়রস, রুচিকারী।

এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার পীড়ায় নানা প্রকার ঔষধীয় দ্রব্য সহযোগে দধি সেবনের ব্যবস্থা আছে।

রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক জনে এক এক প্রকার দধি খাইতে ভালবাসে। কেহ ভাল দধি, কেহ পাতলা দধি, কেহ দধি সর ও কেহবা ছাকা দধি খাইতে ভালবাসে। এতদ্ব্যতীত কেহবা দধির আস্বাদ টুকুই ভালবাসে, সুতরাং মিষ্ট সহযোগে দধি সেবন করে না। আবার কেহবা মিষ্ট সহযোগে দধি সেবন করিয়া থাকে, ফলকথা সকল প্রকারেই দধি সেবনের ফল লাভ করা যায়। কিন্তু "বিনা লবণ ভোয়েন" অর্থাৎ লবণ ব্যতীত দধি সেবন করিবে না। এরূপ কি জন্য লিখিত হইয়াছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অতিসার, গ্রহণী, আমাশয় প্রভৃতি পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক পীড়ায় দধি উত্তম পথ্য।

পাকস্থলীর পরিপাক কার্য্যের বিঘ্ন হইলে শূন্যোদরে চিড়ার কাথ সহ দধি সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আধ সের পরিমাণ দধি অন্ততঃ দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন লোকের দধি সেবনের পর উদরাধ্মান ও অতিসার প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু দুই তিন দিন সেবনেই ঐ সকল উপসর্গ দূরীভূত হইয়া পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই কেহ কেহ দধির অপকারিতা ও ব্যবস্থাপকের অখ্যাতি ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দধি সেবন করিলে ঐ সকল উপসর্গ দূরীভূত হইয়া দধি দ্বারা মহোপকার সাধিত হইতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

যে কোন ব্যাধিতেই হউক না কেন বিশেষতঃ আন্ত্রিক পীড়ায় দধি প্রয়োগ অর্থাৎ ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দধি সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। শয়নের পূর্ব্বে দধি সেবনে সুনিদ্রা হয়।

অল্প গরম জলের সহিত দধি সেবনে আন্ত্রিক পীড়ায় বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাকস্থলীর দুর্ব্বলতায় উদরাধ্মান রোগ হইলে দধি প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যে সকল অজীর্ণ রোগে পাকস্থলীতে প্রবল ফেনা হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, উদরাধ্মান উপস্থিত হয় ও অন্ত্রের কুঞ্চিগতি বৃদ্ধি হয়। এবং দুগ্ধ সেবনেই এই সকল উপসর্গের আধিক্য হয়, তাহাদের দধি সেবন করাইলে তাহারা ভাল হয়।

অন্ত্র হইতে বিষাক্ত পদার্থ শোষিত হইয়া যে সকল পীড়া জন্মে যথা—স্মরণীয় কাঠিন্য, নানা প্রকার রক্তাল্পতা, সন্ধিবাত, শিরঃপীড়া চর্ম্মরোগ, স্নায়বীয়দুর্ব্বলতা, পেট বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, রক্তহীনতা, বিষাক্ত পদার্থ শোষণ জনিত উন্মাদ, নিদ্রাল্পতা, দন্তক্ষত, খিটখিটে স্বভাব উদরাধ্মান, অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়ায় দধি উপকারী।

শিশুদিগের অতিসার এবং অজীর্ণ রোগে বিশেষতঃ শিশুদিগের সবুজ বর্ণের মল বিশিষ্ট অতিসারে দধি বিশেষ ফলপ্রদ।

গ্রহণী রোগে দধি প্রয়োগে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মধু মেহ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির পিপাসা নিবারণার্থ দধি বিশেষ উপকারী। মধুমেহ রোগীকে দুগ্ধে ক্ষীর শর্করা বর্ত্তমান থাকায় তাহা পান করিতে দেওয়া অন্যায় কিন্তু দধিতে উক্ত ক্ষীর শর্করা ক্ষীরাম্লে পরিণত হওয়ায় দধি দেওয়া যাইতে পারে।

এদেশে পরিপাক কার্য্যের সহায়তা জন্য দধির ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত আছে। মাংস, পোলাও প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য সেবনের পর দধি সেবনের ব্যবস্থা থাকে। মাংস সহজে সিদ্ধ হওয়ার জন্য তৎসহ দধি মিশ্রিত করা হয়।

অশোধিত অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ দধি সেবনে বিনষ্ট হয়। সেজন্য কবিরাজীমতে রোগীকে রসায়ণ করিয়া এই উদ্দেশ্যেই দধি সেবনের ব্যবস্থা আছে।

কাসকাশ ও সন্ধিবাত পীড়ায় দধি বিশেষ উপকারী বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

Dr. Herschell মহাশয় নিম্নলিখিত পীড়া ও অবস্থায় দুগ্ধাম্লজ জীবাণু অর্থাৎ দধি প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন।

প্রোটিড খাদ্য অন্ত্রমধ্যে পচিয়া যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন করে যেমন পচনজাত পদার্থের ক্রিয়াজন্য স্নায়বিক

উত্তেজনার ফলে, অন্ত্রের সাধারণ প্রদাহ, কোলনের প্রদাহ, কোন কোন প্রকার অতিসার বিশেষতঃ এই কারণ জন্য শিশুদিগের অতিসার এবং অন্ত্রের অন্যান্য প্রকার প্রদাহে দধি উপকারী।

অন্ত্রমধ্যস্থিত পচন জনিত দ্রব্যঃ বিষাক্ততা ফলে যে সকল লোকের স্বাস্থ্য অল্পে অল্পে ভঙ্গ হইতে থাকে, তাহাদের এই কারণে জাত নানা প্রকার চর্ম্মরোগ ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, এবং শিশুদিগের পরিপোষনের বিঘ্ন, রক্তহীনতা, সন্ধি প্রদাহ, কোন কোন স্নায়ুর প্রদাহ ও পৈশিক পীড়া প্রভৃতিতে দধি উপকারী।

অন্ত্রমধ্যে অম্ল ও বায়ুর উৎপত্তির অভাব হেতু অন্ত্রের ক্রমগতি হ্রাস হওতঃ কোষ্ঠবদ্ধ রোগ উপস্থিত হইলে দধি সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; কিন্তু অন্য কোন কারণে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে দধি প্রয়োগে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে।

অন্ত্রের কোন অস্ত্রোপচারের কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে বিশুদ্ধ দধি সেবন করাইলে অন্ত্রমধ্যস্থ বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় অস্ত্রোপচারে ফল লাভ করা যায়।

দধি প্রয়োগ নিষেধ——নিম্নলিখিত অবস্থায় দধি ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

> ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত নচাপ্যঘৃত শর্করং।
> নামুদগসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা॥

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, ঘৃত এবং চিনি না দিয়া দধি সেবন করিবে না, মুগের দাইল না মিশাইয়া দধি সেবন করিবে না। মধু কিম্বা আমলকি না মিশাইয়া দধি ভোজন করিবে না। উষ্ণ দধি ভোজন করিবে না।

"নরাত্রৌ দধি ভোজনং"

রাত্রে দধি ভোজন করিবে না। কিন্তু ঘৃত ও জল সংযুক্ত করিয়া দধি সেবনে দোষ হয় না।

কাহারও কাহারও দধি মোটেই সহ্য হয় না। দধি সেবন করিলেই যাহাদের অম্ল ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় তাহাদের দধি সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

সর্দ্দি-কাশি হইলে দধি সেবন উচিত নহে। কারণ উহাতে সর্দ্দি ভাল উঠিতে পারে না।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দধি সেবন করিলে জ্বরের আক্রমণ অধিক হয়। বাতগ্রস্থ রোগীর দধি সেবনে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

যেস্থলে অন্ত্রের পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য কোষ্ঠ বদ্ধ রোগ উপস্থিত হয় সেস্থলে দধি প্রয়োগে উপকার হয় না কারণ ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাসের পেশী সবল করণ গুণ নাই। সুতরাং এরূপস্থলে দধি প্রয়োগে উপকার হয় না। এরূপস্থলে দধি প্রয়োগ করিলে বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং শিথিল বিধানকে আরো শিথিল করে।

অন্ত্রে কার্ব্বহাইড্রেট—শর্করাত্মক পদার্থে উৎসেচন ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া অতিসারাদি রোগে দধি অপকারী। এই পীড়ার মলের প্রতিক্রিয়া অম্লাক্ত।

দধির উপকার ও অপকার দধিস্থিত ক্যাজিন এবং ল্যাকটিক এসিডের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন পীড়ায় দধি প্রয়োগের পূর্ব্বে পীড়ার প্রকৃতি ও দধি পরীক্ষা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তক্র ও ঘোল, প্রায় দধির অনুরূপ; তজ্জন্য তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী।

লাঠি।

এঁদো পুকুরের পশ্চাতে যেথা বংশকুঞ্জ রাজে,
জন্মেছি হোথা কবে নাহি জানি,
নধর দেখিয়া কেবা মোরে টানি
রাখিয়া দিল সে দল ছাড়া করি মানুষের গৃহ মাঝে;
কত না যত্ন করিতে লাগিল নিত্য সকাল সাঁঝে।

সেই দিন হ'তে আদরে গরবে বাড়িল আমার জোর,
দুর্ব্বল যত কাঁপে মোর ত্রাসে,
দূরে থাকে সরে, কাছে নাহি আসে;
ঘরে প্রবেশিতে বারে বারে ফিরে দেখে সে আমারে চোর;
কুকুর বেড়াল ছুটিয়া পলায় পাইলে সাড়াটি মোর।

দুষ্ট শিশুরা শঙ্কিত সদা কখন পড়ি বা পিঠে,
কিন্তু যাহারা অবোধ বালক,
তাহারাই হয় আমার চালক,
অশ্ব গড়িয়া চড়ি বসে তায়, ঘুরে মরি সারা ভিটে;
স্নেহের প্রহার মোর কাছে ওগো লাগে যে বড়ই মিঠে!

মূর্খেরে আমি করি না আদর, ঔষধ আমি তার;
ঘৃণা করি আমি কাপুরুষ দলে,
লম্পটে আমি খেদাই সবলে;
বলবান জনে কত ভালবাসি কহিব কত না আর।
ভোজপুরী জানে আমার কদর ছাড়ে না একটি বার।

কিন্তু আমার বাবুগিরি টুকু বেড়ে গেছে বড় হালে,
টুপী থাকে প্রায় আমার মাথায়,
পাদুকাও কভু পরে' থাকি পায়,
বাবুদের কৃপা হইলে কখন রৌপ্য পরি এ ভালে;
হাতে হাতে ফিরি, ডিগ্‌বাজি খাই, থাকিগো সে এক চালে।

এক স্থানে মোর এত যে দর্প সব হয়ে যায় চুর;
শিশুর মতন অসহায় যারা,
অন্ধ, খঞ্জ রোগে শোকে সারা,
দুঃখে তাদের চক্ষু হয় যে অশ্রুতে ভরপুর;
বুক পেতে লই সব ভার টুকু যদি কিছু হয় দূর।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাগরণ।

নবীন মাধব B. A. পাশ করিয়া যেদিন পিতার চরণে আসিয়া প্রণাম করিল, সেদিন বৃদ্ধ নিতাই পাল পুত্রকে তাহার সেই শৈশবকালেরই মত বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল নবীন একটা সাম্রাজ্য জয় করিয়া আসিয়াছে এখন শুধু তাহার মুকুটোৎসবের বিলম্ব মাত্র! তিনি পুত্রকে কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন, কেমন করিয়া তাহার আদর আপ্যায়ন করিবেন ইত্যাদি চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি উল্লাসের আতিশয্যে সেই বাহির বাড়ী হইতেই চিৎকার করিয়া গিন্নিকে ডাকিয়া এই শুভ সম্বাদটা শুনাইয়া দিলেন এবং তখনই নবীনের এই সাফল্যের জন্য সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীতে পূজা পাঠাইতে বলিয়া, পুরোহিত সর্ব্বানন্দ গোস্বামীকে সন্ধ্যা-বেলা তাঁহাদের গৃহে হরির লুট দিতে আসিবার জন্য বলিতে প্রায় ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। স্নেহময় পিতার প্রসন্নতার এই স্বতঃপ্রবাহিত উচ্ছাস দর্শনে নবীনেরও চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

নিতাই পাল জাতিতে তন্তুবায়। স্মরণাতীতকাল হইতে তাহাদের বাড়ীতে তাঁত চলিয়া আসিতেছে। নিতাইয়ের পিতা কাপড় বুনিয়াই বাড়ীতে দালান

তুলিয়াছিলেন। নিতাইও পিতার 'ধারা' বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। সেও তিন চারখানি তাঁত রাখিয়া খুব স্বচ্ছলতার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। নবীনের বাল্যকালে নিতাই মনে করিয়াছিল পুত্র আর একটু বড় হইলেই তাহাকে আপনার কারখানার কাজে লইয়া আসিবেন; তখন হইতেই তাহাকে 'দুরস্ত' না করিলে সে 'লায়েক' হইয়া উঠিবে কেমন করিয়া? দরিদ্র কানাই পালের নাতি মাকি শেষে 'গোড়া' 'গামছা' বুনিয়া ভাতের সংস্থান করিবে? কিন্তু নবীনের মায়ের পরামর্শে নিতাইয়ের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই! গৃহিণী জিদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন পুত্রকে ইংরাজি পড়াইতে হইবে। তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন এই জন্য লোকে তাঁতিকে বোকা আখ্যা দিয়াছে! আজকাল ইংরাজি শিখিয়া চাকুরী না করিলে কি কেহ মানুষের মধ্যে গণ্য হয়! সে পাড়ার পরাণ ঠাকুরপোকে দেখিয়াও কি তাঁহার 'ঘটে' একটু বুদ্ধির উদয় হইল না। পরাণ ঠাকুরপো চিরদিন 'পরাণে কামার' রহিয়া গেলেন, আর তাহার পুত্র রাধাশ্যাম দুই পাতা ইংরাজি শিখিয়া এক্ষণে দিব্য 'রাধাশ্যাম বাবু' হইয়াছে। সম্মুখে অত প্রবল নজির দেখিয়া নিতাইয়ের সত্যই আপনাকে 'বেকুব' মনে হইয়াছিল। তিনি পত্নীর গালে দুইটা 'টোকা' দিয়া আদর করিয়া বলিয়াছিলেন "এই জন্যই ত তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন দিন আমি কিছু করি নাই বড় বৌ! তুমিই যে আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা।

পুত্রের আগমনের কয়েকদিন পরে বৃদ্ধ দম্পতির আনন্দোচ্ছাসের প্রথম বেগটা ঈষৎ প্রশমিত হইলে এখন নবীন কি করিবে তাহারই আলোচনায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কলহের অভিনয় হইত। নিতাইয়ের ইচ্ছা নবীন উকিল হয়! কারণ অল্প দিন পূর্ব্বে একটা মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে যাইয়া উকিলের 'জেরার চোটে' নাস্তানাবুদ হইয়া তাহার মহিমার পরিচয় ভাল রকমই সে পাইয়াছিল। সেই অবধি নিতাই মনে করিয়া রাখিয়াছে নবীনকে উকিল করিতেই হইবে। কিন্তু কাত্যমণি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন "তোমাকে আর যুক্তি দিতে হইবে না। তোমার বুদ্ধিতে চলিলে এতদিন নবীনকে আমার মাকু ঠেলিয়া মরিতে হইত।" কাত্যমণির ইচ্ছা নবীন চাকরী করে। ঐ রাধাশ্যাম যদি গ্রামের স্কুলের দুই পাতা ইংরাজি বিদ্যার দৌলতে 'আফিস করিয়া' মাকে শ্রীক্ষেত্র করাইয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে কলিকাতার বড় স্কুলের তাঁহার তিন-তিনটা-প্যাশ-করা ছেলে কি একটা চাকরীর কিনারা করিতে পারিবে না! সরকার বাহাদুর তাহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া চাই কি তাহাকে একটা দারোগাগিরিও দিতে পারেন!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নবীন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই মা যখন বলিলেন "নবীন তোদের ইংরাজি কেতাবে মেয়েমানুষ বলিয়া মাকে অবহেলা করিবার কথা লেখা আছে না কি রে"? তখন ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া নবীন বলিল "কেন বল দেখি?" তখন তিনি স্বামীর সহিত তাঁহার কলহের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন "তাই বলিতেছিলাম— উনি যে আমাকে মেয়ে মানুষের এমন গুরুতর কথায় থাকা উচিত নয় বলিয়া থামাইয়া দিতে চান ইহা তোর কাছে তোর ইংরাজি কেতাবের যুক্তি শুনিয়া কি না?" মায়ের কথা শুনিয়া নবীন হাসিয়া ফেলিত। সে উভয়ের যুক্তির সামঞ্জস্য করিয়া বলিত "তোমাদের উভয়ের কথাই থাকিবে মা। এখন ত ওকালতিটা দিই। তার পর সুবিধা মত একটা না হয় মুন্সেফী হইব।" এক কথায় নবীনমাধবকে এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিতে দেখিয়া নিতাই অনিমেষনয়নে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া পুত্রগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত; আর কাত্যমণি স্বামীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "সাধে কি আমি নিজেকে রত্নগর্ভা বলিয়া অহঙ্কার করি! বুদ্ধি ছিল তোমার এত বড় একটা কথার অমন সহজ মীমাংসা করিতে।"

(খ)

B. L. পরীক্ষা দিয়া নবীন বাড়ী আসিয়াছে। পাশের সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ ছিল। এখন জীবন সংগ্রামে

জয়ী হইবার আশায় সে কল্পনায় মোহন তুলিতে অন্তর পটে চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া যাইতে লাগিল। দুস্তর পরীক্ষা সমূহ বিশেষ কৃতিত্বর সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সে যখন সাফল্যের প্রায় কিনারায় আসিয়া পৌছিয়াছে তখন, ভাগ্যদেবীর করুণা হইতে নিশ্চয়ই তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না! আশার ছলনায় এমনি করিয়াই মানুষ মনে মনে ইন্দ্রধনুর রচনা করিয়া থাকে! তাই অদৃষ্টের অট্টহাসিতে নির্মম সত্যের সহিত সে যখন পরিচিত হয় তখন চলিতে চলিতে সহসা হোঁছট খাইয়া পড়িবার মত তাহাকে অভিভূত হইতে হয়। নবীন মনে করিত সহরের কোলাহল বর্জ্জিত নিভৃত পল্লীর এক প্রান্তে ছবির মত সুদৃশ্য তাহার এ কখানি বাড়ী। বাড়ীর অধিবাসীগণের আনন সুখে সোণার আলোকে প্রসন্নোজ্জ্বল। সন্ধ্যাবেলা হরি-নামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে মা তাহার পত্নীর কাছে পুত্রের শৈশবের কীর্ত্তির বিষয় গল্প করিতেছেন। স্ত্রী অন্নদা সেই সকল কাহিনী শুনিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। নবীন যেন এই সান্ধ্য বৈঠকে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি এত কথা হইতেছে মা তোমাদের?" তখন ক্ষান্তমণি স্নেহ গদ গদ স্বরে "তোরই ছেলেবেলার গুণের 'ব্যাখান' করিতেছি রে!" বলিয়া তাহাকে বসিবার জন্য বধুকে একটা কিছু পাতিয়া দিতে আদেশ করিতেছেন। নবীন তাহার প্রয়োজন নাই জানাইয়া মাকে বলিতেছে "আমার কি মরিবার অবসর আছে মা যে একদণ্ড বসিয়া তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব? মক্কেল গুলো আমাকে যেন কি পাইয়া বসিয়াছে! ঝঞ্চাট কম হইবে বলিয়া এই এত দূরে আসিয়া বাড়ী করিলাম তবুও কি নিষ্কৃতি আছে?" ক্ষান্তমণি পুত্রের উত্তর শুনিয়া 'ষাট ষাট' করিয়া তাহাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন "এই জনাই তোকে আমি চাকরী লইতে বলিয়াছিলাম নবীন। তাহা হইলে বাড়ীতে একটু সময় পাইতিস।" মায়ের কথায় সে হাসিয়া গর্ব্বোৎফুল্লস্বরে বলিতেছে "তাহা হইলে কি রোজ রোজ তোমাকে মুঠা মুঠা টাকা আনিয়া দিতে পারিতাম মা?" নবীন মনে মনে যখন এই রকম সুখের কল্পনায় মাতিয়া উঠিত তখন পিতার কথা মনে করিয়া তাহার সমস্ত অন্তর একটা বিষম অসোয়াস্তিতে ভরিয়া উঠিত! আজ কয়মাস হইল নিতাইপাল গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল পুত্রকে উকিল হইতে দেখিবেন। সেইত নবীন উকিল হইতে যাইতেছে কিন্তু তিনি আজ কত দূরে! হায় ভগবান আর কটা দিন যদি তুমি তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে!

এইরূপ মধুর চিন্তায় নবীন যখন পরীক্ষার পর অবসর দিন গুলি স্বপ্ন দেখিয়া কাটাইয়া দিতেছিল তখন সহসা একদিন সে দেখিল তাহার স্বপ্ন সত্যই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সে খবর পাইল যে সে বি, এল পরীক্ষা বিশেষ সম্মানের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই সম্বাদ নবীনকে বেশী বিহ্বল করিতে পারিল না! কারণ সে পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। মানুষ বিচলিত হয় তখনই যখন সে অসম্ভাবিত কিছু ঘটিতে দেখে! তাই নবীন মনে করিল স্বপ্নকে শুধু সফল হইতে দেখিয়া সুখী হইলে চলিবে না, এখনও যে তার পূর্ণতা বাকি। নবীনকে এখন তাহারই সাধনা করিতে হইবে।

অবশেষে নবীনের আদালতে বাহির হইবার দিন যখন নিকট হইয়া আসিল সে মা ও পত্নীকে লইয়া জেলার সদরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্ষান্তমণি প্রথমে স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইয়া ছিলেন না, তিনি নবীনকে বলিয়াছিলেন "তুই বৌমাকে লইয়া যা। আমি ঘরেতেই থাকি। তুই মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাইবি; কিন্তু পুত্র যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহাদের গ্রাম হইতে সদর অনেক দূরে এবং যখন তখন আসা যাওয়ার সুবিধা বর্জ্জিত তখন তিনি আর অসম্মত হইতে পারিলেন না। নবীন মাধব পৈত্রিক জমি জায়গার একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া শুভদিন দেখিয়া সপরিবারে সহরে রওনা হইল।

(গ)

নবীনমাধবের ওকালতি পাশ হইবার সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বাবু নবীনমাধব পাল এখন প্রত্যহ আদালতে বাহির হন—সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা

যুবকেদের জন্য 'বাসর' সাজাইয়া বসিয়া থাকেন কিন্তু হায়রে! যাহাদের জন্য এত আয়োজন তাঁহারা যে তাঁহার পানে ফিরিয়াও চাহেন না! "বন্ধু যে কঠিন অতি"! পোড়া বাঙ্গালাদেশের মক্কেল কুল যেন একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে 'ধর্ম্মঘট' ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে।

নবীনের সেই সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন তিনি "এরূপ ভাবে আর কত দিন চলিবে" মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে 'কাঠ' হইয়া উঠিতেছেন। পিতার মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া উপার্জ্জন-করা সঞ্চিত টাকা অনেক দিন হইল নিঃশেষ হইয়াছে। বসিয়া বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডারেও যখন 'টান' পড়ে তখন নিতাই ভাটের পুঁজি ত সামান্য! এখন স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া ঋণ করিয়া কোন রকমে নবীনের দিন চলিতেছে মাত্র। মুন্সেফ হইবার দুরাশা নবীনমাধবের এখন আর নাই। এখন যেমন তেমন একটা চাকরী নিদান পক্ষে স্কুলমাষ্টারি জুটিলেও তিনি 'বর্ত্তিয়া' যান! কিন্তু তাহাই বা কোথায় পাওয়া যায়? আদালতে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসর চারেক ব্যবসায়ে 'পশার' জমাইবার বৃথা চেষ্টার পর 'গতিক ভাল নয়' বুঝিয়া নবীনমাধব সংবাদ পত্রের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকগুলি দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহার কোনটিরই জবাব পান নাই। নবীনমাধবের আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল এখন সেই পয়সাটা থাকিলেও যে তাহার ক'দিনের সংসার খরচ চলিয়া যায়!

সেদিন অপরাহ্ণে ছিন্ন-তালি-লাগান চাপকান গায় দিয়া বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যে নবীনমাধব যখন বারলাইব্রেরী হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মনে হইতেছিল প্রবল ভূকম্পে তাহার পায়ের নীচের মৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়া যদি তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে সে নিষ্কৃতি পায়। আজ সকালে আপিস বাহির হইবার সময় সে শুনিয়া আসিয়াছিল ঘরে ওবেলার চাল 'বাড়ন্ত'; তাহার উপর গোয়ালা বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া হায়রান হইয়া আজ তাহার প্রাপ্যের জন্য আদালত পর্য্যন্ত আসিয়া তাগাদা করিয়া গিয়াছে! এখন কোন্ মুখে তিনি নিরাপদে গৃহে ফিরিবেন? সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ত গোয়ালা 'বাবুজী' বলিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে! রাত্রিতে কি দিয়া তিনি ছেলেদের ভুলাইয়া রাখিবেন? একটা বেলা তাঁহারা উপবাস দিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেও শিশুরা ত তাহা মানিবে না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তিনি চাপকানের হাতায় নয়ন মার্জ্জনা করিলেন! নদীর কিনারা দিয়া নবীনমাধবের বাড়ী যাইবার পথ। তিনি বাড়ী যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন নদীর তীরে বসিয়া কতকগুলি যুবক ছাত্র সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে হল্লা করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে। তাহাদের দেখিয়া নবীনমাধবের মনে হইল তাঁহারও একদিন অমন গিয়াছে, তিনিও একদিন উঁহাদের ন্যায় 'প্রজাপতির পাখার ভর' করিয়া হাল্কা হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। কিন্তু এখন? হায় রে! তাই তাঁহার মনে হইল উহাদের সাবধান করিয়া দিই, বলি যাহাদের মাথার উপর হয় ত অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কৃপাণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে উদ্যত রহিয়াছে তাহারা কেমন করিয়া হাসিতে পারে? কথাটা মনে করিয়াই নবীনমাধব নিজের মনের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। একি! ভাবিতে ভাবিতে সে পাগল হইয়া যাইবে নাকি? তাহা না হইলে ঐ যুবকদের কাছে তত্ত্ব প্রচার করিয়া হাস্যাস্পদ হইবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার মাথায় কেমন করিয়া আসিবে? তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না—দ্রুত পথ অতিবাহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

(ঘ)

জীবন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নবীনমাধব যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার পত্নী তাহাকে বলিল "কিছু না মনে কর ত একটা কথা বলিব।" নবীনমাধব আদর করিয়া স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "অত সঙ্কোচ কেন অনু? এখনও কি তোমার সেই ছেলে মানুষী স্বভাব গেল না?" অন্নদা নত মুখে বলিল "আমি বলিতেছিলাম এদিকে যখন সুবিধা

চলিল না আর চাকরীও এখন পাওয়া যাইতেছে না তখন বাবার মত একটা তাঁতের কারখানা করিলে হয় না ?" "তাতেও ত টাকার দরকার অনু ! তাঁত কিনিবার মত পয়সাই আমাদের কই ?" অন্নদা বলিল "কেন আমার যে গহনা বন্ধক দিয়াছ, সুদের বোঝা ভারি না করিয়া সেগুলো বিক্রয় করিয়া ফেলিলে ত কিছু মিলিতে পারে ! দেশের কারখানা ঘরটাও পড়িয়া যায় নাই। ঐ টাকায় তাঁত কিনিয়া সেইখানে আবার কারখানা বসাইবে।" অন্নদার কথায় নবীনমাধব যেন নূতন আলো দেখিতে পাইল। সত্যই ত তাঁতীর ছেলে সে, কাপড় বুনিয়া খাইতে তাহার লজ্জা কিসের ? সে B. A. পাশ করিয়াছে-উকিল হইয়াছে পরিশ্রম করিয়া খাইলে যে তাহার বাবু নাম ঘুচিয়া যাইবে। এই শিক্ষার অভিমানে শ্রমবিমুখ হইয়াই না বাঙ্গালী জাতির এই দুর্গতি ! পাশ্চাত্য দেশে B A, M. A, পাশ করিয়া ত কেহ মোট বহিতেও লজ্জা অনুভব করে না ! আর তাহাদের বই পড়িয়া, তাহাদের ভাবে শিক্ষিত হইয়া সকল রকমে তাহাদের অনুকরণের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর এই দুর্গতি কেন ! নবীনমাধবের মনে হইল তখনই বাক্সর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত ডিগ্রির 'তকমা' গুলোকে বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। নবীনমাধব আনন্দের আতিশয্যে সেই প্রথম যৌবনের মত পত্নীকে বুকে চাপিয়া তাহার গণ্ডে, ওষ্ঠে অজস্র চুম্বন দিয়া আদরের প্লাবনে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিলেন। সুনিশ্চিত মুক্তির আনন্দে যে তাহার হৃদয় আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

* * *

এক বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

নবীনের এখন আর কোন অভাব নাই। তাহার কারখানায় এখন প্রত্যহ ৭।৮ খানা তাঁত চলিয়া থাকে। যে শিক্ষা সেদিন নবীনকে উদরান্নের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল আজ সেই শিক্ষার সহায়তাতেই সে তাঁতের কাজে প্রচুর লাভবান হইতেছে। 'নবীন বাবু' আজ নবীন 'তাঁতিতে' পরিণত হইলেও দেশের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা অল্প নয় ! তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত নবীন তাঁতির কাপড় 'ধারে' বিক্রয় হয়। নবীন B. L. পরীক্ষা দিয়া একদিন মনে মনে যে সুখের চিত্র আঁকিয়াছিল 'তাঁতই' এতদিনে তাহা সার্থক করিয়া তুলিল।

শ্রীনলিনী নাথ দে।

সন্তবাণী।

(জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ)

হে দাদু, তুই কোন্ মুখে হাসি তামাসা করিস্ ? হায় ! তুই তোর অমূল্য মনুষ্য জন্ম বৃথা কাজে খোয়ালি !

(দাদু সাহেব)

* * *

হে প্রিয়তম, আমাকে বিশ্বাস, ভক্তি, সন্তোষ ও ধৈর্য্য দাও ; তোমার চরণে দাদুর এই একমাত্র ভিক্ষা।

(দাদু সাহেব)

* * *

ভগবানের সেবায় যদি কষ্ট বিপদ হয় সেও ভাল ; কিন্তু তাঁর নাম ছাড়া যে সুখ সম্পত্তি তা কোন কাজের নয়।

(দাদু সাহেব)

* * *

প্রকৃত ভালবাসা কি কেউ ভুলতে পারে ? মেঘ যে এত গর্জ্জন করে তবুও সেই মেঘ দেখে ময়ূরেরা পেখম তুলে আনন্দে নাচ্‌তে থাকে। (তুলসীদাস)

হে তুলসী, জগতে এসে দুইটি কাজ করে নে—সাধু সঙ্গ (এক টুকরা হলেও ভাল), আর হরি নাম নে।

(তুলসী দাস)

* * *

তোর যা কিছু আছে তা দিয়ে নিজে খা, পরকে খাওয়া, আর দান কর্। এমনি করে নিজের কাজ করে নে; মৃত্যুকালে এক ছিদামও তোর সঙ্গে যাবে না।

(কবীর)

* * *

যদি ঘরেই থাক্‌বে, তা'হ'লে ভক্তি কর; নতুবা ঘর ছেড়ে বৈরাগী হও। কিন্তু বৈরাগী হয়ে যদি বন্ধন থাকে তাহ'লে তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য জান্‌বে।

(কবীর)

* * *

গৃহীর বৈরাগ্য বেশ ভাল; কিন্তু বৈরাগীর অনুরাগ বড়ই দোষের।

(কবীর)

* * *

একজন গৃহস্থের মনে হঠাৎ একদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল; সে তার স্ত্রীকে বল্‌লে, "ছাখ্ আর সংসার ভাল লাগে না; চল্ এ সব ছেড়ে কাশী বৃন্দাবন যাই।" স্ত্রী একজন প্রকৃত ভক্ত ছিল; কিন্তু তার স্বামী বা আর কেউ তা জান্‌ত না। এ কথা শুনে তার স্ত্রী বড়ই খুসী; সে খুব আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে "সে ত বেশ ভাল কথা; চল আজিই আমরা রওনা হই, এ সব কাজে দেরী না করাই ভাল।" তার পর যা সামান্য কিছু ছিল তা নিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে দুজনে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিছু দূর গিয়ে পুরুষটি দেখ্‌লে যে রাস্তায় একটা সোণার মোহর পড়ে আছে। সে তখনই সেটা পা দিয়ে চেপে ধর্‌লে, পাছে তার স্ত্রী দেখ্‌তে পায় এই তার ভয়। তার স্ত্রী কিন্তু তাকে হঠাৎ দাঁড়াতে দেখেই বলে উঠ্‌ল, "তুমি থম্‌কে দাঁড়ালে যে? পায়ে কি হয়েছে? দেখি, দেখি, কাঁটা ফুট্‌ল না কি।" তার স্বামী দেখ্‌লে, এ ত বড় বিপদ! তখন আর কি করে? তার স্ত্রীর কাছে সব প্রকাশ করে বল্‌লে "ছাখ্, একটা মোহর পেয়েছি, খবরদার, কাউকে কিছু বলিস্ নি। "তার স্ত্রী ত এসব দেখে শুনে অবাক্; সে বল্‌লে" এই বুঝি তোমার বৈরাগ্য! এখনও তোমার কাছে মাটী ও সোণার বেশ প্রভেদ আছে। চল ঘরে ফিরে চল, আর কাশী বৃন্দাবন যেয়ে কাজ নাই। ঘরে বসে লোকসেবা ও ভগবানের নাম করিগে; মনটা আরও সাফ হোক্। তার পর কাশী বৃন্দাবন যাওয়া যাবে"। তার স্বামী ত বড়ই লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে রইল; শেষে অতি দীন ভাবে তার স্ত্রীকে বল্‌লে, "আর লজ্জা দিস্‌নি; আজ থেকে তুই আমার গুরু হলি। তুই যা বল্‌বি তাই কর্‌বো; চল্ ঘরে ফিরে যাই, যখন সময় হবে তখন ভগবান আপনিই টেনে নেবেন।" তারপর দুজনেই ঘরে ফিরে যেয়ে ভজন সাধন কর্‌তে লাগল।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

।

(উপন্যাস)

———*(*)*———

বেলা বারোটা বাজিবামাত্র সোমনাথ সরকার কোম্পানীর কাগজের বাজারের জান্‌লার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। জান্‌লাগুলি একে একে দেখিয়া বাঙ্গালীদের দিক থেকে মাড়োয়ারীদের দিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঙ্গালীদের দিকে সামান্য কয়েকটা লোক টিম্ টিম্ করিতেছিল। মাড়োয়ারীদের দিকে কতকগুলা

জমায়েত হইয়াছিল। যাকে দরকার তাকে দেখতে না পেয়ে সোমনাথ বাজারের পিছনদিকের চয়ের দোকানে যাইয়া বসিল। অনেকগুলো লোক অল্প স্থানের মধ্যে জড় হইয়া চা খাইতেছিল। এক দিকে চা এর জল গরম হইতেছিল আর অপর দিকে বৈশাখের গরম হাওয়া আসিয়া চা-ভোজীদিগের শরীর আরও গরম করিয়া দিতেছিল। পুরান খরিদ্দার পাইয়া চা-ওয়ালা সোমনাথকে এক বাটী চা আগাইয়া দিল। সোমনাথ বলিল—

আমি চা খাব না। আমি প্রভাত বাবুকে খুঁজছি।

চা-ওয়ালা—প্রভাত বাবু ত এখন আসেন নি। তিনি কি আর একটার আগে আসবেন ?

সোমনাথ। তা ত জানি ; বাজার ত আর একটার আগে জমে না।

চা-ভোজীদিগের মধ্যে কতকগুলা লোক বাজারের দর লইয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছিল আবার কতকগুলো নীরবে চা খাইতেছিল। সোমনাথ নিজের চিন্তায় এত মগ্ন ছিল যে কোন কথা শুনিবার তার আর বড় সময় ছিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—বাহিরে আসিবামাত্রই নগেন দত্ত দালালের সঙ্গে দেখা হইল। নগেন দত্ত দেখিতে শ্যামবর্ণ, গোঁপ দাড়ি কামান, বয়স বত্রিশ বৎসর হইবে। অল্প দিনের মধ্যে অনেক কাজ কর্ম্ম জোগাড় করিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া রাখিয়াছে। সোমনাথ নগেনকে নমস্কার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু নগেন প্রতি নমস্কার করিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বাজারে এমন হয় ; অনেক সময় দালালগণ লোকের সঙ্গে আলাপ না করিয়াই ছুটোছুটি করে। নগেনের তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার একটা বিশেষ কারণ হইয়াছিল। হরেরাম নামে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কৃষ্ণরাধিকা মিলের দশ হাজার শেয়ার কিনিয়াছিল। সে এই শেয়ার কেনাতে বাজার শুদ্ধ লোক তাহাকে পাগল বলিত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দশ টাকার শেয়ারের দাম ক্রমে তিনশ টাকা হইয়াছিল। কাজেই হরেরাম এক বেলাতেই ত্রিশ লাখ টাকার মালিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আবার বাজার শুদ্ধ লোক তাকে মস্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জাহির করিয়া থাকে। সংসারে কেহ ঠকিবে বলিয়া কোন কাজ করে না। কিন্তু ঠকিলেই লোক বুদ্ধিহীন মনে করে আর জিতিলেই মস্ত বুদ্ধিমান বলিয়া ঠাওরায়। হরেরাম যেমন বাজারে মটর হইতে নামিল, অমনি চার পেয়ে যেমন মাছগুলো ছুটিয়া আসে তেমনি দালালগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। হরেরামের গাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইবার পথে নগেনের সঙ্গে সোমনাথের দেখা হইয়াছিল। মানুষ যে কত ভুল করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হরেরাম বড় চালাক লোক। সে বাজার থেকে একবার লুটিয়া নিয়া গিয়াছে। সে অবধি আর সে বাজারমুখো হয় নাই। এখন তার একটী ছেলে বড় হইয়াছে, তাকে বাজারের দালালী শেখাবার জন্য বাজারে দালাল খুঁজিতে আসিয়াছে। এমন একজন দালাল চাই যে ভিতরকার অথচ সহকারী রাখিতে পারে এমন ক্ষমতা হইয়াছে। এ কথা শুনিয়া অনেক দালাল সরিয়া গেল। দু'চারি জন দালাল কিন্তু নড়িল না। তাহারা ভাবিল যে ছেলেটাকে হাত করিতে পারিলে বাপটাও হাত হইবে। তবে সকলে ত আর ভিতরকার দালাল নয়—আবার ভিতরকার দালাল পাঁচ বৎসর না থাকিলে সহকারী লইবার ক্ষমতা জন্মায় না। এত করিয়া তবে দালালী শিখিতে হয়। তার উপর এক্সচেঞ্জের কর্ত্তাদের কাছে পাঁচশ টাকা জমা না রাখিলে সহকারী বলিয়া ভিতরকার খাতায় নাম উঠিবে না। সহকারী বলিয়া নাম যদিও উঠিল তাহাতে দালাল নাম হইবে না। দালাল হইতে হইলে আবার পঁচিশ হাজার টাকা জমা রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিলে তবে ভিতরকার দালাল বলিয়া নাম লেখা হইবে। হরেরামের টাকার ভাবনা নাই বটে, ভাল দালালের ত বেশ অভাব আছে। হরেরাম অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর নগেনের কাছেই ছেলেটীকে সহকারী করিবার ঠিক করিল। হরেরামের সঙ্গে কাজ শেষ করিয়া নগেন আবার সোমনাথের কাছে আসিল। সোমনাথ পূর্ব্বে কোম্পানীর কাগজের অনেক জুয়া খেলিয়াছিল অনেক টাকাও রোজগার করিয়াছিল।

পরে দুর্বুদ্ধি হইল-কয়লার খনি কিনিতে গিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই অবধি সোমনাথ আর বাজারে আসে নাই। আজ বহুদিনের পর প্রথম আসিয়াছে। নগেন অনেকদিন পরে পুরাণ খরিদ্দারটিকে পাইয়া বাজারের সমস্ত দর বলিতে লাগিল।

নগেন। মশায় স্যাকরাহাটি এখন আটাশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এর চেয়ে আর কি সুবিধা দর হবে বলুন ত। শিগ্‌গির ডিভিডেণ্ড ঠিক হবে কাজেই সেই সঙ্গে দাম চড়বে। আমার মনে হয় স্যাকরাহাটি এবার বারোশ টাকা পর্য্যন্ত হবে।

সোম। নগেন বাবু আমার কি আর সেদিন আছে! যদি ভগবান একবার মুখ তুলে চান ত আমি আপনার সঙ্গে কিছু কাজ করব। না হ'লে আমি আর দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিতে যাব না।

নগেন। দুরাশা সাগর কেন?

সোমনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, নগেন বাবু আমি এ বাজারের একটা পুরাণ ঘাগী। বাজার এখন এই রকম আছে, এর পর মুহূর্ত্তে যে কি হবে তা কেউ বল্‌তে পারে না। এখন চটের বাজার গরম আছে বলে পাটের শেয়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছে—কিন্তু চটের জাহাজী খদ্দের কমে গেলেই আবার পাট পড়ে যাবে। এ ত গেল হিসেবের কথা—কিন্তু চটের দাম কমুক আর বাড়ুক যদি কোন বড়লোক উদ্দাম জুয়া খেলবার মৎলবে টাকা ছড়াতে পারে। তাহলে পড়া দামকে চড়াতে পারে আর চড়া দামকে পড়াতে পারে। যেমন ধরুন দেবল বাবু তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের সব হিসেব ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

নগেন। সোমনাথ বাবু আপনি সবই ত বোঝেন—সেই জন্যই আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি।

এই সময় প্রভাত হন্ হন্ করিয়া সোমনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নগেনকে দেখিতে পাইয়া প্রথমেই তাকে বলিল—এই যে নগেন বাবু। কি করি বলুন ত। স্যাক্‌রাহাটি কিছু করব না কি?

নগেন। হ্যাঁ স্যাক্‌রাহাটিতে সুবিধে হবে বলেই ত মনে হয়।

প্রভাত। আচ্ছা, নগেন বাবু—আমার সোমদা'র সঙ্গে একটু কাজ আছে। সেই কাজটুকু সেরেই আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব। নগেন উভয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সোম। কৈ প্রভাতদা' কি হোল বলুন ত?

প্রভাত। সোমদা' কিছুই হোল না।

সোম। কেন দাদা কি কোন সাহায্য কত্তে প্রস্তুত নয়? তবে সে আপনাকে ডেকেছিল কেন?

প্রভাত। তা ঠিক নয়। তিনি আপনাকে কল্‌কাতায় রাখ্‌তে চান না। তিনি বলেন আপনি বড় উড়নচণ্ডে লোক। আপনার চাই ভাল পোষাক, ভাল খানা, ভাল মদ, মোটর গাড়ী, আরও কতকি-আপনি দাদা হন আপনার কাছে কি আর সে সব কথা বল্‌তে পারি—এ সমস্ত ছাড়া আপনার এক মিনিট চলে না। এজন্য যেখানে এ সব জিনিষ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য সেইখানে তিনি আপনাকে পাঠাতে চান। তিনি একটা জঙ্গল মহল নূতন বন্দোবস্ত নিয়েছেন, সেই মহলে আপনাকে পাঁচশ টাকা মাহিনের বড় সাহেব কত্তে চেয়েছেন। আপনি কি এতে রাজি আছেন?

সোম। না।

প্রভাত। তা ত আমি জানি। কারণটা কতক অবিশ্যি বুঝতে পারি তবে সব কথা ত জানি না।

সোম। কারণ, প্রথমতঃ পাঁচশ টাকায় আমার চল্‌তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমি কল্‌কাতা ছেড়ে থাকতে পারব না।

প্রভাত। আপনি ত বিয়ে করেননি আপনার পাঁচশ টাকায় চল্‌বে না কেন? আর সহরেই বা এমন কি মধু আছে যে আপনি ছেড়ে যেতে পারবেন না?

সোম। সহরে মধু কি বলছেন? মৌচাক আছে। এই মৌচাক ছেড়ে আমার মতন জোয়ান ছোঁড়া কখন কি যেতে পারে? দাদার কি বলুন না প্রভাতদা' সেকেলে ধরণের লোক—সেই তেলচিটে চাপকান—আর বালির কাগজের হিসেবের খাতা আজন্ম চালিয়ে এল। প্রাণে একটু সখ নেই—জীবনে একটু বৈচিত্র্য নেই। সেই

ঘড়ির কাঁটার মত একঘেয়ে জীবন নিয়ে দিন কাটিয়ে দিলে। আর আমার এখন নবীন বয়স আর কান্ত বপু।

প্রভাত। আপনি যে একেবারে কালিদাস এনে ফেল্লেন।

সোম। আমি দেখুন এবয়সে সহরের প্রেমের হাট ছেড়ে জঙ্গলের কুলির সর্দারি কত্তে পারব না। দাদা যদি তার কলকাতার আফিসের এক কোণে ঐ মাহিনের একটা স্থান দিতে পারত তাহলে তার চিরকালের কেনা দাস হোয়ে থাকতাম।

প্রভাত। তা ত তিনি দেবেন না।

সোম। বড়ই দুঃখ যে এ জীবনে আর দাদার সঙ্গে আমার মিল হোল না। তবে প্রভাত-দা যদি আর আপনার সঙ্গে দাদার দেখা হয় তাহলে বলবেন যে সে যদি আর একবছর বেঁচে থাকে তাহলে দেখ্‌তে পাবে আমি সহরের সেরা বড়মানুষি করব। বর্ত্তমান সভ্য জগতের যত রকমের সুখ সোয়াস্তির ব্যবস্থা হোয়েছে তার কোনটাও বাকী থাকবে না। তার টাকা থেকেও কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হোল না, কিন্তু আমার টাকা না, থেকেও সমস্ত ভোগসুখ করে যাব। যাক এ সব কথা। আপনার ত আবার নগেন দালালের সঙ্গে কি কাজ আছে বলছিলেন—না আপনি তাহ'লে আসুন। আমি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সোমনাথ প্রভাতকে ছাড়িয়া বাজারের ভিতর ঢুকিল। ষ্টাক্‌রাহাটি, ডাভা কিবলা, কিবলা, কনফিডেন্স শালকে, বোম্বাই, তারকনাথ প্রভৃতি নাম ধরিয়া কতকগুলো লোক চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। বেলা তখন তিনটা। বাজারে লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। বাহিরের ফুটপাতে পাহারাওয়ালাগুলো ভিড় সরাইতেছে। একদিকে পাহারাওয়ালার ঠেলা আর এক দিকে সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—থাকা জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রতাপেই হউক আর শ্রাবণের বৃষ্টিধারাতেই হউক বা পৌষ মাসের শীতেই হউক সব সময় বাজারের চারিদিকে যে পাঁচ ফুট চওড়া রাস্তা তাহাতে লোকে ভর্ত্তি হইয়া আছে। লোকগুলোর হঠাৎ বড় লোক হইবার কি দুরাশা! সোমনাথ ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ভকারান্ত তিনটী জীব, ভাগাধর, ভোলানাথ আর ভরণীকে দেখিতে পাইল। তিনটারই সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন হইল। তিনটাই দালালের ভগ্না। খদ্দের জোগাড় করিয়া দালালদের কাছে দিলে কিছু দালালীর অংশ পায়। ভাগাধর সদাই ভাবে যে শেয়ারের দাম ভয়ানক বাড়িবে আর খরিদ্দারদের কেবল 'বুল' করিতে অর্থাৎ কিনিতে বলে! ভোলানাথ ভাবে যে শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইবে খরিদ্দারদের কেবল 'বেয়ার' করিতে অর্থাৎ শেয়ার নাই অথচ বেচিতে বলে। আর ভরণী কথাবার্ত্তা বড় কম বলে—শুধু হিসাব করে আর মৎলব ভাঁজে—খরিদ্দার একেই বলে যে তার মত হিসাবী দালাল আর একটী বাজারে নাই। সোমনাথ এই তিনটী জীবকে পেয়ে একটু মজা করিবার মৎলবে জিজ্ঞাসা করিল—ষ্টাক্‌রাহাটির কোন কাজ আপনারা করচেন কি?

ভাগাধর। মশায় এই মাত্র একশ ষ্টাক্‌রাহাটির কাজ করে এলাম। ষ্টাক্‌রাহাটি এবার পনের শত হবেই।

ভোলানাথ। এবার ষ্টাক্‌রাহাটি 'পার' অর্থাৎ একশ টাকার শেয়ারের মূল্য একশ টাকা ত বটেই ডিস্কাউন্ট অর্থাৎ একশ টাকার শেয়ারের মূল্য একশ টাকার কম পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

ভাগ্যধর। থাম্ থাম্ তোর যেমন মোটা বুদ্ধি তাই তোর ষ্টাক্‌রাহাটির ডিস্কাউণ্টের কথা মুখে আন্‌তে লজ্জা করল না।

ভোলানাথ ভাগ্যধরে বেশ ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। ভরণী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল কোন কথা বলিল না। সোমনাথ ঝগড়াটা বাধাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে সহবৎরাম আর মহবৎরাম দুই ভায়ের সহিত দেখা হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

দশ দশা।

হেটো মানুষ

মলিন পিরাণ, সফেদ্ চাদর,
কথায় কথায় প্রিয়ার আদর!
মাথায় কি ভার! সহাস বদন,
সুখের জীবন, মধুর সদন!

ভদ্র পথিক

পুঁটুলি হাতে, ছাতি মাথায়,
ঈষৎ খোঁড়ায় পায়ের ব্যথায়;
পাংশু বদন, ক্ষুধায় কাতর,
কামিজ ভেজা, 'চটর-পটর্'।

ভাঙ্গা বাড়ী

শূন্য প্রাসাদ, সহরবাসী,
কপোত কূজন, সুশ্রী দাসী!
আঙ্গিনাতে চোরকাটা ঘাস,
করছে মাণী ঘোর কাশীবাস!

শিক্ষিত হিন্দু

অন্ন যেমন বায় জবর,
চায় ঘরের খোঁজ খবর;
কাজ কেবল দিন তামাম্,
লাজ কোথায়? হায় সেলাম!

ধনীর ছেলে

মুখখানি পাঁওরুটি,
হাঁটুতে কি ভির্‌কুটি!
খায় কত দিন রাতি!
যৌবনে মৌতাতী!

পশ্চিমা মুটে

কাজ সেকি হাড় ভাঙা!
খায় চানা, খুব চাঙা!
সংযমী, বেশ মোটা!
আদমী সে নয় ছোটা!

ফুল বাবু

আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু!
বেঙ্কে বাবু! চাঁপা ফুল!
চাঁছা ছোলা রোগা মুখ,
কোটে-টাকা সরু বুক!

যুবতী বধূ

টল্-টল্ মুখখান, নয়নে মাখা লাজ,
শুকনো কায়, বয় স্তনের ভার;
দিনরাত খাটছেই, খাটুনি বারমাস,
যৌবনের সুখ কোথায় তার!

পশ্চিমা যুবতী

পটোল-চেরা আঁখি, সে নহে পোষা পাখী,
নিটোল দেহ খানি, কাঁচুলি ফাটা বাকী!
কমলাপায়ে খাড়ু, নাসিকা অতি চারু!
সবল রূপবতী, রাখেনা ভীতি কারু!

কবি-কুটীর

ঘর-দোর সুন্দর, সবারি হাসি মুখ,
চর্‌কা-ঘর্ঘর—দেশের স্তব!
সব্বাই ফিট্‌ফাট্, রমণী পূজা পায়,
শান্তি ভরপুর, মধুর সব!

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গের শিল্পী সমাজের ক্ষয়।

মানুষগন্তির বিবরণে পাই, বহুদিন ধরিয়া এদেশের শ্রমশিল্পজীবিদের ক্ষয় হইতেছে। সহরে রাজ ও ছুতার মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজে বাঙ্গালী বড় অল্প পাওয়া যায়; বিদেশীরাই ঐ কাজ বেশি করে। লোক সংখ্যা কমিয়া কমিয়া যাহাদের উচ্ছেদ হইতেছে, তাহাদের ধ্বংসের একটা বড় কারণ তাহাদের বিবাহ রীতি। বঙ্গে যাহারা শিল্পজীবী এবং যাহারা নবশাখজাতীয়, তাহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে বিবাহে কন্যা কিনিবার প্রথা আছে। পূর্ব্বকালে কাছাকাছি জাতিতে আদান চলিত, কিন্তু উচ্চ জাতীয়দের দৃষ্টান্তে অনেক দিন হইতে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে; মুসলমানের আমলেও এ প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাঁহারা পাড়াগাঁ চেনেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে উপযুক্ত টাকা দিয়া বিবাহের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে অনেকের বংশ লোপ হইয়াছে ও হইতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কষ্টশ্রোত্রিয়দের এই দশা ছিল; যাজক ব্রাহ্মণদের দলের অনেকে বিবাহের অভাবে নির্ব্বংশ হইয়াছে। কুলীনত্বের মর্য্যাদা কিছু কমিয়া 'পাশ করা' ছেলের দর বাড়িবার পর কষ্টশ্রোত্রিয়দের দুর্ভাগ্য ঘুচিয়াছে; পাত্রী কিনিয়া লওয়া দূরে থাকুক, তাহারা অনেকে বিবাহ করিয়া টাকা পাইতেছে। নবশাখ প্রভৃতিতে তাহা ঘটে নাই। পাত্রীর বয়স যত বাড়ে ততই তাহার পণের টাকা বাড়ে; এইজন্য কিছু টাকা রোজগার করিয়া বেশ বয়স হইবার পর অনেককে নিতান্ত শিশু পাত্রী সংগ্রহ করিতে হয়; অনেক পাত্রীকে মাতৃত্ব লাভের বয়সে বিধবা হইতে হয়। সামাজিক প্রথার ফলে যে অনেক জাতির উচ্ছেদ ঘটিতেছে, তাহা বড় বড় সংস্কারকেরা একবারেই জানেন না।

বঙ্গবাণী, আশ্বিন, ১৩২৯।

কোনটা আগে?

ধাত্রীর অজ্ঞতা শিশুমৃত্যুর সদ্য কারণ।

বংশ রক্ষা কত্তে লোকে কচ্ছে দুটো তিনটে বিয়ে;
বংশ কিসে রক্ষা হবে দেয় যদি তায় ঘুণ ধরিয়ে?
হাজার করা তিনশ শিশু বাংলা দেশের আঁতুড় ঘরে,
বছর বছর মরে যদি বংশ কিসে রক্ষা করে?
মুচী ডোমের অশিক্ষিতা ধাই বুড়ীরে ডেকে এনে,
কারিয়ে প্রসব তারে দিয়ে কোনমতে হিঁচড়ে টেনে,
বাঁশের চাঁচে নাড়ী কেটে সরষে পড়ে শিকড় বেঁধে
ভয় দেখিয়ে প্রসূতিরে পেচোয় পাওয়ার গল্প ফেঁদে।
আলো বায়ু রুদ্ধ করা ভগ্ন কুঁড়েয় বদ্ধ রেখে,
কাঠ কয়লার আগুন দিয়ে শিশুগুলি সেঁকে সেঁকে
প্রসূত আর প্রসূতিরে বাঁচাতে কেউ যদি পারে
ধন্য বলো কপাল তাদের দিও নাকো বাহবা তারে।
ধাত্রী বিদ্যা মোদের দেশে রয়েছে ঐ ডোমের ঘরে,
অ-শঙ্কা আর কুসংস্কার আছে যেথায় মূর্ত্তি ধরে;
অজ্ঞানতায় বিশের মধ্যে পাঁচটা শিশু যারা মারে,
আজন্ম কাল নখ কাটে না ভুলেও যদি কাপড় ছাড়ে;
যে ধাত্রীতে পুরাযুগে দিগ্বিজয়ী 'সিজার' বীরে—
জননীরে বাঁচিয়ে তাহার বা'র করেছে উদর চিরে,

সেথায় প্রায় শাস্ত্র ছিল শিশুর প্রসব পালন তরে,
যাদের কীর্ত্তি সুধার ধারা ইতিহাসের পাতায় ঝরে
শাস্ত্রমতে সপ্ত মাতার মধ্যে বিরাজ কর্ত্তে যে—
দেখরে চেয়ে চক্ষু মিলে তার আসনে বসছে কে ?

স্বাস্থ্যসমাচার—আশ্বিন, ১৩২৯।

চরকায় সুতা শক্ত করিবার উপায়।

সাধারণতঃ তুলার গুণেই সুতা শক্ত ও সরু হয়। ছোট কাপাসের তুলা যাহার আঁশ লম্বা (Long staple) ও নরম তাহাই চরকায় ব্যবহার করা সুতা শক্ত করিবার সুন্দর উপায়। সচরাচর যে রকম তুলা চরকায় কাটা হইয়া থাকে তাহাতে সুতা বিশেষ শক্ত হয় না এবং সেজন্য মোটা সুতাই কাটা হয়, সরু সুতা টিকে না। এই সুতা আবার তাঁতে টানা দেওয়া কঠিন, ছিঁড়িয়া যায়।

এই সুতায় অতি সহজে মাড় দেওয়া চলে। চরকায় সুতা কাটিবার সময় একটি ছোট বাটিতে কিছু জল ও একটি ভিজে ন্যাকড়া রাখিয়া কিছু কিছু সুতা কাটা হইলে উহা ঐ ন্যাকড়া দিয়া মাঝে মাঝে ভিজাইবে। এরূপ করিলে সুতা কিছু শক্ত হইবে ও টাকু হইতে উঠাইবার সময় ছিঁড়িবে না। ঐ সুতা লম্বা একটা কাঠের খণ্ডে জড়াইবে, কিছু কিছু জড়ান হইলে একটি ন্যাকড়ায় করিয়া বার্লি বা সাগুদানা সিদ্ধ ঘন জল (যাহা রোগীর পথ্য) ঐ কাঠে জড়ানো সুতায় লাগাইবে। লাগাইবার কালে এক দিকেই হাত চালাইবে অর্থাৎ হয় উপর হইতে নীচে অথবা নীচ হইতে উপরে একদিকে চালাইবে। ইহাতে সুতার আঁশ একদিকে ন্যস্ত হওয়ায় সুতা অধিক শক্ত হয়। খুব সরু চরকার সুতায়ও এরূপে মাড় লাগাইয়া সুতা বেশ শক্ত করা যায় এবং ইহা দ্বারা তাঁতে অনায়াসে টানা দেওয়া যায়।

শ্রীলোকেন্দ্র নাথ গুহ—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৯।

সাররূপে অস্থির ব্যবহার।

ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাররূপে অখণ্ড অস্থি ও অস্থিভস্ম ব্যবহার করিবার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তৎপর যে দিন হইতে আমাদের দেশের পশ্বাদির হাড়ের ক্ষুদ্র টুকরাটি পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে, সেই দিন হইতেই অস্থিখণ্ড দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়াতে, এই উৎকৃষ্ট প্রথাটি একরূপ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র নেপালেই (নেপাল হইতে হাড় রপ্তানী করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়াই সেখানে হাড়ের অভাব ঘটে নাই) উক্ত প্রথার প্রচলন অক্ষুন্ন রহিয়াছে। নেপালীরা কোনও ফলের গাছ রোপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ গর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি অস্থি ফেলিয়া দেয় এবং তৎপর ঐ গর্ত্তেই বৃক্ষ রোপণ করে। গোলাপ চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলের আয়তন ও সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববিধ ফলের মিষ্টতা; ধান্য গোধুম প্রভৃতি শস্যের ফলন; আলু, শালগম, প্রভৃতি কন্দজাতীয় সব্জীর কন্দের পরিমাণ, এবং ইক্ষু, বিট, প্রভৃতির শর্করার ভাগ বৃদ্ধি করা ও শীঘ্র শীঘ্র ফল শস্যাদি পরিপক্ক করিয়া তোলাই অস্থিসারের বিশেষ গুণ। এই গুণানুযায়ী ফললাভের উদ্দেশ্যেই অস্থিচূর্ণ অস্থিভস্ম, দ্রব-অস্থি, সুপার ফসফেট অব লাইম ইত্যাদি আকারে পাশ্চাত্য দেশে অস্থিসার ব্যবহার করা হয়। অস্থিচূর্ণাদি ব্যবহার করিলে যেরূপ সত্বর ফললাভ করা যায়, অখণ্ড অস্থিব্যবহারে সেরূপ সত্বর ফললাভ করা যায় না সত্য কিন্তু উহাও ব্যবহার করিলে সুফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত, কিন্তু অধুনা লুপ্ত প্রথাটির পুনঃ প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কৃষি সম্পদ—শ্রাবণ ১৩২৯।
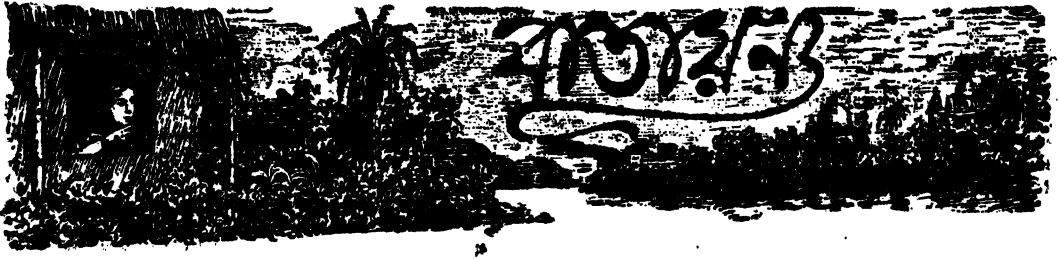
ছোট গল্প। *

আধুনিক যুগে ছোট গল্প সাহিত্যরাজ্যে যে অনেকখানি স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। নানা কারণে ছোট গল্প আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালে জীবনসংগ্রামে ক্ষিপ্তপ্রায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মানব অবসর খুব কমই পায় সুতরাং তাহাদের পক্ষে বড় কোন কিছু বই পড়িয়া শেষ করা প্রায় একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক মাসে নিয়মিতরূপে একাধিক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া এই গল্পসাহিত্য প্রচারের সহায়তা করিয়াছে। ছোট গল্পই যে পরবর্ত্তীকালে নভেলের স্থান অধিকার করিবে এইরূপ ভবিষ্যবাণীও কোন কোন সমালোচক করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে খুব কিছু সম্ভব হইবে তাহা মনে হয় না। জটিল মানব-সমাজের বিচিত্র সুখ দুঃখের চিত্র, মানব চরিত্রের ক্রম বিকাশের আলেখ্য নভেলের মধ্যে যতখানি সম্ভব হয়, অল্পপরিসর ছোট গল্পের মধ্যে তাহা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে Anna Karenina র Levin এর চরিত্র কিম্বা Romola র Tito Melemay র চরিত্র ছোট গল্পে ফুটাইয়া ধরা যায় না।

কিন্তু তবুও সাহিত্যে ছোট গল্পের একটা বিশেষ স্থান আছে। ছোট গল্পের নায়কনায়িকাদের সহিত আমাদের পরিচয় অল্পক্ষণের জন্য হয়; চরিত্রের শুধু একটা দিক্ ফুটাইয়া ধরা হয় ও সমস্ত গল্পটি একটা সামান্য সরল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশিত হইয়া উঠে।

*William Henry Hudson এর "An Introduction to the study of literature" অবলম্বনে লিখিত।

ছোট গল্প যে ছোট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। Edgar Allen Poe বলেন যে আখ্যায়িকা পড়িতে আধ ঘণ্টা হইতে এক বা দুই ঘণ্টা সময় লাগে তাহা ছোট গল্প বলা যাইতে পারে (Requiring from half an hour to one or two hours in its perusal) কিন্তু কেবল মাত্র বাইরের আকার দেখিয়া—ছোট গল্পের বিচার চলিতে পারে না। ইহার কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। নভেলের ক্ষুদ্র সংস্করণকে ছোট গল্প বলা চলে না। Dickens এর Christmas Books আকারে ছোট হইলেও তাহা নভেল ভিন্ন আর কিছুই নয়। ছোট গল্প আজকাল পাঠক সমাজে এত প্রিয় হইয়াছে বলিয়াই তাহার কলাকৌশল ও আর্টের পরিচয় লাভের জন্য মানুষের মন সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ছোট গল্পের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য,—ঘটনাবিন্যাসের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, —ও গঠনকৌশলের একটা অনন্য সাধারণ ঢং আছে।

ছোট গল্পের গল্পাংশ এইরূপ হওয়া উচিত যেন তাহা ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ফুটাইয়া—ফলাইয়া ধরা যায়। ঘটনা সমাবেশ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন পাঠ করিলে মনে হয় উহা আরও বাড়াইলে গল্পটি নষ্ট না হইলেও উৎকর্ষ লাভ করিত না। ছোট গল্প আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে উহা আকারে সংযত সংহত হইলেও যেন বর্ণিত ঘটনাগুলি তাল পাকাইয়া গিয়া একটা অসঙ্গতি দোষ সৃষ্টি না করে তাহা লক্ষ্য করা উচিত।

অবশ্য এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে ছোট গল্প লিখিতে হইলেই সব সময় একটা সামান্য সরল ঘটনা লইয়া লিখিতে হইবে এবং এমন সব ঘটনাই বর্ণনা করিতে হইবে যাহা অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়। যে সমস্ত আখ্যান কিঞ্চিৎ জটিল অথবা যে সমস্ত ঘটনার কাল

দীর্ঘকাল ব্যাপী তাহাও ওস্তাদের হাতে পড়িয়া ছোট গল্প হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এখানেও ছোট গল্পের বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। Washington Irving এর Rip Van Winkle ও Maupassant র (মোপাসাঁ) La Parure এই শ্রেণীর গল্প। যদিচ বর্ণিত আখ্যান ভাগের ঘটনা কাল অত্যন্ত দীর্ঘ তথাপি এই দুটী গল্পেই আমাদের মনোযোগ কেবল একটী মাত্র উদ্দেশ্যের দিকেই আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এবং গল্পের সেই উদ্দেশ্যটি ফলাইয়া ধরিবার পক্ষে যে সমস্ত ঘটনার প্রয়োজনীয়তা নাই তাহা নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। যে আখ্যানটি ছোট গল্পের উপজীব্য স্বরূপ গ্রহণ করা হয় তাহা যাহাতে ছোট গল্পের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠিতে পারে সে জন্য লেখকের মুন্সীয়ানা থাকা আবশ্যক।

ছোট গল্পের আখ্যান অংশের মধ্যে একটী সহজ সরল বাঁধুনি থাকা চাই; তাহা ঢিলেঢালা রকমের হইলে চলিবে না। কি অভিপ্রায়ে গল্পটি লিখিত হইতেছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া মনের কাছে ধরিয়া রাখিতে হইবে। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়। কেবল একটী মাত্র ভাবকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি আপনার সৌন্দর্য্যে পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। ছোট গল্প পাঠ করিলে পাঠকের মনেও কেবল একটি মাত্র ভাবের (Idea) র ছাপ রাখিয়া যাইবে। ছোট গল্প এমন হওয়া দরকার যেন তাহা একতারার একটী সরল সুরের মত পাঠকের মনের তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। সুতরাং বর্ণিত ঘটনার দিক দিয়া লক্ষ্যের দিক দিয়া ও ভাবের দিক দিয়া ছোট গল্পের মধ্যে একটী সহজ সরল ঐক্য বা বাঁধুনি (Unity) থাকা উচিত। সকল প্রকার প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্পেই এই বৈশিষ্ট্য টুকু আছে। Hawthorne এর Dr. Heidegger's Experiment, Poeর The Cask of Amontillado কিম্বা Stevenson এর The Sieur de Maletroit's Door এর মত সংহত আকারের গল্পেই হোক বা Maupassantএর (মোপাসাঁ) La Parure এর মত টানিয়া বুনিয়া লম্বা করিয়া লিখিত গল্পই হোক সর্ব্বত্রই ছোট গল্পের এই বৈশিষ্ট্য টুকু বজায় রহিয়াছে। আবার এমনও গল্প আছে যাহা এই দুইশ্রেণীর কোনটিরই নয় যেমন Bret Harte এর (ব্রেট হার্ট) The Luck Roaring Camp. এখানেও ছোট গল্পের ঐ বিশিষ্টতা টুকুকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। যে প্রধান ভাবটিকে বেষ্টন করিয়া ছোট গল্পটি দানা বাঁধিয়া উঠে তাহার সহিত অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ করা অনুচিত। আর্টের দিক দিয়া ছোট গল্পকে বিচার করিতে গেলে ইহাই হইল প্রধান ও প্রথম মাপকাঠি।

ছোট গল্পের মধ্যে সর্ব্ব দিক দিয়া পূর্ব্বলিখিত এই ঐক্য বা বাঁধুনি (Unity) রক্ষা করা একটী কঠিন ব্যাপার। এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে নভেলের চেয়ে ছোট গল্পে আর্ট অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন বলিয়া অনেক সমালোচক ছোট গল্পকে কলাসৃষ্টির দিক দিয়া নভেলেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। Poe বলেন "ওস্তাদ আর্টিষ্ট অনেক সময় পাঠকের মনে তাহার লিখিত গল্পের একটী অপরূপ ছাপ রাখিতে চান। সেজন্য তিনি অনেক সময় ঘটনার মালা গাঁথিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন। যদি গল্পের প্রথম ভাগ পড়িয়াই সেরূপ ভাবের কোন ছাপ মনের মধ্যে অঙ্কিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে লেখক প্রথম দফাতেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এরূপ স্থলে যে সব কথা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে লেখকের অভিপ্রায় সাধনের অনুকূল নয়, সেরূপ একটী কথাও রচনার মধ্যে স্থান দেওয়া আনাড়ির কার্য্য। এইরূপ যত্ন ও কৌশলের সহিত রচিত হইলে ভাল ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। এই রকমে গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটি অন্য কোন কিছুর সংশ্লিষ্ট না হইয়া উজ্জলতর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে—কিন্তু নভেলের মধ্যে এটি হওয়া একেবারে অসম্ভব।" নভেলের মধ্যে প্রধান গল্পটির সহিত আরও অনেক অপ্রধান ও অনাবশ্যক কিছু লিখিবার যথেষ্ট অবসর আছে, কিন্তু ছোট গল্পে সে সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছোট গল্পের যে সব চরিত্র চিত্র

অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা যাহাতে আপনার রঙে রঙীন হইয়া তাহাদের প্রকৃত আকারে দেখা দেয়, কিংবা গল্পের যে যে অংশে জোর দেওয়া আবশ্যক সেই সেই স্থানে যাহাতে তাহা করা হয় সে, বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে। গল্পের আখ্যানভাগের ক্রমবিকাশের ধারা বজায় রাখিয়া ঘটনার নানা স্তরগুলিকে এমন ভাবে সাজাইয়া ধরিতে হইবে যেন তাহাতে কোন অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট না হয়।

ছোট গল্পের মধ্যে কলা কৌশলের দোষ যত খানি উজ্জ্বল হইয়া চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, নভেলের মধ্যে আর্টিষ্টিক দোষ তত খানি ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু ছোট গল্প রচনার জন্য কতকগুলি ধরা বাঁধা নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অসম্ভব। যে বিষয় ও অভিপ্রায় লইয়া গল্পটি রচিত হয় তাহার উপর অনেক সময় রচনার প্রণালী নির্ভর করে। কোন কোন ছোট গল্পে কথোপকথনের ভাগ অতি সামান্যই থাকিতে পারে বা নাও থাকিতে পারে। আবার কোন কোনটী বা কেবল মাত্র কথোপকথনের দ্বারাই রচিত হইতে পারে। কিন্তু ছোট গল্পে প্রাকৃতিক বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু Cable এর Old Creole Days কিম্বা Stevenson এর Island Night's Entertainment এর মত গল্পে আখ্যান বর্ণিত ঘটনার স্থলের একটি পূর্ণ চিত্র ফলাইয়া ধরিবার জন্য এই শ্রেণীর গল্পের প্রাকৃতিক বর্ণনা আর্টের মাপকাঠির বিচারে সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

যে প্রধান ভাবটীকে বীজ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ছোট গল্প রচিত হয় তাহা যে কত রকমের হইতে পারে ধরিয়া শেষ করা যায় না। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিলে যে কোন রকমের ঘটনা বা অভিপ্রায় লইয়া তাহা হইতে পারে। Washington Irving এর The Stout Gentleman নামক গল্পটি একটা খামখেয়ালী কল্পনাকে (Whimsical fancy) আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। Poe র Gold Bug গল্পটী একটী প্রহেলিকা, তাহার Mystery of Marie Roget, Purloined Letter, Masque of the death প্রভৃতি গল্প গুলি বিভিন্ন ভাবকে আপনার উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছে—Hawthorne এর Wakefield or Gogol এর Madman's diary অথবা Stevenson এর Olalla অসুস্থ মনোবিকারের চিত্র (Morbid psychology) The minister's veil নামক গল্পটি অতীন্দ্রিয়তার ধ্বজা উড়াইয়াছে; The Great Stone Face গল্পটি একটী রূপক। Tolstoy এর Polushkaতে মানসিক চিন্তার ধারা প্রদত্ত হইয়াছে। Tolstoy এর অন্যান্য গল্পেতে রুষীয় কৃষকদের কথা নৈতিক আদর্শ; বা আধ্যাত্মিক নীতিবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কোন অভিনব ঘটনা বা অবস্থা কোন মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য, কোন ধারাবাহিক সমশ্রেণীর ঘটনা মানব চরিত্রের কোন একটা দিক, একটা সামান্য অভিজ্ঞতা, জীবনের কোন অংশের একটী চিত্র. একটী নৈতিক সমস্যা,—ইহার যে কোন একটী বা আরও অন্যান্য অনেক বিষয় সকল প্রকার ভাল গল্পের কেন্দ্রের প্রধান ঘটনা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

Hawthorne এর নিকট ছোট গল্পের কাঠামোটি আখ্যানের আকারে দেখা দিত না বরং তিনি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, মানবচরিত্রের একটা বিশেষ দিকের বিকাশ কিংবা শুধু মাত্র একটী মানসিক ভাবকে আশ্রয় করিয়া এক একটী ছোটগল্প রচনা করিতেন। তাঁহার Birth Mark গল্পটি ইহার উদাহরণ। Stevenson বলেন যে ছোট গল্প রচনা করিবার তিনটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। কোন একটী ঘটনাকে ছোট গল্পের ভিত্তি স্বরূপ লইয়া তাহা ফুটাইয়া ধরিবার জন্য কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করা ছোট গল্প রচনার একটী পন্থা। অথবা একটী চরিত্রকে লইয়া তাহা ফলাইয়া ধরিবার জন্য কতক গুলি ঘটনা সংযোজনা করিয়া দেওয়া আর একটী উপায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি লইয়া—তাহার উপযোগী চরিত্র ও ঘটনা সৃজন করাকে ছোট গল্প রচনার তৃতীয় পন্থা বলা যাইতে পারে। যদিচ Stevenson এর এই তিনটি প্রণালীকে অনেকেই যথেষ্ট মনে না করিতে পারেন তথাপি ইহা যে ছোট গল্প রচনার পথ নির্দেশ করিতেছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সমালোচনা।

অঞ্জলি—শ্রীকৃষ্ণকিশোর রায় কর্ত্তৃক মেদিনীপুর কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। "অঞ্জলি" দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত ভক্তকবির গীতি-পুষ্পাঞ্জলি —স্বদেশ বৎসল এইটী পল্লীকবির মন মাতান প্রাণ জুড়ান ভাবোচ্ছ্বাস। গানগুলিতে যথার্থ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। প্রকাশক অঞ্জলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দান করিয়াছেন। আমরা এই গীতিকবিতাগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

বিকাশ—আশ্বিন ১৩২৯। ১১০। ১নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা। বিকাশ এই সংখ্যায় চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। নবীন লেখক লেখিকার রচনাশক্তির বিকাশ সাধন বিকাশের মুখ্য লক্ষ্য। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'অস্পৃশ্যতা জাতি গঠনের অন্তরায়" ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের "সাহিত্যে স্বাধীনতা" সাহাজির "লীলাবাদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ প্রবন্ধাবলী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই তিনটী প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের ভাববার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। কবিতাগুলির মধ্যে সুকবি কাজী নজরুল ইসলামের "অফুট কুঁড়ি" শ্রীমতি শৈলবালা ঘোষজায়ার "প্রাণের সাধন" শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষের "শারদলক্ষ্মী" বেশ মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য। এই সংখ্যায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের একটি কবিতায় হেঁয়ালি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক, এই কবিতাটীর নামকরণ করিতে পারিলে ৩৲ টাকা কবিতাটীর নামকরণ ও উত্তরের নামকরণ করিলে ৫৲ টাকা, এবং কবিতায় সম্পূর্ণ উত্তর কবিতায় দিতে পারিলে ১০৲ টাকা, পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। নবীন কবিগণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? গল্পগুলির মধ্যে 'ভগবানের দান' গল্পটী বড় মধুর বড় মর্ম্মস্পর্শী বোধ হইল। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে দিন এমনি 'ভগবানের দান' বিরাজ করিবে বাঙ্গালী সেদিন সত্যই বিশ্ব বিজয় করিবে। লেখিকার লেখনী ধন্য হউক। আমরা নব বর্ষের এই প্রথম সংখ্যাপাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

সাহিত্য সংবাদ।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার স্থানীয় শাখা সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মেদিনীপুর শাখার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে শাখা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সুগায়ক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চন্দ্র মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় মহাশয়ের রচিত একটী সঙ্গীত গীত হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহাশয় যথা রীতি পূর্ব্ব মাসিক অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করেন এবং তাঁহার প্রস্তাবে ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণকে শাখা পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়:—

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু।

২। " চারুচন্দ্র মিত্র, বি, এ।

৩। " ললিত মোহন রায়।

অতঃপর নিম্নোক্ত প্রবন্ধাবলী পঠিত ও গৃহীত হয়:—

১। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণের কাল নির্ণয়।
লেখক—শ্রীমণীন্দ্র নাথ বসু সরস্বতী এম, এ, বি, এল

২। বিহগ (কবিতা)—শ্রীব্রজমাধব রায়।

মনীষি বাবু এই দিবস অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার প্রবন্ধটী শাখা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র আর্য্যশিরোমণি মহাশয় পাঠ করেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাশ গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় শাখা পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী ও যতীন্দ্র নাথ পালের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করেন এবং ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শোক সংবাদ।

সাহিত্য গগনের তিনটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক একে একে খসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে যাহা যাইতেছে তাহা আর পূর্ণ হইতেছে না। ভবিতব্যের বিধান অখণ্ডনীয় হইলেও আমাদের এই দুরদৃষ্টের ফলে সাহিত্য জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা অচিরে পূর্ণ হইবার নহে।

বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করিয়া যিনি চির অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের সমসাময়িক সেই সর্ব্বজন সুপরিচিত সুলেখক ও সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাণীর রত্ন মঞ্জুষায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' মত মণি আর খুঁজিয়া পাই না—এ হেন মণি আহরণের প্রয়াস আর দেখিতে পাই না। মনে হয় বুঝি প্রেমিক না হইলে—জহুরি না হইলে মায়ের গলায় তেমন মণির মালা কেহ দোলাইতে পারে না। চন্দ্রশেখর সত্যই জহুরি ছিলেন—সে জহুরির অভাব হায়! কখন কি পূর্ণ হইবে?

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—মাতৃমন্দিরের আর একটী জ্যোতির্ম্ময়ী দীপ শিখা প্রতিভাবান আদর্শ চরিত্র ভূদেব চন্দ্রের পৌত্রী ইন্দিরা দেবী। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গবাণীর সেবায় সাহিত্য ও সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ইন্দিরা দেবী তাঁহাদেরই অন্যতম। শ্রদ্ধেয় পিতামহের আদর্শ শিক্ষার ফলে হিন্দু পরিবারের যে আদর্শ তিনি জীবনে লাভ করিয়াছিলেন, গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া তিনি তাহাই আমাদিগের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আদর্শ চরিত্রা সুলেখিকার অভাবে আজ হিন্দু সমাজের যে ক্ষতি হইল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক যতীন্দ্র নাথ পাল বড় অকালে আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। এত অল্পবয়সে এরূপ অধিক সংখ্যক গল্প ও উপন্যাস রচনায় সম্ভবতঃ কোন লেখকই কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। যতীন্দ্রনাথ মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে গল্প ও উপন্যাসে প্রায় একশত খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মম নিয়তির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইলে বঙ্গবাণীর এই অক্লান্ত সেবক আরও কত মনোমদ কল্পনাকুসুমে মায়ের রক্তিম চরণ কমল সাজাইতে পারিতেন। কিন্তু হায়! নিয়তি কেন বাধ্যতে"।

আমরা আজ সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত বঙ্গবাণীর পরলোকগত এই সেবকত্রয়ের নিদারুণ শোক ব্যথায় ব্যথিত। আজ আমাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে এই গভীর শোক প্রকাশের ভাষা না সরিলেও আমরা সেই সর্ব্বশোকনিবারিণী বীনাপাণির চরণে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিমিত্ত সান্ত্বনা ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি।

স্থানীয় শাখাসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের একজন শুভানুধ্যায়ী সদস্যের অভাব হইল। আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে এই পরলোক গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

প্রথম বর্ষ, । পৌষ, ১৩২৯ ৪র্থ সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

-*(*)*-

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। „ প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। ,, অমৃতলাল বসু।
৬। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। ,, রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
১৩। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। ,, কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৫। ,, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
১৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। „ হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম।
১৮। „ কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। ,, যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। „ হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। শ্রীযুক্ত মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। ,, মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। ,, নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ, এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী।
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
২৯। রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৩০। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।
৩১। শ্রীপবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
৩২। কুমার বিজয় লাল খান।

নিয়মাবলী।

১। মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩।৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তণ করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মেদিনীপুর ষ্টেশন

[আর্ট ডেন-মেদিনীপুর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.]
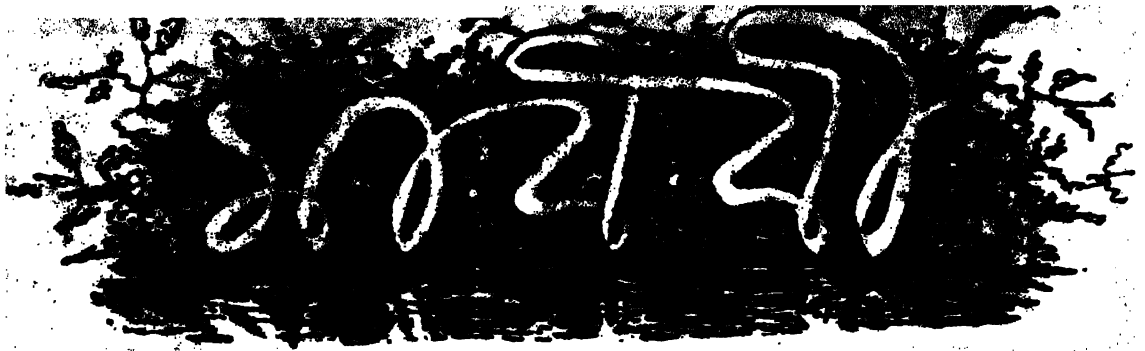
১ম বর্ষ, } পৌষ, ১৩২৯ { ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

বোধন শঙ্খ উঠেছে বাজিয়া মন্দিরতলে আজ,
ছুটেছে ভক্ত পূজার লাগিয়া ফেলিয়া সকল কাজ।
ডাকিছে পূজারী কে কোথায় আছ এস গো অর্ঘ্য নিয়া,
সাজাও মায়েরে নূতন করিয়া যার যাহা কিছু দিয়া।
রিক্ত করিয়া সকল বিত্ত দাওগো চরণে ঢালি;
মুছে ফেল আজি কাঙ্গালিনী মা'র দৈন্যের যত কালি।
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল জননীর জয় রব,
দাও দাও আজি মায়ের পূজায় যার যাহা কিছু সব।
ধনী কেহ দিল কত না রত্ন চরণের তলে আনি,
নারী কেহ দিল খুলি আভরণ কণ্ঠের মালা খানি।
ধন্য ধন্য করিল সকলে দেখিয়া অর্ঘ্য রাশি;
জনতা ঠেলিয়া ভিখারী জনেক দাঁড়াল তথায় আসি।
মলিন বসনে শতেক গ্রন্থি, কঙ্কাল সার দেহ;
বুঝি কোন দিন দুনিয়ার কেহ করেনি তাহারে স্নেহ।
প্রত্যুষে উঠি ক্লান্ত চরণে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি',
তণ্ডুলে তবু ভরেনি আঁচল, আঁধার এসেছে ঘিরি।
সারাদিন পেটে পড়েনি অন্ন, কিছুই নাহিক ঘরে;
শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া তবু সে পুলক অশ্রু ঝরে।
ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা উজাড় করিয়া দিয়া,
কহে [illegible] মোর অর্ঘ্যে পূজারি পূর্ণ হউক হিয়া।
সোণার থালায় সাজায়ে অমনি [illegible] রাখিল আনি,
মুগ্ধ জনতা বলিল চাহিয়া, ধন্যা [illegible]।

অভাব ও আনন্দ।

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্ম্মে আমার
মারবে হিয়ার কাছে?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।

সদাই মনে হয় কত অভাব, কত ব্যথা, কত দৈন্য। আর সেই অভাবের তাড়নায় পৃথিবীময় ছুটে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পালাবার উপায় নেই; দুঃখ দৈন্য পেছনে পেছনে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাড়া করছে। মানুষের জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি চারিদিকে কেবলি অভাব অভিযোগ দেখতে পাই। সেখানে অন্ন বস্ত্রের অভাব, অর্থের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, সুশিক্ষার অভাব, একতার অভাব, কার্য্যকুশলতার অভাব, আরও কত কি অভাব; সেই সব অভাবের সমাধান করতে বড় বড় মণীষিগণ কত রকম উপায় উদ্ভাবন করছেন কিন্তু অভাব ও দুঃখ বেড়েই যাচ্ছে। কমবার কোন লক্ষণই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং অসম্ভব বুঝে অনেক Patriot চোখ বুজে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

ব্যাক্তি বিশেষের জীবনে যে অভাব নিশিদিন তাড়া করছে, দেখছি জাতীয় জীবনেও বর্ণে বর্ণে তা মিলছে; তাই জাতীয় জীবনের অভাব অভিযোগের আলোচনা না করলেও আমার আলোচ্য বিষয় বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। আবার সমষ্টির আলোচনায় প্রবেশ করলে কোথায় অলক্ষ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে এসে পড়ব— তাও আবার নিষেধ।

প্রথমতঃ এ কথা হয় ত কেউ বলতে পারেন— প্রত্যেক জীবনেই কি অভাব ও দৈন্যের তাড়না আছে? আমি মনে [illegible] পারি [illegible] চেয়ে বহু লোক সুখী দেখছি কিন্তু সত্যি সুখী বলতে গেলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে তারাও [illegible]। সকলেরই মনে হয় "কি যেন অভাবই রহিয়াছে"। প্রেমিকা প্রেমিকের অভাব সইতে না পেরে বলছে "হায় আমার শমন হ'ল।" তাদের কিন্তু [illegible] স্থান অধিকার করবার কোন লক্ষণ [illegible] দেখা গেল না। তখন ইচ্ছে করেই মরতে হবে তাই—"মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব।" মরবার পর সখিরা সব কেমন করে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করবে [illegible] সব বিধি ব্যবস্থা শুদ্ধ হয়ে গেল, যথা "নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি"—শুধু তমালের ডালে বেঁধে রাখতে হবে। ডুবিয়ে দিলেও বিপদ, পুড়িয়ে ফেললেও বিপদ, তাই এমন একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত কষ্টে এমন নিদারুণ বিরহ জ্বালায়ও মরা হল না, শ্যাম মথুরা থেকে এলেন—খুব আনন্দের কথা। কিন্তু এমনি মানুষের স্বভাব, এলেন যদি অমনি হয় ত মনে হল—"সখি ভাল করি পেখন না ভেল।" আবার দেখা যদিই বা হ'ল, চলে গেলেই মনে হবে—"নয়ন না তিরপিত ভেল" অথবা "না মিটল পিয়াসা হামারি।" আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভাব। আমার নিজের খাওয়া পরার সংস্থান নেই— কিন্তু "বন্যার মত" সন্তান সন্ততি এসে উপস্থিত হচ্ছে। ছেলেপুলেগুলোকে খেতে দিতে পাচ্ছি না, অসুখ করলে ঔষধ পত্র দিতে পাচ্ছি না, আর আমার চোখের সামনে হয় ত আনন্দনিকেতন শিশুগুলি টপ্ টপ্ পড়ছে—আর মরছে। সমস্ত জীবন অনুতাপে, অনুশোচনায়, দুঃখে, দৈন্যে জর্জ্জরিত হয়ে একটা মাংসপিণ্ডের মত লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়ে রয়েছি। আমার জীর্ণ কুটীরে যখন দিবা রাত্রি এই অভাবের হাহাকার উঠছে, তখন তার পার্শ্বে প্রকাণ্ড ধনী টাকার গাদার উপর বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে সুখে দিনপাত করছে। আমার মনে হচ্ছে তার ত কোন্ অভাবই নেই, সে কত সুখী! কিন্তু সত্যি কি তাই? তাকে জিজ্ঞেস্ করলে হয় ত জানতে পারা যাবে যে ঐ অগাধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার তার কেউ নেই। সেই অভাবে সে মৃয়মান; আনন্দ কোলাহলের লেশ মাত্র নাই। গৃহিণী কত সাধু সন্ন্যাসীর কাছে কত

রকম ঔষধ মন্ত্র চেয়ে নিচ্ছেন, তাগার পরিবর্ত্তে অসংখ্য তাবিজ হাতে তার শোভা পাচ্ছে, কিন্তু অভাব দূর হচ্ছে না। তারপর ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যাটন করে এসে বাবা তারকেশ্বরের কাছে তিন দিন তিন রাত্রি হত্যা দিলেন কিন্তু ফল একই—তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। অসহ্য বোধ করে যদি বা একটা পরের ছেলেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে পুষ্যি করে রাখ্লেন, তাতে কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, স্নেহের ক্ষুধা মিটল না। কিছুদিন পরে সেই পুষ্যি ছেলে দুর্দ্দান্ত দুশ্চরিত্র একটা জানোয়ারে হয় ত পরিণত হল। তখন দুঃখ দৈন্য অভাব আরও বেড়েই গেল।

একের যাতে অভাব, তাতে আবার অপরের হয় ত আনন্দ and vice versa. আমার অবশ্য সঠিক উপলব্ধি নেই, তবে কবি প্রসিদ্ধি এইরূপ যে বসন্তের দখিনা হাওয়া এসে গায়ে লাগ্লেই কবির দল নাচ্তে নাচ্তে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে অজস্র বকে যেতে থাক্বেন; আর তাই সব শ্রেষ্ঠ কবিতার আকারে মাসিক পত্র গুলোতে ও কিছুদিন পরে কেতাবের আকারে বাজারে ছড়িয়ে পড়্বে—পয়সা দিয়ে লোকে কিনুক চাই না কিনুক তখন আনন্দের নাকি একটা স্রোত চারিদিকে বয়ে যায়। সেই আনন্দে পিক পাপিয়া সব গেয়ে ওঠে, তরু গুল্ম লতা সব মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—পৃথিবীময় আকাশে বাতাসে একটা আনন্দের নাকি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু যখন এমনি করে আনন্দ কোলাহলে সবাই উন্মত্ত তখন যদি কবির দলের সর্দ্দার অর্থাৎ কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাদের মাঝখানে বজ্রনির্ঘোষে উদাত্তস্বরে গেয়ে উঠেন:—

"বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী, তার
উদ্দাম তরঙ্গ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ।
সাধের মুকুল কতই পড়্ল ঝরে,
তায় ধূলা হল, ধূলা দিল ভরে।
প্রখর তাপে জর জর
ফল ফলাবার সাধন ধর
হেলা ফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক্ ভঙ্গ।"

তখন কি সেই উদ্দাম আনন্দ কোলাহল থেকে গিয়ে একটা অভাবের ছায়া এসে পড়ে না? তখনি তাঁর একজন শিষ্য সুর মিলিয়ে হয় ত গেয়ে উঠ্বেন:—

"বসন্ত তব বাসর রাতির বিলাস বেশ
খুলে ফেল, ফুল উৎসব আজো হল না শেষ?
আকাশে বাতাসে তোমার মদের জমাট ফেণা
হিসাবে করেছে শত ভুল, শুধু জমেছে দেনা।
ছুটি নাও তুমি ছুটি নাও ওগো চৈত্র নিশা,
পেয়ালা তোমার খালি করে কই মিটিল তৃষা?
পিয়াসী জনের বুক ভরে আজ যে দিবে জল
গগনে পবনে আরতি তাহার, বাজে মাদল।"

তারপর বাদল যদি বা এল, তারই খেয়ালে কত কবি হয় ত উন্মত্ত—"রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে, বরষে"; তখন অমনি কবির প্রাণে প্রেম এসে উঁকি ঝুঁকি মার্ল। তাই কবি বিভোর হয়ে গেয়ে উঠ্লেন—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

আমরা কিন্তু এই গান শুনে তখন বেজায় চটে যাচ্ছি। আমাদের আফিসে যাবার বেলা হল--বৃষ্টি ছাই থামে না, ট্রাম গাড়ী বন্ধ অথবা তার পয়সা নেই, সকাল বেলা বাজার হয়নি, ছেলেপিলেগুলি ক্ষিদের জ্বালায় ছট্ফট্ কচ্ছে—আরও কত কি। আর কবি চারতলা বাড়ীর নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসে গান ধরেছেন "এমন দিনে তারে বলা যায়!" একই সময় বিভিন্ন রুচির ব্যক্তির ভাবের গোলমালে অভাব এসে জোটে আবার একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভাবের অনুভূতি হয়। প্রথম যৌবনের বিরহ প্রেমিক প্রেমিকার অসহ্য বলে বোধ হয়। এ মোহ কেমন করে সকলকে পেয়ে বসে তা

আর বিশেষ করে বলে দিতে হবে না, মনে মনে সবাই বুঝতে পাচ্ছেন, আর অনেকে হয় ত অতীত জীবনের উন্মত্ততার কথা স্মরণ করে মনে মনে হাস্‌ছেন। চিঠি পেতে দু'দিন দেরী হলে তখন হয় ত মনে হত :—

"নাই রে চিঠি নাই!
হৃদয় বিকল, আমি আমায় নিবিয়ে দিতে চাই;
তোমা বিনা ফাগুন সে যে ফুলহারা ফুলবন
তোমার তরে বাড়াই বাহু, না পাই আলিঙ্গন,
বুকের পরে রাখ্‌ছি ফিরে হাত,
করছি করাঘাত;
অশ্রুচোখে চাই,
নাই রে চিঠি নাই!
নাইরে চিঠি নাই!
কেমন করে মরতে যে হয় জানতে আমি চাই;
ঝিমিয়ে সে নেই শুধাতে তুমিও চুপ্‌চাপ্‌,
আমি তোমায় ভালবাসি তবুও এই ভাব!
প্রেম যে তোমার এ চুপচাপের মাঝে,
আমার প্রতি আছে
শুনলে স্বর্গ পাই।
নাই রে চিঠি নাই!
নাইরে চিঠি নাই!
মন থেকে বা গেছি সরে তাই গো ভাবি তাই;
গলার আওয়াজ পাচ্ছি না আর তাই ত আতঙ্ক,
ফোয়ারা কি ফুরিয়ে এলো? লুপ্ত তরঙ্গ?
ভালবাসার চিঠি তৃষ্ণার জল,
ভাঙা মনের বল;
নাই যে ভুল নাই।
নাই রে চিঠি নাই!"

উভয় পক্ষেই এই একই ভাব, কোন পক্ষই যে উদাসীন তা কিন্তু নয়। কিন্তু কিছুদিন চলে যেতেই আমাদের তরফ থেকে একটা পালাই পালাই ভাব মনের মধ্যে দিন রাত কোলাহল করতে থাকে, কিন্তু পালাবার যো নাই, তাই নিরাশা কাতর প্রাণে নিতান্ত ব্যথিত, মথিত, উৎপীড়িত আরও কত কি হয়ে মনে মনে ভাবি,

"শেষ কালেতে মাথার রতন
নেপ্‌টে রইলেন আঠার মতন।"

ব্যক্তিগত ভাবে আরও অনেক রকম অভাবের সঙ্গে আমাদের রোজই হয় ত দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তাদের উদাহরণ আরও দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই নে। জাতীয়জীবনে এমনি কত রকম অভাব আমাদের দিনরাত ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। অবশ্য সেখানে সকলেরই যে একই বিষয়ে একই রকমের অভাবের অনুভূতি হয় তা নয়। সেখানে বরং রুচি ভেদ আরও বেশী। তা যদি না হত তবে দেশের ও দশের চেহারা বদলে যেত, কেন না অভাবগুলো অনেক লাঘব হয়ে আসত। পোড়া দেশের দুর্ভাগ্য এতদিন তা হয় নি, আর কখনও হবে কিনা তাও জানি না। আমারও অতিশয় দুর্ভাগ্য যে এদিককার আলোচনাটা ঠিক মনের মতন করে করা চলবে না—কোনখানটায় আইনের গণ্ডী পেরিয়ে যাই যদি।

সর্ব্ব প্রথমে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দৈন্যের কথাটাই মনে হচ্ছে। যে কোন ভাষার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের তুলনা করতে গেলে নিজেদের অভাব দেখে লজ্জিত হই—ক্ষুব্ধ হই। আমাদের বিজ্ঞান নাই বললেই চলে—অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে যা আছে তাকে আমি বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি না, যেহেতু সব বাঙ্গালীই কিছু সংস্কৃত জানেনা ও বুঝতে পারে না। আর তাও আবার স্থাণুর মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যার ক্রমোন্নতি নেই তাকে মৃত বলায় কোন দোষ হবে না বোধ হয়। আমাদের দেশেও বৈজ্ঞানিক আছেন ও হচ্ছেন কিন্তু তাঁদের দ্বারা সাহিত্যের কোন সমৃদ্ধি হচ্ছে কি? অবশ্য তা না হওয়ার কতগুলি কারণ আছে ও তাঁদের তরফের কতকগুলি কৈফিয়ৎও আছে। কিন্তু সে সব আলোচনার আমার এ প্রবন্ধে কোন প্রয়োজন নেই। শুধু যা দেখতে পাই তাতে এইটুকু বুঝি এদিককার অভাবটা যে রকমের তেমনি আছে, কোন পরিবর্ত্তন নেই।

দর্শনের দিকটাও ঠিক তাই। দার্শনিক প্রবন্ধ মাঝে মাঝে সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই; দুই চারখানা কেতাবও বাজারে বেরিয়েছে। বিশেষ ৺ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রবন্ধগুলি অতি মনোহর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নূতন চিন্তার ধারা ও নূতন মতের সৃষ্টি ত দেখ্‌তে পাই না।

এ বিষয় আমি আর বিশেষ আলোচনা করব না, কারণ পূর্ব্বে একবার ঠিক এই বিষয় নিয়ে অনেক আবোল তাবোল বকেচি—অবশ্য মনের দুঃখে। একথা বল্‌লেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় যে অভাব খুবই এখানটায় আছে ও আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। তবে আশা এই যে অভাব বোধটা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই হয়েছে এবং অভাব মোচনের চেষ্টাও হচ্ছে। একদিন হয় ত সব অভাব দূর হয়ে জগতের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে বাঙ্গলা সাহিত্য আদৃত হবে।

ব্যক্তি বিশেষের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাবের আলোচনা করে যা দেখেছি, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ছবি তার চেয়ে কত ভীষণ কত পীড়াদায়ক তা আর বলে দিতে হবে না। সুশিক্ষার অভাবে দেখ্‌তে পাই আমাদের জাতি ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই নেবে যাচ্ছে। এমনি আরও অনেক রকম অভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় জাতীয় জীবনে হয়; কিন্তু সে সবের আলোচনা হতে বিরত হতে চাই।

মানবের যা জীবনে প্রধান অভাব তার দিকে আমাদের একেবারে লক্ষ্য নাই। কিন্তু অলক্ষ্যে সে এত পীড়া দেয় যে সমস্ত জীবন অশান্তিময় করে একটা গভীর হাহাকার প্রাণের ভিতর থেকে উঠ্‌ছে। শুধু ভাবের অভাবে—চেতনার অভাবে—মনুষ্যত্বের অভাবে সেদিকে আমরা তাকিয়ে দেখি না। যখন জীবনের সন্ধ্যাকালে সে অভাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তার স্বরূপ আমাদের চোখের সাম্‌নে এনে ধরে দেয় তখন প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হতে কি করুণ আর্ত্তনাদ গুমরে উঠে, কি বুক ভাঙা কান্না, অবিরল অশ্রু ধারায় গলে পড়ে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালায় দিবা রাত্রি জ্বালিয়ে দেয়—তা জীবনের প্রভাত সময়ে বুঝ্‌তে পারলে সহ্য করবার মত হত। তা আমাদের হয় না। তাই মনে হয় মৃত্যুতেই শুধু শোক তাপের অবসান।

"দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুকের মত
কেঁদে কেঁদে ওঠে সে নিয়ত;
রোদন উদ্যমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান।
আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেত লোকে জাগাতে করুণা!
এ সংসার অন্ধ কারাগার,
কোন দিকে মিলে না দুয়ার;
ক্ষুণ্ণ প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা।
এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক অবসান.
এ উৎকট রোদনের শেষ
কর, কর, কর পরমেশ!

সত্যিই কি তাই? মৃত্যুই কি একমাত্র শান্তির উপায়? এ হাহাকার, এ দৈন্য, এ দুঃখ, এ শোক তাপ অবসান হওয়ার কি আর কোন উপায় নেই। তা সম্ভব নয়, আরও পথ অবশ্যই আছে। তার প্রধান প্রমান হচ্ছে এই, যে কবি তাঁর ভাষায় যাই বলুন, মানুষ কিন্তু শত দুঃখেও মরতে চায় না। বৃদ্ধা ভিখারিণীও যম রাজের দূত এসে টানাটানি করতে আরম্ভ করলেও নাকি তার জীর্ণ কুটীরখানির দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে থাকে। যত অভাব যত দৈন্যই থাক্ না কেন, আশা মানুষের শেষ হয় না। আর সেই আশার রঙীন্ কুহকে মজে' মৃত্যুকে আপনার বলে আলিঙ্গন করে নেয় না। এই ব্যাপারটা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে একটা বহুকালের ঝগড়া চলে আস্‌ছে। একদল বল্‌ছেন জীবনটায় দুঃখের ভাগই বেশী—এ মতটাকে বলে pessimism. আর একদল বলেন সুখের ভাগটাই বেশী—এটা হচ্ছে

Optimism. এই দুই দলের ঝগড়ার মীমাংসা কর্বার জন্য আমি চেষ্টা কর্‌ছি না। তবে এই দুই দলের মধ্যেও কোথাও একটা মিলনের সূত্র থাক্‌তে পারে। দর্শন শাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান নেই, তাই সাদা চোখে আমাদের মনে হয় শত দুঃখ দৈন্য সত্ত্বেও জীবনটা কেবল দুঃখের বোঝাই নয়। German দার্শনিক Schopenhaur একজন ঘোরতর pessimist ছিলেন। তাঁর মতের আলোচনা করতে গিয়ে Intuition School এর বিখ্যাত দার্শনিক Martineau বলেছেন যে যদি Schopenhaur এর কবরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় "ওহে বন্ধু, পৃথিবীটা ত দুঃখময়, কিন্তু তোমার কবর থেকে উঠে আর কিছুদিন বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হয় কি?" তাহ'লে তিনি হয় ত উত্তরে বল্‌বেন "জীবনটা দুঃখময় তার সন্দেহ নাই, তবে এই মতটা ভাল করে প্রকাশ করতে ও প্রচার করতে আরও কিছুদিন বাঁচ্‌তে চাই। এই যে বাঁচ্‌তে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এ থেকে Martineau বল্‌ছেন যে জীবনটা দুঃখময় নয়। সুখের ভাগটাই বেশী। তা নইলে সবাই বাঁচ্‌তে চায় কেন, মরতে কেউ চায়না কেন?

এই অভাবের কি কোনই সার্থকতা নাই, কোনই প্রয়োজন নাই? সৃষ্টিকর্ত্তা এমন একটা পদার্থ সৃষ্টি করে কি সত্যই শুধু নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়েছেন? ভগবান বুদ্ধদেব বলেছেন "সর্ব্বম্ দুঃখম্।" আবার আজকাল একটু একটু লোকমুখে শুন্‌তে পাচ্ছি তিনি নাকি আমাদের বেদান্তেরই শিষ্য ছিলেন। তবে কি তাঁর "সর্ব্বং দুঃখং" এর সঙ্গে আমাদের "সচ্চিদানন্দের" কোন সম্পর্ক নেই? বোধ হয় আছে। কিন্তু কোথায় তাদের যোগ তা আমি ভাল বুঝি না, বোঝাতেও পারব না। তবে আমার মনে হয় অভাব আছে বলেই আনন্দের উপলব্ধি আছে ও অভাব থেকেই আনন্দের উৎপত্তি। আমি এই টুকুই বল্‌তে প্রয়াস পাচ্ছি কিন্তু সব কথা হয় ত আমার বলা হবে না, কারণ ভাল করে বলবার আমার শক্তির অভাব।

প্রথম বিরহে যে অভাব তাই দিয়ে আমার আলোচনা আরম্ভ করেছি। সুতরাং সেই দিকটাই আগে দেখে নিতে চাই। বিরহই প্রেমের পরিশুদ্ধি এই রকম একটা কবি প্রসিদ্ধি আছে—আর সেটা মোটেই কল্পনা নয়, বাস্তব জগতে সেটা অতি সত্য বলে মনে হয়। বিরহ না থাক্‌লে মিলনানন্দের আস্বাদন হত না, আবার যত বেশী দীর্ঘকাল বিরহ তত মিলনানন্দ সুগভীর। আর সে আনন্দ এমন যে তার বর্ণনা করা চলে না—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।"

তারপর অন্ন বস্ত্রের অভাবে প্রপীড়িত ব্যক্তি যদি কখনও সে অভাব দূরীকরণে সক্ষম হয়, তবে চিরদিন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তির চেয়ে তার তখনকার আনন্দ কি শতগুণে বেশী নয়?

পুত্রহীন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির যদি তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে পুত্রের অভাব দূর হয় তবে তার যে আনন্দ তেমন আনন্দ কি বহু পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত নিরন্ন ব্যক্তির কপালে কখনো জোটে? অভাব বড় বেশী বলেই আনন্দ এত গভীর ও আনন্দ কোলাহল সেখানে তত দীর্ঘকাল-ব্যাপী। অভাব যদি না থাক্‌ত এবং অভাব বোধ যদি না হত তবে আনন্দও সেখানে অসম্ভব হত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে যে আনন্দ তারও সম্ভাবনা কিছুই থাক্‌ত না যদি অভাব বোধ না থাক্‌ত। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবনের যে মাধুর্য্য তা একবারে আনন্দদায়ক বলে বোধ হত না, যদি অমানিশার ঘোর অন্ধকারে দুঃখ ভোগ না হোত। রোজ কেন পূর্ণিমার রাত্রি হয় না, এটা সৃষ্টিকর্ত্তার একটা মস্ত বড় অপরাধ বলে কোন কোন দার্শনিক কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। Scotch দার্শনিক Martineau তার জবাব দিয়েছেন যে আমি বরং অন্ধকার রাত্রিতে লণ্ঠন হাতে করে বেড়াব, তবুও আমি চন্দ্রের প্রতিদিনের পরিবর্ত্তনের সৌন্দর্য্য ভোগ করতে চাই।

প্রখর রৌদ্রতাপে যখন চারিদিক পুড়ে ছারখার হ'তে যায়, তখনই বসন্তসমাগমে প্রকৃতি নেচে উঠে, বিহঙ্গকুল গেয়ে উঠে, আর কবির দল তাই দেখে বিভোর হয়ে সে সৌন্দর্য্যসুধা আকণ্ঠ পান করে। বারমাস প্রতিদিন যদি এমনি কোকিল ডাক্‌ত, ফুল ফুট্‌ত আর কি

কি সব হোত না হলে বোধ হয় কাব্য কোন সাহিত্যেই থাকত না—কারণ কবির কল্পনা, তন্ময়তা, পুলক সবই লোপ পেয়ে যেত। আবার এর পরেই যখন "শ্রাবণের ধারা" এসে হাজির হল তখন তারই কি সৌন্দর্য্য—কি আনন্দ! কিন্তু কেবলই যদি শ্রাবণের ধারা ঝরে প'ড়ত তা হলে আনন্দ হওয়া দূরের কথা নিরানন্দে অস্থির হয়ে উঠতে হত। এমন কি শ্রাবণের ধারা যদি চারটি দিন অনবরতঃ অনুগ্রহ করতে থাকেন তবেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়ে উঠে। অভাব ছিল বলেই পরিবর্ত্তনে আনন্দ, নতুবা আনন্দ অসম্ভব।

মুটে মজুরের বেহদ্দ পরিশ্রম করে আমাদের পরিবার প্রতিপালন করতে হয় বলে বিশ্রাম আমরা চাই। রবিবার এলেই একটা মনে আনন্দ—আবার পুজোর ছুটি হলে আরও আনন্দ কারণ বিশ্রাম কিছু দীর্ঘকালব্যাপী। বিশ্রামের বড় অভাব ছিল তাই এত আনন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের গাদায় দিন রাত বসে আছে, তার কিন্তু বিশ্রামে কোন আনন্দ নাই, যেহেতু শ্রম তাহার একেবারেই নাই। কিছুকাল পরে যখন আলস্য জনিত ব্যাধি ও অবসাদ এসে চেপে ধরে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বাত রোগ ইত্যাদি এসে দেখা দেয় তখন ব্যায়ামের অভাব বোধ হয় ও কোন রকম তার সুবিধা হলে, অবসাদ দূর করতে পারলে তার আনন্দ হয়। এক কথায় বলতে গেলে Change is rest অর্থাৎ পরিবর্ত্তনেই বিশ্রাম ও সেই বিশ্রাম অর্থই আনন্দ। অভাব যদি না থাকত আর অভাব বোধ যদি না হ'ত তবে অভাব মোচনের আনন্দ সম্ভব হোত না এবং পৃথিবীর অধিকাংশ আনন্দ হতে আমরা একেবারেই বঞ্চিত হতাম।

অভাব হতেই আনন্দের উৎপত্তি কেমন করে হয়, সেইটি দেখে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ব্যক্তিগত ভাবে যা সত্যি—জাতীয়জীবনে তা খাটবে। তাই অভাব আছে বলেই আনন্দ সম্ভব। এটি ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করেছি—এবং বর্ত্তমান বিষয় জাতীয়জীবনের দুই একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করতে চাই।

সাহিত্যের অভাব সম্পর্কে কতগুলি কথা বলেছি কিন্তু সেখানে এ কথাও স্বীকার করতে হয়েছে যে, সে অভাব মোচনের একটা চেষ্টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা প্রাণের সাড়া, একটা আবেগ, একটা আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে; এবং অভাব মোচন ঠিক না হলেও এ জাগরণ, এ উদ্যম দেখেই মনে একটা তৃপ্তি একটা আনন্দ কিন্তু উথলে উঠছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে বাঙ্গলা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে ও বাজে বইতে দেশটাকে ছেয়ে দিয়েছে। এই rubbish গুলো উঠে গেলে অথবা ছাপা বন্ধ হলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়। তাঁদের কথা মত আবর্জ্জনা খুব বেশী বেড়েছে এ কথা স্বীকার করলেও এটা মানতেই হবে যে দেশে এদিককার অভাব বোধ মানুষের মধ্যে হয়েছে। অভাব মোচনের চেষ্টাও হচ্ছে—অবশ্য লেখকের ক্ষমতানুসারে। এ সাধু চেষ্টাকে চেপে না দিয়ে বরং উৎসাহিত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তা হলেই হয় ত একদিন দেখব যে আমাদের এই নবীন সাহিত্য সাহিত্যজগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। আমাদের দেশে চিন্তার অভাব নাই, কল্পনার অভাব নাই, বুদ্ধির অভাব নাই, অভাব শুধু উৎসাহ, উদ্যম, নিষ্ঠা ও চেষ্টার। সে চেষ্টা যদি জেগেছে তাকে জাগিয়েই রাখতে হবে, তা হলে অভাব দূর হয়ে এদিককার পূর্ণানন্দের আস্বাদ আমরা পাব।

অন্ন বস্ত্রের অভাবও দেশে আছে, কিন্তু সে অভাব মোচনে, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তা দেখেছেন ত? আর সে আনন্দ, দাতা গ্রহীতা দুই জনেই উপভোগ করে। আজ উত্তরবঙ্গ প্লাবনে যে হাহাকার উঠেছে তা আকাশে বাতাসে ছেয়ে গেছে, সে কান্নার সুর বহু দূর দেশে মানুষের হৃদয় তন্ত্রীতে গিয়ে বেজেছে। সে আর্ত্তনাদে দেশবাসী মুহ্যমান। কিন্তু এই হাহাকারের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নেতৃত্বে সেবকগণের আর্ত্ত সেবায় কি আনন্দ, কি আবেগ, কি উন্মাদনা! আর সেই আর্ত্তদের মাঝখানে যখন এঁদের মঙ্গল হস্তের সেবা গিয়ে পৌছায় তখন দেবতার আশীর্ব্বাদের

মত তাতে তাদের সমস্ত শোক তাপ মুছে গিয়ে স্নিগ্ধ করে দেয়। সে সেবায় পরিপূর্ণ সুখ—গভীর দুঃখ মোচনের এ আনন্দ এমনি অবস্থা না হলে বুঝি ফুটে উঠত না। অনাবিল স্নেহ ধারায় সিঞ্চিত হয়ে আর্ত্তগণের আনন্দ ও কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত কর্ম্মী সেবকগণের দুঃখ মোচনের আনন্দের সঙ্গে প্রবল দেশাত্মবোধের এই স্বরূপ দেখে দেশবাসীর প্রাণের আনন্দ মিলে গিয়ে যে ত্রিধারার মিলন হয়েছে তাতে যেন এক পবিত্র প্রয়াগ তীর্থের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি যা বল্‌তে চাচ্ছি তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে মানুষের অধ্যাত্মজীবনে। সেখানেই স্পষ্ট ভাবে অভাব ও আনন্দ, দৈন্য ও শান্তি, জ্বালা ও নির্ব্বানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। Saint Francis নিজের বুকে একটা Cross ধারণ করতেন এবং Franciscan School এর সবাই চিরদিন এইরূপ Cross ধারণ করে আস্‌ছেন। আমরা হয় ত মনে কর্‌তে পারি খৃষ্টের আত্মত্যাগের কথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখ্‌বার জন্যই শুধু এ আয়োজন অর্থাৎ এটা পৌত্তলিকতার একটা রূপান্তর মাত্র। মনীষিগণ বলেন এটার অর্থ নাকি তা নয়—আরও গভীরতর কিছু। মানুষকে যদি ধর্ম্মের পথে উঠ্‌তে হয়, পরমানন্দের পথে যেতে হয়, প্রকৃত শান্তির অন্বেষণ করতে হয় তবে দুঃখ, ক্লেশ, যাতনাকে বরণ করে নিতে হবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সুখ তাকে বলি দিতে হবে; তা একেবারে লুপ্ত করে না দিতে পার্‌লে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। দেহাত্মিকা মতি, অহং জ্ঞানকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে হবে। কিন্তু তা দিতে গেলে দেহের সব আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত পীড়া দেয়, কিন্তু তাকে জোর করে চেপে দিতে হবে। আর যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্ষুধা অত্যন্ত পীড়া দিতে থাক্‌বে, তাতে বিচলিত হলে চল্‌বে না। একটু স্খলিত হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা ও অভাব মেটাতে তৎপর হলে অধ্যাত্ম জীবনের অবনতিই হতে থাক্‌বে। আর দৈহিক দুঃখ দৈন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বরণ করে নিতে পার্‌লে মুক্তির আনন্দ সম্ভবপর হবে। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট তাই জগতকে শিখিয়ে গেছেন। সেই কথা অহর্নিশ স্মরণ রাখ্‌বার জন্য St. Francis এর এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ভাবটি অতি মধুর ও অতি সত্য।

বৈষ্ণব কবিদের একটা চলিত কথা আছে—

'যে করে তোমার আশ
তুমি কর তার সর্ব্বনাশ'

তবে তুমি কেমন দয়াল ? যে তোমার আশা করে, তার সর্ব্বনাশ করে তুমি তৃপ্ত হও। এমন একটা প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ওখানে ঠিক ভগবানের মঙ্গল হস্তের স্নেহ স্পর্শের একটা অনুভূতি হয়—যদি তেমন করে ভেবে দেখা যায়। আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের লালসায় দিবা রাত্রি ঘুরে মরি, তৃপ্তি কিন্তু তাতে হয় না, হওয়া সম্ভব নয়, ক্রমে বাড়্‌তেই থাকে। নানারূপ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধের মত জীবনের পথ বেয়ে চলি। আর যখন একটী একটী করে সেই মোহ ভাঙ্‌তে থাকে, তখন শোকে দুঃখে অবসন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু সেই মোহের আবরণ এমনি দুর্ভেদ্য যে সমস্ত জীবন শিক্ষায়ও সে আবরণ উন্মোচন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর জীবনের সন্ধ্যাকালে যখন দেখি যে পথের সম্বল কিছুই সংগ্রহ করি নাই, তখন কি ব্যাকুলতা, কি গভীর আর্ত্তনাদ হৃদয়ের অন্তস্তল হতে প্রতিনিয়ত হাহাকার করে উঠে। কিন্তু তখন উপায় নাই, পথ নাই, সময় নাই। যে ভক্ত তার এমন দুর্দ্দশা সম্ভব হয় না, বিধাতা নিজ হস্তে তার সব মোহের আবরণ খসিয়ে দিয়ে তাঁকে নিজের কোলে টেনে নেন এবং দিবস শেষে তাঁকে পরিপূর্ণ আনন্দের অধিকারী করেন। তাই ইহ জগতের যা সব বাঞ্ছিত, যা প্রেয়, যা শ্রেয় তার সব নাশ করেন। কারণ সেগুলি সবই মোহ—তাতে করে প্রকৃত শান্তি, নিছক আনন্দ হতে পারে না বরং ক্রমে পথহারা হয়ে সমস্ত জীবন ঘুরেও শান্তির আস্বাদ সম্ভবপর হয় না। ভক্তজন দেবতার আশা করে বলেই এমন করে তার চোখ ফুটিয়ে তিনি দেন। মোহ তার ঘুচে যায়, অহং তার ডুবে যায়, লালসা তার ধ্বংস হয়। পরে সমস্ত

দুঃখ দৈন্য, জ্বালা অভিশাপ ডুবে গিয়ে অন্তিমে সেই সাচ্চদানন্দের অভয় ক্রোড়ে স্থান পায়। ঠিক একই সুরে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :—

"আঘাত করে নিলে জিনে
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়্‌লে না যে
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে।"

যদি সব বিকিয়ে এমনি করে কিনে নেও তুমি দেব! তবে সুখের বাধা ভেঙে দেওয়ায় দুঃখ নেই। এমন করে যে গাইতে জানে, প্রাণের সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌তে জানে তাকে বুঝি সত্যি তিনি কিনে নেন। আর তখন সব দুঃখের অবসান হয়ে পূর্ণ শান্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দুঃখের মধ্যে উপায়বিহীন হয়ে শেষকালে যে বলা তা ভক্তের মত বলা হয় না, সে স্বার্থপরের মত বলা। যেন এদিকে কিছু সুবিধা হল না বলে আঁকড়ে ধরা সেই দিকটাকে। ভক্ত কবি তাই আবার গেয়েছেন :—

সুখে আমায় রাখ্‌বে কেন,
রাখ তোমার কোলে ;
যাক্ না গো সুখ জ্বলে।
যাক্ না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধর্‌বে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ
বাহু দোলার দোলে।
যেখানে ঘর বাঁধ্‌ব আমি
আসে আসুক বান
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় ত আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি
ধর্‌ব যে তাই হলে।

এমন করে সুখকে জ্বালিয়ে দিয়ে, দুঃখকে যে বরণ করে নিতে পারে, তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ; আনন্দ-ধামের পথ তার কাছে সদা উন্মুক্ত।

অহং যদি বাস্তবিকই বলি দিতে পারা যায়, প্রকৃত আনন্দের যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, শান্তির যদি ভরসা থাকে, মুক্তির যদি আগ্রহ থাকে, তবে প্রাণ খুলে নিশিদিন বল্‌তে হয় এস দুঃখ, এস দৈন্য, এস জ্বালা, এস শোক, এস দহন! তাহ'লে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কবির সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌তে পার্‌ব :—

"দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।
মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।
বহুদিন বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কি আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিয়াষা।
এতদিনে জান্‌লেম
যে কাঁদন কাঁদলেম্‌
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।"

শ্রীমন্মথ নাথ দাশ গুপ্ত।

উপন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহবৎরাম ও নহবৎরাম দুইটীই প্রকাণ্ড রকমের জুয়াড়ী। একজন যখন তেজী খেলে আর একজন তখন মন্দী খেলে। মোটের উপর কারুর না কারুর লাভ থাকে। যার লোকসান যত হয় সে সেই লোকসানটা শোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে। একবার জানাজানি হইয়া যাওয়াতে দুই ভায়ের এক ভাই এক সহরে তেজী খেলিত আর এক ভাই সেই শেয়ারেই অপর এক সহরে মন্দী খেলিত। এক্ষণে দুই ভাইয়ের অসুখ বলিয়া কলিকাতায় আছে। বহুদিন পরে সোমনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় দুই ভাই সোমনাথের দুই হাত ধরিয়া সুখ দুঃখের কত অতীত কাহিনী বলিতে বলিতে লালদীঘির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(২)

হরিনাথ ও সোমনাথ দুই জন বৈমাত্র ভাই। সোমনাথের পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার পর হরিনাথ পিতার সহিত ঝগড়া করিয়া যোল বৎসর বয়সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। হরিনাথ সামান্য একটা পাটের আড়তে প্রথমে মুহুরীর কাজ সুরু করে। পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমশঃ আড়ৎদার, বেলার, এক্ষণে একজন সহরতলীর মধ্যে পাটের প্রধান সওদাগর হইয়া উঠিয়াছে। হরিনাথ বেশী লেখাপড়া শিখে নাই; কিন্তু বিষয়কর্ম্ম বুঝিতে তার মত দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া যুরোপীয় সওদাগরগণ তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। হরিনাথ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ইষ্ট-বৃটিশ কোম্পানীর ডিরেক্টার যুরোপীয় সওদাগর সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পাটের বিষয় তাহার কাছে এত খবর আসিত যে ইংরেজই হউক আর মাড়োয়ারীই হউক, সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহার নিকট খবর লইবার জন্য আসা যাওয়া করিত। কোম্পানীর কাগজের বাজারের প্রধান দালাল দেবজ বাবু তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া সর্ব্বদা চটের খবর লইতেন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ফলে হরিনাথের পিতার দ্বিতীয় পুত্র সোমনাথ জন্মগ্রহণ করে। সোমনাথকে তাহার পিতা ভালরূপ লেখাপড়া করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সোমনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্পদিন পরেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। সোমনাথের পিতার কিছু কোম্পানীর কাগজ ও দেশের কিছু বিষয় ছিল। সোমনাথ সেইগুলি সমস্ত বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। প্রথমে দাদার কাছে একটা চাকুরী জোগাড় করিবার উমেদারী করে — কিন্তু দাদা কোন আমল না দেওয়ায় নিজের যা নগদ টাকা ছিল তাই হাতে লইয়া কোম্পানীর কাগজের বাজারে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে যুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধার দরুন জুট-শেয়ারের বাজার সমস্ত আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সোমনাথ জুয়া খেলিয়া দশ লাখ টাকার মালিক হইয়া উঠিয়াছিল। সোমনাথ জুয়া খেলিবার প্রথম আমলে দাদার কাছে কয়েক বার চটের খবর জানিতে গিয়াছিল। দাদা তাহাকে কোন বিষয় সাহায্য করা দূরে থাকুক তাহাকে কখনই আমল দিতনা। পরে সোমনাথকে দশ লাখ টাকার মালিক হইতে দেখিয়া হরিনাথ গাড়ীতে যাইবার সময় সোমনাথকে দেখিতে পাইয়া তাহার মটর থামাইয়া তাহাকে সাবধানে চলিবার উপদেশ দিয়াছিল ও হরিনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে বলিয়াছিল। সোমনাথ তখন বড় গরমে ছিল; সে আর সে কথায় বড় কাণ দেয় নাই। সোমনাথ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। টাকা হইতেই চৌরঙ্গীতে এক খানি প্রাসাদ ভাড়া লইয়াছিল ও বিলাসের যা কিছু হইতে পারে তাহা সমস্তই জোগাড় করিয়াছিল।

মনে করিয়াছিল, হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, নাচের ফোয়ারার মধ্য দিয়াই বুঝি এমনি করিয়া জীবনটা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু মানুষ এক চায় পায় আর। কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, সে কয়লার কয়েকটা খনি কিনিয়াছিল—বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিল। সোমনাথ শেয়ারের কাজটা যেমন বুঝিয়াছিল তেমনটা আবার কয়লার কাজ বুঝিতে পারে নাই। পরের উপর বিশ্বাস করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল—দেউলিয়া নাম লেখাইবার মত হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রভাতের চেষ্টায় সেটা আর হইল না। তবে যে ফকির সেই ফকির রহিয়া গেল। প্রভাত সোমনাথের সহপাঠি ছিল। প্রভাতের সহিত সোমনাথের পাঠ্যাবস্থা হইতেই খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রভাতের পিতা একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। প্রভাতের পিতার সহিত হরিনাথেরও খুব আলাপ ছিল। প্রভাত হরিনাথেরও বাড়ী মাঝে মাঝে যাইত। সোমনাথের এইরকম দুর্দ্দশা হইবার পর প্রভাতকে ডাকিয়া হরিনাথ বলিল—সোমাটা কি করতে চায়? চাকরী চায় ত আমি একটা যা হোক করে দিতে পারি। প্রভাত ত হরিনাথের আগেকার ব্যবহার জানিত। এই কথা শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে ছুটিয়া গিয়া সোমনাথের সহিত দেখা করিল। পরে আবার হরিনাথের সহিত কথাবার্ত্তা হয়। সে সমস্ত বিষয় পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সোমনাথের টাকা রোজগার করিবার অপেক্ষা বিলাসলালসা প্রবল ছিল। কাজেই দাদার কথা তার ভাল লাগিবে কেন? সহবৎরাম নহবৎ রামের সহিত তেড়ীনন্দী খেলা করিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া নিরাশ হইয়া সোমনাথ বাসায় ফিরিল। ভগবান তুমিই অসহায়ের সহায় এই ভাবিতে লাগিল। সোমনাথের বাসা বাগবাজারে। সেখানে রাজা অরবিন্দ নামে এক ধনী বাস করিতেন। অনেক রকম অন্যায় উপায়ে বহু টাকার সংস্থান করিয়াছিলেন সেইজন্য বড় অনুতাপ হইয়াছিল। চল্লিশবৎসর বয়সে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার জীবন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে বড়ই অনুতপ্ত করিয়াছিল। তিনি এজন্য সৎকার্য্যের জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করিবেন সংকল্প করিয়া এক উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। উইলের মর্ম্ম মতে একটী কৃষ্ণরাধিকার যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিবার ও দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড অতিথিশালা নির্ম্মান করিবার বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী ঐ উইলের একমাত্র এক্‌জিকিউট্রিক্স নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর প্রাসাদের উঠানে দেবমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল ও প্রাসাদের বৈঠকখানা বাটী অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। রাণী দেবসেবায় ও অতিথিসৎকারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রাসাদের দুইদিকে রাস্তা—একদিকে বড় রাস্তা, সেইদিকে প্রধান ফটক। এই ফটক চুকিয়া অতিথিশালার বাটী পার হইয়াই অন্দরমহলের সম্মুখ দেবালয়। প্রাসাদের অপর দিকে গলিরাস্তা; সে রাস্তাতেও গাড়ী যায়। সেই গলিরাস্তার উপর প্রাসাদের সংলগ্ন বাটী রাজা বর্ত্তমানে কাছারীবাটীর মত ব্যবহার হইত। কাছারী বাড়ীটী দোতালা, উপর তালায় দুই খানি এবং নীচের তালায় তিনখানি ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্লোরের উপর বাইরে পয়েণ্টিং করা। ঘরগুলি বেশ বড় বড়। এই বাড়ীখানি একটী ব্রাহ্মপরিবার ভাড়া লইয়া সোমনাথকে উপরের দুই খানি ঘর কোর্ফা বিলি করিয়াছিলেন। উপরের তালায় সোমনাথ থাকে। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটীর নাম হেমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তিনি নীচের ঘরগুলিতে থাকেন। সোমনাথ বাসায় ফিরিয়া ইজি চেয়ারে পড়িয়া নিরাশা সাগরে ভাসিতেছিল; নিরাশার মাঝে সহসা আশার জ্যোতি দেখা দিল—রাণীমার দেবমন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ দেবদর্শনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। মানুষ বিপদে পড়িলেই ভগবানকে ডাকিয়া থাকে। যতক্ষণ কিছুমাত্র আশা থাকে ততক্ষণ কিছুতেই ভগবানকে ডাকেনা। আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া দিন ফুরাইয়া গেলেই ভগবানকে মনে পড়ে। কাছারীবাটীর ভিতর দিয়া রাজবাটীতে যাইবার একটী দরজা ছিল। কাছারীবাটী ভাড়া হইয়া গেলেও সে দরজা বন্ধ করা হয় নাই। সোমনাথ সেই দরজা দিয়াই দেবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

সোমনাথ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অপরূপ লাবণ্যময়ী একটী রমণীকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল ইনি দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী। সোমনাথ ভাবিত রাণী একজন বর্ষীয়সী মহিলা হইবেন ; কিন্তু আজ দেখিয়া বোধ হইল রাণীর বয়স পঁচিশের বেশী হইবে না। রাণী স্বহস্তে দেবমন্দিরের সব কাজ করিয়া থাকেন। পূজা ও আরতির সময় নিজে দাঁড়াইয়া সব জিনিষ পত্র পুরোহিতকে আগাইয়া দেন। সোমনাথ আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিল। হিন্দু দেবমন্দির এত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সোমনাথ আর কখন দেখে নাই। মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা এরকম দেবসেবা করিয়া জীবন কাটাইয়া দিলে হয় না, এ কথাটা যেন বড় করিয়া তাহার মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। এক রকমে রাতটা কাটাইয়া দিয়া সকাল বেলা আবার সোমনাথ দেব মন্দিরে উপস্থিত হইল। ঝাড়ুদার দেবমন্দিরের চারিদিকে ঝাঁটা দিতেছিল। সোমনাথ ঝাড়ুদারকে চারিদিকের ময়লা দেখাইয়া দিয়া ঝাড়ু দেওয়া কাজের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল এমন সময় রাণী সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে ?"

"আমি দেবসেবায় জীবন কাটাব বলে আপনার দেবমন্দিরের চাকরীর উমেদার হোয়ে এসেছি।"

রাণী তখন তাকে মাইনের চাকরীপ্রার্থী মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কত মাইনে চাও ?"

"না। আমি মাইনে চাই না। শুধু কাজ চাই।"

"বেশ কথা। আমি নিজে বাইরের কাজ সব দেখতে পারিনে বলে সেগুলি মনের মত হয় না। তা তুমি যদি নিজের মত করে বাইরের কাজগুলি করতে পার তা হলে এখানে থাকতে পার।"

"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

সোমনাথ অতিথিশালার কাজ হাতে লইল। নিজে বাজার করা, রান্নার দেখাশুনা করা—পরিবেশন করা—সমস্ত কাজ করিতে লাগিল। রাণীর বাজার সরকারগণ বাজার করিতে যাইয়া অনেক পয়সা চুরি করিত। ভাল জিনিষ আসিত না—অথচ অনেক টাকা খরচ পড়িত। সোমনাথ নিজহাতে বাজার করিতে থাকার পর কম খরচে অনেক ভাল বাজার আসিতে লাগিল। পরিবেশনে বহু আহার্য্য নষ্ট হইত। শেষে যাহারা খাইতে বসিত তাহারা সব জিনিষ পাইত না ; অতিথি সেবার শৃঙ্খলা ছিল না। সোমনাথ নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া এমনটী বন্দোবস্ত করিল যে সকল অতিথিই তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরিতোষ হইয়া যাইত। সোমনাথ বেঁটে খাট বড় চট্‌পটে—রংটী ফর্সা ; মুখখানি স্ত্রীলোকের মত—তার উপর আবার পরিস্কার করিয়া গোঁফ দাড়ি কামান। সকলেই সোমনাথকে ভালবাসিতে লাগিল।

একদিন রাণী সোমনাথকে দেখিতে পাইয়া বলিল—তোমার কাজে বড় খুস হোয়েছি—তুমি আমার দেব-সেবায় যে সাহায্য করচ এজন্য আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

সোমনাথ। আমি এ আমার কর্ত্তব্য মনে কোরেই করচি ; যা দরকার হবে অনুমতি করবেন—তা সব করব।

ক্রমশঃ রাণী দেবসেবার সমস্ত কার্য্য সোমনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে লাগিলেন। রাজার উইলে যে সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবার, যেরূপ খরচের ব্যবস্থা ছিল—সোমনাথের তত্ত্বাবধারণে সেই খরচেই তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্রিয়াকর্ম্ম জাঁকজমকের সহিত চলিতে লাগিল। বৎসরে প্রায় পাঁচ ছয় বার বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব হইত এবং মাসে একবার করিয়া সমারোহের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গান হইত। সোম-নাথের বন্দোবস্তে মাসে দুই বার করিয়া মহোৎসব হইতে লাগিল—এবং প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গান হইতে লাগিল। দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান আখ্‌ড়া স্থাপিত হইল। মন্দিরে বহু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সমাগম হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ গায়ক হরিদাসের কীর্ত্তন গানে প্রাসাদ আনন্দময় হইতে লাগিল। সোমনাথ ভাবিত, যে

সেদিন এমন মনে হত যে ধনকুবের না হোতে পাল্লে আর শান্তি নাই, আজ কি না এই নিঃস্বার্থ দেবকার্য্যে শান্তিময় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। রাণী সকল লোকের নিকট সোমনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সোমনাথ তাঁহাকে যাহা করিতে উপদেশ দিত রাণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা করিবার ব্যবস্থা করিতেন। একদিন প্রাসাদে এক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কন্ঠি বদল হইল। এই ঘটনা লইয়া রাণীর সহিত সোমনাথের অনেক আলাপ হইয়াছিল।

। এ বিবাহ কি শাস্ত্রসঙ্গত ?

সোম। হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত না হোলেও বৈষ্ণবশাস্ত্র সঙ্গত বটে। আর বিবাহই বা কি ? দুইটি প্রাণীর মন-মিলন মাত্র। যদি যথার্থ মনোমিলন হয় তা হোলে বিবাহ যেরূপ নিয়মেই সম্পন্ন হোক না কেন সমাজের তাহা মানিয়া লওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে ত আট প্রকার বিবাহের প্রথা আছে। কাজেই এতে আর দোষ কি ?

রাণী। আমারও ঐরূপ মনে হয়। দুইটী একপ্রাণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোতে চায়, তাতে সমাজের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

সোম। দেখুন আমি একটা কথা আপনাকে অনেকদিন বল্‌ব বল্‌ব মনে করেছিলাম—তা বল্‌তে সাহস হয়নি—আজ আপনাকে নির্জ্জনে পেয়েছি, আপনি যদি আমাকে অভয় দেন ত আপনাকে বল্‌তে পারি।

রাণীর লাল মুখখানি আরও লাল হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

সোমনাথ মৌনকে সম্মতি লক্ষণ স্থির করিয়া বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি যুবতী আমি যুবক—আমাদের রক্ত মাংসের শরীর—আমাদের কখন কি দুর্ব্বলতা আস্‌বে তা ত কেউ বল্‌তে পারে না। মানুষ পাগল হলে লজ্জা আর ভবিষ্যৎ কিছুই মনে রাখে না। হয়ত আপনি দুর্ব্বলতা সংযত করতে পারবেন—হয়ত আমি তা পার্‌ব না। এরই মধ্যে চাকর চাকরাণীদের ভেতর অনেক কানাঘুষা হোচ্ছে।

রাণী। হাঁ আমিও তাই শুনেছি। তা বলে কি আমি ভাল কাজ করা ছেড়ে দেব। যাদের পাপচিত্ত তারা সর্ব্বত্রই পাপের ছাপ দেখে বেড়াবে—তাতে ত আর সাঁচ্চা জিনিষে কলঙ্ক তুল্‌তে পার্‌বে না।

সোম। সোনায় কলঙ্ক না উঠলেও—কলঙ্ক রটাতে রটাতে সোনাতে রাং বেরিয়ে পড়তে পারে।

রাণী। তা বলে কত্তে হবে কি ?

সোম। কত্তে হবে কি ? আজ দুইটী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যা করল তাই করলে খাঁটি সোনায় কখন রাং বেরুবে না—জন্মের মত কলঙ্ক ঘুচে যাবে।

রাণী। না—কখনই না। আমি হিন্দু রাজরাণী। এ কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হোল না—যখন তুমি এ কথা মুখে আন্‌তে পেরেছ তখন আর তোমার এখানে থাকা হবে না। আমার কার্য্য গোল্লায় যায় সেও ভাল তবু তোমার মত লোক এ সংসারে থাকা উচিত নয়। তবে জেনো সোমনাথ—আমি তোমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ করতাম—তোমার কাজ কর্‌বার ক্ষমতা যে আছে তা কখন ভুলব না। তোমার গুণ অনেক ছিল, কিন্তু এক দোষে সব গুণ ঢাকা পড়ে যাবে—যাও তুমি, যদি কখন বিপদে পড়—এস—আমি তোমাকে তোমার বিপদে সাহায্য করতে কখন ত্রুটি করব না। যাও দেরী কর না।

রাণীর চণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া সোমনাথ আর কথা কহিতে পারিল না। সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দেব মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

প্রতীক্ষা।

আলোকি মানসকুঞ্জ হৃদয় নন্দনে
ফুটেছিল যে মন্দার অনিন্দ্য প্রতিমা,
বিকাশি বিমল বিভা বিচিত্র বরণে,
বিতরি সে সুধাগন্ধ ফুল্ল মধুরিমা—
ঝরে গেছে আজি সেই রতন দুর্ল্লভ,
ঘন ম্লান কুঞ্জে হায়! শ্রীহীন যে সবি;
নাহিক কুসুম এবে রয়েছে সৌরভ
স্মৃতিপটে জাগে শুধু ছায়ালোক ছবি।
ভীম হাহাকারে পূর্ণ হৃদয় শ্মশান,
ধিকি ধিকি চিন্তা চুল্লী জ্বলে অহরহ;
পলাইতে চাই নাই পথের সন্ধান,
সহিতে নারি যে আর অশান্তি অসহ।
শ্রান্ত, ক্লান্ত, তটে বসি ভাবিতেছি একা,
দূর পরপারে তা'র পাব কবে দেখা!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পর্য্যটকের পত্র।

সওকারপেট্, মাদ্রাজ।
মে, ১৯২১।

বড়দি',

মাদ্রাজে এসে ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে দু'খানা পত্র লিখেছি; কিন্তু তাদের কলেবর ক্ষুদ্র দেখে তুমি নিতান্ত দুঃখিত হয়েছ। আমি জানতুম না যে দেশ-বিদেশের কাহিনী তুমি এত ভালবাস; কারণ চিরকালই তোমার ইংরাজী বাঙ্গলা উপন্যাসের উপর প্রবল অনুরাগ দেখে আস্‌ছি। তার উপর তোমাকে এ দেশের বিস্তৃত বিবরণ লিখিনি কতকটা আলস্য বশতঃ, আর বাকীটা, এর প্রত্যেকটি বিষয়ের নিখুঁত সজীব বর্ণনা দেওয়া আমার লেখনীর সাধ্যায়ত্ত কিনা—এই সংশয়ের বশে। যা হোক্ তুমি যখন এ দেশের ইতিহাস, প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য—সকল বিষয়ের কথা বিস্তৃত ভাবে পত্রের মধ্য দিয়ে জান্‌তে চেয়েছ, তখন বাধ্য হ'য়ে সাধ্যমত তা' আমাকে যোগাতেই হবে।

আজ কিন্তু আমি গণেশ ঠাকুরের কলম চালালুম,—

এবার তোমার চিঠি পড়ার কতখানি ধৈর্য্য তার কঠিন পরীক্ষা হবে। মাদ্রাজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির স্থূল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্ব পত্র দু'খানাতে দিয়েছি; তার বিশেষ বিবরণ সাক্ষাৎমত নিবেদন করব। মহাশয়স্থল! তুমি যে Julius Caeser য়ের সারগর্ভ বাণী "Vini Vidi Vici" য়ের মত বর্ণনায় সন্তুষ্ট নও, তাহ'লে ত তোমায় খান্ তিনেক পোষ্ট কার্ডেই আমার দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করতুম; তুমিও পাঠোদ্ধার ও পাতা উল্টানর হাত হ'তে বাঁচ্‌তে—আমিও কলম চালানর কষ্ট থেকে বাঁচতুম।

আগে ছোট্ট একটা মজার ঘটনা শোন। দিন কয়েক পূর্ব্বে দেশ থেকে খবর এসেছিল যে আমাদের জঙ্গল বাধালের গাঁতি বাকী খাজনার দায়ে দুই এক দিনের মধ্যেই নীলামে উঠ্‌ছে। এ কথা আমি পূর্ব্বেই জানতুম—কিন্তু নীলামের দিন অবগত ছিলুম না; আসবার সময় ছোটদাদাবাবুকে ব'লে এসেছিলুম—গাঁতি যত টাকায় হোক্ বেনামী কিনে রাখতে। ঐ পরামর্শেরই পুনরুক্তি ক'রে একখানা Telegraphic form এ লিখ্‌লুম—"Bid for ganti any cost wire news," এবং সে খান নিয়ে Central Railway Station য়ের Telegraphic office য়ে transmission য়ের জন্য দাখিল করলুম; সঙ্গে বন্ধুবর রামচন্দ্র মুদালিয়র ছিলেন। একজন নেকটাই ঝোলান মাদ্রাজী ট্যাঁশ্ Form খানি প'ড়ে চক্ষু কপালে তুলে বল্লেন—"I see it scents politics—I can't accept it for transmission" ('আমি এতে রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছি, আমি এ পাঠাবার জন্যে গ্রহণ কত্তে পারি না")। বিদ্যাসাগর ভায়া আমার, "Ganti" (গাঁতি) শব্দটি "Gandhi" (গান্ধী) ব'লে ধ'রে নিয়েছেন এবং ভেবে ছিলেন, বুঝি "তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে" কোটি পূর্ণ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী নিজেকেই প্রকাশ্য নীলামে চড়িয়েছেন! যা হোক্, শেষে Park Town পোষ্টাফিসে আমার টেলিগ্রাম গ্রাহ্য হ'ল। এই ব্যাপারে আমি ও মুদালিয়র ত হেসেই অস্থির!

কাল মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন্ (Triplicane) সমুদ্রোপকূলে মৎস্য-শালা (Aquarium) দেখ্‌তে গিয়েছিলুম; সঙ্গে আমার মাদ্রাজী সুহৃৎটিও পথ প্রদর্শক রূপে ছিলেন। মৎস্যশালাটি নাকি জগতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়, প্রথমটি নাকি স্কটল্যাণ্ডে। যাবার পথে এস্‌প্লানেডের মধ্য দিয়ে সেণ্ট জর্জ্জ কেল্লা (Fort St. George) র পাশ দিয়ে গেলাম। চার পাশে কতকগুলো তারহীন টেলিগ্রাফের post জাহাজ-মাস্তুলবৎ খাড়া রয়েছে দেখ্‌লুম। দুর্গের মধ্যে (১৬৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) সেণ্ট্ মেরীর গির্জ্জা; এর সঙ্গে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। এই গির্জ্জার মধ্যে বিখ্যাত মিশনারী সার্জ্জ (Schwartz), মাদ্রাজের প্রথম গভর্ণর Sir Thomos Munro, Sir Henry Ward, Lord Haubert প্রভৃতির সমাধিস্থান রয়েছে। এখানেই নাকি রবার্ট ক্লাইভের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তা' ছাড়া ভারতবর্ষে এইটিই ইংরাজদের সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জা। যা হোক্, তারপর কুউম নদীর (River Cocum) সাঁকোর উপর দিয়ে একটু দূরে লাট প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলুম। লর্ড ওয়েলিংডন্ এখন "উটি"র চূড়ায় (Oatcamord) ঘোড়াদৌড়, পোলো খেলা ও সান্ধ্য-ভোজের সরগরমে গরমকাল অতিবাহিত করছেন। কলিকাতার লাট ভবনের তুলনায় এটা কিছু নয় বল্লেই হয়। চারি পার্শ্বের বাগান, জঙ্গা ঘাস, শুষ্ক পত্র ও ঝোপ্ ঝাড় পরিপূর্ণ হ'য়ে মালীদের হতাদরের সাক্ষ্য দিচ্ছে; তার মধ্যে দুই একটা রুগ্ন হরিণ চর্‌তে দেখে পুরাকালের তপোবনের একটা জঙ্গম আভাষ পেলুম্। কুউম নদীর দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেই তোমায় বলেছি; সহরের নর্দ্দমার (এখানে Underground drainage System নাই) যত ময়লা জল এসে এখানে পড়্‌ছে, পলি প'ড়ে স্রোতের গতি কমে আসছে, রজক ভায়েরা কাপড় কাচ্‌ছে—গো-মহিষাদি দিব্য আরামে গায়ের জ্বালা জুড়াচ্ছে; যাক্ তারপর সিপক প্রাসাদ (Chepauk Palace), সেনেট হাউস, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম্যারিনা রোডে মৎস্যশালার সম্মুখে এসে পড়্‌লুম।

অনতিদূরে বিস্তৃত বেলা ভূমির উপরে—যেখানে মহাত্মা গান্ধী কয়েক মাস পূর্ব্বে মাদ্রাজবাসীদের তাঁর স্বরাজ মন্ত্র ও চরকার বাণী শুনিয়ে গেছেন—সে স্থানটিও সন্দর্শন কর্‌লুম। মৎস্যশালা একটি মাতি বৃহৎ এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একতলা বাটীতে অবস্থিত। প্রায় ২৫০।৩০০ প্রকারের মৎস্য, এক এক জাতের পাঁচ দশটি এক একটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধ জলপূর্ণ কাঁচের কুঠরীতে সংরক্ষিত; কুঠরীগুলির উপর দিকে খোলা, নল দ্বারা জল পরিবর্ত্তন ও পরিপূর্ণ কর্‌বার বন্দোবস্ত আছে। জলের মধ্যে চীনাদের চণ্ডু খাবার নলের মত এক প্রকার লম্বা জিনিষের মুখে এক প্রকারের রাসায়নিক "বরফি" সংযুক্ত রয়েছে, সেই বরফিগুলো জলের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে মাছগুলির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহায়তা কচ্ছে—জলের উপর বুদ্বুদ কাটছে। তিন সেরের বেশী ওজনের মাছ একটাও নেই; সব গুলোই সামুদ্রিক ব'লে বোধ হ'ল। মাছগুলির বর্ণ ও গঠন বৈচিত্র্যই দেখ্‌বার জিনিষ। কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা পীত, কোনটা বেগুনী, কোনটা সবুজ, কোনটা সোণালী, কোনটা কাল, কোনটার আবার সকল রঙের সমন্বয়; কোনটার গায়ে ডোরা কাটা, কোনটার গায়ে যেন সতরঞ্চ পাতা, আবার কোনটার দেহের উপর ঠিক যেন ফুলের কেয়ারী করা। কোন মাছ ত্রিকোণাকার, কোনটা চতুষ্কোণ, কোনটা দীর্ঘ চতুরস্র, কোনটা গোলাকার, কতকগুলি ঠিক বহু বর্ণ রঞ্জিত সর্পের মত দেখ্‌তে; আবার এক রকমের মাছ দেখলুম—আকারে অবিকল এক খানা চিত্র বিচিত্র করা খেলাঘরের ষ্টীমার। এদের কার্য্যও নানা প্রকৃতির লক্ষ্য করলুম। কতকগুলি মাছ আদালতের উকীল আম্‌লাদের মত অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করছে; এক প্রকোষ্ঠে দুটি মাছ ধীরগতিতে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে যেন প্রেমের কাহিনী বলাবলি করছে; কেউ কেউ বালির বিছানায় শুয়ে আলস্যের জৃম্ভন তুলছে; কেউ বা দর্শকের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে মুক্তি ভিক্ষা করছে; কোনটি বা কাঁচের প্রাচীরে পুনঃপুনঃ পুচ্ছের আঘাত ক'রে "ওরে চারিদিকে মোর, একি কারাগার ঘোর! ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা, আঘাতে আঘাত কর্"—যেন কবির এই ভাবটি ব্যক্ত করছে; কোন কোন মাছ এক একবার জলের উপর ভেসে উঠে তার গভীরতা পরীক্ষা করছে; দুই তিনটি প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র পাথর ও নুড়ির দ্বারা রচিত শৈবালাচ্ছাদিত ছোট ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া আছে, কতকগুলি মাছ ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে সেগুলির মধ্যে যাওয়া আসা করছে, শাবকদের পোকা মাকড় খাওয়াচ্ছে—কখনো তাদের ঠেলে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো তাদের সঙ্গে খেলা কচ্ছে, কখনও শৈবাল পঙ্কের মধ্যে মাথা ঘষছে, (ঠিক সংসারী মানুষের মত)—তারা যে বদ্ধ জীব সে সম্বন্ধে তাদের একটুও জ্ঞান নেই। ঘোড়া মুখো মাছ, বাঁদর মুখো মাছ, দ্বিপদ বিশিষ্ট মাছ, কামরাঙা মাছ, ভেক্ মুখো মাছ, মকর মুখো মাছ—আরও কত রকম-বেরকমের সামুদ্রিক মাছ দেখা গেল। এক একটা কাঁচের প্রকোষ্ঠের সম্মুখে যাই আর তাদের খেলা-ধুলা-বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি; রামচন্দ্র ভায়া বাহু ধ'রে টেনে অন্য এক প্রকোষ্ঠের ধারে নিয়ে যান্। এম্‌নি ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে মাদ্রাজের বিখ্যাত মৎস্যশালা দর্শন করা গেল। কল্‌কাতায় "রাজার বাজারে" নিত্য এক রকম মাছের প্রদর্শনী দেখে এসেছি, আর ত্রিপ্লিকেন্ সমুদ্রোপকণ্ঠে আজ অন্য রকমের মৎস্য-সম্মেলন দেখ্‌লুম।

তারপর তোমারি সঙ্গে এদেশের স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা। আমারি পূর্ব্ব পত্রে তোমায় লিখেছিলুম, "দাক্ষিণাপথে এসেই একটা বিষম বিসদৃশ আচার উত্তরাঞ্চলের মুসাফিরের চোখে পড়ে—সেটি স্ত্রী স্বাধীনতা। আমাদের দেশে নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়েরাও দায়ে প'ড়ে পথে বাহির হ'লে শত গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রের একাংশ দিয়ে মস্তক আবৃত করে; কিন্তু মাদ্রাজে দেখছি—একমাত্র বিধবা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকই অবগুণ্ঠন দেয় না—এমন কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কুলবধূরাও নিঃসঙ্কোচে বাজার হাটে গমন করেন এবং উৎসবে নিমন্ত্রনে যে কোন সময় বাহিরে যাবার প্রয়োজন হ'লে পুরুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকেন না।"

তুমি এর উত্তরে লিখেছ যে ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে স্ত্রী স্বাধীনতা আদৌ ছিলনা, হিন্দুদের Present Purdah System মুসলমানদের নিকট থেকে ধার করা। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভুত্ব অল্পদিন স্থায়ী এবং তেমন বিস্তৃতিলাভ করেনি বলেই তত্রত্য হিন্দু সমাজে মুসলমান আচার ব্যবহার প্রবেশ কর্‌বার সুযোগ ঘটে নি। নিজ জাতির স্বাধীনতার অনুকূলে আরো অনেক কথা লিখেছ।

তোমার মতের বিরুদ্ধে আমার প্রথম যুক্তি হচ্ছে এই যে, উড়িষ্যাবাসীরা ত বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদের সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে মুসলমান প্রভাব ছিলও খুব অল্পদিন, তবে সে প্রদেশ থেকে অবগুণ্ঠন ও পর্দ্দা প্রথা বর্জ্জিত হয়নি কেন? রামায়ণ, মহাভারত, মনু, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র ও মাঘ, কালিদাস, ভারবী, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির সংস্কৃত নাটকাদি পাঠ কর্‌লে জানা যায় যে এদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বেই স্ত্রী অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা দুষ্মন্তের সভায় যখন শকুন্তলা এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি সেই "নাতি পরিস্ফুট শরীর-লাবণ্যা" "অবগুণ্ঠনবতী" কামিনীর প্রতি-ক্ষণেক চেয়েই দৃষ্টি অবনত কর্‌লেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে চতুর্থ শতাব্দীতেও যেমন স্ত্রী লোকদের অবগুণ্ঠন প্রথা বর্ত্তমান ছিল, অন্যদিকে তেমনি পরস্ত্রীদের (তখন দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলা পরস্ত্রীই বটে) নিকট পুরুষদের ব্যবহার কতদূর সংযত ছিল!

খৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বকার সময়ের একটা দৃষ্টান্ত দিই। রাবণ-বধ হ'য়ে গেলে, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ অশোক বন থেকে জানকী দেবীকে আনতে গেলেন। এদিকে পথে সমস্ত লঙ্কার পুরস্ত্রীরা ভেঙ্গে প'ড়েছে, তার-উপর সংখ্যাতীত কপি-কটক, সবাই অভাগিনী সীতার দর্শন লালসায় সমুৎসুক; যখন রুদ্ধ শিবিকায় সীতাদেবীকে বসিয়ে, বিভীষণ, শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরা-ভিমুখে যেতে লাগ্‌লেন, তখন সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ লঙ্কাবাসী ও বানরসৈন্যগণ তাঁহাকে দেখ্‌বার জন্য মহা কোলাহল লাগিয়ে দিল; শেষে শিবিকা থেকে সীতাদেবীকে নামাবার উপায় রইল না। তখন বিভীষণ পরুষ বচনে সমস্ত সীতা দর্শনাভিলাসী সৈন্যদের অপসারিত কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাই না শুনে রঘুকুল তিলক রাম বিভীষণকে মৃদু ভৎর্সনা ক'রে বল্‌লেন—"কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ। নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম॥" (অর্থাৎ,—কেন বন্ধু, আমার পরামর্শ না নিয়ে এই সমবেত লোকদের ক্লেশ দিচ্ছ? এদের দূরীভূত কর্‌বার প্রয়োজন নেই—এরা আমার নিতান্তই স্বজন।) তারপর,—"ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে। ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥" (অর্থাৎ—বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহ স্থলে স্ত্রীলোক দর্শন দিলে কোন দোষ স্পর্শে না।) মনু প্রভৃতি যেমন এক দিকে ব'লে গেছেন—স্ত্রীলোক যেখানে সম্মানিতা না হয়, সেখানে দেবতা বিমুখ, তেম্‌নি অন্য দিকে ব্যবস্থা দিয়েছেন—বাল্যকালে স্ত্রীলোক পিতার, বিবাহান্তে পতির ও স্বামী অন্তে পুত্রের অধীন থাক্‌বে,, তার স্বতন্ত্র জীবন যাপনের অধিকার নেই; আরও বলেছেন—"উৎসবে লোক যাত্রায়াং তীর্থেষ্বনা নিকেতনে। ন পত্নীং প্রেরয়েৎ প্রাজ্ঞ পুত্রাভ্যার্বিবর্জ্জিতাম্।" ভারতেরই মহাকবি গেয়ে গেছেন—"সঞ্চারো রতি-মন্দিরাবধি সখি কর্ণাবধি ব্যাহৃতম্।"—অর্থাৎ কুলবধূর গমন-সীমা শয়ন-কক্ষ পর্য্যন্ত, কথা এতই মৃদু যে পার্শ্ববর্ত্তিনী সখি ছাড়া আর কেউ শুন্‌তে পায় না। এর পরও কি তুমি বল্‌তে চাও যে ভারতে স্ত্রী-অবরোধ প্রথা চিরকালই ছিল না? এ সম্বন্ধে তর্ক কর্‌বার বিষয় তোমার সঙ্গে অনেক ছিল, কিন্তু চিঠিতে নয়, ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎ মত কর্‌ব—তুমুল রকমেই হবে জেনো।

এখন দাক্ষিণাত্যে অবরোধ প্রথা অপ্রচলনের কৈফিয়ৎ—যেটা আমি এদের ইতিহাস আলোচনা ক'রে ঠিক করেছি তোমাকে দিতে চেষ্টা করি। রামায়ণ যদি কখনও প'ড়ে থাক ত জান্‌তে পার্‌বে যে ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে বিদর্ভ নামে জনপদে রাজা

ইক্ষ্বাকু নামে নরপতি রাজত্ব করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঋষ্যদণ্ড রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে বিলাসের স্রোতে গা ভাসান দিলেন। তখন বিদর্ভের অধিকাংশই গভীর বন ছিল, সেইজন্য সাধারণের কাছে সে স্থান "দণ্ডধরারণ্য" ব'লে পরিচিত ছিল, তার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্থানটির নাম ছিল, "দণ্ডকারণ্য"। একদিন দুর্বৃত্ত দণ্ড কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিকালে তাঁর কুমারী কন্যা কুজার উপর বলাৎকার করেন। গৃহে ফিরে এসে শুক্রাচার্য্য সকল বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে, ক্রোধে অভিশাপ কল্লেন যে সবংশে ঋষ্যদণ্ড ও তাঁর স-প্রজা রাজ্য অবিলম্বে ভস্মীভূত হোক্। তাই হ'ল। সেই থেকে দণ্ডধরারণ্য ও দণ্ডকারণ্য জন-মানব বনজন্তু-বৃক্ষাদি পরিশূন্য ছিল। তারপর ঋষি অগস্ত্য এসে কয়েকজন মুনি নিয়ে সেখানে একটি ছোট্ট জনপদ গ'ড়ে তুল্লেন; অবশ্য মুনি-পত্নীরাও সঙ্গে এসেছিলেন। যেখানে এক দেশের অল্প সংখ্যক লোকের অধিবাস, সেখানে আত্মীয়তা ও একতা খুব বেশী বাড়ে; আবার যেখানে আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার বেশী বাড়াবাড়ি, সেখানে অবরোধ প্রথাও শিথিল হ'য়ে পড়ে—এটা Universal truth ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। এদেশে স্বজাতির অল্পতা নিবন্ধন পিতৃ-পক্ষের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃ-পক্ষের পঞ্চম পুরুষ বাদ দিয়ে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্রমে যখন অচল, তখন অগত্যা মামাতো পিসতুতো ভাই ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত হ'ল; সে প্রথা এখনও দাক্ষিণাত্য সমাজে বর্ত্তমান। তারপর দেখ,—যখন আর্য্যেরা দণ্ডকারণ্যে বসবাস স্থাপন করেন, তখন সেখানে রাক্ষস-ভীতি ভয়ানক প্রবল; এই রাক্ষসরা আর কেহই নয়—গণ্ড (Gonds), কোল্ (Kolarians) প্রভৃতি আদিম অধিবাসী ও কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির অশিক্ষিত দ্রাবিড়। এই রাক্ষস ভয়ের জন্য আর্য্যেরা যখন কোন সভা সম্মেলন বা অন্য স্থানে গমন করতেন, তখন অর্দ্ধাঙ্গিনীদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। তা' না হ'লে বোধ হয় অসংখ্য "সীতা হরণের" পালা অভিনীত হ'য়ে যেত। তারপর ক্রমে ক্রমে যখন রাক্ষসকুল শান্ত হ'ল এবং প্রাচীন দ্রাবিড়গণ আর্য্যদের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল, তখন স্ত্রী-পুরুষ কেহই পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলেন না। পুরুষরা কেহ কেহ সপত্নীক শিবা-বাড়ী যেতে সুরু কল্লেন; কোন কোন স্ত্রীলোক বা গৃহ কাজ সমাপনান্তে দ্রাবিড় পাড়া প্রতিবেসিনীদের নিকট গিয়ে আর্য্য স্ত্রীসভ্যতার মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। তারপর ক্রমশঃ স্ত্রী স্বাধীনতা সকল বর্ণের মধ্যে অনুকৃত হ'য়ে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

সমালোচনা।

(ছোট গল্প)

আমি তখন একটা বিখ্যাত দৈনিকের সম্পাদকীয় চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সাহিত্যিক ও সূক্ষ্ম সমালোচক বলিয়া আমার একটু খ্যাতি প্রতিপত্তিও ছিল। রোজগার ও মন্দ করিতাম না। সুতরাং সুখেই দিন কাটিতেছিল। সেই সময় কলিকাতায় প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনীর একটা সমালোচনা লিখিবার ভার আমার উপর পড়ে সুতরাং দিন কয়েক আমি খুব পরিশ্রম করিয়াই প্রদর্শনীটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম।

একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমি চিত্র বিভাগ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, সম্মুখে দেখিলাম কতকগুলি লোক জনতা করিয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের অনতিদূরে তিনটী সম্ভ্রান্ত বেশী রমণী চলিয়া যাইতেছেন।

তন্মধ্যে একটী প্রৌঢ়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী সুন্দরী যুবতী। উভয়েই সুন্দরী কিন্তু প্রৌঢ়ার দক্ষিণ পার্শ্বের যুবতীটীর শরীরে লাবণ্য যেন ধরে না। এমন সুন্দর লাবণ্যময়ী দেহলতা আর কখনও দেখি নাই। মুহূর্ত্তের জন্য সকল ভুলিয়া আমি সে সুন্দরীকে দেখিতে লাগিলাম। রমণী ত্রয় দৃষ্টির অন্তরাল হইলে আমার যেন জ্ঞান ফিরিল। শুনিলাম পার্শ্বের একজন বলিল "ওই ডান পাশের মেয়েটীই 'গতি পরিবর্ত্তন' নামের ছবিটী আঁকিয়াছেন। ওঁর নাম মিস বেলা মৈত্র, মিসেস্ রায় ওঁকে খুবই ভালবাসেন। তিনিই ওঁকে চিত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন।

মিসেস্ রায় আমার অপরিচিতা নহেন। দু'একবার তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিতও হইয়াছিলাম। কই তাঁহার গৃহে ত বেলাকে কখনও দেখি নাই। যাহাই হউক মিসেস্ রায়ের নিকট বেলার সন্ধান পাইব ভরসা হইল। আপনারা হাসিবেন না এই মুহূর্ত্ত দর্শনেই বেলার সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়াছে। মানুষের হৃদয়টা যে এত অসার, সে যে এত সহজে বিকৃত হয় তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না।

বেলার ছবিখানি দেখিবার জন্য মনে বড়ই কৌতুহল হইল। আমি ছবিগুলি খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। প্রশংসাযোগ্য চিত্রের ও চিত্রকরের নামও নোট করিয়া লইয়াছি। কই "বেলা" বা "গতি পরিবর্ত্তন" নাম ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। চিত্র তালিকা খুলিয়া দেখিলাম প্রকৃতিই ৯১ নম্বরে "গতি পরিবর্ত্তন" নামে একখানি চিত্র আছে। চিত্রকরী "মিস্ বেলা মৈত্র"। ছবিখানি দেখিলাম প্রকৃতই অতি সুন্দর চিত্র। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কি করিয়া ছবিখানি ইতিপূর্ব্বে আমার মত সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইল। মুগ্ধ হইয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিলাম। দু'এক স্থানে কাঁচা হাতের চিহ্ন আছে সত্য কিন্তু মোটের উপর ছবিখানি খুবই ভাল হইয়াছে। চিত্র পরিকল্পনা অতি সুন্দর, যে কোন প্রতিভাবান চিত্রকরের স্পর্দ্ধার বস্তু। ছবিখানি ফুটিয়াছেও মন্দ নয়। কোথাও রঙের অশোভন আড়ম্বর নাই। স্বভাবসঙ্গত অথচ অতি সরল ভাবে ছবিখানি অঙ্কিত। যতই দেখিতে লাগিলাম ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে দৃষ্ট অস্তায়মান রবি-কিরণরঞ্জিত বেলার সুন্দর মুখখানি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ছবিখানি সেই মুখখানির মতই সরল, সুন্দর, নির্দ্দোষ। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও তৃপ্ত হইল না। অতৃপ্ত আকুল হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর সমালোচনা লিখিতে বসিলাম। দুঘণ্টা ধরিয়া অবিরত কলম চালাইয়া সমস্ত প্রদর্শনীর একটা বিরাট সমালোচনা লিখিলাম। প্রবন্ধ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার পড়িতে গিয়া দেখি প্রবন্ধখানির প্রায় অর্দ্ধাংশ বেলার ছবির প্রশংসায় পূর্ণ। এ ত সমালোচনা নয় যেন অন্ধ ভক্তের আকুল স্তুতি। পড়িতে পড়িতে লজ্জা হইতে লাগিল। কতকগুলি স্থান প্রবন্ধ হইতে কাটিয়া দিলাম। প্রবন্ধ শেষ করিয়া উঠিতে যাইব এমন সময় মনে পড়িল "শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" নামধেয় কোন নবীন লেখকের "আরতি" নামে একখানি পুস্তকের সমালোচনা বহুদিন হইল করা হয় নাই। তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। "আরতির" একটা সমালোচনা লিখিব ভাবিতে ভাবিতে একটা আশ্চর্য্য তথ্য আমার উর্ব্বর মস্তিকে আবির্ভূত হইল। আমি সংশয়ে দেখিতে লাগিলাম সুধীর বাবুর রচনাকৌশল ও বেলার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি উভয়ই এক প্রকারের। উভয়ই নবীন কিন্তু উভয়েরই বিলক্ষণ হাত সাফাই আছে। ভাবের অভিব্যক্তিতে উভয়েই বিলক্ষণ নিপুণতা। মিস্ বেলা বর্ণ ও তুলির সাহায্যে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সুধীর বাবু নিজের প্রশংসনীয় শব্দচাতুর্য্যে তাহাই রচনা করিয়াছেন। লেখক ও চিত্রকরের মধ্যে ভাব ও ভঙ্গীতে এমন অদ্ভুত সমতা আমি আর কখনও দেখি নাই। এই অদ্ভুত তথ্যটা আবিষ্কার করিয়া আমার একটু গর্ব্ব হইল; আমি তাহা প্রদর্শনী সমালোচনায় লিখিয়া দিলাম।

যথা সময়ে প্রবন্ধখানি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পেশ করিলাম। সম্পাদক মহাশয় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি প্রবন্ধখানি পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি মিস্ মৈত্রকে চেন না কি?" আমার মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া গেল। আমি শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম "না মহাশয়।" সম্পাদক আর কিছু বলিলেন না। প্রবন্ধ খানি ছাপিবার জন্য প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন।

(২)

এই ঘটনার প্রায় এক পক্ষ পরে আমি সুযোগ পাইয়া মিসেস্ রায়ের বাড়ীতে একটা ভোজের নিমন্ত্রণ যোগাড় করিলাম। সন্ধ্যা হইতে না হইতে মিসেস্ রায়ের বাড়ীতে হাজির হইলাম। মিসেস্ রায় অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তখনও নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কেহই আসেন নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই একটু সকাল সকাল গিয়াছিলাম। কেন, তাহা বলিতে হইবে কি? ভিতরে গিয়া দেখিলাম মিসেস্ রায়ের অনুগৃহীতা কতকগুলি রমণী বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কই যাহার জন্য নির্লজ্জের মত নিমন্ত্রণ যোগাড় করিয়া এখানে আসিলাম সে কই। মিসেস্ রায় আমাকে বসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক রমণীকে আমার আদর অপ্যায়নের ভার দিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। আমি সেই মহিলাযূথের মধ্যে হংস মধ্যে বকের মত স্থাপিত হইয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলাম। ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে কক্ষ প্রাচীরে সেই ছবিখানি টাঙ্গানো রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ছবিখানি দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না উঠিয়া গিয়া দেখিলাম ছবিখানি বহু মূল্য ফ্রেমে মণ্ডিত। চিত্রের নিম্নে, আমার প্রবন্ধের যে অংশ টুকু বেলার চিত্রের প্রশংসায় পূর্ণ সেই অংশ টুকু স্থাপিত হইয়াছে। আমার একটু গৌরব বোধ হইল। এমন সময় মিসেস্ রায় পুনর্ব্বার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ছবির নিকট আমায় দেখিয়া মিসেস্ রায় বলিলেন "বেলা যে পুরস্কার পাইয়াছে সে কেবল আপনারই জন্য। প্রথমে কেহই ছবিখানি লক্ষ্য করে নাই। আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই পরীক্ষকগণের শুধু তাই কেন সাধারণেরও দৃষ্টি ছবিখানির উপর পতিত হয়। আমার কিন্তু বরাবরই ধারণা ছিল বেলা পুরস্কার পাইবে। যাই হউক বেলা আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "মিস্ মৈত্র কোথায়? তিনি ত আপনার নিকটেই থাকেন।

"হাঁ এখানেই সে থাকত। সম্প্রতি শরীর ভাল নয় বলে সে বাঁকিপুরে গেছে। সেখানে বোধ হয় কিছু দিন থাকবে।"

দারুণ নিরাশায় আমার মন দমিয়া গেল আমি আর ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিলাম না। মিসেস্ রায় অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। আমি মূকের ন্যায় স্থানান্তরে বসিয়া রহিলাম।

(৩)

এই ঘটনার পর প্রথম ছ'মাস কাটিয়া গিয়াছে। বেলার চিন্তা আমার ধ্যান, ধারণার বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাঝে মাঝে বেলা আসিয়াছে কিনা সংবাদ লইতাম কিন্তু কোন বারেই অনুকূল উত্তর পাইতাম না। বেলা এখনও বাঁকিপুরে। এক একবার মনে হইত আমিও বাঁকিপুরে যাই। মিসেস্ রায়ের একখানা চিঠি লইয়া বেলার সহিত পরিচিত হই। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিতাম না। মনের আবেগ মনে চাপিয়া দিন কাটাইতেছি। কাজ কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে না। সম্পাদক মহাশয় ত মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন "প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার পর হইতেই মুখুয্যের প্রতিভা Extinct Volcano র মত শূন্যগর্ভ হয়ে গেছে। প্রকৃতই তাই। আমার যেন সমস্তটা জুড়িয়া বেলা বিরাজ করিতেছে। লিখিতে বসি, বেলার সুন্দর মুখখানি চক্ষের কাছে ভাসিতে থাকে, লেখা আর হয় না। ভাবিতে বসি, বেলা ধীরে ধীরে তার অনন্ত সৌন্দর্য্য সম্ভার লইয়া আমার হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হয়। যাহা ভাবিতে বসিয়াছিলাম তাহা বিস্মৃত হইয়া বেলার চিন্তায় চিত্ত মগ্ন হইয়া যায়।

এক এক সময়ে মনে হয় বেলা কি আমায় ভাবিতেছে? যাহার সমালোচনায় আজ সে সম্মানিতা, পুরস্কৃতা, তাহাকে কি বেলার দিনান্তে একবারও মনে পড়ে? নিশ্চয়ই পড়ে। এত সুন্দর যে, এত কোমল যে, এত মধুর যে, সে কি কখনও অকৃতজ্ঞ হইতে পারে? বিশ্বাস হয় না। তবে বেলা ফিরিয়া আসে না কেন? বেলার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমি যেমন আকুল সে যদি সেরূপ আকুল হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ফিরিয়া আসিত। কৃতজ্ঞতা এক, ভালবাসা আর, এমনি কত চিন্তা, কত দুরাশা আমার হৃদয় মধ্যে নিয়ত উপদ্রব করিতেছে। ইহাতে কি প্রতিভার স্ফুরণ হয়।

একদিন সকালে কাজ করিতেছি, এমন সময় পিয়ন ডাক দিয়া গেল। আমার নিজের চিঠি পত্র খুবই কম থাকে; প্রায়ই অনুকূল সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারদিগের করুণ প্রার্থনাপূর্ণ পত্র আমায় উৎপীড়িত করে। এ পত্রগুলো তাহাই ভাবিয়া এক পাশে ঠেলিতে গিয়া দেখি একটীর লেখা অতি সুন্দর; যেন মুক্তার পংক্তি সাজানো রহিয়াছে। দেখিয়াই পত্রখানি স্ত্রীহস্তের বলিয়া মনে হইল। কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানি খুলিলাম। নীচে দেখিলাম নাম "বেলা।" আনন্দ বিস্ময়ে শ্বাসরোধ করিয়া পড়িতে পড়িতে চক্ষু অন্ধকার হইল, হাত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—বক্ষঃস্পন্দন স্থগিত হইল। চিঠিখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। চিঠিখানি এইরূপ :—

মাননীয়—শ্রীযুত বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

অপরিচিতার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনার করুণাই আজ আমায় জনসমাজে সম্মানিতা পুরস্কৃতা করিয়াছে। আপনার স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি সে করুণাময় দান জীবনে ভুলিতে পারিব না। আপনার মনে পড়িতে পারে আমি গত বৎসর "গতি পরিবর্ত্তন" নাম দিয়া একখানি চিত্র প্রদর্শনীতে দিয়াছিলাম। চিত্রখানি সৌভাগ্যক্রমে আপনার স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। আপনি সংবাদপত্রে তাহার একটী বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমি পুরস্কৃতা হই ও যথেষ্ট যশোলাভ করি। সেজন্য আমি আপনার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ; শুধু তাহাই নহে আপনার সমালোচনা আমাকে জীবনে সুখের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। আমি যখন "গতি পরিবর্ত্তন" আঁকিতে আরম্ভ করি, তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে ছবিখানি আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে আপনি প্রবন্ধের শেষাংশে আমার চিত্রের সহিত শ্রীযুত সুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন দুই জনেরই রচনার আশ্চর্য্য সমতা। করুণাময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সুধীর বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়; সেও আপনার সমালোচনার ফলে। পরিচয়ে যে আমরা দু'জনেই খুব সুখী হইয়াছি তাহার প্রমাণ আগামী ১৫ই জুলাই সুধীর বাবু আমাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিয়া আমায় সম্মানিত করিবেন। প্রকৃত পক্ষে আপনিই এ বিবাহের ঘটক। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে আপনি শুভাগমন করিয়া এই শুভ কার্য্যে যোগদান করিবেন ও নবদম্পতির মস্তকে অনাবিল স্নেহাশীর্ব্বাদ দান করিবেন। আপনি না আসিলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। ইতি

চিরকৃতজ্ঞা চিত্রকরী—
"বেলা"

শ্রীঅতুল চন্দ্র বসু।

অচেনা।

আমার আবাসে আসি আমারে কে দিলে দ্বার!
ডাকি বার বার
খোল দ্বার, খোল দ্বার,
নাই কোন সাড়া!
আমি পথ হারা—
পথিকের মত,
ঘুরে ঘুরে মরি অবিরত;
কেগো তুমি আবাসে আমার!
খোল দ্বার খোল দ্বার।

কে তুমি বধির!
হিমাদ্রির মত ধীর স্থির
অধিকার করিয়াছ আমার মন্দির,
নিজ দ্বারপ্রান্তে আমি দাঁড়ায়েছি হ'য়ে নতশির;
একি জ্বালা, একি গো উৎপাত!
পশিতে নিজের ঘরে একি গো ব্যাঘাত।

খোল দ্বার, খোল দ্বার,
সাড়া নাই সাড়া নাই কি বিষম কি হ'ল আমার,
আজি এ নিজের গৃহে নিজে আমি আসিয়াছি হইয়া অতিথি,
এ কেমন রীতি!
কে গো তুমি এ কেমন তোমার প্রকৃতি?
বদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ি ডাকি আর বার,
খোল দ্বার, ওগো খোল দ্বার,
একি ব্যবহার!

হায়! হায়!
চোরের মতন আজি নিজ গৃহে হইবে কি পশিতে আমায়?
কি আছে এখন আর কি আছে উপায়।
ঐ যায় দেখা
গবাক্ষের ছিদ্র পথ দিয়া ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ আলো রেখা,
কে জ্বালিল সন্ধ্যা দীপ মোর এই কুটীর প্রাঙ্গনে
কিছু নাই মনে।

একি একি সঙ্গীতের ধ্বনি!
বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি কুটীরের মাঝে মম কে ওই রমণী?
একি পরিহাস!
নিজের দুয়ারে আমি নিজেই হতাশ;
দূর হ'তে শুনিতেছি ভূষণ শিঞ্জন!
পশিতেছে কাণে মোর বীণার নিক্কণ
কেবল বঞ্চিত আজি তব রূপ দরশনে মোর দু'নয়ন!
খোল দ্বার,
খুলিবে না দ্বার?
নাই খোল দ্বার,
শুধুই গবাক্ষ পথে কে তুমি গো দরশন দাও এক বার।

শ্রীভুবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সন্তবাণী।

(জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ)

সাধুর চরণ আশ্রয় করে' অনেক নীচ লোক উদ্ধার হয়ে যায়; কিন্তু কত শত কুলীন যে অভিমান নিয়ে সংসার সমুদ্রে ডুবে মরে তার আর অন্ত নাই।

(তুলসী সাহেব)

* * *

সাধুর জাত পাঁত জিজ্ঞাসা করো না; তার কাছ থেকে তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করে নাও। তলোয়ারখানা ভাল কি না তাই যাচাই কর; খাপখানা ভাল কি মন্দ তা' দেখে লাভ কি?

(কবীর)

* * *

প্রদীপ ব্রাহ্মণের ঘরেই জ্বলুক আর চণ্ডালের ঘরেই জ্বলুক, পতঙ্গের কাছে দুই আলোই সমান।

(তুলসী সাহেব)

* * *

এই সংসারে পাঁচটি রত্ন সার:—সাধুসঙ্গ, সদ্‌গুরু-শরণ; দীনতা, দান ও পরোপকার।

(তুলসী সাহেব)

* * *

জন্ম হেতুই পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ; তেমনি কর্ম্মের জন্যই মানুষের সুখ দুঃখের সহিত সম্বন্ধ।

(তুলসী দাস)

* * *

বায়ু দ্বারা যেমন পতাকা আন্দোলিত হয়, তেমনই কর্ম্মের দ্বারাই মানুষের শুভাশুভ চালিত হয়ে থাকে।

(তুলসী দাস)

* * *

এক কুলীন ভক্ত ছিলেন। তিনি বড় লোক না হলেও তার বাড়ীতে এক রকম সদাব্রত ছিল; দীন দুঃখী অতিথি কেউ তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরতো না। তাঁর একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। পিতার শিক্ষা গুণে কন্যাটি যেমন ভক্তিমতী তেমনি দয়াবতী। পরোপকারে ও দীন দুঃখীর সেবায় তার ছেলে বেলা থেকেই খুব যত্ন ও উৎসাহ। ক্রমে কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হয়ে এল। পিতা সৎপাত্র খুজ্‌তে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা মেয়েটিকে কোন ভগবদ্ভক্তের হাতে সমর্পণ করেন; কিন্তু মায়ের ইচ্ছা যে মেয়েটিকে রাজরাজড়ার ঘরে বিয়ে দেন। শেষে মায়ের ইচ্ছামতই কাজ হ'ল। এক রাজা মেয়েটিকে খুব সুন্দরী দেখে তাকে তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর মেয়েটি শ্বশুর ঘরে এল। সেখানে এসেই সে দেখ্‌ল যে রাজার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাস, কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম দান খয়রাৎ কিছুই নাই। এই দেখে তা'র মন বড়ই দুঃখিত হল। কত ভাল কাপড় ও গহনা! কিন্তু সে সেসব কিছুই পর্‌তো না, সাদাসিধে ভাবেই থাক্‌তো। রাণী বউর চাল চলন দেখে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হ'লেন, কিন্তু রাজা বউটিকে বড় ভাল বাস্‌তেন ও তাকে কাছে এনে প্রায়ই খুব আদর কর্‌তেন। কাজেই রাণী বড় কিছু বল্‌তে সাহস পেতেন না। একদিন বউর পিতার গুরুদেব রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত। রাজা তাঁর ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে তাঁকে খুব খাতির কর্‌লেন এবং অন্দরে নিয়ে যেয়ে বউর সঙ্গে তাঁর দেখা কর্‌লেন। পিতার গুরুদেবকে দেখে বৌ খুব খুসী; তাঁকে প্রণাম করে নিজ হাতে রান্না করে তাঁকে খাওয়াবেন বলে বড়ই আব্‌দার কর্‌তে লাগলেন। আপন শিষ্যের কন্যা, কাজেই গুরুজী আর না বলতে পার্‌লেন না। তখন তিনি স্নান আহ্নিক সেরে বউর কাছে এসে বস্‌লেন। বউ রুটী তয়ের করতে লাগ্‌ল ও তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল। রুটী তয়ের হলে গুরুজী সেই গরম রুটী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "এ রুটী বাসি, না টাট্‌কা?" বউ বল্‌লে, "না

এ বাড়ীর সবই বাসি।” রাণী একটু দূরে ছিলেন, তিনি ত এ কথা শুনে অবাক্। তিনি মনে মনে বল্‌লেন ‘এ বউটা লক্ষ্মীছাড়া! এ ত ভাল জিনিষের মর্ম্ম বুঝে না, তারপর আবার মিথ্যাবাদী। এমন টাট্‌কা গরম রুটীকে তার গুরুদেবের সামনে বাসি বল্‌লে! তাঁর ভারী রাগ হলো; তিনি রাজার কাছে সব বল্‌লেন। রাজা সব শুনে উত্তর কর্‌লেন, “তুমি আগেই রাগ কর কেন? অবশ্য এ কথার কোন মানে আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি বউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি। তারপর গুরুদেব আহারাদি করে বিদায় হলে রাজা বউকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “কি মা! তুমি এমন টাট্‌কা গরম রুটীকে বাসি বল্‌লে কি করে? এর মানে কি?” বউ উত্তর কর্‌লে “বাবা আপনি যদি রাগ না করেন ত বলি।” রাজা তাকে অভয় দিলেন। তখন বউ বল্‌লে, “বাবা, এ বাড়ীর যা কিছু ঐশ্বর্য্য সবই আপনার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফল, এ জন্মে সেবা ধর্ম্ম কর্ম্ম, দান খয়রাৎ, দীন দুঃখীর কিছুই দেখ্‌তে পাই না; তাই সব বাসি বলেছিলাম।” রাজা বুঝতে পেরে বল্‌লেন “বেশ কথা, মা! আজ থেকে দীন দুঃখীকে দান করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।” রাজার অন্তরটি ছিল ভাল, তবে ভোগ-বিলাসের মধ্যে থেকে তাঁর দান খয়রাতের হাত ছিল না; তাই দেওয়ানজীকে বলে সপ্তাহে তিন দিন করে গরীব দুঃখীকে খুব মোটা চা'ল দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইরূপ ভাবে কিছুদিন চল্‌লো। তারপর একদিন বউ রাজাকে বল্‌লে, “বাবা আমার বড়ই ইচ্ছা যে আপনাকে নিজ হাতে রান্না ক'রে খাওয়াই; আপনার অনুমতি পেলেই হয়।” রাজা উত্তর কর্‌লেন “বেশ তো, তাই হবে; তোর হাতে খাব এ বড় সুখের কথা; কিন্তু দেখিস্ মা, তোর বাসি জিনিষ খাওয়াস্ নি।” “না বাবা, টাট্‌কা জিনিসই খাওয়াব” এই বলে বউ রান্নার উদ্যোগ করতে গেল। তারপর খুব যত্ন করে রান্না বান্না করে রাজাকে খেতে দিলেন। রাজা খেতে বসেই দেখেন যে খুব মোটা চা'লের ভাত। তাঁর ত দেখেই চক্ষু স্থির। কেমন করে এ মোটা ভাত খাবেন? বউ কাছেই খুব দীনভাবে দাঁড়িয়ে। তিনি বউকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন “এ মোটা চা'ল কেমন করে খাব?” বউ উত্তর কর্‌ল “বাবা অপরাধ নেবেন না। এই মোটা চা'লের ভাত খাওয়া আপনাকে অভ্যাস করে নিতে হবে, নইলে পরজন্মে যে আপনার বড় কষ্ট হবে! আমার বাবা প্রায়ই বলেন যে এ জন্মে লোকে যা দেয় পরজন্মে সে তাই পায়।” এই কথা শুনেই রাজার চমক্ ভাঙ্গলো; তিনি সব বুঝতে পেরে একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন, “তুই মা, আমাকে বেশ শিক্ষা দিলি। আজ থেকে তোর ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা কর্।” তারপর থেকে রাজ্যে নূতন ব্যবস্থা হতে লাগলো। স্থানে স্থানে অতিথিশালা, আতুরাশ্রম স্থাপিত হ'ল। যেখানে জল নাই সেখানে দীঘি কাটান হ'ল; তা ছাড়া দীন দুঃখীর সেবার জন্য ভাল ভাল জিনিস দেবার আদেশ হ'ল। এইরূপে লোকের অভাব মোচনের নানারূপ ব্যবস্থা হ'ল তখন দেশ বিদেশে রাজার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়্‌লো ও সেই সঙ্গে তাঁর পরকালের জন্যেও বেশ কিছু সঞ্চয় হ'য়ে রইল।

(স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গৃহ।

(ছোট গল্প)

যে দিন মৃত স্বামীর দেনার দায়ে সুদখোর বামনদাস, তাহার বাস্তু ভিটার উপর নিজের দখল সাব্যস্থ করিবার জন্য আদালতের পিয়াদা লইয়া ঢোল বাজাইয়া জানাইয়া গেল যে সন্ধ্যার পুর্ব্বে গৃহ ত্যাগ না করিলে তাহাকে গর্দ্দানা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সেদিন বামার মা তাহার স্বামীর ভিটার মাটিতে উপুড় হইয়া যে কান্না কাঁদিল সেরূপ কান্না বোধ হয় যে তাহার কন্যা বামার মৃত্যু সময়েও কাঁদে নাই।

চারি পাড়ের মধ্যে একটী মাত্রও তাল বৃক্ষ না দেখা যাইলেও যেমন "তাল পুকুর" নাম চিরকালই লোকের মুখে রহিয়া যায়, তেমনিই বামা অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসরের উর্দ্ধকাল তাহার মাতার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেও বামনডিহা গ্রামের আবালবৃদ্ধের নিকট নিস্তারিণী বামার মাই রহিয়া গেছে। এই বামা ছাড়া তাহার আরও যে দু'একটী পুত্র কন্যা না হইয়াছিল এমন নহে। কিন্তু এমনই আঁটকুড়ী সে যে একে একে সবগুলিই সে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। শেষে আজ বছর খানেক তাহার বৃদ্ধ রুগ্ন স্বামী তাহাকে একরাশ দেনা আর এই জীর্ণ বাস্তু গৃহটীর একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেল সে পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী কাজ কর্ম্ম করিয়া বাজার হাট করিয়া দিয়া একটা পেট যা হ'ক করিয়া ভরাইয়া আসিতেছিল। আর দিবসের শেষে, কর্ম্মক্লান্ত দেহে স্বামী শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যা দীপ জ্বলাইয়া, শত ছিদ্র চালের দিকে মুখ করিয়া কোনও রূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিত।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতায় ইহাও সহ্য হইল না। হঠাৎ বামনদাস মুখুর্জ্জের এই বিধবাকে গৃহচ্যুত করিয়া আলু বেগুন চাষ করিবার খেয়াল হইল। ফলে বিধবা একমাত্র মাথা গুঁজিবার স্থানও হারাইয়া বসিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নিস্তারিণী মেঝে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একটী মৃৎ প্রদীপ জ্বালাইয়া শেষ বারের মত তুলসী তলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সেই বৃক্ষরূপী নারায়ণের চরণ-তলে উৎসর্গ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া খিড়কী দিয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

(২)

নীলদার লোকালয়শূন্য ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া গৃহহীনা বিধবা লক্ষ্যশূন্য তারকার মতই ছুটিয়া চলিতেছিল। মানবের দয়া মায়ার উপর বিশ্বাস তাহার চিরদিনের তরেই ছুটিয়া গিয়াছে। এই প্রকাণ্ড দুনিয়াটার মধ্যে তাহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। স্থান চাহিতেও আর তাহার সাহস হয় না। গৃহেই যখন তাহার স্থান বিধাতা রাখিলেন না, তখন যে অপরে তাহাকে স্থান দিবে এ ভরসা তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আসিতেছিল না।

মনে করিয়াছিল এই ভাবে চলিতে চলিতেই তাহার গোনা দিন ফুরাইয়া দিবে। ক্ষুৎপিপাসা কিন্তু সে কথা শুনিল না। জোর করিয়া তাহারা তাহার বর্ত্তমান অবস্থা মনে করাইয়া দিল। একটা গাছের কতকগুলো ফল পাড়িয়া খাইয়া ফেলিল, কিন্তু জল, জল কোথায় পাইবে। পিপাসায় যে প্রাণ ওষ্ঠাগত। হায় ভগবান প্রাণ যে ইচ্ছা করিলেই বাহির হয় না, নইলে এ প্রাণ ত গেলেই সে বাঁচিয়া যায়। শ্রান্ত ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে সে একটী অপেক্ষাকৃত খোলা স্থানে আসিয়া পড়িল।

অদূরেই একটী বৃহৎ গৃহ দেখিয়া সে গৃহটীর দিকে ছুটিয়া চলিল। বাটীতে নিশ্চয়ই লোক আছে। একটু জল সে পাইবেই। নিকটে গিয়া কিন্তু তাহার সে ভ্রম কাটিয়া গেল। জনমানবশূন্য গৃহটীকে যেন তাহার তখনকার অবস্থাকে পরিহাস করিবার জন্যই ভগবান তাহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ঝুপড়ী জঙ্গল। দেখিলেই মনে হয় বহুদিন হইতে

পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুঁজিতে খুঁজিতে একটী কূপ মিলিল। কিন্তু দড়ি বালতির অভাবে কি করিয়া জল তোলা যায়। বাড়ীটীর চতুর্দ্দিক ঘুরিতে ঘুরিতে বামার মা দেখিল যে একটী ঘরে দড়ি বালতি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার ঘরে চাবি বন্ধ, সহসা তাহার অঞ্চলস্থিত চাবি কাটির কথা মনে হইল। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পরের বাড়ীর চাবি খোলা, হউক না? তাতে পাপ কি? সে ত আর কিছু চুরি করিতেছে না, কেবল একবার দড়ি বালতিটী লইয়া জল তুলিয়া খাইয়া পরে আবার যেখানে যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিবে। দ্বিধা করিবার মত তখন আর তাহার শক্তি ছিল না। পিপাসার তাড়নায় তখন প্রাণ যায় যায়। আঁচল হইতে চাবি কাটি লইয়া চাবিতে লাগাইয়া ঘুরাইতেই চাবি খুলিয়া গেল। ভগ্ন ছিদ্রপূর্ণ বালতিতে করিয়া জল তুলিয়া পিপাসা মিটাইয়া সে খানিক বসিয়া পড়িল। মনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশে যাহা সে আজ তিন দিন ধরিয়া করিয়া আসিয়াছে, আজ এই ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর আর তাহা করিতে একেবারেই অপারগ। গৃহ ত্যাগ করিয়া অবধি সে আজ তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আজ আর সে পারিতেছে না। এই চল্লিশ বৎসর বয়সে, অর্দ্ধঅনশন-ক্লিষ্ট শরীরে আর সহে না। এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে। আর যাইবেই বা কোথায়? যেখানেই যাক্, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে একটা আশ্রয় চাই, খাইবার পরিবার সংস্থানও চাই। ভগবান! এসব সে কোথায় পাইবে? তখন অভিমান বশে মনের আবেগে মানুষের উপর রাগ করিয়া লোকালয় ছাড়িয়া বনে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বনে তাহার মত অসহায় রমনী কি করিয়া থাকিবে। আবার তাহাকে লোকালয়েই যাইতে হইবে। পূর্ব্ব পরিচয় গোপন করিয়া পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়া খাইবার চেষ্টা করিবে। এ ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

উঠিয়া বালতি দড়ি রাখিতে সে গৃহে প্রবেশ করিতেই অন্য ঘর গুলিতে কি আছে তাহা দেখিবার একটা প্রবল আগ্রহ সে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। অর্গল খুলিয়া খুলিয়া প্রতি ঘর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। যতই দেখে ততই সে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়! এই জঙ্গল মধ্যস্থিত গৃহ মধ্যে এত আয়োজন কে কি জন্য করিয়া রাখিয়াছে। শোবার ঘরে খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, বাক্স, পেটরা, ট্রাঙ্ক; ভাড়ার ঘরে চাউল, ডাইল, আটা, সুজি, চিনি, হাঁড় হাঁড়ি গুড়, দেওয়ালে দেব দেবীর মূর্ত্তি বিলম্বিত, যেন সহরের এক খানি বাড়ী, কোথাও কিছু অপ্রতুল নাই; যেন গৃহস্বামী গৃহটীতে চাবি লাগাইয়া কোথাও ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কেবল সমস্ত দ্রব্যাদির উপর ও মেঝেয় ২।৩ ইঞ্চি পুরু ধূলা বহুদিন গৃহস্বামীর গৃহ ত্যাগের প্রমাণ স্বরূপ পড়িয়া আছে।

তাই ত ভগবান কি গৃহহীনা আশ্রয়চ্যুতা অনাথার জনাই এই গৃহখানি হইতে গৃহস্বামীকে সরাইয়া দিয়াছিল। এই দয়াল সর্ব্বশক্তিমানের দয়ার উপর সে আস্থাশূন্য হইতেছিল? এইখানে, এই ভগবানের প্রদর্শিত গৃহে যদি সে আশ্রয় লয়, কে তাহাকে দোষ দিবে! গৃহস্বামী? কেউ আছে না কি? কই তাহা হইলে যাইবার সময়, এত দ্রব্যাদি অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইবে কেন? না এইখানেই সে থাকিবে। একাহারা একটা পেট তাহার অনেক দিন চলিয়া যাইবে। তারপর সঞ্চিত দ্রব্যাদি ফুরাইয়া গেলে? তখন যা হইবার তাহাই হইবে, আর সে ভাবিতে পারে না। ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। রান্না ঘরে যাইয়া উনুন ধরাইয়া ফেলিল। ভাঁড়ার হইতে চাউল দাইল বাহির করিয়া খিচুড়ী চড়াইয়া দিল। স্বপ্ন নয় ত? সে জাগ্রত ত? ছ'দিন পূর্ব্বে একমাত্র আশ্রয়, স্বামী শ্বশুরের ভিটা হইতে তাড়িতা সে, তিন দিবস অনাহারী সে, আজ কি না তাহার পক্ষে রাজভোগ, একি সত্য? না কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, স্বপ্ন টুটিয়া যাইবে? কই না? ঐ ত খিচুড়ী সিদ্ধ হইয়া গেছে, ঐ যে হাঁড়ির শব্দ!

(৩)

পরদিন হইতে সে গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

চতুর্দ্দিকের ধূলা ঝাড়িয়া, বিছানা বালিশ রৌদ্রে দিয়া, গোময় অভাবে মাটি দিয়া মেঝে লেপিয়া, চাউল দাইল পাছড়াইয়া সে গৃহখানির অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিল। ক্রমে গৃহ মধ্য হইতে গৃহের বাহিরে দৃষ্টি পড়িল। ছোট ছোট আগাছা ও ঘাস কোদালি কুড়ুলের সহায়তায় সমূলে বিনাশ করিয়া বাড়ীখানির চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এতদিনে তাহার ভ্রম অপনোদিত হইল। তাহার ধারনা ছিল সে জঙ্গলের মধ্যে এই গৃহখানি ব্যতীত আর কোনও গৃহাদি নাই। কিন্তু বহির্দ্দিক পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক দিবস একজন সবল বলিষ্ঠ দেহ সাঁওতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বামার মা ভীত হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইলে সে বলিয়া উঠিল, "মা তুই কবে এলি? আমাদিকে খবর দিতে নাই। ফণী বাবুটা কবে আসবে? সে এখন বুঝি আসবে নি? তোকে পাঠিয়েছে ঘর আগলাতে? আহা ফণী বাবুটার মা টা মরে গেল। ফণী বাবুটা যে আছাড় কাছাড় ক'রে কাঁদল। মোরা কত বুঝালি তা কুছু বলল না, রাতে উঠে কখন একাটা চলে গেল। আর ছ'মাস এ মুখো হ'ল না। তা বেশ হয়েছে তুই আসছু থাক্ থাক্। ধরমার মা'কে পেঠিয়ে দুব তোর জায়গাটায় শাক বুনে দিবে, আলু বুনে দিবে। দুটা ছাগল দিবে পুষবি, বেশ থাকবি। তুই বুঝি তার মাসি?"

বামার মা বাক্‌হীন নিস্তব্ধ। এতদিনে সে বুঝিতে পারিল কেন এত আয়োজন স্বত্বেও বাড়ী লোকশূন্য। কি করুণ কাহিনী, মাতৃ-বৎসল সন্তান স্বাস্থ্যকর স্থান বিবেচনায় রুগ্না মাতাকে লইয়া আসিয়াছিল। হাট বাজার হইতে দূর বলিয়া পাছে রুগ্না মা'কে একা ফেলিয়া যাইতে হয় ভাবিয়া, বহুদিনের জন্য আহারাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মা তাকে একা ফেলিয়া, পুত্রের আকুল আগ্রহ, প্রাণপণ সেবা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল; আর কি করিয়া পুত্র সেখানে থাকে। জ্বালাময়ী স্মৃতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পুত্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে বোধ হয় আর ফিরিবে না।

সে কথা মা কহিলেও সাঁওতাল আপনার মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে শুনিতে শুনিতে বামার মা মাঝে মাঝে অসম্বদ্ধ ভাবে দুই একটা হাঁ, হুঁ দিয়া যাইতে লাগিল। কতকক্ষণ পরে সাঁওতাল তাহার পত্নীকে তখনই পাঠাইয়া দিবে বলিয়া চলিয়া গেল। বামার মা কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির নিশ্চল ভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাইত শেষে তাহাকে পরস্বাপহারী হইতে হইল? মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল? গৃহস্বামীর মাসীর ভূমিকা লইয়া পরস্বের উপর জীবন যাপন করিবার তাহার কি অধিকার আছে? কিন্তু উপায়? ভগবানই কি তাহাকে এইখানে পাঠান নাই? এসব কি ভগবানের খেলা নয়? কই সে তৈজসপত্র বিছানা বা মূল্যবান দ্রব্যে হাতও দেয় নাই বরং তাঁহার যত্নে তাহারা ভালই থাকিবে। লোকসানের মধ্যে আহার্য্য দ্রব্য। তাই কি সে না থাকিলে থাকিত? আর গৃহ? পর গৃহে অনধিকার বাস বটে কিন্তু তাহাতে গৃহস্বামীর কি আসিয়া যাইবে। গৃহ লোকহীন থাকিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ বাস করিলে গৃহ অনেক দিন থাকে। সে ফণী বাবুর মাসী না হ'ক তাহার গৃহ রক্ষার কার্য্যই যেমন সে করিতে থাকিবে। মেহনতনার জন্য না হয় এক-বেলা এক মুঠা করিয়া ভাত খাইবে। সে বিলাসশূন্যা বিধবা, তাহার ত ইহার অপেক্ষা আর কিছু বেশী প্রয়োজন হইবে না? কাপড়, তা ধরমার বাপ ছাগল দিলে তাহারই বাচ্ছা বিক্রয় করিয়া সে কাপড়ের সংস্থান করিয়া লইবে। তারপর ফণী বাবু যদি কখনও ফিরিয়া আসে তাহাকে সমস্ত দ্রব্যাদি যথাযথ বুঝাইয়া দিয়া সে আবার গৃহহীনা হইবে। এখন কিন্তু সে গৃহহীনা হইতে রাজী নয়। ভগবান একবার গৃহচ্যুতা করিয়া যখন পুনরায় অসম্ভাবিত উপায়ে গৃহ মিলাইয়া দিয়াছেন তখন তিনিই তাহার উপায় করিয়া দিবেন।

(৪)

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। সেই নির্জ্জন বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মঞ্চোপরে লাউ, কুমড়ার গাছে অসংখ্য ফল ধরিয়াছে। আম, কাঁঠাল বৃক্ষগুলির মূলদেশে রীতিমত

জলসিঞ্চনের ফলে বৃক্ষগুলি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সাঁওতালের স্বার্থশূন্য পরিশ্রমে গৃহখানির চালে ঘন করিয়া ছাউনি হইয়াছে। ছোট ছোট ছাগ ছানা গুলির গলা ধরিয়া কাল কুচ্ কুচে সাঁওতাল বালক গুলি ক্রীড়া করিতেছে। উঠানে একটী মৃত্তিকার মঞ্চোপার বৃক্ষরূপী নারায়ণ রীতিমত সেবা প্রাপ্ত হইয়া বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন আর নিস্তারিণী বামার মা নহে। এখন সে ছেলে বুড়ো সকলকার বাঙ্গালী মাসী হইয়াছে। তার সাঁওতাল বোন পো বোন ঝিয়ে বৃহৎ অপূর্ব্ব সংসার। বেশ আনন্দেই দিন কাটিতেছিল। একদিন ধন্মার বাপ আসিয়া বলিল, "মাসী আজ সৎপথী বামুন ঘরে যাইয়ে শুনলি যে ফণী বাবুটা দু'চার দিনের মধ্যে আস্‌ছে। তোকে চিঠি দেই নি? ওঃ বাবুটা আইলে ত ঘরটা আর চিনতেই পারবেক নি। মাসী তুই ঘরটাকে যে কি করছু তা কি বলব। সৎপথীরা ত অত বড় লোক তাদের কিন্তু অমন ঘর নাই।" বামার মা'র বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা ফরমায়েস করিয়া ধন্মার বাপকে বিদায় দিয়া সে ভাবিতে বসিল। তাইত এত শীঘ্র? আর এমন সময়ে? এ যে তাহার আপনার গৃহ অপেক্ষাও তাহার এখন প্রিয় হইয়াছে। এ মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে। না তাহাকে কাটাইতেই হইবে, ফণী বাবুর আসার অপেক্ষা সে করিতে পারিবে না। কি করিয়া তাহাকে সে মুখ দেখাইবে? তাহার গৃহে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে এই শিশু অপেক্ষাও সরল সাঁওতালদের ভুলাইয়া সে যে এতদিন বাস করিয়া আসিতেছে, তাহার আসল উদ্দেশ্য সে কি করিয়া ফণী বাবুকে বুঝাইবে? কি করিয়া বুঝাইবে যে ইহাতে তাহার মনে এতটুকু পাপ ছিল না। নেহাৎ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সে এই গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। আর এ পর্য্যন্ত সে গৃহের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানই করিয়া আসিতেছে। যেখানকার যে জিনিষ সেই খানেইত আছে; তাহার কিছুইত সে হস্তক্ষেপ করে নাই। কেবল আহারীয় দ্রব্য কিছু সে লইয়াছিল তাহাও আর লইতে হয় না। কি করিয়া বুঝাইবে যে সে কাহাকেও বলে নাই যে সে গৃহস্বামীর মাসী। গৃহস্বামী তাহাকে পাঠাইয়াছে? এ কথা যে সেইখানের সরল প্রাণ সাঁওতালদের নিজের রচা কথা এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করাইবে? না আজই তাহাকে পলাইতে হইবে। একদিন যেমন আসিয়াছিল আজ তেমনই চলিয়া যাইবে।

রাত্রি হইয়া আসিতেছিল। গৃহে চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া ছাগলগুলিকে তাহাদের গৃহে পুরিয়া শিকল দিয়া তারপরে সাশ্রু নেত্রে একবার তার দ্বিতীয় বারের আশ্রয়খানির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

(৫)

জঙ্গলের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়া একখানি গরুর গাড়ী অতি মন্থর গমনে অগ্রসর হইতেছিল। গরুগুলির গলার ঘণ্টাগুলির শব্দ ও শ্রান্ত পশুগুলিকে কথঞ্চিৎ দ্রুত গমনে উৎসাহ দিবার জন্য গাড়োয়ানের সুমিষ্ট আত্মীয় সম্বোধন ভিন্ন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এমন সময় গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, "কেটা বটে, রাস্তায় কি শুয়ে থাক্‌বার যায়গা নাই কি? আমর মাগি উঠ্‌না। কল্লা ক'রে রাস্তায় প'ড়ে আছে দেখ্। গাড়ী যাচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না। গাড়ীতে বাবু আছে, জল্‌দি উঠ নাই ত চাবুক খাবি।"

"এই উঠি বাবা, বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম শুনতে পাইনি বাবা। এই উঠি। মা, মাগো আর যে পারি না মা।"

গাড়োয়ান কথিত বাবু এতক্ষণ ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন। এক্ষণে দেখিলেন যে একটি স্ত্রীলোক রাস্তা হইতে অতি কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভাবে বোধ হইল যে অনেকদূর হাঁটিয়া বেচারীর পায়ে ব্যথা হইয়াছে। সে চলিতে পারিতেছে না। তাহার পরণে ভদ্র গৃহস্থের মত কাপড় ও মস্তকে অবগুণ্ঠন। বাবুটী দ্রুত পদে অবতরণ করিয়া স্ত্রীলোকটির নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনার বোধ হয় বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি অনেক দূর

কেঁটেছেন, আপনার পায়ে যেরূপ ব্যথা হইয়াছে তাতে আপনি আর হাঁটিতে পারবেন না। যদি মনে না কিছু করেন ত গাড়ীতে উঠে বসুন।" রমণী কাঁদিয়া ফেলিল। অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কে বাবা তুমি? ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবি করুন। বাস্তবিক কথা আমি আর চলতে পারছি না।"

বাবুটী তাহাকে অতি যত্নসহকারে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। বলিলেন "আপনি বসুন। আমি হাঁটিয়াই যাইব। ষোল ক্রোশ গরুর গাড়ীতে আসিয়াছি, আর গাড়ীতে বসতে পারছি না।

রমণী। না বাবা তা কি হয় তুমিও এস। আমি এক ধারে বসে যাব' খন। তুমি শোবে এস।"

বাবু। "না মা বেশ যাব। কথা বলতে বলতে আর ক্রোশ চারেক পথ খুব চলে যাব। তোমার কোথায় বাড়ী মা? তোমাকে ভদ্র বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মত দেখ্‌ছি। এ সাঁওতালদের দেশ, একা এমন ভাবে রাস্তায় পড়েছিলে কেন?"

রমণী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বাবুটীর সহানুভূতি—পূর্ণ বাক্যাবলীতে তাহার অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গিয়াছিল; তাহার নিকট কোন কথা লুকাইতে ইচ্ছা হইল না। আর মিথ্যা সে আজন্ম কখনও বলেও নাই।

সে বলিল "আমার নাম বামার মা। নাম নিস্তারিণী। তবে বামার মা বলিয়াই লোকে ডাকে। আমরা বামুন। বাড়ী বামুনডিহা গ্রামে। মহাজনের দেনার দায়ে স্বামীর বাস্তুভিটাটুকুও যখন বিক্রী হয়ে গেল তখন পতি-পুত্রহীনা আমি গাঁ ছেড়ে জঙ্গলে চলে এলাম। তিন দিন অনাহারের পর একদিন জল খুঁজতে খুঁজতে একখানি বাড়ী দেখতে পেলুম। জনমানবশূন্য বাড়ীখানিকে ভগবানের দেওয়া আশ্রয় ভেবে তাতে বাসা নিলুম। কিন্তু বাবা পরে শুনলুম সে বাড়ী অপরের। বাবা জেনে শুনেও উপায় না পেয়ে আমি তাতেই রইলুম। তারই চাল ডাল দিয়ে পোড়া পেট ভরাতে লাগলুম। বাবা পরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আবার চুরি ক'রে তার জিনিষে এ পোড়া পেট পুরিয়েছি। শীগ্‌গির তিনি আসছেন শুনে তাঁর কাছে এ চোরের এ প্রবঞ্চকের মুখ কি করে দেখাব ভেবে পালিয়ে আসছিলুম কিন্তু আবার ভাবলুম না, ঠকিয়ে চুরি ক'রে পালিয়ে যাওয়া আরো পাপ। ভাবলুম যা শাস্তি তিনি দেন তাই মাথা পেতে নেব। তাই তাঁর কাছে সব কথা মুখোমুখি বলতে ফিরে যাচ্ছিলুম। পায়ে হাঁটতে পারলুম না, তাই শুয়ে পড়েছিলুম। বাবা সব ত শুনলে এখন কি আমাকে তোমার এ গাড়ীতে জায়গা দিতে ঘেন্না হচ্ছে না?"

বাবু। "মা সব দিক না জেনে কাউকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর দোষ গুণের বিচার করবার আমরা কে? সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ছাড়া আর কারও দোষ গুণ বিচার করবার শক্তি নেই। যে করতে যায় সে মূঢ়, অহঙ্কারী, পাপী। আর আপনি যে অবস্থায় সে গৃহ ব্যবহার করেছেন সে অবস্থায় পড়লে অতি বড় জ্ঞানীও তা করতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

রমণী। "না বাবা। আমি জেনে শুনে সে বাড়ীর মায়া ত্যাগ করতে পারিনি। সেখানকার লোকে আমাকে বাবুর মাসী ব'লে জানে; তাদের সে ভ্রম ত আমি ভাঙ্গতে চেষ্টা করিনি। বাবা আমি জ্ঞানকৃত পাপী।" বলিতে বলিতে রমণীর কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বাবুটী বলিলেন "মা তোমার চেহারায় ও কথাবার্ত্তায় ত চোরের বা প্রবঞ্চকের কোন আভাষ মাত্র পাওয়া যায় না। যাই হোক্ তুমি ভেব না। আমি সব ঠিক করে দেব। টাকায় সব হয় মা। কিছু টাকা ক্ষতি পূরণ ভাবে দিলেই সে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এখন।"

রমণী—কিন্তু এই গৃহহীনা নিরাশ্রয়ার পক্ষে এ কি কঠোর শাস্তি নয় বাবা? ভগবানের আশ্রয় ভেবে যে ঘরখানি আপনার বলে ঠিক করলুম, সেইটাই পরে জানলুম আমার নয়, অপরের। সংসারে আমার নিজের বলে কোন গৃহ নাই, আমি নিরাশ্রয়া গৃহহীনা। বাবা, আর আমি বনে জঙ্গলে যেতে পারব না। আর ক্ষিদে তেষ্টার জ্বালায় ছটফট করে বেড়াতে পারব না।

রমণী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবুটি রমণীর ঐ ক্রন্দনে বাধা দিলেন না। নীরবে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাহার গৃহের সম্মুখে প্রায় আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাহার মুখে এক প্রকার বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। রমণীটী এই সময় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দোখয়াই নামিয়া পড়িলেন ও বলিলেন "বাবা! এই আমার বাড়ী। বাকী রাতটুকু এইখানে কাটিয়ে যাও। আমি একটু মোহনভোগ তৈরী করি গিয়ে। তুমি ততক্ষণ এস, সদর ঘরে বসবে এস।" তারপর রমণী চাবি খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

বাবুটি বিমূঢ়ের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল। যেখানেই যান, যে ঘরেই যান দেখেন যেন মেঝে হইতে উপর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তক তক করিতেছে। গৃহের যাবতীয় সাজ সজ্জা বিছানা পত্র অতি সুন্দর সুসজ্জিত ভাবে যথাস্থানে রক্ষিত; যেন বাটীর গৃহস্বামীর আসিবার অপেক্ষায় সমস্তই প্রস্তুত।

মোহনভোগ তৈরী করিয়া বার দুই ডাকের পর সদর হইতে বাবুটী শোবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল আসন পাতা পরিষ্কার চকচকে থালায় মোহনভোগ সাজান ও তদপেক্ষা চকচকে গেলাসে জল।

বাবুটি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে রমণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তৎপরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"মা! এমন চোর এমন প্রবঞ্চক যে আমার কপালে মিলবে তা আর আমি জীবনে কখনও আশা করিনি। শাস্তি? তোমাকে শাস্তি দোব। হাঁ মা, তোমাকে শাস্তি দোবো। আজ থেকে তোমার শাস্তি এই পাগলা বেয়াড়া ছেলেটার সমস্ত ভারটা তোমাকে বিনা ওজরে নিতে হবে। আজ থেকে আর তুমি ফণী বাবুর মাসী নও, আজ থেকে তুমি ফণী বাবুর মা হ'লে। মাতৃহীন গৃহে আমার আজ থেকে মায়ের প্রতিষ্ঠা হ'ল।" তারপর ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বামার মা'র পায়ের ধুলা লইল।

শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু।

শিশির।

আমরা শিশির কণা,
প্রদোষে আঁধারে চুপি চুপি করি,
ধরণীতে আনাগোনা;
আলোর আভাসে আকুল পরাণে
শুকাইয়া মরি লাজে।
জগতের তৃষা হরণে আমরা
আসি নাক কোন কাজে;
ক্ষণিকের মোরা ক্ষীণ পরমায়ু
বিকলতা ভরা প্রাণ
তবু যতটুকু যাহা পারি হায়
ধরণীরে করি দান।

শ্রীনলিনী নাথ দে।

পেঁপের চাষ

বাঙ্গলা দেশে কেবল পেঁপের বীজগুলি অযত্নেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, দৈবগতিকে যদি চারা বাহির হয়, বাড়ীর মহিলাগণ সেইটাকে যত্ন করিয়া যদি গাছ তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলে কিছু কিছু ফল হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে প্রচুর জমী জায়গা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহাতে পেঁপে ও আতার চাষ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

আজকালিকার বাজারে পেঁপে, আঁতা, আনারস, শশা, পেয়ারার যেরূপ দাম তাতে মাঠের ধানচাষ অপেক্ষাও লোকে এই সকল ফলের চাষকে অধিকতর লাভজনক মনে করে। একটা বড় রকমের পেঁপে কলিকাতা সহরে ।/০ ।৵০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, আনারস ১টা সময় সময় ৸০ ১৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, শশা দুই পয়সায় একটা পেয়ারা ৵০ জোড়া বিক্রয় হয়।

পেঁপের চাষ করিতে হইলে যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে সেই জমীকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটী ভাঙ্গিয়া বেশ চুর করিতে হয়। তাহার পর পাতলা করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়, বীজের উপর খুব পুরু মাটী দিয়া বীজ চাপা দিবার আবশ্যক নাই, উপরে সামান্য মাটী চাপা দিয়া তারপর তাহাতে সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহার পর ইহার চারা যখন ৪।৫ অঙ্গুলী বড় হয়, তখন খুব সাবধানে গোড়ার যথেষ্ট মাটীসমেত এমন ভাবে চারা তুলিতে হয় যেন চারার গায়ে সামান্য আঘাত না লাগে বা শিকড় না কাটিয়া যায়। যে স্থানে ঐ চারা রোপন করিতে হইবে, তাহা খুব গভীর গর্ত্ত না করিয়া সামান্য গর্ত্ত করিয়া চারা পুতিতে হয়; পরে জল সিঞ্চন করিতে হয় এবং এইরূপে গাছ বাড়িতে থাকে। এই সময় গাছের গোড়ার আগাছাগুলি নিড়াইয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছের গোড়ায় জল বসিলেই গাছ মরিয়া যায়, সুতরাং গোড়ায় মাটী দিয়া এমন উঁচু করিয়া দিতে হয়, যেন গোড়ায় জল জমিতে না পারে।

পেঁপে গাছ দুই প্রকারের—স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয়। পুরুষ জাতীয় গাছে কেবল ফুল হয় ফল হয় না। ইহাদিগকে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছে প্রচুর জল দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। পেঁপের চাষে এই সামান্য কাজ মাত্র। গাছ বড় হইয়া যাইলে ইহার দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলেও গাছ অনেক দিন জীবিত থাকে এবং ফল প্রদান করিতে থাকে। পেঁপে কাঁচা পাকা দুই বিক্রয় হইয়া থাকে, সুতরাং লাভ হিসাবেও পেঁপের চাষ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাড়ীর আশে পাশে পড়া জমীগুলিতে চারিধারে কার্পাসের গাছ লাগাইয়া দাও, মধ্যে পেঁপে, আনারস, আতা প্রভৃতি লাগাও—বিক্রয় হইয়াও দু'পয়সা হইবে, খাইয়াও বাঁচিবে ও প্রচুর তুলা জন্মিবে।

কাজের লোক।

লবণ।

আমেরিকার ডাঃ কেলগ (Dr. N H Kellag) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানা মাসিক পত্রিকায় ভারতে লবণ ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। বহুদিন যাবৎ দেখা গিয়াছে যে ল্যাপলণ্ডের ইস্কুইমো এবং মেরু প্রদেশের অন্যান্য লোক লবণ ব্যবহার করেন। ইহার কারণ ঐ সকল জাতীয় লোক মাংস খাইয়াই জীবন যাপন করে, বিশেষতঃ অত্যন্ত শীত বিধায় তাহাদের চর্ম্মের কার্য্য মোটেই হয় না। সেজন্য শরীর হইতে ঘাম বাহির না হওয়ায় শরীরের লবণও কম হয় না। অন্যান্য শীতপ্রধান দেশেও লবণ কম ব্যবহারের ইহাই কারণ। বর্ত্তমানে অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে মানবের খাদ্যে অতি সামান্য লবণেরই প্রয়োজন। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে যে লবণ আছে তাহাই আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আচার্ড (Achard) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে আমাদের দৈনিক অর্দ্ধ গ্রাম লবণ হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু আমরা অনেকেই ইহার ৮।১০ গুণ বেশী লবণ খাইয়া থাকি। সাধারণ খাদ্যবস্তুতে যে আছে তাহাই আমাদের দ্বিগুণ। কাজেই লবণ ভিন্নভাবে খাইবার প্রয়োজন নাই। লবণ সাধারণতঃ কোন উত্তেজনা করে না বলিয়াই আমরা লবণ ভিন্নভাবে খাইয়া সামাল দিতে পারি, কিন্তু ইহার মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে ইহা পাকস্থলী, মূত্রযন্ত্র এবং খুব সম্ভব অন্যান্য যন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশের নিরমিষ ভোজী যদিও অতিরিক্ত লবণ সেবন করিয়া থাকে কিন্তু তথায় ঘাম অধিক হয় বলিয়া তাহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না। শীতকালে ঘাম না হওয়াতে পিপাসা কম হইয়া থাকে, সেজন্য কোন কোন মানুষ বহুদিন জল না খাইয়া থাকিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় মরুভূমির অধিবাসীরা বহুদিন জল পান না। ঘর্ম্মের সহিত শরীরের অতিরিক্ত লবণ বাহির হওয়ার জন্য দৈনিক অন্ততঃ ৫।৬ গ্লাস জল খাওয়া উচিত। সৌরভ—আশ্বিন।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

আমেরিকায় তিন জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি একশত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিয়া সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা তিনজনেই দীর্ঘজীবনপ্রয়াসী দিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—(১) যে ব্যক্তি একশত বৎসর পরমায়ুর পূর্ব্বে মারা যায়, সে তাহার নিজের দোষেই মারা যায় ; (২) কদাচ মাংস খাইবে না (৩) যত পার দুগ্ধ খাইবে (৪) ভোজনের পর ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম করিবে (৫) দশ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাইবে (৬) জল বায়ুর অবস্থা ভাল থাকিলে গৃহের বারন্দায় শয়ন করিবে (৭) ধূমপান করিবে না (৮) কোন রূপ নেশার জিনিষ খাইবে না (৯) ইজি চেয়ারে বসিবে না কিম্বা বিনা কাজে কদাচ বসিয়া থাকিবে না (১০) অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিবে না।

বিকাশ, আশ্বিন ১৩২৯।

প্রাচীন ভারতে 'গোষ্ঠীবিহার'।

প্রাচীন ভারত যখন উন্নতিশীল ছিল, আদর্শ ছিল তখন তাহাতেও সংহতশক্তির একটা দিব্য বিকাশ দেখতে পাই। প্রাচীন ভারতে লোকে 'গোষ্ঠীবিহার' করিত। নগরবাসীদের সকল কাজের মধ্যে গোষ্ঠীতে যাওয়া একটা কাজ ছিল ; তা আবার যখন তখন নয়—প্রত্যহ। সহরের লোকের দেখাদেখি গ্রামের লোকেরাও গোষ্ঠী তৈয়ারী করিতে ছাড়ে নাই। এই সমস্ত গোষ্ঠীর উপর নজর রাখিতেন ঋষিরা। দরকার মত দু'চারটা কঠোর নীতিও তাঁহারা চালাইতেন। ঋগ্বেদের যুগে ঠিক এই রকমই একটা অনুষ্ঠান ছিল। তাহাকে 'গোষ্ঠী' না বলিয়া 'সভা' বলা হইত। সভায় অনেক কাজের কথা হইত। গরু ও চাষের উন্নতি লইয়া আলোচনা হইত। পাশা খেলাও হইত। বাজী রাখিয়া খেলাও চলিত। সভায়

খেলোয়াড়দের মধ্যে এই রকম খেলায় অনেকে ফতুরও হইত। তবে যারা পাশা খেলিত তাহাদের উপর লোকে খুসী ছিল না। সভায় তর্কযুদ্ধ হইত—কবির লড়াই হইত। মাঝে মাঝে কাব্যকলার আলোচনার জন্য অধিবেশনও হইত। রচনাকুশল তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কারও দেওয়া হইত। ইহাদেরই নাম হইত সভ্য। এই সভাগুলি দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সময় সময় বিচারালয়ের কাজও হইত। ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজরক্ষার কাজও হইত। রাস্তা ঘাট তৈরী করা, এগুলি যাহাতে খারাপ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা, এই সভার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। নগরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও অসুবিধা নিবারণের জন্য সভার চেষ্টা বড় কম ছিল না। নগরে বা গ্রামে খানা ডোবা, যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার জন্য এই সকল সভায় আলোচনা হইত। নগরের জল নিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত। এই সভাই পরযুগে 'সমাজে' পরিণত হয়। নাম পৃথক হইলেও ইহার কাজও সভার অনুরূপ ছিল। সমাজও এই রকম দেশের উন্নতিবিধায়ক ছিল।

আজকাল আমাদের দেশের যুবকেরা 'ক্লাব' করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন ইহাও পাশ্চাত্য আধুনিক প্রথা। এই সব ক্লাবে গিয়া যুবকেরা নানা রকম আমোদ প্রমোদও করিয়া থাকেন। আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দেশের ও দশের কাজের কথাও হয়। ভাল ভাল প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ক্লাবই সহরে বা গ্রামে গঠন করিয়া যদি পাড়ায় পাড়ায় এক বা ততোধিক স্থাপন করা যায় এবং তাহাতে অন্ততঃ সেই সেই পাড়ার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহা হইলে এই ক্লাবের দ্বারাই প্রাচীন ভারতে 'গোষ্ঠীর' কাজ অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন।

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ।

পাঠ দান প্রণালী।

শিশুগণ এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারে না। এজন্য কোন পাঠই সুদীর্ঘ হওয়া উচিত নহে। কোন পাঠই অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কাল হওয়া অবিধেয়। সচরাচর কুড়ি মিনিট পাঠ দিলেই ভাল হয়।

কোন পাঠ অতীব দীর্ঘ বা বিরক্তিজনক হইয়াছে, মনে হইলে শিক্ষক মহাশয় অন্য উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। শিক্ষার্থিগণকে দাঁড়াইতে, গান করিতে বা কয়েক মিনিটের জন্য অঙ্গসঞ্চালন করিতে বলিতে পারেন। ইহাতে তাহার মনের বা শরীরের জড়তা দূরীভূত হয়।

এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোনরূপ শরীর সঞ্চালন করিতে দেওয়া ভাল। অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম দিলেও ক্ষতি নাই। ইহাতে শিক্ষার্থীগণের উৎসাহ ও মনোযোগ বর্দ্ধিত হয়। সহসা কোন পাঠের শেষ হওয়া উচিত নহে। পুনরালোচনা দ্বারা শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, পাঠ সমাপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে।

পরবর্ত্তী পাঠের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের সম্বন্ধ থাকা বিহিত। সম্পূর্ণ নূতন পাঠে অল্পবয়স্ক শিশুগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত বা মন আকৃষ্ট করিতে পারা যায় না। একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, আপেক্ষিক জ্ঞান যেরূপ স্থায়ী, স্পষ্ট ও সহজভাবে আয়ত্ত হয়, নিরপেক্ষ জ্ঞান স্থায়ী নহে এবং স্পষ্ট বা সহজে আয়ত্ত হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার সময় শিক্ষার্থিগণের যেরূপ উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি ও মনোযোগ লক্ষিত হয় বেলা অবসানে বা কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তাহাদের আর সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মন ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য গণিতের ন্যায় দুরূহ বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নই উপযুক্ত সময়; ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য পরবর্ত্তী কোন সময় নির্দ্দেশ করিলে ক্ষতি নাই।

শিক্ষক। অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

শ্রীযুক্ত অশোক কুমার সেন এম্, এ, বি টি।

জেনা বিশ্ববিদ্যালয়।

জর্ম্মাণীর জেনা সহরের নাম ভুবনবিখ্যাত। ইহারই সান্নিধ্যে নেপোলিয়ন সম্মিলিত য়ুরোপীয় শক্তি সমূহের বাহিনীকে রণে পরাস্ত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং ম্যা রেঙ্গো ও অষ্টারলিজের ন্যায় জেনাও নেপোলিয়নের কীর্ত্তির নিদর্শন।

জেনার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে Jhon Frederich the Magnanimous (মহানুভব জন ফ্রেডরিক) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি আজিও জেনার বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের দিন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক ও কবি Goethe (গেটে) ইহার পরিচালক এবং ফিকটে, স্কেলিং, হেগেল, শিলার প্রভৃতি দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ ইহার আচার্য্য পদে বরিত হয়েন। জর্ম্মাণ Evolution Theoryর (বিবর্ত্তনবাদের) আবিষ্কর্ত্তা Ernest Haeckel (আর্ণেষ্ট হেকেল) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া জীবনব্যাপী গবেষণা করিয়াছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮০০ ছাত্র এবং নিম্নলিখিত বিভাগ আছে:—

(১) দর্শন (২) পুরাতত্ত্ব (৩) আবহাওয়া তত্ত্ব (৪) ভূমিকম্পাদি তত্ত্ব (৫) জ্যোতিষ (৬) পদার্থ বিদ্যা (৭) রসায়ন (৮) ব্যবহারিক পদার্থ বিদ্যা (৯) ব্যবহারিক রসায়ন (১০) ভেষজ বিদ্যা (১১) আহার্য্য বিশ্লেষক রসায়ন (১২) আণুবীক্ষনিক বিদ্যা (১৩) খনিজ বিদ্যা (১৪) প্রাণিতত্ত্ব (১৫) উদ্ভিদ বিদ্যা (১৬) বক্তৃতা বিদ্যা (১৭) কৃষি বিদ্যা (১৮) পশুচিকিৎসা বিদ্যা (১৯) শারীর বিদ্যা (২০) ভেষজপ্রকরণ বিদ্যা (২১) স্বাস্থ্যতত্ত্ব (২২) নিদান (২৩) বক্তৃ বিদ্যা (২৪) ব্যবহারিক দৃষ্টি বিজ্ঞান।

প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বলিতে কি সারা জেনা সহরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যে হোটেলে আছি, সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আচার্য্য ও অধ্যাপকদের দাবার আড্ডা বসে এবং দাবা খেলার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়। ইহাতে পৃথিবীর কত যে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ হয় তাহা বলা যায় না। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি ভট্টাচার্য্য পল্লীতেও এমনি ভাবে ন্যায় দর্শন স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে নানা চর্চ্চা হইত। তবে প্রভেদ এই আমাদের গ্রামের পণ্ডিতরা অতীত জ্ঞান লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন, আর জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা প্রকৃতির নানা খেলার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা গবেষণার ধারাকে বহির্মুখী করিয়া সদা নূতন পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী।

ছাত্রগণ পাঠের কাল ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যায়াম ক্রীড়া ও নৃত্যগীতাদিতে যৌবনের বৃত্তিনিচয়ের সম্যক স্ফুরণ হইবার অবসর দেয়। সকালে সন্ধ্যায় তাহারা দলে দলে পথে গান করিয়া বেড়ায়। উহাদের খেলিবার ও ব্যায়াম করিবার নিমিত্ত Saele (সেয়েল) নদীতটে প্রায় ১ মাইল ব্যাপী ক্রীড়াভূমি আছে; পরন্ত Saele নদীতে বাচ খেলিবার জন্য ছোট ছোট ডিঙ্গী ও পানসী আছে।

বসুমতী, কার্ত্তিক ১৩২৯ — শ্রীফণীন্দ্র নাথ ঘোষ।

সামাজিক একতার উপায়।

সমাজে সকল পার্থক্য দূর করে ধনী নির্ধনের সামঞ্জস্য, ভদ্র ইতরের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। এখনও হিন্দুর কাছে হিন্দুর ধর্ম্মই ধর্ম্ম; ইসলাম অধর্ম্ম। মুসলমানের কাছে ইসলামই ধর্ম্ম; হিন্দু অধর্ম্ম। এই প্রভেদ ঘুচাতে হবে। হিন্দুকে ইসলাম নিতে হবে, মুসলমানকে হিন্দু হতে হবে। তবেই যথার্থ একতা হবে।

কোনও জন বুল (J. B.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে জানবো অমুক ভদ্রলোক (Gentleman) কি না?" আমেরিকার কবি তার উত্তর করলেন:—

"Think him so, J. B"

সকলেই ভদ্র মেনে নিতে হবে। তবে ভদ্র ইতর প্রভেদ চলে যাবে। পরস্পরের মধ্যে Think him so নিয়মটা চালাতে হবে। কে ইতর বাঙ্গলা দেশে? যদি তুমি কাউকে ইতর ভাব তাহ'লে তোমার মধ্যে ইতরতা আছে। এই ইতর জ্ঞান চলে গেলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান চলবে। ইতর শ্রেণী যাদের বলা হয় তাদের যদি ভদ্র বলে গণ্য করতে পারি তবে তাদের সঙ্গে চলাফেরা, তাদের সঙ্গে বসবাস, তাদের সঙ্গে আদান প্রদান সবই সহজ হয়ে উঠে। প্রকৃত জাতীয় একতা আসবে না যতদিন এই প্রভেদ না ঘুচবে। ধনী নির্ধনের প্রভেদও না ঘুচালে জাতীয় একতা আসবে না।

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ।

হিন্দু সমাজে বিবাহ বন্ধন ছেদ প্রথা।

কৌটিল্যের সময় হিন্দু সমাজে বিবাহ-বন্ধনছেদ বা Divorce প্রথার প্রচলন ছিল। কৌটিল্য কোন্ কোন্ সময় বিবাহবন্ধন ছেদন করা যাইতে পারে ও কোন্ কোন্ বিবাহই বা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে তাহা তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়, তবেই বিবাহবন্ধন ছেদন করা যাইতে পারে—নতুবা নহে। স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করেন বলিয়া তিনি স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধন ছেদন করিতে পারেন না। আবার পক্ষান্তরে স্বামীও স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারেন না। কেবল মাত্র যখন উভয় পক্ষের মত হয় তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। তবে যদি কোন স্বামী তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কা করেন, তবে তিনি বিবাহের সময় স্ত্রী যে যৌতুক পাইয়াছিলেন সেই যৌতুক স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিয়া স্ত্রীর সহিত সব সম্বন্ধ চুকাইতে পারেন। অন্য পক্ষে স্ত্রী ও যদি স্বামীর নিকট হইতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন, তবে তিনি তাঁহার যৌতুকের দাবী ত্যাগ করিয়া স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন।" (অর্থশাস্ত্র, শ্যাম শাস্ত্রী অনুদিত, ১৯৮ পৃঃ)। কৌটিল্যের মতে "ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব ও আর্ষ বিবাহ কখন ছিন্ন হয় না।" যাহা হউক কৌটিল্যের বিবাহ ছেদনের আইনগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে এই সময়ে পুরুষেরা রমণী জাতির উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। এই সময়ে স্বামী স্ত্রী জীবনসংগ্রামে সমাংশভাগী (Uqual partners) ছিলেন, মনুসংহিতা দাম্পত্য বন্ধন ছেদন (Divorce) প্রচারে তেমন কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে মনে হয়, সংহিতার যুগে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বেশ একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের সময় পুরুষ যেমন স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারিতেন, স্ত্রীও কেবল তেমনি যে স্বামী ত্যাগ করিতে পারিতেন তাহা নহে, স্বামী দ্বেষপরায়ণ হইয়া যদি স্ত্রীর চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিতেন তবে তাহার গুরুদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। (অর্থ শাস্ত্র, ঐ, ১৯৭ পৃঃ)

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

সুবর্ণ-বণিক সমাচার। ভাদ্র ১৩২৯।

পুরাণ বাঙলার দু' একটী কথা।

১৮০০।০১ খৃষ্টাব্দে বাঙলার আমদানী রপ্তানীর তালিকা এইরূপ:—

আমদানি—	(সিক্কা)
বিলাত হইতে মাল	৪১ লক্ষ টাকা।
আর সোণা রূপাদি	৪ ঐ
	মোট—৪৫ লক্ষ টাকা।

রপ্তানি।

মাল	৮৫ লক্ষ টাকা।
আর সোণা রূপাদি	—
	মোট ৮৫ লক্ষ টাকা।

এইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের ব্যবসা মোট হিসাব করিলে দেখা যায় বাঙ্গলায় তখন ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকার মাল ও ৭৩॥০ লক্ষ টাকার সোণা রূপাদি আসিত; আর এখান হইতে দুই কোটী আশী লক্ষ টাকার মাল যাইত; নগদ বা সোণা রূপা এক কাণা কড়িও যাইত না।

সে সময়কার লোক সংখ্যা—কলিকাতার পাঁচ লক্ষ, ঢাকার দু লক্ষ, মুর্শিদাবাদে দেড় লক্ষ, বর্দ্ধমানে ৫৩৯০০, চন্দননগরে ৪১৩৭৭, পূর্ণিয়ায় ৩৩০০০, দিনাজপুরে ২৮০০০, নারায়ণগঞ্জে ২০০০০, মালদহে ১৮০০০, গৌড়ে ১৮০০০, চন্দ্রকোণায় ১৮১৪৫। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে ১০০।১৫০ জন লোক ছিল।

সেকালের হাতের লেখার দাম আজকালকার ছাপার অপেক্ষা কম ছিল। এক টাকায় ৩২ হাজার অক্ষর লেখা হইত; হাতে লেখা মহাভারত ষাট টাকায়, রামায়ণ চব্বিশ টাকায় ও শ্রীমদ্ভাগবত আঠার টাকায় পাওয়া যাইত। তখন লোকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমাজের হিতকর কার্য্যে নিজের ও বংশের মর্য্যাদা বাড়াইতে চাহিত, আজকালকার মত কেবল নিজের সুখের জন্য পাগল হইত না। পিতা মাতার শ্রাদ্ধে তখন দান ধ্যান ও ভুরি ভোজনে লোক নিজের ওজন ছাপাইয়া কার্য্য করিত। তাহারা তখন মনে করিত এই স্বর্গের সিঁড়ি। ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনাদির কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। তখনকার অনেক বড় লোকেরা লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও উইলে তাহা করিবার কথা বলিয়া যাইতেন; তাহাতে তখন চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হইত; আদালতের হিসাবে তাহা দেখা যায়। তখন শাস্ত্রাদি আজকালকার মত ছাপাইয়া সাধারণের পাঠোপযোগী করা বড়ই পাপ বলিয়া লোকে মনে করিত। কারণ উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির হাতে তাহা না পড়িলে ধর্ম্মের যথার্থ উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। তাই তখন লোকেরা উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক শাস্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়া ধর্ম্ম মনে করিত ও তাহাতেই শাস্ত্রচর্চ্চা ও বহুতর অধ্যাপক পণ্ডিতের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

রায় প্রমথ নাথ মল্লিক বাহাদুর ভারত ভূষণ।

সুবর্ণ-বণিক সমাচার। ভাদ্র, ১৩২৯।

বিস্মৃতির সাধনা।*
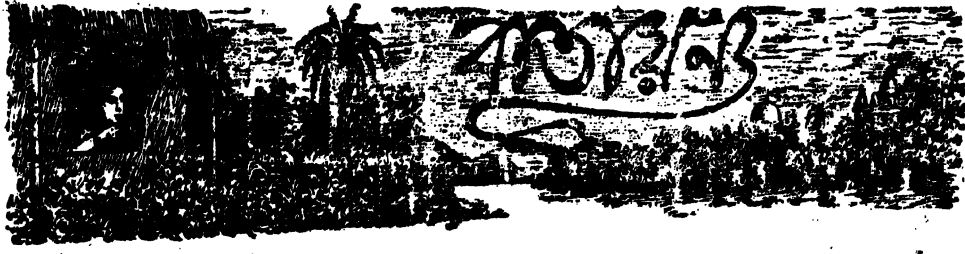
আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী আমরা বিস্মৃতির সাধনায় চিরভ্রান্ত; সুতরাং আমাদের অনেকের কাছেই এই সাধনার সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব জগতে স্মৃতির ন্যায় বিস্মৃতিরও একটা উপকারিতা আছে। কোন কোন সময় বিস্মৃতিও মানবের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। দুঃখ গ্লানি, শোক বিষাদ, লাঞ্ছনা বেদনা, পরাজয় পদস্খলন প্রভৃতির স্মৃতি সুখের নহে, কাম্য নহে। জীবন গ্রন্থখানির অতীত অধ্যায় হইতে যদি আমরা এই ক্লেশদায়ক স্মৃতির মসীলিপ্ত পাতাগুলি একে একে নিঃশেষে ছিন্ন করিতে পারিতাম—বিস্মৃতির সহায়তায় জীবনটাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে আজিকার এই দুর্ব্বহ জীবন কত সুখের কত না আনন্দের হইত? কিন্তু সত্যই কি তাহা আমরা করিতে পারিব না? চেষ্টা করিলে আজ হইতে কি আমরা জীবনের নব পর্য্যায় রচনা করিতে পারি না? বিস্মৃতির সংযত সাধনায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিবলে আমরা সে অসাধ্য সাধন করিতে পারি বই কি। সকল সাধনার ন্যায় বিস্মৃতির সাধনারও একটা পদ্ধতি আছে, ক্রম আছে, বিধি নিষেধ আছে। যত্ন করিয়া সেইগুলি শিখিয়া জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারিলে আমরা এই সাধনারও সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। কেমন করিয়া সেই সিদ্ধি লাভ সম্ভব তাহাই আজ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্মৃতির বিলোপের নামই বিস্মৃতি। আমাদের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানই স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হয়; সুতরাং স্মৃতি মাত্রই অতীত বিষয়ের অনুভূতসাপেক্ষ। যাহা এক সময় অনুভব করা গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার আলোচনাজনিত যে প্রয়াস তাহার ফলেই স্মৃতির উদ্ভব। অতীত যাহার সুখময়, শান্তিময় ও শোভাময়, স্মৃতিও তাহার সুখ, শান্তি ও শোভার আধার। এরূপ স্মৃতি জীবনেরও সুখ স্বস্তি ও শান্তি বিধান করে। কিন্তু যেখানে তদ্বিপরীত, সেখানে বর্ত্তমানে তাহার পুনরভিনয় জীবনে উৎপীড়ন মাত্র। সুতরাং সেরূপ স্মৃতিরবিলোপ সাধনাই একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ভুলিতে চাহিলেই ত ভুলিয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। ভুলিতে হইলে চিন্তার ধারাকে বিপরীতমুখে প্রধাবিত করিতে পারা চাই—সৎপ্রসঙ্গ, সদনুষ্ঠান বা সৎচিন্তার দ্বারা সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়জ্ঞানের বিলোপ করিতে হয়। এই অবস্থায় মনের বল একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অভ্যাসের ফলে এই বল লাভ হয়—ভুলিবারও শক্তি সঞ্চয় ঘটে।

সকলেই জানেন চিন্তাই আমাদের কর্ম্মের প্রসূতি; আর এই চিন্তার ন্যায় শক্তি কেহই ধারণ করেন না। সৎ চিন্তা যেমন সৎকর্ম্ম ও সুফল প্রসব করে, অসৎ চিন্তা তেমনই কুকর্ম্ম ও কুফল সৃষ্টি করে। আমরা মনে মনে যাহা ভাবি, ভাবনার একাগ্রতার তারতম্যে ন্যূনাধিক তাহাই আমরা কার্য্যতঃ কখন না কখন করিয়া কি। এক একটা চিন্তা বা ভাবনা এক একটি সংহত শক্তি বিশেষ; ভাবুকের সদসৎ বিচার হিসাবে সেই শক্তি ভাল

*Life and Liorht গ্রন্থ মালার Thought force গ্রন্থের the art of forgetting প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মন্দ ফল প্রসব করিয়া থাকে। আবার চিন্তার সংক্রমণ-শক্তি আছে বলিয়া একজনের চিন্তা শুধু তাহার নিজের নয়, অপরেরও ভাল মন্দ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বস্তু সংযোগে যেমন সম্পূর্ণ বিচিত্র নূতন কোনও বস্তুর উৎপত্তি ঘটে, তেমনই বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চিন্তার সংমিশ্রণে অভিনব চিন্তা আকার ধারণ করিয়া থাকে।

বিস্মৃতির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে মোটামুটি এই তত্ত্বটুকু মনে রাখিয়া সাধনপথে চলিতে হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" এই সত্যটুকুর মধ্যে যে চিন্তার কি অপূর্ব্ব রহস্য নিহিত আছে তাহা সব সময় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চিন্তার প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োগপ্রণালী অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধির ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। অতি যেমন চিন্তা করিব তাদৃশ ফল লাভ যদি অবশ্যম্ভাবী তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে কুচিন্তার আক্রমণ হইতে আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই আত্মরক্ষার পথে বিস্মৃতি সাধনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সারাদিনের মাঝে আমরা এমন অনেক রকমের চিন্তা করিয়া থাকি, যাহা চিন্তা না করাই উচিত; এখন এই শ্রেণীর চিন্তার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেগুলিকে রোধ করিতে হইবে—অন্ততঃ মনে উদয় হওয়া মাত্রই যাহাতে সৎচিন্তার দ্বারা সেই অকল্যাণকর চিন্তার বিকাশ প্রতিহত হয়, সেই চেষ্টায় একাগ্রমনে ব্রতী হইতে হইবে। প্রথম প্রথম ইচ্ছাশক্তির অভাবে বা অনভ্যাসের ফলে এই চেষ্টা ফলবতী হইতে না পারে; কিন্তু এই যে প্রতিরোধ প্রয়াসে বিপরীত শক্তি নিয়োগ, এ শক্তি কখনও ব্যর্থ হইবে না—আজ হউক, কাল হউক, দুদিন পরেই হউক, প্রয়াস জাগাইয়া রাখিতে পারিলে সুফল ফলিবেই।

সুতরাং দেখা গেল, বিস্মৃতির সাধনার প্রথম ও প্রধান উপকরণ চিন্তা; এবং দ্বিতীয় উপকরণ সেই চিন্তা প্রয়োগের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা মনের বল। প্রত্যেক মানবের মনের এক একটা বিশিষ্টতা, চিন্তার এক একটা ধারা আছে। সাধারণতঃ অজ্ঞাতভাবে সে এই বিশিষ্টতা ও ধারা বজায় রাখিয়া চলে; এই বৈশিষ্ট ও ধারা যে রকম শিক্ষারই ফল হউক তাহা পলকে পরিবর্তিত হয় না। সাধারণতঃ মানবের মনে অশুভকর চিন্তারই উদ্রেক হইয়া থাকে। শোক, নৈরাশ্য, ভীতি, দুঃখ, অবসাদ ও বিফলতা প্রভৃতির মধ্যে চিন্তার একটা ধ্বংস-করী শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তির বিনিময়ে সৃজনকরী শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে তবেই অবস্থান্তর ঘটাইতে পারা যায়। সৃজনকরী শক্তিসাধনায় সর্ব্বাগ্রে আমাদের চরিত্রে কোন্ কোন্ সদ্গুণের অভাব বিদ্যমান, তাহারই অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পর সেই সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত চাই তীব্র আকাঙ্খা, প্রবল পিপাসা উৎকট অভিলাষ আর—চাই সুস্থ ও সবল দেহ এবং স্বচ্ছ ও সতেজ মন। এই যে অভাব পূরণের নিমিত্ত অবিরাম প্রয়াস, এই প্রয়াসের ফলেই সেই সেই শক্তির উদ্বোধন, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। বলা বাহুল্য এই প্রয়াস অসৎ-প্রবৃত্তিজাত গুণ সমূহ বিস্মৃত হইবার সাধনারই নামান্তর মাত্র। ভুলিতে চাহিলেই ভুলিতে পারা অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে। বহুদিনের অভ্যাস সংস্কারে পরিণত হয়; এবং এই সংস্কার শুভাশুভ কর্ম্মের নিয়ামক হইয়া উঠে। একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই সে সংস্কারের বিনাশ করিতে পারা যায়।

বিস্মৃতির সহায়তায় আমরা দৈহিক স্বাস্থ্য শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারি। এই শ্রেণীর অভাবের নিমিত্ত ব্যর্থ হা হুতাশ না করিয়া, গতজীবনের অভাবের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া আমরা এখন হইতে যদি নিত্যনিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য শক্তি ও সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্খা করি তাহা হইলে আমাদের সেই আকাঙ্খাজাত কর্ম্মের ফল এই সমস্ত লাভ সুনিশ্চিত। চিন্তার প্রকৃতি অনুসারেই আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নির্দিষ্ট হয়। আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য শক্তি বা সৌন্দর্য্য এই মানসিক স্বাস্থ্যের উপর পূর্ণ-মাত্রায় নির্ভর করিয়া থাকে। চিন্তাই আমাদের দেহের ভাব ভঙ্গী, আকার প্রকার ও চাল চলন, নিয়মিত করে। দেহের প্রত্যেক মাংসপেশীর গঠনে চিন্তার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। একজন সংযতপ্রকৃতির চাল চলনে

সহিত একজন উচ্ছৃঙ্খল অসংযমীর চাল চলন তুলনা করিলে দেহের উপর চিন্তার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। চিন্তার এই প্রভাব বশতই সুদক্ষ অভিনেতা রঙ্গালয়ে আপন ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া কৃত্রিম হইলেও স্বভাবের এরূপ অকৃত্রিম অনুসরণ করিতে পারেন। আসল কথা, দেহের অস্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যহানি বা শক্তিহীনতা আমাদেরই অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত চিন্তা সমূহের অসদ্ব্যবহারের পরিণাম মাত্র। সুতরাং ইচ্ছা করিলে হিতকর চিন্তা প্রয়োগে আমরা সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারি। এই প্রকার হিতকর চিন্তার মধ্যে জগতের নিমিত্ত সুখ, স্বাস্থ্য ও শান্তি কামনা অন্যতম। এই জাগতিক কল্যাণ কামনার ফলে যে শক্তিবলে নিরন্তর জগতের সুখ, স্বাস্থ্য ও শান্তি সাধিত হইতেছে তাহার উদ্বোধন করা হয়; এবং আমরা প্রত্যেকে সেই শক্তির অংশ বলিয়া আমাদেরও তাহা লাভ করা সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শোক দুঃখ, বিরক্তি অবসাদ পরাজয় পদস্খলন প্রভৃতির স্মৃতি সুখের নহে, কাম্য নহে এরূপ স্মৃতি যতই বিস্মৃত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। তা'ছাড়া এরূপ স্মৃতির কোনই সার্থকতা নাই। বন্ধু বা স্বজন বিয়োগজনিত শোকের প্রত্যক্ষ পরিণাম দেহ মনের দুর্ব্বলতা। আবার শুধু তাহা নহে; এই বিয়োগজনিত শোকের ফলে পরলোকগত আত্মা যে লোকে বা যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমাদের দুঃখে বিচলিত হন এবং তাঁহার শান্তির অন্তরায় সাধিত হয়। ক্রোধ, ঘৃণা ভয়, মানসিক উদ্বেগ, চিত্তচাঞ্চল্য ও অধৈর্য্য বশতঃ আমাদের মাত্র অযথা শক্তিক্ষয় ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যাপারে আমরা যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ ও লাভজনক হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তের চুম্বকের ন্যায় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে; যে চিন্তা বা বিষয়ের প্রতি ইহা স্বভাবতঃ প্রধাবিত হয়, সাধারণতঃ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই হেতু ক্রোধ, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির একবার উদ্রেক হইলে ক্রমশঃ তাহা বাড়িতে থাকে। এই অবস্থায় যদি অনুরাগ, প্রেম, সাহস প্রভৃতি বিপরীত প্রবৃত্তির অনুশীলনে তাহা দমন না করা যায়, তাহা হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। সুখের বিষয় এই প্রকার অনুশীলনে অসৎ প্রবৃত্তির মূলচ্ছেদ করিতে পারা যায় এবং একবার সে শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে উত্তরোত্তর তাহা বাড়ে বই কমে না।

বিস্মৃতির অনুশীলনে চিন্তাও যেমন অপরিহার্য্য চিন্তাসংযমও তেমনি অত্যাবশ্যক। চিন্তার সংযম আজ কাল আমরা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি বলিলেও চলে। বিভিন্ন চিন্তাতরঙ্গমালার মধ্যে স্রোতের শৈবালের ন্যায় আমাদের মনটাকে অবাধে আমরা ছাড়িয়া দিয়া থাকি। আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত এই হেতু অশেষ বিষয়-রাজির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে চিত্তের সাম্য অবস্থা রক্ষা করিতে না পারিলে চিত্তসংযম দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যে চিন্তা আমাদের অশান্তির কারণ এই কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারি না। ফলে মানসিক যাতনাই অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় সেরূপ অস্বস্তিজনক চিন্তাকে কোনও মতে হৃদয়ে স্থান দিব না এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে অভ্যাসবশে চিত্তসংযমের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবলও বৃদ্ধি পায়। চিত্তের শক্তির অপব্যবহার ব্যতীত বিশ্বে পাপ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। এই অপব্যবহারের ফলেই আমরা ব্যাধি, অর্থাভাব, চিত্তের অপ্রসন্নতা, বন্ধুহানি প্রভৃতি ঘটাইয়া থাকি। কামিনী বা কাঞ্চনে অনুরাগই পাপের সৃষ্টি করে না—তাহাদের সৃষ্টির মধ্যে যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের সংসর্গে চিত্তশক্তির অপব্যবহার করি বলিয়াই আমাদের পাপে জড়িত হইতে হয়। চিন্তাসংযমে অভ্যস্ত হইলে আমাদিগকে সময়ে সময়ে মনটাকে একবারে চিন্তাবিহীন করিতে হইবে। চিত্তকে মাঝে মাঝে সর্ব্বতোভাবে চিন্তামুক্ত করিতে পারিলে চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পায় এবং এই বিশ্রামের ফলে তাহার শক্তি শতগুণ বাড়িয়া উঠে। কোন একটা বিষয় কি করিব বা না করিব নিরন্তর এই প্রকার চিন্তায় নিরত থাকিলে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এরূপ স্থলে চিন্তাসংযমের সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে সেই চিন্তা ভুলিতে পারিলে বাঞ্ছিত মীমাংসা অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা কল্পনা নহে — পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য। যে কোনও কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান।

সময়ে সময়ে এক একটা চিন্তা হৃদয়ে এমনই দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া যায় যে জাগরণে বা শয়নে স্বপনে অহরহ তাহা জাগিয়া থাকে। এই শ্রেণীর একগুঁয়ে ভাবুকের সংস্পর্শে আসিলেই তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। চিন্তার সংক্রমণশক্তিবশতঃ এরূপ লোকের আবহাওয়ায় এমনই একটা বিষ মাখান থাকে যে তাহাকে দেখিবামাত্র স্বভাবতঃই তৎসম্পর্কে একটা বদ্ ধারণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই। বরং কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে সেই মারাত্মক চিন্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে তাহার উপকার সাধনের একমাত্র উপায় তাহাকে সম্পূর্ণ চিন্তাবিহীন করা। বিস্মৃতির অনুশীলনে যাহাতে সে চিন্তামুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নতুবা তাহার সেই চিন্তা ব্যাধি আমাদিগকেও আক্রমণ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় পড়িলে সাধারণতঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তিবলে সেই চিন্তারুগ্ন ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া তাহার কল্যাণ সাধনই একমাত্র কাম্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইলে হৃদয়কে সম্পূর্ণ চিন্তাবিহীন করাই একমাত্র প্রতিষেধক।

* অনেক সময় কল্পনা হইতেও আমাদিগকে অনেক প্রকার ভোগ ভুগিতে হয়। কল্পনা মিথ্যা হইয়াও চিন্তার গুরুত্ব অনুযায়ী সত্যে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। কথামালার রাখাল বালক নিত্য ব্যাঘ্রের কল্পনায় সত্য-সত্যই একদিন ব্যাঘ্রের কবলগত হইয়াছিল। আমি পাপী, দুর্ব্বলচেতা, ভীরু, কাপুরুষ কল্পনা করিতে করিতে মানব সত্য সত্যই একদিন পাপকর্ম্মা, শক্তিহীন, হীনচেতা হইয়া পড়ে। বরং উচ্চ আত্মাভিমানের কল্পনা ভাল তথাপি কল্পনায়ও কখন আপনাকে হীন ভাবনা করা উচিত নহে। বিনয়ের দোহাই দিয়া যাঁহারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে খাটো করিয়া তুলেন তাঁহারা যে শুধু তাঁহাদের অন্তরের দেবতাকে খর্ব্ব করেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও সম্মান হানি করিয়া থাকেন। কল্পনায়ও মিথ্যাচরণ মহাপাপ। শক্তি উপেক্ষার বস্তু নহে। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে বিশ্বরাজের কল্পনা বিদ্যমান। কল্পনাই অনেক সময় মানুষের হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা অভিমান প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে ধ্বংসকরী চিন্তা আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিফলতার কারণ, কল্পনায় ও সে চিন্তার অভাব ঘটে না। তাই অসৎ কল্পনার উন্মেষ মাত্রই হয় সৎকল্পনার দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য, নয়ত বিস্মৃতির সহায়তায় সেরূপ কল্পনাকে হৃদয়ে একেবারেই স্থান না দেওয়া উচিত।

বিস্মৃতির সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাকুল প্রার্থনা। ব্যাকুল প্রার্থনার মূলে যে প্রবল ইচ্ছা-শক্তি, চিত্তের একাগ্রতা ও আত্মসংযম পরিলক্ষিত হয়, বিস্মৃতির সাধনায় তাহা সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ব্যাকুল প্রার্থনার অর্থ খোসামুদি বা উৎকোচ প্রদান নহে। যে অনন্ত শক্তি জগতের নিত্য সুখ, শান্তি ও কল্যাণ সাধন করিতেছে সেই শক্তির সহিত আমাদের সান্ত শক্তির একাত্মতা উপলব্ধি করিয়া কাম্য লাভের নিমিত্ত তাহার কাছে যে আকুল আত্মনিবেদন তাহাই প্রকৃত ব্যাকুল প্রার্থনা। এই প্রার্থনার ফলে চিত্ত সবল হয়, চিন্তা সংযত হয়, আত্মশক্তি জাগিয়া উঠে এবং সকল অন্তরায়ের ধ্বংস ঘটে। প্রার্থনার মধ্যেই প্রাপ্তির গোপন রহস্য লুক্কায়িত—প্রার্থনা করিতে জানিলে প্রাপ্তির পথ আপনি নয়নগোচর হয়। বিস্মৃতির প্রার্থনাই আজ বিস্মৃত জাতির একমাত্র সাধনা হোক। আজিকার যুগে আমাদের সকলের কাম্য হউক অসতের বিস্মৃতি—তমসার বিস্মৃতি—মৃত্যুর বিস্মৃতি। বিস্মৃতির সাধনায় আমরা যেন আজ সমস্বরে বলিতে পারি—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ,। মাঘ, ১৩২৯ ৫ম সংখ্যা

লেখা-সূচী।

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। ,, প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। ,, অমৃতলাল বসু।
৬। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। ,, রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
১৩। ,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। ,, কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৫। ,, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
১৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। ,, হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম।
১৮। ,, কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। ,, যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। শ্রীযুক্ত মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। ,, মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। ,, নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ, এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী।
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
২৯ রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৩০। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।
৩১। শ্রীপবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
৩২। কুমার বিজয় লাল খান।

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩।৵৹ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৹ আনা। নমুনার জন্য ।৵৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥৹ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

কামেশ্বরের মন্দির

নেড়াদেউল (মেদিনীপুর)

শিল্পী—আর, বোস্ (মেদিনীপুর)

Bharatvarsha Printing Works.

১ম বর্ষ, | মাঘ, ১৩২৯ | ৩য় সংখ্যা।

সত্যের পথে।

আজ কি আমি জেগে আছি ?
না নয়নে মোর জড়িয়ে আসে স্বপ্ন,
পৃথিবীটা দেখছি আঁধার কুহেলি
আর কুজ্ঝটিকায় মগ্ন !
বহু দূরে ঘন তমসার মাঝে
রতন প্রদীপ উজল হেন
দীপ্ত কি ওই রাজে ?
তারি পানে ছুটছি কি আজ
ভ্রমর সমান পাগল পারা লুব্ধ বেগে অন্ধ,
এই জগতের মিথ্যা ত্যজি
ছিন্ন করে দিয়ে আমার সকল বাধা বন্ধ !
পৌছিতে কি পারব হোথায়,
ওই যেথা ওই জ্বলছে মাণিক রত্ন
ওই আঁধারেই ভেদ করে কি
যেতে আমায় করতে হবে যত্ন ?
ওই কি সঠিক আলো ?
সব তেয়াগি ওরেই কি গো
বরণ করা ভালো ?
দূর থেকে ত দেখছি আমি
চার পাশে ওর আঁধার অবতীর্ণ
কুজ্ঝটিকায় নামতে হবে ?
বাস্তব কি অলীক মাঝে হবে গো উৎকীর্ণ ?

অলীক কি গো ? অন্ধকারেই
আলোক আছে লুকিয়ে আছে সুপ্ত,
মঙ্গল কি অমনি আসে ?
অমঙ্গলই গোপন গুহা—অমঙ্গলেই গুপ্ত !
পথ চলা কি অমনি শুধু যায় ?
হয় ত হোঁচট লাগবে কাঁটা
বিঁধবেরে পায় পায় !
তবু তোমা চলতে হবে
দৃপ্ত হয়ে, হওনা কেন সম্বলহীন আর রিক্ত,
ব্যথা চেপে হাসতে হবে
অশ্রুজলে নেত্র তোমার হোক্ না অভিষিক্ত !
বাতায়নের রন্ধ্র পথে
অন্ধ ঘরে আসে বলে জ্যোতির রেখা ক্ষুদ্র,
তাই বলে তায় ভাববে ছোট
সেই আলোকই ধরতে পারে মূর্ত্তি বিরাট রুদ্র !
আজ ভেঙ্গে দে দ্বার !
বাইরে এসে দেখ্‌না চেয়ে
বিশ্ব চমৎকার !
এ কি দীপ্ত নীল নভোতল !
এ কি উদার ! এ কি অবাক সৃষ্টি !
অপূর্ব্ব এক রস আবেশে
প্রাণ ভরে যায় জুড়িয়ে আসে দৃষ্টি !

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কালনির্ণয়

আমাদের প্রাচীন গৌরবমণ্ডিত ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভারতবর্ষের তাৎকালিক সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতিই কুরুক্ষেত্রসমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অন্যতম পক্ষ অবলম্বন করিয়া অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রবীর্য্য বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ শৌর্য্যশালী ছিলেন না।

পুরাকালের সেনাবিভাগের নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি একটি গজ বা রথ, ৩টি অশ্ব ও ৫ টি পদাতিক সৈন্য মিলিত করিয়া তাহাকে পত্তি নামে অভিহিত করা হইত। সেনামুখে ইহার ৩ গুণ, গুল্মে তাহার ৩ গুণ, গণে তাহার ৩ গুণ, বাহিনীতে তাহার ৩ গুণ, পৃতনাতে তাহার ৩ গুণ, চমূতে তাহার ৩ গুণ, অনীকিনীতে তাহার ৩ গুণ এবং অক্ষৌহিণীতে তাহার দশগুণ সংখ্যক সৈন্য থাকিত। (১)। এইরূপ গণণা করিলে বোঝা যায় যে এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ সংখ্যক গজ ও রথ, ৬৫৬১০ সংখ্যক অশ্বারোহী, এবং ১০৯৩৫০ সংখ্যক পদাতিক থাকিত অর্থাৎ ১৯৬৮৩০ সংখ্যক যোধ থাকিত। এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য (প্রায় ৩৬ লক্ষ লোক) উক্ত সমরক্ষেত্রে বিনষ্ট হইয়াছিল।

যাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে—এই দারুণ লোকক্ষয়কর সংগ্রাম কবে সংঘটিত হইয়াছিল? আমি প্রধানতঃ মহাভারতকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, আমার মনে হয় অন্যান্য গ্রন্থে প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে যে সকল ইঙ্গিত উল্লিখিত আছে তাহার মূল্য অনেক কম। সেই সকল ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। মহাভারত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে অল্প চেষ্টাতেই আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

সকলেই জানেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধনিবারণের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে—

ততো ব্যপেতে তমসি সূর্য্যে বিমলবদ্ গতে।
মৈত্রে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে মৃদ্বর্চ্চিষি দিবাকরে ॥৬
কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।

*　*　*　*　*　*

কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকং কৃত্যং স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ।
উপতস্থে বিবস্বন্তং পাবকঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥৯॥

ইত্যাদি উদ্যোগপর্ব্ব ৮৩ অধ্যায়।

অনন্তর অন্ধকার অপগত হইলে নির্ম্মলাকাশে সূর্য্য উদিত হইলে মৈত্রমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে এবং দিবাকর মৃদু কিরণযুক্ত হইলে, শরৎকালের অবসানে হেমন্ত আগত হইলে কার্ত্তিক মাসে রেবতী নক্ষত্রে * * * * জনার্দ্দন পৌর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া স্নান করিয়া পবিত্র অলঙ্কৃত হইয়া সূর্য্য ও অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই শ্লোক পাঠে প্রতীতি হয় যে কার্ত্তিক মাসে রেবতী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ অভিযান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে দুর্য্যোধনের বিষয় বলিতেছেন—

আজ্ঞাপয়চ্চ রাজ্ঞস্তান্ পার্থিবান্ দুষ্টচেতনঃ।
প্রয়াধ্বং বৈ কুরুক্ষেত্রং পুষ্যোহদ্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥৩॥

— উদ্যোগপর্ব্ব ১৫০ অধ্যায় (২)

(১) অমরকোষ, দ্বিতীয় কাণ্ড, ক্ষত্রবর্গ ৮০।৮১ শ্লোক।

(২) এই শ্লোকের সহিত শল্যপর্ব্বের ৫০ অধ্যায়ের ১০।১৫ শ্লোক সঙ্গত হয় না তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ

(সেই দুর্য্যোধন) দুষ্টাত্মা সেই নরপতিগণকে আজ্ঞা দিলেন—অদ্য পুষ্যানক্ষত্র, তোমরা কুরুক্ষেত্র প্রয়ান কর। সুতরাং পুষ্যানক্ষত্রে দুর্য্যোধনের সৈন্য কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কর্ণের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে তাৎকালিক তিথিও আমরা জানিতে পারি :—

সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ।
সর্ব্বৌষধিবনস্ফীতঃ ফলবানল্পমক্ষিকঃ॥
নিষ্পঙ্কো রসবত্তোয়ো নাত্যুষ্ণঃ শিশিরঃ সুখঃ॥১৭॥
সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদমাবাস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামো যুজ্যতাং তস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম॥১৮॥
উদ্যোগপর্ব্ব ১৪২ অধ্যায়।

বর্ত্তমান মাস চন্দ্রজ্যোৎস্নাহেতু মনোরম, এক্ষণে ভক্ষ্য ও কাষ্ঠাদি স্বল্প আয়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মাসে সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট বনের প্রাচুর্য্য, নানাবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, মক্ষিকার উপদ্রব অল্প, পঙ্কের অভাব, জল স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। এই মাস অধিক গরম নহে, শীতল ও সুখদায়ী। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর অমাবস্যা হইবে। সেই অমাবস্যাতে সংগ্রাম আরম্ভ কর, অমাবস্যার অধিপতি ইন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে দৌত্য সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (১) তাহা আশ্বিনীপৌর্ণমাসীর অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত।

পুনশ্চ :—

যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
তথৈব সহিতাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুর্মহীক্ষিতঃ॥
মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত।
দীপ্যমানাশ্চ সম্পেতুর্দিবি সপ্তমহাগ্রহাঃ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব-১৭ অধ্যায় ১।২ শ্লোক

সেই ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপেই সমস্ত মহীপালগণ একত্রে সমাগত হইলেন। সেইদিন চন্দ্র মঘানক্ষত্রে সমাগত হইলেন (২)। আকাশে সাতটি মহাগ্রহ দীপ্যমান হইয়া উদিত হইল। ভীষ্মের শরশয্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

পতন্ স দদৃশে চাপি দক্ষিণেন দিবাকরম্॥৯৩॥
সংজ্ঞাঞ্চোপ লভৎবীরঃ কালং সঞ্চিন্ত্যভারত।
অন্তরীক্ষে চ শুশ্রাব দিব্যা বাচঃ সমন্ততঃ॥৯৪॥
কথং মহাত্মা গাঙ্গেয়ঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাম্বরঃ
কালং কর্ত্তা নরব্যাঘ্রঃ সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে॥৯৫॥
স্থিতোঽস্মীতি চ গাঙ্গেয়ঃ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমব্রবীৎ।
ধারয়ামাস চ প্রাণান্ পতিতোঽপি মহীতলে॥৯৬॥
ভীষ্মপর্ব্ব ১১৯ অধ্যায়।

তিনি পতন সময়ে দক্ষিণ দিকে দিবাকরকে দেখিলেন। হে ভারত! সেই বীর দক্ষিণায়নকাল চিন্তা করিয়া সংজ্ঞা অবলম্বন করিলেন; এবং অন্তরীক্ষে

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পুষ্যানক্ষত্রে কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিতে বলিলেন এবং ঐ নক্ষত্রে অভিযান করা হইল। যদি এরূপ ধরা যায় যে যে দিনে দুর্য্যধন অভিযান করিয়াছিলেন সেই দিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া সৈন্যাভিযান করাইয়াছিলেন তাহা হইলে সঙ্গত হইতে পারে।

(১) টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি যে যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। ভীষ্মপর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দেখুন।

(২) টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে অর্থ করিয়াছে—মঘা পিত্র্যং নক্ষত্রং তস্য বিষয়ো দেশঃ পিতৃলোকস্তদ্‌গতঃ সোমঃ যুদ্ধে যাহারা মানবলীলা সংবরণ করিতেন তাহাদের উত্তম দেহ প্রদানজন্য চন্দ্র পিতৃলোকের সন্নিহিত হইলেন। এই দিনে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ হইল মনে করিয়া এইরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় এই শ্লোক প্রথমতঃ যেখানে ছিল সেখান হইতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সমূহের জন্য দূরে নীত হওয়ায় অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের দিনই লক্ষ্য করিয়া উক্ত শ্লোক বিরচিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দিক হইতে দিব্যশব্দ শ্রবণ করিলেন—"সর্ব্বধনুষ্কের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গাঙ্গেয় নরশ্রেষ্ঠ হইয়া কি করিয়া দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে কাল প্রাপ্ত হইবেন ?" সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় বলিলেন—আমি জীবিত আছি। তিনি মহীতলে পতিত হইলে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন—

অপক্রান্তো মনুষ্যেভ্যঃ শরশয্যাং গতোঽস্ম্যহম্।
প্রতীক্ষমাণ স্তিষ্ঠামি নিবৃত্তিং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥১৪

ভীষ্মপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়

আমি এক্ষণে মনুষ্যগণ ও তৎভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়া শরশয্যাগত হইয়াছি। এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের নিবৃত্তি প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছি। অতএব বোঝা গেল যে ভীষ্ম দক্ষিণায়ন সময়ে কৃষ্ণপক্ষে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।

দ্রোণ পঞ্চম দিবসে মধ্যাহ্নে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বদিবসে অর্থাৎ চতুর্থ দিবসের রাত্রিযুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে অন্ধকারে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অর্দ্ধ রাত্রি উপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইল।

"অর্দ্ধরাত্রিঃ সমাজজ্ঞে নিদ্রান্ধানাং বিশেষতঃ।" ১৬

দ্রোণপর্ব্ব ১৮৩ অধ্যায়।

সৈন্যগণ নিদ্রিত হইবার পর চন্দ্রোদয় হইল এই চন্দ্রোদয় হইবার পর পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল—

"ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সংহৃষ্টানাং বিশাম্পতে ॥১॥

দ্রোণপর্ব্ব ১৮৫ অধ্যায়।

এখানে "ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং" এই শব্দের অর্থ কি ? টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "ত্রিমুহূর্ত্তশেষায়াং" অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত অবশিষ্ট থাকিতে। 'ভাগ' শব্দের 'মুহূর্ত্ত' অর্থ হয় না; সুতরাং এইরূপ অর্থ কষ্টকল্পনা মাত্র। "ত্রিভাগশেষই" এই শব্দের দুপ্রকার অর্থ হইতে পারে—(ক) তৃতীয়ো ভাগঃ ত্রিভাগঃ (সংখ্যাশব্দস্য বৃত্তি বিষয়ে পূরণার্থত্বমিষ্যতে) ত্রিভাগঃ শেষো যস্যাঃ সা, অর্থাৎ রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে (খ) শিষ্যতে ইতি শেষঃ, ত্রিভ্যঃ ভাগেভ্যঃ শেষ, অর্থাৎ রাত্রির তিন ভাগ অতীত হইয়া এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে (১)। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে সেইদিন কৃষ্ণা দশমী অথবা কৃষ্ণা একাদশী তিথি ছিল। সুতরাং ভীষ্ম তাহার চারি দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশদিনে ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রারম্ভে বলদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ॥
শিষ্যয়ো বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব ॥৬॥

শল্যপর্ব্ব ৩৪ অধ্যায়।

অদ্য ৪২ দিন হইল আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম, অদ্য শ্রবণানক্ষত্রে পুনরায় আগত হইলাম। হে মাধব ! আমি আমার দুই শিষ্যের গদাযুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব পাওয়া গেল যে শ্রবণানক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ অবসান হইলে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ জন্য গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ৫০ রাত্রি নগরে বাস করিয়াছিলেন (২)। পরে উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলে ভীষ্ম বলিলেন—

(১) "ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণম্" (কুমারসম্ভব ৫।৫৭) এই শ্লোকের ব্যাখ্যানাবসরে মল্লিনাথও উক্ত দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

(২) উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্র্য স্মার পুরুষর্ষভঃ ॥৫॥

—অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৭ অধ্যায়।

দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্যো যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ ॥২৬॥
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাস্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥২৭॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥২৮॥
— অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৭ অধ্যায়

হে কৌন্তেয় যুধিষ্ঠির! তুমি ভাগ্যক্রমেই অমাত্যসহ উপস্থিত হইয়াছ। ভগবান্ সহস্রকিরণ সূর্য্য পরিবৃত্ত (দক্ষিণ দিক্ হইতে নিবৃত্ত) হইয়াছেন। আমি তীক্ষ্ণাগ্র শরের উপর শায়িত অবস্থায় ৫৮ রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শতবর্ষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! এই মাঘ মাস উপস্থিত হইয়াছে—তাহা সৌম্য (অর্থাৎ সূর্য্য উত্তরায়ণে থাকিবার কালীন সংঘটিত হয়- যাম্য নহে)। তাহার ত্রিভাগ (পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে তৃতীয় ভাগ অথবা চতুর্থ ভাগ) অবশিষ্ট আছে। এই পক্ষ শুক্ল হওয়া উচিত। (১)

(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ "সৌম্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "চন্দ্র"। এইরূপ অসঙ্গত এবং এইরূপ অর্থ করিবার কারণ দেখা যায় না। সৌম্য বা বুধ উত্তর দিকের অধিপতি; সেজন্য জ্যোতিষ গ্রন্থে সূর্য্যের উত্তরায়ণ সময়ে যে মাসাদি সংঘটিত হয় তাহাকে সৌম্য বলা হইয়াছে; যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি সেজন্য জ্যোতিষ গ্রন্থে সূর্য্যের দক্ষিণায়ণ কালীন মাসাদিকে "যাম্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নীলকণ্ঠ "ত্রিভাগশেষ" পক্ষ এই শব্দের সহিত অন্বয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে "শুক্লো ভবিতুমর্হতি" এই কথা বলিবার সার্থকতা বোঝা যায় না। যদি ভীষ্ম "পক্ষ ত্রিভাগশেষ" বলিয়া জানেন তাহা হইলে "শুক্ল হওয়া উচিত" একথা বলিবেন না। শরশয্যায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় হওয়ায় ভীষ্ম এতদ্বিষয়ে বিশেষ অবগত না থাকাই স্বাভাবিক। বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ—এই চন্দ্রে মাঘ মাস উপস্থিত এই শুক্ল পক্ষ, এই মাসের তিনভাগ এখনও শেষ থাকিতে পারে। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।

এখানে 'ত্রিভাগশেষ' শব্দের অর্থ চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে—এইরূপ গ্রহণ করা যাউক। নীলকণ্ঠ সেইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং তাহাই সাধারণ অর্থ। তাহা হইলে সৌর মাঘ মাসের ২৪ দিবসে যুধিষ্ঠির ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎদিবসে সূর্য্য উত্তরায়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির নগর হইতে বহির্গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে মাঘ মাসের ২৩ দিবসের অপগমে তৎকালে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইত বোঝা যাইতেছে।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। উদ্‌যোগপর্ব্বে গালব-চরিতে সুপর্ণ চারিদিক বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরদিক্ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুপর্ণ বলিতেছেন—

অত্র তিষ্ঠতি বৈ স্বাতিরত্রাস্যা উদয়ঃ স্মৃতঃ ।১৫। ১১১ অধ্যায়।

এখানেই (অর্থাৎ উত্তর দিকেই) স্বাতীনক্ষত্র অবস্থান করে এবং এখানে ইহার উদয় কথিত হয়। স্বাতীনক্ষত্র বিষুবদ্বৃত্তের উত্তর দিকে তৎকালে অবস্থিত ছিল। তুলারাশির ৬।৪০ অংশ হইতে ২০ অংশ পর্য্যন্ত স্বাতীনক্ষত্র। সুতরাং ইহার পরেই বিষুবদ্বৃত্ত ধরিলে (২৩ অংশ ধরিলে), মকররাশির ২৩ অংশে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হয়।

ভীষ্মদেব বলিয়াছেন মাঘ মাসের চতুর্বিংশ দিবসে তিনি ৫৮ রাত্রি শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের দশম দিবসে সন্ধ্যাকালে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্বিংশতি দিবসের সন্ধ্যাকালে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাই যুদ্ধের দশম দিবস। অতএব অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চদশদিবসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল এবং পৌষ মাসের তৃতীয় দিনে যুদ্ধশেষ হইয়াছিল।

কিন্তু তিথি সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ। যদি সেইদিন বলদেবের বাক্যানুসারে (শল্যপর্ব্ব ৩৪।৬) শ্রবণানক্ষত্র

হয় তাহা হইলে শুক্লাচতুর্থী তিথি হয়। তাহা হইলে দ্রোণের নিধন দিবস অমাবস্যার পূর্ব্বে হইতে পারে না এবং তাহার পূর্ব্বদিবস চতুর্দ্দশী হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত দ্রোণপর্ব্বের ১৮৫।১ শ্লোক পাঠ করিলে তাহা একাদশী তিথি বলিয়া অনুমিত হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের সমন্বয় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

টীকাকার নীলকণ্ঠ "ভারতসাবিত্রী" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥"
"অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘ মাসেঃ সিতাষ্টমী।"
"ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।"

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে ভরণী নক্ষত্রে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ভীষ্ম মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। দ্রোণ ত্রয়োদশী তিথির মধ্যাহ্নে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি শ্রবণা নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ শেষ হয়, তাহা হইলে মৃগশিরা বা রোহিণী নক্ষত্র হইতেই যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, ভরণী নক্ষত্রে যুদ্ধারম্ভ অসম্ভব হয়। এক বলদেবের উক্তিতেই সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "মূলে চ পুনরাগতঃ" পাঠ করিলে অনেকটা সঙ্গত হয়।

"চত্বারিংশদহানি" শব্দের অর্থ তিথি সংখ্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ৪২ তিথি বলদেব তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ৪০ দিবসে দুই তিথি ক্ষয় হইয়াছিল। তাহা হইলে শুক্লাত্রয়োদশী হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা (বা প্রতিপাদ) পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ চলিয়াছিল বুঝিতে হইবে।

তৎকালীন গ্রহসংস্থান বোঝা আরও কঠিন। ভীষ্মপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

বিষ্বগ্বাতাশ্চ বান্ত্যুগ্রা রজো নাপ্যুপশাম্যতি।
অভীক্ষ্ণং কম্পতে ভূমিরর্কং রাহুরুপৈতি চ॥১১॥
শ্বেতো গ্রহস্তথা চিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি।
অভাবং হি বিশেষেণ কুরূণাং তত্র পশ্যতি॥১২॥
ধূমকেতুর্মহাঘোরঃ পুষ্যমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
সেনয়োরশিবং ঘোরং করিষ্যতি মহাগ্রহঃ॥১৩॥
মঘাস্বঙ্গারকো বক্রঃ শ্রবণে চ বৃহস্পতিঃ।
ভাগং নক্ষত্রমাক্রম্য সূর্য্যপুত্রেণ পীড্যতে॥১৪॥
শুক্রঃ প্রোষ্ঠপদে পূর্ব্বে সমারুহ্য বিরোচতে।
উত্তরে তু পরিক্রম্য সহিতঃ সমুদীক্ষতে॥১৫॥
শ্বেতো গ্রহঃ প্রজ্বলিতঃ সধূম ইব পাবকঃ।
ঐন্দ্রং তেজস্বিনক্ষত্রং জ্যেষ্ঠামাক্রম্য তিষ্ঠতি॥১৬॥
ধ্রুবং প্রজ্বলিতো ঘোরমপসব্যং প্রবর্ত্ততে।
রোহিণী পীড়য়ত্যেবমুভৌ চ শশি ভাস্করৌ॥
চিত্রাস্বাত্যন্তরে চৈবাধিষ্ঠিতঃ পরুষো গ্রহ॥১৭॥
বক্রানুবক্রং কৃত্বা চ শ্রবণং পাচকপ্রভঃ।
ব্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ॥১৮॥

চারিদিক হইতে উগ্র বায়ু প্রবাহিত হইতে, ধূলিরাশি উপশান্ত হইতেছে না; ভূমি বারম্বার কম্পিত হইতেছে। রাহু সূর্য্যের নিকট উপাগত হইতেছে। শ্বেতগ্রহ (Uranus Neptune) চিত্রা আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; ইহাতে কুরুদিগের নাশ অমঙ্গল সূচিত হইতেছে। মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাও উভয় পক্ষের সেনার ঘোর অমঙ্গল করিবে। মঙ্গল মঘানক্ষত্রে বক্রী (apparent motion) এবং বৃহস্পতি শ্রবণানক্ষত্রে বক্রী হইয়াছে। শনি পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়িত করিতেছে। শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থান করিয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং উপগ্রহসহ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিতেছে। অপর একটি শ্বেতগ্রহ or (Uranus Nepntune?) সধূম পাচকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তেজস্বী ইন্দ্রদৈবত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধ্রুবনক্ষত্র ভয়ানকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া দক্ষিণ মার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চন্দ্র ও রবি উভয়ে রোহিণী নক্ষত্রকে পীড়া দিতেছে। ক্রূরগ্রহ (বুধ?) চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। অগ্নির তুল্য প্রভাবিশিষ্ট মঙ্গল বক্রানুবক্রভাবে সঞ্চরণ করিয়া শ্রবণানক্ষত্র ও বৃহস্পতির অধিষ্ঠিত রাশিকে সমাবৃত করিয়া অবস্থিত হইয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তৎকালে রবি ও চন্দ্র অনুরাধা নক্ষত্রে (অন্যথা রোহিণীকে পীড়া দেওয়া সম্ভব হয় না)। মঙ্গল মঘা হইতে বক্রী হইয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে (অন্যথা শ্রবণানক্ষত্রকে সমাবৃত করা অসম্ভব হয়) বুধ চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যে, বৃহস্পতি শ্রবণানক্ষত্রে, শুক্র (শীঘ্রগামী হইয়া) পূর্ব্বভাদ্র পদ নক্ষত্রের শেষ ভাগে শনি পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে, রাহু বৃহস্পতি রাশিতে তৎকালে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু অন্য বর্ণনা হইতে সন্দেহ উপস্থিত হয়; যথা—

বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ ।২৭।
ভীষ্মপর্ব্ব তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোঽধিকম্ ॥৮॥
কৃত্ত চাঙ্গরকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সঙ্গময়ন্নিব ॥৯।
নূনং মহদ্ভয়ং কৃষ্ণ কুরূণাং সমুপস্থিতম্।
বিশেষেণ হি বার্ষ্ণেয় চিত্রাং পীড়য়তে গ্রহঃ ॥১০॥
সোমস্য লক্ষ্ম ব্যাবৃত্তং রাহুরর্কমুপৈতি চ।
—উদ্যোগ পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়।

বৃহস্পতি ও শনি বিশখানক্ষত্রের সমীপস্থ হইয়াছে। তীক্ষ্ণগ্রহ শনি প্রাণিপুঞ্জের সমধিক পীড়াজননার্থ প্রজাপতি দৈবত রোহিণী নক্ষত্রকে পীড়িত করিতেছে। মঙ্গল বক্রভাবে জ্যেষ্ঠাতে সঞ্চারিত হইয়া মিত্রকুলের সংহারের জন্য অনুরাধা নক্ষত্রে উপস্থিত হইবার অভিলাষী হইয়াছে। চিত্রা নক্ষত্রকে একটী গ্রহ পীড়া দিতেছে; নিশ্চয় কুরুবংশের মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে। চন্দ্রের মণ্ডপ যথাস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে এবং রাহু সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইতেছে। এই বর্ণনা ঠিক হইলে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা অসম্ভব হয়। ব্যাসদেব যখন পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা করেন তখন উভয় পক্ষের সৈন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং চন্দ্র অনুরাধা নক্ষত্রে বলা হইয়াছে।

টীকাকার নীলকণ্ঠ অন্যান্য স্থানে গ্রহের সমাবেশ সম্বন্ধে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বতোভদ্রচক্রসম্বন্ধীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ ঐরূপ কোনও ব্যাখ্যা না করিলে সমন্বয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু বিপদ এই যে কতকগুলি বাক্যকে সর্ব্বতোভদ্রচক্র সম্বন্ধীয় বলিয়া ধরিলে, কোন্‌টি প্রকৃত গ্রহসংস্থানবিষয়ক উক্তি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে না। প্রকৃতগ্রহসংস্থানদ্বারা সময় নির্ণয়ও বিশেষ আয়াসসাধ্য, এ ক্ষেত্রে একপ্রকারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং অয়নাংশ দ্বারা কালনির্ণয় করিব।

মল্লিখিত "মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণের কালনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে অয়নাংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছি এবং সূর্য্য সিদ্ধান্তে তাহার গণনাপ্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বাৎসরিক অয়নগতি ৫০-২″ বিকলা মধ্যমান-অর্থাৎ জ্যোতিষীগণের মতে বাৎসরিক অয়নগতি ৫৪″ বিকলা। প্রচলিত পঞ্জিকার মতে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি এক্ষণে পৌষ মাসের নবম দিবসে হইয়া থাকে (৮।৮।৩৯।১৮) * ॥ ভীষ্মদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বোধ হয় ৯.২২।৩০ রাশ্যাদিতে সূর্য্য আগমন করিলে উত্তরায়ণ হইত। তাহা হইলে ৪৩৫০।৪২ অংশ বিলোমগতি হইয়াছে। তাহা উপরোক্ত উভয় মতে গণনা করিলে

* গ্রহলাঘবমতে "বেদাব্ধ্যব্ধ্যূনঃ খরসহৃতঃ শকোঽয়নাংশঃ।" শকাব্দ হইতে ৪৪৪ বাদ দিয়া অবশিষ্টকে ৬০ দিয়া ভাগ দিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা অতি স্থূল গণনা। ইহার মতে বর্ত্তমান অয়নাংশ ২৩।২০॥ সিদ্ধান্তরহস্যের গণনা সূর্য্য সিদ্ধান্তানুসারিণী "শাকমেকা-ব্ধিবেদোনাং দ্বিঃ কৃত্বা দশভির্হরেৎ। লব্ধং হীনঞ্চ তত্রৈব ষষ্ট্যাপ্তাশ্চায়নাংশকাঃ।" শকাব্দার অঙ্ক হইতে ৪২১ বাদ দিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দুই স্থানে স্থাপিত করিবে। প্রথম স্থান স্থাপিত অঙ্ককে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া যে অঙ্ক লব্ধ হইবে তাহা দ্বিতীয় স্থান স্থাপিত অঙ্ক হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ দিলে ভাগলব্ধ অঙ্ক। বেয়নাশংঅহই

যথাক্রমে ৩:৪৪ বা ২৯২৩ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ১২২২ বা ১০০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয় সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া মহাভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণবলেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। পুরাণ সমূহ হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে বায়ুপুরাণ খুব প্রাচীন। এই পুরাণ হইতে এ সম্বন্ধে যে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অবশ্য গ্রহণীয়।

বায়ু পুরাণ, প্রক্রিয়া পাদ ৯৯ অধ্যায়—

সপ্তবিংশতিপর্য্যন্তে কৃৎস্নে নক্ষত্রমণ্ডলে।
সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্ ॥৪১৯

* * * * *

সপ্তর্ষীণান্তু যে পূর্ব্বা দৃশ্যন্তে উত্তরা দিশি।
ততোমধ্যে চ নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং দিবি ॥৪২১॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা জ্ঞেয়া ব্যোম্নি শতং সমাঃ।
নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্যৈতন্নিদর্শনম্ ॥৪২২॥
সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারীক্ষিতে শতম্।
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম ॥৪২৩॥

সপ্তর্ষি মণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করিয়া সপ্তবিংশতিনক্ষত্রান্বিত সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল (ভ্রমণ করে)। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে উত্তর দিকে অবস্থিত পূর্ব্বভাগস্থ যে নক্ষত্রসমূহ দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে আকাশে সমসূত্রপাতে যে নক্ষত্র দৃষ্ট হয় সপ্তর্ষিগণ যখন তাহার সহিত মিলিত হয়েন তখন শত বৎসর পূর্ণ জানা যায়। নক্ষত্র ও ঋষিগণের যোগের ইহাই নিদর্শন। পরীক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিগণ শত বৎসর মঘাযুক্ত ছিলেন; আমার মতে অন্ধ্রাজ্যের অবসানে শতভিষা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিবেন।

মৎস্যপুরাণে শেষোক্ত শ্লোক যে ভাবে লিখিত আছে তাহার অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট (১) বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপ লিখিত আছে, কেবল অন্ধ্রাজগণের রাজত্বাবসানের সময়ে সপ্তর্ষিগণ কোথায় থাকিবেন তাহা লিখিত নাই। (২)

এক্ষণে দেখা যাউক পরীক্ষিতের রাজ্যকাল কত দিন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তিনি ষষ্ঠি বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। যখন পরীক্ষিৎ মৃগয়া জন্য বনে গমন করিয়া শমীক মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প প্রদান করিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ষষ্ঠীবৎসর—

পরিশ্রান্তো বয়ঃস্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্ ॥ ২৬॥

আদি পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।

ইহার ৭ দিবস পরে পরীক্ষিত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন—

ষট্‌ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১ ॥

মৌষল পর্ব্ব প্রথম অধ্যায় ॥

ইহার কিয়ৎকাল পরেই যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেন—এইরূপ উক্ত হয় নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে পরীক্ষিতের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অন্ধ্রাজ্যাবসানে শতভিষানক্ষত্রে অবস্থান করিবেন। অর্থাৎ পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হইতে অন্ধ্রাজ্যাবসানের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ১৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অন্ধ্রাজ্যান্তে শতভিষা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ৪ বৎসর অবস্থান ধরিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে অন্ধ্রাজ্যাবসান সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৪৪০ বৎসর ধরিতে হইবে।

এইবার অন্ধ্রাজ্যাবসান কাল বিচার করা যাউক। বায়ুপুরাণের মতে ২৭২॥০ বৎসর এবং মৎস্য পুরাণের মতে ৪৫৮॥০ বৎসর অন্ধ্রাজ্যকাল। অন্ধ্রাজগণের পৈঠান ও ধনকটক এই দুই নগরীতে রাজধানী ছিল। বয়োবৃদ্ধগণ ধনকটকে এবং কনীয়ানগণ পৈঠানে শাসন

(১) সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তা কালে পারিক্ষিতে শতম্।
ব্রহ্মণস্তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যন্তি শতং সমাঃ ॥ ২৭৩।৪৪

(২) বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ, ২৪ অধ্যায় ৩৩,৩৪

করিতেন। ধনকটকই প্রধান রাজধানী ছিল; তথায় সিংহাসনশূন্য হইলে পৈঠান রাজগণ পৈঠান পরিত্যাগ করিয়া ধনকটকের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিতেন। পৈঠানের সমস্ত রাজগণই ধনকটকের সিংহাসন অধিকার করিতে পাইতেন না। এতদ্ব্যতীত অন্ধ্রগণের অন্য এক শাখা কানাড়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পুরাণ সমূহে এই সকল অন্ধ্রাজবংশ লইয়া অনেক গোলযোগ করা হইয়াছে।

ভূগোলবিৎ টলেমি শ্রীপুড়ুমায়ী অন্ধ্ররাজকে Siro Polemios বলিয়া এবং মহাক্ষত্রপ চষ্টনকে Tiastenes বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোতমীপুত্র শাতকর্ণি খহরাত বংশীয় নহপান নামক ক্ষত্রপকে পরাজিত করিয়া সবংশে নিহত করেন। পরে উজ্জয়িনী শাসনকর্ত্তা ক্ষত্রপ চষ্টনের পুত্র জয়দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকেও পরাজিত করেন। (৩) জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম বাশিষ্ঠী পুত্র পড়ুমায়ীর পুত্র গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণিকে পরাজিত করেন, কিন্তু তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন নাই। (৪) তাহার পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি বা চতুরপন (চতুষ্পর্ণ) মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের কন্যা মঢ়রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মঢ়রীপুত্র শকসেন ১৯০ হইতে ১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুরাণে মঢ়রীপুত্র শকসেনের নাম নাই। পুরাণের উল্লিখিত অন্ধ্রবংশের শেষ রাজার নাম পুলোমায়ী বা পুলোমা। তিনি ধনকটকে ২১১ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং মঢ়রীপুত্র শকসেনকে শেষ রাজা না ধরিয়া পুলোমায়ীকে শেষ রাজা ধরিতে হইবে এবং ২১৮ খৃষ্টাব্দ অন্ধ্ররাজত্বের অবসান কাল ধরিতে হইবে।

১৪৪০ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ বাদ দিলে ১২২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল। পূর্ব্বোক্ত অয়ন গণনার দ্বারাও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং ১২২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

(৩) তৎপুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র পড়ুমায়ীর নাসিকস্থ শিলালিপি দেখুন।

(৪) গির্ণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের শিলালিপি দেখুন।

সাহিত্যিক

আমরা নবীন সাহিত্যিক্
ব্যাকরণ মেনে চলে যেবা তারে দিই মোরা শতধিক্।
সংস্কৃত কবে মরিয়া গিয়াছে,
দাঁত ভাঙা কথা শুধু তায় আছে,
নেহাৎ সেকেলে মলার মতন ফেলে দেওয়া তারে ঠিক,
তবুও গোপনে উল্টাই পাতা দেখে লই চারিদিক্;
কোথায় রয়েছে প্রকৃতির শোভা,
উপমা কোথায় কবি মনোলোভা,
ললিত পদের নৃত্যভঙ্গে কোথায় ডেকেছে পিক্;
চুরি করিবার নাহি কিছু মানা যেবা যত পারে নিক্।

আমরা লিখিগো নূতন ছন্দে,
সাগরী ভাষার ধারিনেক ধার শিহরি উঠি সে গন্ধে।
'বুঝিনা অনেক মানেই তাহার'—
বুঝিবে একথা সাধ্য কাহার!
আঁটিয়া উঠিবে মোদের সহিত কে আছে বচনদ্বন্দ্বে,
লড়াই করিতে আসিলে অমনি চড়ে বসি তার স্কন্ধে।
বানান করিগো নূতন ধরণে
দ্বিতীয় ভাগ যে নাহি আর মনে,
যুক্তেরে মোরা মুক্ত করেছি ভাঙিয়া নিয়ম বন্ধে।
মন্দে ফেলেছি ভালোর দলেতে ভালোরে ফেলেছি মন্দে।

মোদের লিখিতে চাইনা মাথা
ইহারই মধ্যে মসীতে ভরেছি গোটা গোটা কত খাতা।
ইহার ভাবটা, উহার ভাষাটা,
বেমালুম মোরা চুরি করি খাঁটি,
বেশীভাগ তার ইংরাজী হতে শুধু অনুবাদ যা তা।
অথচ দেখাই মৌলিকতায় আমরাই যেন ধাতা।
মাঝে মাঝে তার দিয়া "কোটেশন"
দেখাই কতনা নূতন 'ফ্যাসন'
মুগ্ধ হইবে পাঠক পঠিকা পড়িলে একটি পাতা,
স্থানয় উঠিবে চৌদিকে শুধু যশের উচ্চ গাথা।

মাসিকে মোরাই সব
পত্রে পত্রে কীর্ত্তিত তাই আমাদেরি জয়রব।
মোদের শুধু সে কবিতা বুঝি
বিলাতি ধরণে নভেল সৃষ্টি,
নাটক নাটিকা গদ্য পদ্য সাহিত্যের বৈভব;
কখন লিখিবা এমন হেঁয়ালি সৃষ্টি সে অভিনব!
"কি জানি কি" এর দোহাই দিয় সে
দর্শন কত লিখি বসে বসে,
পুরাতনে ছিই উড়াইয়া হেসে করিয়া উচ্চ রব,
আজিকার যুগে মোরাই লেখক, ভাবুক, রসিক, সব।

আসিবে কে এই দলে?
এস ত্বরা করি লেখনী লইয়া সময় যাইছে চলে
একখানি চাই নোট বুক আর
লিখিয়া রাখিতে বাছা কথা সার,
অভিধান খানি সঙ্গে আনিও লুকায়ে খাতার তলে;
অব হয় আরো নিজ মূর্ত্তির আলো কচিত্র হলে।
ধরণ ধারণ না হ'লে শিক্ষা,
হবেনা কাহারো এ নব দীক্ষা,
দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ লাগাতে হইবে কলে,
হাত বাড়ালেই স্বর্গ পাইবে জন্ম হবে না ম'লে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে! বনমাঝে কি মনোমাঝে বলিতে পারি না—কিন্তু ঐ উদাস-করা পরাণ-হরা মোহন বাঁশী মধুর স্বরে অবিরাম বাজিতেছে! বাঁশরীর সে ব্যাকুল আহ্বানে একদিন যমুনা উজান বহিয়াছিল—ব্রজাঙ্গনাগণ লোকলাজভয় পরিহার করিয়া কুলে ডালি দিয়া আকুল মনে উদাস প্রাণে সেই মদনমোহন বংশীবদনের সঙ্গসুখ আশে ছুটিয়াছিল—আর আজ আমিও তেমনই লোক লাজে জলাঞ্জলি দিয়া—সংসারের শত খুঁটিনাটি ছাড়িয়া—আপনা ভুলিয়া অধীর আগ্রহে পথের বাহির হইয়াছি! যাহাকে চাহিতেছি—যাহার আশায় আজ পথের বাহির হইয়াছি, এ জীবনে তাহার সঙ্গ লাভ কখনও ঘটিবে কি না তাহা আমার সেই বংশীধারী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার বাঁশীর সুধামাখা স্বর আমাকে উদাস করিয়া তুলিয়াছে—আমি উদভ্রান্ত, উন্মত্ত ও দিশেহারা হইয়াছি—তাই সেই পাগল-করা বাঁশীর টানে সেই বাঁশরীর রবই লক্ষ্য করিয়া উধাও ছুটিয়াছি! দুর্গম বনপথ—কঙ্করময়, কণ্টকাকীর্ণ! প্রতিপাদবিক্ষেপে কুশাঙ্কুর চরণে বিঁধিতেছে—গুরুজন গঞ্জনা, লোকাপবাদ বা অপযশভীতি যে একেবারে নাই, তাহাও নহে; তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল সেই বংশীরবের প্রতি কাণ পাতিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছি! যত যাইতেছি ততই পথ বাড়িয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঁশরীর রবও যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। বাঁশীর সেই 'প্রাণ কেড়ে নেওয়া' সুর, সে সুরের সেই মধুর মূর্চ্ছনা, বাঁশীর খেলা অথবা সেই বংশীবাদকের লীলা তাহা বলিতে পারি না—তবে সে সুরের সেই মূর্চ্ছনায়—সে ওস্তাদের সেই ওস্তাদী আলাপে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় মুগ্ধ; সুতরাং আমি সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সেই সুধার উপভোগ করিতে না পারিলে যেন তৃপ্তি বোধ করি না। আমার এই তোলপাড় ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর আমার নাই; আমি কেবল বাঁশীর টানে আকুল হইয়া ছুটিয়াছি! কোথায়—কতদূরে—আমার এই ছোটাছুটির অবসান হইবে তাহা আমার সেই বংশীধারীই জানেন। তবে দেখিতেছি যতদিন ঘরের কোণে পড়িয়া বাঁশীর রবে আকুলি বিকুলি হইতেছিলাম ততদিন যেন কেমন নিঃসঙ্গ কেমন নিরালা অবস্থায়—কেমন নিরাশার তীব্রদাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিলাম। আর আজ যেই একটু ঘরের কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি—উদার উন্মুক্ত গগনতলে প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল ছায় আশ্রয় করিয়াছি—অমনই যেন সেই বাঁশীর সুর শতদিকে শতভাবে আমায় টানিয়া লইতে চাহিতেছে! আজ আমার দাঁড়াইবার অবসর নাই—বোঝাবুঝির সময় নাই—হিসাব নিকাশের তিলমাত্র অবকাশ নাই! আজ দেখিতেছি ঊর্দ্ধে নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, অন্তরে বাহিরে, আমার সর্ব্বত্র সেই বাঁশরীর সুরলহরী ওতপ্রোত! ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম—অনন্ত আকাশপটে সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে প্রতি নিয়ত এই বাঁশীর সুরে আহ্বান করিতেছে—আবার উপগ্রহও এই বৃহৎ গ্রহের বাঁশীর রবে আকুল হইয়া তাহার পানে উধাও ছুটিয়াছে! নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম ক্ষীণতোয়া কংসাবতী বরষার নববারিসমাগমে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুকূল প্লাবিত করিতে করিতে সেই বাঁশীর টানেই সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে—সাগরবক্ষ পূর্ণ শশধরের বাঁশরী রবে আকুল হইয়া তরঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে! সম্মুখে, পশ্চাতে চাহিলাম—সে কি দৃশ্য! অগণিত নরনারী স্নেহ বা অভাবের তাড়নায়, শোকের শেলাঘাতে, দুঃখের [illegible], বিরহের কাতরতায় মুহ্যমান! আবার কেহ বা [illegible] ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে, পাপের প্রবল চক্রাবে, রোগের [illegible] কবলে, বিপদের অতল জলধিতলে পড়িয়া [illegible]

নিঃসম্বল! সহানুভূতির শান্ত মধুর বাঁশরীরব শুনিবার জন্য সকলেই উৎকীর্ণ—সকলেই উদ্‌গ্রীব! অন্তরের প্রতি একবার নয়ন ফিরাইলাম—দেখিলাম, এক হৃদয় অন্য একটি হৃদয়কে প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, মৈত্রী, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই এক বাঁশরীর সুরে আহ্বান করিতেছে! বুঝিলাম—মানুষ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল—মনুষ্য হৃদয়ে একমাত্র তৃষা অন্য হৃদয়কামনা; বাঁশী এই কামনাই তাহার মধুর স্বরে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। মনে হইল, সত্যই ত; হৃদয়ে হৃদয়ে এই সংঘাত—হৃদয়ে হৃদয়ে এই যে মিলন, ইহাই ত মানব জীবনের সুখ; বাঁশী ত এই সুখের কথা—এই মিলনের কথাই, আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে জাগাইয়া তোলে! কিন্তু এই প্রাণে প্রাণে মিলন—এই পবিত্র মহাসম্মিলনরূপ সুরস্বর্গ গড়িয়া তোলা কেমন করিয়া সম্ভবে? তৃষিত নয়নে পথের পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম—আমার ন্যায় বাঁশীর টানে মজগুল—আমার মতন, বাঁশী শুনে পথ-হারা' আর কেহ আছে কি না? দেখিলাম, এ পথে শুধু একা আমি বাহির হই নাই—আমার মতন শত শত লোক বাঁশরী রবে ঘরের বাহির হইয়া—লাজ মান কুল ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া এ পথের পথিক হইয়াছে। কল্পনা বা খেয়াল নহে—সত্য সত্যই তাঁহারা বাঁশীর সেই বিচিত্র রাগিণী শুনিয়া লোক হিত-সাধনে পাগল হইয়াছেন। মানবতার অতীত ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—ভারতের এই পুণ্যক্ষেত্রে, একদিন এক পুণ্য মুহূর্ত্তে জগতের জীবকে জরা মৃত্যু রোগ শোকের কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধদেব এই বাঁশীর টানে আকুল হইয়াই মহাভিনিষ্ক্রামণ করিয়াছিলেন। রাজভোগ—কান্তাসাহচর্য্য—পুত্র স্নেহের কঠিন বন্ধন, কিছুই তাঁহাকে এই বাঁশীর টান হইতে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বুদ্ধদেবের লীলাবসানে তাঁহারই পবিত্র নামে সমাজে যেদিন আবার ঘোরতর অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, সেদিনও এমনই বাঁশীর আহ্বানে আকুল হইয়া কলুষিত, অধঃক্ষিপ্ত সমাজকে উদ্ধার করিতে কিশোর শঙ্কর জননীর স্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া পথের বাহির হইয়াছিলেন। আবার একদিন এই সোণার বাঙলায় পবিত্র তীর্থ পুণ্যধাম নবদ্বীপে পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য এমনই বাঁশীর সুরে পাগল হইয়া হরিনাম-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব 'জীবে দয়া, নামে রুচি' রূপ অক্ষয় উপদেশ-সুধা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিতরণ করিতে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননীর অশ্রুজল—পতিব্রতা পত্নীর মায়া—স্বজন বান্ধবের সকরুণ মিনতি কিছুই তাঁহাকে তাঁহার পুণ্যব্রত পালনে নিরস্ত করিতে পারে নাই। আর এই সেদিনের কথা—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের পর যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে একটা বিপ্লবের সূচনা হইল—যখন সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবল সঙ্ঘাতে বাঙ্গালীর ধর্ম্মপ্রাণতা মত ও পথ লইয়া বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিল—তখনও এমনই বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর চিরবরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-জগতের সেই সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যের মধুর রসাস্বাদে চরিতার্থ হইয়া শুধু বাঙ্গালী কেন সমগ্র ভারতবাসী, এমন কি নিখিল জগৎ আজও তাই তাঁহার চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। নয়ন ভরিয়া দেখিলাম—ভক্তি ভরে এই মহাপুরুষগণের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিলাম—মানবজন্ম ধন্য ও সফল হইল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল মুক্তাত্মা এই কয়জন মহাপুরুষই কি কেবল বাঁশীর টানে আকুল হইয়াছিলেন? কই, আমার ন্যায় রিক্ত, হৃতসর্ব্বস্ব, গুণলেশহীন কাহাকেও ত বাঁশীর সুরে পাগল হইতে দেখিলাম না? নয়ন ফিরাইতে না ফিরাইতে দেখিলাম ভারতের অগণিত সাধু সন্ন্যাসী, আমারই মতন কত শত নির্গুণ, অখ্যাত, অকৃতী মানুষ সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া—লোকালয় ত্যাগ করিয়া পদব্রজে দুর্গম পথে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ভারতের দূর-দূরান্তরস্থিত পুণ্যতীর্থে ছুটিতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কায়িক ক্লেশ কেন?—এ তীর্থ দর্শন লালসা কেন?—এ পুণ্যার্জ্জনস্পৃহা কেন? উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম—এই লালসা ও স্পৃহার অন্তরালে—এই

একাগ্রতা ও ঐকান্তিকী ভক্তির মধ্যেও সেই বাঁশীর সুর লহরী উচ্ছলিত! শুনিলাম ভারতের কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এই ভাবে সকল বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেছে—তাহাদিগকেও সেই বাঁশীর সুর আকুল করিয়া তুলিয়াছে। মনে হইল বাঁশীর সুস্বরলহরী কেবল বুদ্ধ শঙ্কর, গৌর নিতাই, নানক কবীর, তুকারাম তুলসী-দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কাঙ্গাল হরিনাথকে পাগল করিয়া তোলে নাই—এই অপূর্ব্ব বাঁশীর টানে দেশবিদেশের অনেককেই মজিতে হইয়াছে! বুঝিলাম—ভাগবতের সেই বর্ণনা, নানাকর্ম্মনিরতা ব্রজগোপীগণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র শ্যামের সন্ধানে ছুটিয়া যাওয়া নিরর্থক কবি কল্পনা নহে। নব্যশিক্ষাগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আমরা যতই কেন না এই ব্যাপারকে কুসংস্কার ও কুরুচিপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করি কিন্তু তথাপি ইহার মূলে যে সত্য বিরাজমান, উপহাস করিয়া তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমরা সংসারে দেখিয়াছি সেবা-স্বরূপিণী ব্রহ্মচারিণী বিধবা আপনার কমকলেবর পাত করিয়াও সংসারের সেবা করিতেছেন—সাধ্বী বনিতা পতির পদপার্শ্বে বসিয়া অনাহারে অনিদ্রায় অম্লানবদনে নিশিদিন তাঁহার রুগ্নদেহের পরিচর্য্যায় নিরতা—প্রবাসগত পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্খায় জনক জননী সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতচিত্তে ব্যাকুলভাবে ইষ্টদেবতার চরণ বন্দনায় রত রহিয়াছেন—প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা বৎসরান্তে শারদীয় পূজাবকাশে স্বীয় দয়িতের চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া বিরহক্লেশ প্রশমন করিবার আশায় প্রতি মুহূর্ত্ত যুগযুগান্তরের ন্যায় ভাবিতেছেন! এ কেন?—কিসের জন্য? না সেই বাঁশীর সুর তাঁহাদিগকেও এই ভাবে মজাইয়াছে। বাঁশরীর সে ব্যাকুল আহ্বান তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছেন না। আবার দেখিতে পাই—মা ছেলেকে দোলায় ঘুম পাড়াইয়া সংসারের শত কাজে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময় সহসা শিশু 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! মায়ের হাতের কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গেল—অমনি শশব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি তিনি ছেলেকে বুকে লইয়া শান্ত করিলেন। সুকুমারী বালিকা কুঞ্জবনে আপনার খেলাঘর পাতিয়া সহচরীগণ সহ খেলা করিতেছে—অমনি স্নেহময়ী জননী আদরভরে কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন; যেখানের ধূলোখেলা সেইখানে রহিয়া গেল—বালিকা বিজলীবেগে ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল! কিশোর বালক বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সবে মাত্র জলযোগ করিতে বসিয়াছে, এমন সময় দ্বার প্রান্তে ক্রীড়াসহচরগণের সঙ্কেত-ধ্বনি তাহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল—অমনি মুখের গ্রাস মুখে রহিয়া গেল, বালক সঙ্গীগণের সঙ্গে মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল আবেগে ছুটিল! এখানেও আবার সেই বংশীধ্বনির প্রভাব—সেই অপরূপ বাঁশীর আকর্ষণ! লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সংসারের এই প্রকার নিত্য শত শত দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যেও বাঁশীর সেই অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান। ভাবিলাম একবার সাহিত্য-জগৎটা ঘুরিয়া আসি—বাস্তব ছাড়িয়া কল্পনার রাজ্যে এই বাঁশী কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না দেখিয়া আসি। অধিক দূর যাইতে হইল না; দেখিলাম—পুরাণে কাব্যে, দর্শনে ইতিহাসে, নাটকে উপন্যাসে নানাভাবে এই বাঁশীর সম্মোহন-শক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ প্রমুখ ঋষিগণ—রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ—বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি, ও ভারবী প্রমুখ কবি সমূহ—আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, প্রমুখ আদর্শ ললনাগণ সকলেই এই বাঁশীর টানে পাগল হইয়াছেন। আবার জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ—কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, ভাগবতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র—রাজকৃষ্ণ রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র—অক্ষয় দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র,—গোবিন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয় বড়াল সত্যেন্দ্র নাথ প্রমুখ সকলকেই বাঁশী তাহার আপন সুর-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ করিয়াছে। দেখিলাম শুধু কাব্যে, উপন্যাসে, গীতে, নাটকে তাঁহারা এই বাঁশীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত নিজ জীবনেও তাঁহারা তাহার আলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মাতার স্নেহের আহ্বানে ব্যাকুল হইয়া অকুতোভয়ে তরঙ্গভঙ্গসমাকুল দামোদরের প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া এই বাঁশীর টানেই মায়ের কোলে ছুটিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর গিরীশচন্দ্র এই বাঁশীর টানে আকুল হইয়াই আজীবন লোকাপবাদ গুরুগঞ্জনা ও বিপদ আপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনসন্ধ্যায় অটুট বিশ্বাসবলে ইষ্টদেবের চরণ-সান্নিধ্যলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। সাধক-কবি রজনীকান্তও এই বাঁশরী রবে মুগ্ধ হইয়া কঠোর রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও দেহাদিমমতা ভুলিয়া বিশ্বজননীর অঙ্কে "ওমা এই ত নিয়েছ কোলে" বলিয়া অন্তিম শয়ন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম বাঁশীর মধুর রবে কেহই আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে,—কি সাংসারিক জীবনে, কি পারমার্থিক জীবনে বাঁশী সকলকেই আপনার সুরসম্মোহন মন্ত্রে মোহিত করিয়াছে। অনাদি যুগের সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে বুঝিবা বাঁশী চিরদিনই এমনি করিয়া সকলকে পাগল করিয়া আসিতেছে। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এই বাঁশীর মহিমা সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন; তাই "শ্যামের বাঁশরী" বলিয়া আজও ইহা তাঁহার সুপবিত্র নামের সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'রাধা নামে সাধা' বাঁশী সে যুগেও যেমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশেষ ধ্বনি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিত, আজও তেমনি বিচিত্র সুর লহরীতে সকলের হৃদয় যমুনায় উজান বহাইতেছে!

কিন্তু কি সেই বাঁশী যে নিখিল বিশ্ব তাহারই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ? কেমন সেই সুর যে সেই অচেনা অজানা রাগিণীর চকিত পরশে নৈশ অন্ধকারে জন্মান্তরীন সুখ-স্বপ্নের ন্যায় মুহূর্ত্তের মাঝে অন্তরে এক নবজাগণের মধুর আস্বাদ অনুভূত হয়? এ বাঁশী ত সমরাঙ্গনের রণভেরী নহে—রঙ্গালয়ের ক্লারিওনেট নহে—অথবা বিলাসীর বিলাসের বাঁশ নহে। এ বাঁশী তবে কি উপাদানে গঠিত? কে যেন কাণের ভিতর ফুকারিয়া কহিল "ওগো ভাবুক! এ বাঁশী প্রেমের বাঁশী—প্রেমময় শ্যামসুন্দর প্রেম-যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া প্রেমভরে প্রতিনিয়ত এই বাঁশী বাজাইতেছেন। প্রেমের বাঁশী নানাভাবে, নানা ছন্দে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নিতুই নব প্রেমের সুর ধ্বনিত করিয়া তাঁহারই প্রেমের আহ্বান ব্যক্ত করিতেছে! বিশ্বের নরনারী সেই আহ্বানে অধীর উন্মত্ত হইয়া ক্রমবিকাশের পথে তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার আশায় অলক্ষিত ভাবে ছুটিয়াছে!" একবার ভাবিলাম—কে সেই শ্যাম? এই শ্যামা জলদার শ্যাম তনুর মাধুরী মাঝে অঙ্গ ডুবাইয়া—হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও আত্মাভিমান ভুলিয়া—তাঁহারই সর্ব্বস্ব, সর্ব্বাবলম্বন, অঞ্চলের নিধি সন্তানগণের সহিত প্রেমে গলিয়া একাত্মতা উপলব্ধি করিতে পারিলে কি সেই প্রেমমাখা শ্যামচাঁদের সন্ধান মিলিবে না? শুনেছি যেই শ্যামা সেই শ্যাম — শ্যামার প্রেমে কি শ্যাম ধরা দিবে না? মণোবীণায় তারে তারে ঝঙ্কার দিয়া কে যেন বিচিত্র নবসুরে গাহিয়া উঠিল — "পাবে—পাবে; শ্যামচাঁদ যে তোমারি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বাহু যুগল প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অনুতাপের অশ্রুজলে গতজীবনের সকল গ্লানি ধৌত করিয়া তোমার আমিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীকে প্রেমের বিশালতার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দাও, দেখিবে সত্য সত্যই সেই শ্যামসুন্দর তোমার হৃদয়যমুনা তীরে তোমারি চেতনার কদম্বমূল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন! সেদিন বুঝিবে তোমারি প্রেমের বাঁশী শুনিয়া সবার হৃদয়-যমুনা দুইকূল প্লাবিয়া ছুটিয়াছে—নির্ম্মম নরহন্তা রত্নাকর সাধু, ভক্ত, ঋষিতে পরিণত হইয়াছে—মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের উদ্ধতশির বশিষ্ঠের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে।" বুঝিয়া দেখিলাম —সত্যইত; প্রেমের বলে কি না সম্ভব? এ শক্তিতে যে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে—ধরা স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। কান পাতিয়া শুনিলাম—দূরে অতিদূরে কি যেন মধুমাখা সঙ্গীতের রেশ সান্ধ্যবায়ুসন্তাড়িত হইয়া আমার স্বপ্নবীণায় এক নব আশার ঝঙ্কার তুলিয়া গেল; প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল! আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—সেই অদৃশ্য বংশী-বাদকের উদ্দেশে বলিলাম— 'ওগো! বাঁশীর ঠাকুর! ওগো হাসি-কান্নার ধন! এমন করিয়া পথের বাহির হইয়াও একা আমি যে মেঘের

ঘোরে আর মনের কোণে কোণে ফিরিতে পারি না।
একবার বল্—

"আমার, একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে ?

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে,
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে ;
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে ?"

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

প্রতিক্রিয়া।

(গল্প)

(ক)

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যতীন্দ্রমোহন আপনার বিদ্যুৎ-আলোকজ্জ্বল ড্রইং রুমে বসিয়া নিখিল ও রমেশ বাবুর সহিত চা পান করিতে করিতে হিমাংশুর অনুপস্থিতিতে সন্ধ্যাবেলা তাঁহাদের "ব্রীজের" আড্ডা ফাঁক যাইবে বলিয়া যখন তাহার 'আক্কেলের' সমালোচনা করিয়া পরিহাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার "ফারমে"র জনৈক কেরাণী আসিয়া তাঁহাকে মায়ের অসুখের কথা জানাইয়া ছুটির প্রার্থনা করিলে তিনি রূঢ় ভাষায় তাহাকে হতাশ করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। স্বভাবতঃ মিষ্টভাষী পরদুঃখকাতর যতীন্দ্রমোহনকে তাঁহার কর্ম্মচারীর ওই কাতর ও সঙ্গত আবেদন এরূপ ভাবে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া বন্ধু নিখিলবাবু তাঁহাকে বলিলেন "তুমি ভুল করলে যতীন! ওর মুখ দেখলে মনে হয় যে মিছে কথা বলে না, দু'দিনের জন্যে ছেড়ে দিলেই পারতে।" যতীন্দ্র-মোহন বলিলেন "ভুল আমি করিনি ভাই ; আমি জানি সত্যই ওর মায়ের অসুখ, তবুও আমি ছুটি দিতে পারিনে" ক্ষণিক থামিয়া পুনরায় বলিলেন "এই কেরাণীগুলো কৃপার পাত্র হলেও আমার চক্ষুশূল!"

রমেশ বাবু বলিলেন "তোমার এই কেরাণী বিদ্বেষের কারণ কি হে? ওরা ত নিতান্তই "বেচারী" মানুষ!"

"তাই ত আমি এমনি কষাঘাতে ওদের প্রবুদ্ধ করতে চাই—"বলিয়া যতীন্দ্রমোহন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আমার অতীত ইতিহাস না জানলে তোমরা আমার এই ব্যবহারের সঙ্গতি বুঝতে পারবে না।"

সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে যতীন্দ্রমোহনের মুখের পানে চাহিল। যতীন্দ্রমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বলছি"। তারপর চাকরকে তামাক আনিতে আদেশ দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

(খ)

দরিদ্র বিধবা মাতাকে মাসে দুইটার স্থলে চারিটা একাদশী করাইয়া, বালিকা পত্নীকে নিরাভরণা করিয়া বি, এ, পাশের "ডিগ্রি" লইয়া যখন বাহির হইয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল 'সাত রাজার ধন মাণিকের' অধিকারী ত হইয়াছি, এখন বিলম্ব শুধু একটা রাজত্ব প্রাপ্তির! তাই সে সময় মনটা উঁচু সুরে বাঁধা ছিল বলিয়া মা যখন পল্লীর কাহারও নিকট শুনিয়া কোথায় কি কর্ম্মখালির সংবাদ আমাকে আসিয়া জানাইতেন, তখন একটা দারুণ অভিমানে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিত! মনে হইত মাকে বলি "আমি কি তেমন ছেলে মা। যে এর তার মত যা তা একটা কাজ করব? আমার মত 'অনারে' বি, এ, পাশগুলোকে যে লাট সাহেব ডেকে

চাকরী দেবেন!" কিন্তু হায়রে "আমি স্বপন করিনু স্বপন কেবল আকাশে!" অনেকদিন লাট সাহেবের আহ্বানের অপেক্ষায় বৃথা বসিয়া থাকিয়া মহম্মদের পর্ব্বত সন্নিধানে গমনের মত আমি নিজে যখন চাকরীর 'হাটে' বাহির হইয়াছিলাম, তখন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে নামের পশ্চাতে বি, এ, অক্ষর দুইটা থাকিলে আত্মপ্রসাদ এবং 'বাহবা' লাভ ভিন্ন তাহাতে পেটের জ্বালার নিবৃত্তি হয় না।

অবশেষে আমার পিতৃবন্ধু, আমাদের জেলার জজ সাহেব বাহাদুরের সেরেস্তাদার কুঞ্জবাবুকে ধরিয়া অনেক চেষ্টার পর যখন কেরাণীর "ঘানিতে" পাকা হইয়াছিলাম, তখন না খাইয়া মরিবার ভাবনা হইত অব্যাহতি পাইয়া মনটা ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেও অন্তর তাহাতে তৃপ্তি বোধ করে নাই। বি, এ, পাশের পড়া যে তখন আমার চিত্তে অনেক রঙ্গিন স্বপ্ন রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। তাই চাকরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার সহকর্ম্মীগণের সহিত নিজের তুলনা করিয়া, তাহাদের হেয় সংসর্গে সারা জীবন কাটাইতে হইবে মনে করিয়া দারুণ ধিক্কারে আমার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিত! তাহার উপর যখন শুনিতাম উপরি ওয়ালার বকুনী খাইয়া আত্মসমর্থনের জন্য সেই কেরাণীর দল কবে কোন হাকিম কাহাকে কি ভাল 'সার্টিফিকেট' দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া পরস্পরের মধ্যে "বাহাদুরী জাহির" করে—যখন দেখিতাম সামান্য কয়েকটা পয়সা "উপরির" জন্য ইহারা জলৌকাকেও লজ্জা দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তখন একটা বিষম ঘৃণায় আমার অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত! মনে হইত ইহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে পলাইয়া যাই। কিন্তু হায়রে! তাহা কতটুকু সময়ের জন্য? বি, এ, পাশের "তকমা" যে স্পর্শমণি নয়, তখন যে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম! তাই "মরমে মরিয়া" মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, অদৃষ্টের দোষে যখন কেরাণীই হইতে হইল, তখন দৈত্যকুলের "প্রহ্লাদের" মত একটা দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইব। আমার 'রকম' দেখিয়া সহকর্ম্মীগণ আমাকে নদীতীরে উপবিষ্ট মৎস্যলোলুপ পক্ষী-বিশেষের সহিত তুলনা করিয়া আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত "কত হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলেন, কত জল!"

ঘটিয়াছিলও তাহাই। বি, এ পাশ করিয়া আমি যে একটা সামান্য কেরাণী হইয়াছি, আমার স্ত্রী তাহা কিছুতেই মনে করিতে চাহিত না। আর তাহাকে আমি তাহা বিশ্বাস করাইতামই বা কিরূপে? আমাকে একটা "কেষ্ট-বিষ্ণুর" মত কিছু হইবার জন্যই না একে একে সে তাহার পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া আমার পড়িবার খরচ যোগাইয়াছিল! তাই আমার চাকরী লাভের পর সরলার যখন তখন আমাকে "এটা ওটা" চাহিয়া আব্দার করা অসঙ্গত ছিল না। আমার মাতৃদেবীও তখন পুত্রের সৌভাগ্যোদয়ে সময় পাইয়া "ধর্ম্মে-কর্ম্মে" ব্যয়ের মাত্রাটা এমন বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, যে তাহা পূর্ণ করিতে যাইয়া চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণীর চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীর রঙ ধোঁয়ার মত হইয়া যাইত! কোন দিন মাতাঠাকুরাণীকে এ বিষয়ে যদি একটু "বুঝিয়া" চলিতে বলিতাম, তাহা হইলে তিনি অভিমান করিয়া বলিতেন "দরকার নেই আমার কিছুর! তুই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে যতীন, মরলেও তবু হাড় ক'খানা গঙ্গায় পড়বে।" ইহার উপর আর কথা চলিত না। মাতাঠাকুরাণীরই বা দোষ কি! তিনি দেখিয়াছিলেন পাড়ার হর-কাকার ছেলে মাত্র একটা পাশ করিয়া যদি মাকে মুঠা মুঠা টাকা আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার তিনটা-পাশ-করা দিগ্‌গজ পুত্র তাহা পারিবে না ইহাই বা তিনি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন? সুতরাং ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে 'উপরির' চেষ্টা দেখিতে হইল। প্রথম প্রথম এই কাজের জন্য আমার মনে অনুশোচনার সীমা থাকিত না—কাহারও কাছে হাত পাতিয়া কিছু লইবার সময় মনে হইত হাতটা যেন বাঁকিয়া খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সে ভাব আর রহিল না। ক্রমে ব্যাঘ্রের রক্তের আস্বাদন পাইবার মত 'উপরির' রস পাইয়া আমি এমনই 'মরিয়া'

হইয়া উঠিয়াছিলাম, যে তখন মাত্র একটা পয়সার জন্যও পরমাত্মীয়ের কাছে আমার চোখের এতটুকু পর্দা ছিল না।

(গ)

বৎসর কয়েকের মধ্যে অনেক 'ডিপার্টমেন্ট' ঘুরিয়া "নায়েক" বলিয়া আমি যখন মুন্সেফ বাবুর পেস্কারিতে বাহাল হইয়াছিলাম, তখন মনে মনে অনেকেই আমার উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেও সেরেস্তাদার বাবুর নিতান্ত অনুগৃহীত "জীব" বলিয়া তাহারা আমার সেই সৌভাগ্যোদয়ে আমাকে মৌখিক অভিনন্দন করিতে ত্রুটী করিল না। কিন্তু কতখানি আত্মাবমাননায় বিনিময়ে যে আমি সেই "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার অন্তর্যামীরই গোচর ছিল। এক রকম "জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত সেরেস্তাদার বাবুর বাড়ীর প্রায় সকল কাজই আমাকে করিতে হইত। আমার চাকরীতে প্রবিষ্ট হইবার কয়েক দিন মধ্যেই "পরে তেমন যত্ন লয় না" বলিয়া সেরেস্তাদার বাবু তাঁহার পুত্রদের প্রাইভেট টিউটরকে বিদায় দিয়া আমার হাতে ছেলেদের সঁপিয়া দিয়াছিলেন। চাকরে বাজারের পয়সা চুরি করে বলিয়া সেরেস্তদার-গৃহিনী, আমাকে "ঘরের ছেলের মত" ভাবিয়া, ওই কাজটা করিয়া দিতে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তাহার উপর সেরেস্তাদার বাবু, আমাদের দেশের কলাটা মাছটা ইত্যাদি পছন্দ করেন বলিয়া সময় সময় বাজার হইতে খরিদ করিয়, বাড়ী হইতে আসিয়াছে বলিয়া, তাহাকে ভেট দিয়া আসিতাম। প্রাণপাত তপস্যায় ভগবানও যখন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ হন, তখন আমার অতখানি সাধনায় সেরেস্তাদার বাবু যে প্রসন্ন হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু অধিক দিন এ ভাবে কাটিল না, এই পরম ঈপ্সিত পেস্কারীই আমার শনি হইল; "অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!"

মুন্সেফ বাবু প্রায়ই একটা না একটা ফরমাইস করিয়া আমাকে সন্ধ্যাবেলা তাঁহার বাসায় ডাকিতেন। কোন কোন দিন সকালেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। এইরূপে মুন্সেফ বাবুর "পীরিতে" পড়িয়া সেরেস্তাদার বাবুর বাড়ীতে আমার "হাজিরার" কামাই হইতে লাগিল। এক দেবতাকে তুষ্ট করিতে যাইয়া আমি যে অন্যের রোষের কারণ হইতেছি, তাহা গোড়াতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমার অবস্থা যে তখন রামরাবণের মারীচের মত! সেরেস্তাদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "যতীন বাবু এখন বড় 'পায়া' পেয়েছেন, আমাদের আর মনে থাকিবে কেন?" তাহার কথা শুনিয়া আমার ডাক ছাড়িয়া কান্না পাইত. মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সেই অনুযোগের উত্তরে আমার চক্ষে যে মিনতি ফুটিয়া উঠিত, তাহা দেখিলে পাষাণও বুঝি দ্রব হয়! মনে হইত চীৎকার করিয়া বলি "দেখাইবার হইলে দেখাইতাম, হনুমানের বক্ষে রাম নাম লেখা থাকিবার মত আমার অন্তরের অন্তরেও আপনার মূর্ত্তি আঁকা আছে।" কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ হইলে "পোড়া মাছ"ও যখন হাত হইতে পলাইয়া যায়, তখন সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যে সেরেস্তাদার বাবু আমার উপর বিরূপ হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! ইহা কাহারও দোষ নয়—"আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

এইরূপে সেরেস্তাদার ও মুন্সেফ দুই নৌকায় পা রাখিয়া আমি যখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলাম, তখন আশ্বিন মাস আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে আকাশে বাতাসে তখন উল্লাস করিয়া পড়িতেছিল! আদালত বন্ধ হইবার বিলম্ব ছিল না। অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া প্রিয়জনদের "বিরহ-বিধুর মুখে মিলন-মধুর হাস" দেখিবার আশায় আমার মত প্রবাসীরা যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিনা মেঘে বজ্র পতনের মত একদিন "নোটিশ" পাইলাম আমাকে "ভিটেন্‌শনে" থাকিতে হইবে। হুকুম দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কেরাণীর হুজুর সেরেস্তাদার বাবুর অসন্তোষের ফলেই আমার এই দুর্গতি! নিতান্ত অকারণে আমার উপর সেরেস্তাদার বাবুকে এতখানি কঠিন হইতে দেখিয়া তাঁহার উপর দারুণ বিরাগে আমার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিলেও "মরমের কথা মরমে চাপিয়া" তাঁহার

কাছেই আমাকে ছুটিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি ছাড়া কেরাণীকুলের যে কোন গতিই ছিল না। সেরেস্তাদার বাবুর কাছে গিয়া অনেক মিনতি করিলাম—আমার মত ক্ষুদ্র জীব-বিশেষকে হত্যা করিলে যে তাঁহার "হাত গন্ধ" মাত্রই সার হইবে ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—অন্ততঃ পূজার কয়টা দিনের জন্যেও ছুটি দিয়া অনুগ্রহ করিতে বলিলাম, কিন্তু "বিফল ভেল সবহুঁ।" সেরেস্তাদার বাবু মুচকি হাসিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, আমাকে তাঁহার কাছে না আসিয়া হাকিম মুরুব্বির কাছে যাইতে উপদেশ দিলেন। সেরেস্তাদার বাবুর কথায় দারুণ অপমানে আমার সমস্ত দেহটা রী রী করিয়া উঠিয়াছিল; অনেকদিন পরে মনের সুপ্ত আত্মসম্মানের যেন সাড়া পাইয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই গোলামীর শিকল সজোরে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ি। কিন্তু তখনই মনে পড়িল মাতা পত্নী ও শিশু পুত্রের মুখ! চাকরী ছাড়িয়া দিলে তাহাদের খাওয়াইব কি? সংসারের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া আমার সমস্ত রাগ "জল" হইয়া আসিল। মনে হইল কেরাণীর আবার অভিমান!

সেরেস্তাদার বাবুর বিরাগভাজন হইয়া, এইরূপে নানান্ দুর্গতির মধ্যে দিয়া যখন আমি দিন কাটাইতে ছিলাম তখন একদিন বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম আমার পুত্রের অসুখ। পল্লী গ্রামের লোক যে কতখানি মুস্কিলের মধ্যে পড়িলে টেলিগ্রাম করে তাহা আমার অবিদিত ছিল না। তাই টেলিগ্রামে পুত্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া আমার চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা ঘুরিয়া উঠিল! আমি তাড়াতাড়ি এক খানা দরখাস্ত লিখিয়া টেলিগ্রাম খানি লইয়া সেরেস্তাদার বাবুর কাছে ছুটিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমি কি করিতে পারি? ছেলের অসুখ, তুমি সাহেবের সঙ্গে দেখা কর—ছুটির মালিক তিনি।" আমি কাতর হইয়া বলিলাম "দোহাই আপনার, একটু দয়া করুন। ওই এক সন্তান আমার তাঁকে একবার দেখে আসবার অনুমতি দিন্।" সেরেস্তাদার বাবু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন "আমার লোক আমি, আমার আমার দয়া! যাও মিছে বিরক্ত ক'র না"। সেরেস্তাদার বাবুর এই পৈশাচিক ব্যবহারে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার মনে পড়িল, এই সেরেস্তাদার বাবুর পুত্রের বসন্তের সময় আমি জীবন তুচ্ছ করিয়া কি সেবাটাই না করিয়াছিলাম। যাক্ সে কথা, অগত্যা আমাকে সাহেবের কাছে যাইতে হইল। তিনি দরখাস্ত পড়িয়া আমাকে তাহার উপর সেরেস্তাদার বাবুর "নোট" লিখাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সাহেবের কথা শুনিয়া আবার সেরেস্তাদার বাবুর কাছে ছুটিলাম। এবার তাঁহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিলাম, আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের নাম করিয়া তাহার সহিত সেরেস্তাদার বাবুর হৃদ্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া একটু করুণা করিতে বলিলাম কিন্তু মরুভূমিতে সলিল অন্বেষণের মত সমস্তটাই বৃথা হইল। সেরেস্তাদার বাবু কঠোর স্বরে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন "নোট ফোট আমি লিখ্‌তে পারব না। তোমার ছেলে মরে কি বাঁচে তা কি আমি জানি, যে একটা মিছে কথা লিখে দেব। যাও কাজ করগে। অনর্থক ঘ্যান ঘ্যান ক'রো না।" অনেক লাঞ্ছনা অপমান এতদিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন আর পারিলাম না। মানুষের একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে। কেরাণী হইলেও আমি মানুষ, তাহার উপর পুত্রের অসুখের খবর আমাকে "মরিয়া" করিয়া তুলিয়াছিল। আমি উদ্ধত স্বরে সেরেস্তাদার বাবুকে বলিলাম—ছুটি দিতে না পারেন, আমি Resignation দিচ্ছি—আমাকে মুক্তি দিন" বলিয়া তথনই অফিসে আসিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া সেরেস্তাদার বাবুকে পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

উত্তেজনার প্রথম বেগটা ঈষৎ হ্রাস পাইলে 'ঝোঁকের মাথায়' কাজ করিবার জন্য আমার অনুশোচনার অবধি ছিল না। কেরাণীর আবার সুখ দুঃখ কি! রাত পোহাইলেই 'হন্তে' কুকুরের মত পেটের চিন্তায় যাহাকে অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার পক্ষে মুখ বুজিয়া সমস্ত সহিয়া যাওয়াই যে উচিত ছিল! বাড়ীতেও আমার হঠকারিতার জন্য অশান্তির অবধি ছিল না। মা মুখ ভার করিয়া থাকিতেন, সরলা সর্ব্বদাই

নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া আমার কাণে বিষ ঢালিয়া দিত! তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম—দুনিয়াটা কি জিনিস! নিতান্ত পরমাত্মীয়রাও যখন "পান হইতে চুণ খসিয়া পড়িলে" মুখ ফিরাইয়া লয় তখন সেরেস্তাদার বাবুর অপরাধ কি? অন্তরে বাহিরে দারুণ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া আমি পাগল হইয়া যাইবার মত হইয়াছিলাম; এক একবার মনে হইত আত্মহত্যা করিয়া সকল দুঃখ অবসান করি; কিন্তু শিশু পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া—তাহার মায়ায়—আমার সে ইচ্ছা তিরোহিত হইত। তাহার মধুর হাসিতে, আধ আধ কথায়, অপূর্ব্ব অঙ্গ ভঙ্গিতে, আমি আমার দুর্গতিময় জীবনে যেন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইতাম। মনের এই রকম অবস্থায় কোন দিকে কিছু "কিনারা" করিতে না পারিয়া তখন আমি সহরে আসিয়া একটা বিড়ির দোকান করিয়া বসি। বি, এ, পাশ করা আদালতের ভূতপূর্ব্ব পেসকার বাবুকে বিড়ি বেচিতে দেখিয়া তখন দেশে একটা ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছিল। আমার ব্যবহারে আত্মীয় স্বজনদের উঁচু মাথা হেঁট হইল বলিয়া তাঁহারা আসিয়া আমাকে ধিক্কার দিয়া যাইতেন। সরলার গঞ্জনায় আমার বাড়ী যাইবার উপায় ছিল না। তাহার সহিত দেখা হইলেই তাহার বাপ মা তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সে আমাকে শোনাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিত। চারিদিক হইতে প্রবল বাধা সত্বেও আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই। আমাকে সকল প্রকারে বঞ্চিত করিয়া ঈশ্বর আমার মনে যে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন! তাহার পর ধীরে ধীরে সেই বিড়ির কারবার হইতে আমি আজ এত বড় "কারবের" মালিক হইয়াছি।"

আত্মকাহিনী শেষ করিয়া যতীন্দ্রমোহন উভয় বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন বুঝতে পারছ কেন আমি আমার কর্ম্মচারীর সহিত রূঢ় ব্যবহার করি? আমি চাইনে যে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা চিরদিন গোলামীর মায়ায় মুগ্ধ থাকে? বুঝিয়ে বললে ওদের চৈতন্য হবার আশা অল্প। তাই আমি ওদের সঙ্গে হৃদয় হীনের মত ব্যবহার করে ওদের মনে কেরাণী জীবনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করাতে চাই।"

শ্রীনলিনী নাথ দে।

পর্য্যটকের পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যাক্ তারপর এখন আর্য্যদের প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্যের বিষয় তোমাকে কিছু লিখব। এর অধিকাংশ উপকরণগুলি আমি Hall, Kanakasabhai, Caldwell, Bureun, Hunter, Eastwise প্রভৃতির দাক্ষিণাত্য বিষয়ক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি, কতক অবশ্য এখানকার দু'চারজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মুখ থেকে পেয়েছি; আবার মাঝে মাঝে আমার নিজের টীকা-টিপ্পনীও চালিয়েছি।

বহু ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, দ্রাবিড় জাতি ইরাণ হ'তে ভারতবর্ষে আগমন করেছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে তারা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে—তার সঠিক সাল তারিখ এখনও জানা যায় নি; তবে তারা যে হিন্দু: আর্য্যজাতির বহুপূর্ব্বে এদেশে প্রবেশ করেছে, তার অনেক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির এদেশে বসবাস স্থাপন করবার পূর্ব্বে, কোল্, নিগ্রিটো, গোণ্ড, বেদ্দাইক্ (Veddaic), মঙ্গল (Mongolians) প্রভৃতি ও পরে শক্ (Scythians), হুন্, গ্রীক্, কুশান্ প্রভৃতি জাতি প্রবেশ করে এবং কালক্রমে অল্প বিস্তর আর্য্য জাতির সঙ্গে শোণিত সংমিশ্রন ও ভাবের আদান প্রদান ক'রে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক স্তরে স্থান পেয়ে নিজেদের হিন্দু নামে পরিচিত করে। এখন একটা সমস্যা-প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দ্রাবিড় জাতি যদি ইরাণ হ'তেই এ দেশে

আগমন ক'রে থাকে, তাহ'লে আর্য্যদের মত তারা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তীকালের 'কারমেনিয়া' 'জিড্রোসিয়া' বা 'আরাচোশিয়া' নামীয় প্রদেশের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ ক'রে প্রথমতঃ সিন্ধুতীরে উপনিবেশ স্থাপন করবে ও পরে (আর্য্যদের ন্যায়) জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের শস্য-শ্যামল সমভূমিতেই বিস্তৃত হয়ে পড়বে; কিন্তু ফলতঃ তা না ক'রে তারা দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করতে গেল কেন? তা ছাড়া দ্রাবিড়দের প্রাচীনতম শাস্ত্রে কোন বড় নদীর তীরে তাদের উপনিবেশ স্থাপনের সন্ধান পাওয়া যায় না, বরং সমুদ্র তীরেরই ঈষৎ উল্লেখ পাওয়া যায়। আমার ধারণায়, খুব সম্ভবতঃ দুঃসাহসিক দ্রাবিড়েরা জলপথে নূতন বাসস্থানের সন্ধান করতে করতে মালবার উপকূলের কোন স্থানে এসে অবতরণ ক'রেছিল। পরে সেস্থান হতে সমস্ত দক্ষিণাপথময় ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখতে পাই যে মধ্যযুগ হ'তে এযাবৎকাল ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যসংঘটিত আদান-প্রদান, এর পশ্চিম উপকূল হ'তেই বিশেষ ভাবে চলে আসছে। তা ছাড়া গ্রীক, রোমান ও আরবীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ স্পষ্টতঃ উল্লেখ ক'রে গেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও রোম, ফিনীশীয়া, আরব, চাল্ডীয়া (Chaldea বা পুরাতন ব্যাবিলোনীয়া), এমন কি চীন দেশের সহিত দক্ষিণ ভারত বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল। টলেমী (Ptolemy) গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে Kolkai নামে পাণ্ড্য রাজ্যের একটী বিখ্যাত বন্দর ছিল; এই Kolkai যে অধুনাতন Calicut হইতে অভিন্ন নয়, তাইবা কে বলতে পারে?

এতদ্ব্যতীত দ্রাবিড়দের প্রাচীনতম গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় যে অতি পুরাকালে "বিল্লবর" ও "মীনবর" নামক তাদের দুটি প্রধান শাখা ছিল। "বিল্" শব্দ অর্থে বধ করবার শস্ত্র বিশেষ। এই শব্দ হ'তেই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার বল্ ও ভল্ল ধাতু নিষ্পন্ন (অর্থ—বধ করা) 'বলি' 'ভল্ল' (বাঙ্গলায়—'বল্লম') প্রভৃতি শব্দ গঠিত হয়েছে। মীন শব্দের অর্থ মৎস্য। সুতরাং বিল্লবর জাতির কার্য্য শীকার করা ও মীনবর জাতির পেশা মৎস্য ধরা ছিল—এটা সহজেই বুঝা যায়। তা'হলে আমরা ন্যায়তঃ অনুমান করতে পারি যে দ্রাবিড়গণ ভারতের তীরে পদার্পণ ক'রে অল্পকাল মধ্যে, কার্য্যগত পার্থক্য ও প্রকৃতিগত প্রবণতার ফলে, দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়; একদল—যারা নৌ-চালনায় সিদ্ধ হস্ত ছিল, তারা সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে বসতি স্থাপন করে, কেউ বাণিজ্য ব্যাপারে—কেউ মৎস্য ব্যবসায়ে লিপ্ত রইল;—এরা মীনবর। অন্য একদল ক্রমশঃ অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হ'য়ে পর্ব্বত-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, শীকার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগল। কর্ণাটতীরবর্ত্তী বহুস্থানে, রাজপুতানা ও গুজরাটের জঙ্গল ও পার্ব্বত্য উপত্যকায়, বিল্লবর ও মীনবর জাতির অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়। কোনও স্থানে এরা বীরবর নামে অভিহিত। এই বিল্লবর জাতিই উত্তরাঞ্চলে ভীল (ভল্লই যাদের প্রধান সহায়) নামে পরিচিত এবং সমগ্র রাজস্থানের কীর্ত্তিগাথা এদের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। তারপর দ্রাবিড়দের পরবর্ত্তীকালের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা গো-পালন বিদ্যায়, যুদ্ধ নীতি শাস্ত্রে ও রাজ্য শাসন বিষয়ে পারদর্শী হ'য়ে উঠেছে এবং আর্য্যদের গোত্রও গোষ্ঠের ন্যায় 'পঞ্চ মণ্ডলম্'এর সৃষ্টি ক'রে, পঞ্চ জাতি পঞ্চ 'কো'র (রাজা) অধীনে বসবাস করছে। এই 'কো' বা রাজা, দ্রাবিড়গণ কর্ত্তৃক বিশেষ ব'লে পূজিত হ'তেন ব'লে, তাঁর বাস-গৃহ বা মন্দিরের নাম—'কোভল'। আর্য্যদের সংস্পর্শে আসবার পূর্ব্বে দ্রাবিড়দের মধ্যে দেবতা অপেক্ষা অসংখ্য উপ-দেবতারই পূজা যে আর্য্যদের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বে উৎপন্ন ও প্রচলিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ উপদেবতার পূজার 'মন্ত্রম্' প্রাচীন তামিল ভাষায় রচিত, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মসম্মত পৌরাণিক দেব দেবীর পূজার প্রায় সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্রাদি উত্তর ভারতের ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্র হ'তে গৃহীত। প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্ম এখনও মাদ্রাজী জন সাধারণ ভুলতে পারে নি। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিক, পার্ব্বতীর পূজার অবসরে 'আয়নার' 'বীর ভদ্রন্', 'কল্কী', 'কারুপন', 'ইরুলন্'

প্রভৃতি অন্যতর উপদেবতাগুলির নিয়মিত পূজা না করলে, তাদের বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে যেন একটা মস্ত ত্রুটি থেকে যায়। সেইজন্য, আমাদের দেশে যেমন 'বারো মাসে তের পার্ব্বণ', সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে অন্ততঃ তিনশত তেরটি 'উৎসবম্' অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রেতা যুগের প্রথমাংশে ঋষি অগস্ত্য, গুরুভক্তিপরায়ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের গর্ব্বোন্নত মস্তক চিরতরে অবনমিত রেখে, তাঁর ভাই (মহাভারত মতে পুত্র) ইধ্মবাহ, সুতীক্ষ্ণ, শরভঙ্গ, নমুচি, প্রমুচি, সুমুখ, বিমুখ, স্বস্ত্যাত্রেয় প্রভৃতি মুনিসংঘ সঙ্গে নিয়ে, দক্ষিণাপথে এসে উপনিবেশ স্থাপন করলেন। পরে রামচন্দ্র বনবাস গমন পথে দণ্ডকারণ্য ও তাহার দক্ষিণবর্ত্তী স্থান রাক্ষসভীতিহীন করলে, ক্রমে ক্রমে তথায় একদল চতুর্ব্বর্ণ আর্য্যজাতির বসতি স্থাপিত হ'ল। দ্রাবিড়দের প্রাচীন শাস্ত্রে ঋষি অগস্ত্য 'তামিড় মুনি' নামে কথিত হয়েছেন। তিনি প্রথম পাণ্ড্য রাজের রাজপুরোহিত ও মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও অনেকগুলি ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র মার্জ্জিত তামিল ভাষায় প্রণয়ণ ক'রে শিষ্যের সভায় প্রচলিত করেন। তামিল শাস্ত্রকারগণের মতে, সপ্ত চিরজীব ব্যতীত অগস্ত্যও একজন চিরজীবি; কাহারও মতে ত্রিচুবল্লীর (Tinnevely) পশ্চিমে "অগস্ত্য-পর্ব্বতে" লুক্কায়িত আছেন; আবার অনেকের বিশ্বাস—তিনি দক্ষিণ নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররূপে (Canopus Star) চির বিরাজ করেন, প্রতি ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিবসে ('অগস্ত্যোদয়') লোকচক্ষুগোচরে আসেন। "অগস্ত্য-পল্লী" প্রভৃতি কয়েকটি স্থান এখনও এই ভারতপূজ্য ঋষির নাম দক্ষিণাপথে অমর ক'রে রেখেছে; কন্যা কুমারীকার (Cape Comorin) নিকটবর্ত্তী জনপদে অদ্যাবধি তিনি "অগস্ত্যেশ্বরম্"রূপে পূজা পেয়ে আস্‌ছেন্।

অগস্ত্য-আগমনের দুই চারি শতাব্দীর মধ্যে দ্রাবিড় জাতির অধিকাংশই আর্য্যদের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সংমিশ্রিত হ'য়ে "গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ" চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সংযোজিত হ'লেন এবং হিন্দু নামে পরিচিত হ'য়ে আপোষে পরস্পরের ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির আদান-প্রদান করতে সুরু করলেন। রামচন্দ্রীয় যুগে যারা শবর-কিরাতাদি নামে অভিহিত এবং যাদের অধিকাংশই আর্য্য-প্রভুত্ব সহজে বিনা রক্তপাতে বহুকাল মেনে নিতে চায় নি, তারাই পরিশেষে শূদ্রেতর 'পঞ্চম' জাতি "পারিয়া" (Pariah) রূপে পরিণত হ'য়েছে। এই পারিয়া জাতির অধুনাতন অবস্থার বিষয় পরে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। যারা প্রথমে মীনবর শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল ও পরে যারা 'নেইয়ড়্‌ যাকড়' নামে অভিহিত হয়, তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়—তারা বৈশ্য শ্রেণীতে ও যারা কেবল সমুদ্রের জল শুষ্ক ক'রে লবণ প্রস্তুত করত ও জাল ফেলে মৎস্য ধরত—তারা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল। এরা সাধারণতঃ সমুদ্রের ধারে যে গ্রামে বাস করত, তাকে 'প্যাত্তন' (বা 'পত্তনম্') বলত। এজন্য দেখা যায় যে, করমণ্ডল উপকূলস্থ অধিকাংশ বন্দরেরই নাম পত্তনম্ ভাগান্ত; যথা—কালিঙ্গপত্তনম্ (Calingapatam), বিশাখাপত্তনম্ (Vizagapatam) মশুলিপত্তনম্, (Mosulipatam)* বিমলাপত্তনম্, (Bimlipatam) রামজারাপত্তনম্, (Ramjapatam) নাগ পত্তনম্ (Negapatam) ইত্যাদি।

দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতি ও সভ্যতা অনেকটা আর্য্যজাতির বিনা সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ কর'ছে ও পরে তাঁদের সংস্পর্শে এসে অধিকতর উন্নত হ'য়ে উঠেছে। এখন দেখা যাক্, পুরাকালে দ্রাবিড়গণের স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রার্জ্জিত সভ্যতার কতখানি বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্রাবিড়দের বিল্লবর ও মীনবর শাখার কয়েকদল গুর্জ্জর,

* মেসোপটেমিয়ায় 'মশুল' নামক একটী স্থান আছে যেখানে সর্ব্বপ্রথম জগৎ বিখ্যাত মস্‌লিনের উদ্ভব করেছিল। এই দুটি নামের সঙ্গে পরস্পরের বেশী সৌসাদৃশ্য আছে; এতে মনে হয়—প্রাচীন আসুরীয় জাতির সঙ্গে দ্রাবিড়গণ বাণিজ্য ব্যাপার করতে গিয়ে মশুলের মস্‌লিন বয়ন বিদ্যা শিখে আসে এবং স্বদেশে ফিরে এই স্থানের মশুলিপত্তনম্ নামকরণ করে। পরে এই মশুলিপত্তনম্ থেকেই ঢাকা প্রভৃতি স্থানে মস্‌লিন বয়ন শিল্প প্রচার লাভ করে। এখনও মশুলিপত্তনম্ কার্পেটের গালিচা ও পরমপুর কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিমাংশের দুই একটি স্থলে বসতি বিস্তার করে। আর্য্যেরা যখন সিন্ধুনদ পার হ'য়ে আর্য্যাবর্ত্তে অধিকার বিস্তার কর্‌তে লাগ্‌লেন, তখন এই জাতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হ'ল। স্মৃতিতে দেখা যায়,—অন্ধ্, কর্ণাট, গুর্জ্জর, দ্রবিড় ও মহারাষ্ট্র—এই পঞ্চদেশ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ও এদের অধিবাসীগণ হীনদশা-প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। আর্য্যেরা ভারতের অন্যান্য আদিম অধিবাসীগণকে 'রাক্ষস', 'অসুর', 'দস্যু', 'দাস' প্রভৃতি ঘৃণিত আখ্যা প্রদান ক'রে, পরিশেষে তাদের শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর্‌লেন, কিন্তু এই জাতটিকে পতিত ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত কর্‌লেন কেন?—কারণ আর কিছুই নয়, তাঁরা দেখ্‌লেন যে এই জাতি জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করে, উন্নত প্রণালীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও দুর্গ নির্ম্মাণ কর্‌তে জানে (বেদে এদের ৭৩৯টি সপ্ত প্রাসাদ ও নব্বই দুর্গের উল্লেখ আছে), বহুপূর্ব্ব হ'তে নিজেদের মধ্যে একনায়ক তন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন ক'রেছে এবং সভ্যতায় এই জাতি তাদের চেয়ে ন্যূন নয়।

রামায়ণের শেষ সময়ে চোল্, তোণ্ড ও পাণ্ড্য রাজ্য স্থাপনের কথা জানা যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাংশে কঙ্কন, চের ও কানারা রাজ্য ও পূর্ব্বাংশে অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হয়। অধুনা উড়িষ্যার দক্ষিণের কতকাংশ নিয়ে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত অন্ধ্র রাজ্য বিস্তৃত হয়, ও পাণ্ড্য রাজ্য অধুনা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণের প্রায় সমস্ত অংশ ও মহীশূরের কিয়ৎ পরিমাণ নিয়ে সংগঠিত হয়। উত্তরকালের ইতিহাসে এই দুটি রাজ্যই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনির গ্রন্থে অন্ধ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মুনি খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দ্রাবিড়, পাণ্ড্য ও চোল্ রাজ্যের কথা ব'লে গেছেন এবং শেষ দুটির রাজধানীর নাম যথাক্রমে 'মদুর' ও 'উরৈয়ূর' উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে, দাক্ষিণাত্য আবিষ্কৃত হবার পর, আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে মথুরা নামক পাণ্ড্য নামে একজন বৈশ্য পাণ্ড্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে, 'বৈগা' (আধুনিক বিগাই Vigai) নদীর তীরে মদুর নগরে (যা বীর নাম চিরস্মরণীয় 'কর্‌থার' জন্য—অথবা অপরে) রাজধানী পত্তন করেন। তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে কাত্যায়ন বর্ণিত 'মদুর' ও আধুনিক 'মাদুরা' (Madura) প্রাচীন পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মদুর নগর বা মথুরা নগর ব্যতীত অপর কিছু নয়। আরও সন্ধান জানা যায় যে, অযোধ্যাপুরী থেকে তরমন চোল্ নামক এক ব্যক্তি কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি পরিষ্কৃত ক'রে, সেখানে চোল্ রাজ্য স্থাপন করেন ও ত্রিশিরপল্লীর (অধুনা ত্রিচিনাপল্লী Trichinopoly) নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। কাত্যায়ন লিখিত উরৈয়ূর (Woriure) নামক স্থানটি এখনও পর্য্যন্ত ত্রিচিনাপল্লীর দুই মাইল দূরে বিদ্যমান্—এ স্থানটি Cigar Industry র জন্য বিখ্যাত। অপরন্তু, উপরোক্ত দুটি স্থানের নামের শেষে দৃষ্ট 'উর' শব্দটি নাকি প্রাচীন চাল্ডীয়দের নিকট থেকে ধার করা। তামিল ভাষায় এর অর্থ—গ্রাম, 'দিহাত' বা স্থান (locality)। মাদ্রাজ প্রদেশে, উত্তরাঞ্চলের 'পুর'-ভাগান্ত স্থানের ন্যায়, 'উর' ও 'ওর্' শব্দ ভাগান্ত বহু স্থান দৃষ্ট হয়; যেমন—চিতুর, মহীশূর, পদনূর বা পোড়ানূর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিসন্দুর, কাণানূর, কোইম্বাটুর, গুন্টুর, কাজনূর, রাইচুর, কারুর, ত্রিভালোর, মাঙ্গালোর, তাঞ্জোর, নেলোর, বাঙ্গালোর ইত্যাদি।

তারপর জানা যায় যে, 'কুলোতুঙ্গ' নামক এক চোল্ নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রজারা যুবরাজ ব'লে স্বীকার না করায়, তিনি তাকে ত্রিপথি (Tirupetty) নামক স্থানের দক্ষিণে এক বিস্তৃত ভূমি খণ্ড দান কর্‌লেন। তার রাজধানী হ'ল—'কাঞ্চী'—অধুনাকালের ভারত-বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র কঞ্জীবরম্ (Conjevaram)। ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম একবিংশতিবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে, সেই নরহত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গোকর্ণ তীর্থে যাত্রা করেন। দ্রাবিড়দের প্রাচীন পুঁথি পাঠে অবগত হওয়া যায়—তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের সমুদ্র-তটের প্রসার লাভ ক'রে কেরল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ও কতকগুলি ধীবর জাতীয় মৎস্যজীবিকে ধ'রে, যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ক'রে, তাদের বসতি-

স্থাপন করান্ ; কিন্তু তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা সর্পজাতির * অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে অত্যল্প-কাল মধ্যে সেখান থেকে পলায়ন করে ; তখন পরশুরাম অনন্যোপায় হ'য়ে কুরুক্ষেত্র হ'তে কয়েকটি আর্য্য ব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে সেথায় স্থাপিত কর্‌লেন ; এঁরাই অধুনা মালাবারের 'নম্বুদ্রি' ও 'নায়ার্'দের পূর্ব্ব পুরুষ এবং মলয়ালম্ [মলয়+অ'লয়ম্, ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরপূর্ব্বদেশে মলয় পর্ব্বত (Anamalai Hills)—কবিজনবাঞ্ছিত মলয় সমীরের জন্মভূমি ব'লে পরিজ্ঞাত] ভাষার জনক ; কারণ এই ভাষার মধ্যে বহুতর নিছক্ সংস্কৃত শব্দ দেখা যায়। কাশ্মীরের ন্যায় ত্রিবাঙ্কুরের অধিকাংশই গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণের অধিবাস ও তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণ আর্য্যজাতীয় ছাঁচে ঢালা। সুতরাং বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, পরশুরামের আর্য্যাবর্ত্ত থেকে ব্রাহ্মণ আনা'র প্রবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মেগাস্থিনিশের বিবরণে দক্ষিণাঞ্চলে পাণ্ড্য ও আন্ধ্র রাজ্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায়। তিনি লিখেছেন যে তারা তাম্রলিপ্তির প্রান্ত (মৌর্য্য রাজ্যের দক্ষিণ) পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার ক'রেছিল। তারপর দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুঙ্গবংশীয় পুষ্প মিত্রের রাজত্ব সময়ে যোগশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি পতঞ্জলি তাঁর পাণিনি-মহাভাষ্যে আন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল্ রাজ্য কাঞ্চীনগর, কাবেরী নদী প্রভৃতির উল্লেখ ক'রেছেন ; দাক্ষিণাত্যে তিনিই বোধ হয় ব্যাঘ্রপাদ মুনি নামে অভিহিত ছিলেন। পরে (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৪ অব্দে) সুঙ্গ ও কান্ব বংশের বিলোপ সাধন ক'রে আন্ধ্রগণ মগধ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার ক'রে লন্। তারা তিন শত বর্ষাধিক কাল মগধে রাজত্ব করেন। দাক্ষিণাত্যবাসিগণের এই সর্ব্বপ্রথম হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়ের সুযোগ ঘট্‌ল ; এঁর পূর্ব্বে তাঁরা মুষ্টিমেয় আর্য্যদের নিকট থেকে যা' মৌখিক ভাবে শিক্ষা ক'রেছিলেন, তা' অতঃপর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ী লোকের অনুবেষ্টনীর মধ্যে তাঁদের ব্যবহারিকভাবে—হাতে-কলমে শিক্ষা করতে হ'ল। এই সার্দ্ধ তিনশতাব্দী ধ'রে আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্বকাল মধ্যে তাঁরা দিলেন খুব কমই, কিন্তু বিনিময়ে যা' গ্রহণ কর্‌লেন—তাতে তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের ধারা, সামাজিক জীবন, ভাষা ও সাহিত্য পরিবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। এর পূর্ব্বে আন্ধ্রদের ভাষা—তেলেগুতে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সময় হ'তেই তাঁরা সংস্কৃত ভাষা-ভাণ্ডার থেকে অগণ্য শব্দ চয়ন ক'রে তৎসাহায্যে নিজেদের সাহিত্যের চারাটি মুঞ্জরিত ও শব্দ-কোষকে সম্পূর্ণ ক'রে তুল্‌তে সুরু কল্লেন। এই জন্যে তেলেগু ভাষার বর্ণমালা ও ব্যাকরণ নব গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় অল্লাধিক সংস্কৃতেরই অনুরূপ এবং এমন কি নিম্ন শ্রেণীর চলিত কথার মধ্যেও বহু সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় ; যথা—শিরস্ (মাথা,) হস্তমুলু (দুটি হাত,) হৃদয়মু (বুক,) চান্দ্রডু (চাঁদ), সূর্য্যডু (সূর্য্য) নক্ষত্রমুলু (তারকারাজী), নীড়লু (জল), কোঞ্চেমু (সং-কিঞ্চিৎ), আবদ্ধম্ (মিথ্যা), প্রিয়ম্ (দামী), দ্রাক্ষাপাণ্ডু (সং—দ্রাক্ষাফল), ইত্যাদি। কিন্তু পাণ্ড্য, চোল্ প্রভৃতি দেশে প্রচলিত তামিল ভাষা যে সংস্কৃতের বিনা সাহায্যে গ'ড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ—প্রথমতঃ, কতকগুলি আর্য্যপূর্ব্ব প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ, দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক তামিল বর্ণমালা দৃষ্টে পাওয়া যায়। স্বরবর্ণগুলি এই,—অ (বাঙ্গলার 'অ' নয়, হ্রস্ব 'আ'), আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, এ (দীর্ঘোচ্চারিত), আই, ও, ও (দীর্ঘোচ্চারিত), আউ, ইখ্। তারপর ব্যঞ্জন বর্ণ,—ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম, ইয়, র, ল, ব, ড় ('ড়' ও 'ঢ়' এর মাঝামাঝি কঠিন উচ্চারণ), ল ('ল' ও 'ড়' মিশ্রিত উচ্চারণ), র়, ন। প্রথম পঠনেই দেখা যাচ্ছে

* দাক্ষিণাত্যের এই সকল জনপদ যে পূর্ব্বে নানাজাতীয় ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাগপূজার পরিকল্পনা, ও নাগারী, নাগারি, নাগরীর নাগলমুরম্, নাগপত্তনম্, নাগোর, নাগকুনেই, নাগর কোইল প্রভৃতি স্থান সমূহের নাম হ'তে পাওয়া যায়।

তামিল বর্ণমালায় ঐ, ঔ, খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঠ, ড, ঢ, থ, দ, ধ, ফ, বর্গীয় ব, ভ, শ, ষ, স, হ ('স' ও 'হ' পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত হইতে গৃহীত হয়), ং, ঃ, ঁ, — এতগুলি বর্ণের অভাব ; উপরন্তু বিভিন্নভাবে উচ্চারিত দুইটি 'এ', দুইটি 'ও', তিনটি 'ন' দুইটি 'ল' একটি ইথ্ (এটি সাধারণতঃ 'হসন্ত'র কাজ করে) রয়েছে। আরও মজা এই যে খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, প্রভৃতির উচ্চারণ, বর্গের প্রথম বর্ণ দিয়েই সারতে হয়। যথা কট্‌ঠড়ম্ (অট্টালিকা), আমার লিখতে হবে—'কট্টটম্', তারপর "বুঝ জ্ঞানী যে জান সন্ধান !" তার উপর আবার এক মজা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় এদের ভাষায় সন্ধি, সমাস ও যুক্তাক্ষরের নিয়ম প্রচলিত নেই, বর্ণ ও শব্দের মধ্যে যেন Rowlatt Act জারী করা হ'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলি যেন, (১) মহাত্মা গান্ধী, আমার লিখতে হবে—'মহাতুমা কান্তী' (২) অরবিন্দ ঘোষ, লিখ্‌ব 'অরবিন্ত কোস', (৩) মহম্মদ ইব্রাহিম, লেখা চাই— 'মুকমুবদু ইপুরাহিম্' তামিলে আমার নাম লিখ্‌তে হবে এই ভাবে—'নিরুপ্‌পেন্দুদের কুমার পচু' ;—কিমাশ্চর্য্য অতঃপরম্ ! অনেক জায়গায় 'হ' 'স' ও বর্গীয় 'ব'য়ের উচ্চারণ যথাক্রমে 'ক', 'চ' ও 'প' দিয়ে চালানো হয় ; তার জলন্ত দৃষ্টান্ত উপরিলিখিত মহম্মদ ইব্রাহিম ও আমার নাম থেকেই পাচ্ছ। এরূপ অসম্পূর্ণ ও দুর্বোধ্য ভাষা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে—এমন কি জগতের কোন সভ্য দেশেই নেই ব'লে বোধ হয়। কিন্তু কল্ডওয়েল্ (Bishop Caldwell) বলেন, তামিল ভাষা, সংস্কৃত হইতে এ যাবৎকাল যতটা সাহায্য পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কিম্বা সমস্তটাই ফিরাইয়া দিলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না ; বরং অধিকতর পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত হয়।" তিনি আরও ব'লেছেন যে বাইবেলের 'দশটি উপদেশমালা' (Ten Commandments) প্রাচীন বিশুদ্ধ (Classical) তামিলে হুবহু তর্জ্জমা করা যায়, কেবল একটি সংস্কৃত শব্দের সাহায্য না নিয়ে পারা যায় না—সেটির শব্দটি 'মূর্ত্তি' (image)।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীগণকে আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথমে 'ম্লেচ্ছ' আখ্যায় বিভূষিত ক'রেছিলেন ; এই ম্লেচ্ছ শব্দের ধাতুগত অর্থ—'যারা অসংস্কৃত ভাষায় কথা বলে।' আর্য্যদের বৈদিক ভাষা ছিল—প্রাচীন ইন্দো-জার্ম্মাণ (Indo German) আর দ্রাবিড়দের ভাষা ছিল 'মাদির-তুরাণী (Medo-Turanian) ভাষা-ভাণ্ডার (stock) থেকে গৃহীত। এই দুই ভাষার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখেই আর্য্যেরা তাঁদের দক্ষিণাপথের প্রতিবাসীদের 'ম্লেচ্ছ' নামে ভূষিত করেন ; কিন্তু এই ম্লেচ্ছ ভাষা থেকেই আর্য্যেরা যে কতকগুলি নাম বাচক শব্দ আপনাদের ভাষার মধ্যে বেমালুম আত্মসাৎ ক'রেছেন, তার অনেকগুলি বিশ্বাস-যোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। নীর, মুক্তা, নাগ, ময়ূর, পিপ্পলি, মীন, ভল্ল, হিঙ্গুল প্রভৃতি শব্দগুলি দাক্ষিণাত্যের নিকট হ'তে ঋণ নেওয়া ব'লে জানা যায়। অগস্ত্যের পূর্ব্বে যে সকল তামিল সাহিত্য রচিত হয়, তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার নামগন্ধও নেই ; এখন সেগুলির অনেক জায়গার পাঠোদ্ধার ভাষাতত্ত্ববিৎ ছাড়া সম্ভবপর নয়। মহামুনি অগস্ত্য দক্ষিণ ভারতে এসে, প্রাচীন তামিল ও সংস্কৃত মিশিয়ে ডালে-চালে এমন একটা সুন্দর মুখরোচক খিচুড়ী প্রস্তুত করে গেছেন যে তা' তামিল লিখিত ও পঠিত ভাষায় এখনও পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে পরিবেশিত হ'য়ে আস্‌ছে। এই ভাষার সংস্পর্শে এসে অনেক বীর্য্যবান্ সংস্কৃত শব্দ ক্লীবলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন ; যথা—সমুদ্রন্, সায়াহ্নম্ (সায়াহ্ন) তীর্থম্ (পানীয় জল,) মনুষ্যম্, মন্ত্রম্, উৎসবম্, সমাচারম্ বিশেষন্, পণম্, (পাওনা), দেগম্ (দেহ), ঈশ্বরম্ ইত্যাদি। "ঠোল্ কাপ্পিয়ম" নামক একখানি প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ নাকি অগস্ত্যের একজন শিষ্য তাঁরই নির্দ্দেশানুসারে রচনা করেন ; এই ব্যাকরণখানির আদর্শেই পরবর্ত্তীযুগের তামিল ভাষা ও সাহিত্য গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে।

ডাক্তার বার্ণেলের মতে, কুমারিল স্বামীর আগমনের পূর্ব্বে (অষ্টম শতাব্দী) দ্রাবিড় জাতি বর্ণমালাকে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করতে পারে নি। আনুমানিক [illegible]

শতাব্দীতে বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য যদিও এই প্রদেশে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শন-মত উত্তর ভারতে যেরূপ সমাদৃত হ'য়েছিল, সেরূপ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে হয় নি। এই সময়ে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য এই দেশ ভাগে জন্মগ্রহণ ক'রে স্থানীয় ভাবে স্বীয় মত প্রচারে শঙ্কর অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হন্। অন্যদিকে অশোকের সময় হ'তেই বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকগণ আন্ধ্র প্রদেশের অধিকাংশ ও অধুনা নিজাম ও মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ত্রিপিটকের বীজ উপ্ত ক'রে আস্‌ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ সন্তোষ-জনক ফললাভ হয় নাই। সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, দাক্ষিণাত্যেও হিন্দু ধর্ম্ম চর্চ্চার সাড়া প'ড়ে গেল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এক দিকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পণ্ডিতরা মহা উদ্যমে সংস্কৃত ভাষায় বৃহৎ বৃহৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ণ করতে, অন্য দিকে একদল তামিল ভাষায় কথা-সাহিত্য, লোক সাহিত্য প্রভৃতি অবিশ্রান্ত লিখে যেতে লাগ্‌লেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও সাহিত্যের এই বিরাট ডামাডোলের মধ্যে কতকগুলি দ্রাবিড় বৌদ্ধ ও জৈন নিরুদ্বেগে (নয় হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) সহজবোধ্য ভাষায় নিজেদের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখে প্রচার করতে সুরু ক'রে ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের কর্ণধারগণ মরা গরুও ঘাস খাচ্ছে দেখে, দ্বিগুণ উদ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি মূল শাস্ত্রগুলি জনসাধারণের উপযোগী ক'রে নূতন ছাঁচে তামিল ভাষায় ঢেলে, প্রচার করতে লেগে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘাটে মাঠে, সজনে-বিজনে অনন্ত সাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত দেব-দেবীদের ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির তৈরী কত্তে তৎপর হ'লেন। দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগ যখন ক্রমান্বয়ে চালুক্য, মহারাট্টা, মুসলমান, ওলোন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজের সদর্প পদবিক্ষেপে প্রপীড়িত হচ্ছিল, সে সময় তামিল ভূমি নিশ্চিন্ত বিশ্রামে আপন ভক্ত কবিদের মধুর মর্ম্মস্পর্শী গীতি-কবিতা ভক্তি গদগদ চিত্তে শ্রবণ কচ্ছিল ও তার লক্ষ দেব-মন্দিরে অযুত ভক্তের উন্মাদ স্তোত্রের সঙ্গে পূজারতির বিপুল সমারোহ চল্‌ছিল। তারপর সপ্তদশ শতকে, কর্ম্মকাণ্ড-বাহ্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধবাদী শৈব সিতার সম্প্রদায় ও তার সাহিত্যের অভ্যুদয়। অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ কাল তামিল ধর্ম্ম সাহিত্য ও কাব্যের গতি অপ্রতিহতভাবে চল্‌ল বটে, কিন্তু তারপর বঙ্গের অধিকাংশ খাল বিল ক্ষুদ্র নদীর মত মজ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। উনবিংশ শতাব্দী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইতালীয় জেস্যুৎ (Jesuits) ও রোমান ক্যাথলিক মিশনারী (আমাদের দেশের ক্যারী-মার্শম্যানদের মত) তামিল সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা হ'য়ে একদিকে যেমন উপকার—অন্যদিকে তেমনি অপকার সাধন কল্লেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যের আপামর সাধারণ গভীরবেদীর ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলে প্রতীচ্য সভ্যতার বাহ্য অনুকরণে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন; দলে দলে ভদ্রেতর লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে লাগলেন,—বাঙ্গলার দেবেন্দ্র রামমোহনের মত কোন (reformer)ই তাদের সাম্‌লে রাখ্‌তে পারেন না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল সাহিত্যরথী কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম প্রকাশ ক'রেছেন, তাঁদের অনেকেরই স্যন্দন-শীর্ষে হিন্দু ধর্ম্মের 'বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট' উড়ে না, কাহারো ঘোটক নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে, অধিকাংশেরই রথের সারথী—উৎকট বিলাতী আদর্শ!

আধুনিক মাদ্রাজী সভ্যতা, আচার ব্যবহার প্রভৃতির পরিচয় কতক পূর্ব্বে দিয়েছি, আরও ক্রমে ক্রমে দিতে চেষ্টা ক'রব। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই এ যাবৎকাল কেউই তোমায় সুদীর্ঘ ৩১ পৃষ্ঠার চিঠি লেখেন নি—এমন কি বড়দাও নয়। * * * পরশু বোধ হয় ত্রিচিন-পল্লী রওনা হব। তোমার পত্রোত্তর পেলে, সেখানকার বিবরণ পূর্ণ আর ১ খানি সুদীর্ঘ চিঠি তোমায় লিখ্‌ব—আশা করি C/o Post Master, Trichy, S. I. Ry. এই ঠিকানায় পত্র দিও। আজ বড় পরিশ্রান্ত, আসি। প্রণাম নিও ও জানিও। ইতি

তোমার স্নেহের ঠাকুরপো

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

বন্দনা

সে এক সুদূর অতীত দিবসে মোহিনী বীণার ঝঙ্কারে,
মন্দ্রিল চারু উন্মদ রাগ শব্দ ব্রহ্ম ওঙ্কারে,
তখনও ভুবনে জাগেনি চেতনা, টুটেনি মোহের বাঞ্জনা,
সুপ্ত স্বপন অলস মর্ম্মে পশিল সে মধু মূর্চ্ছনা।
সুন্দর প্রাণে সামগান স্রোত ছুটিল মর্ত্ত্যে কল্লোলে,
মুগ্ধ হৃদয় উঠিল নাচিয়া, ভাসিল প্রেমের হিল্লোলে;
চমকি' বিশ্ব আনতশীর্ষ গাহিল ভারতী বন্দনা,
তুমি মা তীর্থ, তুমি মা বিত্ত, নিখিল-চিত্ত-রঞ্জনা।

সৌম্য উজল কান্ত তনিমা বিজন পর্ণ শয্যাতে
কানন কুটীরে নেহারি অধীরে ছুটিয়া মর্ম্ম লজ্জাতে
অযুত ভক্ত মুক্ত হৃদয়ে উচ্চারি বেদ মন্ত্ররে,
দৃপ্ত গরবে শুভ্র নিশান উড়া'ল জগত প্রান্তরে;
পূজার অর্ঘ্য আনিল লুটিয়া ভূতল নিতল অম্বরে,
রচিল রম্য হেম হর্ম্ম্য খচিত রত্ন মর্ম্মরে;
উল্লাস বিশ্ব আনতশীর্ষ গাহিল বিজয় বন্দনা,
তুমি মা তীর্থ, তুমি মা বিত্ত, নিখিল চিত্ত রঞ্জনা।

আবার যেদিন ধন্যা ধরণী লক্ষ্মী মায়ের সঙ্গমে,
ছড়ায়ে মহিমা পুণ্য প্রতিভা বিতরি স্থাবর জঙ্গমে,
সহসা থামিল বাণীটী তোমার জানিনা কাহার সঙ্কেতে,
গরিমা আকর ব্রহ্মবর্ত্ত চলিল ভ্রান্তি অঙ্কেতে;
জড়িমা জড়িত বক্ষে না হেরি তোমারি পুলক অঙ্কনে
ব্যাকুল ভারত সারাটী পৃথ্বী ভরিল করুণ ক্রন্দনে;
সভয়ে বিশ্ব আনতশীর্ষ গাহিল তোমার বন্দনা,
তুমি মা তীর্থ তুমি মা বিত্ত, নিখিল-চিত্ত-রঞ্জনা।

শ্যামল নিচোল অঞ্চল পাতি নিভৃত বঙ্গ অঙ্গনে,
বসালে পুন মা সাধক প্রবরে [illegible] রাগিণী স্বননে;
সে গীতে উঠিল বঙ্গ সেবক লুব্ধ মানস চঞ্চলি,
ভক্ত উপচারে যতনে অর্ঘ্য দিয়াছে চরণে অঞ্জলি;
তুমি মা ভারতী হইলে সেদিন বঙ্গ নিলয়ে বন্দিনী,
বঙ্গ অধরে মেদুর হাস্য খেলিল মানস রঞ্জিনী;
চকিত বিশ্ব আনতশীর্ষ গাহিল তোমারি বন্দনা,
তুমি মা তীর্থ, তুমি মা বিত্ত, নিখিল-চিত্ত রঞ্জনা।

আজি মা মঞ্জু কুঞ্জ বিতানে কুট্টিম মণি মজিয়া,
বিরাজি জননী রাজিছে তোমার ললিতোজ্জল ভঙ্গিমা;
দাও মা ভরিয়া রিক্ত হৃদয় মঞ্জুষা চির মঙ্গলে,
বরাভয় প্রদ আশীষ তোমার বেঁধে দি জীর্ণ অঞ্চলে;
রঙ্গ আলয় নিশায় তোমারে তুলে দি জগত সম্মুখে,
কি চারু লাবান ঝরিছে সেথায় দেখুক তায় মা উন্মুখে;
গাহুক বিশ্ব আনতশীর্ষ বঙ্গ বাণীর বন্দনা,
তুমি মা তীর্থ, তুমি মা বিত্ত, নিখিল-চিত্ত রঞ্জনা।

৺ সুরেন্দ্রনাথ [illegible]।

জুয়া।

উপন্যাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সোমনাথ কি করিবে ভাবিয়া অকুল পাথারে ভাসিতে লাগিল। প্রতিদিন দুই বেলা অতিথিশালায় সোমনাথের আহার হইতেছিল। রাণীর কঠিন বচন শুনিয়া সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল, সে রাত্রে আর আহার করিল না। পিঞ্জরায় আবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগল। মানুষ নিরাশ হইলে প্রথমে ক্রোধ পরে সম্মোহ উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ সোমনাথের রাগ পড়িয়া গিয়া সম্মোহের ভাব আসিয়াছে। সে যে কি করিবে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সোমনাথের একটী মাত্র চাকর ছিল। চাকরের নাম কেদার। সোমনাথের শয়ন গৃহেই তাহার নিজের সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুতের সাজ সরঞ্জাম থাকিত। কেদার তাহার সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুত করিত। ইকমিক্ কুকার, প্রাইমাস্ ষ্টোভ, চা, কাফি, কোকো, চিনি প্রভৃতি কেদারের নিকট মজুত থাকিত। সোমনাথ যে বাটীর উপর তলায় বাস করিত তাহার নীচের তলায় একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম পরিবার বাস করিতেন। হেমেশ এবং তাহার বিধবা ভগ্নী সুরূপা দেবী থাকিতেন। সুরূপা দেবী দেখিতে গ্রীক রমণীর ন্যায় লম্বা চওড়া, মুখের নিখুঁত গঠন, উজ্জ্বল চক্ষু, বয়স বত্রিশ বৎসর। সুরূপা দেবী সাংসারিক কাজে খুব পটু। যেমন রাঁধিতে তেমনি সেলাই করিতে তেমনি ঘর দরজা পরিষ্কার রাখিতে পটু ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। কিন্তু সুরূপা দেবী হিসাবী বলিয়া দারিদ্র্যের বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না। সুরূপা দেবী জীবনে অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন। তাঁহার পঞ্চবিংশ বয়সে পতির লোকান্তর হয়। তাহাতে তিনি এত বিরহবিধুর হইয়া পড়েন যে তাঁহার লম্বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চুলগুলি সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছিল। রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চুলগুলি দোলাইয়া যখন সুরূপা দেবী ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইতেন দূর হইতে যেন কোন স্বর্গকন্যা মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া অনুভূত হইত। যে রাত্রিতে সোমনাথ রাণীর প্রেমে হতাশ্বাস হইয়া নিরাশবহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে ছিল সেই রাত্রিতে এক নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া কেদার ছুটি লইয়া গিয়াছিল। এদিকে সুরূপার ভাণ্ডারে সেদিন একটুও চা ছিল না। দাদা উঠিয়া প্রাতে চা চাহিবেন। কি করা যায় এই ভাবিতে ভাবিতে সুরূপা উপরে সোমনাথের ঘরের বারান্দায় কেদার যেখানে শুইয়া থাকিত সেইখানে আসিয়া মিহি সুরে কেদার কেদার বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কেদার ছিল না—ঘরের ভিতর সোমনাথ জাগিয়া ছিল সে একটী বাতি হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনি কে? কেদারকে কি দরকার?" আমরা নীচের তলায় থাকি। "কেদারের নিকট কিছু চা ধার করিতে আসিয়াছিলাম।"

সুরূপাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সোমনাথ চাএর কৌটা খুঁজিতে লাগিল। সোমনাথ পূর্ব্বে কখন সুরূপাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। অদ্য সম্মুখে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সত্বর চাএর কৌটা আনিয়া সম্মুখে ধরিল।

সুরূপা বলিল—"এত চা কি হইবে।"

আমার আজ মুস্কিল। চাকর নাই। আপনারা যদি কাল সকালে দুই পেয়ালা চা আমাকে পাঠাইয়া দেন তা হ'লে বড়ই উপকার হয়। "আপনার এখানে কি আর কেহ আছেন।" "না। আমি সকাল বেলায় দু পেয়ালা না খেলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারি না।"

"আপনি যদি প্রাতে ৭টার সময় আমাদের বাহিরের ঘরে আসেন সেখানে ৪ পেয়ালা চা প্রস্তুত পাবেন। আমাদেরও আর অন্য চাকর চাকরাণী নাই।"

সোমনাথ একটু লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সুরূপা চলিয়া গেলেন। সোমনাথ এতটুকু সামান্য কথাবার্ত্তায় সমস্ত বেদনা ভুলিয়া গিয়া শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রাতে উঠিয়া দেখে প্রায় সাড়ে সাতটা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকিয়া হাত মুখ ধুইয়া একটা কামিজ গায়ে দিয়া চটি জুতা পরিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সুরূপাদের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হেমেশ বাহিরে আসিয়া সোমনাথকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরটী একটা ছোট খাট লাইব্রেরী ইহাতে দশটী আলমারীতে পুস্তক মাসিক পত্র এবং কতকগুলি খাতা ও মানচিত্রে পরিপূর্ণ। আলমারীগুলি চারিদিকে সাজান। মাঝখানে একটী বড় শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। টেবিলের চারিদিকে আট খানি কাঠের কেদারা। টেবিলের উপর চাএর বড় কেট্‌লী, পেয়ালা, সসার, চামচ, একটী বড় কাঁচের ডিসে অনেকগুলি কেক্ রহিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া হেমেশ সোমনাথকে বসাইলেন এবং ভগ্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"সুরূ, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া সেরে নাও।"

সুরূপা অপর দিকে বসিয়া চা ঢালিতে লাগিলেন। সোমনাথ হেমেশকে হিন্দু মনে করিয়াছিল। হিন্দুর ঘরে এইরূপ সভ্যতার আলোকে আলোকিত পরিবার দেখিয়া সোমনাথ বড়ই আনন্দিত হইল। হেমেশের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। গৌর বর্ণ। দেখিলে রুগ্ন বলিয়া বোধ হয়। কথাবার্ত্তা বেশ পরিষ্কার এবং সোমনাথ দু একটী কথায় তাঁহাকে বন্ধুবৎসল বলিয়া বুঝিয়া ফেলিল। চা খাইতে খাইতে হেমেশ বলিল,

"কেক্‌গুলি কিরূপ?"

সোমনাথ উত্তর করিল "অতি উত্তম।"

হেমেশ বলিল—"এই কেক্ সুরূর নিজ হাতে তৈয়ারী। সুরূপা লজ্জায় অবনত মুখে চা খাইতে লাগিল। চা খাইবার পর অনেক কথা হইতে লাগিল। সুরূপা চা খাইয়াই গৃহ কর্ম্মে চলিয়া গেল। হেমেশ সোমনাথকে বসিতে বলিলেন। সোমনাথ হেমেশকে কি করিতেন জিজ্ঞাসা করিলেন। হেমেশ বলিলেন—

"কন্‌ট্রাক্টারি করিতাম। ব্রহ্ম দেশে ছিলাম। আমরা অনেকগুলি ভাই ভগ্নী ছিলাম। সবগুলিই গত হইয়াছেন। আমরা দুইটী জীবিত আছি। বিবাহ করিয়াছিলাম। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে পতিপ্রাণা রমণীলোকান্তরিত হইলেন। আমরা বড়ই শোক তাপ পাইয়াছি।"

"সকলকেই কিছু না কিছু শোক তাপ পাইতে হয়?

"আমি জীবনে অনেক কাজ করিব ভেবেছিলাম। কিন্তু কিছুই কর্‌তে পারিলাম না।"

"কি রকম কাজ আমি একটু শুনিতে পারি?" "আমি ব্রহ্ম দেশে জেলায় জেলায় মহকুমায় ঘুরিয়া দেখেছিলাম যে সেখানে প্রতি মহকুমায় শাখা স্থাপন করিয়া যদি একটা বড় ব্যাঙ্ক এবং একটী ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানী করা যায় তাহা হইলে ব্রহ্ম দেশের লোকের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।" "এ সমস্ত কাজ কিছু আরম্ভ করিয়াছিলেন কি?" "না আরম্ভ করিব মনে করিতেছিলাম সেই সময়ে আমার স্ত্রী মারা যান। আমি নিরাশ হইয়া বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম।"

সোমনাথ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হেমেশ বলিলেন "আপনি কি বিবাহিত?" "না"

"আপনি এখন কি করেন?"

"আমি আপাততঃ কিছুই করি না। কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে আপনার কথা শুনিয়া আমার অনেক আশা হইতেছে।"

হেমেশ আলমারী হইতে ব্রহ্মদেশের মানচিত্র বাহির করিয়া ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

সোমনাথ এই সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা এই সমস্ত কাজ করিতে হইলে এক্ষণে কি করিয়া আরম্ভ করা যায়?"

"প্রথমে টাকা যোগাড় করিতে হইবে। দুইটী কোম্পানী খুলিয়া আরম্ভ। একটী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী—পঁচিশ লক্ষ টাকা মূল ধন। আর একটী ব্যাঙ্ক—পঁচিশ লক্ষ টাকা মূল ধন। এখন শেয়ারগুলি বেচিতে পারিলেই হয়।"

"শেয়ার বোধ হয় বিক্রয় করিতে কোন অসুবিধা হইবে না"

"তা হইলেই ত হইয়া যায়।"

"আচ্ছা, আপনি একটা প্রস্‌পেক্‌টাস্ লিখিয়া ফেলুন।"

"প্রস্‌পেক্‌টাস্ লিখিতে হইবে পরামর্শ করিয়া লিখিতে হইবে।"

"যে সময় আপনি বলিবেন আমি সেই সময় আপনার সহিত বসিতে পারিব।"

"আচ্ছা শুনিলাম অদ্য আপনার চাকর নাই। এখানে আপনার আজ আহার করিলে হয় না?"

"আপনাদের কোন অসুবিধা না হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব।"

"কোনই অসুবিধা হইবে না।"

অল্প সময়ের মধ্যে সোমনাথ এবং হেমেশের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। সোমনাথ হেমেশকে দাদা বলিলেন। যথা সময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। টেবিলের উপর অন্ন ব্যঞ্জন আসিল। তিন জনে টেবিলে খাইতে বসিলেন।

টেবিলে বসিবার পূর্ব্বে হেমেশ সোমনাথকে বলিলেন "আপনার ত টেবিলে খাইতে কোন আপত্তি নাই।

সোমনাথ উত্তর করিল, "না। টেবিলেই আমি বড় সুবিধা মনে করি। আপনারা যে এতদূর বর্ত্তমান সভ্যতার প্রথা সমূহ নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

খাইতে খাইতে সোমনাথ সুরূপার রন্ধন প্রক্রিয়ার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরূপা তাঁহার রক্তিমগণ্ড অবনত করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। আহারান্তে হেমেশ নিজে একটী বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া একটী সোমনাথের নিকট ফেলিয়া দিলেন।

সোমনাথ ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "আমি সিগার খাই না।" তাহার পর পকেট থেকে সোনার কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটী সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইলেন। ঘরে বসিয়া সুরূপা সেলাই করিতে করিতে সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। বৈকালে চারিটার সময় সুরূপা চা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। চা খাইয়া সোমনাথ উঠিয়া গেলেন।

দাদাকে নিরিবিলি পাইয়া সুরূপা বলিলেন "দাদা এ সব আর কেন? তুমি ত তোমার পুরাণ পাগলামি বহুদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলে।"

"এ ত কাজের কথা। একে পাগলামি বল কেন।"

"তুমি একদিনের আলাপে এই লোকটীর সহিত এত ঘনিষ্টতা করিয়া কি ভাল করিতেছ।"

"মানুষ খারাপ হইলে গোড়া হইতেই বুঝা যায়। আমার বোধ হয় লোকটীর বেশ সরলান্তঃকরণ।"

"দাদা, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয় লোকটীকে দেখিতে যেমন সরল কাজে সেরূপ সরল হইবে না।" "আমি ত আর উহার হাতে যাইব না। ও যদি টাকা যোগাড় করিতে পারে তা'হলে কাজে নামিব। আর খুব সম্ভব ও টাকা যোগাড় করিতে পারিবে না।"

"আমি বেশ দিব্য চক্ষে দেখিতেছি ও টাকা যোগাড় করিয়া আনিবে এবং তজ্জন্য তোমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।"

"আমাকে আর কি করিয়া বিপদে ফেলিবে?"

"দাদা তা আমি বলিতে পারি না। তবে আমার যেন মনে লাগিতেছে যে ওর সঙ্গে জুটিলে তোমার অনিষ্ট হইবে।

"সুরু! তোমারই পাগলামি—আমার কিছু নয়।"

সুরূপা চিন্তিত মনে গৃহ কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্থান

করিলেন। হেমেশ কতকগুলি কাগজ লইয়া আঁক কষিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় সুরূপা আসিয়া খাইবার জন্ম "দাদা দাদা" করিয়া ডাকিতেছেন। দাদা সংজ্ঞাশূন্য। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন যে আহার প্রস্তুত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

সন্তবাণী।

(জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ)

দুঃখের সময়েই সকলে ভগবানকে স্মরণ করে, সুখের সময় করে না। সুখের সময় স্মরণ করলে কি আর দুঃখ আসতে পারে?

(কবীর) *

*　*　*　*

সুখের সময় স্মরণ না করে তুমি কেবল দুঃখের সময় তাঁকে স্মরণ করে থাক। এমন লোকের ফরিয়াদ বল কে শুন্‌বে?

(কবীর)

*　*　*　*

যে সুখের সময় নাম হৃদয় হ'তে চলে যায়, সে সুখের মাথায় বাজ পড়ুক্। বালহারি সেই দুঃখ পল পল তাঁর নাম জপ করায়!

(কবীর) *

একদিন এক ভদ্রলোক সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লেন যে একজন লোক তেল মেখে গামছা হাতে ক'রে অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সে কেন এমন ভাবে আছে জান্‌বার জন্ম ভদ্রলোকটীর বড় কৌতূহল হ'ল। তিনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন, "তুমি এতক্ষণ এমন দাঁড়িয়ে আছ যে?" লোকটি উত্তর করলে, "আজ্ঞে সমুদ্রের যে গর্জ্জন ও ঢেউ! এগুলি থাম্‌লেই স্নান করবো মনে কর্‌ছি।" তখন ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "তাহ'লেই তোমার স্নান করেছে আর কি! এ গর্জ্জনও থাম্‌বে না, আর তোমার স্নানও হবে না।" পরমার্থের কাজে সংসারের অনেক লোকের অবস্থা ঠিক এম্‌নি। তারা মনে করে, "সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থামুক তারপর ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যাবে। কিন্তু এ ঝঞ্ঝাটও থামে না আর পরমার্থ সাধনও এ জীবনে হয় না।

*　*　*　*

এক গৃহস্থ শিষ্য সংসারের জ্বালায় নিতান্ত জ্বালাতন হয়ে গুরুজীর কাছে এসে উপস্থিত। গুরুজী কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যটি হাত যোড় ক'রে বল্‌লেন, "মহারাজ আমি সংসারের ঝঞ্ঝাট আর সহ্য করতে পারি না। আমায় মুক্তি দিন; আপনি দয়া ক'রে অনুমতি দিলেই আমি বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ি। কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি।" গুরুজী সব শুনে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর উত্তর করলেন, "না না তা হতে পারে না; তোমার এখনও সময় হয় নাই। সংসারের দেনা থাকতে তোমার এক পাও বের হ'বার যো নাই। দেখ বৈরাগীর আশ্রমের চেয়ে সংসারাশ্রম অনেক ভাল। সংসারে মনের অনেকটা গড়া পেটা হয়, দেহ ও মনে যে সব খারাপ মসলা থাকে সেগুলি ক্রমে ক্রমে ঝাড়া হয়ে যায়, অভিমান চূর্ণ হয়ে মনে দীনতা আসে। কিন্তু বৈরাগী হয়ে পড়্‌লে এ সব সুবিধা নাই; বরং দেহ ও মনের খারাপ মসলা সব সঞ্চিত থেকে অন্তরে বড়ই ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেয় আর ভিতরটি মান অভিমানে পূর্ণ করে ফেলে।" এ কথা শুনে শিষ্যটি আর কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। তিনি বুঝ্‌লেন যে সংসারের নিষ্পেষণের

* কেহ কেহ বলেন যে এই দুইটী তুলসীদাসের উক্তি।

মধ্য দিয়েই তাঁকে মুক্তির পথে যেতে হবে। অগত্যা তাঁকে সংসারাশ্রমেই থাক্‌তে হ'ল।

* * * *

একদিন এক মজুর সমস্ত দিন কাজের খোঁজে থেকেও কোন কাজ পেল না। অগত্যা বড় দুঃখিত হয়ে সে সন্ধ্যার সময় বাড়ীর দিকে ফির্‌ল সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগলো, "হা ভগবান্! এমন ত কোন দিন হয় নাই। আজ কেন এ বিপদে ফেল্‌লে? ছেলে পেলে নিয়ে কি আজ অনাহারে মর্‌বো?" বড়ই কাতর প্রাণে সে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ডাক্‌তে রাস্তায় যেতে লাগলো। হজরৎ ইব্রাহিম শাহ সেই পথে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে মজুরটি তাঁর কাছে যেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আপনার দুঃখ জানা'ল। ইব্রাহিম সাহেব তা'র কাতরতা দেখে বল্‌লেন, "ভাই আমি আজ পর্য্যন্ত যত ভজন বন্দাগি ও দান খয়রাৎ করেছি তার সমস্ত ফল আমি তোকে দিতে রাজি আছি; আজ তোর যে হায়রাণ পরেশানি ও ব্যাকুল অবস্থা হয়েছে তাই আমাকে দে।" এই বলে তিনি মজুরটিকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য কর্‌লেন। মজুরটিও ভগবানের এই আকস্মিক দয়া দেখে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল; আর সেইদিন থেকে তার জীবনের গতিও বদ্‌লে গেল।

* * * *

হজরৎ মহম্মদ তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে বড়ই ভাল বাস্‌তেন। মেয়েটি কেমন আছে দেখ্‌বার জন্য তিনি একদিন তার কুটীরে যেয়ে উপস্থিত। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মা, তুই কেমন আছিস্?" তখন মেয়েটি বল্‌লে, "বাবা! তুমি যেমন মানুষের হাতে আমাকে দিয়েছ তাতে যেমন থাকা সম্ভব, আমি তেমনিই আছি।"—"সে কি মা! আমি তোমাকে আলির হাতে দিয়েছি। আলি ত যে সে লোক নয়। সমস্ত আরব দেশের মধ্যে এমন ধার্ম্মিক লোক ত আমি দেখ্‌তে পাই না।" —"না বাবা আমি সেরূপ ভাবে বল্‌ছি না।"

"তবে কি মা? তুই কি বল্‌তে চাস্?"

—"বাবা, আজ তিন দিন কিছু খাই নাই।"

"—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি যে, মা, আজ পাঁচ দিন কিছু খেতে পাই নাই। তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুরাতন চিঠি।

আমি এই খোলা নদীতে নির্জ্জন চরের মধ্যে এসে ভারি আরাম বোধ করছি। বেশ বুঝতে পারচি একজন আছেন যিনি আমাদের সমুদয় বেসুরোকেই ধীরে ধীরে সুরে বেঁধে তুলছেন—জীবনের বীণাটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেই হল, আর কিছু নয়। নিজে এটাকে নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত নাড়াচাড়া করতে গেলেই সমস্ত গোলমাল করে ফেলি। আর তাঁর হাতে একবারে তুলে দিতে পারলে কি আরাম! আজ আমার মনে হচ্চে সমস্ত জল স্থল আকাশ যেন আমার ভার নিয়েছে—সূর্য্যালোকিত দিনগুলির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন অতি নিঃশব্দে আমার শুশ্রূষা করচে। এই আমার ঘর, আমার আপন ঘর, সুনীল সুন্দর সমুজ্জল সহাস্য শান্তি, এই যে উদার বিস্তার এই যে অবাধ আকাশ এই যে আপনাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মেলে দেবার উদার প্রাঙ্গন। এমনি করে আপনাকে প্রতিদিন বাইরে মেলে দিতে পারলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রন্থিগুলো খুলে আসতে থাকে—আর আপনার মধ্যে মধ্যে সমস্ত জড়িয়ে মড়িয়ে রাখতে গেলেই কেবল জটার উপরে জটা পড়ে যেতে থাকে—মনে হয় মৃত্যু এসে তার খাঁড়া দিয়ে ছিন্ন করে না দিলে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থি যেন কিছুতেই সরল হবে না। কিন্তু সরল রাস্তা সহজ উপায় একেবারেই হাতের কাছে পড়ে রয়েছে। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৮।

শান্তি-নিকেতন, অগ্রহায়ণ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খুঞা।

যাহারা সংস্কৃত সাহিত্য কিছুমাত্র চর্চ্চা করিয়াছেন তাহারা ক্ষৌম ও দুকূল নামক বস্ত্রের নাম অবশ্যই পাইয়াছেন। সে বস্ত্র কত উত্তম ছিল, রাজা-রাণীর পরিধেয় হইত, তাহাও জানেন। ক্ষুমা হইতে জাত ক্ষৌম। অতসী গাছের এক নাম ক্ষুমা। অতসীর বাঙ্গলা অপভ্রংশ তিসী। ইহার বীজের নাম মসৃণা, বাঙ্গলায় মসিনা। অর্থাৎ অতসী গাছের ছালের আঁশ পাকাইয়া সূতা হইত; সে সূতা বুনিয়া ক্ষৌম হইত। উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম ছিল দুকূল।

* * * *

যেমন ভূমি + ইয়া = ভূমিয়া হইতে ভুঞা নাম, তেমন ক্ষুমা + ইয়া = ক্ষুমিয়া হইতে ক্ষুঞা নাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্ষুমা-জাত ক্ষুমিয়া; জাত এই অর্থে বাঙ্গলায় 'ইয়া' প্রত্যয় হয়।

* * * *

শণ চাষ যেমন, তিসীর চাষও তেমন। যখন নীচের পাতা হলুদ হইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে তখন উপড়াইয়া আটি বাঁধিয়া কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। গাছে বীজ পাকিবার পূর্ব্বেই গাছ উপড়াইতে হয়। কয়েকদিন পড়িয়া থাকিলে বীজ একটু ডাঁট হয়, সে বীজ হইতে তেল বাহির করা সোজা হয়। পরে বুনিবার নিমিত্ত বীজ চাহিলে গাছ এত শীঘ্র উপড়াইলে চলিবে না। সে কথা সবাই জানে। আটি শুকাইয়া আসিলে ধান ঝাড়িবার মতন আছড়াইয়া ফল ও বীজ পৃথক করিতে হয়। এ সময়ে গাছগুলি আঁচড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। কারণ তাহাতে ফেঁকড়া ডাল পালা পৃথক হয়, পরে কাজ সোজা হয়। ইহার পর তিনটী কাজ আছে। (১) ডাঁটা হইতে ছাল পৃথক করা (২) ভিতরের কাঠ পৃথক করা (৩) ছালের আঁশ বাহির করা। প্রথম কাজে শণ ও জুট যেমন জলে পচাইতে হয় তিসীর আটিও তেমন পচাইতে হয়। ইহার পর ভাল জলে আছড়াইয়া কাচিয়া ধুইয়া শুকাইয়া কাঠ বাছিয়া ফেলিতে হইবে। প্রথমে মুগুর দিয়া পিটিয়া ভাঙ্গিয়া লইলে হাত বাছাই সোজা হয়।

শণ ও জুটে এই দ্বিতীয় কাজ শেষ হইলেই আর কিছু করিতে হয় না। কিন্তু আমারা তিসীর সূতা করিতে চাই। কাজেই পরস্পর সংলগ্ন আঁশগুলি যত সরু সরু হয় ততই সরু সূতা পাওয়া যাইবে। কাপাস তুলা ধুনতে হয়, নইলে রোয়া পৃথক হয় না, চাপ বাঁধিয়া থাকে। তিসীর আঁশ লম্বা সুতরাং ধোনা চলে না। জাল বুনিবার সময় সরু দড়ী করিবার শণ কত যত্নে তৈয়ার করিতে হয়। তিসীর সূতা করিতে আরও যত্ন চাই। লোহার চিরুণী পাইলে আচড়াইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশগুলি সহজে পৃথক করিতে পারা যায়। লোহার কাঁটার চিরুণী করিয়া লওয়া কঠিন নহে। অভাবে পিটিয়া পিটিয়া তুলা পিঁজিবার মতন তিসীর আঁশ আঙ্গুল দিয়া পিঁজিয়া লইতে হইবে। এখন হাত খানেক লম্বা তিসির নুড়ী হইবে। ইহার পর সূতা কাটা। চরকায় চলিবে না, তাকুড়ে কাটিতে হইবে। প্রথম প্রথম তাকুড়ই ভাল। পরে তিসির সূতা কাটার নিমিত্ত চরকা গড়া কঠিন হইবে না।

পিটিয়া আচড়াইয়া পিঁজিয়া তত সরু আঁশ পাওয়া যায় না। চাপ কিছু কিছু থাকে, ফলে সূতা মোটা হয়। সে সূতায় যে কাপড় হইবে তাহাকে খুঞ্চা বলি। ক্ষৌম করিবার সূতা আরও সরু হইবে এবং সরু পাইতে গেলেই আঁশ আরও পৃথক পৃথক করিতে হইবে। কলাপাতার পাঁশের ক্ষার জলে তিসির নুড়া ফুটাইয়া লইলে চাপের আঠা গলিয়া যায়। তখন আঁশ আরও সূক্ষ্ম পাওয়া যায়, শাদা হয়, উজ্জ্বল হয়।

খুঞ্চা পাওয়া কঠিন নয়, ক্ষৌম করাও কঠিন নয়। এই বৎসরই মাসনার গাছ লইয়া খুঞ্চা করিবার উদ্যোগ করিলে আগামী বৎসরে সব কাজ সোজা হইবে। কৃষকের ক্ষতি কিছুই নাই বরং লাভের আসা আছে। তেল কিছু পাইবে, গরুতে খইল পাইবে, গরুর দড়া, গায়ের চাদর সবই হইবে।

প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁশ

বাঁশ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট; কোনও কোনও উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতের মতে তৃণের পূর্ণ বিকাশ মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এক গাছি দুর্ব্বা ও একটী বাঁশের গঠন ও বর্দ্ধনপ্রণালী একই প্রকার।

অগ্নিপুরাণ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে বাঁশের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথাঃ ত্বকসার, কর্ম্মার, ত্বচীসার, তৃণবীজ, শতপর্ব্ব, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন। বাঁশের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ হয়, তাহাকে কীচক বলে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বাঁশের অনেক নাম আছে, যেমন মহাবল, ধনুদ্রুম, ধানুষ্য, দৃঢ়গ্রন্থি ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বাঁশের কতিপয় গুণ বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

বাঁশ সারক, হিমবীর্য্য, স্বাদু, কষায় রস, বস্তি শোধক, ও ছেদন। ইহা কফ পিত্ত কুষ্ঠ রক্তদোষ ব্রণ ও শোথ নষ্ট করে। ইহার অঙ্কুর কটু, কষায়, মধুর রসবিশিষ্ট। পাকে কটু রুক্ষঃ গুরুপাক, সারক, বিদাহী। কফ বায়ু ও পিত্তকে বর্দ্ধিত করে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক-কফ, নাশক। বাঁশ হইতে যে বংশলোচন জন্মে তাহা একটী লাভজনক পণ্য ও অনেক ভৈষজ্যে ব্যবহৃত হয়।

দোয়াঁশ ও বালুকাময় মাটীতে বাঁশ ভালরূপ জন্মে। বর্ষার প্রারম্ভে বাঁশের কোঁড়া বাহির হয়। এই সময় বাঁশ রোপন করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই রোপনের প্রশস্ত সময়। পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক বাঁশের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। বাঁশ বাগান মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া দিলে

ইহার বৃদ্ধি হয়। খনার বচনে আছে 'চৈতে আগুণ, বৈশাখে মাটী, বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি।" অর্থাৎ তিন বৎসরের বাঁশ না হইলে কর্ত্তন করা উচিত নহে।

রীতিমত বাঁশ বাগান প্রস্তুত করিতে পারিলে বেশ লাভবান হইতে পারা যায়। এক এক ঝাড়ে দেড়শতাধিকেরও বেশী বাঁশ হইতে পারে। বর্ষার সময় যখন বাঁশের কোঁড়া বাহির হয় তখন গবাদি পশুতে খাইয়া বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে থোড়ের ন্যায় তরকারীতে খাইয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। যদি বাটীর নিকট বাঁশ বাগান করিতে হয় তবে বাটীর পূর্ব্বাংশে রোপণ বিধেয়। খনা বলিয়াছেন—'পূবে বাঁশ পশ্চিমে হাঁস, উত্তরে কলা দক্ষিণে মেলা।" অর্থাৎ বাটীর পূর্ব্বাংশে বাঁশবাগান পশ্চিমে পুষ্করিণী উত্তরে কলাবাগান ও দক্ষিণ দিক একেবারেই খোলা থাকিবে। বাঁশ যদি কিছুদিন জলে পচাইয়া গৃহ কর্ম্মে দিতে লাগান যায় তবে খুব শক্ত হয় ও তাহাতে ঘুণ বা কোন পোকা ধরে না। খনার বচনে আছে "বাঁশ যদি পেকে পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে আর শালে।" বাঁশ একবার লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এমন কি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিলে ২।৩ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে। বাঁশের ব্যবসাও বেশ লাভ জনক, ১২।১৪ টাকা হইতে ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি শত বিক্রয় হইতেছে। অনেকে বাঁশবাগান তুলিয়া দিয়া অন্যান্য ফসল করিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ বাঁশ বংশ লোপ হইলে আমরা অনুমান করি অদূর ভবিষ্যতে টাকায় ১টী বাঁশ পাওয়া দুরূহ হইবে।

কৃষক, আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩২৯। শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

যৌবনের সাধন।

কোটাই যৌবনের প্রকৃতি। যৌবনে ইন্দ্রিয় সকল নবচেতনা পাইয়া অভূতপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিয়া অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সন্ধান পাইয়া সকল প্রকারের বন্ধন ছিঁড়িয়া আপনার প্রকৃতির প্রেরণায় এই শোভা-সুখপূর্ণ আনন্দময় বিশ্বের চারিদিকে ছুটিয়া যায়—"সে বারণ নিবারণ অঙ্কুশ না মানে।" এ হাতীকে বাঁধিবে কে? যে শক্তিতে যৌবনকে প্রাচীন তন্ত্রের নীতিবাদী-দিগের চক্ষে বিষম কাল করিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তির দ্বারাই যৌবনকে সংযত এবং সুশাসিত করিতে হইবে। ইহার আর অন্য পথ নাই। অন্য যে কোনও পথে যৌবনকে শাসন করিতে যাও না কেন, তাহার ফলে হয় যৌবন একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; না হয় তোমার মন-গড়া বেড়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া প্রকৃতির প্রতিশোধ তুলিবে। এ সংসারে সর্ব্বত্রই আত্মশাসন বা স্বায়ত্তশাসন একমাত্র বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট শাসন। রাষ্ট্র সম্বন্ধেও এ কথা যেমন সত্য, সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য, ব্যক্তিগত সম্বন্ধেই সেইরূপই সত্য। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য জীবনের সকল অবস্থাতেই ইহা সত্য। স্বাধীনতাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ।

নব্যভারত, পৌষ ১৩২৯। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ফুল তাজা রাখিবার উপায়।

আমরা ফুলদানীতে যে সব ফুলের তোড়া রাখি তাহা খুব সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। একদিন গেলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং ফেলিয়া দিতে হয়। কিন্তু এই ফুল অনেকদিন পর্য্যন্ত রাখিবার একটি সহজ উপায় আছে। ফুলদানিটী গরম জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক মাত্রা এস্পাইরিন মিশাইয়া তাহাতে বোটাসহ ফুলের তোড়া রাখিয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ফুল আর সহজে নষ্ট হইবে না। যদি কোন ফুল শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও এস্পাইরিন মিশান গরম জল দিয়া ধুইয়া দিলে আবার তাজা হইয়া উঠিবে ভাণ্ডার, কার্ত্তিক ১৩২৯।

সাত ঘাটের জল।

রুসিয়া নামক দেশটি যেমন অতিকায় ইহার এক একটী ঘটনাও সেইরূপ অসাধারণ ও আজগুবী। রুসিয়ারই উত্তরাংশে মৃত্তিকাগর্ভে আদিমযুগের সর্ব্ববৃহৎ আধুনিক হস্তী জাতির পিতৃপুরুষরূপ 'ম্যামথ' নামক জানোয়ারগুলির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী 'পেত্রোগ্রাদ, হইতে 'মস্কো' হইয়া জাপান উপকণ্ঠবর্ত্তী 'ব্লাদভস্তক' পর্য্যন্ত একটী রেলপথ খোলার চেষ্টা চলিতেছে; শেষ হইলে জগতের মধ্যে সেটি দীর্ঘতম রেল লাইন বলিয়া পরিগণিত হইবে। যুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষা করিয়া পলায়ন বিদ্যায়ও রুস জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার রুসিয়ার সাইবিরিয়া নামক প্রদেশে একটি অতিকায় মানব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি না কি দেহের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওজনে, ভোজনে ও শয়নে মানব জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়! মানুষটির নাম ক্যজানক্। ৩৪ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সম্প্রতি ইহাকে চাক্রেরীর একটী প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। উচ্চতায় তিনি ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি (সাধারণ মানুষ ৫ ফিট ৬·৯ ইঞ্চি) প্রস্থে ও তদনুরূপ; বলও অসীম। তাঁহার হাতের আঙ্গুলের ডগা হইতে কব্জী পর্য্যন্ত ৩ ফিট ১ ইঞ্চি, বুকের ছাতি ৫৮ ইঞ্চি (সাধারণ লোকের ৩২-৩৬ ইঞ্চি) মস্তকের বেড় ২৫ ইঞ্চি (সাধারণ লোকের ১৬-১৯) ও ওজন প্রায় সাড়ে পাঁচ মণ। তাঁহার খাদ্য প্রায় চারি জনের খাদ্যের সমান এবং প্রয়োজন হইলে ৬ জনের আহারও উদরসাৎ করিতে পারেন। তিনি দিন রাত্রিতে চারিবার পুরামাত্রায় ভোজন করেন এবং মোটের উপর ৩।৪ সের দুগ্ধ, ২০।২৫ টী ডিম, ২ সের মাংস, ৫।৬ খানি লম্বা বড় পাঁউরুটি ১॥-২ সের আলু মটর প্রভৃতি শাক তরকারী খাইয়া থাকেন। বিনা নেশায় ৫।৬ পাইন্ট মদ পান করিতে পারেন। এই অতিকায় মানুষটি প্রায় আঠারো ঘণ্টা নিদ্রা যান এবং যতটুকু সময় জাগিয়া থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তন্দ্রাবেশে নেত্র দুটি তাঁর ঢুলু ঢুলু করে। বোধ হয় ত্রেতার কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরের বকাসুর—এই দুয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রনে কলিতে এই অপূর্ব্ব ধরণের জীবটির সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বাস্থ্য সমাচার—অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

প্রকৃতির উপদেশ।

প্রকৃতির যতগুলি সৌন্দর্য্য আছে, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে সাম্যভাবের উপদেশটী সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য জগতে যে আলো দিতেছেন তাহা কোনও বিশেষ ব্যক্তি সমাজ জাতি বা দেশের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য স্ত্রী বলুন, পুরুষ বলুন সধবা বলুন বিধবা বলুন বালক বলুন অথবা বৃদ্ধই বলুন, সকলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান ভাবে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোক পাইতেছে। গাছে যে ফল ফলিতেছে লতায় যে ফুল ফুটিতেছে ঝরণা ও স্রোতস্বিনীতে যে সুপেয় জলধারা বহিতেছে, পুষ্পে যে সৌরভে প্রবাহিত হইতেছে তাহাও কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা সমাজের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, সমাজের প্রত্যেক নরনারীর জন্য। যেখানে এই সুন্দর সাম্য ভাব থাকিবে সেইখানেই মৈত্রী ভাবটী ফুটিয়া উঠিবে এবং যেখানে মৈত্রীভাব থাকিবে সেইখানেই স্বাধীনতা আসিবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ছবিটি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। মানুষের কর্ত্তব্য সমাজ বা পরিবার গঠনে প্রকৃতির এই উপদেশটি গ্রহণ করা।

ভারতী, পৌষ ১৩২৯। শ্রীক্ষীরোদ মোহন চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব।

——:•:——

* * * নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় ছেলেদের এমনি করে তৈয়ার করা যাতে তারা প্রলোভনে পড়ে শেষে উদ্ধার হতে পারে—পরন্তু নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের চরিত্র এমন করে গঠিত করা যাতে তারা কখনও একবারে প্রলোভনে না পড়ে বা পড়ার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না থাকে। রিপুর সহিত যুদ্ধ করবার শক্তি লাভ নৈতিক সাধনার উদ্দেশ্য নয়, রিপুকে চিরতরে বশে আনাই নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। পাঠক মহাশয়কে এই কথাটা আমরা ভাল করে হৃদয়ে গেঁথে নিতে বলি।

নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম-আত্মদমন শক্তিলাভ। দ্বিতীয়—কর্ত্তব্যের প্রতি অচল নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই নিষ্ঠা ও আত্মদমন (সংযম) স্বাভাবিক বা সংস্কারগত হওয়া দরকার। যে মানুষ ঘটনার সম্মুখে পড়ে ভাবে কি করবে তার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য উভয় পথে যাওয়াই সমভাবে সম্ভব। এমন কি অর্ব্বাচীন যুগে পাপের প্রাবল্য হেতু এইরূপ ব্যক্তির মন্দ পথের গমনই অধিকতর সম্ভব। যে মানুষ কর্ত্তব্যের জন্য বহুবার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে নাই তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি কখনও নির্ভর করা যায় না।

আত্মদমন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এই দুইগুণ অর্জ্জন করানকে ইংরাজেরা শিক্ষা সাধনার একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্দ্দেশ করেছেন, এবং সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয়, ইঁহারা এই লক্ষ্যে পৌছেছেন। ইংরাজ শিক্ষকরা কেবল খুঁজেন কেমন করে ছেলে আপনা আপনি ভাল হতে মন্দকে পৃথক করতে শিখবে, কেমন করে আপনার কর্ত্তব্য আপনি বেছে নিতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষকদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছাত্র তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক আর তাঁরা তাকে যন্ত্রবৎ যদিচ্ছা পরিচালিত করুন। কিন্তু যদি কখনও কেহ এক বয়সের একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ বালককে একই বিপদ মুখে কর্ম্ম করতে দেখে থাকেন, তিনি বোধ হয় অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, ইংরাজ বালক কেমন নিশ্চিন্ত ভাবে যথা কর্ত্তব্য করে এবং ফরাসী বালক ইতস্ততঃ করতে করতে ভাবে—"হায় গুরুদেব, তুমি এখন কোথায়? এই একটা দৃষ্টান্ত থেকেই দুইটী দেশের শিক্ষা পদ্ধতির ভালমন্দ বিচার করা যেতে পারে। গুরুদেবের পক্ষে যখন সারা জীবন যন্ত্রীর মত ছাত্র ছাত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরে তাদের সুনিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব তখন ছাত্র ছাত্রীকে আপন পায়ে ভর দিয়ে ঠিক পথে চলবার চরিত্রটা গঠিত করে দিবার দিকেই তাঁর সমস্ত লক্ষ্যটা দেওয়া উচিত। তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি চান না ছাত্রের আজীবন আত্মসমর্পন—কিন্তু যিনি শিষ্যকে যত শীঘ্র পারেন আত্মপ্রতিষ্ঠ করে দেন।

প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। শ্রীহারাধন বক্সী।

কন্যার প্রতি দারার উপদেশ।

"লা এলাহা ইল্ল ল্লা।
("এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই।")

"বাবা, আর কত দিনে আমাদের এ দুঃখের অবসান হ'বে? আমরা কি আর এ জীবনে শান্তিময়ী নিদ্রায় রজনী যাপন করতে পারব না? কত দিন আর আমাদিগকে এরূপ অনিদ্রায় অনাহারে, উদ্বেগে রাত্রি জেগে কাটাতে হ'বে? পিতৃব্য আলমগীর কেনই বা আমাদে'কে এত নির্য্যাতন করছেন? আপনার কাছে শুনেছি, ভগবান দয়াময় ও ন্যায়বান। কিন্তু কই বাবা! তিনিও কি আমাদিকে ত্যাগ করেছেন? তিনিও কি ন্যায়ের পক্ষ ত্যাগ করেছেন? জগত জানে যে আপনিই দিল্লীর সিংহাসনের ও মুকুটের অধিকারী। আর ধর্ম্মতঃও আপনি তাহার ন্যায্য অধিকারী। কিন্তু বাবা, আমাদের ত আর কৃতকার্য্য হ'বার কোন আশা দেখছি না। স্বর্গ মর্ত্ত্য আমাদের শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদিগকে তাই আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণ ভয়ে সন্তর্পণে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও ত তাঁরা সন্তুষ্ট নন্। আমাদিগকে একবারে তাঁরা প্রাণে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র কচ্ছেন।"

দারা উত্তর করিলেন, "দিলেরা! এত উতলা হচ্ছিস কেন মা? সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তোকে যে সকল কথা বলে ছিলাম, সে সকল কথা কি ভুলে গেছিস? তোকে সেদিন আমি বলেছিলাম যে, দুঃখ কষ্ট, আপদ বিপদ, অত্যাচার, উৎপীড়ন—এই সব নিয়েই জগত। এরাই সিদ্ধি অসিদ্ধি চক্র গঠন করেছে—যা'তে এ সংসারটা বাঁধা আছে। দুঃখ কষ্ট, আপদ বিপদ, জ্বালা যন্ত্রণা না থাক্‌লে, জগতের সৌন্দর্য্য থাক্‌ত না। উন্নতি অবনতি, উত্থান-পতন আছে বলেই, জগতেরও অস্তিত্ব আছে, তবে দুঃখ কষ্ট আপদ বিপদ এসব ব্যক্ত ভাবের একটা অঙ্গ স্বরূপ এ'রা ব্যক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আসে। এদের কোন পৃথক বা স্বতন্ত্র বস্তুগত অস্তিত্ব নাই। পৃথক পৃথক বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের পরস্পর সম্বন্ধে এ গুলো স্বভাবতঃই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তোর পিতৃব্য আওরাঙ্গজেবকে কোন ক্রমে দোষ দিতে পারি না। আর সময় মন্দ ব'লে বা ভগবান রুষ্ট ব'লে কোনও অভিযোগও করতে পারি না। কোরাণে একস্থানে লেখা আছে, "তাহাদের প্রতি অত্যাচার আল্লাহ কর্ত্তৃক অসম্ভব, ইহা (দুঃখ কষ্ট) কর্ম্ম সম্ভূত।" একজন রাজদণ্ড হাতে ক'রে রাজ সিংহাসনে ব'সে একজনের বিচার করছেন, আর একজন সেই বিচার ফলে ফাঁসী কাঠে ঝুলে ইহলোক ত্যাগ করছে; একজন সুধাধবলিত প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শু'য়ে শান্তিময়ী নিদ্রায় রাত্রি কাটাচ্ছেন, আর একজন পর্ণকুটীরে মৃত্তিকা শয্যায় শুয়ে মনের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সমস্ত রাত্রি জেগে কাটাচ্ছে; একজন ক্রোরপতি হ'য়েও কিরূপে আরও অর্থ পুঁজি করবেন, সেই ভাবনায় ব্যস্ত, আর একজন পথের ভিখারী হয়ে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য কাতর; এই ত জগতের ধারা। কিন্তু মা, নিশ্চয়, জানিস, এক রকম অবস্থা কারুর চিরকাল থাক্‌বে না। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, হাসি কান্না কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ সম্পদের পর বিপদ, বিপদের পর সম্পদ, উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর

উন্নতি—এই ত জগতের চিরন্তন নিয়ম। জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ কে কবে ভোগ করেছে? আজ যে চর্ব্ব্য চোষ্য্যে প্রতিপালিত; কাল সে অনশনে অর্দ্ধমৃত, আজ যে সুধাধবল সৌধ তলে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত, কাল সে জীর্ণ পর্ণ ভবনে ধুলিলুণ্ঠিত, আজ যেখানে আনন্দ কোলাহল, কাল সেখানে হৃদয়ভেদী করুণ রোদন। আরও, একটু বিবেচনা করে দেখলে বুঝতে পারবি যে, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না এ সকল অলীক, মনের কল্পনা মাত্র। মনকে দমন করবার ক্ষমতা থাকলে অসহ্য দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মন বিচলিত হবে না, কষ্ট বলে কিছু মালুম হবে না। আমরা যে সকল ভোগ করি,—তা সে সকল সুখই হউক, বা দুঃখই হউক—সকলই আমাদের অতীত কর্ম্ম অনুসারে ভগবান বিধান করেন সেগুলি বিধি নির্দ্দিষ্ট। সেগুলি আমাদিকে ভোগ করতেই হবে। কাজেই সেগুলির ভোগ আমাদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে। যেমন কাউকে রাজা করলে, তাঁকে তাঁর মর্য্যাদা অনুযায়ী কাজ করতে হয়, সেই রকম দুর্ভাগ্য মানুষকেও তার অবস্থা অনুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে হবে। আওরাঙ্গজেবের সম্রাট হওয়া আমি যতদিন না বুঝতে পেরেছিলাম, ততদিনই আমি তার সঙ্গে বিরুদ্ধ আচরণ করেছিলাম। এখন আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, আওরাঙ্গজেবের সম্রাট হওয়া, আর আমার পথের ভিখারী হওয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা। ইহা যখন তাঁর ইচ্ছা, তখন আমি আমার এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কাজ করতে পারবে, মা? তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। মানুষ স্বাধীন জীব, তার মঙ্গলের জন্যই ভগবান মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। মানুষ যদি বুঝতে না পেরে, সেই ক্ষুদ্র স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করে, তাঁর সেই মহতী ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করতে উদ্যত হয়, তবে তার পতন অনিবার্য্য। তাই বলে তাঁর এমন ইচ্ছা নয় যে, আমরা অনন্তকালই এমন ভাবে কষ্ট পাব। মা! আমাদের এই কষ্ট আমাদের নিজের অসৎ কর্ম্ম হ'তেই হয়েছে। কোরাণে লেখা আছে, "যে কষ্ট তোমার উপর আইসে, তাহা তোমার কর্ম্ম সম্ভূত।" এতে ভগবানের দোষ কি মা? আওরাঙ্গজেব যত রকমে সম্ভব, আমাদিগকে নির্য্যাতিত করতে পারেন আর আমাদিগকে একবারে প্রাণে মেরে ফেলবার জন্য ষড়যন্ত্রও করতে পারেন। তা' সব আমাদিগকে সহ্য ক'রতে হবে। কারণ দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট, নিরাশ্রয়, নিরশন আমাদের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট। এর জন্য দুঃখ করলে কি হবে? সব ধীর ভাবে সহ্য করতে হবে।

পিতার এই সকল কথা শুনিয়া দিলেরা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "হা ভগবন! এ, আবার কি! আজ আমার মনে আবার নতুন সন্দেহের উৎপত্তি হ'ল যে!" তাই পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! আপনি আমাকে রোজ রোজ কত উপদেশের কথা শুনাও কিন্তু আমি অজ্ঞান বালিকা বলে সে সকল বেশ ভাল ক'রে বুঝে উঠতে পারি না। সেদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে জগতে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরা যা, দেখছি, বা আমাদের চিন্তার ফলে মনের মধ্যে যে সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হচ্ছে—সে সকল প্রকৃত প্রস্তাবে এক। কেবল রূপ অর্থাৎ আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। যেমন হাঁড়ী, কলসী, ঘট, প্রদীপ, দোরখা আদি সব এক কাদা হ'তে তৈয়ারী কেবল তাদের রূপ ও নাম ভিন্ন ভিন্ন মাত্র; আর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করলেও তা'রা সকলেই এক মাটী হ'তে উৎপন্ন। কিম্বা যেমন একটা লম্বা সুতোর মাঝে কতকগুলো গিরে'। যদিও এই গিরোগুলোর কোনটা বড়, কোনটা ছোট; কোনটা উঁচু, কোনটা নীচু;—ওরকম সকলেই পরস্পর অসমান, বিভিন্ন আকার; তবুও, সেগুলো এক সুতো হ'তেই উৎপন্ন বা সেগুলি নিয়েই ঐ সুতোটী; কেবল সুতোটীতে অনেকগুলি ফের বা পাক দেওয়ায় অনেক গিরোর উৎপত্তি হয়েছে। গিরোগুলি খুলে ফেললেই, সেই এক সুতো দেখতে পাওয়া যাবে।

"মুসলমান শিশুকে প্রথমে যা' শিখান হয়, তা' 'কলমা'—"লা ইলা লীল আল্লা মহমদিন রসুল আল্লা।"

এর অর্থ হচ্ছে,—"ঈশ্বর ও তাঁর দূত মহম্মদ ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।" আমার উপদেষ্টা মৌলবী সাহেবকে একবার আমি ঐ অর্থই নির্দ্দেশ ক'রে বলেছিলাম। তা'তে তিনি আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে বলেছিলেন, "এই মত ইসলাম ধর্ম্মের বিরোধী। যে মানুষ এই মতে বিশ্বাস করে সে কাফের। দারা শিকো হিন্দুদের ধর্ম্ম গ্রন্থ হ'তে এ মত শিক্ষা ক'রেছে। এর অর্থ হচ্ছে,—"ঈশ্বর এক ও তিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা।" কিন্তু দারা বলছে—প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর—তরুলতা, পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আকাশ-পৃথিবী—সকলই ঈশ্বর। এ রকম পাষণ্ডের মত উচ্চারণ করার জন্য ভগবান তোমাকে মাপ করুন। এ সকল কাফেরের মত।

"সেদিন আপনি আমাকে যা' বলেছিলেন, তা' শুনে আমি হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলাম। আজ আবার আপনি আমাকে একটা নতুন কথা শেখালেন। আজ আপনি বলেছেন যে, দুঃখ কষ্ট ভোগ করাও একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে; আর সেই দুঃখ কষ্ট বেশ ধৈর্য্য ধ'রে সহ্য করতে হবে। আপনি আমার কাছে পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম মত ব্যাখ্যা করেছেন, সে সব শুনে মৌলবী সাহেব বলছিলেন যে, এ সকল মত আমাদের কোরাণে লিখা নাই। সে সকল হিন্দুদের বেদান্ত শাস্ত্র সম্মত ও তা' থেকে সংগৃহীত। সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ হিন্দুদের পন্থা অনুসরণ ক'রে, সে সমস্ত মত স্বীকার করে। আপনার আবার আজকার ঐ সকল মত শুনে, তিনি সেগুলিকেও ইসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত নয় বলেই ব'লবেন। বাবা! সত্যি কথা ব'লতে কি আমার ধারণা তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যে মত বলছেন—সকলই ঈশ্বর—সে মত যদি আমাদের কোরাণে লিখা না থাকে, তা'হলে কেমন করে সেগুলিকে সত্যি ব'লে স্বীকার ক'রব?"

কন্যার সন্দেহে দারার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তবে তিনি ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হইলেন না। বরং সমধিক দুঃখিত হইলেন, কিন্তু সে দুঃখ নন্দিনীর আনন্দ বর্দ্ধনে অক্ষমতা জনিত নহে—অজ্ঞান ব্যাক্তির প্রতিবাদ শুনয়া জ্ঞানীর হৃদয় যেমন করুণায় বিচলিত হয়, কন্যার কথা শুনিয়া দারার হৃদয়ও সেইরূপ বিচলিত হইল। তাই তিনি বলিলেন, "াদলেরা, যে বস্তুটা সূর্য্যের মত নিত্য প্রকাশশীল, সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বে সন্দিহান হচ্ছিস? মৌলবী সাহেব অদূরদর্শী, তাই তিনি বলেছেন যে, কোরাণে এ সকল লেখা নাই। কোরাণ অনন্ত জ্ঞানের ভণ্ডার। শব্দের অর্থ ধরে কোরাণ বুঝতে গেলে এরূপ ভ্রমেই পড়তে হয়।* কোরাণের প্রত্যেক "আয়েতের" প্রকৃত গুহ্য অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কোরাণে সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, ঈশ্বর জগতের তাবৎ পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। তিনিই আদ, তিনিই অন্ত; তিনিই দৃশ্য, তিনিই অদৃশ্য; তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই নিম্নে; তিনিই সম্মুখেত তিনিই পশ্চাতে। তিনিই সর্ব্বত্র। তিনি বহু নামে অভিহিত। কোরাণ স্পষ্টাক্ষরেই বলেছেন যে যাঁরা গভীর ভাবে এই সকল উপদেশ চিন্তা করেন, এই সকক উপদেশ তাঁদেরই

* "লা এলাহা ইল্লাল্লা"—এই পবিত্র কোরাণ বাণীর অর্থ "Theosophy" in India নামক মাসিক পত্রে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় Some Suffi Teachings প্রবন্ধে যে ইং অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"লা এলাহা ইলল্লা" ইহার দুইটী অংশ আছে—একটী অস্বীকার সূচক (Negative), আর একটী স্বীকার সূচক (affirmative) এই দুইটীর প্রত্যেকের আবার দুইটী করিয়া অর্থ আছে। প্রথম অর্থ:—(১) অলীক দেবতাগণের উপাসনা করিবার অধিকার অস্বীকার (Negation of the claim of false gods to worship, (২) প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অধিকার স্বীকার (Affirmation of the claim of True God to worship,। দ্বিতীয় অর্থ :—(১) সেই নিত্য বস্তুর উপলব্ধিকারক তাবৎ পদার্থের অস্বীকার (Negation of everyhting that bears the realisation of the Object) (২) সেই কেবল এক বস্তুর স্বীকার (affirmation of the One Object alone)— লেখক।

জন্ত—অপরের জন্ত নয়। কিন্তু মানুষ তেমন ক'রে চিন্তা করে কই? এ কথা সত্য যে এ সকল মত বৈদান্তিক। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মের উপদেশ যদি হিন্দু ধর্ম্মের বেদান্তের অনুরূপ হয়, তা'তে ক্ষতি কি? তোকে আমি ক'বে বলেছি যে, সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলা উচিত? আমি তোকে যে দু'টা উদাহরণ দিয়ে এ তত্ত্ব বুঝাবার চেষ্টা করেছি, সে তত্ত্ব দু'টা বেশ ভাল ক'রে বুঝলে বুঝতে পারবি যে, হাঁড়ি কলসী আদি একই কাদা হ'তে তৈয়ার হ'লেও, যতক্ষণ তাদের নিজের নিজের রূপ থাকে ততক্ষণ তা'দিকে কাদা বলে বলতে পারা যায় না। আবার সেই রকম সেই লম্বা সূতোটার মধ্যে যতক্ষণ গিরোগুলো থাকে, ততক্ষণ (তা'রা সূতো হ'তে উৎপন্ন হলেও) সূতো বলতে পারা যায় না। ঈশ্বর ও জগতের তাবৎ পদার্থের বেলায়ও সেই রকম বুঝতে হবে।

"তারপর আজ তোকে যে বল্‌লাম যে দুঃখ আর সুখ, বিপদ আর সম্পদ—এ সকলই মানুষের কর্ত্তব্য ভোগ। যখন আমরা স্বীকার করি যে সকলই সেই এক অর্থাৎ জগতে যা' কিছু আছে, সকলই তাঁর প্রতিবিম্ব বা বিভাব তখন আমরা, সুখ দুঃখ যে কর্ত্তব্য ভোগ, তার সত্যতা বুঝতে পারব। তিনি কতকগুলিতে স্বয়ং ব্যক্ত হন—যে গুলিকে তাঁর ক্রোধ বলে বোধ হয়; আর কতকগুলিতে ব্যক্ত হন—যে গুলিকে তাঁর দয়া বলে বোধ হয়। ফল ফুল উৎপন্ন হয় না—এমন কোন কাঁটা গাছ যদি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলে "অপর গাছে কেমন সুদৃশ্য ফুল ও সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু আমার কেন হয় না?" তা' হ'লে তার জবাব এই—"এই তোমার বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ। যে সকল গাছ ফল ফুল প্রসব ক'রছে, তা'দিকে তোমার নির্দ্দিষ্ট কাজের অনুরূপ কাজ দেওয়া হয় নাই। তা'দিকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, তা' তোমার অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" মা দিলেরা! এই সকল মত এতই শান্তি সঞ্চারক যে, মানুষ যদি একবার এই সকল সত্য ভাল ক'রে বুঝে, তা' হলে সে সংসারের সকল রকম কষ্ট হ'তে মুক্ত হ'বে। কোন রকম কষ্ট তাকে অভিভূত করতে পারবে না। কোনরূপ সুখে বা আনন্দেও আত্মহারা হ'বে না। স্ত্রী-পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করলেই সংসার ত্যাগ করা হয় না—পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্যের দুঃখ কষ্টের অতীত হ'তে পারলেই প্রকৃত সংসার ত্যাগ করা হয়। তাই বলি, মা দিলেরা! আমি যখন আমার ভাইএর আমার প্রতি আচরণের জন্ত কোন অনুযোগ করছি না, তখন তুমি কেন অনুযোগ করছ? যথেষ্ট; সর্ব্বদা মনে রেখো—"সেই এক বস্তু জগতে বিদ্যমান আর কোন কিছু নাই।"

ভাই, হিন্দু ও মুসলমানগণ! দারার এই উপদেশ গুলির প্রতি মন দিয়া দেখিবেন কি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য কোথায়?*

শ্রীঅপর্ণ চরণ সোম।

* এই প্রবন্ধটী হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্ত ও মুসলমান ভ্রাতাগণের ধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণের গুহ্য উপদেশ বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিবার জন্ত এবং তৎসহ দুঃখ রহস্য আংশিক সমাধান করিবার জন্য "Theosophy in India" নামক পত্রিকার ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাহায় প্রকাশিত সৈয়দ আমজ আলি, এম, আর, এ, এস লিখিত "Dara's Advice to his daughter" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইল। লেখকের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন, অনেক স্থানে নানা প্রকার ত্রুটী থাকাই সম্ভব। কৃতবিদ্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

লেখক।

শোক সংবাদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র **সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর** মহাশয় গত পৌষ মাসে হৃদ রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। কঠোর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি সঙ্গীত রচনায় অবসর কাল যাপন করিতেন। ব্রহ্ম সঙ্গীত গুলি ছাড়া ইঁহার অকৃত্রিম দেশ ভক্তি মূলক অনেকগুলি গান রহিয়াছে। উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ "বোম্বাই চিত্র" "বুদ্ধদেব চরিত" ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

আমরা এই প্রবীণ সাহিত্যরথীর শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত মুঙ্গেরের উকীল **শ্রীযতীন্দ্র মোহন গুপ্ত বি, এল** মহাশয় অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অতর্কিত মৃত্যুসংবাদে আমরা অতীব মর্ম্মাহত হইয়াছি। যতীন্দ্র বাবু কিয়ৎকাল যাবৎ মস্তিষ্কের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; সম্প্রতি হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হওয়ায় সহসা তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে অকাল মৃত্যু ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে জানি না দুরদৃষ্ট আমাদের এই পুঞ্জীভূত শোকের পরিণাম কোথায়?

বাঙ্গলার রসসাহিত্য রচনায় যতীন্দ্র বাবুর সমকক্ষ লেখক অতি অল্পই আছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিককে তাঁহার "বেহার চিত্র" ও "হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য" পুস্তক দুখানির পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আশা করি যতীন্দ্র বাবুর পুত্রগণ এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে ত্রুটি করিবেন না।

মৃতদার যতীন্দ্রবাবু চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের এই দুঃসহ শোকে সমবেদনা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। বাণীর এই এক নষ্ঠ সাধক আজীবন যাঁর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন সেই দেবী বীণাপাণী তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে শান্তি বিধান করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ— বঙ্কিম মণ্ডলীর অন্যতম, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার "শৈশব সহচরী" উপন্যাস ও "মধুমতী" ছোট গল্প সাহিত্য জগতে চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সমালোচনা।

"সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত"—শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত এবং ঢাকা বান্ধব কুটীর হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর গৌরব সুকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের অকাল বিয়োগে ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ কর্ত্তৃক আহূত শোক সভায় লেখক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম। রচনা নৈপুণ্যে ও সংযত ভাবোচ্ছ্বাসে ইহা বেশ মনোজ্ঞ, রসাল ও ভাব-মধুর হইয়াছে। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় পরলোকগত কবির গীতি কবিতার প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লেথক সংক্ষেপে যে ভাবে কবির চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব রাগ বিন্যাস, নিপুণ শব্দ প্রয়োগ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অদ্ভুত অভিনিবেশের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং লেথকেরও যথেষ্ট ভাবুকতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদান করে। আমরা এই পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সত্যানন্দ।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ, । ফাল্গুন, ১৩২৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

লেখা-সূচী।

-*(*)*-

বিশিষ্ট লেখকবর্গের তালিকা।

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
২। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
৪। „ প্রমথনাথ চৌধুরী।
৫। „ অমৃতলাল বসু।
৬। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু বিজ্ঞানাচার্য্য।
৭। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
৯। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত।
১১। „ রাখালরাজ রায় বি, এ।
১২। „ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৩। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
১৪। „ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।
১৫। „ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
১৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৭। „ হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম
১৮। „ কালিদাস রায় বি, এ।
১৯। „ যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
২০। হিরণ কুমার রায় চৌধুরী এম, এ।
২১। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
২২। শ্রীযুক্ত মৌলবী ওসমান আলি, বি, এল।
২৩। „ মোজাম্মেল হক, বি, এ।
২৪। „ নলিনীকান্ত সরকার।
২৫। ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।
২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ, এম, এ, বি, এল।
২৭। শ্রীযুক্তা নীহার বালা দেবী।
২৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
২৯। রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৩০। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া
৩১। শ্রীপবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
৩২। কুমার বিজয় লাল খান। (ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৷৶০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২৸০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোণীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তণ করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রী অহেন্দ্র নাথ দাস।

।াগর উদ্দেশে

চিত্রশিল্পী—শ্রীমতী মাধুরী বসু। মেদিনীপুর আর্টডেন।

Bharatvarsha Ptg. Works.

১ম বর্ষ, { ফাল্গুন, ১৩২৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

যাত্রাপথে।

অতল তলায় সাগর কাঁদে লুকিয়ে বেদন গভীর কালো
তবুও তারে হাসতে যে হয় মাখতে যে হয় অরুণ আলো!
যাত্রাপথে ব্যথায় চাপি বিঘ্ন বাধা পায় সে দলি
গানের সুরে দিবস নিশি হেসে হেসে যাচ্ছে চলি!
ওই দেখ সে কূলে কূলে
আসছে ধেয়ে ফুলে ফুলে,
ক্রন্দনে আজ ডুবিয়ে দিল
কল্লোলে কল্লোলে;
ছড়িয়ে দিল ফুল পারা ওই
ফেণার রাশি, হিল্লোলে হিল্লোলে!

গহন ঘন অন্ধকারে এই ধরণীর গুহায় থাকি
চেয়েছে চাঁদ থাকতে আড়াল বুকের কালি লুকিয়ে রাখি;
তবুও কি সে পেরেছে তাই? সাঁজ গগনের বাইরে আসি
রুদ্ধ বেদন গোপন করে ফুটিয়ে তোলে মুখের হাসি!
দীপ্ত করি মধ্য গগন,
ওই দেখ সে ছড়ায় কিরণ;
ওই দেখ সে পড়ল ঢলে
দিগন্তরাল মাঝ;
চুপ করে কি রইতে পারে
যাত্রাপথের পথিক সে যে আজ!

নিবিড় বনের কুজ্ঝটিকায় লুকিয়ে ছিল মেউদী পাতা,
কলিজা তার রক্তরাঙা বুকে তাহার অগাধ ব্যথা;
জানায়নি সে ব্যাকুলতা, মুখ ফুটে সে কয়নি ভালো,
তবুও সে আজ হেসেছে গো যেই দেখেছে দিনের আলো!
ওই দেখ সে পথের ধারে,
শ্বেত বিজুলি মুক্তা হারে,
আপনারে জড়িয়ে নিয়ে
লক্ষ অযুত ফুল.
ফুটিয়ে দিল—যাত্রা দিনের
উৎসাহে ওই দুলছে দোদুল দুল!

প্রভাত আলোর যাত্রীরা সব আজ করেছে যাত্রা সুরু,
সবার পিঠে দুলছে বোঝা ছোট বড় হাল্কা গুরু!
সুদূর তবু পথ চলেছে করে না তায় গ্রাহ্য তারা,
সঞ্চারিতে গান ধরেছে নবীন জীবন মাতোয়ারা!
মনরে আমার বাঁধন ছিঁড়ে,
মিশে যা তুই যাত্রী ভিড়ে;
ওদের মতন করতে হবে
সুদূরের সন্ধান,
প্রাণের কালো থাক্ চাপা থাক্,
বাতাসে তুই ছড়িয়ে দে আজ গান।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ।

মুর্ত্তি বা প্রতিমা পূজা।*

প্রতিমা পূজা কতদিন অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে এই বিষয় লইয়া বিদ্বদ্বৃন্দের মধ্যে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক এ বিষয়ে সুমীমাংসা করা কঠিন। প্রতিমা পূজা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রতিমা পূজার স্থূল কয়েকটি বিষয় বিচার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

প্রতিমা পূজা যে খুব প্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন কবি হোমরের প্রণীত ইলিয়ড্ গ্রন্থে মুর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৬।৩০১)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে হোমর খৃষ্টপূর্ব্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। রোমনগরস্থিত ডায়না দেবীর প্রাচীনতম মূর্ত্তি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষে তৎপরবর্ত্তী কালে প্রতিমা বা মূর্ত্তি পূজার উদ্ভব হইয়াছিল কিনা তাহাই বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে "the worship of idol is a secondary formation, a later degradation of the more primitive worship of ideal gods" (M Muller). ইহাদের মতে বুদ্ধদেবের জন্মের পরবর্ত্তীকালে মুর্ত্তিপূজার উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে রুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

"স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ
পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ণ বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং॥" (৩৩।৯)

দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, বভ্রুবর্ণ দীপ্ত হিরন্ময় অলঙ্কারে পরিশোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্ত্তা, তাঁহার বল পৃথক কৃত হয় না। এই মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্র ও পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে রুদ্রমুর্ত্তির পূজা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অষ্টম মন্ত্রে রুদ্রকে নমস্কার করার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ৫২ সূক্তেও মরুদ্‌গণকে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পৃথক করিবার ভাব বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে।

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ।

এই মন্ত্রে "সন্দৃশো" শব্দের অর্থ কি? সায়ন বলেন "সন্দর্শনাৎ"। কিন্তু ঐ শব্দের অর্থ যদি "মূর্ত্তি" বলা যায় তাহা হইলে অর্থ সঙ্গতি হয় কিনা তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে দেবতাগণের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বরুণ হিরন্ময়বর্ম্মে আচ্ছাদিত, ক্ষমতাশালী ও সুপাণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইন্দ্র ইচ্ছামত সর্ব্বপ্রকার আকার গ্রহণ করিতে পারেন; সাধারণতঃ তাঁহার দেহ রক্তবর্ণ বা হিরণ্যবর্ণ; তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘবিলম্বী ও দূরপ্রসারিত; তাঁহার হস্তদ্বয়, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি রক্তবর্ণ; তিনি সুন্দর, যুবক, বলবান, সমরকুশল, বীর্য্যবান্ দীপ্তিসম্পন্ন এবং জয়শীল। বায়ু মনোহর, আকাশস্পর্শী, মনের ন্যায় বেগবান্ এবং সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট। সবিতা সুবর্ণচক্ষু সুবর্ণহস্ত এবং সুবর্ণজিহ্ব; তিনি কামরূপী এবং সুবর্ণজ্যোতির্বৃত। পূষা অপ্রতিরোদ্ধব্য ক্ষয়বীর বলবান্, পুরুবসু, বদান্য, অন্নপ্রদ, কপর্দ্দী এবং জ্যোতিষ্মান্। ঊষাকে সুদৃশীকসন্দৃক্ অর্থাৎ মনোহর মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য দেবগণেরও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল রূপের ধ্যান বা উপাসনার

* মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত।

জন্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণ বৈদিক যুগেও অসম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। কারণ, চিত্তের সমুন্নতি বা ধারণার দৃঢ়তা না হইলে মনের প্রাথমিক বা অপরিণত অবস্থায় রূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা বা তাহাকে নমস্কার করা অসম্ভব ও অসঙ্গত হয়। বাহ্য পদার্থে তাদৃশরূপ কল্পনা করিয়া তাহারই পূজায় অভ্যস্ত হইবার পর মানসপটে রূপের ধ্যান করা সঙ্গত হয়। "বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্" (ঋক্ ১।৩২।৭) এই মন্ত্রে প্রতিমান শব্দের অর্থ সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। সায়ন বলেন প্রতিমান অর্থে সাদৃশ্য।

বৈদিকযুগে প্রতীকোপসনার বাহুল্য দেখা যায়। "ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বেদান্তসূত্র ৪।১।৪) এই সূত্রের ব্যাখানাবসরে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "মন ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনার নাম অধ্যাত্ম উপাসনা; আকাশ ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনার নাম অধিদৈব উপাসনা; নামরূপে ব্রহ্মোপাসনারই নাম নামব্রহ্ম উপাসনা"—প্রতীকোপাসনা এই তিন প্রকার; উক্ত বেদান্তসূত্রে কথিত হইয়াছে—প্রতীকে অহং জ্ঞান করিবে না। প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যৎপ্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষ্বব বিষ্ণ্বাদীনাম্" যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুর উপাসনা তেমনই আদিত্যাদিতে ব্রহ্মের উপাসনা। প্রতীকোপাসনার বিষয় ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এইবার পাণিনির ব্যাকরণ আলোচনা করা যাউক। আমরা এই প্রসঙ্গে যদি দুইটি সূত্র "রাল্লোপঃ" (৬।৪।২১) এবং 'ন ধাত্ব্যা পূর্মূর্চ্ছিমদাম্' (৮।২।৫৭) আলোচনা করি তাহা হইলে তৎকালে মূর্ত্তি শব্দ প্রচলিত ছিল বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য মূর্ত্তি শব্দের অর্থ দেহ এবং কাঠিন্যও হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি শব্দ দেবদেহে প্রযুক্ত হইলেই আমরা "প্রতিমা" এই অর্থে উপনীত হইতে পারি।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—

"গিরিপৃষ্ঠে তু সা তস্মিন্ স্থিতা সস্মিতলোচনা।
বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী॥ (১৭।২৭)

এই শ্লোকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার বিষয় স্পষ্ট উক্ত হইল। মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে গোলযোগ করিলে চলিবে না। আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। পাণিনিতে 'ভারত', 'বাসুদেব' 'যুধিষ্ঠির' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম দেখা যায়। যদিও মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দেখা যায় তথাপি মূল মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতকের পর বিরচিত হয় নাই ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। এবং বর্ত্তমান আকার যে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের উৎকীর্ণ তাম্রশাসনাদিতে মহাভারতের নাম পাওয়া যায় এবং তৎকালে যে মহাভারতের বর্ত্তমান আকার প্রচলিত ছিল এবং তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মহাভারতে আরও যে যে স্থলে মূর্ত্তিপূজার বিষয় উল্লেখ আছে বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

পুরাণ সমূহের মধ্যে মৎস্য ও বায়ু পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উভয় পুরাণই জন্মেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও তাহাতে ভবিষ্যরাজবংশের প্রসঙ্গ আছে কিন্তু তাহা পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে "ভবিষ্যৎপুরাণের" উল্লেখ দেখা যায়। যদি আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠশতকে বিরচিত বলিয়া ধরা যায় (ডাক্তার বুহ্লারের মতে তাহা পাণিনির পূর্ব্বে বিরচিত হইলেও হইতে পারে) তাহাতেও পুরাণের প্রাচীনতা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ যদি খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতকে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশশতকে মূল মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। বায়ু পুরাণে মূর্ত্তিপূজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং যে অংশে মূর্ত্তিপূজার বিষয় বলা হইয়াছে তাহা উত্তরকালে বিরচিত বা প্রক্ষিপ্ত নহে বলিয়াই বোধ হয়। বায়ু পুরাণের ২৭ অধ্যায় ৫৫ অধ্যায় দেখুন।

মৎস্যপুরাণের ২৫৮ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

প্রতিষ্ঠায়াং সুরাণাস্তু দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্।
দেবযজ্ঞোৎসবঞ্চাপি বন্ধনাৎ যেন মুচ্যতে॥

যে কর্ম্মযোগ দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন হয় দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠায়, দেবগণের অর্চ্চন, দেবগণের নামকীর্ত্তন এবং দেবযজ্ঞোৎসবই সেই কর্ম্মযোগ জানিবেন।

মৎস্যপুরাণের ২৫৮ হইতে ২৬১ অধ্যায়ে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না।

মৎস্যপুরাণে কয়েক প্রকার প্রতিমার বিষয় কথিত হইয়াছে—

সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈলদারুময়ীবাপি লোহ শঙ্খময়ী তথা॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥

বৌধায়ন বলিয়াছেন—

দ্রবাবৎ কৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনম্।

দেবতার্চ্চা শব্দের অর্থ দেবপ্রতিমা।

অগ্নিপুরাণে দেব প্রতিমা, জীর্ণোদ্ধার বিধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে দেবমন্দিরনির্ম্মাণের প্রকার ও মঠস্থাপনের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। অগস্ত্যসংহিতায় দেবমন্দিরকর্ত্তা স্বর্গলাভ করিবেন বলা হইয়াছে।

যজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

তাম্রকাৎ স্ফটিকাৎ রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাঞ্চনৌ।
রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ॥
দ্বৈবর্ণৈর্বা পটে লেখ্যাঃ গন্ধৈর্ম্মণ্ডলকেষুথবা।
যথাবর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ॥

বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে।—

ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসংস্কৃতয়োঃ

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে।—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

রঘুনন্দন বলেন "রূপকল্পনা" শব্দের অর্থ রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্রাংশাদিকল্পনা। যদি উপাসকের কার্য্যার্থ অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা হয় তাহা হইলে অতি প্রাচীন কালে হইতেই মূর্ত্তির কল্পনা ও পূজা প্রচলিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

মহাকপিল পঞ্চরাত্রে।—

প্রতিষ্ঠাশব্দ সংসিদ্ধিঃ প্রতিপূর্ব্বাচ্চ তিষ্ঠতেঃ।
বহুবর্ষত্বাগ্নিপাতানাং সংস্কারাদৌ প্রতেঃ স্থিতঃ॥
অর্থস্তদয়মেতস্য গীয়তে শাব্দিকৈর্জনৈঃ।
বিশেষসন্নিধেয়া তু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য তু।
যন্মূর্ত্তৌ ভাবনা মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠা সা বিধীয়তে॥

রামায়ণে।—

তত্র তাং মাতরমেব প্রবণাং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্॥

অযোধ্যাকাণ্ড চতুর্থ সর্গ ৩০ শ্লোক

* * * *

বাগ্যতঃ সহবৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ॥

অযোধ্যাকাণ্ড ষষ্ঠ সর্গ ৪র্থ শ্লোক

অধ্যাপক যাকবির মতে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত মূলরামায়ণ রচনার সময়ে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্টকাণ্ডদ্বয় পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। পালি দশরথ জাতক পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে এই জাতক রামায়ণ রচনার পরবর্ত্তী। মূলরামায়ণের একটি শ্লোক রূপান্তরিত হইয়া উক্ত জাতকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে শ্লোকে বুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত আছে তাহা পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত। যবন শব্দের দুইবার উল্লেখ আছে; দুইটি শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রামায়ণ পর্য্যালোচনা করিলে তাহা যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিরচিত তৎবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং রামায়ণে দেবপূজা ও দেব-

মন্দিরের উল্লেখ দেখিয়া তাহা যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রচলিত ছিল তদ্বিষয় সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে দেবপূজা জীর্ণোদ্ধার বিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিধান লিপিবদ্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণেও দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উপদেশ লিখিত আছে।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে অস্মদ্দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রতিমাপূজা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। গ্রীক বা রোমানগণ যে সময়ে প্রতিমা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই অস্মদ্দেশে প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছে।

প্রতীক্ষা।

সখি, মোর মরণ হ'লে তারে তুমি ব'ল ব'ল,
অভাগিনীর গেছে প্রাণ নিয়ে আঁখি ছল ছল;
চেয়ে চেয়ে দিবস রাতি,
নিবে গেছে জীবন বাতি,
হিয়াখানি রেখে গেছে ব্রজের এই ধূলাতল;
তারি তরে র'ল সারা জনমের আঁখিজল।

সে যদি গো আসে পুনঃ আসে যদি কভু ফিরে,
বিঁধিয়োনা তারে সখি, কথা ও ব্যথার তীরে;
অশ্রুসিক্ত বরণ ডালা,
রহিল এ ফুল মালা,
দিয়ো সখি দিয়ো তার পদতল দিয়ো ঘিরে;
অভিষিক্ত করো তারে আনা, হ'য়ে আঁখিনীরে'।

যদি সে শুধায় তোরে তারে তুমি ব'ল ব'ল,
সুখে গেছে অভাগিনী নিয়ে স্মৃতি-পরিমল,
তারি দেওয়া যত ব্যথা,
যত দুঃখ যত কথা
ফুটেছিল হিয়া মাঝে হয়ে সুখ শতদল;
সে যেনগো মোর তরে নাহি ফেলে আঁখিজল।

অভাগিনী গেছে চলে তারি কথা কয়ে কয়ে,
আশার পশরাখানি মরণের পথে বয়ে;
তাহারে পাবার লাগি
রহিব সেখানে জাগি,
রব আমি দিবানিশি পরপারে পথ চেয়ে:
মরণ সফল হবে তারে পুনঃ বুকে লয়ে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

শৈলজার কথা।

অবতরণিকা।

শৈলজা জাতীয় কবি নবীন চন্দ্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শৈলজা চরিত্রের সম্যক বিশ্লেষণ করিতে হইলে যে মহাকাব্যত্রয়ের সহিত এই চরিত্রের উপাখ্যান ভাগ সংশ্লিষ্ট তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কবিবর নবীনচন্দ্রের এই তিন খানি মহাকাব্য—"রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা মধ্যলীলা ও অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। যাঁহারা এই তিনখানি মহাকাব্যের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা অবশ্য নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেব খণ্ডভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতার অলৌকিক কৌশল প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এক বিশাল মহাভারত প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অবগত আছেন। কিন্তু যাঁহারা এই মহাকাব্যত্রয়ের আখ্যান বস্তুর সহিত পরিচিত নহেন তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাকীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত আভাষ এই স্থলে প্রদান করিলাম।

সুদূর অতীত কাল। শ্বেতকায় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণকে নৃশংস অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়া—কানন কান্তারে বিতাড়িত করিয়া—ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। নিপীড়িত কৃষ্ণকায় নাগ ও দস্যুগণ হিংস্র জন্তুর ন্যায় আর্য্যগণের সেই প্রবল অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদানে তৎপর! চারিদিকে বহুদেববাদ ও নিষ্ঠুর বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার! ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেবলমাত্র ভেদনীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। অন্যদিকে বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষের নৃপতি-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে! এই বিবাদ বিসম্বাদের অবসর লাভ করিয়া ক্ষাত্রশক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে! স্বপ্রাধান্যলোপের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ শক্তি অনার্য্য শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশের ষড়যন্ত্রে সমুদ্যত! এমন সময় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। এই মহাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা করে লইয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিপক্ষে মস্তক উত্তোলন করিলেন। এক ভবিষ্য আশার মধুর আলেখ্য আর্য্য-অনার্য্যের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডভারত প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি প্রচার করিলেন—

"এক ধর্ম্ম এক জাতি, এক রাজ্য এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,
"একমেবাদ্বিতীয়ং" করিব নিশ্চিত;
ওই ধর্ম্ম রাজ্য "মহাভারত" স্থাপিত।"

শ্রীকৃষ্ণের মহাকীর্ত্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নরনারায়ণের মহাকীর্ত্তি এই "মহাভারত" সংস্থাপনে শৈলজা কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কবি তাঁহার মহাকাব্যত্রয়ে শৈলজা চরিত্রের যেরূপ ক্রমবিকাশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই চরিত্র পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে গিয়া কোথাও একটু আধটু সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমার্হ বিবেচিত হইব।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবিরই ভাষায় ও ভাবে তাঁহার চিত্রিত শৈলজার আলেখ্য সুবিন্যস্তভাবে পাঠকগণের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। এই আলেখ্য প্রতিষ্ঠায় যদি কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তাহা আমার, চিত্রকরের নহে ইহা মনে রাখিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

শৈলজা—রৈবতকে

শৈলজা নাগবালা—নাগবংশীয় চন্দ্রচূড় রাজার কন্যা। "নাগ" অর্থে কেউটে বা ঢোঁড়া সাপ নহে; নাগ জাতি অনার্য্যজাতি বিশেষ। চন্দ্রচূড় রাজা খাণ্ডবপ্রস্থে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণ তথায় একছত্র আধিপত্য করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের এই আধিপত্য অধিকদিন বিস্তার লাভ করে নাই। শ্বেতকায় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া নৃশংস অত্যাচারে উৎপীড়িত করতঃ তাঁহাদিগকে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। এই পাতাল সম্বন্ধেও সাধারণের একটা ভ্রমসংস্কার আছে। পাতাল ভূগর্ভে নহে; ভারতের পুরাতন মানচিত্রে উহা সিন্ধুনদতীরে সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এখনও ভারতবর্ষের নাগপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে নাগজাতির রাজ্যের চিহ্ন আছে; এবং এখনও নাগজাতি ভারতের পার্ব্বত্যাঞ্চলে বাস করে। পুরাণোক্ত বাসুকির নাম অনেকে অবগত আছেন সেই বাসুকি শৈলজার পিতৃব্যসুত। কবি এই বাসুকিকে নাগরাজ নামে অভিহিত করিয়াছেন; এবং প্রথম অবস্থায় তাহাকে ঘোর কৃষ্ণদ্বেষী, ক্রোধী ও দাম্ভিকস্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। চন্দ্রচূড়রাজ কিন্তু পরম কৃষ্ণভক্ত; সুতরাং বাসুকির সহিত তাঁহার মতের মিল হইল না। "মতভেদে মনোভেদ"; চন্দ্রচূড়রাজ কিশোরবয়সে অসিমাত্র সম্বল করিয়া পাতাল পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধে অবশ্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই তখন ছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু হইলে কি হয়?

"—————————সেই প্রেম পারাবার
হৃদয়েতে হল, অসি ভিক্ষা যষ্টি সার।
বেড়াইলা বনে বনে, অচলে অচলে
ভারতের নানা স্থানে॥"

* * * * *

শিখিলেন ছদ্মবেশে ঋষিদের কাছে
আর্য্যবিদ্যা, আর্য্যধর্ম্ম, নিম্মাইয়া শেষে
এই বিন্ধ্যাচল শিরে "সুনীরার" তীরে
সুন্দর কুটীর ক্ষুদ্র—"পুলিন কুটীর"
হইলা আশ্রমবাসী।"

এই আশ্রমে শৈলজার জন্ম হয়। শৈলজা নাম হইল কেন কবি স্বয়ং শৈলজার মুখেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"——————————সেই কুটীরেতে
সেই শৈলে জন্ম—নাম শৈলজা আমার।"

অষ্টমবৎসর অবধি শৈলজা এই আশ্রমে জনক জননীর স্নেহে ও মমতায় লালিত পালিত হয়, শৈলজার এই আট বৎসরের ক্ষুদ্র ইতিহাস শ্রবণ করুণ—

"অষ্টম বৎসর যবে পড়ে মনে প্রভু
স্থলে স্থলচর সহ করিতাম ক্রীড়া
জলে জলচর সহ দিতাম সাঁতার
সুনীরার তরঙ্গেতে ডুবিয়া ভাসিয়া;
কভু ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে পর্ব্বত শিখরে
করিতাম কৃষি সুখে জনকের সহ;
কভু থাকি জননীর ছায়ায় ছায়ায়
করিতাম গৃহকার্য্য। জনক জননী
কি আদরে হাসিতেন চুম্বিতেন মুখ।
কি আদরে নাচিত এ অভাগীর বুক।
কার্য্য অবসরে পিতা কতই আদরে
শিখাতেন আর্য্যভাষা, অস্ত্র সঞ্চালন—
লক্ষ্য ফুল ফল পত্র। কহিতেন পাপ
অকারণ জীবহত্যা—জীব মনস্তাপ।"

ক্ষুদ্র জীবনের কি ক্ষুদ্র সরল ইতিহাস। এই আট বৎসরের মধ্যে বালিকার সকল প্রকার শিক্ষাই যেন সমাপ্ত হইয়াছিল। অথবা অষ্টমবৎসর গত হইলেই যাহার জনকজননীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভের বাসনা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে তাহার পক্ষে এই আট বৎসরের মধ্যে যতটুকু শিক্ষা লাভ সম্ভব তাহা লাভ না করিলে

চলিবে কেন? ফলতঃ আমরা বালিকার চরিত্রের উত্তরাংশে দেখিতে পাই যে তাহার বাল্যের এই শিক্ষাই তাহাকে উত্তর জীবনে ক্রমশঃ পূর্ণ উন্নতির পথে প্রধাবিত করিয়াছিল।

অষ্টম বৎসর পরে বালিকা একদিন সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইল। চন্দ্রচূড়রাজ দুগ্ধ অন্বেষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে খাণ্ডব দর্শনে গমন করিতেন। অনার্য্যের অতীত গৌরবশ্মশান, পুণ্যতীর্থ খাণ্ডবপ্রস্থ তাঁহার বড় আদরের স্থান ছিল। চন্দ্রচূড়রাজ প্রথমতঃ ইন্দ্রপ্রস্থবাসী আর্য্যব্রাহ্মণগণের নিকট কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনার্য্যদ্বেষী আর্য্যগণ সেই সামান্য দুগ্ধভিক্ষা দানেও যখন অসম্মত হইলেন তখন চন্দ্রচূড় বলপূর্ব্বক তাঁহাদের গাভী হরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ সে যুগে ভেদনীতির প্রশ্রয় দানে সিদ্ধকাম ছিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সমীপে যাইয়া এই অত্যাচারের প্রতিকার ভিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন তাহাদিগকে নগরপালের কাছে প্রতীকার লাভের আশায় আশ্বস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু চক্রী ব্রাহ্মণগণ অর্জ্জুনের সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন "দস্যুরাজকে রণে পরাস্ত করিয়া গাভীগণের উদ্ধার সাধন নগরপালের সাধ্য নহে।" অর্জ্জুন তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। নাগরাজ রণক্ষেত্রে প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে চমৎকৃত করিলেন বটে কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার প্রভাব কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?

রণকুশল অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইল না—বীর কৃষ্ণভক্ত নাগরাজের প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে অনন্তে বিলীন হইল।

——————"নীরবিল নাগ পতি"

কিন্তু "বিশাল ত্রিশূল

অর্জ্জুন হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ

কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ থর থর থর।"

অর্জ্জুন স্বহস্তে নাগরাজের মৃতদেহ দাহন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিলেন বটে; কিন্তু তীব্র অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয়ের সকল শান্তি বিনষ্ট হইল। তিনি বালিকার অনুসন্ধানে গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

"——————আসিলাম গৃহ ছাড়ি; কিন্তু

অষ্টম বর্ষিয়া সেই অনাথা বালিকা

ভাসিতে লাগিল সদা নয়নে আমার;

বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান

কি যে তীব্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার

বসাইল বিষ দন্ত; সুখশান্তি মম

হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্য্যটনে

আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।

অষ্টমবৎসর আজি দেশ দেশান্তরে

বেড়াইনু; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান

অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।"

অর্জ্জুন শৈলজার সন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ দেশে দেশে ঘুরিয়া অবশেষে রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একদিন ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেবের শ্রীচরণ-দর্শনে গমন করিলেন। কথায় কথায় ব্যাসদেব অর্জ্জুনের তীর্থভ্রমণের কারণ জানিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন যথাযথ প্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকার উদাসীনব্রতসাধনে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন "কৃষ্ণ! অর্জ্জুন সেই বালিকার সন্ধানে ফিরিতেছে বটে; কিন্তু এই সন্ধানের পরিণাম শুভ কি অশুভ তাহা জান কি? বলিলেন—

"নহে অসম্ভব

বিষম অশুভ তার সেই দরশনে

শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা

যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে

ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে

হয় ত তেমনি বালা ক্রমে শুকাইয়া

জীবনের বৃন্ত হ'তে পড়িবে ঝরিয়া।

নহে অসম্ভব কৃষ্ণ! পার্থ হুতাশন

প্রবেশিয়া অনাথার জীবন উদ্যানে

পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম

দুঃখিনীর পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জ্জুন
হন্তা সেই অনাথার।"

মহর্ষির বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হিম-শীতল হইয়া গেল। তিনি স্থির অপলকনেত্রে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ব্যাস-দেব নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহর্ষির চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক রৈবতকে ফিরিয়া আসিলেন।

আমরা শৈলজার মূল উপাখ্যানভাগ হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। উক্ত কিয়দংশ সম্প্রতি পাঠকগণের অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে; কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত শৈলজার মিলন ও আত্মপরিচয় প্রদানকালীন এই অংশটির বিশেষ যোগাযোগ আছে বলিয়াই প্রারম্ভে আমরা ইহা তাঁহাদের গোচর করিয়া রাখিলাম।

এদিকে শৈলজার পিতা চন্দ্রচূড়রাজের মৃত্যু সংবাদ অচিরে পাতালে নাগপুরে আসিয়া পৌছিল। শৈলজার জননীর কর্ণে তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রবেশলাভ করিল। অনার্য্য পতিব্রতা রমণী

"———— শোক সমাচার
শুনিলা যেমনি, চাহি মুহূর্ত্ত আকাশ
পড়িল ভূতলে ছিন্ন এ জীবন পাশ!
বিধির অপূর্ব্ব-বীণা দেবতা বিভব
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার, হইল নীরব।"

অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও শৈলজার তখন জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মুহূর্ত্তে তাহার জনকজননীর বিয়োগ ব্যথা নিদারুণ শেলাঘাত করিল। বালিকা সেই দারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় নাগরাজ বাসুকি (শৈলজার পিতৃব্যসুত) তাহাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া গেল এবং যথাযথ শুশ্রূষা করিয়া তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিল। শৈলজা তদবধি বাসুকি আলয়ে দিন যাপন করিতে থাকে।

নাগরাজ বাসুকি চিরদিনই অর্জ্জুনকে শক্র ভাবিয়া ঘৃণা করিত। ঘৃণার ও শক্রতার কারণ শ্রীকৃষ্ণ সোদরা সুভদ্রা। নাগরাজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে—

"————চক্রী নারায়ণ
পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ
যাদব-কৌরব-শক্তি করিবে মিলিত
তা হলে অনার্য্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।"

এদিকে নাগরাজ আযৌবন সুভদ্রার করপ্রার্থী; কিন্তু অর্জ্জুন থাকিতে তাহার আশা কিছুতেই মিটিতে পারে না; সুতরাং অর্জ্জুনকে ক্ষেত্র হইতে ছলে কৌশলে সরাইয়া সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। নাগরাজ বুঝিত যে অর্জ্জুনের সহিত বলে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কেননা অর্জ্জুনকে—

"—সম্মুখ সমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে—"

তাই এতদিন ধরিয়া সে কোনও প্রকার সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আজ আর নাগ রাজের আনন্দের সীমা নাই।

আজ তাই যখন সে শুনিল যে তাহার চিরদিনের পরমশত্রু অর্জ্জুন রৈবতকে আসিয়াছে তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। ক্ষুদ্রা-সরলা বালিকা শৈল-জাকে সে প্রতিহিংসার অস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বীজ বপন করিয়া তাহাকে এক অসীম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে শৈলজাকে কহিল—

"—পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে; সম্মুখ সমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে;
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্ব গ্রহণ
কাল ভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমায় সুযোগ মত দিবি সমাচার
হরিব সুভদ্রা—চির বাসনা আমার।"

শৈলজা শুনিল—পিতৃব্যসুতের আদেশ কিরূপ হেয় ও কঠোর তাহাও বুঝিল; কিন্তু তথাপি সে আদেশ অমান্য

করিবার শক্তি তখন তাহার নাই। পিতৃব্য সুতের সেই কঠোর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে ধীরপদে অর্জ্জুনের অনুসন্ধানে রৈবতকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থলে শৈলজার চরিত্র যেন একটুখানি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটা দিক দিয়া দেখিলে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়। অনার্য্য-সুতা শৈলজা মানবী মাত্র, দেবী নহে। কবি তাহাকে মানবীপদ হইতে কার্য্যগুণে, স্বভাবগুণে ক্রমে দেবী পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তা' ছাড়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদানের অক্ষমতাও বড় গৌরবের বিষয় নহে; সুতরাং মানবী শৈলজা নাগরাজের আদেশ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহার মানবীত্ব বরং এ ক্ষেত্রে আরও উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘটনা স্রোতে তাহার এই ঈর্ষা-বিষ পূরিত হিংসা তমসাচ্ছন্ন হৃদয় রৈবতকে আসিয়া কি সুন্দর অপার্থিব শান্তিকরুণামাখা সুকোমল প্রেমপূর্ণহৃদয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল আমরা ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদান করিব।

একদিন রৈবতকের প্রান্তসীমায় এক বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীরবর অর্জ্জুন পর্ব্বতোপরি পুরোদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন এমন সময় সহসা এক ভীষন উরগ তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধফনা হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেল। বীরের হৃদয় মূহুর্ত্ত মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দিক লক্ষ্য করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন কিশোর বয়ীয় এক কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, ধনুর্ব্বান করে সুন্দর বালক শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান। তিনি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"— দেখিতে বালক তুমি
কিন্তু যে কৌশলে বিদ্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়;
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?
আসিয়াছ কেন হেথা? আসিলে কেমনে?
দিয়াছ জীবন মম, কি দিব তোমায়?

বালক অর্জ্জুনের পদতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে উত্তর করিল—

"—বীরচূড়ামণি!
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি
আসিয়াছে এই দাস, শৈল নাম তার;
সেবিবে চরণাম্বুজ; ভিক্ষা চাহে আর।"

পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের সহিত ছদ্মবেশী শৈলজার এই প্রথম পরিচয়; অর্জ্জুন বালককে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। শৈলজা ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের নিকট আত্মগোপন করিতেছে উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

আর একদিন রাসোৎসবে রৈবতক মুখরিত। জনস্রোতে অধিত্যকা, উপত্যকা প্রপূরিত। শত শত রঙ্গভূমি, শত শত নাট্যশালা, প্রস্ফুটিত কুসমদামে হরিত পল্লবে ও পুষ্পকেতনে সজ্জিত হইয়া দীপালোকে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ফুল্ল চন্দ্রালোকে রৈবতক গিরি স্থির-বিজলী-মাখা মেঘমালার মত শোভা পাইতেছে। রাসোৎসবে সকলেই মত্ত—আনন্দে দিশেহারা—সকলেই আত্ম বিস্মৃত। কেবল একটী প্রাণী এমন উৎসবের দিনেও চঞ্চল হয় নাই। সে ভৃত্য শৈল। বিষাদমূর্ত্তি শৈল। অর্জ্জুনের-আবাসকক্ষ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া অনিমিষ নেত্রে পূর্ণচন্দ্রের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।

"————উৎসব ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাই তাহে
একটিও ক্ষুদ্ররেখা সুখ-চন্দ্রিকার।
এক দণ্ড দুইদণ্ড ক্রমে দণ্ড চারি
বহিল শর্ব্বরী স্রোতে দরিদ্র বালক
সেই ভাবে সেইখানে আছে দাঁড়াইয়া।"

ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর হইল। উৎসবের কোলাহল ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল। অর্জ্জুন উৎসবান্তে স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। সুভদ্রার রূপ মাধুরী অর্জ্জুনকে সে রাত্রিতে মোহিত করিয়াছিল। তিনি প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গের ভূষণ ও সজ্জা খুলিতেছিলেন এবং স্বগতঃ অস্ফুটস্বরে সুভদ্রার রূপগুণের প্রশংসা করিতেছিলেন। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সুপ্ত বিশ্ব চরাচর সে প্রণয়

উচ্ছ্বাস শ্রবণ না করিলেও নিদ্রাহীন শৈলের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল। শৈল অধোমুখে মুক্ত কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই প্রণয় উচ্ছ্বাস শ্রবণ করিল—

"যতই শুনিতেছিল, ততই তাহার
নবজলধরনিভ বদন মণ্ডলে
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হ'তে ছিল ধীরে ধীরে মৃদুল সঞ্চার
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে।"

তারপর ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈলজা প্রভুর ভূষণ, বাস খুলিতে লাগিল। অর্জ্জুন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈল! এতক্ষণ——
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি মামাস্থানে?"

শৈল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"দেখিনি উৎসব প্রভু।"

অর্জ্জুন। "তবে কি কারণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত শৈল এতক্ষণ?"

শৈল। "প্রভু প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস।"

কি সুন্দর ও সরল উত্তর! অথচ কি কঠিন আত্মপ্রতারণা! হৃদয়ের মধ্যে যখন তুমুল সংশয়ের আন্দোলন চলিতেছে—যখন একদিকে গুরুতর কর্ত্তব্য প্রতি পদে কঠোর হইতে কঠোরতর আদেশ বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং অন্য দিকে যাঁহার প্রতি ক্রমশঃ হৃদয়ের অনুরাগ অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে, সেই প্রভু বা প্রেমাস্পদ ব্যক্তিত্বের অথচ পিতৃহন্তার সস্নেহ কথন কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে—তখন হৃদয়ের সেই সংক্ষুব্ধ অবস্থায় আত্ম গোপন করিয়া সেই ব্যক্তিত্বের সহিত বাক্যালাপ কি কঠিন কি দুরূহ।

অর্জ্জুন আদরে শৈলজার ক্ষুদ্র মুখখানি বাম করে তুলিয়া দক্ষিণ করে তাহার ক্ষুদ্র কপোলবাহী কুন্তলরাজি সরাইয়া দিয়া অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন?

"পার্থ অতৃপ্ত নয়নে-
দেখিলা সে মুখে সেই বিস্তৃত নয়নে
সেই ঘন ভ্রূরেখায়, ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে;
প্রভাত শিশিরসিক্ত অপরাজিতার
করুণা মণ্ডিত সেই বর্ণ নীলিমার;
কি মহত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কি কোমলতা—
কিবা নিরাশ্রয়ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!"

অর্জ্জুন বলিলেন—

"শৈল, এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন্ মতে আমি?"

শৈল প্রভুর পা দুখানি দুই করে ধারণ করিয়া ছল ছল নেত্রে প্রভুর পানে চাহিয়া উত্তর করিল—

"————বীর শ্রেষ্ঠ! দিবানিশি দাস
পাইতেছি যে পবিত্র পদ পরশন
অনার্য্যের পরমার্থ; ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্য্য কুমার।"

কি সরল সুসঙ্গত উত্তর। এমন সুন্দর উত্তর অনার্য্যা রমণী ত দূরের কথা; আর্য্যা রমণীর মধ্যেও এ হেন অবস্থায় বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না পিতৃহন্তা বলিয়া নিশ্চিত ধারণা থাকা স্বত্বেও কে এমন মহত্বব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করিতে পারে? এই এক উত্তরের মধ্যে দিয়া আমরা শৈলজার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারি।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পার্থ সুবর্ণপর্য্যঙ্ক অঙ্কে শয়ন করিলেন। শৈল ধীরে ধীরে সুকোমল করে তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তাহার কোমল করস্পর্শে মনে করিলেন যেন—

"দুইটি কুসুম ফুল্ল কোমল শীতল
আলিঙ্গিয়া পদমূল চুম্বিয়া চুম্বিয়া
করিতেছে যেন অঙ্গে অমৃত বর্ষণ।"

এতখানা ভাবিলেন—এমন করিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখ দেখিলেন, তবু অর্জ্জুন তাহাকে বালিকা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না!

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় যাম হইল। অর্জ্জুন শৈলকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন, কিন্তু কি-জানি-কেন শৈল তথাপি তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার নিদ্রালসতনু, শিথিল অঙ্গ প্রভুর চরণাম্বুজে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল তথাপি তাহার পদ সেবার বিরাম নাই। শান্ত মুখে শৈল শূন্য পানে চাহিয়া আছে। তাহার সুকোমল কর পল্লবে অর্জ্জুনের পদাম্বুজ সংস্থাপিত।

তাহার"———ঢল ঢল দুটী নেত্র
অধরে প্রসন্ন হাসি, কি অঙ্গ মহিমা।
নীলমণি নিরমিত ভক্তির প্রতিমা!
কি আনন্দ! যেন বহু তপস্যার পর
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর!"

শৈলের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব ভাবকে কি বলিয়া অভিহিত করিব? ইহা পূর্ব্বরাগের লক্ষণ, না বাঞ্ছিতের প্রতি প্রেমিকার আত্মনিবেদন? যদি বাস্তবিক ইহা অলক্ষ্যে আত্মনিবেদন হয় তাহা হইলে শৈলের আত্ম গোপনের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্ম নিবেদনের ভাব প্রকাশ কত সুকঠিন তাহা রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয় যাম অতীত হইল। পার্থ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শৈলজা একবার বাতায়ন পথে আকাশের পানে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া অদূরে এক বনান্তরালে প্রবেশ করিল। সেথানে একজন আগন্তুক ছায়ার আঁধারে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আগন্তুককে প্রণাম করিল। আগন্তুক তাহার ক্ষুদ্র ললাট চুম্বন করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দুইজনে অদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

আগন্তুক। "বহুক্ষণ বসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়;
বল শৈল! করেছ কি উদ্দেশ্য সাধন?"
শৈল। "করিয়াছি।"
আগন্তুক। "বুঝিয়াছ পাণ্ডবের মন?"
শৈল। "বুঝিয়াছি।"
আগন্তুক। "প্রেমাকাজ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রার?"
শৈল। "প্রেমাকাজ্ক্ষী।"
আগন্তুক। ——"ভদ্রা কি তেমন
"অনুরাগিণী তাহার?"
শৈল। "নবাগত ক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র আমি;
অন্তঃপুর নিবাসিনী সুভদ্রা সুন্দরী,
কেমনে বুঝিব আমি হৃদয় তাহার?
কিন্তু ভ্রাতঃ ঐ দেখ পূর্ণ শশধর
বসি সিন্ধু বক্ষোপরে, দেখ কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ! প্রস্তর যেমন
নিরুচ্ছ্বাস নীরনিধি আছে কি এমন?"

আগন্তুক ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তারপর শৈলজাকে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। শৈলজা তৎক্ষণাৎ আগন্তুকের পদতলে পড়িয়া ক্ষুদ্র সুকোমল করে তাহার পদ যুগল ধারণ করিল এবং করুণ নয়নে তাহার ভীম দৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া কাতর স্বরে কহিল—

"হেন পাপ অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহে নিরমম তুমি। অভাগ্য অনার্য্য
হয়েছে কঙ্কাল সার; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগনন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কাল রাশি? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি?

কিন্তু শৈলজার কাতর উক্তিতে পাষাণহৃদয় আগন্তুকের যেন মন গলিল না। সে শৈলজাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নানাপ্রকার ভৎর্সনা করিল ও নক্ষত্রের মত বেগে কোথায় লুকাইয়া গেল।

এই নবাগত পাষাণ হৃদয় আগন্তুক যে নাগরাজ বাসুকি, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

নাগরাজের কঠোর তিরস্কার ও লাঞ্ছনা শৈলজার অন্তরে দারুণ আঘাত করিলেও শৈল আপনার কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইল না। সে ইতঃপূর্ব্বেই আপনার কর্ত্তব্য পথ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে জানিতে পারিয়াছিল যে ভ্রাতার সেই ঘৃণিত আদেশ

কখনই তাহার জীবনের ব্রত হইতে পারে না। বাহাকে দেখিলেই হিংসার আগুণ নিভাইয়া যায় তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা এবং সুযোগ পাইলে তাহাকে কালভুজঙ্গিনীর মত দংশন করা যে তাহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন ইহা শৈলজার বুঝিতে বাকী রহিল না। শৈলজা পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া অস্তগামী শশধরের পানে চাহিয়া একে একে জীবনের বিগত ঘটনাবলীর আলোচনা করিতে লাগিল। অশ্রু স্রোতে শৈলজার বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। শৈলজা অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে স্থির করিল :—

"কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিবে আপনি ভাই ! ডুব'তে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিস্ফল
তোমার জীবন ব্রত, আমার জীবন।"

শৈলজার এই অভিসন্ধি কেন শুনিবেন ?

"কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন
কিবা ঘোর পাপ মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
আসিলাম ! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে ; যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার আধার ; নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে। বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত মন্দাকিনী ! হোক সব স্বপ্ন—
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি—দুঃখ জাগরণ।"

নিরাশার অন্ধকারে যখন দুর্ব্বল অশান্ত মানবহৃদয় হাবুডুবু খাইতে থাকে, তখন জগতে বাস্তবিকই একমাত্র স্বপ্নের মাঝে তাহার শান্তি লাভের সম্ভাবনা। শৈল এতদিন রৈবতকে থাকিয়া ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের সেবকরূপে দিন যাপন করিয়া অর্জ্জুনকে বেশ চিনিয়া লইয়াছিল। ভ্রাতার দুরভিসন্ধি বশে পরিচালিত হইয়া সে ইহাও বেশ বুঝিয়াছিল যে অর্জ্জুন সুভদ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ; সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি তাহার যে অনুরাগ ও প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে ইহা হৃদয়ে উঠিয়া দুইদিন পরে হৃদয়েই মিলাইয়া যাইবে ! বাস্তব জীবনে তাহাদের এ প্রেম কখনও সফল হইবার অবসর আসিবে না। শৈলজা তাই স্থির করিয়াছিল যে এমন প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে বাস্তবজীবনে লাভ করিতে না পারিলেও অলীক কল্পনায় তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখলাভ করার চেয়ে জগতে আর কি শান্তি থাকিতে পারে ? শৈলজা তাই সেই ব্যক্তিতের মদিরাময় প্রেমের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া সেই কুহকমাখা স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিল। প্রকৃত পক্ষে অনার্য্য-রমণী আর্য্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইলে তাহার পক্ষে এই স্বপ্ন ভিন্ন অন্য শান্তিই বা কোথায় ?

শৈল কাতরভাবে পূর্ব্বগগণের পানে চাহিয়া ভাবিল—

"—অনাথ নাথ ! আশা অন্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে। যাপিব জীবন
নিরাশার উষালোকে দেখিয়া স্বপন।"

তারপর ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল। ক্ষুদ্রা সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে তখন চিন্তার যে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল তাহার কে ইয়ত্তা করিবে ?

অর্জ্জুনের নিদ্রাভঙ্গ হইলে শৈল বিনীতভাবে প্রকারান্তরে সেই দুরভিসন্ধির বিষয় অর্জ্জুনকে জানাইল। বালিকা তখনও আত্মপরিচয় প্রদান করিল না ; কেবল মাত্র অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে অর্জ্জুন যাহা শুনিবেন তাহা যেন ঘুণাক্ষরে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করেন। অর্জ্জুন সেই নৃশংস ষড়যন্ত্রের বিষয় শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে শৈলের প্রতি এক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন ; কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

"দেখিলা সে মুখ শান্ত ; শান্ত দু'নয়ন
সরল ও সুশীতল উষার মতন।—বিস্ময়
বিমুগ্ধ প্রাণে।"

অর্জ্জুন ক্ষণকাল সেই মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর মৃগয়ায় চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুনের রৈবতকবাস শেষ হইয়া আসিল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া হস্তিনায় ফিরিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এক দিবস অর্জ্জুন শৈলকে কহিলেন—

"————শৈল! মম রৈবতকে বাস
হইয়াছে শেষ; তুমি ছাড়িয়া আমায়
যাইবে কি গৃহে তব?"

কি নির্ম্মম প্রশ্ন! প্রশ্ন শুনিয়া শৈলজার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! দরদর অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া গেল! শৈল কাঁদিতে লাগিল।

সত্যই তো কাঁদিবার কথা। সংসারে যে সকল বন্ধনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কেবল একটী মাত্র বন্ধনে আপনাকে এতদিন আবদ্ধ রাখিয়াছে—যে বন্ধন তাহার জ্ঞানের প্রথম উন্মেষেই সংসারের শ্রেষ্ঠ মধুর বন্ধন এবং তাহার ক্ষুদ্র জীবনের চরম বন্ধন বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সেই চিরাকাঙ্খিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আজ সে কোথায় যাইবে?

শৈল উত্তর করিল—

"————নাহি গৃহ এ দাসীর।"

অন্তরের আবেগে হৃদয়ের ব্যাকুলতায় পরাণের রুদ্ধ মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল—

"————নাহি গৃহ এ দাসীর।"

অর্জ্জুন শুনিলেন—শুনিয়া একবার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বালকের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন—

"————শৈল! তবে চল হস্তিনায়
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্র নির্ব্বিশেষে
পালিবে তোমায় পার্থ। তব স্বার্থহীন
শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহা সুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্লভ বৎস!"

শৈল কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। ঝটিতি সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার কক্ষে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই যে অশ্রু—এ অশ্রু কিসের? অনাবিল প্রেমের না বুক-ফাটা ব্যাকুলতার?

পার্থ বিষণ্ণ অন্তঃকরণে কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর শৈলের কক্ষে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু এ কি! শৈলের সে ভৃত্য বেশ কোথায়? তৎপরিবর্ত্তে তিনি এ কি দেখিতেছেন?

"অপূর্ব্ব যোগিনী মূর্ত্তি মাধুরী মণ্ডিত,
অপরাজিতার সৃষ্টি সদ্য সুবাসিত
শীতল মাধুর্য্যে অঙ্গ, মধুর রেখায়
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধারায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল
শান্তি করুণার স্বর্গ দর্পণ যুগল!
ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর কোণায়
শান্তি করুণার স্বপ্ন সমাধি তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতনু শরীর
শান্তি করুণার যেন পবিত্র মন্দির।
দেখ মুখ—দেখিবে সে হৃদয় তাহার
কি শান্ত করুণা মাখা প্রেম পারাবার!
নীরব—কি যেন এক করুণা উচ্ছ্বাস
অন্তরে অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিঃশ্বাস
যোগিনীর পরিধান আরক্ত বসন
একটী কুসুম হার অঙ্গের ভূষণ।"

অর্জ্জুন বিস্ময় বিহ্বল! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈল! শৈল!—দেবী কি মানবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"

শৈল অর্জ্জুনের চরণ যুগল ধারণ করিয়া কাতর স্বরে উত্তর করিল—"ছলনা দাসীর————
ক্ষমা কর বীরমণি! ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে,
সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর

আত্ম পরিচয়, কিন্তু সেই শোক গীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"

আত্ম বিস্মৃতের মত অর্জ্জুন সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা তখন একে একে সুখ পূর্ণ শোকপূর্ণ জীবনের কাহিনী ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। আমরা এই সমূহ কাহিনী পূর্ব্বেই পাঠকের গোচর করিয়াছি। অর্জ্জুন সেই শোক পূর্ণ কাহিনী শুনিয়া উন্মাদের মত শৈলজাকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রু প্লাবিত বদনে বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা!
চন্দ্রচূড় কন্যা তুমি!——— * * * *
আমি তব পিতৃহন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন? নাহি স্বর্গ কে বলে ধরায়?
এ যে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায়!
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল! আমি। আমি পাপী ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ———"

অর্জ্জুন কি বলিতে যাইতেছেন বুঝিতে পারিয়া শৈলজা সবেগে অর্জ্জুনের মুখে হাত দিয়া তাঁহার সেই উচ্ছ্বাস নিবারণ করিল। তারপর উভয়ে বহুক্ষণ নীরব। অবিরল অশ্রু ধারায় উভয়ের বক্ষঃ প্লাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন কৃত কর্ম্মের নিমিত্ত ভীষণ অনুতাপ করিলেন। শৈল তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। অনুতপ্ত মর্ম্মাহত অর্জ্জুন তখন বালিকার দুইটী কর ধরিয়া কাতর ভাবে কহিলেন:—

"শৈলজে! শৈলজ!
* * * * করেছি প্রতিজ্ঞা
জনক শশ্মানে তব দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি। অনুতাপে মম
তব পিতৃ হত্যা পাপ জুড়াইব শৈল!
দেখি সুখ হাসি তব সুধাংশু বদনে
চল ইন্দ্রপ্রস্থে শৈল! অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অগ্নানলে, করিব উদ্ধার
হিংস্র বন্য পশু বাস; স্থাপিব আবার
পিতৃ রাজ্য তব; পিতৃ সিংহাসন;
শৈলজে! তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ
শোভিবে চন্দ্রিকা বক্ষ শারদ গগন।"

কিন্তু শৈলজা আজ আর বাহ্য সম্পদের অভিলাষিনী নহে। সে অর্জ্জুনের সমুজ্জ্বল হৃদয়স্বর্গে বিন্দুমাত্র স্থান ভিক্ষা করে। সে কি চায় শুনিবেন?

"—দাসীর হৃদয়ে
সেই শান্তিরাজ্য নাথ! হয়েছে স্থাপিত
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্ব চরাচর
হবে মম পার্থময়। বনের কুসুম
গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল
হইবে অর্জ্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা; তুমি প্রাণেশ্বর!
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।"

শৈলজা এমনি তন্ময়তা, এমনি "অর্জ্জুন" ময়তা, এমনি বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধ চাহে। দুই দিন বাদে বিমুক্তা বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে কাননে কান্তারে, যাহার ঘুরিয়া বেড়াইবার বাসনা সে কেন সঙ্কীর্ণ খণ্ডরাজ্যের অধিকারিণী হইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে? ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়াও সে বিশাল বিশ্বপ্রেমের মধুরতা আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা করে সে কেমন করিয়া সঙ্কীর্ণ প্রেমের গণ্ডীতে আপনাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে? নিরাশা পীড়িত ভগ্নকণ্ঠে শৈলজা উত্তর করিল—

"যেই রক্তবাসে যোগী সাজি প্রাণনাথ!
খুঁজিলেও অভাগীরে, পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতা; যাও প্রাণনাথ!

শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা! রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা হার—ত্রিদিব ভূষণ—
"শুকায়ে পড়িবে মালা ; মালাদাত্রী হায়!
হয়তো বাসুকি অঙ্কে শুকাবে ধরায়।"

শৈলজা চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বনফুল আপনার অন্তরনিহিত সৌরভে বাঞ্ছিতকে ক্ষণতরে আকুল করিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা কেহ দেখিল না। অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু রৈবতকের ত্রিঃসীমায় তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে অর্জ্জুন উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিলেন—

"————ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যৎ বাণী ফলিল দুর্ব্বার—
পিতৃহন্তা হলো আজি হন্তা অনাথার।"

রৈবতকে কবি শৈলজাকে এই পর্য্যন্ত চিত্রিত করিয়াছেন। এতক্ষণ আমরা শৈলকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দেখিলাম। কবি তাহাকে যে ভাবে বালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কবিত্বের হিসাবে তাহা এই অবস্থায় প্রযুজ্য হইতে পারে। রৈবতকে শৈলজা মানবীমূর্ত্তিতে যে অদ্ভুত নিঃস্বার্থ-ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই জগতে দুর্ল্লভ ভক্তবীর চন্দ্রচূড় রাজের শিক্ষার গুণে শৈলজা আট বৎসর কালমাত্র শিক্ষালাভের অবসর পাইয়া এই দুর্ল্লভ চরিত্রের অধিকারিনী হইয়াছে। কবি অতঃপর তাহাকে এক অসীম ধৈর্য্যশালিনী প্রসন্নতাস্বরূপিনী চিরপ্রেমময়ী মহীয়সী নারীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

"কুরুক্ষেত্রে" আমরা শৈলজার সেই চরিত্রের প্রভাব বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মিলনানন্দ।

প্রিয়তমে! "থাম প্রিয়! হের ধীরে ধীরে
আসিতেছে অপরাহ্ন জীবনের তীরে
বিথারিয়া কালোছায়া, নিটোল যৌবন
শিশিরেতে শীর্ণ ম্লান সরোজ মতন
হইতেছে লোল ক্রমে; ব্যাকুল অন্তর
চাহিতেছে আজ শুধু চির অবসর
প্রমোদ উৎসব কাছে।"

মিথ্যা ভর ভয়'
দেহের বিকারে নাহি যৌবনের ক্ষয়
এক কণা কোন দিন; যৌবন অমর
প্রসন্ন আনন্দময় মর্ম্মের ভিতর
গোপন আসন তার। তাই সুহাসিনী!
বহিতেছে প্রাণে মোর দিবস যামিনী
নির্ঝরিণী সঙ্গীতের; পলকে পলকে
করিতেছি পান আমি তৃপ্তির পুলকে
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি; কিসের সংশয়?
চেয়ে দেখ হে প্রেয়সী! কত্রদ্যুতিময়
ঝলমল তারা ফোটা নীল নভোস্থল
কি দিব্য সান্ত্বনা পূর্ণ! নিয়ে ভূমণ্ডল
গন্ধ-বর্ণ রূপ-রসে নিখিলের প্রাণ
তুলিছে আশ্বাসে ভরি; শোন পাতি কাণ
প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে কি মহান
অভয় সঙ্গীত নিত্য!

তাই বলি তোমা
অহেতুকী চিন্তা ভুলি এস মনোরমা
লাবণ্য-কোল্লোলে ভর; এস এস বুকে
বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত সম অধীর কৌতুকে
মগ্ন করি মোরে! কে তুমি! কি তুমি রাণী!
অকারণ চাহি না বুঝিতে! ভালো জানি
নহ তুমি ধধুপের ক্ষণ দীপ্তি খানি
আঁখির বিলাস মাত্র; তুমি যে হে নারী
অপূর্ব্ব চেতনা প্রাণে; কিম্বা মহিমারি
শরীরি প্রকাশ চোখে! আমি শুধু বুঝি
যারে হায় নিরন্তর জন্ম জন্ম খুঁজি
তোমাতে আভাষ তার; হয় অনুভব
তুমি ছাড়া এই বিশ্ব অপূর্ণ নিষ্প্রভ
অস্পষ্ট ছবির মত।

তর্ক অকারণ
চেয়ে দেখ আজি বিশ্বে কত আয়োজন
মিলন উৎসব ভরে; গগনে পবনে
বাজিতেছে বাঁশী, মরি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
কি ঝঙ্কারে প্রাণোন্মাদী! মহোল্লাস ভরে
কুঞ্জময় ফোটে ফুল থরে থরে থরে
নন্দিতে বাসক রাতি। দূরে আম্র শাখে
পঞ্চমেতে পিকরাজ কুহু কুহু ডাকে
ঘন ঘন শঙ্খ সম; ব্যাকুল বকুল
ঝরিয়া বিছায় ভূমে শয়ন অতুল
ক্ষীর শুভ্র সুকোমল; তবু নিরুত্তর?
আরো হের দিকে দিকে কি দিব্য সুন্দর
প্রাণারাম মিলন আলেখ্য। হে ভাবিনী!
সুদূর দিগন্তে ওই চুম্বিছে মেদিনী
নুয়ে পড়ি নীলাকাশ; নিয়ে হোথা দূরে
সাগরে মিশিছে নদী কুলু কুলু সুরে
কি আগ্রহ লয়ে বুকে! সান্ধ্য জ্যোছনায়
উচ্ছল বারিধি বক্ষ! বেলা বালুকায়
আলিঙ্গন করে সিন্ধু উন্মাদের; প্রায়
রৌপ্য-শুভ্র-ফেন-হাস্য-ধারে; সমুন্নত
ভীম কান্তি পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ যত
বক্ষে ধরে-মেঘ মালা; এই রূপে ধরা
মধুর মিলনানন্দে রহেছে বিভোরা
কি গৌরবে মহিমায়। মোরা শুধু হায়

পুণ্যময়ী এ রজনী পরম হেলায়
যাপিতেছি বৃথা তর্কে। তাই বলি প্রিয়া
এস তুমি হৃদয়ের সর্ব্ব দ্বার দিয়া
অচঞ্চল পদে দ্রুত! মানস মধুপ
ঘিরিয়া তোমার এই জ্যোৎস্না ফুল্ল রূপ
নাচুক উল্লাস ভরে, কটাক্ষে তোমার
জ্বলুক প্রীতির অগ্নি অন্তরে আমার
স্নিগ্ধ শিখা জ্যোতির্ম্ময়। তব পরশণে
ভুলাইয়া দিক জ্ঞান বিচারের মনে
নব চেতনায় এক। চুম্বনেতে আর
লুপ্ত হোক চক্ষে মোর বিশ্ব মহিমার।

শ্রীনলিনী নাথ দে।

শূন্য।*

শূন্য আমার চির সহচর। আমি ছাড়িতে চাহিলেও প্রবাদ বাক্যের কমলীর ন্যায় শূন্য আমাকে ছাড়িতে চাহে না। তাই আমি আজ শূন্যের রূপ বর্ণনা করিতে বসিয়াছি।

হে শূন্য, তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় গণিতের দ্বারে। সেথানে তোমার বিচিত্র লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হই।

হে শূন্য তোমার মহিমা যারা খর্ব্ব করিতে চাহে তাদের তুমি পদতলে দলিত কর এবং তাদের অসারতার পরিচয় দিতে কালমাত্র বিলম্ব কর না। $\frac{\circ}{\cdot}$ = ০

আবার যখন কেহ গর্ব্বোন্মত্ত হইয়া তোমার সমকক্ষ হইতে চাহে ক্ষণকাল মধ্যে তুমি তার দর্প চূর্ণ কর। ০×১=০

বিন্দুমাত্রও তমোভাব থাকা পর্য্যন্ত তুমি তার ক্ষতি বা বৃদ্ধি কর না। ১+০=১, ১−০=১

শাস্ত্রে বলে—

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥
ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ সংসারের সার।
করিবারে পারে তাহা ভবনদী পার॥

তাই যখন কেহ বিনয় সহকারে তোমার সহায়তা ভিক্ষা করে তখন তুমি প্রকৃত সাধুর মত তার মূল্য অনেক বাড়াইয়া দাও। ১এর পিঠে ০=১০

আবার যাকে তুমি মাথায় তোলো তার মূল্যের ত কথাই নাই, সীমা হইতে তাহাকে তুমি অসীমে লইয়া যাও। $\frac{১}{০}$=∞

হে শূন্য যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের শেষ তার ওপারেই তোমার বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীমা।

এ সংসারের অসারতা ভাবুকের মনে তোমার নিত্য সত্বার কথা জাগাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভোগ হইতে ফরাশী সাহিত্যিক আমিল (Amiel) দ্বি শূন্যের বা অসীমের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গণিত শাস্ত্রে × এই দ্বি শূন্য অসীমের সঙ্কেত রূপে ব্যবহৃত হয়। এই দ্বি শূন্য মহাত্মা বিবেকানন্দের মনে মহা প্রলয়ের কথা জাগাইয়া ছিল। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন সেই শেষ দিনে ——'শূন্যে শূন্য মিলাইবে।'

আবার সাহিত্য জগতে শূন্যের বিচিত্র লীলা দেখা যায়। কোন কোন দার্শনিক বলেন শূন্য হইতে কিছুই সম্ভবে না (Ex nihilo nihil fit) কিন্তু মহাকবিরা এই শূন্যের উপাদানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি Milton ইহার এইরূপ বর্ণনা দেন—

"A dark

* মেদিনীপুর কলেজের সারস্বত সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

Illimitable Ocean, without bound,
Without dimension, where length, breadth and height
And time and place are lost, when eldest Night
And chaos, ancestors of Nature, hold
Eternal Anarchy."

৺রমাই পণ্ডিত শূন্য পুরাণের 'সৃষ্টি পত্তনে' বলেন—

"নহিরেক নহিরূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দরে ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥

এমন কি

শূন্যেত বেড়াঅন পরভু কাউর নহি পান লাগ॥

আজও শত শত নরনারী ভার্জিলের ইলিয়াডের, দান্তের ডিভাইন্ কমিডিতে, চসারের হাউস্ অফ্ ফেমে, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে বা হেমচন্দ্রের ছায়াময়ীতে শূন্যের বিচিত্র রূপ বর্ণনা দেখিয়া আনন্দ রসে আপ্লুত হন।

হে শূন্য, দর্শনের দুয়ারে তোমার বিশ্বরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই।

হে শূন্য, হে মহাশূন্য তোমার মহিমা অপার। তুমি আপনার ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অনন্তের আভাস দাও। তুমি অরূপের ভিতর স্বরূপের প্রকাশ কর। তুমি সীমার মধ্যে অসীমকে দেখাইয়া দাও। তোমার বিরাট গর্ভের মধ্যে ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণ অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে আছে।

যা কিছু আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ সবই সেই মহা প্রলয়ের দিনে তোমার সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে তা তোমার রাজ্যে বাস করতো আবার দুদিন পরে সে সেই অসীম সমুদ্র মাঝে হয়ে যাবে লীন। এ সংসারে তুমিই শুধু নিত্য, সৃষ্টি ক্ষণকালের কিন্তু হে শূন্য তুমি চিরকালের।

সৃষ্টির ধ্বংস ঠিক ফিনিক্স পক্ষীর মৃত্যুর ন্যায় যার মরণের সঙ্গে আর এক ফিনিক্সের জন্ম হয়। শিবমূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্যে তুমি ধ্বংস করিতেছ; মাতৃমূর্ত্তি কালীরূপে তুমি ভৈরব নিনাদে সংহার করিতেছ। কিন্তু সেই মরণের মধ্যে জীবনের অঙ্কুর গ্রথিত রহিয়াছে। উভয়ের মিলনে নূতনের সৃষ্টি হইতেছে। তাই তোমার সংহার মূর্ত্তি এত সুন্দর। তাই তোমার কালী মূর্ত্তিতে—নিবিড় আঁধার মাঝে এত রূপরাশি চমকিয়া উঠে।

হে মহাশূন্য, তুমি এই সৃষ্টির আদি আবার তুমিই ইহার অন্ত। তোমা হইতে মোরা লয়েছি জনম্ আবার তোমাতে ফিরিয়া যাইব। ঐ দূর থেকে তোমার বাঁশী ডাকছে; যে কালো অন্ধকার বাঁশী বাজলে সে আমার কণাও রাখবে না চিহ্নও রাখবে না। কালোর মধ্যে, তোমার তীব্র মধুর রূপের মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশে যাবে। তুমিই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। জগতে যা কিছু আমরা দেখিতে পাই, অথবা যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই কেবল শুনিয়াছি মাত্র, সমস্তই তোমার বিচিত্র বিকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। তুমি কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, কখনও শান্ত কখনও অনন্ত, কখন এক কখন বহু, তুমি আপনার সনাতন সত্তা দিয়ে ত্রিভুবন সৃষ্টি করেছ। তুমি দেবতার মধ্যে, মানুষের মধ্যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছ। জগৎ এবং তুমি অভিন্ন এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে তুমি সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে অবস্থান করচো—তুমিই এ বিশ্বপটে জ্ঞান শক্তি এবং প্রেমের অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া তুলিতেছ। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, তুমি সত্য, সুন্দর।

তাই ঋগবেদের নাসদীয় সূক্তে আর্য্যঋষিগণের দেব ভাষায় তোমার বন্দনা করি।

না সদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমা পরোযৎ কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস। তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্ তুচ্ছ্যেনাভপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা অজায়তৈকম্।

শ্রীনারায়ণকুমার মুখোপাধ্যায়।

দাবদাহ।

(১)

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয় নাই। পশ্চিমাকাশে অস্তমিত তপনের রক্ত-কিরণ-ছটা তখনও শোভিতেছিল, এমন সময়ে একটা অশ্বযান বর্ম্মার নিবিড় বনরাজি ভেদ করিয়া দ্রুত গমনে চলিতেছিল। তখন বর্ম্মার নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছিল। বিখ্যাত ধনী হরকিষণ লাল একটা বড় কণ্ট্রাক্ট লইয়া রেলপথ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। অশ্বযানটী তাঁহারই। গাড়ীর ভিতরে হরকিষণ লাল ও তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা লছমী। হরকিষণের সংসারে এই কন্যা ব্যতীত আর কেহ ছিল না, তাই হরকিষণ যখন যেখানে যাইতেন কন্যাটীকে সঙ্গে লইতেন। লছমীও তাহাতে খুব আনন্দ লাভ করিত। অশ্বচালক ক্লান্ত অশ্বকে দ্রুত গমনে খুবই উত্তেজিত করিতেছে সত্য কিন্তু পথ বন্ধুর বলিয়া অশ্বের গতি প্রতিহত হইতেছে। এদিকে সন্ধ্যা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। পথের দুই ধারে নিবিড় অরণ্য। এখনও দশক্রোশ না যাইলে বাজারে পৌঁছিতে পারা যাইবে না। পথে যে ভয় নাই তাহাই বা কে বলিবে?

অশ্বের গমনভঙ্গী দেখিয়া হরকিষণ একটু চিন্তিত। লছমী কিন্তু অনুদ্বিগ্না, একমনে বন্যপ্রকৃতির লীয়মান সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। শান্ত, গম্ভীর, সান্ধ্য বনশ্রীর ন্যায় লছমীর মুখখানিও শান্ত, নিষ্কম্প। হরকিষণ কিন্তু স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। একটু অন্যমনস্ক হইবার আশায় পার্শ্বোপবিষ্টা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মা! ভয় পাইতেছিস্"; লছমী একটু হাসিয়া উত্তর দিল "না, বাবা।" সে হাসিটুকু মেঘান্তরিত বিদ্যুতের মত, অনুজ্জ্বল হইলেও বড় মধুর। বৃদ্ধের প্রাণ ভরিয়া গেল; বৃদ্ধ কহিলেন, "কি দেখিতেছিস্?"

"দেখছিলুম বাবা! একটু আগে এই গাছগুলো সূর্য্যের সোণালী-কিরণে কেমন জ্বলিতেছিল আর এখন ক্রমেই যেন অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে! পৃথিবীর সকল জিনিষেই এমনই আলো আঁধারের খেলা! না বাবা!"

"হাঁ, মা! সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, জগতের এই নিয়ম। তবে এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় মা, যাদের জীবনে দুঃখের রাত্রি আর পোহায় না। চির-জীবনই তারা ভাগ্যের পীড়নে নিষ্পেষিত হ'য়ে অকালে দুনিয়া থেকে চলে যায়। চির-সুখী লোক জগতে খুবই কম।" বৃদ্ধ একটী দীর্ঘনিংশ্বাস ছাড়িল, যেন একটা অজ্ঞাত ব্যথা, একটা গোপন বেদনা অলক্ষ্যে হরকিষণের হৃদয় অধিকার করিল। এমন সময় একটা করুণ চীৎকার করিয়া হরকিষণের অশ্ব পড়িয়া গেল, গাড়ীটাও বিষম ধাক্কায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। লছমী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি ব্যাপার বুঝিতে না বুঝিতে গাড়ী উল্টাইয়া গেল। হরকিষণ ত্রস্তভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া কন্যাকে সেই বিপর্য্যস্ত-যানের অভ্যন্তর হইতে বাহির করিল। লছমী তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে দাঁড়াইতে পারিল না। রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল। হরকিষণ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন অশ্বচালক রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। দারুণ আঘাতে হতভাগ্য কাতর ধ্বনি করিতেছে। অশ্বের অবস্থা সব চেয়ে খারাপ। তাহার অন্তিমকাল আগত প্রায়। হরকিষণ ত্বরিতহস্তে ঘোড়ার বন্ধন কাটিয়া দিলেন কিন্তু অশ্ব আর উঠিতে পারিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্বটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যান বাহন বিরহিত হইয়া ঘনতিমিরাবৃত কানন-মধ্যে লক্ষপতি হরকিষণ প্রমাদ গণিলেন। একা হইলে তিনি সাহসে ভর করিয়া পদব্রজে গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেন। ঊষর মরুভূমির অধিবাসী সর্ব্বপ্রকার কঠোরতায় অভ্যস্ত, কিন্তু আজ ত তিনি একা নহেন! সঙ্গে সদ্যোভিন্নযৌবনা কুসুমকোমলা কন্যা—সে যে আজীবন বিলাসে লালিত—সে এ ক্লেশ সহিতে পারিবে কেন?

কিনা রাঁধুনীর কাজ করিবে! লছমী ভাবিতেছিল "কি স্পর্দ্ধা এই লোকটার!" লছমী একবার বিশ্বনাথের দিকে দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল একটা অসভ্য বন্য পশু ভিন্ন আর সে কি হইতে পারে? তথাপি তাহার মধ্যে একটা শক্তি আছে। লছমী তাহাকে যতটা ঘৃণা করিবে ভাবিতেছিল ততটা পারিতেছিল না। তাহাতে লছমীর রাগ আরও বাড়িতেছিল।

বিশ্বনাথ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিল ঘরে শোওয়া হরকিষণের বা লছমীর অভিপ্রায় নয় তখন সে উঠিয়া গিয়া স্বয়ং শয়ন করিল।

হরকিষণ ভজুয়া বা লছমী কেহই সে রাত্রি ঘুমাইল না। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুশ্চিন্তায় তাহারা সে রজনী অতিবাহিত করিল।

প্রত্যূষে বিশ্বনাথ কুঠার হস্তে হরকিষণের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে ও ভজুয়াকে কাজে যাইতে আহ্বান করিল। হরকিষণ ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল "দেখ বিশ্বনাথ, অনেক হয়েছে, আর কেন?

বিশ্ব। এই ত সবে আরম্ভ! এখনি হয়েছে কি?

হর। তুমি দেখছি আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলবে?

বিশ্ব। তোমার মেয়ের উপর আমি কোন অত্যাচার করতে চাই না। তবে তাকে রাঁধতেই হ'বে। নইলে সে করবে কি? বসে খাওয়া এখানে চলবে না!

হর। না না তা হবে না! আমি খেটে তার খোরাকী পুষিয়ে দেব। বিশ্বনাথ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, তোমার খাটুনীতে তোমার নিজের খোরাকেরই দামই উঠবে না তা পরের কথা! সে হবে না, তোমরা চলে এস, বেলা হচ্ছে। রান্নাঘরে রান্নার সমস্ত জিনিষ আছে। বলিয়া বিশ্বনাথ একবার লছমীর দিকে চাহিল। লছমীর তখন হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। অতি কষ্টে সে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিল "বাবা তোমরা যাও, কেন বৃথা অপমানিত হবে!" ক্রোধে দুঃখে আহত সর্পের মত গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে হরকিষণ চলিল। ভজুয়া প্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিল।

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহারা কাজ করিল। বিশ্বনাথের শরীরে অমিত শক্তি তাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। সে একাই সব কাজ করিল। হরকিষণ ও ভজুয়া কর্ত্তিত কাঠগুলো রহিতে লাগিল মাত্র লছমী গৃহ দ্বারে বসিয়া সব দেখিল। বিশ্বনাথের কর্ম্ম নিপুণতা, শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া সে বিস্মিতা হইল। কর্ত্তব্য জ্ঞান তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ ফিরিয়া আসিয়া লছমীকে রান্না হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। লছমী তাহার উত্তর দিল না। শুধু তাহার নির্ম্মল গণ্ড দুটী আরক্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ রান্নাঘরে গিয়া দেখিল কিছুই হয় নাই। তখন সে খান কয়েক বাসী রুটী আনিয়া হরকিষণের ও ভজুয়ার সম্মুখে ধরিল। হরকিষণ সেই অখাদ্য রুটী তাহার কন্যাকে দিল। বিশ্বনাথ ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল—"না না তা হবে না ও মেয়েটা যখন খাটে নাই তখন খেতে পাবে না। তুমি খাও নচেৎ খাটতে পারবে না। এখানে অলসের অন্ন নাই।" হরকিষণ রুটী খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

প্রভু খাইল না, প্রভু কন্যা উপবাসী ভজুয়া কি করিয়া খায়। সে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া রুটী খানি লছমীকে দিতে গেল। বিশ্বনাথ হুঙ্কার দিয়া বলিল "খবরদার নিজে খাও নইলে খুন করে ফেলব।" ক্ষীণ প্রাণ ভজুয়া সেই আরক্ত লোহিত লোচন দেখিয়া আর বাঙ্ নিষ্পত্তি করিল না; ভোজন করিতে লাগিল।

আহার শেষ করিয়া বিশ্বনাথ রান্নাঘরে গেল ও আগুণ ধরাইয়া খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ আটায় জল দিতেছে এমন সময় লছমী ধীর পদক্ষেপে সেখানে উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে লছমী অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি জানলে নিশ্চয়ই রাঁধিতাম! অন্ততঃ বাবার জন্যেও এ কাজটা করতুম।"

বিশ্বনাথ দেখিল বায়ুতাড়িত বেতস লতার মত লছমী কাঁপিতেছে। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আদৌ রাঁধতে জান না?" লছমী উত্তর করিল "না।"

মুহূর্তের জন্য বিশ্বনাথ আবার লছমীকে দেখিল তাহার মুখে কাতরতার চিহ্ন। বিশ্‌নাথ স্বয়ং লজ্জিত হইল। লছমী সে ধনীর কন্যা সাংসারিক কাজে অনভিজ্ঞা তাহা বোঝা তাহার উচিত ছিল। যে কাজ লছমী জানে না তাহার ভার দিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। লছমীর উপর বিশ্‌নাথের দয়া হইল। বলিল, "বস, দেখিয়ে দিলে, শিখতে পারবে?"

লছমী "হাঁ বলিয়া ঘাড় নাড়িল। তখন বিশ্‌নাথ স্নেহপূর্ণ আগ্রহের সহিত লছমীকে রান্না শিখাইতে লাগিল লছমী এক মনে শিখিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিল এই ডাকাইতের মত কর্কশ স্বভাব লোকটা আবার এত কোমল, এত স্নেহময়। বিশ্বনাথের উপর তাহার যেন ভক্তি জন্মিতে লাগিল। রান্না শেষ হইলে বিশ্‌নাথ সকলকে খাওয়াইয়া লছমীকে গৃহের ভিতর বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিল লছমী তাহাতে অসম্মত হইল না।

বৃদ্ধ হরকিষণ কিন্তু পূর্ব্ববৎ গর্জ্জাইতে লাগিল।

৩

এমনি করিয়া তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আসন্ন মুক্তির আনন্দে হরকিষণের রাগ অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল। বিশ্‌নাথ তাহাদের সঙ্গে ত মন্দ ব্যবহার করে নাই। কেবল কাজ সম্বন্ধে সে একটু কঠোর। আর লছমী? সে ইতিমধ্যেই এই বনবাসী পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছে। বিশ্‌নাথের উপর সে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। লছমী এখন আর সংসার কর্ম্মানভিজ্ঞা বিলাসপরায়ণা ধনী কন্যা নহে। সে এখন নিপুণা গৃহকর্ত্রী হইয়াছে। সংসারের দিকে বিশ্‌নাথকে এখন আর দেখিতে হয় না। ঘর গোছান রান্না, খাওয়ান সব দিকেই লছমী প্রধানা। বিশ্বনাথের উপর লছমীর এখন আর ঘৃণা নাই বরং বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। এক দিকে কঠোর প্রকৃতি, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল অন্য দিকে স্নেহ মমতাপূর্ণ এমন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সে পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই।

তখন খুব গরম পড়িয়াছে। বন্য প্রকৃতি রৌদ্রদগ্ধ হইয়া ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছে। দিবা রাত্র একটা অসহ্য উত্তাপ। এই উত্তাপে লছমীর বড়ই কষ্ট হইতেছিল। আজকাল গৃহ কর্ম্মে সে অল্পেই শ্রান্ত হইয়া পড়িত। বিশ্‌নাথ লছমীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, মুখখানি অত্যন্ত শীর্ণ, পাণ্ডুর। বিশ্‌নাথ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?"

আজ এই বিষম গরমেও সারাদিন লছমী বিশ্‌নাথের কুঠারের শব্দ শুনিয়াছে। তথাপি এই সন্ধ্যাতেও তাহাকে কেমন সতেজ দেখাইতেছিল। আর আজ সে সামান্য গৃহকর্ম্ম করিতে এলাইয়া পড়িয়াছে। এতটুকু দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে লছমীর লজ্জা হইতেছিল অথচ বিশ্‌নাথের সম্মুখে মিথ্যা বলিতেও সে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ।"

"তবে তুমি বস, আমি তোমার কাজটুকু সেরে দিচ্ছি।" বিশ্‌নাথের স্বভাব কর্কশ কণ্ঠেও একটা সুগভীর মর্ম্মস্পর্শী সমবেদনা বাজিতেছিল। এমন মিষ্টি কথা বুঝি লছমী আর কখনও শুনে নাই। তাহার হৃদয়টা যেন ভরিয়া গেল। বিশ্‌নাথ বলিতে লাগিল "দেখ আমি মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই যে এ সব কাজ তুমি কখনও করনি। কতখানি অন্যায় আমার বল ত?

লছমী বিস্মিত হইয়া বিশ্‌নাথের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। "কেন ভুলে যাই জান? সব সময় মনে থাকে না যে তুমি পর অনাত্মীয়; আমার মনে হয় তুমি যেন আমার নিজেরই কোন আত্মীয়া। লছমী লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। দ্রুত রক্ত স্রোত তাহার পাণ্ডুর মুখ খানি মুহূর্ত্ত মধ্যে রঞ্জিত করিয়া দিল। লছমীর মনে হইল বিশ্‌নাথের এই কথার প্রতিবাদ করা উচিত কিন্তু এমন সহজ সরল ভাবে সে কথাগুলি বলিয়াছে যে সেজন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করা যায় না।

এমনি করিয়া আরও দিন কয়েক কাটিল। কিন্তু উত্তাপ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। বায়ু ক্রমেই শুষ্ক হইতেছে। কাঠবিড়ালী গুলো নিঃশব্দ হইয়াছে। পাখীগুলো নীরবে চক্ষু মুদিয়া ঘন রোদ্রপর মধ্যে লুকাইয়া আছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্রমেই নির্জ্জীব হইয়া

হরকিষণ অশ্বচালককে উঠাইলেন। আঘাত সামান্য হইলেও ভয়ে সে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর আদেশে উঠিয়া দাঁড়াইল। হরকিষণ তাহাকে নিকটে কোথাও আশ্রয় স্থান আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উত্তর দিল না। সুতরাং পদব্রজে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর উপায় কি?

হরকিষণ প্রৌঢ় হইলেও শরীরে বলের অভাব ছিল না। অশ্বচালক ভজুয়া তখনও নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। সুতরাং সে ভাল চলিতে পারিতেছিল না। আর লছমী! যদিও সে পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত তথাপি সে মনের বল হারায় নাই। পুনঃ পুনঃ স্খলিত চরণ হইলেও সে কোন মতে পিতার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল।

এমনি করিয়া তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টা চলিলেন। সহসা দূরনিঃসৃত একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি হরকিষণের চক্ষু প্রহত করিল। এই জনশূন্য নিবিড় বন-মধ্যে আলোকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই মনুষ্যবাসের পরিচায়ক এই ভাবিয়া হরকিষণ আলোক লক্ষ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠারের শব্দও তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল। আশায় উৎফুল্ল হইয়া হরকিষণ চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন দূরে পথ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ। সেই গৃহের বাতায়ন দিয়া আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। হরকিষণ দ্বারে করাঘাত করিয়া গৃহস্বামীকে ডাকিলেন। লছমী বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সে দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল। ভজুয়া নিকটে দাঁড়াইয়া স্বেদবারি মুছিতে লাগিল। যথাসময়ে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গৃহস্বামী বাহিরে আসিল। তাহার হাতে একটী লণ্ঠন। লছমী সেই আলোকে দেখিল গৃহস্বামী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গঠন যুবা। দীর্ঘ দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশরাশিতে মুখ খানি আচ্ছন্ন, পরিশ্রমজনিত শ্বাসে তাহার বক্ষঃস্থল কম্পিত। যুবাকে দেখিয়া লছমীর ডাকাত বলিয়াই বিশ্বাস হইল। ভাবী বিপদাশঙ্কায় লছমী শিহরিয়া উঠিল। হরকিষণ এতক্ষণ যুবার মুখ দেখিতে পান নাই। যুবক যখন হরকিষণকে দেখিবার নিমিত্ত আলো উঠাইল হরকিষণ যুবাকে দেখিয়া আতঙ্কে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ! এ যে বিশ্বনাথ!" এই বিশ্বনাথই এক বৎসর পূর্ব্বে হরকিষণকে শাসিত করিয়াছিল যে সময়ও সুবিধা মত সে হরকিষণকে রীতিমত শাস্তি প্রদান করিবে।

হরকিষণ চতুর। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াও তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন "বিশ্বনাথ, রাস্তায় আমার ঘোড়া মারা গেছে। কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আমি বিপদে পড়িয়াছি। আমায় একটা ঘোড়া যোগাড় করে দাও যত টাকা চাও আমি দিব।"

বিশ্বনাথ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "তা হয় না হরকিষণ! তোমাদের এখানে দিন কয়েক থাকতে হবে।"

হরকিষণ প্রমাদ গণিলেন। নিরুপায়, এই বিজন বনমধ্যে মর্ম্মান্তিক শত্রুর সহিত কলহে সমূহ বিপদ তাহা বুঝিলেন। তথাপি বৃদ্ধের হৃদয়ে যৌবনের উত্তেজনা ফিরিয়া আসিতেছিল। সম্মুখে দেখিলেন একটা অনতি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। হরকিষণের ইচ্ছা হইল সেইটা ছুঁড়িয়া বিশ্বনাথের মস্তকে প্রহার করে। বিশ্বনাথ হরকিষণের সাগ্রহ দৃষ্টিতে এ সংকল্প টের পাইল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হরকিষণের দিকে চাহিয়া রহিল। হরকিষণ জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে কি করতে চাও?" বিশ্বনাথ স্বীয় স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "হরকিষণ এতদিনে দেবতারা আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। আজ আমি এ গভীর গহনবাসী কেন? তুমিই আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, আমায় গৃহহীন করেছ। লোকালয় হতে বনে প্রতাড়িত করেছ। অনেক কষ্টে এই জায়গা টুকু বন্দোবস্ত নিয়ে আজ পাঁচ মাস ধরে বন কাটছি। আর এক মাস বাকী। এই এক মাসের মধ্যে যদি সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে এই জায়গাটুকু আবাদের উপযুক্ত করতে না পারি তাহলে এটুকুও আমায় হারাতে হবে। আমার এই ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রম সমস্ত নষ্ট হইবে।" বলিতে বলিতে ক্রোধে বিশ্বনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বিশ্বনাথ একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি ভেবে ঠিক করে উঠতে পারিনি

একা কেমন করে আমি এই কাজটুকু শেষ করব। তাই বিধাতা দয়া করে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা চারজনে পরিশ্রম করলে বোধ করি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারব।"

বিশ্বনাথ দেখিল হরকিষণ সেই প্রস্তরখণ্ডটা সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন সে ক্ষিপ্রহস্তে সেটাকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

২।

বিশ্বনাথের প্রস্তাব প্রকৃতই অদ্ভুত ও অপমান-সূচক। লক্ষপতি হরকিষণ ভজুয়ার সহিত জঙ্গলকাটা কাজে নিযুক্ত হইবে ও আবাল্য বিলাসে লালিতা সুকুমারী লছমী রাঁধুনী হইবে। একথা যে ভাবিতেও পারা যায় না। কিন্তু ইহাই বিশ্বনাথের ইচ্ছা। যদি একমাসের মধ্যে জঙ্গলকাটা শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে বিশ্বনাথ নিজে তাহাদিগকে লোকালয়ে পৌছাইয়া দিবে, আশ্বাস দিয়াছে। হরকিষণ ভয় দেখাইয়া, প্রলোভন দিয়া মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়াছে। আইনের ভয়, জেলের ভয় বিশ্বনাথকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিশ্বনাথ বলিতে লাগিল "আমি তোমাদিগকে জোর করে ধরে রাখছি না, সম্মুখে রাস্তা পড়ে আছে চলে যাও—কিন্তু মনে রেখো এখান থেকে পাঁচক্রোশ দূরে হরদেও মিশরের আড্ডা।

হরকিষণ হরদেও মিশরকে জানিতেন। বরং বিশ্বনাথের হস্তে মুক্তির আশা আছে। হরদেওর নিকট পরিত্রাণ অসম্ভব। সে যে অর্থলোভে সমস্ত দেশবাসীকে মর্ম্মান্তিক শত্রু করিয়া রাখিয়াছে!

তখন বিষয়ী হরকিষণ, বিশ্বনাথকে অর্থের লোভ দেখাইল। মুক্তির বিনিময়ে পাঁচহাজার টাকার চেক দিতে চাহিল। তথাপি বিশ্বনাথ অটল। বিশ্বনাথ বলিল "তুমি নিজে অর্থলোভী পিশাচ তাই মনে করছ অর্থই জগতে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার যে অপকার করেছ অর্থে তাহার প্রতীকার হয় না হরকিষণ। সে দেনা তোমায় শোধ করতে হ'বে তোমার ওই নশ্বর দেহের ঘর্ম্মবারি দিয়ে। তোমায় শিখতে হবে একটা ঘর করতে কত পরিশ্রম করতে হয়! কত কষ্ট করলে গমের চাষ হয়। টাকার লোভ দেখাচ্ছ হরকিষণ লাল! টাকা কি জগতে এতই মূল্যবান? এই যে জায়গা টুকু, এর প্রত্যেক ধূলিকণায় আমি যে পরিশ্রম করেছি তার মূল্য দিতে পার এত অর্থ তোমার আছে? এর প্রতি অণুতে আমার জীবনের যোগ রয়েছে তা জানো।" বিশ্বনাথ খুবই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার মনে হইতেছিল এক আঘাতে এই বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চকের মাথাটা ভাঙ্গিয়া দেয়—সহসা লছমীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিশ্বনাথ লজ্জিত হইয়া বলিল, "যাও আজ সব শোও গে, কাল থেকে কাজে লেগো! বুঝলে? তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘরের ভিতর ঘুমুতে পার।"

কিন্তু গর্ব্বিতা লছমী তাহার পিতার অপমানকারীর নিকট এতটুকু উপকার লইতেও অনিচ্ছুক। সে ধীর স্বরে উত্তর করিল, "থাক্, তোমার আর দয়া দেখিয়ে কাজ নাই।" বিশ্বনাথ বলিল—"এ দয়ার কথা নয়! এটা কর্ত্তব্য। তোমার বাবা আমার কি অপকার করেছে শুনলে তুমিও ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করতে। তাহলে কাল সকাল থেকে তুমি রাঁধিও।" লছমী কোন উত্তর করিল না। কেবল তাহার কৃষ্ণতার নয়ন ছুটির বিদ্রূপ ভরা তীব্র দৃষ্টি বিশ্বনাথের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া এমন একটা অবজ্ঞার মৃদু হাসি হাসিল যে বিশ্বনাথ লজ্জায় ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিল। সে ত্বরিত পদে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিল।

বিশ্বনাথ খান কয়েক অর্দ্ধদগ্ধ মোটা রুটি বাহির করিয়া নিজে কিছু ভক্ষণ করিল তাহাদিগকেও খাইতে দিল। কিন্তু তাহারা কিছু খাইল না। হরকিষণ যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছিল না। পাগলের মত একবার এদিক একবার ওদিক বেড়াইতে লাগিল। কখনও বা বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে ভয় দেখাইতে লাগিল। লছমী সাধ্যমত পিতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার নিজের হৃদয়ই অশান্ত সে অন্যকে কি সান্ত্বনা দিবে? সে নিজে লক্ষপতির কন্যা, তাহার নিজেরই ৪।৫টি দাসী আর সে

আসিতেছে। বিশ্বনাথ বৃষ্টির জন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দিন কয়েক আগে সে হাটে গিয়াছিল, সেখানে শুনিয়া আসিয়াছিল যে বহুদূরে বনে আগুণ লাগিয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া বন পুড়িতেছে। তবে এখনও বহু দূরে। বিশ্বনাথের আড্ডা হইতে সে প্রায় ১০০ ক্রোশ দূরে। মাঝে মাঝে খানা কাটিয়া অগ্নি বিসর্প রোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ্বনাথ খুবই আশা করিয়াছিল যে দাবানল তাহার কুটীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে না। কিন্তু উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া বিশ্বনাথকে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। এখন এক উপায় প্রচুর বারিপাত— কিন্তু আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্রও নাই।

অসহ্য উত্তাপে আরও তিন দিন কাটিল। চতুর্থ দিনে দ্বিপ্রহরেই সমস্ত প্রকৃতি তিমিরাবৃত হইয়া গেল। মৃদু বাতাসের সঙ্গে কৃষ্ণাভ ধূমরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। বাতাস ক্রমেই ঘন ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল— শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ তখনও কুঠার হস্তে কাজ করিতেছিল কিন্তু আর হাত চলে না। আজ বিশ্বনাথেরও শ্রান্তি হইয়াছে। বিশ্বনাথ কুঠার ফেলিয়া দিয়া সকলকে কুটীরে যাইতে আদেশ করিয়া বলিল "ব্যাপার দেখছি ক্রমেই গুরুতর হইয়া পড়িল"

হরকিষণ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি" ?

বিশ্বনাথ উত্তর দিল—"আমার বোধ হয় দাবানল খানা পার হয়েছে"। "তবে এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

বিশ্বনাথ বলিল—"এ স্থানই সব চেয়ে নিরাপদ। আমাদের চতুর্দ্দিকে ২০।২৫ বিঘার মধ্যে জঙ্গল নাই। তার উপর নিকটেই ঝরণা আছে।" হরকিষণ তাহাতে যে কি সুবিধা হইবে তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—না না, চল পালিয়ে যাই—যতদূরে যেতে পারা যায় ততই ভাল।" বলিয়াই হরকিষণ লছমীকে ডাকিল। লছমী তখন ধূমে অন্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সে খাড়া হইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। বৃদ্ধ হরকিষণ কন্তার হস্ত ধরিয়া উন্মাদের মত রাস্তার দিকে ছুটিয়া চলিল।

ইতিমধ্যে সমস্ত আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বাতাস ঝড়ের মত বেগে বহিতেছে। সে বাতাসও মরুভূমির বায়ুর মত নীরস, উত্তপ্ত। দূরে সংক্ষুব্ধ-সিন্ধুগর্জ্জনবৎ একটা বিকট শব্দ ধ্বনিতেছিল। হরকিষণকে কন্তা সহ পাগলের ন্তায় দৌড়িতে দেখিয়া বিশ্বনাথ ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিল। বিশ্বনাথ বলিতে লাগিল "পালিও না, পলাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। এইখানেই সকলের চেয়ে সুবিধা! আমি বলছি কোন ভয় নাই।" হরকিষণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে বিশ্বনাথের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ তখন সজোরে লছমীকে ধরিয়া বলিল, "তুমি যাবে যাও, লছমীকে আমি যেতে দিব না। এখান ছেড়ে অন্তত্র গেলে নিশ্চিত মৃত্যু", লছমী তুমি যেওনা।" লছমীর ধারণা বিশ্বনাথ যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক। এ বিপদে সে বিশ্বনাথের উপরেই নির্ভর করিয়াছে। বিশ্বনাথ ভিন্ন অন্ত কেহ আজ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। সে বলিল "বাবা যে শুনছেন না।" "তাঁকে শুনতেই হ'বে" বলিয়া বিশ্বনাথ একহস্তে লছমীকে ও অন্তহস্তে হরকিষণকে ধরিয়া সেই পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে আনিয়া উপস্থিত করিল। তজুয়া যন্ত্রপরিচালিত পুত্তলিকাবৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ লছমীকে বলিল, "আমি জল আনিতে চলিলাম, শপথ কর লছমী এ স্থান ছাড়িয়া অন্ত কোথাও যাইবে না।" লছমী বলিল "না"। বিশ্বনাথ উপদেশ দিল, "তোমরা এইখানে মাটীতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়। মাটীর নিকটের বাতাস এখনও লঘু ও শীতল আছে। লছমী শুইয়া পড়িল, বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ যখন ফিরিয়া আসিল, লছমীর মনে হইল সে যেন একটা যুগ। বিশ্বনাথের দুই হস্তে দুই বালতী জল। বিশ্বনাথ লছমীর নিকটে আসিয়া বলিল, "তোমার গায়ে জল ঢালিয়া দিতেছি, ভয় পাইও না।" এমন সময় তজুয়া বলিয়া উঠিল "জল, আমায় একটু জল দাও। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।" তজুয়া আর দেরী সহিতে পারি-ল না। সে বুকে হাঁটিয়া

বালতীর দিকে অগ্রসর হইল। বিশ্বনাথ এক হুকারে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল "একটু পরে দিতেছি, এখন চুপ করে শুয়ে থাক।" তারপর বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে সেই দুই বালতী জল লছমীর চোখে মুখে, চুলে, সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিল। লছমীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। বারি সম্পাতে তাহা শীতল হইল। বিশ্বনাথ একটা গামছা ভিজাইয়া লছমীর মুখের নিকট ধরিয়া দিয়া আবার স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। লছমী কহিল "কোথায় যাবে? যেও না।"

"আরও জল চাই! যতক্ষণ পারি চেষ্টা করে দেখি।" বলিয়া বিশ্বনাথ সেই দুই শূন্য বালতী লইয়া ঝরণার দিকে অগ্রসর হইল। এবার ফিরিয়া আসিতে তাহার দ্বিগুণ দেরী হইল। ফিরিয়া আসিয়া এক বালতি জলে হরকিষণ ও ভজুয়াকে ভিজাইল এবং অন্য বালতিটি তাহাদিগকে খাইতে দিল। দুইজনে বালতি নিঃশেষ করিয়া দিল। তখন বিশ্বনাথ আবার ঝরণার দিকে ফিরিল। লছমী শুইয়া শুইয়া সব দেখিতেছিল, সে এবার বিশ্বনাথের হাত চাপিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তুমি কোথায় যাবে? যেতে পাবে না"। বিশ্বনাথ ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল—সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "ছেড়ে দাও লছমী! আরও জল আনতে হবে, নইলে কেহই বাঁচবে না। বিলম্ব হইলে নিশ্চিত মৃত্যু।"

বিশ্বনাথ আর বলিতে পারিল না। লছমীর সেই স্পর্শে, সেই অমৃতময়, পুলক সঞ্চারী স্পর্শে বিশ্বনাথের যেন চেতনা লুপ্ত হইল। বিশ্বনাথ ভাবিতেছিল আজ এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আজ লছমী তাহারই উপর সমস্ত নির্ভর করিয়াছে। এখন যদি তাহার মৃত্যু হয়, সে কি সুখের কি আনন্দের মৃত্যু! কিন্তু লছমী! তাহাকে ত বাঁচাইতে হইবে! কোথা হইতে বিশ্বনাথের দেহে অসুরের ন্যায় বল আসিল। সে লছমীর বন্ধন ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেই লছমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল "না, না, তুমি যেওনা। তুমি আমার কাছেই থাক!" আজ লছমীর লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। এ অবস্থায় কাহারই বা সঙ্কোচ থাকে? বিশ্বনাথ জানুতে ভর দিয়া লছমীর পাশে বসিয়া কহিল "লছমী, কথা শোন, আমায় ছেড়ে দাও। আমি এখনি ফিরে আসব। লছমী কোন উত্তর করিল না কেবল বিশ্বনাথের হাতখানি আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। বিশ্বনাথ বুঝিল লছমী বুঝিবে না। তখন সে জোরে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল "ভয় নেই লছমী, আমি এখনি ফিরে আসব। নরকাগ্নিও আমায় আটকাতে পারবে না"।

ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। বাতাসের প্রবল নিঃশ্বাসে অগ্নি লোলিহান জিহ্বা মেলিয়া যেন আজ বিশ্বসংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক ধূমে ধূমাচ্ছন্ন। সে তিমিরাবরণী ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই ধূম, সেই অগ্নি ভেদ করিয়া বিশ্বনাথ তৃতীয়বার ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় একটা বিরাটকায় জলন্তবৃক্ষ শিথিল মূল হইয়া পড়িয়া গেল। অগ্নির ঝলসে চতুর্দ্দিক দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথের মনে হইল যেন তাহার সর্ব্বশরীর পুড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ দ্রুতপদে সে অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। আসিয়া দেখিল ভজুয়া মাটীর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে! লছমী এই অসহ্য উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়াছে আর বৃদ্ধ হরকিষণ শ্বাসাবরোধ কম্পিত দেহে কন্যাকে আবরণ করিয়া বসিয়া আছে। বিশ্বনাথ সেনাপতির ন্যায় কঠোর স্বরে আদেশ করিল "শুয়ে পড়, দুজনেই শুয়ে পড়।" সে আদেশ অবহেলা করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। বিশ্বনাথ তখন সেই বহুমূল্য জলের খানিকটা হরকিষণের ও খানিকটা লছমীর মাথায় ঢালিয়া দিল। কিন্তু সে অসহ্য উত্তাপে জল মুহূর্ত্ত মধ্যে শুকাইয়া গেল। মরুভূমির বক্ষে সলিলকণা কতক্ষণ সরস থাকে বিশ্বনাথ বুঝিল এইবার অন্তিম ঘনাইয়া আসিতেছে। সেও ক্লান্ত দেহভার বহন করিতে পারিতেছিল না। বিশ্বনাথ লছমীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। বিশ্বনাথের অন্তরে আজ খুবই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সে কেন

প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এই তিনটা প্রাণীকে ধরিয়া রাখিল? তাহা না হইলে ত আজ তাহারা এমনি করিয়া পুড়িয়া মরিত না। বিশ্বনাথ লছমীর কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "কথা বলিও না। যাহা বলিতেছি শোন। এ সমস্ত আমারই দোষ; আমায় ক্ষমা করিও লছমী! আমি যদি তোমাদের ধরিয়া না রাখিতাম তাহলে লক্ষপতির কন্যা আজ এমন সময় অসহায় ভাবে নিবিড় বন মধ্যে পুড়িয়া মরিত না।" বিশ্বনাথ হাত বাড়াইয়া জলের বালতি হইতে খানিকটা জল লইয়া লছমীর মাথায় ঢালিয়া দিয়া বলিতে লাগিল "ক্রমশঃ সব শেষ হইয়া আসিতেছে। তোমায় গোটা কতক কথা বলিব।" কিন্তু কথা বলাও বিশ্বনাথের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছিল। তথাপি বিশ্বনাথ বলিতে লাগিল, "ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করিবেন, কিন্তু আজ মরণে আমার দুঃখ নাই। তোমায় ভালবেসে, তোমার পাশে শুয়ে মরতে পাচ্ছি এ আমার সুখের মৃত্যু— অনন্ত তৃপ্তি।" বিশ্বনাথ আর বলিতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহার মস্তক মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা অননুভূতপূর্ব্ব স্পর্শে বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিল—বিশ্বনাথের মনে হইল যেন লছমী তাহার শুষ্ক ঠোঁট দুই খানি বিশ্বনাথের হাতের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। বিশ্বনাথ শ্বাসরোধ করিয়া সে স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—এ কি হঠাৎ ঘটিয়া গেল! না, তাত নয়! এই যে লছমী তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলী দিয়া বিশ্বনাথের অঙ্গুলীর সন্ধান করিতেছে! তখন বিশ্বনাথের মাথার উপর অগ্নিময় বায়ু বহিতেছে, বিশ্বনাথ তাহা অনুভব করিতে পারিল না। তাহার শরীরে লক্ষ লক্ষ অগ্নি শলাকা বিদ্ধ হইতেছে, সে যন্ত্রণা বিশ্বনাথের অনুভবে আসিল না। আকাশ তখন অগ্নিময়, বিশ্বনাথ দেখিল সে অগ্নি নয় যেন লক্ষ লক্ষ রক্ত-গোলাপে খচিত চন্দ্রাতপ। তাহার অদূরে সারি সারি বৃক্ষকাণ্ড জ্বলিতেছে, বাতাসের ঝাপটায় আগ্নেয়গিরির ন্যায় অগ্নুদ্গম হইতেছে! তাহাতে কি আসে যায়? আজ লছমী অতি মাত্র বিশ্বাসের সহিত এই অনন্ত মুহূর্ত্তে তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে সে অবলম্বনে কত খানি ভালবাসা, কতখানি স্নেহ কতখানি প্রেম প্রকাশিত হইতেছে, বিশ্বনাথ জীবন মরণ ভুলিয়া, দহন জ্বালা ভুলিয়া তাহাই ভাবিতেছে। সহসা একটা অগ্নিময় ঝঞ্ঝা দহ্যমান বৃক্ষপত্রশাখা বহন করিয়া তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গেল। বিশ্বনাথ জ্ঞান হারাইল!

* * * * *

শীতল বায়ুর স্পর্শে বিশ্বনাথের চেতনা ফিরিয়া আসিল। বিশ্বনাথ চক্ষু মেলিয়া দেখিল তখনও বৃক্ষ কাণ্ডগুলি জ্বলিতেছে তবে তাহাদের শিখা ঊর্দ্ধমুখী। বায়ু অনেকটা লঘু হইয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসে আর তেমন কষ্ট হইতেছে না। বিশ্বনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল আকাশও অনেকটা পরিষ্কার। আনন্দে তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল "যাক্, ভগবান তবে রক্ষা করেছেন।" বিশ্বনাথের কণ্ঠ শুনিয়া হরকিষণ কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার কণ্ঠ তালু জিহ্বা সব শুষ্ক। বিশ্বনাথ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আবার বালতি লইয়া ঝরণার দিকে চলিল। অনন্ত অঙ্গারখণ্ডে তাহার পা পুড়িতে লাগিল, জ্বলন্তপত্রশাখা পড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল—বিশ্বনাথ সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ঝরণার নিকট উপস্থিত হইল। ঝরণার জল তুষার শীতল। বিশ্বনাথ আকণ্ঠ সেই শীতল সলিল পান করিল। শেষে বালতি ভরিয়া জল বহিয়া আনিল। এক বালতি জল হরকিষণ ও ভজুয়া শেষ করিল অন্য বালতি লইয়া বিশ্বনাথ লছমীর চোখে, মুখে, মাথায়, পৃষ্ঠে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লছমী চাহিল—দেখিল বিশ্বনাথের চক্ষে কি অসীম দয়া, কি গভীর স্নেহ প্রতিভাত হইতেছে!

বৃদ্ধ হরকিষণ শীতল বায়ু ও সলিল পান করিয়া উঠিয়া বসিল; দেখিল লছমী অতি সতৃষ্ণ নয়নে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া আছে—সে দৃষ্টিতে কতখানি কৃতজ্ঞতা, কতখানি স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে। আজ তাহার স্মরণে আসিল এমনি করিয়া লছমীর মা তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সে গভীর মমতা, সেই উৎসর্গময় প্রেমের

উত্তরাধিকারিণী ত এই লছমী! তারপর বৃদ্ধ সেই উন্নত দেহ, অর্দ্ধদগ্ধশরীর বিশ্বনাথের দিকে চাহিল—এযে প্রকৃতই বিশ্বনাথ! বৃদ্ধ আজ সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ক্ষোভ, সব অভিমান ভুলিল। একটা অহেতুকী বাৎসল্যে বৃদ্ধের প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

হরকিষণ দেখিল, বিশ্বনাথের সে কুটীরটী যাহা আজ পাঁচ ছয় মাসের যত্নে, পরিশ্রমে সে গড়িয়া তুলিতে ছিল তাহা অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। হতভাগ্য বিশ্বনাথ সজল নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া আছে।

বিশ্বনাথকে হরকিষণ জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি উপায় হবে বিশ্বনাথ!"

বিশ্বনাথ কহিল "কাল তোমাদিগকে বনের বাহির করিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব!" বৃথাই তোমাদের একরাত্রি কষ্ট দিলাম। ভাগ্যের লিপি কেহই রোধ করিতে পারে না।"

বিশ্বনাথের কথাগুলি শুনিয়া লছমীর চোখে জল আসিল। হরকিষণ তাল করিয়া একবার লছমীর মুখ দেখিয়া লইল। বৃদ্ধের হৃদয়ে আজ ধনগর্ব্ব নাই, যশঃ লোভ নাই, আজ তাহার হৃদয়ে যৌবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে; স্নেহে, প্রেমে তাহার জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জরটী কাঁপিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধ, বিশ্বনাথের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল "বাবা, বিশ্বনাথ, আমায় কি ক্ষমা করতে পারবে না? আজ এই দাবানলে আমার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত লোভ, সকল প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, আমাকেও নূতন করিয়া গড়িয়া তোল। আমার আদরের লছমীকে তোমার হাতে দিলাম। তুমি আমার ঘরে আসিয়া আমার পুত্রের স্থান গ্রহণ কর। দাবদাহে আমাদের সমস্ত মনোমালিন্য ছাই হয়ে যাক্।"

লছমীর চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িতেছিল। সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

শ্রীঅতুল চন্দ্র বসু।

আশা।

আমি কত যুগ ধ'রে, সারাটি জগতে,
তোমারি সন্ধানে ফিরেছি;
কি রূপ, কোথায় আছ তুমি, কত
জানিতে যতন করেছি।
প্রথম উষার আলোকে যে দিন,
হেরিনু এ বিশ্ব অন্তঃসীমা হীন,
সুনীল গগনে, জ্বলন্ত তপনে,
তোমার মূরতি হেরেছি।
অরণি ঘর্ষণে জালিয়া হুতাশ,
কত হবি, পশু করিয়াছি নাশ,
সাম ঋক্ গানে, যজু অথর্ব্বণে
তোমার অর্চ্চনা করেছি।

সুন্দর ভীষণ গড়িয়া মূরতি,
কত রূপে তব করেছি আরতি,
বসন ভূষণে, নৈবেদ্য চন্দনে,
ভূষিতে তোমায় চেয়েছি।
করিয়া কামনা ধন পরিজন,
প্রীতি ভক্তি করি হবন পূজন,
করিয়াছি কত, ডাকিয়াছি কত,
কত আশা বুকে বেঁধেছি।
নিবসি গহনে করিয়া সংযম,
দমি রিপুকুল করি কত শ্রম,
ভেদি এ প্রপঞ্চ তোমার
স্বরূপ হেরিতে প্রয়াসপেয়েছি।

দর্শন নিষতে করেছি বিচার,
অধ্যাস এ বিশ্ব ছায়ার আকার,
হেতুভূত তুমি কিন্তু নিরাকার,
স্থির এ সিদ্ধান্ত ভেবেছি।
নাশিতে পীড়িতা অবনীর ভার,
নররূপে যবে হও অবতার,
জনক জননী, তনয়, রমণী,
সখী সখাভাবে দেখেছি।
ভুলি নিজ দৈন্য করি অহঙ্কার,
"সোহংতত্ত্বমসি" করেছি প্রচার,
ক্ষণেক আলোক, ক্ষণেক আঁধার,
গোলক ধাঁধায় পড়েছি।
পহি নাই তোমা, পা'ব কি কখন ?
তবু কি বাসনা ছেড়েছি।

শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার।

নৈষধ চরিত।

প্রথম সর্গ।

যে নল নৃপতি কথা—অমৃত করিয়া পান,
বুধগণ সুধা প্রতি নাহি করে অবধান;
শ্বেত আতপত্র প্রায় সুকীর্ত্তিমণ্ডল যাঁর,
আধার ছিলেন তিনি মহোজ্জ্বল মহিমার। ১

যাঁর কথা রসভরে অমৃতে অবজ্ঞা করে,
ছিল নানা চিত্রগুণ সেই নল ভূপবরে;
প্রদীপ্ত প্রতাপ যাঁর ছিল হেমদণ্ডময়,
সুকীর্ত্তি মণ্ডল ছিল সিত আতপত্রদ্বয়। ২

হেন মানি, যে চরণ এই কলিযুগ ভরি,
জগৎ পবিত্র করে রসে প্রক্ষালন করি;
যদিও আবিলা অতি স্বীয় সেবিনীর মত (১)
বাণী মম, কেন তাহা না করিবে পবিত্রিত। ৩

অধ্যয়ন অর্থাগম আচরণ প্রচারণ,
এ চারি উপায়ে কৈলা চারি দশা সম্পাদন;
বুঝিতে না পারি ইহা, ছিল বিদ্যা চতুর্দ্দশ, (২)
তবে কেন পুনঃ তারে করিলেন চতুর্দ্দশ। ৪

অষ্টাদশ দ্বীপে প্রতি জয়লক্ষ্মী চিনিবারে, (৩)
রসনাপ্রবিষ্টা তাঁর অষ্টাদশ রূপ ধরে;
ছয় অঙ্গগুণে যথা বিস্তারিত বেদত্রয়,
প্রতিভাদি গুণে তাঁর বিদ্যা অষ্টাদশ হয়। ৫

দিগীশবৃন্দের অংশে বিভূতি আছিল তাঁর,
এই হেতু দিক্‌পতি ত্রিনেত্রের অবতার;
নেত্রদ্বয় অতিরিক্ত ছিল নেত্র শাস্ত্রচয়,
কামের উদ্দাম বেগ যাতে প্রতিহত হয়। ৬

পদচতুষ্টয়ে ধর্ম্ম করিলেন প্রতিষ্ঠিত,
সত্যযুগ-আবির্ভাবে কে নহে তপস্যারত;
রয়েছে অধর্ম্ম কৃশ তপস্বিত্ব প্রকাশিয়া,
একপদে ক্ষুদ্রাঙ্গুলি আছে ভূমি পরশিয়া। ৭

রণযাত্রা কালে যাঁর ধূলিরাশি বলোদ্ধত,
ধরিত আকার দীপ্ত প্রতাপাগ্নিধূম মত;
তাহাই কি সুধাম্বুধিমাঝে হয়ে নিপতিত (৪)
পাইয়া পঙ্কতা বিধু করিয়াছে কলঙ্কিত? ৮

নলাযুদ্ধে ছিল চাপ, নাদ; বরষণে তার, (৫)
হ'ত নিজ প্রতাপাগ্নি নির্ব্বাণ অঙ্গারাকার;
সে অঙ্গার-অপযশ, রণে হ'য়ে পরাজিত
করিত বিস্তার তাঁর শত্রুগণ শত শত। ৯

অগণিত অরিপুরদাহানলে উজ্জ্বলিত
স্বকীয় প্রতাপানল, তাহে করি উদ্‌ভাসিত,
করিলেন প্রদক্ষিণ ধরণী মণ্ডল খানি,
জয় লাগি করিলেন নীরাজনা হেন মানি। ১০ (৬)

ঈতিহীন করিলেন অখিল ধরণীতল, (৭)
অতিবৃষ্টি নাহি পায় খুঁজিয়া বিশ্রাম স্থল;
নাহি ত্যজে ক্ষণকাল, এই হেতু মনে লয়,
প্রতীপভূপালবৃন্দ অঙ্গনার নেত্রচয়। ১১

মহাখড়্গ বেমরূপ, চাতুরী হইয়া তুরী, (৮)
সিতাংশুবরণ তাঁর গুণাবলী গুণ করি,
বয়ন করিত পট যশোরূপ রণাঙ্গনে,
পারতেন আভরণ অঙ্গে দিগঙ্গনাগণে। ১২

(১) সেবনী=দাসী। (২) চতুর্দ্দশ শব্দের দুইটি অর্থ—চতুর অর্থাৎ চারি দশা যার; এবং চৌদ্দ। (৩) নল অষ্টাদশ দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, ইহাই ভাবার্থ। বিদ্যা অর্থাৎ সরস্বতী লক্ষ্মীর সপত্নী; অতএব লক্ষ্মীকে জয় করিবার জন্য ইচ্ছা স্বাভাবিক।

(৪) অন্বয়—তাহাই কি পঙ্কতা প্রাপ্ত হইয়া বিধুকে কলঙ্কিত করিয়াছে? (৫) ভাবার্থ—শত্রুগণের অপযশ নলের যশ সূচনা করিতেছে। (৬) নীরাজনা—দিগ্‌বিজয় যাত্রার আরম্ভে ঘোটকাদির মাঙ্গলিক আরাত্রিক বিশেষ।

(৭) ঈতি—অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যের ছয়টী উপদ্রব। (৮) বেম—তন্তুবায়ের শানা; তুরী—মাকু; চাতুরী—নিপুণতা; গুণ—সৌর্য্য বীর্য্যাদি এবং সূত্র।

ছিল তেজে মিত্রজয়ী চারদৃষ্টি প্রতিক্ষণ, (৯)
তথাপি বিচারদৃষ্টি অমিত্রের নিসূদন ;
হেন বুঝি নলভয়ে প্রতিকূল ধর্ম্ম যত,
নির্বাসিত একাধারে অরিনৃপকুল মত। ১৩
থাকিতে নলের তেজ, যশ বিদ্যমান তাঁর, (১০)
নিস্ফল এ চন্দ্র সূর্য্যে কিবা প্রয়োজন আর ;

(৯) মিত্র—সূর্য্য; অমিত্র—শত্রু; মিত্র, অমিত্র; এবং চারদৃষ্টি ,বিচারদৃষ্টি, আপাততঃ বিরুদ্ধ। (১০) কুণ্ডলনা—বৃত্তাকার চিহ্ন। পূর্ব্বকালে লেখকগণের এইরূপ রীতি ছিল যে, লিখিতে লিখিতে অতিরিক্ত কিছু ভ্রমক্রমে লিখিত হইলে ঐ অংশের চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্তাকার চিহ্ন দেওয়া হইত।

এই চিন্তা বিধাতার চিত্তে জাগে যে যে কালে,
চন্দ্রসূর্য্যে কুণ্ডলনা দেয় পরিবেশ-ছলে। ১৪
যেই যাচকের শিরে লিপি ছিল বিধাতার,
দরিদ্র হইবে এই, অন্যথা না হবে তার ;
দারিদ্রে দরিদ্র তারে, কল্পজয়ী নৃপবর,
করিয়া পালন কৈলা বিধিলিপি নিরন্তর। ১৫
সুমেরু বিভাগ করি নাহি দিলা অর্থিজনে,
সিন্ধু না করিলা মরু দানজল—উৎসর্জ্জনে,
এই দুই অপযশ মানিতেম দিবানিশি,
মস্তকে দ্বিফালবদ্ধ স্বকীয় চিকুররাশি। ১৬

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়।

জুয়া।

(উপন্যাস)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

সোমনাথ হেমেশের নিকট হইতে বাহির হইয়া প্রভাতের সহিত দেখা করিল। প্রভাত হাইকোর্টের উকিল। কাজকর্ম্ম বেশ আছে—শেয়ারের কাজও করিয়া থাকে। প্রভাত মোটসোটা বেঁটে—দেখ্‌তে শ্যামবর্ণ—খুব চটপটে। প্রভাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজ লইয়া ঘুরিয়া থাকে। খুব্‌ চালাক লোক, নিজের স্বার্থ খুব বোঝে—কিন্তু অত্যন্ত বন্ধুবৎসল—বন্ধুত্বের খাতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। প্রভাত যেমন আলাপ আপ্যায়িত করিতে-তেমনি খাওয়াইতে দাওয়াইতে। প্রভাত তাহার লাইব্রেরীতে বসিয়া কাজ করিতেছিল, সোমনাথ আসিবামাত্র উঠিয়া সোমনাথের সহিত করমর্দ্দন করিল—বলিল 'এই যে সোমদা' আর কি খবর বলুন ত'-এই বলিয়াই ঠাকুরকে সোমনাথের জন্য চা লুচি আনিতে বলিল।

সোমনাথ। আমি এই মাত্র চা খাইয়া আসিয়াছি।

প্রভাত। সোমদা তা হ'তে পারে না। আপনাকে এখানে কিছু খাইতেই হইবে।

উভয়ের বৈকালিক আহার শেষ হইবার পর সোমনাথ বলিল, "প্রভাতদা," একটা বড় কাজ করবার মৎলব এঁটেছি। এক্ষণে আপনার সাহায্য বিনা ত তা করা যায় না।"

সোমনাথ। কি বলুন আমার দ্বারা যা কিছু হবে তা সমস্ত করব জানবেন।

প্রভাত। আমি দুটা কোম্পানী খুলতে চাই। একটা ইনসিওরেন্স আর একটা ব্যাঙ্কিং। আপনাকে তার ডিরেক্টার হোতে হবে, কাগজ পত্র তৈয়ারী করতে হবে, শেয়ার কিন্‌তে হবে, বন্ধুবান্ধব মক্কেলদের মধ্যে শেয়ার বেচতে হবে।

প্রভাত একবার এক কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়া বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল সে বলিয়া উঠিল সোমদা আমি কেবল ডিরেক্টার হোতে পারব না তবে কোম্পানীর উকিল রূপে কাজ করতে পারব—শেয়ার সামান্য কিছু কিনব, শেয়ার কতক বেচেও দিতে পারব—কাগজ পত্র

তৈয়েরীতে উকিলের কার্য্য যে সমস্ত আমি করব, আপনার কোন চিন্তা নাই।

সোমনাথ। এখন কি কি কাগজ রেজেষ্টারির জন্ত দরকার বলুন ত আর উপস্থিত কতই বা খরচ।

প্রভাত। মেমোরেণ্ডাম অফ্ অ্যাসোসিয়েশন্ চাই, আর্টিকেল্‌স অফ অ্যাসোসিয়েশন্ চাই—ডিরেক্টারদের লিষ্ট চাই, অন্ততঃ দুইজন ডিরেক্টার আবশ্যক। তারপর ডিরেক্টারদের সম্মতিপত্র, ডিরেক্টারগণ যে কতগুলি শেয়ার কিনবেন তার চুক্তিপত্র, প্রস্‌পেকটাস, কোম্পানীর অফিসের ঠিকানার নোটিশ আর সমস্ত কাগজ পত্র ও কার্য্য যে আইনমত হয়েছে তার একটী এ্যাফডেভিট এই সমস্ত চাই। ডিরেক্টার কারা হবেন তার কিছু কি ঠিক হয়েছে?

সোম। না। সে ঠিক করে ফেল্‌ছি। প্রস্‌পেকটাস লিখে ফেল্‌ব কিন্তু অন্য কাগজগুলো আপনাকে তৈয়েরী করতে হবে। আর কত খরচ লাগবে বলুন ত। মূলধন প্রত্যেকটীরই পাঁচশলক্ষ টাকা করব স্থির করেছি।

প্রভাত। ছাপাখরচ অনান্য বাজেখরচ নিয়ে পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না।

সোম। কাকে কাকে ডিরেক্টার করলে ভাল হয় বলুন ত।

প্রভাত। আপনার দাদা আর দেবল বাবুকে পেলে মণিকাঞ্চন যোগ হত। তাঁরা এতে যোগ দিতে চাইবেন?

সোম। দাদার কথা মিছে তবে দেবল বাবুকে একবার বিশেষ করে চেষ্টা করতে হবে।

প্রভাত। আপনার দাদাকেও একবার চেষ্টা করতে হবে। একজন রাজামহারাজার মধ্যে আর একজন ইংরাজ হ'লে ভাল হয়।

সোমনাথ। চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হবে। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ। প্রথম সমস্যা পাঁচ হাজার টাকার। তারপর ডিরেক্টার নিয়োগের। আজ আমি চুয়াস . . র চেষ্টাই প্রথম করি। আপনি কাগজপত্রগুলো মুসাবিদা ক'রে রাখবেন আমি আবার ৩।৪ দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

সোমনাথের এ সময় হাতে একটী পয়সা ছিল না। আকাশকুসুম ভাবিয়া কাজে নাবিয়াছে। প্রভাতের নিকটে বিদায় লইয়া একটী সোণারূপার দোকানে উপস্থিত হইল। সখের সোণার ঘড়িটী বাঁধা রাখিয়া পঞ্চাশটী টাকা কর্জ্জ করিয়া লইল। একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া রাণীর দেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

সোমনাথ। আপনি বলেছিলেন যে যদি কখন বিপদে পড়ি আপনি আমাকে সাহায্য করিতে ক্রটি করবেন না। আজ বিপন্ন তাই আপনার শরণাগত হয়েছি।

রাণী। কি রকম?

সোমনাথ। আমার দারুণ অন্ন কষ্ট। আমি কোন রকমে একটী কাজের যোগাড় করেছি। একটী ভাল কোম্পানীতে আপনি যদি পাঁচহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনেন তা'হলে আমার একটা অন্নসংস্থান হয়।

রাণী। আমি কোম্পানীর কাগজ কিন্‌লে তোমার অন্নসংস্থান হবে কি ক'রে তা ত আমি বুঝতে পারলুম না।

সোমনাথ। সি, এস, কোম্পানী নামক এক বড় হৌসে আমি ঢুকবার চেষ্টা করচি। তাদের যদি পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার বেচতে পারি তা'হলে আমার কার্য্য সিদ্ধি হবে। না'হলে ত আর আমার কোন উপায় দেখছি না। আপনি আমার এক মাত্র আশা।

রাণী। আমি শেয়ার টেয়ার বুঝি না। এ টাকাটা আমাকে এককালীন দান করতে বল্‌ছ কি?

সোমনাথ। না না। তা বল্‌ব কেন? শেয়ার অর্থে কোম্পানীর কাগজ। আপনি এই কাগজ কিন্‌লে এর সুদ পাবেন আর দরকার হ'লে কাগজ বেচে ঘরে টাকা আনতে পারবেন।

রাণী। সুদ কত?

সোমনাথ। সুদ অন্ততঃ মাসিক শতকরা এক টাকা ত পাবেনই বেশী ও পেতে পারেন।

রাণী। এ ত দেখছি আমাদের যে কোম্পানীর কাগজ আছে তার চেয়ে অনেক বেশী সুদ। টাকাটা ত মারা যাবে না।

সোমনাথ। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে শপথ করে বল্‌ছি-আপনার টাকা আমার রক্ত। আমার প্রাণ থাক্‌তে আপনার এক পয়সা নষ্ট হবে না।

রাণী। আমার ত নগদ কিছু নেই যা আছে তা কোম্পানীর কাগজ করা আছে—শুন্‌তে পাই কোম্পানীর কাগজের দর অনেক কমেছে তা আটহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বেচলে কি পাঁচহাজার হবে না।

সোম। খুব হবে।

রাণী। এখনই কি তুমি কাগজগুল নেবে?

সোম। যা আপনার অভিরুচি। তবে যত শিগ্‌গির হয় ততই ভাল কারণ কাগজগুলো বেচতে আবার দু এক দিন সময় যাবে কি না।

রাণী ধীর পদবিক্ষেপে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। রাণীর একটু দেরী হইতেছিল সোমনাথের নিকট এই সামান্য দেরী যেন একযুগ বলিয়া বোধ হইল। রাণীর যাওয়া ও আসার মধ্যে সোমনাথ সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। রাণী আসিয়া কাগজগুলি সোমনাথের হাতে দিলে সোমনাথের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

রাণী। তুমি একটা কথা মনে রেখো যে এই সমস্ত কোম্পানীর কাগজ আমার কিছুই নয় সব আমার ঠাকুরের। যদি কোন কারণে এই কাগজ নষ্ট হয় তাঁহলে আমাকে ঠাকুরের জিনিষ তছরূপ করার মহাপাপে ডুবতে হবে।

সোমনাথ। আপনার কোন চিন্তা নাই। কাগজ কিছুতেই নষ্ট হবে না।

সোমনাথ কাগজগুলির পিঠে রাণীর সহি করাইয়া হেমেশের নিকট ফিরিয়া গেল। সোমনাথ হেমেশের ঘরে যখন পৌছিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। হেমেশ সোমনাথ ও স্বরূপা আহার করিলে পর স্বরূপা শয়নাগারে গমন করিল। দুই বন্ধুতে চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে নানারূপ বাজে কথা লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। রাত্রি এগারটা বাজিলে সোমনাথ বলিল, এখন বোধ হয় স্বরূপা ঘুমাইয়াছেন। আসুন আমরা আমাদের ব্যবসার সম্বন্ধে আলোচনা করি।

হেমেশ। বৈকালে বাহির হইয়া কিছু করিতে পারিয়াছেন কি?

সোমনাথ। দেখুন দাদা আমার কাজ করবার শক্তি খুব আছে কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ বলে আজ পর্য্যন্ত কিছু করতে পারি নাই। আমার বোধ হচ্ছে আমার সময়টা ভাল পড়েছে। বৈকালে যা কাজ করেছি তা আমার জীবনে এরূপ কোন জায়গায় সফল-মনোরথ কখন হই নি।

হেমেশ। কি কি করলেন?

সোমনাথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। হেমেশ খুব খুসী হইল।

হেমেশ। আসুন প্রস্‌পেকটাস্‌ এইবার লিখে ফেলা যাক্‌।

সোমনাথ। তা লেখবার আগে কোম্পানীর নামটা কি করবেন বলুন তা।

হেমেশ। আমার চিরদিনের অভিলাষ যে ভারত ব্যাঙ্কিং কোং লিমিটেড আর ভারতবীমা কোং লিমিটেড এই দুই নামে দুটি কোম্পানী খুলব।

সোমনাথ। আচ্ছা আমার ও নামে কোন আপত্তি নেই। তবে আমরা কোম্পানী দুটির জন্মদাতা আমরা প্রমোটার স্বরূপে সি, এস, কোং একটী স্থাপন করব তাতে আপনার মত কি?

হেমেশ। সি, এস্‌ কোং কেন? আমাদের নাম দিয়ে করলেই ত হয়।

সোমনাথ। ঐ ত আমাদের নামেই হ'ল। চক্রবর্ত্তীর সি আর সরকারের এস, নিয়েই ত সি এস কোম্পানী হয়েছে।

হেমেশ। তাহলে আমার আর আপত্তি কি?

হেমেশ প্রসপেকটাস আবৃত্তি করিতে লাগিল আর সোমনাথ প্রুতি লিখন লিখিতে লাগিল। প্রসপেকটাস লিখিতে লিখিতে ভোর ৬টা বাজিয়া গিয়াছে। স্বরূপা আসিয়া দাদাকে কাজ করিতে দেখিয়া বড় চটিয়া উঠিল। বলিল,

দাদা তোমার কি একটু শরীরের উপর মায়া মমতা নেই। দিনের বেলায় এ কাজ গুলা কি হ'ত না।

সোমনাথ। আমিই এই অপরাধের প্রধান অপরাধী। বিচার পরে হবে। এখন দু পেয়ালা করে কড়া চা খাইয়ে আমাদের অর্দ্ধমৃত দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিন। স্বরূপা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চা এর চেষ্টায় চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

শেষ গান।

(গল্প।)

(১)

পাহাড় ঘেরা তটিনীর তীরে বসে তার কলতানের সঙ্গে তান মিশিয়ে গাচ্ছে এক বৃদ্ধ ফকির; অঙ্গে তার গৈরিক বসন, হাতে তার রুদ্রাক্ষের মালা। বয়সের গুণে দেহের চর্ম্ম তার লোল হয়ে এলেও সুগৌর তনুটি ঘিরে একটা অপরূপ শ্রী তখনও লেগে আছে। গলা তার কিন্তু প্রথম যৌবনের মতই নবীন; গ্রামে গ্রামে উঠে যেন নীল আকাশের গায়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রভাতের প্রথম আলোর রেখার স্পর্শে প্রাণের যে উৎস উৎসারিত হয়ে উঠেছিল তার এখনও বিরাম নাই। তপনদেব ক্রমে মধ্য গগনে এসে দাঁড়ালো; প্রখর সূর্য্য কিরণে তার সারা দেহটা জ্বল জ্বল করছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। অগাধ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কেঁপে কেঁপে জলে স্থলে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমে দিনের শেষ আলোটুকু নিবে এল; গানের শেষ পর্দ্দাও যেন ক্রমে মিশিয়ে গেল। ফকির একবার ঊর্দ্ধমুখে উদার গগনের দিকে চেয়ে শান্ত পদে ঘরে ফিরে এল। নীরব নির্জ্জন ছোট্ট তার কুঁড়ে খানি গিরিপাদ মূলে নির্ঝরিণীর বুকের কাছে, এক রাশ ফোটা আধ ফোটা ফুলের ঝোপ মাথায় নিয়ে যেন কার পথ চেয়ে বসে আছে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দেখে মনের আনন্দে গান গেয়ে তার দিন কেটে যায়। পোড়া পেটের ভাবনা তাকে মোটেই ভাবতে হয় না। রাজ বাড়ী থেকে যা মাসহরা পায় তাই সে অনাথ আতুরকে বিলিয়ে দিয়ে ও খেয়ে শেষ করতে পারে না। কিন্তু রাজবাড়ীর কোন ধার ধারে না সে; সে সংসারে একলাটি আপন ভাবেই বিভোর হয়ে থাকত। বাইরের কিছুই তাকে স্পর্শ করত না।

(২)

রাজা ছিলেন হিন্দু। তরুণ রাজা রূপের নেশায় ভরপুর। তরুণী গায়িকাদের বিলোল কটাক্ষ, দেহ-লতিকার যৌবন-শ্রী আর তরল কণ্ঠের প্রেম সঙ্গীত তার শিরায় শিরায় মদিরার মদিরোচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল; বৃদ্ধ ফকিরের কম্পিত কণ্ঠের রাগিণী শুনে সে তার অমূল্য যৌবনের এক দণ্ডও বিফল করতে মোটেই রাজি ছিল না। একদিন প্রমোদ ভবন থেকে ফিরবার পথে রাজার রক্ত আঁখির সামনে পড়ে গেল সেই ফকির। সে নগর প্রান্ত দিয়ে এক মনে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে তুলসীদাসের ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। যবন হয়ে হিন্দুর আচরণ দেখে রাজা রাগে গর গর করে উঠল। জড়িতকণ্ঠে মত্ত অবস্থায় কটু কথায় রাজপথ মুখর করে চলে গেল। ফকিরের কাণে সে কথা পৌছল কি না কে জানে? সে তেমনি প্রশান্ত মুখে তার ভক্তিগদগদ স্বরলহরীতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল।

(৩)

সকালে উঠেই রাজা দরবারে এসে হাজির। উজীর আর অমাত্যগণকে কড়া তলপ হবা মাত্রই সকলে সভয়ে সিংহাসনতলে এসে দাঁড়াল। কিছুদিন থেকে অনাবৃষ্টি হয়ে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে; রাজ্যময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। কদিন থেকেই প্রজাদের আর্ত্ত কণ্ঠের করুণ চীৎকার রাজার রূপের নেশার মজগুল প্রাণটায় বড়ই বেসুরো ঠেক্‌ছিল গোলাপী নেশায় সব রং টুকু যেন মাটি করে দিচ্ছিল; তাঁর সমস্ত হৃদয়টা তিক্ত হয়েছিল। তার উপর এই ফকিরের আচরণ দেখে তার প্রাণটা একবারে জ্বলে উঠেছে। বৃদ্ধ, কদাকার পুরুষ, কণ্ঠে কোমলতা নাই। আবার তার উপর ভণ্ডামি করে মাসে মাসে রাজকোষ থেকে এতগুলো করে টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে এ কিছুতেই রাজার সহ্য হ'ল না। তিনি উজীরকে ডেকে তার মাসহরা বন্ধ করে দিয়ে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে বল্লেন। উজীর সভয়ে শিউরে উঠে বল্লেন "মহারাজ কাকে কি বল্‌ছেন, উনি যে ঋষিতুল্য লোক; অদ্ভুত ওঁর সঙ্গীত সাধনা; অক্ষুন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সঙ্গীত সাধনা করছেন। আপনার বাপ পিতামহ ওঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে এসেছেন; তাঁরা বিধান করে যে রাজ্যের গুপ্ত ধনাগারের চাবি ওঁকেই দিয়ে গিয়েছেন।" উজীরের কথাগুলো উন্মাদের প্রলাপ মনে করে রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। নিস্তব্ধ দরবারের কক্ষে কক্ষে সে অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি জেগে উঠল। সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কায় হঠাৎ শিউরে উঠল। যখন একজনও রাজার এই কঠোর আদেশ পালন করতে রাজী হ'ল না, তখন রাজা বজ্রগম্ভীরস্বরে বল্লেন "আমিই এর প্রতিবিধান করব; সে কত বড় সাধক আমি তাই একবার দেখ্‌তে চাই; তোমরা তাকে একবার আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস" দূতের সঙ্গে ফকির তেমনি প্রশান্ত মুখে এসে রাজ দরবারে দাঁড়াল। রাজা পরুষ কণ্ঠে বল্লে "তুমি কি রকম সঙ্গীত সাধনা করেছ একবার দেখতে চাই। এই আজ কতদিন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়ে রাজ্য রসাতলে যেতে বসেছে, গাও দেখি এমন গান যাতে এখনি বাদলের ধারার মত বৃষ্টি নেমে আসে; আমার রাজ্যে থেকে এতদিন বসে বসে মাসহরা খাচ্ছ রাজ্যের একটা মঙ্গল কর।" ফকির সবিনয়ে বল্লে "আজই আপনার মাসহরা বন্ধ করে দিন আমি তার আদৌ প্রত্যাশা করি না, দুনিয়ার মালিক যখন আমায় সংসারে পাঠিয়েছেন তখন আমার আহারের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। সঙ্গীতে সকলই সম্ভব কিন্তু রাজ্যের অনাবৃষ্টির হেতু যে আপনিই রাজার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহই যে প্রজার সব কল্যাণকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আপনিই এ অনাবৃষ্টি ঘোচাবার মালিক। একান্ত মনে একবার খোদাকে ডাকুন দেখি তাঁর চরণে এই আকুল প্রার্থনা নিবেদন করুন, তাঁর মরজি হ'লে নিমেষে সব অকল্যাণ ঘুচে গিয়ে এই জলহীন শুষ্ক মরু প্রান্তরে তাঁর করুণা প্রবাহ বন্যাতরঙ্গের মত এসে আপনার রাজ্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত হরিত শস্যে শ্যামায়মান করে তুলবে। ক্ষুদ্র আমি একধারে পড়ে আছি আমার কি ক্ষমতা আপনার রাজ্যের আমি মঙ্গল সাধন করতে পারি।" অমনি আবার রাজা গর্জ্জে উঠলেন "ওসব ফাঁকির কথা আমি শুন্‌তে চাই না, সঙ্গীতের দ্বারা যদি বৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয় তাই তোমায় করতেই হবে।" ফকির বল্লে "বেশ তবে আয়োজন করুন। বারজন বেদজ্ঞ সৎ ব্রাহ্মণ আনান। এক লক্ষ আটটি ভাল বিল্বপত্র সংগ্রহ করুন এবং খাঁটি গব্য ঘৃত দ্বারা হোম ও শিব পূজার ব্যবস্থা করুন আর প্রতিজ্ঞা করুন যে প্রাণের স্নেহ মমতা টুকু নারীর অক্ষম যৌবনের পায়ে বিলিয়ে না দিয়ে সন্তানবৎ প্রজা পুঞ্জকে আপনার উদার বক্ষে টেনে নেবেন। এ কামাগ্নির লেলিহান শিখায় যে সবই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।" রাজার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা অজানিত শিহরণ জেগে উঠল কিন্তু এ খেয়াল তাঁর মেটাতেই হবে তার মূল্য যতই হোক না কেন। দ্বিধা সঙ্কুচিত প্রাণে সংস্ত যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করবার হুকুম দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

উন্মুক্ত আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে রাজ্যের

(৪)

যত প্রজা আজ সমবেত হয়েছে। রাজা এক পাশে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে আছেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শিব পূজা আর যজ্ঞ করছেন; সভার মাঝখানে ফকির তার তানপুরো নিয়ে গান আরম্ভ করল, মেঘ মল্লার। গাইতে গাইতে বৃদ্ধ তন্ময় হয়ে পড়েছে তার সেই রাগিণীর মূর্চ্ছনা কেঁপে কেঁপে উর্দ্ধে ক্রমে আরো উর্দ্ধে উঠছে আর এদিকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের হোমাগ্নি শিখাও যেন তালে তালে নেচে উঠছে। দিবা রাত্রি বিরাম নাই। বিরাট জনসঙ্ঘ স্তব্ধ হয়ে আকাশের পানে চেয়ে আছে। বৃদ্ধের মুখে চোখে সে কি লাবণ্য ফুটে উঠেছে। যৌবনের সমস্ত শক্তি যেন তার ফিরে এসেছে। যেন কণ্ঠের মধুর স্বর লহরী মুগ্ধ জনতার প্রাণের পরতে পরতে ঝঙ্কৃত হয়ে আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। রাজা রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে আছেন, এক একবার শ্রদ্ধায় তাঁর প্রাণ ভরে উঠছে আবার বৃষ্টির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত না দেখে ভণ্ড ভেবে ললাট এক একবার ঘৃণায় ও বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। আজ শেষ দিন; মন্ত্রপূত শেষ আহুতির সঙ্গে সঙ্গে হোমের কুণ্ডলায়িত ধূম শিখা কেঁপে কেঁপে উঠে আকাশে যেন কালো যবনিকা টেনে দিয়েছে। অগ্নি একবার শেষ বারের মত জ্বলে উঠে নিবে গেছে; বৃদ্ধের কণ্ঠও তার শেষ গ্রামে পৌঁছেছে। সুর লহরী কেঁপে কেঁপে উঠে আকাশের বুকে আছাড়ে পড়ল; আর কড় কড় শব্দে মেঘে মেঘে তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠল; আর তার কোল থেকে সহস্র ধারে নেমে এল বাদলের বারিধারা, শান্ত শীতল প্রাণ-জুড়ান। মন্ত্রাহতের মত অগণিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক বিস্ময়ে উপরের দিকে চেয়ে রইল মাথার উপর দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, ভ্রুক্ষেপও নাই। সঙ্গীত নীরব, গায়ক নীরব। সভা স্তব্ধ নীরব, রাজা নির্ব্বাক! কেবল দুকুল ছাপিয়ে যেন শ্রাবণের বারিধারা নেমেছে ঝর ঝর ঝর। রাজা কণ্ঠের মণি মালা খানি খুলে ছুটে গিয়ে গায়কের কণ্ঠে পরিয়ে দিলে কিন্তু এ কি তুষার শীতল তার দেহ প্রাণের কোন সাড়াই নাই। রাজা উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করে পায়ের তলায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। আর সেই বিরাট জনমণ্ডলীর উপর আকাশ থেকে অবিরাম ঝরে পড়তে লাগল যেন বিশ্বের অশ্রু প্রবাহ পাগলা ঝোরার মত।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাজা রামমোহন রায় ও
বঙ্গ সাহিত্য।

———:০:———

* * * বিশুদ্ধ সাহিত্য, কি সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কোন শ্রেণীর কি লক্ষণ এ সমুদয় নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। আমরা এই স্থানে বিশুদ্ধ সাহিত্যের একটী সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। মানুষ নানাপ্রকারে মানুষ হইতে পৃথক। জাতি ধর্ম্ম ভাষা আবার এমন কি গায়ের বর্ণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে এই পার্থক্য ছাড়াইয়া উঠা যায় না। কিন্তু মানবচৈতন্যের বা মানবহৃদয়ের এমন একটী জাগরণের অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ তাহার এই স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীগুলি সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠে এবং ভাবে চিন্তায়, কল্পনায় আশায়, আকাঙ্ক্ষায় সুখে দুঃখে সৌন্দর্য্য বোধে ও রসাস্বাদনে অতীত অনাগত দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী যাবতীয় মানবের সহিত এক হইয়া যায়। মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সেই সময় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যে শব্দময় ও রসবৎ প্রকাশ গদ্য বা পদ্য যাহাতেই হউক—তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য। সাহিত্যের ভূমি মহামিলনের ভূমি। যাহা নিত্য সত্য ও নিত্য সুন্দর তাহাই সাহিত্যের আত্মা।
প্রবাসী, মাঘ ১৩২৯।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

কলমের ইতিহাস।

সেই আদিযুগে যে লোক সব প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম সরু চুল আঁচড়াইবার বুরুশ ব্যবহার করেন। আজকাল চীনা ধোপারা উষ্ট্রের লোমের তুলি দিয়ে কাপড়ে চিহ্ন দিয়ে থাকে। এর পরেই জনৈক সাদা ব্যবসায়ী লোহার কলমের ব্যবহার আরম্ভ করে।

কলমের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দু রকমের কলমের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রথম খাগড়া, দ্বিতীয় কাগজ আজকাল অবশ্য লোহার কলমের প্রচলন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মণ লোহা প্রতিবৎসর তাতে ব্যয়িত হচ্ছে। তবে এখনও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা খাগড়া ও পালকের কলমে লিখে থাকেন।

চীনের কন্‌ফিউসিয়াসগণ কলমরূপে তুলি ব্যবহার করিত। হাজার হাজার বছর ধরে তারা তুলিকেই কলমরূপে ব্যবহার করে আসছে। খাগড়ার কলম পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে চলিত আছে।

তুলির চাইতে খাগড়ার কলম অনেকটা উন্নত অবস্থায়।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম যুগেই পালকের উপযোগিতা আবিষ্কৃত হয়। পালকের প্রচলন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পাশ্চাত্য হতে পালকের ব্যবহার আমেরিকায় যায়। লোহার কলমের প্রচলন হবার আগে ইংলণ্ডে বছরে আড়াই কোটি পালক আমদানী হত।

উপাসনা, মাঘ ১৩২৯।

মন-বশীকরণ।

হৃদয় বশ করিবার এবং মনকে উন্নত করিবার কয়েকটী পন্থা নিয়ে প্রদর্শিত হইল :—

(১) তোমার জীবনের প্রত্যেক অবস্থা—অর্থাৎ ভাল মন্দ সর্ব্ব অবস্থাকেই তোমার জীবনের উন্নতির বর্দ্ধক বলিয়া লক্ষ্য করিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া যাইবে।

(২) প্রত্যহ ধর্ম্ম বিষয়ে যে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক তাহার অভ্যাস করিবে।

(৩) সর্ব্ববিষয়ে লোভ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে।

(৪) তোমার ক্রোধপরায়ণতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইবে।

(৫) প্রত্যহ জগদীশ্বরের আরাধনা করিবে। প্রার্থনা কালে সেই বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা জীবনে ও মৃত্যুতে আনন্দ, লোভাদি দমনের নিমিত্ত দৃঢ়তা, চিত্তের প্রসারতা, জীবনের লক্ষ্যে পবিত্রতা ও উচ্চতা সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ মৃত্যুতে শান্তি এবং অমরতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে।

শিক্ষক, মাঘ, ১৩২৯।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

যৌবনের স্বারাজ্য।

* * * যৌবনের শারীরী সাধনার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ও সকলের গোড়ার কথা এই যে যে যুবক নিজের যৌবনের সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে নিজের দেহের প্রতি অচলা ভক্তি সাধন করিতে হইবে। প্রতিমার উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহারা যে ভাবে প্রত্যক্ষ প্রতিমাতে অপ্রত্যক্ষ দেবতার অধিষ্ঠান ধ্যান করিয়া তাহাতে দেবতা-বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন ঠিক সেই ভাবে যৌবনের সাধককে নিজের দেহের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইবে। যার যাহাতে ভক্তি নাই সে তাহাকে সাধন করিতে পারে না। * * * এই দেহপুরের পুরবাসী বিশ্বের উপাস্য নারায়ণ। এই ভাবে প্রতিদিন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য নিজের দেহেরই ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানের ফলে এই দেহেতে দেবতা বুদ্ধি জন্মিবে। দেহেতে দেবতা-বুদ্ধি জন্মিলে এই দেহকে উপেক্ষা বা কোনও প্রকারে অপবিত্র করা অসম্ভব হইবে। দেব প্রতিমাকে স্পর্শ করিতে যেমন শঙ্কা হয়, শুচি না হইয়া যেমন পূজারী দেবতা বিগ্রহের ভোগরাগাদি সম্পাদন করিতে সাহস পায় না সেইরূপ যৌবনের সাধক অন্তর্বাহ্যে শুচি না হইয়া নিজের অঙ্গস্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। তথা স্নানাদি নিত্য কর্ম্ম তাঁহার উপাসনার অঙ্গ হইয়া যাইবে। দেহের প্রসাধন করিতে যাইয়া তিনি ভোগ বিলাসের প্রেরণা অনুভব করিবেন না, কিন্তু সত্য এবং পবিত্র ভক্তি দ্বারাই প্রেরিত হইবেন। ভোজন তখন তাঁহার ভজনেই পরিণত হইবে। শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য সাধন ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিবে।

নব্যভারত, মাঘ ১৩২৯।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

স্বপাক ভোজন।

স্বপাকভোজন জাতীয়তা রক্ষা করিবার একটী প্রধান অস্ত্র। স্বপাক ভোজনের আরো একটি মস্ত কারণ আছে—সেটি স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ক্ষয়কাশ বা থাইসিস ব্যারামের বিষ ঐ রোগীর কাশে থাকে। যদি পাচক ঠাকুর ক্ষয় কাশ গ্রস্ত হন তবে তিনি যতবার পরিবেশন বা রন্ধন কারতে করিতে কাশিবেন, ততবারই খাদ্য দ্রব্যে ঐ রোগের বিষ ছড়াইবেন। যে লোক সম্প্রতি টাইফয়েড জ্বরে ভুগিয়াছে বা যাহার টাইফয়েড জ্বর সবে মাত্র ধরিয়াছে সে ব্যক্তির থুথুতে ঐ ব্যারামের জীবাণু থাকে। * * * যে লোকের কলেরা বা ওলাউঠা হইয়াছিল বহুকাল ধরিয়া তাহারও মুখের লালায় ঐ রোগের বিষ বর্ত্তমান থাকে। * * * যাঁহারা উপদংশ বা গর্ম্মীর ব্যারামে পীড়িত তাঁদের এঁটো করা বাসনে চা বা হোটেলে খানা খাইয়া ঐ ব্যারাম হওয়া বিচিত্র নহে। * * *

স্বপাক ভোজনের শাস্ত্রীয় যুক্তি ও আছে। আমরা ইংরাজী পড়িয়া পাপ বলিলে Sin বুঝি। হিন্দুদিগের মতে যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাই পাপ। এমন অবস্থায় পাপ একজন হইতে অপর জনে সংক্রমিত হইতে পারে। শাস্ত্রীয় পুস্তকে পড়িয়াছি যে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আহৃত অন্ন ভোজন করিয়া সাধু ব্যক্তি চৌর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছেন; অসাধুর অন্ন ভোজন করিয়া সাধু কষ্টে পড়িয়াছেন অর্থাৎ অন্ন দ্বারা পাপ ও সংক্রমিত হইয়াছে।

স্বপাক ভোজন করিলে বেশী রকমারি করা চলে না মোটামুটি ভাবেই রন্ধন করিতে হয়। আমরা অন্নভোজী এবং শারীরিক শ্রম বিমুখ। কাযেই আমরা আহারে বাহুল্য করিতে গেলে মধুমেহ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য মিতাচারের সুযোগ আছে বলিয়াও স্বপাক ভোজী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে স্বপাক ভোজন করিলে ব্যক্তি গত ভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সংযম অভ্যাস হয় ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি হয় ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। সামাজিক হিসাবে জাতীয়তা সংরক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯।

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় এল এম এস।

শক্তি পূজার ইতিহাস।

* * * শিব দুর্গা যে স্ত্রী প্রধান গৃহস্থালির আদর্শ হইতে আর্য্য ভিন্ন অপর নানা জাতির দেব কল্পনার সংমিশ্রণে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তার অনেক নিদর্শন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে ও অনুমানে দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃ দেবতার প্রাধান্য মধ্য ধরণী সাগরের উপকূল হইতে মঙ্গোলিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। রোমানদের এক দেবী ছিলেন অন্ন পরেন্না; তিনি অন্নাধিষ্ঠাত্রী; তার পূজা হইত বসন্ত কালে ১৫ই মার্চ্চ। ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশেও অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা বহু পরবর্ত্তীকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সুদূর অতীতে রোমানদিগকে দেবীর যে মহিমা এইরূপ কল্পনার প্রবৃত্ত করিয়াছিল বাঙ্গালীকেও স্বতন্ত্রভাবে সেই মহিমা আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রীট দ্বীপে পর্ব্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী পূজিত হইতেন। রোমাদের ব্যাকাস ও মিনার্ভা দেবীর উপাখ্যান ও পূজা পদ্ধতি এমন অবিকল যে হঠাৎ মনে হয় যে ঐ দুই দেব দম্পতি এক অভিন্ন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ডবলিউ ওয়ার্ড সাহেব ১৮১৮ সালের ও পূর্ব্বে A view of the History of Literature and Mythology of the Hindus (including a minute description of their manners and customs) নামক অতি আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করেন। তাতে তিনি শিব দুর্গা ও ব্যাকাস মিনার্ভাকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে The object of worship is the some througout India, Tartary, china, Japan, Burma, the. as alse among the Assyriang chaldoans the Magians of Persia etc.

বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩২৯।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার দেশ।

জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশী!

(সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সৌজন্যে)

১৯২০

জন্ম	মৃত্যু
তের লাখ উনষাট হাজার নয়শ তেরো	চৌদ্দ লাখ একাশী হাজার ছয়শ বারো

১৯২১

জন্ম	মৃত্যু
তেরো লাখ এক হাজার	চৌদ্দ লাখ তিন হাজার বাট

জন্মের পর বছর না ঘুরতেই বাপ মাকে কাঁদিয়ে চলে গেছে হাজার করা।

১৯২০	১৯২১
দুই শ সাত জন	দুইশ ছয় জন

ম্যালেরিয়া সাবাড় করেছে।

১৯২০	১৯২১
এগার লাখ চুয়াল্লিশ হাজার চার শ একুশ	দশ লাখ সত্তর হাজার তিন শ আটষট্টি

বিজলী, ১১ই ফাল্গুন ১৩২৯।

উন্নতির তাৎপর্য্য।

LEONARD T. HOBHOUSE মহোদয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। পরে সেগুলি একত্রিত করিয়া তিনি পুস্তকাগারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যুগে যুগে মানুষের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অবস্থাতেই কতকগুলি দোষ ও গুণ ওতঃপ্রোত রূপে মিশ্রিত থাকে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের মধ্যেও এই আশা ও নিরাশার লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ রূপেই বিদ্যমান আছে। আধুনিক সমাজ সংস্কারকগণ প্রায় সকলেই এই ক্ষতস্থান গুলিকে অসম্ভব রূপে বড় করিয়া দেখেন এবং আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও এই জন্য একটা দুঃখের সুর তীব্র বাজিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার নিন্দা করা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিকাশ হওয়া ও অতীতকে কল্পনার রঙে রঙীন্ করিয়া তোলা সংস্কার বাদীদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতীতের চিত্র আমাদের সকলেরই চিত্তে অলৌকিক কান্তিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখিতে পাই সকলেই অতীতে কোন না কোন বিষাদময় কষ্টকর নিয়তির অধীন হইয়াছে। সেই দুর্ভাগ্যকে পুনরায় জীবনে বরণ করিয়া লইতে নিশ্চয়ই কেহ অগ্রসর হইবেন না। এই দুঃখ কষ্ট গুলিই আবার স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়া কত মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। অতীতের বেদনা ও বিষাদের গল্প করিতে আমরা কত আনন্দ করি! ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য সমষ্টির সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সামাজিক জীবনেও আমরা অতীতের বিষাদ বেষাদ বেদনাকে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য চিত্রিত করি কিন্তু তাহার মধ্যে কেহই আবার প্রবেশ করিতে চাহি না। বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্য আমাদিগকে মর্ম্মান্তিক রূপে আঘাত করে কিন্তু অতীতের বেদনা ক্লেশ কতকটা বিস্মৃতির অন্ধকারে মলিন হইয়া যায় আবার কতকটা সময়ের প্রভাব শান্ত করুণ আকার ধারণ করিয়া কোমল ও বিধুর হইয়া উঠে। সুতরাং প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্ত্তনই দুঃখ বাদীর চিন্তার খোরাক জোগাইতেছে। সামাজিক উন্নতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে বসিয়া সামাজিক মনের দুঃখবাদের প্রতি এই যে পক্ষপাত তাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে।

যাঁহারা সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা যে ইহার দোষগুলিকে ছোট করিয়া দেখেন তাহা নহে। কিন্তু দুঃখ বাদী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও একটা বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার দোষ গুলির জন্য সমাজের সর্ব্ব স্তরের লোকের মধ্যে যতখানি বেদনা বোধ জন্মিয়াছে—অন্য কোনও যুগে বোধ হয় তাহা সম্ভব হয় নাই। আমাদিগকে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সমর্থন করিতে যদি নিযুক্ত করা হয় তবে আধুনিক সমাজের যে দোষগুলি খুব কিছু কম তাহা আমরা বলিব না বরং সেই দোষগুলিকে সংশোধন করিবার জন্য যে দৃঢ় প্রযত্ন এই যুগে লক্ষিত হইতেছে তাহার উপরেই জোর দিব। এই প্রচেষ্টা যে এই যুগেই

* Leonard. T. Hobhouse এর Social evolntion and political thioay" গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহার গুরুত্ব ও প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানবের চিন্তা ও সমর্থ আধুনিক যুগে এই দিকে অনেক বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইয়েছে। মানুষ আজকাল আর সমাজদেহের ক্ষত চিহ্ন গুলিকে নিরাময় করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না। সে ইহার মধ্যে আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সমূলে বিনষ্ট করিতে চাহিতেছে।

প্রত্যেক সভ্যদেশেই কত শত নরনারী মানব সমাজের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। দেশে দেশে যে বিপুল "মানব-বাহিনী" এই মহৎ কার্য্যে রত আছে—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা পরস্পরের সাহচর্য্য ও নিজেদের চেষ্টায় এই পরম উদ্দেশ্য সাধন করিতে আশা করেন। আবার কেহ বা ইহা যাহতে গভর্ণমেণ্ট দ্বারা সুসাধিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ সমাজের সমস্ত ব্যাপার অনুশীলন করিয়া উন্নতির যে মূল কারণ তাহা খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। যিনি দুঃখবাদী এবং বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যিনি মন্দের ভালই বেশী দেখিতে পান তিনিও বোধ হয় এই সংস্কারক গণের অস্তিত্ব ও একাগ্রতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন না। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইতে পারেন।

"মানববাহিনী" সমাজের হিত সাধনে রত হইয়াছে উপরে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই কথায় কেহ কেহ হয়ত এইরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে বাহিরের মত সুসংবদ্ধ সুনিয়মিত ও শৃঙ্খলধীন সমাজ সংস্কারকের ত কোনই দল দেখা যাইতেছে না। এলোমেলো ভাবে কতকগুলি লোক সমাজের হিত সাধনে ব্যস্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন দলের চেষ্টার মধ্যে কোন ঐক্য নাই; অনেক সময় তাঁহারা ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করিতেছেন এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কার কার্য্যে রত হইয়াছেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁহারা যে একই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের এই জ্ঞান নাই। কেহ কেহ মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা এদিকে এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে জগতে অন্য সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁহারা উদাসীন। কোন কোন দল বা পল্লীসমাজ পুনর্গঠন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে অসম্ভবরূপে মনোযোগ দিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষা ও নারীর অধিকার বিস্তারেরও প্রচেষ্টা চলিতেছে। শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। সামাজিক হিত সাধনের এইরূপ আরো কত খণ্ড খণ্ড অসংবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপে শত সহস্র লোক সমাজসংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। বৃথা বিবাদ করিয়া অনেক সময় ইহারা উন্নতির পথে বাধাও দিতেছেন। যে যাঁহার দলের মতকে ও লক্ষ্যকে উচ্চে ধরিয়া সংস্কার কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই সমস্ত বিভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার মধ্যে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, সমস্ত চেষ্টাকে একটা উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া ধরিয়া মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের যে চেষ্টা তাহা একরূপ হইতেছে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপন আপন দলের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যতটুকু সংস্কার কার্য্য চলে তাহাই হইতেছে।

এই কথাটা বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু এই সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি সত্বেও কোন কোন দিক দিয়া সমাজের কিছু কিছু উন্নতি সাধন হইয়াছে। কিন্তু মানবের যতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার তুলনায় মানুষের শক্তি অনেক বেশী পরিমাণে অপব্যয় ও নষ্ট করা হইয়াছে। যদি মানবের শক্তির এই অপব্যয় নিবারণ করিতে হয় ও সংস্কারকদের সম্মিলিত চেষ্টার অনুরূপে সমাজের উন্নতি বিধান করিতে হয় তবে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বলিতে কি বুঝায় তাহা এই ভিন্ন ভিন্ন দলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই খণ্ড খণ্ড চেষ্টা যে এক অখণ্ড বিরাট প্রচেষ্টারই অঙ্গ মাত্র তাহা বলা বাহুল্য।

সমাজের নানাদিকে যে নানা দোষ বর্ত্তমান আছে

তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা সেই দোষগুলি কখনো বা জোর করিয়া আবার কখন বা শান্তভাবে সমূলে উৎপাটন করিতে চাই। কতকগুলি পাপাচার দূর করিব মাত্রই আমরা দেখিতে পাই সমাজের অন্য দিক দিয়া আরও কতকগুলি নূতন মন্দ সংস্কার আবির্ভূত হইয়াছে। কোন প্রকাশ্য পাপ দমক করিবা মাত্রই নূতন কোন গুপ্তপাপের উদ্ভব হয়। মদ্যপান নিবারণ করিয়া হয় ত দেখা যায় যে জুয়াখেলা সমাজে খুব চলিয়া গিয়াছে। শ্রমজীবিগণ নিজেদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মহাজন প্রভুরাও আপনাদের সমবায় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতেছে এইরূপ দেখা গিয়াছে। সমাজের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন যত ভালোর দিকেই হউক না কেন তাহা সমাজের মধ্যে উন্নতিবিরোধি প্রতিক্রিয়া অন্যদিক দিয়া সৃজন করিবেই। যদি আমরা কোন উন্নতির আশা বাস্তবিক করি তবে সামাজিক জীবনের নানা বৈচিত্র্যকে এক অখণ্ড সামঞ্জস্যের মধ্যে ধরিয়া তাহাদের ভিতরের মূল ঐক্য সূত্রটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নিজের নিজের দলের অভিপ্রায়টিকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। অন্যান্য দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে হইবে। অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রেও কেবল একটি মাত্র জিনিষকে লইয়া ব্যস্ত থাকার দোষগুণ দুই-ই আছে। মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র ও সসীম; তাই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার মানব দেহের বস্তু সমূহ যেমন এক অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ভাগগুলিও তেমনি অবিভাজ্য। মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র বলিয়া যেমন একটি কিছু লইয়া থাকাই মানুষের উচিত ঠিক তেমনি কেবল মাত্র একটি-কেই ধরিয়া থাকায় সে একচোখা হইয়া সামাজিক জীবনের অবিভাজ্যতার কথা ভুলিয়া যায়। যিনি সেই কার্য্য করেন তাহাকে একান্ত বড় করিয়া দেখাই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই উভয়তঃ বিরুদ্ধ সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যাহাতে হয় তাহাই করিতে হইবে।

মানব যে অভিপ্রায় লইয়া কাজ করে তাহা ঠিক যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে তাহার মধ্যে কোন স্বতঃ বিরোধ আছে কিনা ও কার্য্যকালে কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি করিবে কিনা। দ্বিতীয়তঃ উহা মানবের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা সাধিত হইবে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে।

মানব সমাজের উন্নতি বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বোঝা প্রয়োজন। মানব সমাজ যে ক্রম বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা মানিতে হইবে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই যে তাহা উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরাজীতে Evolution ও progress বলিয়া যে দুটী কথা আছে তাহার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্ত্তমান। কোন বিষয়ের অগ্রগতি বা বিকাশকেই (Growth) সেই বিষয়ের ক্রম বিকাশ (Evolution) বলা যায়। মানব চরিত্রের যে সমস্ত গুণের প্রতি মানুষ বিচার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া সমাদর প্রদর্শন করিতে পারে সামাজিক জীবনে যদি সেই সমস্ত গুণের বিকাশ হয় তবেই সমাজের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে সুতরাং সামাজিক উন্নতি (progress) সমাজের ক্রম বিকাশের (evolution) কেবল মাত্র একটী অংশ। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সমাজিক জীবনের প্রত্যেক ক্রমবিকাশটি সমাজের উন্নতির পরিচায়ক নয়। এখানে Hobhouse মহোদয় জাতিভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিভেদ জিনিষটা সামাজিক জীবনের একটা ক্রমবিকাশের লক্ষণ; ইহা ঠিক সমাজের উন্নতি সাধন করে নাই। আধুনিক যুগে monopoly ও cartel সমূহের উদ্ভব হইয়াছে; ইম্পিরিয়ালিজম্, সোসিয়ালিজম্ ও মিলিটারিজমেও আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এগুলি দ্বারা সামাজিক উন্নতি হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সমাজ বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে এইরূপ মনে করা ভ্রম।

বিবর্ত্তন বাদের নিয়মের মধ্য দিয়া যে জিনিষটি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহা যে মানব সমাজের পক্ষে সব সময় হিতকর নয় এ কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে

হইবে। কারণ জীবতত্ত্ববিদ্গণ অনেক সময় এই ক্রম বিকাশ ও উন্নতিকে এক অর্থবোধক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করেন। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া সামাজিক জীবন যদি কোন বিকাশ লাভ করে তবে জীবতত্ত্ববিদ্গণ সেই সমস্ত অবস্থাগুলির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন। যে সমস্ত নৈতিক আদর্শের সহিত ক্রমবিকাশবাদের সামঞ্জস্য নাই তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাঁহারা এই কথা বলেন। তাঁহারা বলেন যে ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতেছে—ইহার মধ্যে ভাল মন্দের কোন কথা নাই। যে মানুষ আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাঁহার বিবেচনায় মানব জীবনে যে সমস্ত কিছু মূল্যবান্ তাহা যে সামাজিক উন্নতির বিরোধী তাহা মানিতে পারা যায় না। জীবতত্ত্ববিদ্গণ হয়ত বলিবেন যে কোন কিছুর অগ্রগতির (process) সহিত মানুষ বিচার করিয়া যাহা ভাল বলিয়া ঠিক করিয়াছে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। এই অবস্থায় এই অগ্রগতি (process) কে উন্নতি (progress) বলা যাইতে পারে না। কারণ উন্নতি বলিতে ভালোর দিকে অগ্রসর ইহাই বুঝায়। মানব যাহা কিছু জিনিষকে মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মানব নিজে উন্নতির জন্য যত কিছু চেষ্টা করে তাহা সর্ব্বকালে ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মানব উন্নতির পক্ষে যাহা বিরোধী তাহাকেই যে মানুষকে বরণ করিয়া লইতে হইবে এমন হইতে পারে না। নৈতিক আদর্শ যদি জগতের বিবর্ত্তনের পরিপন্থী হয় তবে মানুষের যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজের কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করা এরূপ স্থলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত শক্তি মানুষের স্থায়ী উন্নতির পরিপন্থী নরনারী যদি নিজেদের প্রচেষ্টা সেই শক্তির পিছনে নিয়োজিত করে তবে তাহাদের মূর্খতাই প্রকাশ পাইবে। এরূপ মন্দ ভাগ্য যদি মানবের বাস্তবিকই হইয়া থাকে তবে মানব জীবনের যেটুকু শ্রেয় ও প্রেয় আছে তাহা সর্ব্বনাশের হাত হইতে যতটুকু রক্ষা করিতে পারা যায় তাহাই দেখিতে হইবে। যদি এটুকু করিতেও আমাদের শক্তিতে অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে মানবকে ক্রিয়াহীন অপ্রতিরোধী (passive) হইয়া ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। যাহা আমাদের কাছে মূল্যবান তাহাকে যে শক্তি নষ্ট করিতেছে তাহাকে যে আমরা কষ্ট স্বীকার করিয়া সাহায্য করিব না তাহা বলাই বাহুল্য।

যে সমস্ত অবস্থার আবর্ত্তে পরিয়া সমাজের ক্রম-বিকাশ সাধিত হইয়াছে—তাহা যে উন্নতিরই রূপভেদ এরূপ বলা যায় না। উন্নতি ও ক্রমবিকাশ অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। তবে উন্নতি বলিতে কি বুঝায়? মানুষ বিচার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যাহা কিছুকে জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে—যাহা কিছু জীবনকে সত্য সুন্দর অমৃতের পথে লইয়া যাইতে পারে তাহাকে জীবনের মধ্যে লাভ করাকেই উন্নতি লাভ করা বলা যাইতে পারে। মোটমুটিরূপে উন্নতির এই সংজ্ঞাকেই আমরা মানিয়া লইব। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা জগতের বিবর্ত্তনের অগ্রগতিকে কোন্ কোন্ জিনিস সাহায্য করিতেছে তাহার কষ্টিপাথরে উন্নতির আদর্শকে অবশ্যই পরীক্ষা করা হইবে না।

উন্নতির অর্থ যদি এইরূপ হয় তবে জগতে কোন উন্নতি সম্ভব কি? যদি উন্নতি লাভ সম্ভব হয়, তবে মানুষের চেষ্টার একটা পরিষ্কার সুসঙ্গত লক্ষ্য আছে। যদি না হয় তবে মানবকে স্বীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থকাম হইতে হইবে।

জগৎ বাস্তবিকই কোন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কিনা তাহা ঠিক করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন মানব সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আপনাকে এক মহৎ আদর্শে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছে। আবার কেহ বা বলেন যে মানব সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসরও হইতেছে না, পশ্চাৎপদও হইতেছে

না। তবে আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া প্রচার করিতেছি ও করিয়াছি তাহা সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution) মাত্র। আবার তৃতীয় দল বলিতেছেন যে জগৎ ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেই না বরং অধোগতিতে নামিয়া যাইতেছে। অবশ্য এই দুঃখবাদী-সংখ্যা সৌভাগ্যক্রমে জগতে খুব কম।

সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারাই অবশ্য সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সমাজের হিত সাধন হয় না। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ও ভিন্ন ভিন্ন মানবের সহিত একটা উদারতার সামঞ্জস্য স্থাপন করা এবং প্রত্যহের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে আপনার অভিরুচি অনুসারে নিয়মিত করিতে শিক্ষা করাকে উন্নতির সোপান বলা অনুচিত হইবে না। ব্যক্তিকে সমষ্টির মধ্যে ধরিয়া তোলা জাতিকে বিশ্বমানবের সাম্যভূমিতে নিখিল নরনারীর মিলন যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য করিয়া তোলা এই সমস্তই মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। মানবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের মূল ঐক্য সূত্রটি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইয়া এই বৃহৎ মানব পরিবারকে এক মহামানবতার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তুলিবে। মানুষ অসীম উন্নতির অধিকারী—মানবের ভাগ্য বিধাতা সৃষ্টিকালে এই বিরাট সম্ভাবনা নরনারীর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। সে একদিন সবলে সমস্ত হীনতার লক্ষ্য ভেদ করিয়া উর্দ্ধমুখে সত্য-সূর্য্যের দিকে জীবন শতদলকে চরম সৌন্দর্য্য সৌরভে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবে ইহাই তাহার জীবনের পরম সার্থকতা।

ফলাফলের বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এইখানেই মানুষের সহিত ইতর প্রাণীর প্রভেদ। জীবনসংগ্রামে উদ্বর্ত্তনের জন্য নৈতিক ও উচ্চ আদর্শ সকল ইতর প্রাণীই একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু স্নেহ, দয়া, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতা পরিত্যাগ করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া মানুষের অভিপ্রায় কিনা তাহা সন্দেহ। কেবলমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এই শুষ্ক নীতি মানিতে গেলে হৃদয়ের অনেক কোমল বৃত্তিই নষ্ট করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কোমল বৃত্তিকে মানুষ চিরদিনই সমস্ত করিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হওয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা হইতে পারে কিন্তু উন্নতি লাভ করা হইবে কিনা তাহা অনেকেই সন্দেহ করিবেন।

পশুর জীবনের অগ্রগতির সহিত মানব-সমাজের উন্নতির তুলনা চলিতে পারে না। তাহা আরো উচ্চতর ও উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে মানুষ একদিন শান্ত হোমাগ্নি আলোকে বসিয়া জগতের আদি সত্যকে হস্তামলক রূপে পাইয়াছে—আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ত পুরুষকে অমৃতরূপে জানিয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সীমা নাই—তাহার আদর্শকে শুদ্ধমাত্র বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে বিচার করা চলিবেনা। মানুষ কেবলমাত্র সংসারের জীব নয়; সে অনন্তেরও সন্তান। তাই তাহার উন্নতি শুধু যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নয়—ক্রমবিকাশের অগ্রগতি নয়; তাহা এক উদার আদর্শে মহিমান্বিত ও বৃহৎ মহত্বে গরিমামণ্ডিত!

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন গুপ্ত

মাধবী।

(সম্মিলন সংখ্যা)

প্রথম বর্ষ, । চৈত্র, ১৩২৯ ৭ম সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

নিয়মাবলী

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৷৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম প্রতি মাসে	১০৲ টাকা	
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি মাসে		২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কেনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু এম, এ ; এফ, আর, জি, সি ; মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ও শাখা সাহিত্য পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
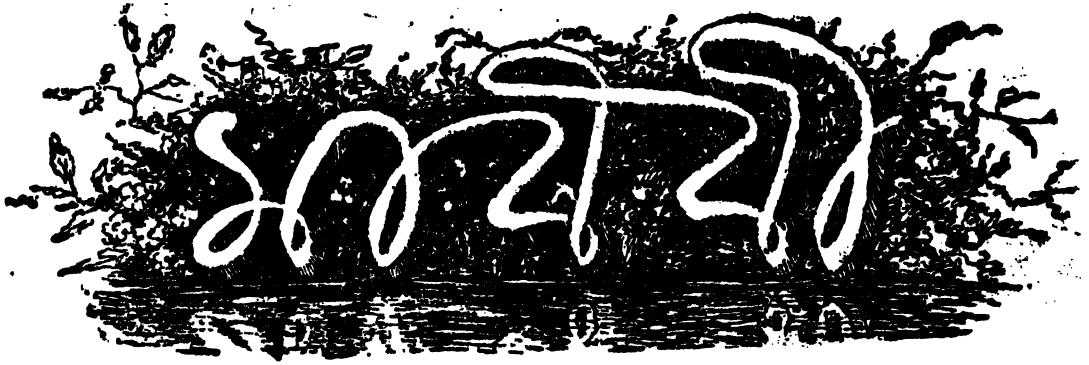
১ম বর্ষ, } চৈত্র, ১৩২৯। { ৭ম সংখ্যা।

বাণী স্তোত্র।

আম্রের তরু ছায়
পঞ্চমে পিক যেই
ডাক্‌ল,
বিশ্বের দরজায়
তোর যে মা রূপ সেই
জাগ্‌ল।
মুকুলের মর্ম্মটি
উদ্‌ঘাটি পুলকের
আলোকে,
স্বর্গের পথ বেয়ে
নেমে এলি সজ্জিত
ভূলোকে ;
কুঞ্জের বুকে ঢেলে
হাসি তোর নিঃশেষে
গোপনে,

পদ্মের দলে এসে
দাঁড়ালি মা মর্ত্ত্যের
তোরণে।
গুঞ্জন মধুপের
ঝঙ্কারি কোন্ বীনা-
যন্ত্রে,
জগালি মা সুপ্তের
মূর্চ্ছিত হিয়াখানি
মন্ত্রে।
অর্ঘ্যের পাত্রটি
পূর্ণ যে ভক্তির
প্রসূনে,
অর্পিনু পদে তোর
উচ্ছ্বসি অনুরাগ-
অরুণে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।*

সমাগত সজ্জনবৃন্দ!

অতীতের গৌরবমাখা স্মৃতির শ্মশানভূমিতে দাঁড়াইয়া আজ শাখা-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি—এহি এহি স্বাগতম্! বিদ্বজ্জনসমাজের ধারক ও বাহক আপনারা! আপনারাই আমাদের এই সারস্বত-যজ্ঞের গৌরব—আমাদের নিরাশ জীবনের শ্লাঘা, আমাদের নিপীড়িত চিত্তের সান্ত্বনা—আমাদের অবসন্ন হৃদয়ের অবলম্বন। আপনাদের আগমনে আজ আমরা সম্বৎসরের পুঞ্জীভূত গ্লানি বেদনা ও ব্যর্থতা ভুলিয়া, নবীন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত। রিক্ত আমরা, কাঙ্গাল আমরা, অভ্যাগত আপনাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া আবাহন করিবার সামর্থ্য বা উপচার আমাদের নাই। সে পঞ্চপ্রদীপ নাই—সে ঘৃত কর্পূর বা অলক্তক নাই—সে পবিত্র শঙ্খ ও কুসুমহার নাই—সে চন্দন তিলক বা লাজ হোমের আজ্যটীকা নাই! দেশের অধিকাংশ নরনারী আজ অন্নহীন বস্ত্রহীন! তাহার উপর আবার ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও বিসূচিকা প্রভৃতি করাল কৃতান্তের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠর নির্ধন বিবস্ত্র নরনারীকে দলে দলে নির্দয় ভাবে আপনার কবলগত করিতেছে! অভাবের এই ব্যাকুল ক্রন্দনের মাঝে মায়ের পূজারী আপনারা আপনাদের যথাযোগ্য উপচারে বরণ করিয়া লইব সে শক্তি আমাদের কই! কিন্তু তবু ডাকিতেছি—এহি এহি স্বাগতম্! আসুন চিরবাঞ্ছিত অতিথিগণ! বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ উপাসকবৃন্দ! দরিদ্র হইলেও দেশের ও দশের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বিদুরের খুদের মত অতিথি নারায়ণ আপনাদের হাতে তুলিয়া দিব। সে ভিক্ষায় আমাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অস্বস্তি নাই; কেননা আপনারা যে আমাদের অতিথি—আবার শুধু অতিথি নহেন—আমাদের স্নেহময়ী জননী বীণাপাণির ভক্ত সন্তান, আমাদের একান্ত আপন, অন্তরঙ্গ ও অন্তরতম। আপনাদের সেবার জন্য ভিক্ষা করিব সে ত আমাদের অতি বড় সৌভাগ্যের কথা।

আমরা বড় দুঃখী বড় নিঃসম্বল বটে; কিন্তু এই গ্লানি ও অবসাদমাখা বর্ত্তমানের নিদারুণ দীর্ঘশ্বাসের মাঝেও অতীতের গৌরববাহিনী স্মৃতিবাণী আমাদের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করে—আমাদের দুঃখের পঙ্কিল সায়রেও সুখের কনক কমল ফুটাইয়া তোলে। বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগতের সংযোগ সেতু। এই অতীতকে যথার্থ বুঝিলে ও চিনিলে আমরা বর্ত্তমানকে রূপান্তরিত করিতে পারি এবং আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতে পারি। আমাদের জন্মভূমি মেদিনী মাতার অতীত চিরদিনই গৌরবসমুজ্জ্বল। আজিকার এই নিদারুণ দুঃখের অসহ অস্বস্তির মাঝে সেই গৌরবমাখা পুণ্য স্মৃতিই আমাদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র অবলম্বন। মা আমার কত যে বীর ও ধার্ম্মিক, সাধক ও ভক্ত, কবি ও প্রতিভাবান সন্তানের প্রসূতি তাহা কে নির্ণয় করিবে? পুরাণপ্রসিদ্ধা কপিশা কংসাবতী মায়ের বক্ষোবাহিনী। জননীর পশ্চিমাঞ্চল বেড়িয়া পুরাণোক্ত সুবর্ণরেখা প্রবহমানা। হিন্দু, বৌদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টান চারি জাতিই মায়ের অঙ্কে সখ্যসূত্রে বিরাজমান। আজিও কত মন্দির, দেবালয় ও মঠ, কত প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি, কত মসজিদ ও আস্তানা, কত গির্জ্জা ও ভজনালয় অতীতের সেই স্মৃতি বুকে করিয়া ধীরে ধীরে কালের

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য

কুক্ষিগত হইতেছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের মন্দির আজিও ভক্তির কাছে শৌর্য্যের হীনতার সমুজ্জল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কান পাতিয়া শুনুন এখনও এই মেদিনীপুরের পথ দিয়া শ্রীক্ষেত্র-যাত্রী হরিনামমূর্ত্তি পরমপ্রেমিক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নৃত্যমুখর চরণের মঞ্জীর রব শুনিতে পাইবেন। যে দেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত অর্জ্জুনের শুভাগমনে ধন্য—যে দেশ প্রেমের ঠাকুর দয়াল গোরাচাঁদের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র, যাহার হাটে মাঠে, আকাশে বাতাসে কত না দেব দেবীর বিচিত্র-উৎসব বারতা—কত না বীরের জয়-পরাজয়-কাহিনী—কত না সিদ্ধ সাধকের অলৌকিক সাধনার ইতিহাস আজিও ধ্বনিত হইতেছে সে দেশের অতীত গৌরবের পরিচয় আজ নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলিতে চাহি সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে সাহিত্যে, আমাদের এই স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির অতীত জীবন একদিন মহাকালের বক্ষে যে যে উজ্জল রেখাপাত করিয়াছিল; নিয়তির কঠোর বিধানে আজ তাহা একে একে লুপ্ত হইতে বসিলেও এখনও দেশের প্রাণ সেই পুরাতন স্মৃতিকে বক্ষে জড়াইয়া নবভাবে নব ছন্দে নব সুরে বাজিয়া উঠিবার নিমিত্ত ব্যাকুল প্রতীক্ষা করিতেছে। জীবনের যে ধারা একদিন শুকাইয়া গিয়াছিল—যাহার সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান সুধা স্রোতে চড়া পড়িয়াছিল—যাহার সমুহ সত্তা প্রাণহীন কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—জীবনমরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া আজ তাহারই যেন সজীব ও সজাগ হইবার নিমিত্ত তীব্র পিয়াসা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের এই ব্যাকুলতা ও পিয়াসাকে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে বরণ করিয়া লইয়া আজ তাই আমরা এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায়তায় অতীতের আলোকে ভবিষ্যতের গভীর তমসাবৃত পথ আলোকিত করিতে চাহি। আসুন সারস্বত যজ্ঞের সিদ্ধ সেবকগণ! আমাদের আজিকার এই শুভানুষ্ঠান সার্থক করিয়া তুলুন—আমাদের সেই পবিত্র লক্ষ্য সাধনের সহায় হউন—আমাদিগকে ভাষাজননীর উদ্বোধন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া দিন।

এই পবিত্র মিলন-মণ্ডপে দাঁড়াইয়া আজ একবার প্রত্যেককে আমি এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করিতেছি। লক্ষ্য করিলে দেখিবেন এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে সংহতি শক্তির একটা দিব্য বিকাশ লুকাইয়া আছে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ফলে এরূপ অনুষ্ঠানের সেবকবৃন্দের চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে এক দিব্য সংহতি শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তা-শক্তি বা কর্ম্মশক্তি সিদ্ধি লাভের অন্তরায়। প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে এই সংহতি শক্তির জয় আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। প্রাচীন ভারত এই সংহতি শক্তি বলে একদিন আদর্শ ভারতরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মনস্বী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রাচীন ভারতে লোকে গোষ্ঠিবিহার করিত। নগরবাসিদের সকল কাজের মধ্যে গোষ্ঠীতে যাওয়া একটা কাজ ছিল; তা আবার যখন তখন নয়, প্রত্যহ। সহরের লোকের দেখাদেখি গ্রামের লোকেরাও গোষ্ঠী তৈরী করিতে ছাড়ে নাই। এই সমস্ত গোষ্ঠীর উপর নজর রাখিতেন ঋষিরা। দয়কার মত দু'চারটা কঠোর নীতিও তাঁহারা চালাইতেন। ঋগ্বেদের যুগে ঠিক এই রকমই একটা অনুষ্ঠান ছিল। তবে তাকে গোষ্ঠী না বলিয়া সভা বলা হইত। সভায় অনেক কাজের কথা হইত। গরু ও চাষের উন্নতি লইয়া আলোচনা হইত। পাশা খেলাও হইত। বাজী রাখিয়া খেলাও চলিত। সভার খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকে ফতুরও হইত। তবে যাহারা পাশা খেলিত তাহা-দের উপর লোকে খুসী ছিল না। সভায় তর্ক যুদ্ধ হইত, কবির লড়াই হইত। মাঝে মাঝে কাব্যকলার আলোচনার জন্য অধিবেশনও হইত। রচনাকুশল তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কারও দেওয়া হইত। ইহাদেরই নাম হইত 'সভ্য'। এই সভাগুলি দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সময় সময় বিচারালয়ের কাজও হইত। ধর্ম্মনীতি ও সমাজরক্ষার কাজও হইত। রাস্তা ঘাট তৈরী করা,

এগুলি যাহাতে খারাপ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা এই সভার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। নগরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও অসুবিধা নিবারণের জন্য সভার চেষ্টা বড় কম ছিল না। নগরে বা গ্রামে খানা, ডোবা যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তাহার জন্য এই সকল সভায় আলোচনা হইত। নগরের জল নিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত। এই সভাই পরযুগে 'সমাজে' পরিণত হয়। নাম পৃথক হইলেও ইহার কাজও সভার অনুরূপ ছিল। সমাজও এই রকম দেশের উন্নতিবিধায়ক ছিল।" বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি আজিকার যুগে যেমন বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন সঙ্ঘের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রাচীন ভারতে সেগুলি এক গোষ্ঠীবিগ্রহেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু কালে সকলই যখন বদল হয়, তখন সঙ্ঘের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য লইয়া আক্ষেপ করা সমীচীন নহে। বরঞ্চ উদ্দেশ্য ভেদে যত প্রকার বিচিত্র প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন, দেশে হিত-সাধনই সকলের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া বিধেয়। মত ও পথ লইয়া বিবাদের দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার দিন। সাম্যের ও মৈত্রীর সাধনায় আজ আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; যিনি যে উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ হউন না কেন, দেশের প্রকৃত হিতসাধনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সাম্য ও মৈত্রীর পথে চলিতে হইবে। ধর্ম্মে ও সমাজে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে, কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যে, সর্ব্বত্রই এই ভাবে সঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদিগকে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় দূর করিতে হইবে। আজ আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, শিক্ষাভাব, হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন। সকল সমস্যা সমাধানের মূল উপায় চরিত্র গঠন। জাতির চরিত্র গঠনের আগে ব্যক্তির চরিত্র গড়িয়া তোলা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। যে চরিত্র বলে আজ বিজেতার জাতি বিজয়লক্ষ্মীকে করতলগত করিতেছেন, উদ্যম, সৎসাহস আত্মনির্ভরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা অথচ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কা[illegible] ইহাই জাতির মূল ভিত্তি-স্বরূপ। আমাদের প্রধান অন্তরায় আমাদের চরিত্র বলের অভাব। জীবন সংগ্রামে এই অভাব হেতু আমরা প্রতি পদে নিষ্ফলতাকে বরণ করিয়া লইয়া নিয়তির দোষই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। সঙ্ঘ, সমাজ বা সম্মিলনে বহুবিধ সদ্‌গুণ লাভের অবসর ঘটে। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের ইহাই সার্থকতা।

দেশের এই সারস্বত অনুষ্ঠানটীর মধ্যে তাই আমি জাতীয় ভবিষ্যৎ কল্যাণের বীজসমূহ প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। সাহিত্য কি? সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। জাতির সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, আনন্দ-বেদনার চিত্র—তাহার সংসার, সংগ্রামে জয় পরাজয়ের ছবিই সাহিত্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। আমাদের জাতীয় জীবনে যে নবভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহার ফলে সমাজের জাতীয় সাহিত্যধারার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

ভাগ্যবিধাতার করুণাবলে জাতি আজ জাগিতে সুরু করিয়াছে সাহিত্যেও নূতন প্রেরণা আসিয়াছে। আসুন বাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ! আপনাদের লেখনী মুখে এই প্রেরণা সুস্পষ্ট করিয়া তুলুন—জাতির মঙ্গল হইবে—আপনারা ধন্য হইবেন—আপনাদের লেখনীও সার্থক হইবে।

সাহিত্য যখন শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া সমাজ, বা দেশের কল্যাণ সাধন করে তখনই তাহা সার্থক হইয়া উঠে। যাঁহারা কল্পনার রাজ্য হইতে সাহিত্যকে বাস্তব রাজ্যে নামাইয়া আনিতে একান্ত নারাজ, তাঁহারা সাহিত্যের সার্থকতা স্বীকার না করিলেও স্মরণ রাখিবেন যে আমাদের দেশে বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যদেব একদিন সমাজের গুরু হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য দেশেও Carlyle, Ruskin, ও Tolstoy সমাজের শিক্ষা দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার। সাহিত্য সাধনায় দেশের সেবাকে মঙ্গলের আসনে, ধর্ম্মের আসনে, সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন আমরা দেশমাতৃকার দুঃখদৈন্য দূর করিতে পারিব সেইদিন আমাদের সেই সাধনা সার্থক হইবে। সাহিত্যসম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--"যে লেখনী দরিদ্রের হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন প্রকাশ না করে সে লেখনীর ধ্বংস হউক।" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন—

——সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে,
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে—
শুধু মুহূর্ত্তের তরে দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে উঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি ; তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

এইখানেই সাহিত্যের প্রাণ—এইখানেই তাহার সাধনের সার্থকতা। এই সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের সাহিত্যজীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রয়াসে আজ দীর্ঘ নয় বৎসর কাল আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োগ করিয়া আসিতেছি। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস, যে বাঁশী একদিন দেশকে জাগাইয়াছিল—যাহার সুর দেশের সুখ দুঃখে জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন মরণের প্রাণ হইয়াছিল—সেই বাঁশী আবার বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিবে। নূতন ছাঁদে নূতন ভঙ্গীতে গগনে পবনে তাহার মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইব। নিত্যই নূতন সেই মূর্চ্ছনার সঞ্জীবনমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা আপনাকে চিনিব—আমাদের সমাজ, জাতি ও দেশকে বুঝিয়া লইব; আর—

গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইব ঊর্দ্ধপানে—
ভাষারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।

আমাদের এ আশা এখন হয়ত দুরাশা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে—কিন্তু ইহা কল্পনা নহে ; সত্যসত্যই—"আসিবে সেদিন আসিবে"—যেদিন এই বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় শুধু এক অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে না—পরন্তু সমগ্র ভারত বঙ্গবাণীর জ্ঞানামৃত বিতরণের সদাব্রতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে এবং বৌদ্ধযুগে যেমন জগৎ ও ভারতের ভাব সংঘর্ষে এক অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসম্মিলনে তেমনি আমাদের বঙ্গবাণী একদিন রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে শুধু আমাদের মাতা নহে—জগতের মাতা বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

হে ঋত্বিকবৃন্দ! ভবিষ্যের এই স্বপ্ন-তরণী আজ আপনাদের করুণায় আশা ও আনন্দের পণ্যসম্ভার লইয়া আমাদের হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। আপনাদের সৌজন্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের ধারায় স্নাত ও শুচি হইয়া মাতৃপূজায় বসিব এ উল্লাস আজ আর তাই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। উল্লাসোদ্বেল হৃদয়ে তাই আবার এ মিলনে সকলকে আহ্বান করিতেছি। এ মিলন ত শুধু বাহিরের নহে—এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক বিচিত্র সমন্বয়! রূপে, রসে, গন্ধে শব্দে ও স্পর্শে যাঁহার নিত্য বিলাস চলিয়াছে, সেই নিখিলরসামৃতসিন্ধু যে আজ স্বয়ং নব নব রূপে বিলাস করিয়া আমাদিগকে প্রেমের মিলন-ভূমিতে এক করিয়া দিয়াছেন। আজ তাই সেই প্রেম চিন্তামণির চরণে প্রার্থনা করিতেছি—আপনাদের আগমনে দেশের সাহিত্য জীবন বল সঞ্চয় করুক—তাহার পূর্ব্ব বিভব ও গৌরব আবার ফুটিয়া উঠুক—এবং আমাদের বড় সাধের এই অনুষ্ঠানটী সত্য সুন্দর ও সার্থক হইয়া দেশবাসীকে তাহার জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে শক্তিমান্ ও সাহসী করিয়া তুলুক।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন, হে অতিথিবৃন্দ! প্রসন্নমনে আমাদের সকল ত্রুটি ও অক্ষমতা মার্জ্জনা করুন। বৎসরান্তে আবার এমনি দেবতার বেশে আসিয়া দীনের পর্ণ-কুটীর আলোকিত করুন। বাণীর কৃপায় আমরা যেন আবার আপনাদের সেবা ও সাহচর্য্য করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

অভ্যর্থনা সঙ্গীত।

নন্দন হ'তে স্বরগ সুষমা মর্ত্ত্যে এসেছে নামিয়া,
যুগের শঙ্খ মধুর মন্দ্রে উঠেছে নিখিলে বাজিয়া
কনকোজ্জল প্রভাতের রবি,
স্মরণে আনিছে অতীতের ছবি,
হিম যামিনীর বিদায়ের গীতি ভাসে সমীরণে কাঁপিয়া।

নির্ম্মল নব কিশলয়ে ভরা পুষ্পিত বনকুঞ্জে
এস গো বাণীর কাননচারণ! হর্ষ-মধুপ-গুঞ্জে,
তোমরা পূজারি, তোমরা সাধক
ভক্ত, ভাবুক, ওগো! উপাসক!
তোমাদের জয় যশোসৌরভ উঠুক মেদিনী ছাপিয়া।

প্রীতির প্রসাদে ঘুচায়ে জড়তা লয়ে চল চির লক্ষ্যে,
আশার আলোক উঠুক ভাতিয়া নিরাশ-মথিত বক্ষে,
দীর্ঘ দিনের বিরহের শেষে,
এসেছ বন্ধু অতিথির বেশে,
লহ গো প্রণতি, ক্ষমা কর ত্রুটি, স্নেহের নয়নে চাহিয়া।

শ্রীব্রজমাধব রায়।

উদ্বোধন।

ভদ্র মহোদয়গণ,

আজকার এই পবিত্র অনুষ্ঠান—মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করিবার ভার—এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার মত সাহিত্যরসহীনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। ভার যখন অবনত মস্তকে লইতে স্বীকৃত হইয়াছি, তখন সভার রীতি অনুসারে আমাকে দুই এক কথা বলিয়া এই শুভ কার্য্যটি আরম্ভ করিতেই হইবে। ভরসা এই যে আপনারা সকলেই সাহিত্যরসিক, সুতরাং অযোগ্য আমার কোন ত্রুটী ঘটিলে, আপনারা নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

যে সাহিত্য পরিষৎটি আজ এই জেলার সম্মিলন আহ্বান করিয়াছেন, তাহার আজ নামে দশম বার্ষিক উৎসব হইলেও কার্য্যতঃ তাহার প্রতিষ্ঠা ১৩১৮ সালে। নীরবে বৎসর দুই কাজ করিবার পর গত বৎসর এই সাহিত্য সম্মিলনের বৈঠক খুব জমকাল রকমেই হইয়াছিল ও নানাদিক হইতে সাহিত্যিকগণ সমবেত হওয়ায় এই পুরাতন মেদিনীপুর সহর সেই সময় পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল

দেশের এই হিতকর অনুষ্ঠানটির মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু এই যে এটির সঙ্গে দেশের সব শ্রেণীর

লোকের একটি আন্তরিক সম্বন্ধ নাড়ির টান রহিয়াছে। রাজা, জমিদার, জজ, সবজজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ও উকিল মোক্তার, তা' ছাড়া ডাক্তার, কবিরাজ, কেরাণী, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেরই ইহার প্রতি সহানুভূতি বর্ত্তমান। দেশের এই সহানুভূতি ও অনুরাগ জাগিয়া থাকিলে এই সাহিত্য পরিষৎ যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। বাস্তবিক বলিতে কি সকল শ্রেণীর লোকের মিলনের এমন একটা স্থান আর দ্বিতীয় নাই। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দেশের অনেক হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার হইতেছে। আবার শুধু তাহাই নহে, ইহারই মধ্য দিয়া যে একদল লেখক গড়িয়া উঠিতেছে, তা'র পরিচয় এই পরিষদের "মাধবী" নামে মাসিক পত্র খানার পাতা উল্টাইলেই জ্ঞাত হইবেন।

বার্ষিক উৎসবে এঁরা এক এক বৎসর জ্ঞানের এক এক বিভাগের বিখ্যাত পণ্ডিতকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া থাকেন। এবার বিজ্ঞানের পালা। বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার যে একটু আধটু পরিচয় আছে, তাহা নেহাৎ তৎসামান্য হইলেও, আজ যাঁহাকে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি বহুদিন হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি ও তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমবেত অনেকেই হয় ত মনে করিতেছেন যে এত বড় বৈজ্ঞানিক যখন সভাপতি তখন বিভীষিকাময় কঠোর ভাষা শ্রবণে এখনই প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে ও বসিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিবে। সেইজন্য একটি কথা আপনাদের অজানা না থাকিলেও একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালার খ্যাতনামা মনস্বী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের নামটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইলেও সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার "বিলাতের পত্র" পুস্তকখানিই ইহার যথেষ্ট সাক্ষী। আজিকার এই সভায় তাঁহার অনেক ছাত্রও উপস্থিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার এ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। সুতরাং এবারকার এই অধিবেশন তাঁহার প্রতিভায় যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রয়াগ তীর্থ হইবে তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র সংশয় নাই।

যখন এমন আশা রাখি, আমার এই নীরস উদ্বোধন এইখানেই শেষ করা বিধেয়, নচেৎ আপনাদের সেই তীর্থে অবগাহন স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভের বিলম্ব ঘটিবে। আপনারা সকলে মিলিয়া এই শুভানুষ্ঠান সার্থক করিয়া তুলুন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়।

বাণী বোধন।

জননি আজি ধরিয়া তোল হাত
ঠেলোনা পদে ঠেলোনা, কর
করুণ আঁখি পাত।
নিরাশা-হত কাতর প্রাণে,
আঁধারে ঘন আলোক দানে,
আকুল-করা মধুর তানে,
টানিয়া লহ সাথ;
ঠেলোনা পদে ঠেলোনা, কর
করুণ আঁখি পাত।

আজি এ মধু মাধবী প্রাতে
বেদনা ভরা প্রাণ,
গাহিতে চাহে কোকিল সাথে
তোমারি জয় গান;
বসিয়া তব চরণ তলে,
ধোয়াব তারে নয়ন জলে,
সাজাব তোমা কুসুম দলে
জাগিয়া দিবারাত,
ঠেলোনা পদে ঠেলোনা, কর
করুণ আঁখি পাত।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সভাপতির অভিভাষণ।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনীর দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আপনারা আমাকে সবিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমার ভাগ্যে এরূপ সম্মান বড় একটা ঘটে না। আমি বাড়ীতে পড়ি ও বাহিরে পড়াই, কি গুণ দেখিয়া আমাকে এই সাহিত্যিক মণ্ডলীর মাঝে টানিয়া আনিয়াছেন বলিতে পারি না। ছাগল দিয়া যব মাড়াইবার চেষ্টা, পঙ্গুর দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাইবার অভিলাষ, অনধিকারীকে দিয়া অধিকারীর স্বত্ব লোপ করিবার উদ্যম, কি সমীচীন হইয়াছে? যাঁহারা বক্তৃতা-স্রোতে শ্রোতৃবর্গকে ভাসাইয়া দিতে পারেন, প্রভূত পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণায় অভিভাষণ পূর্ণ করিতে জানেন, কথায় লোক মাতাইয়া সভামণ্ডলে করতালির উপর করতালির ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির করকা-বৃষ্টি-সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যাঁহারা আসর জমাইতে সিদ্ধহস্ত, সেরূপ এক জন গণ্যমান্য নামজাদা লোককে না আহ্বান করিয়া, এক নগণ্য "গুরুমশাই"কে ধরিয়া আনিয়াছেন। আপনাদের যেমন কর্ম্ম, সেইরূপ ফলের আশা করিবেন।

সংসারে প্রবেশাবধি শিক্ষা ও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে আজ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ও জড়িত রহিয়াছি। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার জন্ম না হউক অভ্যুত্থান দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, বিজ্ঞানের অঙ্কুরে জল সেচন করিয়াছি ও করিতেছি। সেই ভাষা ও বিজ্ঞানের দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিব মনে করিয়া আসিয়াছি। বক্তৃতা শিল্পে অনভ্যস্ত,

বক্তৃতার সহিত আমার চিরবিরোধ, রচনাকৌশল কখন শিখি নাই, ফেনাইয়া ফেনাইয়া বক্তব্যের বহর বাড়াইতে পারি না, কাজেই অভিভাষণ যাহাকে বলে, তাহা আমার নিকট পাইবেন না। মোটা কথা, মোটা ভাষায় বলিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাষার আকারপ্রকার ও ভাব-ভঙ্গি এবং সাহিত্যের কলেবর ও অঙ্গ সৌষ্ঠব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এতদুভয়ের আধুনিক শ্রীবৃদ্ধির মূল কেরী মার্শমেন-প্রমুখ ইংরেজ মিশনারি ও আমাদের বাস্থ ধন রাজা রামমোহন রায়। তাঁহারা ভাষা ও সাহিত্য উত্থানের অবতারস্বরূপ এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং শত বিঘ্ন শত ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, জীবন-পণ করিয়া, অকাতরে অপরিসীম অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির যে পথ খুলিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহাদের নিকট চির ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। মুদ্রাযন্ত্রের সহিত ভাষাসাহিত্যের কি ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাহা আজিকার দিনে আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হয় নাই। মিশনারিরাই সাহিত্যের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং আধুনিক গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেরী-প্রণীত অভিধান ও ব্যাকরণ সাহিত্যিক মাত্রেরই গৃহে গৃহে ও সাধারণ পুস্তকালয় সমূহে রক্ষিত হইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। লোকশিক্ষার প্রবল সহায়, ভাষাগঠনের প্রধান অবলম্বন, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলাধার, সংবাদ ও সাময়িক পত্রও এই সময়েই মাথা তুলিয়া উঠে। প্রথিতনামা পণ্ডিত ও আভিধানিক রামকমল সেন আপন অভিধানের মুখবন্ধে কেরী প্রভৃতি পাদরির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengali language, its improvement and in fact the establishment of it as a language, must be attributed to that excellent man, Dr. Carey and his colleagues, by whose liberality, and great exertions many works have been carried through the press, and the general tone of the language of this province has been so greatly raised."

নূতন পথে চালিত হইয়া, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্য পাইয়া, ভাষা সাহিত্য যখন নবকলেবর ধারণ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। ইতিপূর্ব্বে এক শ্রেণীর লোক সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার পক্ষপাতী ও আর এক শ্রেণীর লোক ইংরেজী ভাষাশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাঙ্গালার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর অবশেষে শেষোক্ত দলেরই জয় হয়, ইংরেজীরই প্রাধান্য স্থিরীকৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও ইংরেজীর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া তাহার প্রসার আরও বাড়াইয়া দিল। স্কুল কলেজে ইংরেজীর চর্চ্চা ও বহুল প্রচার আরম্ভ হইল, সকল বিষয়ই ইংরেজীতে অধীত ও অধ্যাপিত হইতে লাগিল, ইংরেজীরই ওড়ন পাড়ন হইল, ইংরেজীই বাঙ্গালীর জপমালা হইল, মাতৃভাষা কোণ-চাপা হইয়া একঘরে হইয়া পড়িল। লেখকের পঠদ্দশায় বাড়ীর বাহিরে বাঙ্গালায় কথা বলা, বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লেখা, বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা, বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করা, (জানি না বাঙ্গালায় স্বপ্ন দেখা কি না) লজ্জার কথা ছিল, পাড়াগেঁয়ে ভূতের লক্ষণ ছিল। বাপ, খুড়া, জেঠাকেও "মাই ডিয়ারিং" করা ফ্যাশন ছিল, ইংরেজী বুক্‌নিতে অনাবিল দিশী মাতাপিতা, ভাইভগ্নী, পাড়াপ্রতিবেশী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কালে ও তাহার কিছু পূর্ব্বে ইংরেজী-আবেশে আমরা একেবারে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়াছিলাম। কিন্তু যুগমাহাত্ম্যের কি মহিমা, ইংরেজী নেশায় মাতোয়ারা হইলেও, অনতিকাল পরে, এক শ্রেণীর লোক জন্ম গ্রহণ

করিলেন, যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া আত্মবোধ রূপ অমৃতের উদ্ধার করিলেন ও সেই আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। কেরি-মার্শমেন-রামমোহন যেমন ভাষাসাহিত্যের প্রথম অবতার, ইহারা সেইরূপ দ্বিতীয় অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ভাব ভাষা ও সাহিত্যকে এক অভিনব সাজে সজ্জিত করিলেন।

সাহিত্য-ইতিহাসের এই দুই সন্ধির মাঝখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তিনি তখনকার সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা পণ্ডিতী বাঙ্গালা ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্তু সেই ছাঁচে এমন এক অলৌকিক লালিত্য, মনোহারিত্ব, নূতনত্ব ঢালিয়া দিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে কেহ দিতে পারেন নাই, যাহার তুলনা নাই। এখনকার বাঙ্গালায় সেই সংস্কৃত ছাঁচ গলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে অতুলনীয় লালিত্য সম্পদ ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষা চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার লোক। মেদিনীপুরে আসিয়া মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া মেদিনীপুর-গৌরব পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের স্মৃতি ও কীর্ত্তি উল্লেখের অবসর পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিম অবস্থায় "পুরুষ পরীক্ষা" নামক গ্রন্থ বি এ ডিগ্রী পরীক্ষায়, যে সাহিত্যের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সাহিত্য এই যুগান্তরের আবর্ত্তনে পড়িয়া এরূপ উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহা বিশিষ্ট ভাষাশ্রেণীর সহিত একাসনে বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছে, অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। বাঙ্গালার এই গৌরব ও বঙ্গভাষার এই দিগ্বিজয়, উভয়ের মূল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজীরই প্রাধান্য চলিয়াছে, বাঙ্গালার বিশেষ কোন স্থান বা ব্যবস্থা নাই, তথাপি যুগধর্ম্মের গুণে সেই ইংরেজী শিক্ষাই পরোক্ষভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান সহায় হইয়া, উহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়াইয়া দিয়াছে। তাই বলি আজি-কালিকার বঙ্গদেশ, কি ভাব, কি ভাষা, কি সাহিত্য কি সমাজ, কি ধর্ম্ম, কি কর্ম্ম, সকল বিষয়েই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ১৮৫৭ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এই ৬৫ বৎসর মধ্যে ইহা বাঙ্গালাকে বাঙ্গালীত্ব প্রদান করিয়াছে, বঙ্গদেশকে সমগ্র ভারতবর্ষের শীর্ষদেশে তুলিয়া ধরিয়াছে। ইহারই বলে বাঙ্গালী "স্বদেশী" মন্ত্র সকল ভারতবাসীকে শিখাইয়াছে, ইহারই বলে আজ বাঙ্গালা যাহা ভাবে কাল সমগ্র ভারতবাসী তাহা ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, যেখানে যাও সেইখানেই বাঙ্গালী স্বনামে পরিচিত।

কিন্তু সংসারে "কিন্তু"র হাত এড়াইবার জো নাই। চাঁদের "কিন্তু" কলঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের "কিন্তু" ইহার ইংরেজী ছাঁচ। ইহা ইংরেজের কীর্ত্তি, কাজেই ইহার ইংরেজী ছাঁচ। এখন ইংরেজী ছাঁচ বদলাইয়া ইহাকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিতে হইবে, হ্যাট কোট খুলিয়া খদ্দরের ধুতী চাদর পরাইতে হইবে, ইংরেজী বুলি ছাড়াইয়া মায়ের বুলি ধরাইতে হইবে। দেখুন, সভ্যজগতে এমন দেশ নাই, যেখানে বিদ্যালয় সমূহ মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দীক্ষা দেয়, যেথান শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও, পাছে পোড়াকপাল মাতৃভাষা শিখিয়া ফেলে সেই ভয়ে, আপন পুত্রকন্যাকে ইংরেজী, অন্ততঃ হিন্দি বুলি শিখায়। এরূপ বিসদৃশ অস্বাভাবিক অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রহসন বঙ্গদেশেই দৃষ্ট হয়। এই প্রহসনের অভিনয় এখন বন্ধ করিতে হইবে। আশার বিষয় যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আনুকূল্যে আমাদের আত্মবোধ জন্মিয়াছে, আমাদের ভাষা পুষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়াছে। এখন ইংরেজীকে নিম্নস্থান দিয়া বাঙ্গালাকে উচ্চ স্থান দিবার সময় হইয়াছে, স্কুল কলেজে বাঙ্গালার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঙ্গালাই শিক্ষার বাহন হইবে। এই পরিবর্ত্তনে আমাদের ভাবী বংশধরগণ, সময়, চেষ্টা, মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্য-অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, লুপ্ত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইবে, জাগরূক আত্মবোধ আরও জাগিয়া উঠিবে, দেশের শ্রী একেবারে ফিরিয়া যাইবে। সময়ের গতি ও পরিণতির গুণে,

সকলেই বুঝিয়াছেন প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার আবশ্যক। সরকার সেই সংস্কার-কল্পে ইউনিভারসিটি ও হাই-স্কুল-প্রদত্ত শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন শুনা যায়, কিন্তু সাধারণের অবগতির জন্য তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পুরাতন যাইবে ও নূতন হইবে, এই নূতন পুরাতনের সন্ধি স্থান আমাদের প্রকৃত অভাব ও প্রকৃত স্বভাব বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের গোচর আনিতে হইবে। ইংরেজী পড়িয়া শিখিয়াছি সভাসমিতি, মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্রই লোকের মুখ ও লেখনী। সেই মুখ ও লেখনী প্রয়োগে সকলের প্রকৃত মনোভাব সত্বরে প্রকাশ করিতে হইবে। বিধির বিধানে আমাদের রাজা বিদেশী, ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্বেও আমাদের প্রকৃত ভাব ও অভাব অনবগত. চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হউন। সর্ব্ববাদী আন্দোলনের প্রভাব, সমগ্র দেশবাসীর সমবেত স্বর, ব্যর্থ হইবার নহে, কোন দেশে কোন কালে ব্যর্থ হয় নাই, এদেশে ও কাজেও ব্যর্থ হইবে না। ইউনিভারসিটি ও হাইস্কুলের নববিধানের সহিত সমগ্র বঙ্গদেশের হিতাহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। আসুন আমরা জাতি ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ পশ্চাতে রাখিয়া এক যোগে, এক মনে, এক প্রাণে প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষা-প্রণালীর আইন দেশের উপযোগী করিবার চেষ্টা করি। ইউনিভারসিটি ও হাইস্কুল এমন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে ইহা আমাদের নিজস্ব ধন হইবে, যাহাতে শিক্ষার উজ্জ্বল মুখ আরও উজ্জ্বল হইবে।

বর্ত্তমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের গুণাগুণ, প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর ফলাফল, শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার ও সংস্কার কল্পে নূতন আইনের খসড়া রচনা প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিতে গিয়া গোড়ার যে বিজ্ঞানাঙ্কুরে জল সেচনের কথা বলিয়াছি তাহা ভুলি নাই। ১৮৭০ সালের আগে স্কুল কালেজে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়, শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য মুখাই ছিল। ছোটলাট কাম্বেলের সময় বিজ্ঞানবীজ কোনরূপে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে প্রথম পাতিত হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্র ও অনুকূল বাতাস পাইয়া, বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হয়। আমি সেই সময়ের লোক, কাঠ-বিড়ালী যেমন সেতু বন্ধনে সাহায্য করিয়াছিল, সেই সময়ের লোক ক্ষীণবল হইলেও অঙ্কুরে জল সেচন করিয়া তাহার লালন পালন করিয়াছিল ও এখনও করিতেছে। পরে ১৯০৪ সালে বড়লাট কর্জ্জনের আমলে সেই অঙ্কুরে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়, তাহার ফলে অঙ্কুর এখন পল্লব মণ্ডিত বৃক্ষ পরিণত হইয়াছে। বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়েতর স্থানে বিজ্ঞান কলার বিশিষ্ট আলোচন হইতেছে, যন্ত্রসম্ভারের আয়োজন ও প্রয়োজন চলিয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্র সমূহ লোক সমাজে বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতেছে, পাঠ-শালা ও বাঙ্গালা স্কুলেও বিজ্ঞান প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এই পল্লব মণ্ডিত বৃক্ষে আজও ফুলফল সম্ভারের বিশিষ্ট চিহ্ন দেখা দেয় নাই। সেই ফুলফল পাইতে হইলে, বিজ্ঞানকে কার্য্যকরী করিতে হইবে, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে শিল্পে প্রযুক্ত করিতে হইবে। দেখ, সেই অভাবে আজ বিদেশী তাঁতি আমাদের তুলা লইয়া বহিয়া স্বদেশে কাপড় বুনিয়া আমাদের দেশে ফেরত পাঠাইয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, আমাদের পশম লইয়া গাত্র বস্ত্র বুনিয়া আমাদের শীত নিবারণ করিতেছে বিদেশী চর্ম্মকার সেই এক প্রথা অবলম্বন করিয়া আমাদের পাদুকা যোগাইতেছে। বিদেশী চটওয়ালা আমাদের পাট লইয়া কলে ফেলিয়া কেবল আমাদের নহে পৃথিবীর চট ও বস্তা যোগাইতেছে। যে পাট আমাদের বাঙ্গলা দেশের নিজস্ব পৃথিবীর আর কোথাও জন্মে না, তাহার এই দশা। বিদেশী ছাতা-ওয়ালা ছাতা দিয়া আমাদের মাথা রাখিতেছে, বিদেশী নুন দেশী নুনকে দেশছাড়া করিয়াছে, বাঙ্গলার রত্ন কয়লাপাথর বিদেশে অগ্নিযোগ করিতেছে, আর আমরা অগ্নিবিনা ভাত রাঁধিতে পাইতেছি না, নীল বড়ির চাষ ও শিল্প সে দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একচেটিয়া ছিল ও ধনাগমের প্রশস্ত পথ ছিল, আজকাল কার্য্যকারী বিজ্ঞানের হাতে পড়িয়া নীলবড়ি বিদেশী রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়া আভারত পৃথিবীর রঙ যোগাইতেছে, আর ভারতে

নীলের চাষ ও শিল্প উঠ উঠ——আমরা নিস্পন্দ হইয়া হাতপা হারাইয়া, ভঙ্গুর বিদেশী লাঠির উপর ভর দিয়া, হাঁ করিয়া চারিধারে এই দৃশ্য দেখিতেছি। এই দুঃখ, বিষাদ, ও আক্ষেপের কাহিনী আর কত বলিব! আমাদের নোড়া ও আমাদের শিল দিয়াই আমাদের দাঁত-ভাঙ্গা চলিয়াছে। দুঃখের এই জ্বলন্ত ছবি, জ্বলন্ত অঙ্গার শলাকা দ্বারা আমার মর্ম্মস্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে, বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে দেখাইতাম!

যাহাতে বিজ্ঞানের সহিত শিল্পের যোজনা হইয়া লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার ও নূতন শিল্পের অবতারণা ও আবিষ্কার হয়, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। একটা ইংরেজী কথা আছে "গরম থাকিতে থাকিতে লৌহকে পিটাইবে", একটা বাঙ্গলা কথাও আছে "যে মাটীতে বানর গড়ে সেই মাটীতেই শিব গড়ে"! শিক্ষা সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, গরম থাকিতে থাকিতে উহাকে এমন ভাবে পিটাইতে হইবে, যাহাতে বানর না গড়িয়া শিব গড়িয়া উঠে। শিক্ষার নববিধানে যাহাতে শিল্প-কলার বিশিষ্ট স্থান থাকে, তাহা করিতে হইবে।

বিজ্ঞানকে শিল্পকলায় নিযুক্ত করিবার উপায় করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন দেশ-উদ্ধারের উপায় নাই—একথা বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নহে। আপনারা জানেন বঙ্গদেশের অধিবাসী সংখ্যা ৪ কোটী, আর ইহাদের মধ্যে ৩ কোটী কৃষিজীবি, অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে ৭৫ জনের জীবনোপায় কৃষি। জমিরও অভাব নাই। কিন্তু কৃষকের অবস্থা এত হীন যে, দুই বেলা পেটপুরিয়া ভাত জুটে না, বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ হয় না, পানীয় জলের অভাবে দারুণ গ্রীষ্মের সময় হাহাকার রব উঠে। লোকের মুখে শুনি ও খবরের কাগজে পড়ি, কৃষিতে বিজ্ঞানের যোজনা করিলে, বড় বড় লাঙ্গল ও বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিলে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাটীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত সার-প্রয়োগ করিলে, ফসল ও গো মহিষের নূতন নূতন জাতি-সৃষ্টি করিলে, ছোট ছোট জোত ভাঙ্গিয়া বড় বড় জোত প্রস্তুত করিলে, অনতিবিলম্বে কৃষি ও কৃষকের দুঃখ ঘুচিবে, দেশ আবার ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা হইবে। কিন্তু এই যুক্তি আমার কাছে মূষিকের যুক্তি বলিয়া বোধ হয়, আল্লানাস্‌কারের স্বপ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। উক্ত পরামর্শ ঠিক স্বীকার করিয়া লইলেও (আমি ঠিক স্বীকার করি না), পরামর্শ অনুসারে কাজ করে কে? বিড়ালের কণ্ঠে ঘণ্টা বাঁধে কে? আমরা গরিব, আমাদের অন্ন ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ, আমাদের কি সামর্থ্য যে ঐ সকল উপায় কাজে লাগাইতে পারি।

তাই বলি, এ সকল আকাশ কুসুমের কথা ত্যাগ করিয়া, একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণের কথা শুনুন। এক দেশের কথা আমি জানি, যাহা আমাদের দেশের ন্যায় কৃষি-প্রধান এবং যে দেশ আমাদের দেশের ন্যায় ছোট ছোট জোতে বিভক্ত। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা অতি হীন ছিল। কিন্তু এখন সেই কৃষি ও কৃষকের অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে যে, পৃথিবীর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িয়াছে। কি উপায়ে তাহাদের এই উন্নতি হইল? যে মন্ত্র এই অল্প সময় মধ্যে তথায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা এক উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। সেই মস্তিষ্কবান্ পুরুষ আপন গ্রামের অধিবাসীগণকে একত্র ডাকিয়া বুঝাইয়া দেন যে তাহারা গরীব, তাহাদের অনেকের এমন অবস্থা যে বীজ-ক্রয়ের অর্থ পর্য্যাপ্ত নাই, ভূমিকর্ষণের উপযোগী যন্ত্র নাই, ফসল লালনপালনের বিশিষ্ট জ্ঞানও নাই, ফসল পাকিলে অর্থাভাবে সময়ে গৃহজাত হয় না, ফসলের জন্মদাতা ও ভোক্তা উভয়ের মাঝখানে পঙ্গপালের দল জুটিয়া জমির উপসত্বের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, জন্মদাতার অদৃষ্টে এক চতুর্থাংশও মিলে না, আর ভোক্তাকেও চারিগুণ দামে তাহা কিনিতে হয়,—ইহাই তাহাদের সকল অনর্থের মূল। ইহা নিবারণার্থ তিনি স্বগ্রামে সকলে মিলিয়া এক "সহযোগ-সমিতি ও ভাণ্ডার" স্থাপন করেন। প্রত্যেক গ্রামবাসী আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মূলধনের ব্যবস্থা করেন। একা একা যে সকল কাজ করা অসম্ভব ছিল, তাহা সহজসাধ্য হইল। কাহারও ক্ষেত্রে লোকে বা অর্থাভাবে অকর্ষিত

রহিল না. বীজাভাব ঘুচিল, জল ও সারপ্রয়োগের কষ্ট রহিল না, ফসল সময়মত কাটা হইতে লাগিল, ফসলের জন্মদাতা ও ভোক্তা উভয়ের একত্র সমাবেশ ও ঘনিষ্ঠতা হইল, মধ্যবর্ত্তী পঙ্গপাল দলের কোথায় অন্তর্ধান হইল, উপসত্বের ষোল আনা কৃষক পাইল, ভোক্তাগণ অল্প মূল্যে গ্রাসাচ্ছাদনের দ্রব্য সামগ্রী পাইতে লাগিল, দুইদিনে তাহাদের শ্রী ফিরিয়া গেল। এই সহযোগ মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সমগ্র দেশ ইহার মন্ত্রশিষ্য হইল, সহযোগ-সমিতি ও সহযোগ-ভাণ্ডারে দেশ ছাইয়া গেল। ইহারই ফলে বহু কৃষি-শিল্পের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সকল স্কুলে কৃষকের বংশধরগণ অবসরমত, দিনে হউক রাত্রে হউক, শীতঋতুতে হউক গ্রীষ্মঋতুতে হউক, নিজের কাজ সারিয়া, আপন আপন বৃত্তির "কেন" (why) শিখিয়া আসে ও আপন আপন বৃত্তির উন্নতিকল্পে তাহা নিযুক্ত করে। কোন বৃত্তির "কেন" জানাই সেই বৃত্তির উন্নতির মূল।

অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির কথা ছাড়িয়া, কৃষিশিল্প ও কৃষিবৃত্তির উল্লেখ কেন করিলাম, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই, বাঙ্গলা দেশে কৃষিই প্রধান ও প্রথম "ইণ্ডষ্ট্রী", সেজন্য কৃষিকেই সকল ইণ্ডষ্ট্রীর আগে ধরিয়াছি। যে সকল শিল্পদক্ষ জাতি বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থ লালসায় কৃষি ছাড়িয়া অন্য শিল্পের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধের সময় গ্রাসাচ্ছাদন অভাবে কি ঘোরতর কষ্ট পাইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, এখনও সে কষ্টের অবসান হয় নাই। সেই সকল জাতি ঠেকিয়া শিখিয়াছে, গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় যে কৃষিশিল্প, তাহার অবহেলা করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া ধনকুবের হইলেও, দেশের কি দুরবস্থা হয়। তাহারা এখন স্বাবলম্বনের উপায় কৃষিশিল্পের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। আর আমরা, যে শিল্প আমাদের একমাত্র শিল্প, প্রথম শিল্প, ও প্রধান শিল্প তাহার উন্নতিকল্পে নিরুদ্যম। উপরে যে দেশের উদাহরণ দিয়াছি, সেই উদাহরণ অনুসরণ করিয়া, আগে কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। তৎপরে অন্যান্য ইণ্ডষ্ট্রীও সেই সহযোগ প্রথা অবলম্বনে প্রসার লাভ করিবে। তাই বলিয়াছি কৃষি সকল শিল্পের মূল। শিল্প-বৃক্ষের আগায় উঠিতে হইলে, মূল অবলম্বন করিয়া গাছে চড়িতে হইবে।

অবশেষে আমার সানুনয় ও সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, আপনারা অবহিত চিত্তে মাতৃভূমির দৈন্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, আমাদের এই বসুন্ধরাকে ধন-ধান্য পুষ্পে পূর্ণ করুণ, কেবল গানের তানে, পূর্ব্বগৌরবের স্মরণে, হিমালয় হইতে কুমারিকাব্যাপী হিন্দুর পূর্ব্বকীর্ত্তি-ঘোষণে, অথবা কর্ডোভা হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত ইস্‌লামের পূর্ব্ব-স্মৃতি-জাগরণে, দেশ উদ্ধার হইবেনা। দেশ উদ্ধারের পন্থা স্বতন্ত্র। তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ—এই মন্ত্র জপমালা করিয়া ভগবানের নাম লইয়া, সেই পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

বাণী বোধন।

পন্থা তোমার সজ্জিত করে পুষ্পিত নববল্লী,
অঙ্কিল ফুলে শুভ্র তোরণ মঞ্জুল বনমল্লী;
ঝঙ্কারে অলি পঞ্চমে পিক সঙ্গীত গায় কুঞ্জে,
অর্ঘ্য সাজায় স্নিগ্ধ মধুর কুন্দ কানন পুঞ্জে।
মুগ্ধ মাধবী-বিজড়িত-চূত-পল্লবে ধরে ছত্র,
খঞ্জনী নাচে, বাঁশরী বাজায় মর্ম্মর ঝরা পত্র;
কিংশুকে শোভে রক্ত নিশান, বহিয়া মলয়মন্দ
কম্পিত কার পল্লবে নব সঞ্চারে মধু গন্ধ।
এস বীণাপাণি! কল্যাণি! রাণি! সুন্দর এই বঙ্গে,
ধ্বনিয়া উঠুক হৃদয়তন্ত্রী চরণ পরশে রঙ্গে;
ভক্তি কুসুম অঞ্জলি লহ রাগ-চন্দন-লিপ্ত
আশা-চঞ্চল চিত্ত আজিকে কর গো জননী তৃপ্ত।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র দাস গুপ্ত।

ভাষাতত্ত্বের মুখবন্ধ।*

ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে আমরা ভারতের ভাষাগুলির কিঞ্চিৎ আভাষ দিব।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত আর্য্য ভাষা সমুদয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তই তৎকাল প্রচলিত ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল; কাজেই প্রাচীন আর্য্যদিগের ভাষা নির্ণয় করিতে হইলে এই সমস্ত ভাষার প্রকৃতি নিরূপণ নিতান্ত আবশ্যক।

অশোকের রাজত্বকালের খোদিত শিলালিপি এবং বৈয়াকরণ পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে উত্তর ভারতে যে সমস্ত আর্য্যভাষা ব্যবহৃত হইত, সেগুলি বৈদিক সূক্ত সমূহের রচনাকালবর্ত্তী প্রাচীন ভাষা সমুদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে এই ভাষা সমূহের মধ্যে একটী ভাষা হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের বিকাশ হয়।

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে প্রতিনিধি সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে প্রচলিত আর্য্য ভাষাগুলি 'প্রাকৃত' বলিয়া খ্যাত ছিল। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ— যাহা স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতাদোষপরিশূন্য; 'সংস্কৃত' শব্দে মার্জ্জিত বুঝায়। বৈদিক সূক্তগুলি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হইয়াছিল; সুতরাং সেই সময়ের চলিত ভাষাসমূহকে 'প্রাকৃত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেইগুলি প্রথম স্তরের 'প্রাকৃত'। আবার সেইগুলি হইতে যে সমস্ত সংস্কৃত আর্য্য ভাষার বিকাশ হইয়াছিল, তাহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের 'প্রাকৃত' বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত হইতে আধুনিক যে সমস্ত ভাষা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে তৃতীয় স্তরের প্রাকৃত বলা যাইতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের মধ্যে, অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের প্রাকৃতের কোনরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত ভাষার প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে অদ্যাবধি কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। অশোকের শিলালিপিতে ইহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয়। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত এত অল্পে অল্পে তৃতীয় স্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, পরিবর্ত্তিত ভাষাটী কোন স্তরের, তাহা স্থির করা একরূপ অসম্ভব। তবে উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম স্তরে ভাষা Synthetic থাকে; ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রুতিকঠোর সমাবেশ ইহাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরের ভাষাও Synthetic থাকে। তবে ইহাতে প্রথম স্তরের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রুতিকঠোর সমাবেশ খুব অল্পই থাকে। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের যখন সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তখন উহা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ছিল। তৎকালে স্বরবর্ণের ব্যবহারই বেশী ছিল— ব্যঞ্জনবর্ণ কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, তৃতীয় স্তরে অত্যধিক স্বরবর্ণের সমাবেশ একেবারেই ছিল না; প্রথম স্তরের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারই সমধিক দেখা যাইত; কিন্তু ইহাদের সমাবেশ নূতন ধরণের ছিল। এসময়ে ভাষা Synthetic না হইয়া Analytic হইয়াছিল।

দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা হইতে কোন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না; তবে যখন বৈদিক যুগে নানাপ্রকার ভাষার প্রচলন ছিল, তখন উক্ত প্রাকৃতেরও যে বহু শাখা ছিল, তাহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই সময়ে প্রাকৃত সিন্ধুনদ হইতে কুশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশ্য স্থান ভেদে যে ইহার প্রকার ভেদ ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অশোকের খোদিত শাসন সমূহ এই ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই গুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালীন আর্য্য ভাষার দুইটী প্রধান শাখা ছিল— একটী পশ্চিমী প্রাকৃত, অপরটী পূরবী প্রাকৃত। এই সময়ে দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা আমরা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম পুস্তক হইতে জানিতে পারি। এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত, তাহা এক্ষণে পালি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পালি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে প্রাকৃত বলিলে পালি অপেক্ষা উন্নততর ভাষাকেই বুঝায়।

কিছুকাল পরে, কবিতা; ধর্ম্মগ্রন্থ ও নাটকাদি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তীকালে প্রাকৃতের ব্যাকরণ লিখিত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর প্রাকৃত ভাষা সমূহের আর প্রচলন দেখা যায় না। প্রাকৃত সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিতে হইলে তৎকালের সাহিত্য বা ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। দুঃখের বিষয় উল্লিখিত সাহিত্য গ্রন্থাদি হইতে আমরা প্রাকৃত ভাষার পরিচয় পাই না; কারণ সাহিত্যিক উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া চলিত ভাষাগুলির অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা পশ্চিমী ও পূরবী প্রাকৃতের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারি। উভয়েরই যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। পশ্চিমী প্রাকৃতকে 'সুরসেনী' বা সুর সেনের ভাষা বলা হইত, পূরবী প্রাকৃত 'মাগধী' বা মগধের ভাষা

বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। মগধ বলিলে অধুনা বিহারের দক্ষিণ অঞ্চলকেই বুঝায়। পশ্চিমী ও পূরবী প্রাকৃতের মাঝামাঝি আরও একটী ভাষা ছিল; তাহা অৰ্দ্ধ মাগধী নামে প্রচলিত ছিল। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষারই লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত। প্রবাদ আছে যে জৈন অৰ্হৎ মহাবীর এই ভাষায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাতন জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে ইহা ব্যবহৃত হইত। মারাঠী ভাষার সহিত এই ভাষার খুব নিকট সম্বন্ধ। প্রাকৃত কাব্যগুলি অধিকাংশ স্থলেই এই মারাঠী ভাষাতে লিখিত হইত। অধস্তন প্রাকৃত ভাষার পরবর্ত্তী স্তর 'অপভ্রংশ' নামে অভিহিত। অপভ্রংশ অর্থে 'দুষ্ট' বা বকৃত' বুঝায়। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে 'উন্নত' বা 'বিকশিত' অর্থ বুঝায়। যে সকল চলিত ভাষার উপর প্রাকৃত ভাষা প্রতিষ্ঠিত, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'অপভ্রংশ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অপভ্রংশের উন্নতি কল্পে অপভ্রংশ ভাষায় অনেক গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছিল। অপভ্রংশ-সাহিত্যে আমরা তৎকালীন কথিত ভারতীয় ভাষাসমূহের অনেক নিদর্শন পাই। কোন্ সময়ে এই ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণীত হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে বোধ হয় এ ভাষার আর প্রচলন ছিল না। আধুনিক ভাষা সমূহের বা তৃতীয় স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাই। অতএব স্থূলতঃ বলিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আধুনিক আর্য্য (Indo-Aryan) ভাষাসমূহের প্রচলন আরম্ভ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃত কিম্বা সংস্কৃত হইতে আধুনিক ভাষাসমূহ ব্যুৎপন্ন না হইয়া বরং অপভ্রংশ হইতেই এগুলির বিকাশ হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাই সত্য, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের মূল অপভ্রংশেই নিবদ্ধ। অপভ্রংশ হইতে যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, এইবার আমরা তাহাদের পরিচয় দিব।

সিন্ধুনদের নিম্নস্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে 'ব্রাবড়' নামে এক প্রকার অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে সিন্ধী ও লহণ্ডা ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। কোহিস্থানী ও কাশ্মীরী ভাষাদ্বয় কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে, ঐ ভাষার সহিত ব্রাবড় ভাষার যে বহু সাদৃশ্য ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। নর্ম্মদা উপত্যকার দক্ষিণে আরব্যোপসাগর হইতে ওড়িশা পর্য্যন্ত প্রদেশে অনেকগুলি ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সহিত অপভ্রংশ বৈদর্ভীর খুব নিকট সম্বন্ধ। বৈদর্ভী ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপভ্রংশ ভাষাসমূহ হইতে আধুনিক মারাঠি ভাষায় উদ্ভব হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এদিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অপভ্রংশ 'ওড্রি' বা 'উৎকলী' প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বর্ত্তমান 'ওড়িয়া' ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ওড্রির উত্তরে বিহার, ছোটনাগপুর ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধে মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল; ইহা হইতে বর্ত্তমান বিহারী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এটি একটি প্রধান ভাষার মধ্যে পরিগণিত ছিল; পূরবী প্রাকৃতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যও বিদ্যমান ছিল। ওড্র, গৌড়ি ও তক্কী ভাষাসমূহ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মাগধীর পশ্চিমে প্রাচ্য অপভ্রংশ বা গৌড়ী প্রচলিত ছিল; বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী গৌড়ই ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। আরও পূর্ব্বে ইহা ঢাকার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এ স্থানে ইহা 'ঢক্কী' নামে অভিহিত হইত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইহা তৎসমুদয়ের আদি। গৌড় অপভ্রংশ পূর্ব্বদিকে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; উত্তর বঙ্গ ও আসামের ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা অপভ্রংশ ভাষাসমূহের পরিচয় দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূরবী ও পশ্চিমী প্রাকৃতের মধ্যবর্ত্তী অৰ্দ্ধ-মাগধী বলিয়া আর একটী ভাষা আছে। বর্ত্তমান

পূরবী হিন্দীই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ভাষা অযোধ্যা, বুন্দেলখণ্ড ও ছাত্রিশগড় প্রদেশসমূহে প্রচলিত আছে।

আভ্যন্তর ভাষাসমূহ যে 'অপভ্রংশ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা 'নাগর' অপভ্রংশ বলিয়া অভিহিত। সম্ভবতঃ ইহা পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক ভাষাসমূহ হইতে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে, নাগর অপভ্রংশ অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়া সমগ্র পশ্চিম ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৌরসেনী অপভ্রংশ অন্যতম। সৌরসেনী হইতে পশ্চিমী হিন্দী ও পঞ্জাবী ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। 'আবন্তী'ও ইহাদের মধ্যে আর একটী ভাষা। আবন্তী বর্ত্তমান উজ্জয়নীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে ব্যবহৃত হইত; 'রাজস্থানী' ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর উত্তর ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। অত্রত্য ভাষাসমূহ পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল হইতে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। রাজস্থানী ভাষার সহিত এই সকল ভাষার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে যে, এই প্রদেশস্থ কতকগুলি জাতি রাজপুতানা হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল; সুতরাং রাজস্থানী ভাষা ও এই প্রদেশের ভাষার উৎপত্তি একটী ভাষা হইতেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই উভয় ভাষার আকর ভাষার নাম আবন্তী অপভ্রংশ।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত কোন মূল প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাণিনি ও অন্যান্য বহু বৈয়াকরণের পরিশ্রমে এই ভাষা ইহার বর্ত্তমান আকারে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই ভাষা দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত হইতে যথেচ্ছভাবে শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। পক্ষান্তরে প্রাকৃতও সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল শব্দ 'তৎসম' বা সংস্কৃতের ন্যায় একই বলিয়া প্রাকৃত বৈয়াকরণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। যে সকল প্রাকৃত শব্দ মূল প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা 'তদ্ভব' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অর্দ্ধ-তৎসম বলিয়া কতকগুলি শব্দের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ শব্দগুলি 'তৎসম'; তবে লোকমুখে বিকৃত হইয়াছে মাত্র। আমাদের বৈয়াকরণগণ 'দেশ্য' নামে আর এক প্রকার শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে হয় নাই, সেইগুলিকে ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন লেখক অজ্ঞতাবশতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অনেকগুলি শব্দকে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। দ্রাবিড়ীয় মুণ্ডা ভাষাসমূহ হইতেও কতকগুলি শব্দ পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশ শব্দই প্রাচীন সংস্কৃত হইতে ব্যুৎপন্ন ভাষাসমূহ হইতে আসিয়াছে। এই গুলিই প্রকৃত পক্ষে 'তদ্ভব'। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের বৈয়াকরণগণ যে অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেন, এখানে উহা সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এই দেশ্য শব্দগুলি স্থানীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং গুজরাট প্রভৃতি দেশের সাহিত্যাদিতে এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক Sanscritic Indo-Aryan ভাষাসমূহেরও এই অবস্থা দেখিতে পাই। বিদেশী শব্দগুলি বাদ দিলে এই ভাষাসমূহের শব্দসমষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; যথা—তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম ও তদ্ভব। তদ্ভব শব্দগুলি মূল প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক তৎসম ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আরও অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন আছে; কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং এই মধ্য পথেই 'মুখবন্ধ' শেষ করিতে হইল।

শ্রীজলধর সেন।

সম্বৰ্দ্ধনা।

আজ বান ডেকেছে মরা গাঙে,
ভাবের তুফান ছুটছে ভালো!
রূপ সাগরের আঁধার বুকে,
প্রেমের মণিদীপটী জ্বালো।

সুরের তরী লহর তুলে,
ঠেক্‌ছে সবার মরম কূলে,
সাজিয়ে দে তায় প্রীতির ফুলে,
ফুটুক নবীন প্রাণের আলো!
এস সাধক! ভক্ত! কবি!
নিয়ে তরুণ আশার ছবি,
অরুণ রাগে হাসুক রবি,
ঘুচাই যুগের মনের কালো।
চলুক তরী এমনি ধেয়ে,
সবার সোহাগ পরশ পেয়ে,
স্নেহের ধারে ভাবের নেয়ে,
মোদের শিরে আশীষ ঢালো।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

সঙ্গীত চিত্র।

Graphical representation of Music.

ভারত সঙ্গীতে স্বরলিপি পাশ্চাত্যের অনুকরণ নহে; ইহা স্বদেশ জাত। ইহার সময় নির্ণয় করা বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভব। বেদের কালনির্ণয়ের সহিত স্বরলিপির উৎপত্তির কালনির্ণয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ; কেন না আমরা বৈদিক মন্ত্রাবলিতে এবং সাম-গানসমূহে স্বরের সঙ্কেত ১, ২, ৩, ৪, গণিত অঙ্ক দ্বারা লিখিত দেখিতে পাই; কিন্তু সামের গানসমূহে যে স্বরসঙ্কেত পরিদৃষ্ট হয় তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুরূপদেশ ব্যতীত গান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশুদ্ধ সাম-গায়ক বর্ত্তমান সময়ে অতি বিরল। বৈদিকযুগে মহর্ষি ভরত বেদ হইতেই সঙ্গীতের মূল সূত্র গ্রহণ করেন। তদনুসারে তাঁহার রচিত সঙ্গীতশাস্ত্র ভারতে সর্ব্বপ্রথমে গান্ধর্ব্ব-বেদনামে প্রচারিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক প্রণীত যজুর্ব্বেদের শিক্ষা শাস্ত্রের গান্ধর্ব্ববেদে "যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ। ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ॥"৬ শ্লোক উহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এই শাস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে নানাবিধ রাগরাগিণী, বহুবিধ তাল ও নৃত্য এবং অভিনয় প্রচলিত ছিল। মহর্ষি ভরত, প্রচলিত তাল, রাগ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আপন বুদ্ধিকৌশলে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উলুক, দন্ত

নারদ প্রভৃতি ঋষিগণও সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইঁহাদের রচিত পুস্তকসমূহ সম্পূর্ণভাবে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সঙ্গীত-রত্নাকর পুস্তকে স্থানে স্থানে ভরতাদি ঋষিপ্রণীত পুস্তক হইতে উদ্ধৃতাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত-রত্নাকর পুস্তকে কয়েকটি সংস্কৃত গান, স্বরলিপির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু ভরতাদি ঋষিগণের অবলম্বিত স্বরলিপির প্রণালী জানিবার উপায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাই হউক না কেন ভারতে স্বরলিপি বৈদিক যুগের প্রারম্ভকাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অধুনাতন ব্যবহৃত স্বরলিপি প্রাচীনের অনুকরণ মাত্র ; প্রায় একই প্রকার। উহা দ্বারা অস্মদ্দেশীয় বহু সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ, গান ও তেলেনা প্রভৃতি সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভারতীয় সঙ্গীতকে সঞ্জীবিত রাখিবার মহৎ প্রয়াস সঙ্গীতপ্রিয় মাত্রের ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের ব্যবহৃত স্বরলিপিদ্বারা কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা হইতেছে ; কিন্তু অন্য একটী উপায়দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। তাহা চিত্র (গ্রাফিক) প্রণালী দ্বারা। স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ মাত্রার সহিত সম্মিলিত হইলে যেন একটী উর্দ্ধাধোগামিনী লতিকার আকার ধারণ করে। গ্রামোফনের প্লেটের চিত্র (সূক্ষ্ম বিন্দুযুক্ত) যেরূপ শব্দের কম্পনের উপর এবং কালের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ যদি গণিতের গ্রাফের ন্যায় স্বররেখা ও মাত্রারেখা সমকোণ ভাবে অঙ্কিত করা যায় তাহা হইলে গান বা যন্ত্রের গৎ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারে এবং তদবলম্বনে সহজে কণ্ঠে বা যন্ত্রে গান ও গীতাদি অভ্যাস করা যাইতে পারে। উল্লিখিত লিখনপ্রণালীতে গান বা গতের প্রত্যেক অক্ষরে সা রে গামাদি অক্ষর পুনঃ পুনঃ দিতে হইবে না ; অধিকন্তু Y রেখা বা কোটী রেখাতে সপ্তকের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সমূহ লিখিত হইবে এবং প্রচলিত শ্রুতিসমূহ পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইবে। তৎসমূহে মাত্রাচিহ্ন প্রদান করা আবশ্যক হইবে না। উহাতে গীতাবলম্বিত তালের অঙ্ক সংখ্যা এবং ফাঁকের বিন্দু চিহ্ন গীতাক্ষরের শিরোদেশে দিলে তাল প্রকাশের কোন বাধা ঘটিবে না। গমক ও মূর্চ্ছনা স্বর এবং মাত্রাসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। X রেখা বা ভূ রেখা এক একটী মাত্রানুসারে ভাগ করিয়া প্রত্যেক মাত্রাকে প্রচলিত গ্রাফ চিত্রিত পত্রের ন্যায় অষ্টমাংশে ভাগ করিলে, আমার বিশ্বাস, গমক, মূর্চ্ছনা, কম্পন ও কুন্তন যাহা সূক্ষ্মমাত্রা দ্বারা ব্যবহৃত হয় তাহা সহজে ব্যক্ত হইতে পারে। এক্ষণে একটী গ্রাফ বা চিত্রের দ্বারা কি প্রকারে গান লিখিত হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

Graph

বা চিত্র।

কলিকাতার বিখ্যাত স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের দ্বারা গীত একটী গান "অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা ?" উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইল।
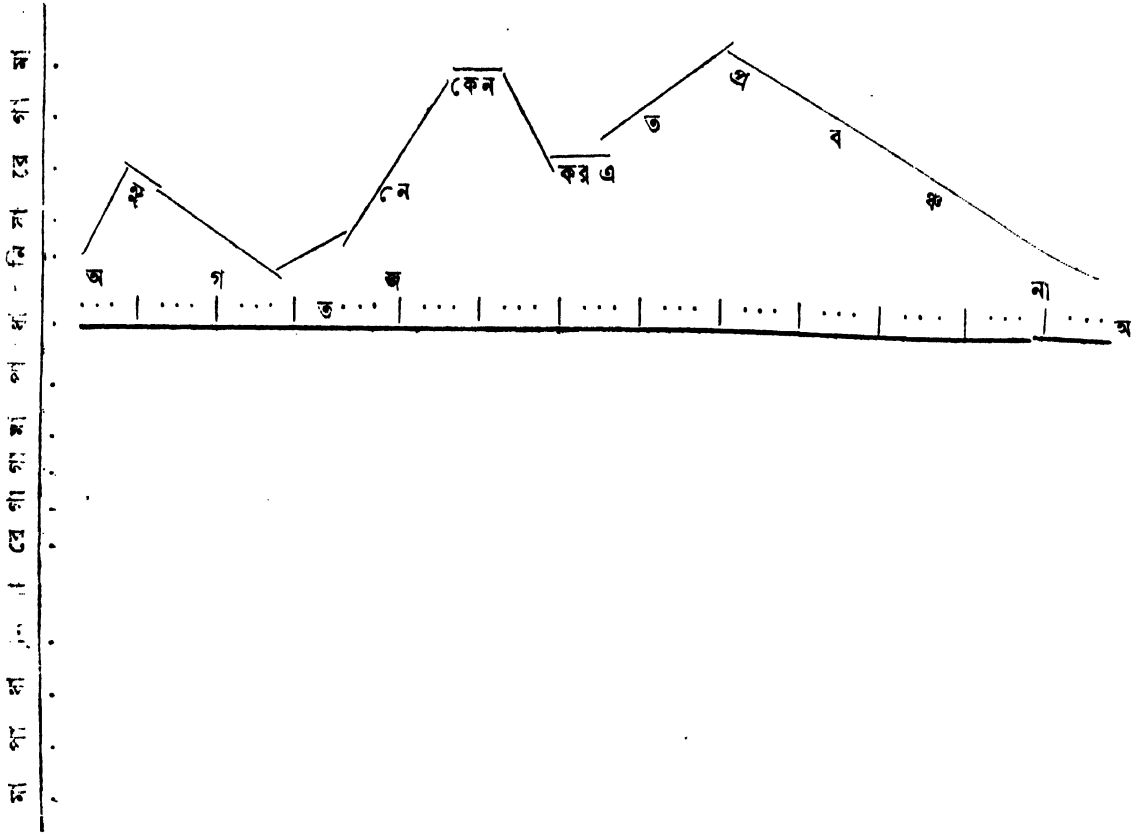
প্রদর্শিত চিত্রে X রেখা বা ভূ রেখা যাহা এস্থলে মাত্রারেখা নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাকে সূক্ষ্মতর বিভক্ত করিলে অল্প স্থানে গান প্রকাশিত হইতে পারে। Y রেখা বা কোটী রেখা যাহা এস্থলে স্বররেখা নামে ব্যবহৃত, তাহার অধোভাগ নিম্ন সপ্তকের ব্যবহারযোগ্য মধ্যম পর্য্যন্ত এবং উৰ্দ্ধভাগে তারাসপ্তকের পঞ্চম পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে।

চৌঃ শ্রীযাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র।

অভিমান।

স্বাগত হে সুধীবৃন্দ! আপনারা আজ মহতের দ্বারে মহান্ অতিথি আজ ফাল্গুনের ফল্গুরাগে ধরাতল রঞ্জিত; আপনাদেরও হৃদয় বর্ষান্তে সুহৃৎ সমাগমের ঔৎসুক্যে অনুরাগে রঞ্জিত। এখন আপনারা বিশ্রম্ভালাপ ও নব নব ভাবের আদানপ্রদান করত পরস্পরের মনোরঞ্জনে যত্নবান্। এই সময়টা আমার আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্ট অবসর নহে। তাই আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ না হইয়া 'নেপথ্য' হইতেই দুই চারিটা কথায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আবার 'গা ঢাকা' দিব। আমার কথাগুলি 'শব্দভেদী বাণ' নহে, সুতরাং আপনারা ত্রস্ত হইবেন না।

আপনাদের মিলন-মন্দিরে আজ আমার মত কালামুখোর স্থান নাই বটে, কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকেরই হৃদয় মন্দিরে আমি একদিন না একদিন আসন পাতিয়াছি, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবং ভবিষ্যতে আমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না, এ কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না।

আমার বয়স কত তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। তবে এটা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অথবা তৎপূর্ব্বেই আমার সৃষ্টি হইয়াছিল। কবির কথায় বলিতে গেলে, আমি "প্রভাতের আলোর সমবয়সী"। সৃষ্টিকর্ত্তা কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে অনন্ত যৌবন দান করিয়াছেন, তাই জরা আমায় আক্রমণ করিতে পারে না, আমি চিরকালই অপ্রতিহত প্রভাবে অবনী শাসন করিয়া আসিতেছি। আমার প্রতিপত্তি স্থান বিশেষে বা কাল বিশেষে আবদ্ধ নহে। মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতেশ্বরের সাম্রাজ্যের ন্যায় আমার সাম্রাজ্যেও কখনও সূর্য্যাস্ত হয় না। আবার দেখুন, জিগীষু নৃপতিকে বিপুল বাহিনীর সাহায্যে শত্রু দমন করিতে হয়; কিন্তু আমার প্রতাপ এমনই অলৌকিক যে, আমার একটি সূক্ষ্মতম পরমাণু সহায়-সম্পদ্‌বিহীন হইয়া দিগ্বিজয় করিয়া আসিতে পারে (চিকিৎসা শাস্ত্রের সদৃশ-বিধান স্মর্ত্তব্য।)

চারিটি মাত্র অক্ষরে আমার অবয়ব, কিন্তু এই অক্ষরের প্রত্যেকটি 'একৈকমপ্যনর্থায়'। এই চারিটি অক্ষরের প্রতাপে আমি চারি যুগে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছি। সত্য যুগে, আমারই প্রভাবে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হয়। ত্রেতায়, আমিই কৈকেয়ীর স্কন্ধে ভর করিয়া রামের বনবাস ঘটাই, এবং আমারই প্ররোচনায় সীতার পাতাল প্রবেশ। দ্বাপরে, আমারই সহায়তায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অপূর্ব্ব বিকাশ, ও স্মরগরল-খণ্ডন পদপল্লব দানে তাহার চরম সার্থকতা। কলিতে আমার কৃতিত্ব অন্যান্য যুগ অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী। প্রথমে প্রাচীন কালের কথাই ধরুন। বিদুষী পত্নীর বাক্যবাণবিদ্ধ কালিদাসের স্কন্ধে যদি আমি ভর না করিতাম, তাহা হইলে কি আজ আপনারা তাঁহার কাব্য নাটকের অমৃতাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন, না প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কালিদাসের জন্মভূমি নদীয়ায় কি বর্দ্ধমানে কি বঙ্গের বাহিরে, এই তথ্য নির্ণয়ার্থ মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অবসর পাইতেন? আবার ভবভূতির উপর যদি আমি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ না করিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আপনারা তাঁহার 'মালতী মাধব' ও 'উত্তররাম চরিতে'র রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতেন।

আধুনিক বঙ্গীয় সমাজে আমার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকট—ঘরে ঘরে আমার নিত্য নূতন লীলা দেখিতে পাইবেন। স্ত্রী যখন স্বামীর ভর্ৎসনা লাভ করিয়া বিষণ্ণ বদনে ঘরে খিল দিয়া অনাহারে অহোরাত্র কাটাইয়া দেয় এবং লক্ষ সাধ্য সাধনাতেও খিল খুলিয়া বাহির হইয়া আইসে না, তখন আমিই তাহার ঘাড়ে চাপি। আবুর

পুত্র যখন পিতার তিরস্কারে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, এবং হাজার হাজার অনুরোধ উপরোধ, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন, এমন কি ত্যাজ্যপুত্র করিবার ভীতি প্রদর্শনেও ফিরিয়াআইসে না, তখনও আমিই তাহার স্কন্ধে ভর করি। যখন হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত একটা নগণ্য কারণে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয়, এবং বুক ফাটিয়া যাইলেও কাহারও মুখ ফোটে না, তখন আমারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাহারা এইরূপ করে, এ কথা কে না জানে ?

আপনারা বোধ হয় এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পুরুষের অপেক্ষা নারীর উপরই আমার প্রভাব অধিক প্রকট। তাহার কারণ, পুরুষের অপেক্ষা নারীর হৃদয় অধিকতর কোমল ও ভাব প্রবণ, এবং তথায় আমি অনায়াসেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারি। (পুরুষ অপেক্ষা নারীকেই অধিক সময় ভূতে পায়, ইহা আপনারা জানেন। দুর্ব্বল জাতিই সহজে অপরের বশ্যতা স্বীকার করে, ইহাও অবিদিত নহে।) অনেক সময়ে ব্যাপার এত বেশী দূর গড়ায় যে আমার প্রভাবে নারীগণ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আজকাল বাঙ্গালীর মেয়েদের এটা খুব রপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রেমের রাজ্য আমার প্রিয়তম ও প্রকৃষ্টতম লীলা ক্ষেত্র। অবশ্য আমি প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের ক্ষণিক বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিই বটে, কিন্তু সেই বিপ্রলম্ভ অধিকাংশ স্থলেই সম্ভোগের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত অপরিহার্য্য, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এক কথায় বলিতে গেলে, আমিই প্রেমের প্রাণ। তাই কবি আমাকে বাদ দিয়া প্রেমের গান রচনা করিতে পারেন নাই :—

"প্রেমে সদাই অভিমান,
প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ,
সয় না কথার টান,
প্রেমের লক্ষ সূতার বাঁধাবাঁধি,
বাতাসের ও ভর সহে না।"

বাস্তব জীবনের ন্যায় রূপকথায় এবং কথা সাহিত্যেও আমার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। আপনারা একাধিক রূপকথায় রাজপুত্রের 'গোঁসাঘরে' পড়িয়া থাকার কথা শুনিয়াছেন। সেটা ত আমারই কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গলা উপন্যাসগুলিতে আমার দর্শন আপনারা ভূয়োভূয়ঃ পাইবেন। 'বিষবৃক্ষে' আমিই সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগের পথ দেখাইয়াছি, আমিই কুন্দনন্দিনীর কর্ণে আত্মহত্যার মন্ত্র দিয়াছি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দ লাল ও ভ্রমরের হৃদয় ক্ষেত্রে আমার বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের সেই নিদারুণ পরিণাম। পক্ষান্তরে, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষার এবং 'বঙ্গবিজেতা'র বিমলার অলৌকিক আত্মত্যাগ আমার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। আমিই 'মাধবীকঙ্কণে' নরেন্দ্রনাথের দেশত্যাগের, এবং 'চোখের বালি'তে অন্নপূর্ণার কাশীবাসের হেতু। নিরুপমার দিদি এবং শরৎ চন্দ্রের বিন্দুর ছেলে উভয়েই আমার প্রভাবে প্রভাবিতা। আর কত বলিব ? বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের বিশাল বারিধির যে অংশই মন্থন করুন, কখনও অমৃতরূপে কখনও বা গরল রূপে আমার দেখা পাইবেন। অধিক কথায় কাজ কি, আজকালকার একজন প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকাকার আমার প্রভাব এতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, আমারই নামে একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করিয়া সাহিত্য জগতে আমার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া দিয়াছেন। একজন লেখক আমার প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকপত্রে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় আমাকে "চূর্ণ" করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য। কেন না প্রাচ্য পুরাণের রক্তবীজ এবং প্রতীচ্য কিম্বদন্তীর Phoenix এর মত আমি মরিয়াও মরি না— বরং দলিত হইয়া অধিকতর তেজে আত্মপ্রকোপ প্রকাশ করি।

বিদায় কালে একটা কথা নিবেদন করি। আপনারা দেখিয়াছেন যে, আমার সেবক কখনও অমৃতের অধিকারী

হয় আবার কখনও বা তাহার ভাগ্যে শুধু হলাহলই মিলে। অর্থাৎ আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অনেকে আত্মোন্নতির চরম সীমায় উঠিয়া নর দেহেই দেবত্ব অর্জন করে, আবার অনেকে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া পিশাচেরও বেহদ্দ হইয়া পড়ে। অথচ উভয় ঘটনারই মূলে সেই এক আমি। আসল কথাটা হইতেছে এই যে, যেমন একই আলোক রশ্মি বিভিন্ন বর্ণের কাচ খণ্ডের মধ্য দিয়া বিকীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, অথবা যেমন জলাদি তরল পদার্থ আধার ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, আমিও সেইরূপ বিভিন্নপ্রকৃতি মানবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করি। অর্থাৎ যাহার যেমন শিক্ষা, সংস্কার ও মনের গঠন, সে সেইরূপ ভাবেই কাযে লাগায়। যে অস্ত্র ভিষকের হস্তে অবস্থিত হইয়া বিপন্নের প্রাণদান করে, সেই অস্ত্রই আবার দস্যুর হস্তে অবস্থিত হইয়া কত শত নিরীহ লোকের প্রাণ সংহার করে। সেইরূপ, আস্তিক্য-বুদ্ধি-শালী মার্জ্জিতমতি ও আত্মজয়ী মানব আমার সাহায্যে মর্ত্ত্যেই নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করে, পক্ষান্তরে অব্যবস্থিত-চিত্ত বিকৃতবুদ্ধি ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তি মানব আমারই সহায়তায় এই সংসারকে পিশাচের লীলাভূমি করিয়া তুলে। যে আগুনে প্রাণ রক্ষা হয়, সেই আগুনেই আবার গৃহ দাহ হয়, এ কথা যেন কেহ ভুলিবেন না, এই আমার শেষ অনুরোধ।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলন-মঙ্গল।

হে মোর বন্ধু, পুণ্য প্রভাতে
জাগরে সবে—
বক্ষে বক্ষে নিবিড় মধুর
মিলন হবে।

হেথায় দাঁড়ায়ে ডাক একবার
মেঘের মন্দ্র স্বরে,
লুটায়ে পড়ুক মূর্চ্ছনা তার
সুদূর স্বর্গ পুরে।

প্রীতির উৎস অবিরল ধারে
পড়িছে ঝরিয়া প্রেম পারাবারে,
হেথায় চিত্ত এক সুরে শুধু
জাগিয়া রবে;
বক্ষে বক্ষে নিবিড় মধুর
মিলন হবে।

হেথা একদিন মা'র আহ্বানে
এসেছিল কত কবি,
গানে গানে তার কেটে গিয়ে মেঘ
হেসে উঠেছিল রবি;

মহাপুরুষের পদধূলিপূত
এই সে পুণ্য ভূমি,
জেগেছিল কত দেউল উচ্চ
ঊর্দ্ধে গগন চুমি;

কীর্ত্তির শত অতুল কাহিনী
ঘুমায়েছে কত দিবস যামিনী,
নূতন মন্ত্রে, নবীন ছন্দে
জাগিবে কবে?
বক্ষে বক্ষে আবার তেমনি
মিলন হবে।

জাগো জাগো ভাই বয়ে যায় বেলা,
হৃদয়ে আসুক বল ;
টেনে লও আরো কাছে কাছে আজি
যারা অতি দুর্ব্বল।

জোয়ার এসেছে নদী কূলে কূলে,
জেগেছে বংশীরব ;
সম্মুখে ঐ মায়ের দেউল
মুখরিত জয়রব।

ভাসাও তরণী তটিনী বক্ষে,
চল ছুটে ত্বরা চরম লক্ষ্যে,
বহায়ে নিখিল প্রাণের প্রবাহ
চল গো সবে ;
মায়ের স্নেহের অঞ্চল ছায়
মিলন হবে।

মুছে ফেল আজ যুগের লজ্জা,
দুখের রক্ত টীকা,
অন্তরে আজি জাগিয়া উঠুক
নব হোমানল শিখা ;

ভস্ম হউক মান অভিমান,
দম্ভ হউক চূর ;
ধ্বনিত হউক স্বার্থে ডুবায়ে
ত্যাগের মোহন সুর।

নিয়ে এস মা'র চরণের কাছে,
ঘরে পরে যেথা যে রতন আছে
মহিমা গরিমা শোভা সম্পদে
অতুল ভবে ;
তবে ত মায়ের স্নেহময় কোলে
মিলন হবে।

এসেছে পূজারী দুয়ারে তোমার,
হাতে হাত ধরে উঠ ;
তাদের দেখান পথ ধরি আজ
তাদের মতন ছুট ;

পুণ্য আশীষ অঞ্চল ভরি
কুড়ায়ে লহগো সাথে,
পড়ুক ঝরিয়া স্নেহসুধা ধারা
বিনয় নম্র মাথে।

সুরে সুর দিয়ে পরাণ ভরিয়া
গেয়ে ওঠ গান গগন ভেদিয়া,
ঘুচাইয়ে চির যুগের জড়তা
বিজয় রবে ;
মায়ের চরণে, নবীন জীবনে,
মিলন হবে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা।

ভারতবর্ষ ক্রমশই আপনার নিজস্বটুকু আপনার বিশেষত্বটুকু ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে কি? নূতন যুগে ভারতবর্ষ নূতন আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। যাহা ছিল তাহা নাই, যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। বর্ত্তমান ভারত জগতে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখানকার প্রাণগুলি পশ্চিমের ফাগের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমের স্রোত আসিয়া দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই স্রোতের গতি ফিরাইবার জন্য দেশের সর্ব্বত্রই প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের হারান "গাঁঠের কড়ি" পাওয়ার জন্য আমরা প্রচুর অনুষ্ঠান ও অনুসন্ধান করিতেছি। তল্লাসের বেদনা লাগিলেও আমরা পাওয়ার আশায় আনন্দ ধ্বনিটা একটু বেশী রকম করিতেছি।

নব নব জ্ঞান বিজ্ঞানের রেলগাড়ীতে চড়িয়া আধুনিক সভ্যতা আসিয়া ভারতে নামিয়াছে। আমরা তাহার শুভ্ররূপরাশিকে "প্রিয়" বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল প্রাচীন কুটির শিল্পের প্রাচুর্য্যময় স্থান পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া আধুনিক সভ্যতার লীলা নিকেতন সহরে 'নাগরিক' খুঁজিতে ছুটিয়া আসিয়াছি। জানি না কি শুভক্ষণে আমাদের মতি গতি একটু ফিরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহারা মহাযাত্রার টিকিট কিনিয়াছিল তাঁহাদের অনেকে অর্দ্ধ পথে নামিয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহারা কতদূর ফিরিয়া যাইবেন। পশ্চাতে প্রাচীন সভ্যতার শান্তিময় কুটীরের নিগূঢ় সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ফিরিবার জন্য ডাকিতেছে।

ভারতের মনীষি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই কঠিন সমস্যার সমাধান জন্য ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার যে ধারাটি ভারতের কুটিরাশ্রমে সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা কি বিজ্ঞানযুগের পশ্চিম প্রান্তরের শুষ্ক বাতাসে প্রাণ হারাইল? কত যুগ পূর্ব্বে পুণ্যতোয়া তমসা তীরে কবি করে যে মধুর বীণা ঝঙ্কিয়াছিল তাহার সুমধুর তান কি পশ্চিমপ্রেরিত কারখানার কঠোর নিনাদে চিরতরে লোপ পাইবে? প্রাচীন শান্তিময় কুটীরের যে ইঙ্গুদি তেলের আলোটি কুটীরলক্ষ্মী আলোকিত করিতেছিল তৎপরিবর্ত্তে কেরোসিনের ধূমোদ্গিরিত বাতিটি কি চিরতরে স্থান পাইবে? আধুনিক সভ্যতার প্রলয় প্লাবন কি প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তিতল শিথিল করিয়া দিবে?

প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার আদি নিকেতন পল্লী কুটীরগুলিতে সন্ধ্যার আলো আর জ্বলে না। কুটীরগুলির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিতে সে ছায়াচ্ছন্ন বনরাজি নাই, কুটীর পার্শ্বে স্বচ্ছ সুন্দর জলাশয়টি শুষ্ক। কুটীর প্রান্তবাহি নদীতীর বৃক্ষরাজিপূর্ণ জঙ্গলাবৃত। পল্লীর বাগানে আম্র বকুল পানস বৃক্ষরাজি বিরল। পল্লীর বৃক্ষবিতানে রাখালগণের সুমধুর গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। পল্লীকুটীর অঙ্গনে শাক শব্জীর বাগান আর নাই। দুগ্ধবতী গাভী অন্তর্হিত। সুস্থকায়া পল্লীবালাগণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া কলসী কক্ষে জল আনিবার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। পল্লীকুটীরের প্রাচীর গাত্রে এক্ষনে দেব দেবীর চিত্র স্থান না পাইয়া বিভৎস অর্দ্ধ উলঙ্গ রমণীর চিত্র স্থান পাইতেছে। কুটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ দুচার বিঘা জমি সাঞ্জায় ও ভাগে চাষ আবাদ করে। আর কর্ত্তার ছেলে সহরের কারখানায় চাকরী করে। তাই পল্লীকুটীরের পাথরের তৈজসের পরিবর্ত্তে চিনা মাটীর চায়ের পিয়ালা আসিয়াছে। আর কুটীর শিল্পের শেষ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বৃদ্ধার হস্তের চরকার ক্ষীণ ধ্বনিতে শ্রুতি গোচর হইতেছে।

কুটীরবাসীর অবকাশ কালে পল্লীর কুটীরে যে শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে লোপ পাইতেছে। যেদিন মানুষের অনন্ত সাং মিটাইবার জন্য মানুষের সাধনা কল কারখানা আবিষ্কা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিল সেইদিন হইতে কুটীরশিল্পে অধোগতি হইল। যেদিন মানুষ অভাবের তাড়নাে সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া মনে অসন্তোষের বীজ রোপ করিল সেইদিন হইতে পল্লীর কুটীরশ্রী অন্তর্হিত হই থাকিল। গ্রামের সৌন্দর্য্য ছিল অভাবের স্বল্পতায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিপূর্ণতায়। গ্রামের সেই

আনন্দ কি আমরা সহরে পাইতেছি? ভাবুক একবার প্রাচীন শান্তিময় কুটীরের সুন্দর চিত্রটিকে লইয়া আধুনিক সহরের ধূম্রময় কারখানার চিত্রটার সহিত মিলাইয়া দেখুন দেখি। ভগবানের এই বিশ্ব-চিত্রশালায় কোন চিত্রটি সুন্দর দেখায়।

আমাদের প্রাচীন সভ্যতা পল্লীবাসীগণের ধর্ম্ম-প্রাণগুলিকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই পল্লীর অধঃপতনের সহিত আমাদের প্রাচীন সভ্যতা তাহার পীঠ স্থান হারাইতে বসিয়াছে। যেদিন সহর অতিথিরূপে পল্লীর কুটীরে আশ্রয় লইল সেইদিন পল্লী ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের মেকী চালাইতে শিখিল; সাম্য ভাবের পরিবর্ত্তে বৈষম্য ও ব্যবধানের অচলায়তন প্রাচীর তুলিয়া দিল।

বর্ত্তমান সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে সহরের ইট প্রস্তরের স্তূপে। প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ শিক্ষাস্থান ছিল তপোবন ও আশ্রমে। আশ্রমে ভারতের যে শিক্ষা লাভ হইত তাহার সেই শিক্ষার প্রভাব ভারতের জীবনধারাকে সরল ও সুন্দর করিয়াছিল। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ প্রভায় ভারতের জীবনধারা অনন্ত জ্ঞান লাভে ছুটিয়াছিল। পুরাতন ও নূতন সভ্যতার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ছিল এবং সেই আদর্শ লাভ বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হইত। ভারতের ভাবধারা অনিত্য জীবনের উপভোগকেই জীবনের পরম সুখ বলিয়া জ্ঞান করিত না। প্রতিযোগিতার ক্ষিপ্রতা আসিয়া তাহার জীবনধারাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। ভারতের আশ্রমের সামানীতি আকুমারিকা হিমাচল ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ বর্ণ নিকৃষ্টের সহিত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। ভারতের গর্ব্ব করিবার বস্তু ছিল ভারতের ভাবধারার সহিত কর্ম্মধারার সুন্দর সামঞ্জস্য।

আধুনিক সভ্যতা ইহকালকে যতদূর উচ্চে স্থান দিয়াছে, বর্ত্তমান জীবনের উপভোগকে যেরূপ জীবনের লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, সুরাপাত্র যেরূপ উগ্রাসবে পরিপূর্ণ করিতেছে তাহাতে তাহার চরণতলে পৃথিবী টলমল করিলেও তাহারও পতন অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক সভ্যতার শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে নগরের বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক সভ্য শিক্ষিত জীব নগরের কৃত্রিমতার মধ্যে শিক্ষা পাইয়া বাহির জগতের প্রতি অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করিতেছেন। তাহার আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক, পোষাক পরিচ্ছদ তাহার জীবনকে বিচিত্র ভাবে বাহ্যজগতে লইয়া যায়, অন্তর্জ্জগতটা কুৎসিৎ কদাকার ভাবে নয়নান্তরালে পড়িয়া থাকে।

আধুনিক সভ্যতা সুগন্ধহীন শিমুল ফুলের ন্যায়। ইহার দর্শনানন্দময়ী জ্ঞান বিজ্ঞান ধনৈশ্বর্য্য ও বলবার্য্য আছে। তাই প্রাচীন সভ্যতা এই অভিনব সভ্যতার বাহ্যিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রদীপমুখী পতঙ্গের ন্যায় ছুটিতেছে। তাই প্রাচীন তাহার তত্ত্ব জ্ঞানের উন্মুক্ত পাতা উল্টাইয়া দিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের বিচিত্র উজ্জ্বল পাতা উন্মুক্ত করিতে ব্যস্ত। গ্রীসিয়, রোমীয় ও মিশরীয় সভ্যতা জগৎ পৃষ্ঠে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে তাহা সুদৃশ্য হিসাবে কোন ঐতিহাসিক উল্টাইলেও তাহার ইদানীন্তন প্রয়োজনীয়তা ভূপৃষ্ঠে এক্ষণে কেহই স্বীকার করিবেন না। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার দশাও কি তাহাই হইবে? যে ভারতীয় সভ্যতা ভারতের পল্লীতে পল্লীতে তাহার বিশিষ্ট প্রণালীতে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা কি কারখানার কঠিন কবলে পড়িয়া চিরতরে ভূপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইবে?

অতীত প্রীতিকে রক্ষণশীলতা বলিয়া প্রাচীন সভ্যতা প্রীতিকে অতীতের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ বলিয়া নূতনের শুভ্র অঙ্কে যাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবেন তাহাদিগকে কিছু না বলাই ভাল। তবে বলি পূর্ব্বের পল্লী জীবনে মানুষের প্রতি মানুষের যে সরল সুন্দর ব্যবহার ছিল তাহা কি বর্ত্তমান সভ্য সহরে আছে? সে সরলতা, সে শান্তিপ্রিয়তা, সে স্বজাতি প্রেম, সে অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রণালী, সে মাদক দ্রব্যে অপ্রিয়তা কি আধুনিক সভ্যতার বিলাসভবন সহরে নগরে পাওয়া যায়। তাহা প্রকৃতির প্রিয় প্রান্তর পল্লীর শান্তি নিলয়েই সম্ভব ছিল। পল্লীগ্রামের কৃষক তন্তুবায় কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতি লইয়া যে সমাজ গঠিত হইয়াছিল তাহার ভিতর সখ্যতা ও

প্রীতির বন্ধন ছিল। সেই পল্লীতে পল্লীতে যে কুটীর শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে দেশে ধনকুবের কেহ হইতে না পারিলেও কাহারও অশন বসনের অভাব হয় নাই। কুটীর শিল্পে দেশের অর্থ সমূহ দেশময় ছড়াইয়া পড়িত। তখনকার পল্লীবাসাকে আবশ্যকীয় উদরান্ন সংস্থান জন্য বা পরিধেয় বস্ত্র জন্য চাকর বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। তাহার নিজের চাষের অন্ন ও গৃহ কার্পাসের বস্ত্র প্রচুর হইত। সে অনাবশ্যক বাহুল্য জন্য ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্য প্রধাবিত হইত না। তাই সেই দৃঢ়কায় কৃষক ও শিল্পী যুবক ছিল দেশের মেরুদণ্ড। আজ দেশের সেই মেরুদণ্ডকে কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে?

পুরাতন সভ্যতায় অন্তরে ও বাহিরে প্রবল পার্থক্য ছিল না, ঘরে ও বাহিরে বিপুল ব্যবধান ছিল না। আধুনিক সভ্য জীব দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বত্রই অভিনয় করিতেছে। পশ্চিমের সুগন্ধী বাতাস আসিয়া তাহার হৃদয়ে বিলাস বিভ্রম ঘটাইতেছে। তাহার চক্ষে এমনি ঝলক লাগিয়া গিয়াছে যে সে চায় রাজধানীর রাজপথ, রাজপ্রাসাদ যানবাহন ও আমোদ প্রমোদ। আর সেই নগরের উন্নতি জন্য কত না আইন কানুন রচনা করিতেছে। কিন্তু যেখানে প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রাণ রহিয়াছে সে দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেছে না। ফলে হইতেছে অনেক গরীবের ছেলে সহরে রাজার ছেলের অভিনয় করিয়া বিলাসবন্যায় তলাইয়া যাইতেছে। চিরকালই ঢিমা তেতালা বাজাইয়া আসিয়া আজ জলদের সঙ্গে তাল দিতে গিয়া উপহাসাস্পদ হইতেছে।

বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষ্য হইতেছে ইন্দ্রিয়সুখ লাভের চরমোৎকর্ষতা। আর প্রাচীন সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ। আধুনিক সভ্যতার দেবতা হইতেছে অর্থ, প্রাচীন সভ্যতার দেবতা ছিল ধর্ম্ম। তাহার দেবতা পরিতুষ্টি জন্য আধুনিক সভ্যতা আনিয়াছে তাহার জটিল ও কুটিল চিন্তা। তাহাতেও দেবতা সন্তুষ্ট নহেন। আমরা যখন আমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিই সুচারুরূপে পাইতেছি না, আমরা যখন অন্ন বস্ত্রের সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেছি না তখন আমাদের জন্য অভাবের সৃষ্টি করিয়া নব সভ্যতা আনয়ন করা ধৃষ্টতা।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণের বর্ত্তমান দৈন্য সহায়হীন অবস্থা কে করিল? সহরের ভদ্রনামধারী কয়েকটী লোকের জন্য পল্লী বিলাসিতার খাদ্য যোগাইয়া তাহার এই দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছে। হাকিম আমলা উকিল মোক্তার প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ভদ্রনামধারী লোকের জন্য আমাদের পল্লী শতকরা পঁচাত্তর জন লোক নিরন্ন বস্ত্রহীন রহিয়াছে। যাহারা থাকিলে দেশ থাকিবে সত্বর তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা আধুনিক সভ্য সহরবাসীর কি উচিত নহে। যে শক্তি প্রকৃত পক্ষে দেশের ধনোৎপাদন করে ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে সেই শক্তি লোপ পাইলে সহর কাহার উপর প্রতিপত্তি করিবে? কুটীর শিল্পের চিরনিকেতন প্রাচ্য সভ্যতার প্রিয় ভবন পল্লী ভূমি ধ্বংশ হইলে দেশে থাকিবে কি? আমার দেশ বলিতে থাকিবে কি?

তাই বলি হে সাধক ভারত! তুমি এই প্রবল পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিবে? না বীরের ন্যায় স্রোতকে প্রতিহত করিবে? তুমি পশ্চিমের পিয়ানোর বাদ্যে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না বলভদ্রের রুদ্র আমন্ত্রণে সাড়া দিবে? তুমি যে ভাই, ত্যাগীর ছেলে ভোগে কেন ভুলিবে? দুঃখিনী ভারত মাতার সন্তান তুমি তোমার মায়ের দুঃখ মুছাইবে না পশ্চিমের শুভ্র কন্যাকে অঙ্ক লক্ষ্মী করিয়া বিলাসে ডুবিয়া থাকিবে? হে যোগী তুমি দেশব্যাপী জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়া দাও; বিলাসিতার আবর্জ্জনা হ্যাট টাইগুলা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক্। জড়ত্বের প্রতি মোহ অপসারিত করিয়া ফেল তোমার আত্মবোধের অভিনব শক্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠুক।

প্রাচীন সভ্যতার লীলানিকেতন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পল্লী আর বাঙ্গলায় নাই বলিলেই হয়। গ্রামের হাজার হাজার লোক কুটীর শিল্পের অধঃপতনে নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছি। এই অনিবার্য্য ধ্বংসের হস্ত হইতে আমাদের দেশকে রক্ষা করে কে? তাহাদের এক মুষ্টি অন্ন সংস্থান জন্য তাহারা পুনরায় কুটীর শিল্প গ্রহণ করুক এ কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় কে?

তাই প্রেমের গান প্রেমের কবিতা এক্ষণে রাখিয়া দিয়া দাও আধুনিক সভ্য বাঙ্গলা, অগ্রে দেশের নিরন্ন কোটি লোককে সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে। হে আধুনিক সভ্য ভ্রাতার তুমি ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা ছাড়িয়া পশ্চিমের স্রোতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছ, তোমার শরীর পশ্চিমের ঝড়ের মলিন ধুলায় ধুসরিত ও কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমার ঐ পল্লীবাসী ভ্রাতাগণ এখনও আগুনের মত শুদ্ধ, যোগীর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সৈনিকের মত কষ্টসহিষ্ণু আছে। তবে তাহাদিগকে প্রাচীন সভ্যতার পুরাতন আশ্রমে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। সেই ভাবী শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের ভিতর আমাদের জাতীয়তা আমাদের বিশিষ্টতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমাদের পল্লীগ্রামের অস্পৃশ্য উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত কুটীরগুলির ভিতর আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই পল্লী সংস্কারের ও পল্লী সমাজের পুনর্গঠনের উপর আমাদের সমূহ চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োগ করিতে পারিলে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার জীবনী শক্তির প্রকৃত স্পন্দন জাগিয়া উঠিবে। আমাদের বিশিষ্ট সভ্যতাকে পুনরানয়ন করিতে হইলে প্রাচীন পল্লীর শান্তিময় জীবনকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে। এস ভাই তোমার নূতন ধুলা ঝাড়িয়া মায়ের ক্রোড়ে ফিরিয়া আইস। মা যে তোমার জন্য দুঃখিনী পাগলিনীর প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। এস ভ্রান্ত মুগ্ধ বালক ফিরিয়া আইস। মায়ের করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছ না?

শ্রীবিপিনবিহারী দাস।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের বয়স।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের বয়স লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খৃঃ পূঃ ৫৬ হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত অভিজ্ঞান শকুন্তলের জন্ম সময়ের বহু মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই মত গুলির মধ্যে দুইটী প্রধান মত। একটী খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী—দ্বিতীয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। দ্বিতীয় মতটীর সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ বলেন যে সংবৎ নামক অব্দ বিক্রমাদিত্য প্রচার করেন এই সংবৎ অব্দ খৃঃ পূঃ ৫৬ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর দুই মত নাই। তবে বহু রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য মহাপ্রতাপশালী বিক্রমাদিত্য ৫৪৪ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করাইয়া সংবৎ অব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্যগণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সাপক্ষে প্রমাণ এই যে ৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই বিক্রম অব্দের কোন ফলক পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে বরাহমিহির ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হয়েন। এবং বৌদ্ধগণের উপর যে হিন্দুদিগের বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল তাহা প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে লুপ্ত হয় এবং অপর একজন নবরত্নের মধ্যে অমর সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন সুতরাং নবরত্নের প্রধান রত্ন মহাকবি কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় অভিজ্ঞান শকুন্তল রচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার খ্যাতনামা গ্রন্থ History of Sanskrit Literature এ যে কথা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The main thesis of Prof Max Muller is, that in the middle of the sixth century A. D. the reign of a King Vikramaditya of Ujjayini, with whom tradition connected the name of Kalidasa and other distinguished authors, was the golden age of Indian Court poetry. This renaissance theory is based on Ferguson's ingenious chronological hypothesis that a supposed King Vikram of Ujjayini having expelled the Scythians from India, in commemoration of his victory

founded the Vikrama era in 544 A. D. dating its commencement back 600 years to 57 B. C. The epigraphical researches of Mr. Fleet have destroyed Fergusson's hypothesis. From these researches it results that the Vikrama era of 57 B. C. far from having been founded in 544 A. D., had already been in use for more than a century previously under the name of the Malava era (which came to be called the Vikrama era about 800 A. D.). It further appears that no Sakas (Scythians) could have been driven out of Western Indian in the middle of the sixth ;century, because that country had alreday been conquered by the Guptas more than a hundred years before. Lastly, it turns out that, though other foreign conquerors, the Huns, were actually expelled from Western India in the first half of the sixth century, they were driven out, not by Vikramaditya but by a King named Yasodharman Vishnuvardhan.

Thus the great King Vikramaditya vanishes from the historical ground of the sixth century into the realm of myths. With the disappearance of Vikrama from the sixth century A. D. the memorial verse ধন্বন্তরি has lost all chronological validity with reference to the date of the authors it enumerates. None of the other arguments by which it has been attempted to place Kalidasa separately in the sixth century have any cogency. One of the chief of these is derived from the explanation given by the fourteenth century commentator Mallinatha, of the word Dingnaga occurring in the 14th Stanza of Kalidasa's Maghduta. The explanation to begin with, is extremely dubious in itself. Then it is uncertain whether Mallinatha means the Buddhist teacher Dingnaga. Little weight can be attach d to the Buddhistic traditoin that Dingnaga was a pupil of Vasubandhu, for this statement is not found till the sixteenth century. The assertion that Vasubandhu belongs to the sixth century depends chiefly on the Vikramaditya theory, and is opposed to Chinese evidence, which indicates that works of Vasubandhu were translated in A. D. 404. Thus every link in the chain of this argument is very weak. The other main argument is that Kalidasa must have lived after Aryabhattya (A. D. 499) because he shows a knowledge of the Scientific astronomy borrowed from the Greeks. But it has been shewn by Dr. Thibaut that an Indian astrominical treatise undoubtedly written under Greek influence the Romaka Siddhanta, is older than Aryabhatta, and cannot be placed later than A. D. 400. It may be added that a passage of Kalidasa's Raghuvansa (XIV-40) has been erroneously adduced in support of the astronomical argument, as implying that eclipses of the moon are due to the shadow of the earth ; it really refers to the spots in the moon as caused, in accordance with

the doctrine of the Puranas by a reflection of the earth.

Thus in the present state of our knowledge there is good reason to suppose that Kalidasa lived not in the sixth, but in the beginning of the fifth century A. D. The question of his age, however, is not likely to be definitely solved till the language, the style and the poetical technique of each of his works have been minutely investigated, in comparison with datable epigraphic documents, as well as with the rules given by the oldest Sanskrit "treatises on poetrics" ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে বিখ্যাত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ৩৭৫ হইতে ৪১৩ খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে মহাকবি কালিদাস উদ্ভূত হয়েন। ভিন্সেন্টস্মিথ মহাশয়ও এই মতের পোষণ করেন। কিন্তু এই মত সমীচীন হইলে ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাপ্রতাপবান বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অস্তিত্ব থাকে না। পাশ্চাত্যের ত গেল এই সব কথা—আমাদের প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মত এই যে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীনিঃসৃত কাব্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন আমি প্রাচীনমতাবলম্বী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মতই সমর্থন করি। কোন রাজা যদি কোন অব্দ স্থাপন করিতে চাহেন, তিনি যে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে অপর এক রাজার সময় হইতে আরম্ভ করিবেন তাহা কখন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আর ফলকের কথা বহুদিন হইল মালঞ্চে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই পুনরুক্তি করিতেছি। শুধু ফলকের উপর ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে যাইলে অনেক ভুল অনেক অসম্ভব গল্প রচনা করিতে হয়। আমাদের যে সর্ব্বস্বধন কতকগুলি পুঁথি আছে সেগুলিও ঐ ফলকের সঙ্গে নাড়া চাড়া করা চাই। পুঁথি না খুলিয়া কেবল দশাট আর কতকগুলি ফলকের উপর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। তাই আজ আমি অভিজ্ঞান-শকুন্তল খানি আর একবার আপনাদের সম্মুখে ধরিতে চাই। নাটকগুলি সমাজের সাময়িক চিত্র। যদি চিত্রী কৃতী হয়েন তাঁহার নক্সা তাৎকালিক সকল রসের নিখুঁত চিত্র দেখাইতে পারেন। মহাকবি কালিদাসের ন্যায় চিত্রী ত আর জগতে জন্মেন নাই। সামান্য অশিক্ষিত শ্রমজীবি হইতে রাজরাজেশ্বরের পর্য্যন্ত তাঁহার অতুলনীয় তুলিকার সাহায্যে চিরদিন জীবন্ত চিত্রপট অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রমজীবি অর্থ পাইলেই মদ্য পানের চেষ্টা করে তাহা চিত্রে কেমন ফুটাইয়াছেন :—

ষষ্ঠাঙ্কের প্রবেশকে শ্যাল বলিতেছেন :—

ধীবর মহত্তরো পিঅবঅস্সো দাণিং সংবুত্তো

তা কাদম্বরীসক্খিঅং অহ্মাণং পঢমসোহিদং

ইচ্ছীঅদী। ত সুণ্ডিআভবণং এব্বে গচ্ছামো।

এমন ছোট ছোট বিষয়গুলিও মহাকবির তুলিকার হাত হইতে এড়ায় নাই। অবান্তর ছাড়িয়া দিয়া মহাকবির বয়স লইয়া আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র হইতে মহাকবির সময় কাল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। মহাকবি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহার দু একটী দৃষ্টান্ত দিতে চাই। যখন শকুন্তলাকে রাজার বাটীতে আনা হইয়াছে রাজা গর্ভিণী দেখিয়া বলেন যে ইহার গর্ভে সন্তান ক্ষেত্রজ হইবে কারণ তিনি ঐ সন্তানকে তাঁহার ঔরস পুত্র বলিয়া সে সময় স্মরণ করিতে পারেন নাই।

রাজা বলিলেন—ভোস্তপোধন::চিন্তয়ন্নপি স্বীকরণ মত্রভবত্যা ন স্মরামি। তৎঃ বধৃমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানমক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

ক্ষেত্রজ শব্দ স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়ীভূত। স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের মহাকবি এই শব্দ ব্যবহার করিতেন না। তারপর য়ুরোপীয় স্মৃতিশাস্ত্র সমূহের যে en ventre Samere সম্বন্ধে বিধান হইয়াছে তাহা মহাকবি নায়কের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন নন্বুগর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থ মর্হতি।

গর্ভস্থ সন্তান যে পিতার সম্পত্তি পায় তাহা স্মৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলে প্রকাশ করা সুকঠিন।

এখন এই আইনের দিক দিয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলের বয়স ঠিক করা যাক্।

ষষ্ঠাঙ্কে রাজা বলিতেছেন—

কথং সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নৌব্যসনেন বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল সঃ। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয় ইত্যমাত্যেন লিখিতম্। (সবিষাদম্) কষ্টং খল্বনপত্যতা। বেত্রবতি মহাধনত্বাত্তত্রভবতা বহুপত্নীকেন ভবিতব্যম্। বিচার্য্যতাং কাচিদাপন্নসত্ত্বাপি তস্য ভার্য্যা স্যাৎ। প্রতিহারী—দেব দাণিং এব্বে সাকেদঅস্স সেট্‌ঠিণো দুহিদা নিবুত্তপুংসবণা জাআ সে সুণীঅদি।

রাজা—ননুগর্ভঃ পিত্র্যং রিক্‌থমর্হতি। গচ্ছ। এবমমাত্যং ব্রূহি।

এই রাজার কথা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা পত্নী সেই সময় উত্তরাধিকারিণী হইত না। বৈদিকযুগে পত্নী স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতেন। ঋগ্বেদে পত্নীর উত্তরাধিকারিণী হইবার প্রমাণ আছে। গর্ত্তারুগ্ ইব সনয়ে ধনানাং। এই সূক্তটীর অর্থ এই যে বিধবা পত্নী বিচারালয় হইতে তাহার স্বামীর ধন লাভ করিতে পারেন। বৃহদারণ্যক হইতে পাওয়া যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিবেন বলিয়া সন্তান লাভ ইচ্ছা করেন নাই:—

মৈত্রেয়ী হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্ বা আর অহম্ স্থানাৎ অস্মি হন্তত্তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং করবাণি ইতি। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আর্য্যগণের মধ্যে স্ত্রী জাতির উত্তরাধিকারিণী হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার সময় হইতে সৈন্যের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে পুত্র লাভ করা একটী পরম বাঞ্ছনীয় বস্তু ছিল। কিন্তু আর্য্যগণের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা বেশী না থাকায় আর্য্যগণকে শুল্ক দিয়া ছলবলকৌশলে ভারতের আদিম অধিবাসীগণের কন্যা বিবাহ করিতে হইত। এই জন্য আট প্রকার বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেক সময় কন্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া কন্যাকে পরাস্ত করিতে পারিলে তাহার সহিত বিবাহ হইত। চণ্ডী হইতে পাওয়া যায়. যো মাং জয়তি সংক্রমে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে সমে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

যখন এই সমস্ত রূপে অসুরকন্যাদিগকে আর্য্যগণ বিবাহ করিতে লাগিলেন—তখন স্বামীর মৃত্যুর পর জায়া তাঁহার ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি পাইলে সেইগুলি জায়ার পিতৃবংশের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিত। আর্য্যগণের সম্পত্তি অসুরগণ পাইয়া ধনবান হইবে এই আশঙ্কায় অপুত্রক পত্নী বিষয় পাইবেন বলিয়া বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী যুগে স্থির হইয়াছিল।

পিতাহরেদপুত্রস্য রিক্‌থং ভ্রাতর এব বা॥

অপুত্রকের বিষয় হয় পিতা নয় ভ্রাতা পাইবেন পত্নী পাইবার কোন বিধান হইল না। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। শ্লেগেল বলেন খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে হইয়াছিল এলফিনষ্টোন খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দ অধ্যাপক উইলিয়মস খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ম্যাক্সমূলার খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে বলেন। ডাক্তার বুলার ও অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন যে ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা প্রাচীন মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইতে রচিত হইয়াছে ও ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত দুইটী পণ্ডিত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার রচনা কাল খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী স্থির করিলেও উক্ত সংহিতার বিষয় বহু পূর্ব্বে বৃদ্ধমনু বৃহন্মনু বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র নামে বেদের পরবর্ত্তী সময় হইতে জনসাধারণের মধ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এবং ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা তাহার অনুবাদ মাত্র। মনুসংহিতার বহু পরে বিষ্ণু, কাত্যায়ন বৃহস্পতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

বিষ্ণু সর্ব্বপ্রথমে অপুত্রের ধন পত্নী পাইবেন এই কথা বলেন। বিষ্ণুস্মৃতি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে ইহার ১৬০ টী শ্লোক মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ বিষ্ণু স্মৃতির সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা যে মনুসংহিতার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে তাহা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন।

বিষ্ণুস্মৃতির পরবর্ত্তী সময়ে কাত্যায়ণস্মৃতি রচিত হইয়াছে। কাত্যায়ণ বলেন "পত্নী পত্যুর্ধনহরি যা স্যাদব্যভিচারিণী" ব্যভিচারিণী না হইলে পত্নী অপুত্রক স্বামীর ধন প্রাপ্ত হইবেন।

ক্যাত্যায়ণের সময়কাল ২০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন ইহাও যে মনুসংহিতার পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছেন এবং উত্তরাধিকারের ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতা গোত্রজা বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি মনুস্মৃতির বহুকাল পরে রচিত হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধগণের মুণ্ডিত মস্তক ও হরিদ্রা বর্ণ গাত্রাবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা যে বৌদ্ধ যুগের সময় বা তাহার পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক উইলসন ইহার রচনাকাল ২০০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ম্যাকডোনেল যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময়কাল ৩৫০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন এবং এই সময়কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃহস্পতি বলেন 'অপুত্রস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণী' ডাক্তার জলি বৃহস্পতি স্মৃতির সময়কাল ৬০০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বেদের পরবর্ত্তী সময় হইতে বিধবা পত্নী অপুত্রক স্বামীর বিষয় পাইত না। পরে বিষ্ণুস্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিধবা পত্নীর উত্তরাধিকার জন্মিয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতির সময় কাল জানা যায় নাই; তাহা ছাড়িয়া দিলেও অপর তিন খানি স্মৃতি অর্থাৎ কাত্যায়ণ বৃহস্পতি ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিশাস্ত্র খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে রচিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ মহাকবি কালিদাস খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে যে অভিজ্ঞান শকুন্তল রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহই খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের রচনা কাল স্থির করেন নাই। এজন্য প্রাচীন পথাবলম্বী আমাদের প্রাচ্যপণ্ডিতগণ যে খৃঃ পূঃ প্রথম অব্দ মহাকবির সময় কাল বলেন তাহাই সমীচীন। মহাকবির অনপত্যের বিধবা পত্নী বিষয় পাইবে না বলিয়া যে উক্তি তাহা মনুস্মৃতি ব্যতীত অন্য কোন স্মৃতি হইতে প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং যে সময় মনুস্মৃতির বিধি সমূহ প্রচলিত ছিল সেই সময়েই মহাকবি তাঁহার অমর নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

ওঁ শিবমস্তু।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

স্বাগত

অশোক-পলাশ-কাঞ্চন ফাগ লইয়া প্রকৃতি রঙ্গে,
উল্লাস রসে খেলিতেছে হোরি মধু মাধবের সঙ্গে;
সুনীল আকাশে রাঙা রবি হাসে, অনিল বহিছে মন্দ,
বিতরি মাধবী মল্লী সুবাস আম্র মুকুল গন্ধ;
গাহিছে কোকিল পঞ্চম রাগ ললিত মধুর ছন্দে,
এস এস সবে এ মধু বাসরে ব্যাকুল বাহুর বন্ধে!

তোমরা সাধক, কবি, গুণী, জ্ঞানী, ভারতী ভক্ত পুঞ্জ,
মেদিনীর এই পাষাণ বক্ষে রচিয়া বাণীর কুঞ্জ
নব নব তানে মা'র গুণ গানে জাগাও যতেক সুপ্ত,
নব চেতনায় জাগুক দেশের অতীত যা কিছু লুপ্ত।

তোমরা মহান্ অতিথি দেবতা কেমনে করিব তুষ্টি,
বিদুর কুটীরে নীবার কণিকা নাহিক পূর্ণ মুষ্টি;
পরশে সবায় কর গো পূর্ণ, নিঃস্ব আমরা রিক্ত,
স্নেহের সরস আশিষ ধারায় কর গো মোদেরে সিক্ত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মেদিনীপুর শাখার দশম বর্ষের কার্য্য বিবরণী।

অবতরণিকা ও গত অধিবেশনের কথা।

বর্ষে বর্ষে আপনাদেরই পুণ্য-আশীষধারা শিরে বহন করিয়া, আপনাদেরই অমৃতময় স্নেহরসে পুষ্ট হইয়া শিশু পরিষদটি তাহার চরম লক্ষ্যের পথে ছুটিয়াছে। পদে পদে তাহার শত বাধা পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আপনাদেরই উৎসাহে আবার তাহার শিথিল ক্লান্ত চরণে নব বল আনিয়াছে। তাহার পথ চলার কাহিনী আশা-নিরাশার কথা আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। প্রার্থনা পদে পদে তাহার সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

গত বর্ষের গৌরবময় ইতিহাস ইহার বক্ষে যে এক প্রাণোন্মাদী নব চেতনার সঞ্চার করিয়াছে তাহারি পুণ্য ফলে একদিন ইহার সাধনা যে জয়যুক্ত হইবে সেরূপ

আশা করা যাইতে পারে। ত্রয়োদশ সাহিত্য-সম্মিলন এই ক্ষুদ্র পরিষদেরই যত্নে ও চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের উদ্বোধনের বাঁশরী রবে বঙ্গের সুদূর নিভৃত পল্লীর প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত মায়ের ডাক পৌঁছিয়াছিল, দলে দলে ভক্তের দল শ্রেষ্ঠঅর্ঘ্য লইয়া মায়ের দেউল দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রধান পুরোহিত ছিলেন পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মী সুপণ্ডিত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় সাহিত্যের, শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইতিহাসে, রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ বি এল মহাশয় দর্শনে, ও রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহোদয় বিজ্ঞানে তাঁহাদের অক্ষয়জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নাবলী আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমাদের শাখা পরিষদের নবম বর্ষের পুরোহিত রূপে পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয় তাঁহার সুধানিস্রাবী বক্তৃতার দ্বারা আমাদের বুকে অনেক আশার কথা জাগাইয়া দিয়াছেন। আর আমাদের এই সারস্বত যজ্ঞে দেশের রাজপুরুষগণ রাজা, জমিদারবর্গ, ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকগণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারীগণ স্বেচ্ছা সেবকদল, এমন কি দেশের আপামর সাধারণ সকলেই অর্থে সামর্থ্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি দানে আমাদের এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করিয়া আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে নাড়াজোল রাজ প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণের ও সভাপতি মহাশয়ের আতিথ্যের ভার গ্রহণ করিয়া এবং "মতি" "হিতৈষী", "কমলা" ও "লক্ষ্মী" প্রেসের স্বত্বাধিকারীগণ বিনা ব্যয়ে মুদ্রন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের ঋণের বোঝা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিয়াছেন, পরিশোধের সামর্থ্য আমাদের কোন দিনই হইবে না।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা।

এবার আমাদের বহুদিনের একটি আশা ফলবতী হইয়াছে। বহুদিন আমাদের এই শাখা সাহিত্য পরিষদ হইতে একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী ছিল কিন্তু দরিদ্র পরিষদের ভিক্ষার ঝুলির দিকে চাহিয়া তাহা এতদিন দরিদ্রের মনোবাসনার মত হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইয়া গিয়াছে। কোন দিনও হয়ত আমাদের এই স্বপ্ন সফল হইত না যদি না আমাদের অন্যতম উদ্যমশীল সদস্য মতিপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ফকির দাস চন্দ্র মহাশয় ছয়মাস বিনা ব্যয়ে মুদ্রনের ভার লইতেন। তাঁহারি উৎসাহে আমরা এই কর্ম্ম সিন্ধুতে ঝাঁপ দিয়াছি। গত আশ্বিন মাস হইতে মাধবী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম, এ, বি, এল, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস। দেশের এই নব জাগরণের যুগে, গৃহে গৃহে জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া বঙ্গভারতীর সেবা ও অর্চ্চনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধন পথ রচনা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই দীন অকপট আয়োজন। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সংখ্যক গ্রাহকগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি তাহা কাগজ চলার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইখানেই অনেক সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত আছেন তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইলেই আমাদের "মাধবী"কে চিরকাল অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। আশাকরি কেহই পরিষদের মুখপত্রের মুখ বন্ধ করিতে চাহিবেন না।

দ্বিতীয় কথা দেশে সাহিত্যচর্চ্চার বহুল প্রচার ও উন্নতিকল্পে আমাদের নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়গণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ঘোষণা করিয়াছেন। যথাসময়ে বিষয়গুলি বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

১। অবিনাশ চন্দ্র মিত্র রৌপ্যপদক—

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র।)

২। সুষমা রৌপ্যপদক—

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র।)

৩। সিদ্ধেশ্বরী রৌপ্যপদক—

(শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু।)

৪। বিদ্যাসাগর স্মৃতি রৌপ্যপদক—
(শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু।)

৫। গিরিবালা স্মৃতি রৌপ্যপদক—
(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

৬। বরদা কান্ত স্মৃতি রৌপ্যপদক—
(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।)

এই ঘোষণার ফলে "মেদিনীপুরের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা, উন্নতির উপায় ও অবনতির কারণ" শীর্ষক অমূল্য প্রবন্ধটি পাইয়াছি। কিন্তু তাহার লেখক হেম কমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা বড়ই অকালে হারাইয়াছি। শুধু তাঁর এই স্মৃতিটুকুই পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ও অক্লান্ত সেবার কথা আমাদিগকে চিরদিনই স্মরণ করাইয়া দিবে।

৩য় কথা দুইজন অভিভাবক সদস্য লাভঃ— একজন এখানকার সুযোগ্য সদর সবডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহোদয় ও আর একজন রায় মন্মথনাথ বসু বাহাদুর বি, এল মহোদয়।

সদস্য সংখ্যা ঃ—

আলোচ্যবর্ষে সদস্য সংখ্যা মোট ১১৮ জন। তন্মধ্যে সাধারণ সদস্য ১০৫ জন, অভিভাবক সদস্য ১০ জন, অধ্যাপক সদস্য ৩ জন। পূর্ব্বাপেক্ষা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি এই সভাতেই এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আমাদের এই মাতৃ-ভাষার সেবাব্রতে যোগদান করেন নাই। আমরা তাঁহাদের স্নেহ সহানুভূতি ও সহায়তা ভিক্ষা করিতেছি। বান্ধব সদস্যের অভাব বুঝি এ জন্মেও পুরিল না। বহুবার এ অভাবের কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিয়াছি। আশা করি আপনারা স্নেহ হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইবেন।

কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবল দেব বি, এ
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মণীষিনাথ বসু সরস্বতী এম, এ, বি, এল।
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি, এল।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ দে।
,, মহেন্দ্রনাথ দাস।
,, মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল।
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়।
,, শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী।
হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু।
,, ঈশান চন্দ্র মহাপাত্র বি, এল,

ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ১০ জন কর্ম্মকর্ত্তা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, নলিনীরঞ্জন বসু, ডাক্তার শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মন্মথনাথ দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহোদয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি। সকলেই নিঃস্বার্থভাবে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরিষদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পরিষদ মন্দির ঃ—

মায়ের সুযোগ্য সন্তান অক্লান্তকর্ম্মী স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিষদকে বিশাল মহীরুহের আশ্রয়ে বসাইয়া দিয়াছেন তাঁহারই প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ও পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শী আহ্বানে আমরা প্রথমে এ বিষয়ে আশান্বিত হইয়াছি। তাহার পর হইতেই আমরা প্রতিবর্ষেই কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। গত সম্মিলনের উদ্বৃত্ত টাকা হইতেও কিছু পাইবার আশা আছে। কেবলমাত্র একটি সুবিধাজনক স্থানের অভাবে আমরা মাতৃমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিবার আয়োজন করিতে পারি নাই। যেস্থানে আজ এই সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে এই স্থানটাই পাইবার জন্য আমরা সরকার বাহাদুরকে আবেদন করিয়াছি। এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। আপনাদের স্নেহ রসে পুষ্ট হইয়া যে সভাটি আজ দ্বাদশ বৎসর বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে চলিয়াছে সেটী যাহাতে চিরকাল মেদিনীর বক্ষে জাগিয়া থাকে তাহার জন্য অগ্রসর হউন। আমাদের ভাণ্ডা

জননীর পূজার মন্দির নির্ম্মাণে মায়ের সেবক আপনারা সহায় হউন, আমাদের ভিক্ষার ঝুলি দু হ'তে পূর্ণ করিয়া দিন, আপনাদেরই অক্ষয় কীর্ত্তি তাহার ভিত্তি গাত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। এ বিষয়ে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের সভক্তি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রবন্ধ।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৬০টী প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সমূহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য:—

মণীন্দ্র নাথ বসু সরস্বতী।
এম, এ, বি, এল

১। মাতৃপূজা।

২। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণের কালনির্ণয়।

৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয়।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস।

নবীন চন্দ্রের শৈলজা চরিত্র রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে এবং বিস্মৃতির সাধনা।

শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল,

কাব্য ও দর্শন।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার।

সাহিত্য চর্চ্চার প্রচার কল্পে আমাদের এই শাখা পরিষদে একটি পুস্তকাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের সামর্থ্য অতি সামান্য। গ্রন্থকার প্রকাশক ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণের কৃপা ও সহানুভূতিই ইহার প্রাণ। আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরাও প্রতি বৎসর কিছু কিছু পুস্তক ক্রয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমরা উহা সুন্দর ও উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছি। এবার আমাদের "মাধবী" পত্রিকার কল্যাণে আমরা সমূহ বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা বিনিময়ে পাইতেছি। পরিষদ মন্দিরে সকলেই আসিয়া বিনা চাঁদায় নিয়মিত সময়ে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে পারেন। আলোচ্যবর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুস্তকের সংখ্যা—৯৩১

অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের সর্ব্বপ্রকার ৭৬টী অধিবেশন হইয়াছে। তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম:—

সাপ্তাহিক অধিবেশন—৪৩
মাসিক অধিবেশন——৫
কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ৫
অভ্যর্থনা সমিতি—— --২
প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি ৬
নাট্য সমিতি————২
পত্রিকা প্রকাশ সমিতি

মূল পরিষদে ও অন্যান্য শাখা পরিষদে সাধারণতঃ কেবল মাত্র মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমরা প্রথম হইতেই মূল পরিষদের অনুমোদন ক্রমে মাসিক ব্যতীত সাপ্তাহিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহা দ্বারা আমরা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা অনেকেরই প্রাণে সাহিত্য চর্চ্চার অনুরাগ জন্মিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অধিবেশনের মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি সভা দুটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায় মন্মথ নাথ বসু বাহাদুর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জীবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর স্মৃতি সভায় সর্ব্বজন পরিচিত পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় তাঁহার জীবনীর পর্য্যালোচনা করিয়া একটি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

আয় ব্যয়—

আলোচ্যবর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ২৭৭৵৭॥ আয় হইয়াছে। পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়, বাঁধাই, আলমারি ক্রয়, অধিবেশনের খরচ ইত্যাদি কার্য্যে ১৯৭৸৵১৫ টাকা ব্যয় হইয়া ৭৯॥৵১২॥ টাকা মজুত আছে। এই স্থায়ী ভাণ্ডারের সহিত বার্ষিক উৎসবের ব্যয়ের কোন সংস্রব নাই। উহা দেশবাসী ও সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে

প্রাপ্ত বিশেষ চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এজন্ত তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

শোক প্রকাশ—

এবারে আমরা আমাদের উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে হারাইয়াছি। আজ মিলিত অশ্রুজলে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

উপসংহার—

ইহাই আমাদের সারাবর্ষের সুখ দুঃখের, আশা নিরাশার সাফল্য ও বিফলতার ক্ষুদ্র কাহিনী। জানিনা আমরা ভাষা-মাতৃকার সেবায় কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি; তাহার বিচারের ভার আপনাদের উপর দিলাম। উপসংহারে আমাদের এই ভিক্ষা, চিরদিন আপনারা যে স্নেহধারায় আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিষদকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে যেন কোনদিন বঞ্চিত না হই। আমাদের পবিত্র ব্রতে, আমাদের এই শ্রদ্ধানিত শিরে আপনাদের পুণ্য আশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষিত হউক।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদায় গীতি

যদি, জীবন বীণায় সুর দিয়ে শুধু
না গাহিতে গান যাবে গো চলে,
নিয়ে যাও সাথে যত হাসি তবে
দিয়ে যাও ব্যথা মরম তলে।

এযে, সুর গেছে থেমে মিলায়েছে তান,
এখনো বীনায় ভ'রে উঠে গান,
কণ্ঠ নীরব তবু একি দান!
নিবিড় বাঁধন বিদায় ছলে!
সাঙ্গ কি হ'ল সব দেওয়া নেওয়া,
আজি হতে সুরু হ'ল পথ চাওয়া,
আঁখি মুদে আসে ভাবিতে এ পাওয়া
এ কি এ পুলক নয়ন জলে!

ওগো! জেগে রবে চির এই জাগরণ,
বোঝাব কেমনে বোবার স্বপন,
বিরহের ক্ষণে এ নব মিলন
রবির কিরণ নীহার দলে!

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন ও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-শাখার দশম বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ১৯শে ও ২০শে ফাল্গুন, শনিবার ও রবিবার, প্রত্যহ অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন এবং স্থানীয় শাখা সাহিত্য পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিবস দৈবদুর্বিপাকে প্রাতঃকাল হইতে ঘন ঘন বারিপাত হওয়ায় সম্মিলনের নিমিত্ত স্থানীয় বেলীহলের সম্মুখস্থ মুক্ত প্রান্তরে যে পুষ্পপল্লবশোভিত প্রশস্ত মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া ঐ দিবস বেলীহলের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুখের বিষয় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সত্ত্বেও সদর মফঃস্বল হইতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া সাহিত্যানুরাগ ও এই প্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য মান্য বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া দেশের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যেও অনেকেই যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। জেলার সহৃদয় সর্ব্বজনপ্রিয় কালেক্টর মিঃ ম্যাদুক মহোদয় শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া সমবেত সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নিয়তির কঠোর বিধানে এ হেন হিতৈষী রাজপুরুষের আকস্মিক অকালবিয়োগে এই সম্মিলনের অনুষ্ঠানকল্পে তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা স্মরণ করিয়া সেই পরলোকগত আত্মার সমীপে আজ তাই কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে আমাদের অন্তরের গভীর ঋণ জ্ঞাপন করিতেছি। মিলন-উৎসবের বুকভরা আনন্দের কলধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে উৎকট শোকের এই নিদারুণ শেল চিরদিন আমাদের অন্তর মথিত করিবে। আমরা কায়মনোবাক্যে মিঃ ম্যাদুকের বিয়োগবিধুরা পত্নী ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিমিত্ত শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

সাহিত্য-সম্মিলন সভার সভাপতি হইয়াছিলেন বাঙ্গলার খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসু, এম, এ, এফ আর জি, সি (লণ্ডন)। একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবর এই মহানুভবের পবিত্র স্পর্শে সত্যই এবার দেশের সাহিত্য-সম্মিলন গঙ্গাযমুনাসম্মিলিত পুণ্য প্রয়াগতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে নিম্নোক্ত কয়জন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ও এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
২। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত।
৩। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ এম, এ, বি, এল
৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দাস এম, এ, বি, এল।
৫। শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ।
৬। শ্রীযুত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম, এ।
৭। শ্রীযুত লাডলীমোহন মিত্র এম, এ।
৮। শ্রীযুত প্রমোদ চন্দ্র সেন এম, এ।
৯। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রথমোক্ত দুইজন ছাড়া ইঁহাদের সকলেই নাড়াজোল রাজকুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের অতিথি হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও কুমার বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের যথোচিত আতিথ্য সৎকার ও আদর আপ্যায়নে যেরূপ ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার নিমিত্ত

গর্ব্বে ও উল্লাসে আমাদের অন্তর ভরিয়া উঠে। ক্ষোভের বিষয় পারিবারিক অসুস্থতার জন্য সভাপতি মহোদয় দ্বিতীয় দিন অবধি সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে আগত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণও প্রথম দিনের বৈঠক শেষে পরদিন প্রাতেই তাঁহার সহিত মেদিনীপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

প্রথম দিবস।

এই দিবস ডায়মণ্ড এমেচার কনসার্ট পার্টি কর্ত্তৃক ঐকতান বাদন হইলে সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। নিম্নোক্ত দ্বাদশটী কুমারী সমস্বরে "বাণীস্তোত্র" আবৃত্তি করেন :—

১। কুমারী রাধারাণী দাসী।
২। „ মায়ারাণী বসু।
৩। „ অমিয়বালা বসু।
৪। „ পদ্মরেণু বসু।
৫। „ বিভাবতী দত্ত।
৬। „ বীণাপাণি দত্ত।
৭। „ বীণাপাণি নাগ।
৮। „ লাবণ্যময়ী মিত্র।
৯। „ হিরণ্ময়ী মিত্র।
১০। „ কিরণময়ী মিত্র।
১১। „ পারুলবালা বসু।
১২। „ রত্নমালা দেবী।

তারপর ইহাদের মধ্যে কুমারী রাধারাণী দাসী ও কুমারী মায়ারাণী বসু উভয়ে মিলিয়া 'বাণীবোধন' গীতটি গান করেন। শাখা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সুগায়ক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চন্দ্রের যত্ন ও চেষ্টায় কুমারীবৃন্দের গীতগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। গান শেষ হইলে স্থানীয় সুযোগ্য সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন শ্রীযুত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সম্মিলন-সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার পরে কুমারীগণ সমস্বরে 'অভ্যর্থনা সঙ্গীত' গাহিলে সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, স্থানীয় সুযোগ্য জমিদার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি এ মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে নাড়াজোল রাজকুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খান মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহোদয়ের সমর্থনে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি মহোদয় প্রভূত উল্লাসব্যঞ্জক করতালিরবের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে এবং অব্যবহিত পরে অপর কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। অনন্তর সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধীরগম্ভীর স্বরে স্বীয় অভিভাষণখানি পাঠ করেন।

অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে অভিনয়কৃতিত্বের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত তিনটি রৌপ্যপদক বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পদক বিতরণ প্রসঙ্গে বলেন যে স্থানীয় শাখা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত পরলোকগত প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের কয়েকটি মাত্র অঙ্ক দেখিয়া তিনি স্বয়ং ও খ্যাতনামা প্রবীন নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় 'রমেশ' 'যোগেশ' ও 'জগমণি' ভূমিকায় অভিনয়চাতুর্য্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে গতবৎসর এই তিনটি ভূমিকার অভিনেতৃবর্গকে তাঁহারা তিনটি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। কথা ছিল এই বার্ষিক অধিবেশনে সেই পদকগুলি বিতরিত হইবে। ক্ষীরোদবাবু স্বয়ং অসুস্থতানিবন্ধন আসিতে না পারায় 'যোগেশের' ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য মহাশয়কে প্রতিশ্রুত রৌপ্যপদকটি প্রদান করিতে তাঁহার মারফৎ প্রেরণ করিয়াছেন। খগেন্দ্র বাবুও অসুস্থ থাকায় 'জগমণির' ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয়কে প্রতিশ্রুত রৌপ্যপদকটি প্রদান মানসে তাঁহার মারফৎ পাঠাইয়াছেন।

আর তিনি স্বয়ং 'রমেশে'র ভূমিকার অভিনেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়কে তাঁহার নিজের প্রতিশ্রুত রৌপ্যপদকটি প্রদান করিতে আসিয়াছেন। নলিনীবাবু অতঃপর একে একে পুরস্কৃত অভিনেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া পদকগুলি যথাবিধি বিতরণ করেন। দেবকিশোর বাবু অনুপস্থিত থাকায় এবং মন্মথ বাবু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাদের রৌপ্যপদক প্রেরণের বিহিত ব্যবস্থা করা হয়।

পদকবিতরণ শেষে শাখা সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের বর্ষবিবরণী পাঠ করেন। তারপর কুমারীবৃন্দ কর্ত্তৃক সমস্বরে একটি মাঙ্গলিক সঙ্গীত গীত হইলে এই দিবস সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। এই দিবস রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সম্মিলনের নিমিত্ত নির্ম্মিত মণ্ডপমধ্যে শাখা সাহিত্য পরিষদের সদস্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত পরলোকগত কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'পরপারে' নাটকখানি অভিনীত হয়। প্রশস্ত মণ্ডপখানি দর্শকবৃন্দে সম্পূর্ণ ভরিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস।

এই দিবস প্রথমে কুমারীবৃন্দ কর্ত্তৃক একযোগে 'বাণী আবাহন' গীত হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সভাপতির অনুপস্থিতে প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রদ্ধেয় জলধর বাবু আসন গ্রহণান্তে যথারীতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইলে শাখা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা পাঠ করেন। ইঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মি, এ ডবলিউ কুক সি আই ই, আই সি এস মহোদয়, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বিজ্ঞানাচার্য্য মহোদয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহোদয় এবং গড়বেতা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর প্রতিনিধি সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরসমধুর বক্তৃতায় সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে আপ্যায়িত করিয়া 'ভাষাতত্ত্বের 'মুখবন্ধ' শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অনন্তর যথাক্রমে নিম্নোক্ত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়:—

১। মিলন-মঙ্গল (কবিতা)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
২। অভিজ্ঞান শকুন্তলের বয়স—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র স্মৃতি ভূষণ, এম, এ, বি, এল।
৩। স্বাগত (কবিতা)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৪। জৈন তীর্থঙ্করদিগের পরিচয়—শ্রীপ্রবোধ কুমার দাস, এম, এ, বি, এল।
৫। সঙ্গীত চিত্র—চৌঃ যাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র বি, এ।
৬। বাণীর ক্রন্দন—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।
৭। অভিমান—শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৮। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা—শ্রীবিপিন বিহারী দাস বি, এ।

প্রবন্ধাদি পাঠ শেষ হইলে জলধর বাবু বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও উপদেশপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে বৎসর বৎসর এই শ্রেণীর সাহিত্যিক অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সুন্দর করিতে হইলে প্রধানতঃ তিনটি প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। প্রথম—সম্মিলন সভায় একদিনে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ না হইয়া এক একবার যাহাতে সাহিত্যাদি এক এক বিষয়ের আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ হয়, সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নে আলোচ্য বিষয়সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সভাপতি এবং বক্তা বা লেখক বর্গের প্রবন্ধ আবাহন পূর্ব্বক আলোচ্য বিষয়ের যথাবিহিত আলোচনা হইলে সভায় সমাগত সকলেরই সেই সেই বিষয়ে শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা ও প্রচুর

অবসর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ ও বিশ্বাস আকৃষ্ট হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ—লোকশিক্ষামূলক ব্যবস্থা যথা, রঙ্গাভিনয়, যাত্রা, কথকতা, কবির গান, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতির আয়োজন করিলে এই প্রকার সাহিত্যিক অনুষ্ঠানকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের একটা রমণীয় মিলনভূমি করিয়া তুলিতে পারা যায়। যাহাতে এই তিনটি উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাখা সাহিত্য পরিষৎ উত্তরোত্তর দেশের হৃদয় জয় করিতে পারেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে দেশের মিলন মন্দির করিয়া গড়িতে পারেন তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

বক্তৃতা শেষ হইলে শাখা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয় শাখা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রৌপ্যপদকদাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদত্ত মহোদয় পরিষদের পক্ষ হইতে এই সম্মিলনের সাহায্যকল্পে যাঁহারা নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করেন। তাঁহার উল্লিখিত তালিকার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় এবং কলিকাতা হইতে সমাগত সজ্জনবৃন্দ।

২। ডায়মণ্ড এমেচার কনসার্ট পার্টি।

৩। বান্ধব নাট্যসমাজের সভাপতি—

শ্রীঅমরনাথ রায়।

৪। 'মতি' 'কমলা' ও 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' প্রেসের স্বত্বাধিকারীবৃন্দ।

৫। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

৬। কালেক্টরীর কর্তৃপক্ষ।

৭। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ।

৮। স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতির অধ্যক্ষবৃন্দ।

৯। চাঁদাদাতৃগণ প্রভৃতি।

পণ্ডিত মহাশয়ের এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি এ মহোদয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

এই সময় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শাখা সাহিত্য পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে একটী অনুযোগপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুইটী শাখা রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর দেশের ও দশের অতি বড় গৌরবের বস্তু। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের স্থায়ী মন্দির গঠিত হইয়াছে। তাঁহার বড় আশা ছিল মেদিনীপুরেও শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ অবধি সে কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। এমন সাহিত্যানুরাগী দেশবাসিগণ, এমন হিতৈষী দেশনেতৃবর্গ, এমন দানশীল রাজা, জমিদারবর্গ থাকিতেও এই মন্দিরনির্ম্মাণকল্পে যে কি অন্তরায় ঘটিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমার বিশ্বাস মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ অচিরে এই সঙ্কল্পসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া অধিকতর আগ্রহে ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস করিবেন এবং সহৃদয় দেশবাসী মাত্রেই তাঁহাদের এই পুণ্যব্রত পালনে আর্থিক সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

অনন্তর কুমারী রাধারাণী দাসী কর্তৃক একটী বিদায় সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভাভঙ্গের পর স্থানীয় বেলীহলে প্রতিনিধি সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রমুখ কতিপয় ভদ্রমহোদয়ের ও শাখা সাহিত্য পরিষদের উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একত্রে একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়; এবং ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে একটী সান্ধ্যসম্মিলনে গীতবাদ্যাদি, চা ও যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। পরিষৎ সদস্যবৃন্দের অনেকেই এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

গত ৩রা চৈত্র শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় শাখা সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র মিত্র বি, এ মহোদয়ের সৌজন্যে ও আনুকূল্যে একটী প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। পরিষদের সদস্য, বান্ধব, হিতৈষী ও অভিভাবকবর্গ এই প্রীতি সম্মিলনে যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ,। বৈশাখ, ১৩৩০ ৮ম সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

নিয়মাবলী

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩।৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২৷৷০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	"

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মেদিনীপুর শাখাতে দশম বার্ষিক অধিবেশনে মঙ্গলাচরণ-গায়িকা বালিকাগণ ও তাঁহাদের শিক্ষক।

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

১ম বর্ষ, | বৈশাখ, ১৩৩০। | ৮ম সংখ্যা।

কবিতা-সুন্দরী।

বহু বহু দিন পরে অয়ি বরাননে!
আজি পুন দেখা যদি হ'ল তব সনে
যেয়োনা এখনি চলি; রহ কিছুক্ষণ
হেরি আমি সর্ব্বেন্দ্রিয় করি উন্মিলন
মহিমার সমারোহ সম অতুলন
অনিন্দ্য লাবণ্য তব। এস এস কাছে
তোমারে যে চিত্ত মোর নিত্য যাচিয়াছে
বাঁচিবার আগ্রহ সমান; তাই আজি
তোমা চেয়ে প্রাণে মোর উঠিতেছে বাজি
উন্মদ ঝঙ্কার এক, অন্তরে অন্তরে
বিদ্যুৎ প্রবাহ সম কি যেন সঞ্চরে
নয়ন নিমেষ হারা, মরমের কথা
চাহে যেন বাহিরিতে হইয়া শতধা
উচ্ছলিয়া তরঙ্গ মতন; যেন আর
শতদল সম চিত্তে শত কল্পনার
ফোটে ফুল নানা বর্ণে।
অয়ি মধুময়ি!
কত কথা মনে আজ পড়ে রহি রহি—
এমনি প্রফুল্ল এক বসন্ত দিবসে
নিরালায় নদী কূলে একা আছি বসে
মুগ্ধ দৃষ্টি প্রসারি সমুখে; পরপারে
ভুরু রেখা সম কালো বনের আঁধারে
ডুবিতেছে দিনমনি তরুরাজি শির
রঞ্জিয়া স্বর্ণবর্ণে; অধীর সমীর
মদির মঙ্গল বাসে স্তব্ধ চারি ধার;
কচিৎ কখনো দূরে মুগ্ধ পাপিয়ার
শোনা যায় মধু স্বর। সে পুণ্য লগনে
খসে পড়া তারা সম চঞ্চল চরণে
এলে তুমি কোথা হতে! তোমায় নিরখি
মনে হল যেন আমি হেরিলাম সখি
মুর্ত্তিমতী গীতি এক; কিম্বা যেন চোখে
হেরিনু সে প্রদোষের অস্ফুট আলোকে
শরীরী বসন্তলক্ষী!
সেই দিন হতে
সেবেছি তোমায় আমি নিত্য কত মতে
প্রাণপণে নিশিদিন; বসন্তে এমনি
সাজায়েছি ওই তব দেহখানি ধনি
অশোকের চীনাংশুকে; প্রখর নিদাঘে

শালের মুকুট গড়ি কত অনুরাগে
পরায়েছি শিরেতে তোমায় ! বরষায়
গাঁথিয়া মালতি মালা তোমার গলায়
দিয়াছি পরম সুখে, শরৎ প্রভাতে
কঙ্কন কমলে গড়ি — তোমার দু হাতে
পরায়েছি কি আনন্দে ! হেমন্তে মধুর
দিয়াছি মেখলা তোমা উল্লাসে প্রচুর
অপরাজিতায় গড়ি, শিশিরে আবার
দিয়াছি দুকর্ণে তব কুন্দ মুকুতার
দোলায়ে মোহন দুল ; এইরূপে সদা
লীলায় কাটিত দিন।
সহসা একদা
ঝঙ্কৃত বীণার তার ছিঁড়িবার মত
নিমেষে লুকালে তুমি। সে হতে নিয়ত
খুঁজিতেছি তোমা আজি জলে, স্থলে, ব্যোমে,
হাহাকারে বক্ষ চিরি ; কিন্তু প্রাণতমে !
এমনি পাষাণী তুমি তবু কভু হায়
দাওনি উত্তর।
তাই মিনতি তোমায়
ভুলায়োনা আর মোরে মিথ্যা ছলনায়
মরিচি আশ্বাসে গাঢ়, চেয়োনা অমন
উন্মাদনা ময় ওই দীপ্ত সুতীখন
নয়নে আমার পানে। শোন নিবেদন,
ক্ষমা দাও এই তব নিঠুর কৌতুকে
টানিয়োনা আর মোরে বিশ্বের সমুখে
সম্মোহন হাস্যে মধু ; আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ
কেমনে যাইব যবে সহস্র নয়ান
সেথায় আমারে চাহি হানিবে বিজলি
এক সাথে নিমিষে নিমিষে ! তাই বলি
আমারে থাকিতে দাও আড়ালে গোপনে
সকল হইতে দূরে ; সেথা নিরজনে
গাহিব একলা বসি, আপনার মনে
ভগ্ন একতারা হাতে ; আনন্দে সতত
শিশুর জননী মুখ চেয়ে থাকা মত
চেয়ে রব ওই দূর সুদূর গগন
চন্দ্র-তারা-রবিদীপ্ত ; সমস্ত জীবন
ডুবায়ে রাখিব সদা এই বসুধার
রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে, ইহা ছাড়া আর
নাহি অন্য অভিলাষ !
কিন্তু অয়ি রাণি
এমনি কুহকময় তব মৌন বাণী
চুম্বক সমান যেন তাহা ধীরে ধীরে
পলে পলে ঠেলে মোরে আনিছে বাহিরে।

* * * * *

তাই হোক এস তবে মানস সুন্দরি !
পেলব ও দুটী হাত আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে দাও জড়াইয়া, চুম্বন সুরায়
ভরিয়া উঠুক চিত্ত নব চেতনায়
প্রেরণার প্রদীপ্ত অলোকে। সেই শান্তি
সে আরাম দিক ক্লিন্ন-ক্লিষ্ট ম্লান-কান্তি
হৃদয়ের সর্ব্ব দৈন্য অতৃপ্তির পর
পরম সম্পদ এক গভীর সুন্দর।

শ্রীনলিনী নাথ দে

শৈলজা—কুরুক্ষেত্রে।

শৈলজা রৈবতক ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রৈবতকে আসিবার সময় পাপ-অভিসন্ধি-প্রসূত যে বীভৎস নরক হৃদয়ে বহন করিয়া আনিয়াছিল, রৈবতক-বাস অবসানে তৎপরিবর্ত্তে এক বিশাল বিশ্বপ্রেমের সূচনা-স্বর্গ লইয়া সে চলিয়া গেল!

কিন্তু এই বিশ্বপ্রেমাঙ্কুরের ধারণা করিতে শৈলজা সঙ্গে সঙ্গেই পারিয়া উঠে নাই। রৈবতক ছাড়িয়া মুক্তা বনাবহঙ্গিনীর ন্যায় সে যখন এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ছায়ার মতন চলিতে লাগিল তখন তাহার জীবন উদ্দেশ্যবিহীন—যাত্রা অনির্দ্দিষ্ট! সে চলিতেছে বটে কিন্তু কোন্ পথে—কোথায় যাইতেছে কিম্বা কেন যাইতেছে তাহা সে জানে না! সে দেখিল—

"———উপরে আকাশ
শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময়, মরুময়
নিম্নে ধরাতল; হু হু রবে সমীরণ
যাইছে বহিয়া।"

আর এই মহা মরুভূমির মধ্য দিয়া শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত পদে একাকিনী, অনাথিনী সে চলিয়াছে! তাহার মনে হইল—

"আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারিদিকে
হু হু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।"

অর্জ্জুনগতপ্রাণা রমণী নিরাশার এই কঠোর দাবদাহকর উত্তাপ বুকে লইয়া কতক্ষণ পথে চলিবে? ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে ভূতলে পড়িয়া গেল। নিদ্রা কি মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার চেতনা অপহরণ করিল সে বুঝিতে পারিল না। বিস্মৃতির এই অঙ্কে সহসা যেন এক মধুর স্বপ্নের চকিত স্পর্শে সে সচেতন হইয়া উঠিল! তাহার বোধ হইল যেন সে কোন্ এক অতীন্দ্রিয় অবাস্তব রাজ্যে অবস্থিত। সেখানকার জগত যেন নিয়ত শ্যামশোভাময় ও আনন্দময়। বিচিত্রবর্ণের কুসুমরাজি সৌরভ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। নবোদিত ভাস্কর মৃদু কিরণ ছড়াইয়া এক অপূর্ব্ব সুষমায় ধরণীকে প্লাবিত করিয়াছে। বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে সুখের গান, মানবের মুখে মুখে প্রীতির বিমল হাসি। শৈলজা দেখিল পার্থ যেন শিয়রে বসিয়া স্বীয় অঙ্কে তাহার শান্ত মুখখানি স্থাপন করিয়া তাহাকে অমিয় বচনে কি বলিতেছেন। তাঁহার মুখ প্রশান্ত, স্থির পিতৃস্নেহপূর্ণ—নয়ন যেন স্নেহ-করুণাসিক্ত, পবিত্রতার পুণ্য প্রস্রবণ। শৈলজা শুনিল অর্জ্জুন যেন তাহাকে বলিতেছেন—

"———তোর, পিতার শ্মশানে
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি
দুহিতার মত পালিবরে তোরে
জানেন অন্তরযামী।
অন্তরে অন্তরে পূজিয়া প্রতিমা
পুষেছি তোরে সদায়
দুহিতার ক্ষত— এই মহাপাপ
কেমনে করিব হায়!
দেখ পিতৃ প্রেম অনন্ত বিস্তার
কি পবিত্র সুশীতল
পতি প্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত
পূরিত কামনাল।"

শৈলজার হৃদয়ের ঈর্ষার নরক নিভিয়া গেল—তাহার অন্তরের সকল সংশয় দ্বিধা ও অশান্তি দূর হইল—অপূর্ণ কামনা ও অতৃপ্ত আকাঙ্খা যেন নিমেষের মধ্যে পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি লাভ করিল। সে নয়ন মেলিয়া দেখিল—বেলা অবসানপ্রায়! ধরাতল শান্তিপূর্ণ; মাথার উপরে বিহঙ্গগণ আনন্দ-কাকলি গাহিতেছে—চারিদিকে কুরঙ্গ শশক শিখী প্রভৃতি তাহাকে সস্নেহ অন্তরে

ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাহার অঙ্ক অধিকার করিয়া আনন্দে রোমন্থন করিতেছে। রমণী আশৈশব বনচারিণী। বনে বনে বিচরণ করিয়া সকলের সহিত পূর্ব্ব হইতে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে—আজ তাই বহুকালের পর তাহার মিলন সুখের আশায় সকলে তাহাকে সাদরে বেষ্টন করিয়া যেন এক শান্তির ত্রিদিব রচনা করিল। শৈলজা সেই বনস্নেহ সেই বনশান্তি লাভ করিয়া—স্নেহময়ী স্বপ্ন-স্মৃতির সেই উদ্বোধন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেন কি নবজীবন লাভ করিল। তাহার মনে হইল সে যেন আর সে শৈল নহে—এক স্মৃতির সোনার কাঠিস্পর্শে সে যেন এক অভিনব সত্বায় রূপান্তরিতা!

শৈলজা তখন সেই নীরব অরণ্যমধ্যে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। অতীত জীবনের সুখ-দুঃখ-বিজড়িত অনেক চিত্র তাহার মানস-নয়ন সমক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিস্মৃতির অন্ধকারময় যবনিকা সরাইয়া সে তাহার বিগত জীবন-নাট্যের ঘটনাবলির ঘাতপ্রতিঘাত হইতে আপনার কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার মনে হইল শৈশবে তাহার জনক তাহার মাতার কাছে কহিতেন—

"————ধর্ম্মে প্রিয়ে! সুখ
ইন্দ্রিয় সংযম সেই ধর্ম্মের সোপান।
নাহি চাহি রাজ্যধন। শৈলজা আমার
হইবে ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যের, বিলাইয়া হরিনাম সুধা
বাঁচাবে অনার্য্যজাতি। ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোনমতে অনার্য্য উদ্ধার।"

জনকের সেই বড় আশার বারতা বালিকাকে যেন আজ কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিল। শৈলজা আকাশপটে আপনার কর্ত্তব্য-রেখা অঙ্কিত দেখিল। আর দেখিল দূরে অতি ঊর্দ্ধে নীলমণিময়পটে সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করিয়া তাহার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা স্নেহের ত্রিদিবে যুগল স্নেহ-দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। মাতাপিতার সেই পুণ্যছবি—সেই সুপ্রসন্ন প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল যে অনার্য্যের ধর্ম্মের জননী হইয়া তাহাদিগের মধ্যে হরিনাম সুধা বিলাইয়া—তাহাদিগের উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলে তবেই তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে এবং তাহার জনকজননী প্রীত হইবেন। শৈলজা তাই সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে প্রণাম করিয়া সেই যুগল-দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে কহিল:—

"————দেব! দেবি! দিয়া পদাশ্রয়
কন্যার কঠিন ব্রত করিও পূরণ।"

কন্যার এই করুণ মিনতি রক্ষা করিতে তাহার যুগল দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার শিরে স্নেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেননা শৈলজা অচিরে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে পল্লব কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এই কঠিন ব্রত সাধনায় ব্রতী হইবার আয়োজন করিতে লাগিল। শৈলজা দেখিল যে এই কঠোর ব্রত-সাধনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে মধুমাখা বিশ্বপ্রেমের মধুরতা উপলব্ধি করিতে হইবে; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পার্থের প্রতি তাহার অন্তর-নিহিত প্রেম ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সীমা পরিহার করিয়া—কামনা ও আসক্তির মাদকতা নাশ করিয়া—বিস্তৃতভাবে এই বিশ্বের সকলের মধ্যে ছড়াইয়া না পড়ে—যতদিন অবধি এই স্বার্থমূলক পতি-প্রেম জীবনের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আপনাকে অনন্তের অভিমুখী করিয়া না তুলে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার এই বিশ্বপ্রেমের ধারণা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র এবং তাহার এই কঠিন ব্রতও দুঃসাধ্য হইবে। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সে তাই সর্ব্বপ্রথম এই কামনা-জড়িত প্রেমের উচ্ছেদ-সাধনে তাহার কাম্য-দেবতা পার্থের পূজায় রত হইল। লতাকুসুমশোভিত সেই পল্লব কুটীর মধ্যে এক সুচারু বেদিকার উপর

মৃগয়ার বেশে শোভমান পার্থের এক স্বহস্তনির্ম্মিত মনোরম মৃন্ময়-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সে অপূর্ব্ব ভক্তি ও নিষ্ঠাভরে সেই মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিল।

সাধনার কয়েক বৎসর অতীত হইলে একদিন কৈশোর উল্লাসে পার্থকুমার অভিমন্যু মৃগয়ায় আসিয়া সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন মরুভূমে মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এই সুন্দর কুটীর খানি এক অপূর্ব্ব শান্তি-নিকেতনের মত শোভা পাইতেছে। কুটীরের চারিধারে মনোহর কুঞ্জবিতান—নাতিদূরে এক সুন্দর সরোবর—তৎপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা। কুটীর প্রাঙ্গনে বৃক্ষে বৃক্ষে সারীশুক প্রভৃতি বিহঙ্গনিচয় পার্থের পুণ্যময় দশনাম গাহিতেছে এবং সমগ্র কানন সেই নামের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত!

মুক্তকেশী উদাসিনী শৈলজা ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে সেই দশবিধ পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিলে শশক, ময়ূর, মৃগ, কুক্কুট প্রভৃতি মধুর সুস্বরে বন প্লাবিত করিয়া দলে দলে তাহার কাছে আসিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে লাগিল। কিশোর বালক প্রখর মধ্যাহ্নে ক্লান্তদেহে এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আশ্রমের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাঁহার দেহ ও মন যেন কি এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল! বিস্ময়ের আবেগে তিনি এই বনবাসিনীর পদাম্বুজে প্রণাম করিয়া তাহার পরিচয় লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি শৈলজাকে প্রশ্ন করিলেন—

"——————যাঁহার
এ অপূর্ব্ব পূজা, আমি কুমার তাঁহার
কে তুমি মা? কহ বড় কুতূহল মনে।
কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে?

কুমারের প্রশ্নে শৈলজার মুখে স্নেহহাসি ফুটিল—তাঁহার বক্ষে মধুর স্নেহস্রোত উছলিয়া উঠিল, সে স্নেহস্বরে কহিল—

"———————বাছারে!
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভাব।
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার
তাহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
পার্থ উপাসিকা আমি।
কেন পূজি তারে?
কেন পূজে বৎস! মন্ত্র ওই সবিতারে?
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য—কে না পূজে বল?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল।
জগতে দেবত্ব ধর্ম্ম-ভক্তি-প্রস্রবণ;
হিমাচলে সিন্ধু গঙ্গা লভেন জনম।
মম ভক্তি হিমাচল জনক তোমার।
সেই ভক্তি বলে,
পাইনু তোমায় আজি এই বনস্থলে।
এস বৎস! এস বুকে! তপস্যা আমার
হইল সফল বুঝি————"

শৈলজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—আর কথা সরিল না। স্নেহভরে কুমারকে বুকে টানিয়া লইয়া সে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল। কুমার দেখিল বননিবাসিনীর হৃদয়ের কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ যেন উৎসারিত হইয়া তাহাকে অবিরল স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিতেছে! শৈলজার নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। কুমার বিস্মিতনয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন কিন্তু এ অশ্রু কিসের তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল এ অশ্রু অমূল্য মাতৃস্নেহের বিকার মাত্র। কিন্তু হায়! অনার্য্যা রমণী আর্য্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া গভীর নিরাশাভগ্নহৃদয়ে তাহার চিরবাঞ্ছিত, চিরঈপ্সিতের কুমারকে বক্ষে চাপিয়া যে আজ সাফল্যের সুখস্বপ্নে বিভোর এবং সে যে আজ উচ্ছ্বসিত প্রেম ও অনাবিল আনন্দের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে তাহা কুমার কেমন করিয়া ধারনা করিবেন! কুমার শৈলজার সেই স্নেহস্বর্গে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হাসিকান্নায় কুমারের সারাদিনমান অতিবাহিত হইল। বিচিত্র কাকলি কল্লোল সহ সন্ধ্যাসতী ধীরে ধীরে

কাননে আসিয়া দেখা দিলেন। বনপুত্র ও বনপুত্রীগণ সেই কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া উল্লাসগীতি গাহিতে গাহিতে শৈলজার কাছে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের হাসি ও বাঁশীরবের সহিত গোচারণাগত গাভীবৃন্দের হাম্বারব মিশিয়া সমগ্র কানন মুখরিত করিয়া তুলিল। কুমার দেখিলেন একটী গাভী 'মা—মা' রবে ডাকিতে ডাকিতে সেই ছায়ালোকবেষ্টিত সন্ধ্যায় শ্বেতকাদম্বিনীর ন্যায় তাঁহার বনমাতার কুটীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। শৈলজা 'মা—মা' রবে স্নেহভরে তাহাকে দোহ করিলে পুণ্যবতী গাভী সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া অজস্র শ্বেতামৃত বর্ষণ করিল। বনবালকবালিকাগণ নাচিয়া নাচিয়া উল্লাসভরে নানাবিধ ফলমূল লইয়া তাহাদের বনমাতাকে অর্পণ করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ সেই বনবাসিনীর কর, বক্ষ বা অঞ্চল ধরিয়া—কেহ বা গলদেশ, বাহু ও জানু জড়াইয়া গোচারণের কতবিধ সমাচার প্রদান করিল। কুমার দেখিলেন, মাতৃমূর্ত্তি যেন সেই স্নেহের কানন উপশোভিত করিয়া পুষ্পিতা বল্লরীর ন্যায় বিরাজমানা; এবং বালকবালিকারা বন-কুসুমের ন্যায় তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিশুহৃদয়ে সেইদিন সর্ব্বপ্রথম যেন কি এক পবিত্রতার স্বর্গদ্বার খুলিয়া গেল! তিনি তন্ময়চিত্তে সেই মাতৃস্নেহ স্বর্গের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

শৈলজা বালকবালিকাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"————দেখ বাছাগণ!
আসিয়াছে মম রাজপুত্র একজন।"

সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে সে নৃত্যগীতোল্লাস—সে কোলাহল থামিয়া গেল! সবিস্ময়ে অচঞ্চলনেত্রে সকলে কুমারের পানে চাহিয়া রহিল এবং তাহার বসন ভূষণ দেখিতে লাগিল। জনৈক বনবালক সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করিল—

"————মাগো! বনপুত্রসনে
খেলিবে কি রাজপুত্র; যাবে গোচারণে?"

বালকের কাতর কণ্ঠস্বরে কুমারের যেন সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মাতা মাতুলের এক প্রীতিময় শিক্ষা তাহার মনে পড়িল। মনে হইল—

"সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী
সকলের পুত্র কন্যা ভ্রাতা ও ভগিনী।
দেখিবে সকল জীবে আপনার মত
পরহিত প্রাণপণে সাধিবে সতত।"

শৈলজার উত্তর দিতে না দিতে কুমার মহোল্লাসে তাই তাহাদের সহিত খেলিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। আবার আনন্দ উচ্ছ্বাসে বনপ্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রদেব নীলাম্বরে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ বিমল জোৎস্নায় ধরা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। কাননাভ্যন্তরে সেই সুচারু চন্দ্রকরলেখা এক বিচিত্র আলোছায়ার রাজ্যগঠন করিতে সুরু করিয়াছে। কুমার সেই ছায়ালোকে তাহাদের সহিত কতবিধ ক্রীড়া করিলেন। বালকবালিকাগণের উচ্চহাসি, আনন্দ-কলরব ও উল্লাস-গীতিতে কানন ভরিয়া গেল! তাহারা কুমারকে পত্রে পুষ্পে তাহাদের বনরাজা সাজাইল; কোন চারুহাসিনী বালিকা তাহার বনরাণী হইল; নিজেরা পারিষদের বেশ গ্রহণ করিল। তারপরে পুষ্পবেদিকার উপর কুসুমিত লতা পল্লবে রচিত এক পুষ্প সিংহাসনে সেই কুসুম-কোমলাঙ্গ রাজারাণীকে বসাইয়া রাজ্যাভিনয় দেখিবার জন্য তাহাদের বনমাতাকে ডাকিয়া আনিল। শৈলজা সেই মধুর দৃশ্য দেখিয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে দুইটীকে লইয়া কতই কৌতুক করিল। সাদরে কুমারের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"———— বউ ত হয়েছে মনোমত?"

কুমার লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেলেন। কল্পিতা বালিকা-রাণীর অকৃত্রিম অনুরাগ যেন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। কুমারের তখনকার মনের অবস্থা—

"সত্য ভাবিতাম আমি সে আমার রাণী
সত্য সে ভাবিত মনে আমি তার স্বামী।"

ভাবের আবেশে কুমার কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া মায়ের দেওয়া ফল মূল তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল।

তারপর কুমার বনজননীর বুকে ঘুমাইয়া পড়িলেন—বন-বালকবালিকাগণ সেই অমূল্য স্নেহের ত্রিদিবে তাহাদের বনমাতাকে ঘিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিশি অবসানে বালকবালিকাগণ কানন খুঁজিয়া কত প্রকার খাদ্য আনিয়া তাহাদের সঙ্গীকে প্রদান করিল। বিদায়কালে তাঁহার গলা জড়াইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

——'আবার ভাই আসিবে কি বনে?
আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে?
সাজাইয়া বন ফুলে পল্লবমালায়,
আমাদের রাজা ভাই! করিব তোমায়।"

শৈলজা কাঁদিয়া কহিল—

"————————বন জননীরে
পড়িবে কি মনে বাছা! আসিবি কি ফিরে?

বনভ্রাতাভগ্নীগণের সজল নয়ন ও রোদনরতা বনমাতার কাতর মুখখানি দেখিয়া কুমারের হৃদয় গলিয়া গেল! বনজননীর স্নেহ-বুকে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শৈলজা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করিতে করিতে স্নেহ-শোকোচ্ছ্বাসে কহিল—

——————— ———"বাছারে!
জনক জননী কাছে বনবাসিনীর
কহিও না কোন কথা এই তাপসীর;
কহিলে তপস্যাব্রত হইবে বিফল।
যথাকালে তাহাদের চরণ কমল
দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন;
তদবধি এ তপস্যা রহিবে গোপন।
ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে
কি কাজ জানিয়া তাঁর — জানাইয়া তাঁরে?"

কুমার ক্ষণেক পরে মাতার পদধূলি লইয়া ভাই ভগিনীগণকে সাদর বচনে তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বালক-বালিকারা কাননের প্রান্তভাগ অবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। পথিমধ্যে তাহারা কত ফলফুল লইয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিল। হায় অনার্য্য বালক-বালিকাগণের এ অমূল্য স্নেহের তুলনা জগতে আর কোথায় মিলিতে পারে?

আমরা এই চিত্রে শৈলজার বিকাশোন্মুখে চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারি। বিদায়কালীন পার্থ-উপাসিকার এই যে কাতর অনুরোধ—ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখীর এই যে গোপন আরাধনা, নীরব আত্মদান এবং গভীর অকপট প্রেম—ইহারই মধ্যে আমরা শৈলজার কঠোর আত্মসংযম ও ত্যাগমাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। সর্ব্বোপরি বীরকুমার অভিমন্যুর প্রতি তাহার যে আন্তরিক অনুরাগের চিত্র দেখিয়া আসিলাম তাহা হইতে তাহার এই নিষ্কাম উপাসনার মূলে যে ইন্দ্রিয়জয়ের কি কঠিন প্রয়াস লুক্কায়িত আছে তাহারও একটা ধারণা করিতে পারি। রৈবতকে যখন সে ভৃত্যবেশে দিনযাপন করিয়া তাহার হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতাকে সুভদ্রার করপ্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন হইতেই এই অনার্য্যা রমণী বিলক্ষণ জানিত যে তাহার অন্তরনিহিত প্রেম অন্তরে রহিয়াই বিলীন হইয়া যাইবে, বাস্তবজীবনে এ প্রেম সফল হইবার অবসর তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তাই সে অনার্য্যসুত একলব্যের ন্যায় তাহার বাঞ্ছিতের মৃণ্ময় মূর্ত্তি-পূজায় রত হইল। অর্জ্জুনের সমুজ্জল হৃদয়স্বর্গে দাসীরূপে এক বিন্দু স্থান ভিক্ষা করিয়া যে একদিন নিরাশ হইয়াছে — সেই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বচরাচর পার্থময় করিতে ব্রতী হইল। বনের কুসুম, বনচর জীব, গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল, আজ তাহার নিকট পার্থরূপে পূজা পাইতে লাগিল। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলের মধ্যে সে আজ অর্জ্জুনের সত্তা অনুভব করিতে লাগিল। আকাশে, বাতাসে আজ তাহার নয়নের সম্মুখে অর্জ্জুনের ছবি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিহগের গানে, বনফুলসৌরভে, তটিনীর কলতানে, বন-বালক-বালিকাগণের সঙ্গীত আলাপে, কুরঙ্গ-শশক-হংস-ময়ূরের নৃত্যকলাপে, সে অর্জ্জুনের রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ অনুভব করিল! সুখে দুঃখে, হরিষে বিষাদে, অর্জ্জুন তাহার অন্তর বাহির জুড়িয়া রহিলেন। এমনি তন্ময়তা, এমনি

"অর্জ্জুন"-মমতা লাভ করিতে ক্রমশঃ শৈলজার হৃদয় হইতে কামনার করাল ছায়া ও আসক্তির প্রবল প্রলেপ মুছিয়া যাইতে লাগিল। পার্থকুমার অভিমন্যুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আজ সে তাই আর বাঞ্ছিতের বিরহজনিত কাতরতা অনুভব করিল না; বরং আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া তাহাকে নিবিড় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কহিল—

"———এস বৎস! এস বুকে;
তপস্যা আমার হইল সফল বুঝি!"

আজ তাই যখন কুমার বিদায় গ্রহণ করিল, রমণী কঠিন স্নেহের নিগড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেও বাষ্পগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে। অনুরোধ করিতে ভুলিল না—

"——— ———বাছারে!
জনকজননী কাছে বন-বাসিনীর
কহিও না কোন কথা এই তাপসীর,
কহিলে তপস্যা-ব্রত হইবে বিফল।"

তপস্বিনীর এই আত্মগোপনের মূলে কি কঠোর আত্মসংযম বিরাজ করিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই অনার্য্য রমণীর চরণতলে ভক্তিনম্র শির স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

অভিমন্যু চলিয়া গেলেন। সাফল্যের আশায় আশান্বিত হইয়া শৈলজা আবার পূর্ব্ববৎ সাধনা করিতে লাগিল। অনন্যমনে ভক্তিভরে এইরূপে পূজা করিতে করিতে চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে তাহার হৃদয় হইতে অর্জ্জুনের প্রতি সেই পতিভাব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল। সিন্ধু-মুখী গঙ্গার ন্যায় এক অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে তাহার হৃদয় নিমগ্ন হইল। তাহার প্রেমসিন্ধু দুকূল প্লাবিত করিয়া বেগবতী তরঙ্গিনীর ন্যায় বিশ্বের চারিধারে বহিয়া গেল। এক প্রেম বহুধা হইয়া তৃপ্তি লাভ করিল। শৈলজার বোধ হইল—

"কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।"

পার্থ-উপাসিকার পার্থসাধনা সফল হইল—শৈলজা সাধনা-বসানে এক মহান বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইল।

এই সময় একদিন ব্যাসদেব শৈলজার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ শৈলজাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তপস্বিনীর কঠোর সাধনার বিষয় তাঁহার অবিদিত রহিল না। তিনি শৈলজাকে কহিলেন—

"———————শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থ পূজা; পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার।
থাকে যদি কণামাত্র কামনা উত্তাপ
হৃদয়ে নিবিবে; শান্তি পাইবে পরম!"

শৈলজা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তি গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

"——— ———চিন্তাতীত সেই ভগবান
বুঝিবে, পূজিবে এই অবলা কেমনে
জ্ঞানহীনা?"

ধীর-গম্ভীর-স্বরে ব্যাসদেব কহিলেন—

"———বুঝ, পূজ, ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ,—যুগ-অবতার;
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়,
এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয়।"

কি সুন্দর সরল মীমাংসা—কি সহজসাধ্য সাধনার প্রণালী! শৈলজা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির এই অমৃত-মধুর উপদেশবাণী সম্মুখে ধরিয়া কর্ত্তব্যের পথে আগুয়ান হইতে সঙ্কল্প করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠ তাঁহার তপস্বিনীর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"———বৎসে! তব এই যোগিনীর বেশ,
একি রৈবতকের সে ভৃত্য বেশ তার?"
শৈলজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—
"না না প্রভু
এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর।
অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞানসিন্ধু তব,
পাইবে না অনার্য্য কি বিন্দুমাত্র তার?
নারায়ণ! এই নব জলধর-ধারা
পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল?
পাইবে না মরুভূমি? দেহ এ দাসীরে
এক বিন্দু; বিলাইয়া বনে বনে, দাসী
করিবে এ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন।"

অনার্য্যরমণীর এই পতিতোদ্ধাররূপ মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের-কামনা লক্ষ্য করিয়া আর্য্য ঋষিপ্রবরের অন্তর গলিয়া গেল। তিনি সজল নয়নে কহিলেন—

"——————চন্দ্রচূড় সুতে!
গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত
পতিত পাবন নাম; অনার্য্য উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।"

তপস্বিনী অশ্রুজলে ব্যাসদেবের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কহিল—

"———কর মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যায়,
পদ-কল্পতরু মূলে বন-লতিকায়
দেও স্থান; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।"

ব্যাসদেবের বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া আনন্দের মন্দাকিনীধারা বহিয়া গেল। তিনি আদরে তপস্বিনীকে বুকে লইয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"——মা! আমার! নিরুপমা এই
জলন্ত পাবকশিখা পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।"

স্থূলতঃ বিচার করিতে গেলে ব্যাসদেবের এই উক্তিটী কেমন বিসদৃশ ঠেকে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ঋষিপ্রবরের এই উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া আমরা কবির চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ শৈলজার কঠোর আত্মসংযম, অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়জয় ও অলৌকিক আত্মনিবেদনের শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একটা উজ্জল ধারণা করিতে পারেন নাই তাহা নহে; যে রমনী অথবা যে "নিরুপমা জলন্ত পাবক শিখা" একদিন রৈবতকে পার্থপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া পিতৃহন্তা পার্থের কৃতজ্ঞতামূলক বাৎসল্যস্নেহোচ্ছ্বাস নিবারণ করিতে পার্থের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং অবশেষে নিজে মুখ ফুটিয়া সেই অন্তর-অন্তরের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই—সেই রমনী যে আজ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কামনা ও আসক্তি-মূলক পতি-প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া সিন্ধুমুখী গঙ্গার ন্যায় এক অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেছে—সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেবের ইহাও অবিদিত ছিল না। তবে মানব মাত্রেরই সকল জয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জয় চিত্ত জয়; এবং এই চিত্ত জয়ের প্রথম ও চরম সোপান কাম জয়। কেননা কাম জয় করিতে না পারিলে—মানবের এই দুর্দ্দমনীয় রিপুর দমন সাধিত না হইলে, তাহার অন্যান্য সংবৃত্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হয় না; এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয় চিত্ত জয়ের অবসরও তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং যে প্রবল রিপুর দমনে কত যোগী ঋষিরও পদ-স্খলন ঘটিয়াছে—শৈল সাধনার পথে যে সেই উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিবে ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে মহর্ষির আশ্রমবাসী শিষ্য-সেবকবর্গও যে সেই রিপুর প্রবল হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, এ বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। সুতরাং স্বাভাবিকতার হিসাবে কবির এই উক্তি ব্যাসদেবের মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক ব্যাসদেবের এই উক্তিতে শৈলজা সরমে মরিয়া গেল। সে অধোমুখে ধীরে উত্তর করিল—

-অর্জ্জুনের ভৃত্য আমি !
হবে তব শিষ্য, পুত্র, সেবক তোমার।"

ব্যাসদেব তাহাকে চরণাম্বুজে স্থান দান করিলেন। শৈলজা সেবক শিষ্যপুত্রের ন্যায় তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সান্ধ্যসময়ে ঋষিপ্রবর শৈলজাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সান্ধ্যরবিকরে সেদিন শরতের নীল নির্ম্মল আকাশ উদ্ভাসিত! মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দিবা অবসানে এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! ঊর্দ্ধে শরতের শেষ মেঘ সেই নির্ম্মল আকাশে তরঙ্গিত—আর নিম্নে মহাভারতের রক্তসিন্ধু যেন গর্জ্জন করিতে করিতে ভীম বেগে ছুটিয়াছে! বিশ্বচরাচর নীরব, নিস্পন্দ, ভীত! রণ-পয়োধির উভয় প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির যেন তরঙ্গিত বেলাভূমির ন্যায় শোভমান! অসংখ্য মৃত্যুজিহ্ব বিদ্যুৎগতি অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাতে কালানল উদ্গীরিত হইয়া যেন কুরুক্ষেত্রকে এক বিকট শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। বাতক্ষুব্ধ সমুদ্র হুঙ্কারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শুধু মর্ম্মভেদী হাহারব—শুধু যেন প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য ও অট্টহাস!

দূরে এক বিশাল বটবিটপি ছায়ায় দাঁড়াইয়া দ্বৈপায়ন কহিলেন—

"————দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিতধারায়!"

শৈল সভয়ে কম্পিতচিত্তে একবার নিমেষ মাত্র সেই সংহার-লীলা দেখিল; কিন্তু পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নতনেত্রে কহিল—

"কি ভীষণ দৃশ্য! প্রাণ কাঁপে থর থর;
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!
এই পাপ দৃশ্য প্রভু! দেখিলেও হায়!
হয় চিত্ত কলুষিত।

তাহার মনে হইল, নির্ম্মম হিংস্র জন্তুর ন্যায় নিষ্ঠুর-প্রকৃতি যে সকল বীর সর্ব্বদা পরস্পরের নিধন প্রয়াসে রত, তাহারা যদি মানব হয় তাহা হইলে মানবে ও শমন-কিঙ্করে প্রভেদ কি? এই পাপক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আবার ধর্ম্মক্ষেত্র? সে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"নিষ্ঠুর মানব,
এইরূপে নির্ম্মম হিংস্র জন্তু প্রায়
নাশে কি হে পরস্পরে? একি অসম্ভব!
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত হায়!
পাপক্ষেত্রে!—এ নরক—"

"হায় যদি প্রভু!
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আর?
কেশব, করুণাসিন্ধু, বিষ্ণু অবতার—
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্ম্মসংরক্ষণ
যাঁর মহাধর্ম্মনীতি—এই কার্য্য তাঁর?"

দ্বৈপায়ন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জগতের নীতি—
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।
নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর-হৃদয়,
দয়ার সাগর তিনি, পুণ্য পারাবার।
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
নাশিছেন প্রিয়জন দেখ কত মতে
হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস!
সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
ধ্বংস বিনা সৃষ্টি স্থিতি বৎস! অসম্ভব।
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব!
রুদ্ধ কর মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্দ্ধিত
জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত।"

শৈলজা মহর্ষির যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু তাহার কোমল প্রাণ তথাপি ধ্বংসনীতির সার্থকতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ভাবিল, সৃজন পালন যাঁহার মায়া, ধ্বংসও তাঁহার মায়া হইতে পারে; কিন্তু যখন আমি একটি বালুকণিকা সৃজন করিতে পারি না, তখন আমার ধ্বংসে অধিকার কি?

আমি কে? আত্মসমস্তার গভীর রহস্যজাল ভেদ করিবার বাসনা রমণী হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল—

"————————আমি কে?"

"তাঁহার অস্ত্র! সৃষ্টি স্থিতি লয়
যেই নীতিচক্রে নিত্য হতেছে সাধিত
তুমি পরমাত্মা তার; সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্ম্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত;
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। এই নীতিবলে
শার্দ্দুল নাশিয়া বৎস! ক্ষুদ্রপ্রাণী যত
পড়িছে শার্দ্দুলাধিক কালের কবলে।
আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
জীবদের হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার।
এই নীতি অনুসরি যদি নিয়োজিত
কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার?"

শৈল নিবিষ্টচিত্তে সকল কথা শুনিল বটে; কিন্তু তথাপি এই নীতির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। শুধু আবেগভরে কহিল——

"নিগূঢ় সংসার তত্ত্ব! হায়! ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে তাহা কে বুঝাবে তারে?
শুনিয়াছি দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার;
এই ধ্বংস যজ্ঞ প্রভু! ধর্ম্মশিক্ষা তাঁর?
জীবে দয়া— জীবহিংসা? সর্ব্বজীবহিত
সর্ব্বজীবের বিনাশ? এই মহারণ—
কুরুক্ষেত্র— ধর্ম্মক্ষেত্র? প্রভু! উৎপাটিত
করিলে কি এই তরু হবে সংরক্ষিত?"

মহর্ষি শৈলের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে এই নিগূঢ় সংসারতত্ত্ব বুঝিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শৈল বুঝিতে পারিল——

"মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
ভাসি এই অনন্তের মহা পারাবারে,
মহা ধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ধর্ম্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র অধ্যয়ন,
যোগ বল, মানবের শিক্ষার সোপান।"

আর বুঝিল—

"বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।
এই ধ্বংস যজ্ঞ ধর্ম্ম।
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এই পাপ ভার
করিতে মোচন— করিতে প্রচার
মহারাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য—করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত— কৃষ্ণ অবতার।"

মহর্ষি শৈলজাকে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। কংসের নিধন, বসুদেবের কারামুক্তি, উগ্রসেনে রাজ্য দান, জরাসিন্ধু-বধ, রাজমেধ যজ্ঞ নিবারণ, রাজসূয়যজ্ঞাবসানে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবের প্রবল সাম্রাজ্য স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের নির্লিপ্ততা, দয়া-ধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উদার মহান নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ প্রদান করিলেন। আর, বুঝাইয়া দিলেন যে এই বিরাট সংহার-লীলার অভিনয় যে শুধু তিনি ইচ্ছা করিয়া করিতেছেন তাহা নহে পরন্তু—

"সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন
সাধিবারে অনিবার্য্য (এই) ধর্ম্মরণ!"

শৈলজা সাগ্রহে মহর্ষির মুখে সেই কৌতূহলপূর্ণ জীবন-নাট্য-বৃত্তান্ত শুনিল; কিন্তু তাহার মনে আবার একটা নূতন খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিস্ময়ে ও ব্যাকুলভাবে সে প্রশ্ন করিল—

"ঘোরতর কর্ম্মলিপ্ত অবতার তাঁর
দেখিতেছি ভগবান্! বুঝিব কেমনে
ঈশ্বর নির্লিপ্ত তবে?"

ব্যাসদেব কহিলেন—

কি ভ্রান্তি তোমার!
কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।

ভগবান কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম!
জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম্ম মূলে—কর্ম্ম ফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার—নির্লিপ্ত সে জন।

দেখাইয়া দিলেন—

"নিষ্কাম বা নির্লিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
কৃষ্ণের জীবন চিত্র পবিত্র নির্ম্মল।
আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার?
নারায়ণ নারায়ণী সেনা আপনার
দেখ প্রতিকূল পক্ষে—বীর অদ্বিতীয়
ভারতের—সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি!"

শৈলজার সকল সংশয় যেন এইবারে নিমিষের মধ্যে দূর হইয়া গেল। ভক্তি ও আনন্দের অশ্রু ধারায় তাহার গণ্ডস্থল বিধৌত হইল। সে নীরবে আনত বদনে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেল। ঋষি শ্রেষ্ঠ সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে তাঁহার সঙ্কলিত গীতামৃতের পরিচয় দিয়া কহিলেন—

"কাতর অর্জ্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
যেই ধর্ম্ম গীতামৃত করাইয়া পান
করিলা স্বধর্ম্মরত—যোগধ্যান করি
করিয়াছি সঙ্কলন—পরিতৃপ্ত প্রাণ;
সেই গীতা উত্তরীয় অঞ্চলে তোমার।

এবং সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি পাণ্ডবশিবিরে অর্জ্জুন-পত্নী সুভদ্রার হস্তে মহর্ষির আশীর্ব্বাদ সহ সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। বলিয়া দিলেন——

"——————শান্তনু তনয়
ঐই গীতামৃত তরে আকুল হৃদয়।
কহিও ভদ্রারে—" যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
"সুভদ্রে! তোমাতে মিতা, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
"তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী
"এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
"বিরাজিত যেই চন্দ্র, সুধার আধার,

শৈলজা সেই সুদুর্লভ দেববাঞ্ছিত 'গীতামৃত' খানি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া সত্বর পাণ্ডবশিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল বটে, কিন্তু কে যেন তাহার পদদ্বয় চাপিয়া ধরিল। তাহার বক্ষের মধ্যে যেন একটা অব্যক্ত বেদনাময় আকাঙ্খার স্পন্দন সে অনুভব করিল। তাহার মনে হইল অন্ধ, দিক্‌ভ্রান্ত মানবকে অনন্তকাল ধরিয়া গন্তব্য পথ দেখাইতে যদি গীতা-জ্যোৎস্নার আবির্ভাব—তাহা হইলে অজ্ঞ, অসহায়, অসভ্য, অনার্য্য-জাতির উদ্ধারব্রতে, তাহাদের জীবনব্যাপী নিরাশার ঘোরান্ধকার মোচনে, তাহা কি ব্যর্থ ও নিস্ফল হইবে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে ত তাহার অনার্য্যোদ্ধার ব্রত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। রমনী ম্লানমুখে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্তর্য্যামী ঋষিপ্রবর শৈলের হৃদয়ের এই সংশয়মূলক সমস্যা ধারণা করিতে পারিয়া কহিলেন—

"যাও বৎস! যাও চলি। যথা অবসর
করিব যতেক শিষ্যে এ অমৃত দান।
মিলিয়াছে মোক্ষ সুধা, যুগযুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান।
মানবের কর্ম্মাকাশে ধর্ম্ম ধ্রুবতারা
জানিলাম এতদিনে হ'ল সমুদিত;
অনন্তকালের তরে অন্ধ, দিক্‌হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত।"

শৈলজা পবিত্র গীতামৃত লইয়া পাণ্ডবশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎকরে কহিল—"জয় সুভদ্রার জয়। অর্জ্জুন-সহিষীর জয়।"

জনৈক সখী আসিয়া ভদ্রাকে সংবাদ দিলেন—

"মহর্ষি শিবির দ্বারে ব্যাস শিষ্য একজন।"

ব্যস্তভাবে ভদ্রা কহিলেন—

"—————আন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁকে।"

সখী আসিয়া শৈলকে ভদ্রার সমীপে লইয়া গেলেন।

মনোহর !
নীলোৎপল প্রতিমায়, জাগিতেছে যৌবনের
কি মধুর প্রথম স্বপন !
সুন্দর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি
সুকুমার দেহ মনোহর,
ললাটে চূড়ার মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি
অমার্জ্জিত ধূলায় ধূসর ;
সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে
আকর্ণবিস্তৃত ছল ছল,
ভাসিছে যুগল তারা নিলীম প্রভাতাকাশে
দুই সুখ-তারা সমুজ্জ্বল ;
কি তারায়, কি নয়নে শান্ত স্থির সে বদনে
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা কি ত্রিদিব-স্নেহকথা
হৃদয়ের ভাসিতেছে হায় !"

সুভদ্রা ছদ্মবেশী ব্যাস-শিষ্য শৈলের রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি শৈলকে প্রণাম করিতে যাইতে যুবকবেশী শৈল শশব্যস্তে তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিল—

"যে ধর্ম্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্ত্তি তার,
দেবি ! তুমি নমস্যা আমার।"

শৈলের কণ্ঠ বহুদিনবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায় সুভদ্রার অন্তরের অন্তরে কি যেন এক আবেশমাখা ভাবের লহরী বহাইয়া দিল।

"সেই কণ্ঠ সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা,
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত—
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত।"

সুভদ্রা আত্মহারা হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

"——————————তপোধন
আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র
পুনর্ব্বার করি পদার্পণ।"

প্রেম-নতমুখে উত্তর করিল——

"——————————সান্ধ্যকৃত্য করি শেষ
করিবেন শুভ আগমন।
গোধূলিরে পদধূলি দিয়া উদ্ভিবেন দেবি !
ঋষিকুলে নক্ষত্র প্রথম।"

তারপর ধীরে ধীরে আপন উত্তরীয় হইতে 'গীতামৃত' খানি মুক্ত করিয়া সুভদ্রার করে অর্পণ করিয়া কহিল——

"যে ধর্ম্মের আত্মা কৃষ্ণ, বাহুবল ধনঞ্জয়
জ্ঞানবল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
দেহ যার মূর্ত্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি
পুণ্যময়ী প্রেম-প্রস্রবণ—
এ পবিত্র মহাগীতা, তার সুধাময়ী ভাষা
আশীর্ব্বাদ সহ উপহার,
বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে
সুধাকরে সুধার ভাণ্ডার।"

আবেগভরে কহিল—

"মানব অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী
গীতামৃত করি বিকীরণ,
সুশীতল জ্যোৎস্নায় যুড়াও জগতারাধ্যে !
জগতের তাপিত জীবন !"

সুভদ্রা দ্বৈপায়ন উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গ্রন্থখানি শিরে ধারণপূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখিয়া দিলেন। তারপর—

" উভয় নীরব পুনঃ উভয়ের হৃদয়েতে
ভাসিয়াছে কি যেন উচ্ছ্বাস !"

শৈল দেখিল———

"——————————নেত্র ছল ছল সুভদ্রার
কি করুণা করিছে বিকাশ !

তাহার মুখে আর কথা সরিল না—সে সজলনয়নে ধীর নম্রপাদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুরুক্ষেত্রে শৈল-সুভদ্রার এই সর্ব্বপ্রথম সম্মিলনে নিতান্ত পরিচিতের মধ্যেও অপরিচয়ের একটা ব্যবধান রাখিয়া কবি অতি নিপুণতাসহকারে অল্প কথায় শৈলজার সংযম শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অর্জ্জুনগতপ্রাণ অথবা 'অর্জ্জুন'ময় শৈলের সমীপে সুভদ্রা আজ যে "নমস্যা দেবী," ইহা কোমলস্বভাবা নারীর অল্পশক্তির পরিচায়ক নহে! শৈল নারী হইলেও সে যে সাধারণশ্রেণীভুক্তা নহে ইহা আমরা এস্থলে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

সুপ্রভাত।

গোপন মরম কুঞ্জে বাঁধি নীড় পুঞ্জে পুঞ্জে
কুহক ছড়ায়েছিল মোহ-ইন্দ্রজাল;
না চাহিতে আঁখি তুলি' আশার কোরকগুলি
ঝরিয়া পড়িয়াছিল—বৃন্তের দুলাল।

আজি মম সুপ্রভাত— সোহাগ পরশে, নাথ,
অসহ পুলকে হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
মুখরিয়া চারিদিক কুহরিছে আজি পিক—
ঝরিছে অময়া-সুধা নিখিল ছাপিয়া!

বেঁধে দও আজি মোরে তোমার প্রেমের ডোরে,
প্রেমের গৈরিকে, প্রভু, সাজাও আমারে,
রিক্ত কমণ্ডলু মম ভরে দাও, প্রিয়তম,
বাউল হইয়া প্রেম বিলাই সবারে।

উজলিবে প্রেম-ইন্দু, উথলিবে প্রেম-সিন্ধু,
বহিবে প্রেমের বন্যা উদ্বেল—উদার,
আশীষ লইতে মাথে উর্দ্ধমুখে জোড় হাতে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, নাথ, সন্তান তোমার।

মিস্ বেলা গুহ।

কালোর খেদ।

(গল্প)

আমি কালো। কালো বলতে লোকে সাধারণতঃ যেমন বোঝে ঠিক তেমনটি না হ'লেও, শ্বশুর শাশুড়ীর চোখে, স্বামীর চোখে, আর সূক্ষ্মদর্শী প্রতিবেশিনী ও তা ননদের চোখে আমি কালো। শুধু যে কালো তা নয়, আমার মুখশ্রীরও নাকি অভাব। যদিও এ বিষয়ে দু একজনের মুখে কখনও কখনও ভিন্ন মত শোনা যায় তাও গোপনে সহানুভূতির ও সান্ত্বনার ছলেই বলে বোধ হয়। যাক, আমি যে কালো, তা অস্বীকার করবার যো নাই। এ তো আর ছাপিয়ে রাখবার জিনিষ নয়; দোষ-গুণ বরং দুদিন লুকিয়ে রাখতে পারা যায়, কিন্তু রূপ, বিশেষ মেয়ে মানুষের—বাপ্‌!

তা বেশ! আমি কালো, তাতে কার কি এলো গেল! আর সে কথা এত ভনিতা ক'রে শুনিয়েই বা কি লাভ? খুব ঠিক। এ জগতে কারও কার্য্যে কারও কিছু যায় আসে না, আর কারও কথা শুনে কারও কিছু লাভ লোকসান হয় না তাও জানি। এ কথা কাকেও শোনাতেও কখনও চাইনি, আর হৃদয়ের এ গোপন ব্যথা কেউ যে জানতে পারে এ ইচ্ছাও আমার নাই। বহু দিনের রুদ্ধ যাতনা, পুঞ্জীভূত হতাশা, নিরাশার কঠিন ধাক্কা, উপেক্ষার তীব্র জ্বালা, আমার এই ক্ষুদ্র বুকের মাঝেই এতদিন খুব গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলাম। একদিনও কোনও কাজে, কোন ব্যবহারে, কোনও বাক্যে, তার সামান্য আভাষ মাত্রও লোককে জানতে দিইনি। আজ এই শ্রাবণের বাদলার দিন, প্রকৃতির এই সারাদিনব্যাপী বিষাদমলিন আকৃতি দেখে আমার মনটা কেন যে এত ভারী হ'য়ে উঠল তা বোঝবার পূর্ব্বেই বন্যাস্ফীতা নদীর জলতরঙ্গের মত এতদিনের সযত্নে চাপা বেদনার রাশি আমার এই দুর্ব্বল চিত্তকে ছাপিয়ে কলমের ডগায় বেরিয়ে পড়ছে, কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। কোনও মতেই বাধা দিতে পারছি না। এ কাকেও জানাবার জন্যে নয়, কাকেও শোনাবার জন্যে নয়, এ কেবল প্রাণভরা আকুলতার, জীবনভরা ব্যর্থতার তীব্র স্মৃতিটুকু যা জোর ক'রে বেরিয়ে পড়ছে—যাকে শত চেষ্টাতেও আমার হৃদয় মধ্যে আর পুরে রাখতে পারছি না। ওগো! এ পৃথিবীর লোক! ওগো! মানুষের রূপ-গুণের কঠোর সমালোচক! তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা যেন এই কালো কুৎসিৎ মেয়েটার এই কথাটিও অন্ততঃ সত্যি বলে বিশ্বাস হয়।

আমি কালো সেটা কি আমার দোষ? আমি কি ইচ্ছে করে সাধ করে, কালো হয়ে জন্মেছিলাম? কালো ত কেউ নিজের ইচ্ছায় বা স্বভাবে হয় না। সে ত ভগবানের সৃষ্টি। যে সৃষ্টিকর্ত্তা একজনকে রূপবতী করেছেন তিনিই ত অপরকে কুরূপা করেছেন। তবে তাঁর দেওয়া এই রূপ নিয়ে লোকে মানুষের দোষ দেয় কেন? রূপের অভাব যদি এতই দোষনীয়, এতই ঘৃণার্হ, তবে রূপহীনাকে অত যত্ন ক'রে ঘরে আনা কেন? কালোতে যদি মনই না ভোলে, কালোর সঙ্গে মিশে যদি মনের তৃষ্ণা না মেটে, তবে সাত পাক ঘুরে—অগ্নি সাক্ষী রেখে মন্ত্র পাঠ ক'রে—সে অভাগিনীর নয়নের সম্মুখে সমস্ত স্বর্গের সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলে দিয়ে দেখবার আশা মিটতে মিটতেই, আমার সম্বন্ধে সে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেওয়াই বা কেন? কালো ত আমি আছিই, আজ ত আর নূতন করে কালো হলুম না; এ কালো ত আর জোর ক'রে তোমাদের কাছে এগিয়ে যায়নি; এই কালোকে দেখে শুনেই ত ঘরে নিয়েছিলে। তবে কেন এ প্রতারণা? কেন এ অত্যাচার? কি পাপের এ কঠোর শাস্তি? শুনেছি আমার মায়ের ছেলে হ'য়ে বাঁচত না বলে অনেক দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে হতাশ হয়ে শেষে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ক'রে আমার লাভ ক'রে আমায় মা খুসী হয়েছিলেন। সেই হ'তেই আমার নাম 'মঙ্গলা' ওরফে

'মঙ্গুলি' বা 'মুঙ্গ্লি'। আর আমার জন্ম দিনে পুত্র সন্তানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণা কন্যার আবির্ভাবে আশাভঙ্গে যখন প্রতিবেশিনীরা এমন কি আমার গর্ভধারিণীও নাসিকা কুঞ্চিত ক'রেছিলেন, তখন আমার বাবা নাকি তাঁদের তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন "ঠাকুরের দেওয়া ধন, আমার পুত্রের চেয়েও বেশী। তোমরা কেউ কিছু বলো না। আমার ওই সাত-রাজার-ধন মাণিক।" হায় পিতা! এখন তুমি কোথায়? তোমার সেই সাত-রাজার ধন মাণিকের মূল্য যে আর কেউ বুঝলে না—আর সকলেরই চক্ষে যে সে চিরকালের তরেই ঝুটা রয়ে গেল।

শৈশবের কয়টা দিনের স্মৃতি কি মোহন মুরতি নিয়ে আমার মানস চক্ষে ভেসে বেড়ায়! মায়ের অগাধ স্নেহ, পিতার অনাবিল অসীম ভালবাসার মধ্যে কি আনন্দেই না বেড়ে উঠেছিনু! অযাচিত অপরিমেয় আদর পেয়ে আমার এমনই স্বভাব হয়ে উঠেছিল যেনামান্য অভাবেই আমার অভিমানের সাগর উথলে উঠ্ত! সে অভিমান ভাঙতে, হায় পিতা! তোমাকে কতবার, কত না সাধ্য সাধা সাধনা ক'রতে হ'য়েছে। আর এখন তোমার সেই আদরে-গড়া অভিমানী মেয়ের সামান্য একটু অভিমান করবার অবসরও নেই, সাহসও নেই। এখন যে আমি গৃহস্থের বধূ, হিন্দু স্ত্রী, তাতে আবার কুরূপা! আমার কি অভিমান সাজে!

স্নেহে, যত্নে, আদরে, আবদারে, কেমন ক'রে যে দিন চলে গেল জানতে না জানতেই শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ ক'রে দেখলুম যে পিতামাতার আর পূর্ব্বের সে ভাব নেই। আমার নিকট সযত্নে গোপন করবার চেষ্টা করলেও আমি বেশ বুঝতে পারতুম যে এখন আর আমায় দেখলে, আমার আদর আবদার শুনলে, তাঁদের স্নেহকোমল বদন ঠিক আগেকার মত আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না। যেন কিসের ভাবনায়, যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁদের সদাপ্রফুল্ল বদন এখন কাতর হ'য়ে ওঠে। প্রথম প্রথম তাঁদের এ ভাব পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম আমার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকলেও শীঘ্রই আমার বুঝতে বাকী রইল না যে আমার বর্ত্তমান বয়সই এর একমাত্র কারণ। আর সে কারণটা আরও গুরুতর কেননা আমার রূপ নাই। একমাত্র আদরের দুলালী হলেও হিন্দুর মেয়ে আমি, চিরকাল ত আর আইবুড়ো করে বাপ মা ঘরে রাখতে পারবেন না। বিয়ে ত দিতেই হবে। রূপ থাকলেও বরং আরও দুদিন চুপ করে বসে থাকা চ'লত। কিন্তু কালো মেয়ে, এখন থেকে না চেষ্টা করলে, এর পর খুড়ো হলে ঐ মেয়ে যে কেউ ছোঁবেও না। এক মনে পথ চলতে চলতে সম্মুখে উত্থিতফণা ভুজঙ্গ দর্শনে পথিক যেমন বিস্ময়ে আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে যায়, পিতামাতার একটানা আদর স্রোতে বিহ্বলা আমিও তেমনি প্রতিবেশিনীদের ও আত্মীয়াদের এই সমস্ত কঠোর সত্য কথায় একবারে বিহ্বলা হয়ে পড়লাম। তাই ত এ কথা সেদিন আমার মনে কখনও উদয় হয়নি যে আমি কালো বলে আমার পিতামাতার মনে কোনও কষ্ট হতে পারে। বরং এতদিন তারা আমার স্নেহে আদরে এমনি ডুবিয়ে রেখেছিলেন যে আমি যে কালো তা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম। কালো হয়ে জন্মানো যে দোষের বিশেষ—নারীর পক্ষে, তা আমার মনে হয় পূর্ব্বে উদয় হবার অবসরই পায়নি। হায় পিতামাতা এ কালো মেয়েকে নিয়ে যদি তোমাদিগকে এত ভাবনায় পড়তে হবে জানতে, তবে কেন এতদিন তাকে এই মোহের আবরণে ঢেকে রেখেছিলে? কেন তাকে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলনি? তা'হলে ত আপদ চুকে যেত; তোমাদিকেও এত চিন্তায় পড়তে হত না, আর আমারও ভবিষ্যৎ জীবনের নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না। যাই হ'ক মাকে আমার জন্যে বেশী দিন ভাবতে হ'ল না। তিনি তাঁর চির আদরের কন্যার অপমান অত্যাচার দেখবার পূর্ব্বেই আমায় অকূলে ভাসিয়ে এ মরধাম ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর বাবাও শোকে কেমন একরকম পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। তাঁর সেই দারুণ দুঃখের দিনে তাঁর এত আদরের আমিও তাঁর সুমুখে যেতে সাহস করতুম না। একা একা ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হ'য়ে যদি বা কখনও তাঁর কাছে যেতুম, তখন বাবা

আমার মলিন, কাতর মুখখানাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতেন, আমি খানিক নিস্তব্ধ হ'য়ে তার সেই স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে পড়ে থাকতেম, শেষে বা কখনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেও ফেলতাম আমার কান্নার সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে যেত; তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ফেলেই বলতেন! "মা তোকে আমি একটী মনের মতন পাত্রর হাতে সঁপে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই—এ ভীষণ শূণ্য সংসার ছেড়ে একবার সেই অসীমের রাজ্যের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।" হায়! আমি কি তখন জানতুম যে এই সুপাত্র জিনিষটা এ সংসারে এত দুর্লভ!

তা সুলভই হোক আর দুর্লভই হোক অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক দেখাদেখি, অনেক প্রত্যাখ্যানের পর শেষে আমার নারীজন্ম সার্থক করার জন্যে একজন নাকি পাত্র পাওয়া গেল। শুনলাম তাদের নাকি খুব বনেদী বংশ, অবস্থাও বেশ সচ্ছল। আমার ভবিষ্যৎ জীবন-নাটকের যিনি সুত্রধর হবেন, তিনি বেশী লেখাপড়া না শিখলেও খুব মেধাবী ও ব্যবসায়ের দিকে খুব মনোযোগী এত গুণের উপর আবার সর্ব্বোপরি সুপারিশ তার তরুণ বয়স ও সাদা চামড়া। লক্ষ কথা না হ'লে একটা বিবাহের পত্তন হয় না, একথা অন্য ক্ষেত্রে ঠিক হলেও দু'বেয়াইয়ে দু'ঘণ্টার কথাবার্ত্তাতেই আমার বিবাহের সব কথা নাকি পাকা হয়ে গেল। আমার শশুর আমার বিবাহে এক পয়সাও নেবেন না। বাবা স্বেচ্ছায় তাঁর মেয়েকে যা গহনা পত্র দিতে ইচ্ছা করেন তাতেই তিনি রাজি। দু'বেয়াইএর ঐ কথাবার্ত্তার দিন পাঁচেক পরেই আমার ভাসুর আমায় দেখতে এলেন। আর তার দিন পাঁচেক পরেই হুলুধ্বনির সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশিনী ও আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের আশীর্ব্বাদের মধ্যে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকের ভয় হতে পরিত্রাণ পেলেন। বাবা এক ঘোর দুশ্চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পেলেন, আর আমিও একজন অপরিচিতের নিকট আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে দিয়ে তার হাত ধরে আমার এই চতুর্দ্দশ বৎসরের স্নেহের নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাবাকে আমার বিবাহের দুশ্চিন্তা হতে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে কত বিনিদ্র রজনী আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে কাটিয়েছি; কিন্তু বিদায়ের সময় আগত হলে বাবার এই তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা স্মরণ ক'রে আমার স্বভাবতঃ অভিমানশীল হৃদয় এমনই বিমুখ হয়ে উঠেছিল, যে বাবাকে একটা ঢিপ করে প্রণাম করা ছাড়া তাঁর বিচ্ছেদের বেদনা যে কত গভীরভাবে আমার এই কোমল হৃদয়কে মথিত করেছে তার কোনও নিদর্শনই কেউ পায়নি—না একটা কথায় না এক ফোঁটা অশ্রুতে। বাবাও তার এই মেয়েটিকে বিশেষ করেই চিনতেন। তাই যখন অপর পাঁচজনে আমায় 'বেহায়া' 'ওমা আজকালকার মেয়েরা কিগো! 'এমন বাপকে ছেড়ে যাচ্ছে চোখে এক ফোঁটা জল নাই' 'তা কচি-খুকিটি ত নয়, বয়েসও ত চোদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পড়ল' 'অমন কার্ত্তিকের মত বর পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেছে' 'যাই হ'ক মার জন্মের বর্ত্তের জোর আছে বলতে হবে,' 'কে ভেবেছিল যে কালো মেয়েটার অমন সুন্দর বর হ'বে'। ইত্যাদি নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য প্রকাশে ব্যস্ত, তখন তিনি—পাছে আমার এই রুদ্ধ অভিমানের স্রোত ভীষণ আকারে বহির্গত হ'য়ে সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দেয়, এই আশঙ্কায় কোনও কথাটি না বলে কেবল তাঁর বিষাদকরুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর সেই বিদায়কালের কাতর জলভরা চক্ষুর স্নেহকোমল দৃষ্টি এখনও যেন আমার শত কাযকর্ম্মের মাঝে, শত অপমান ও মর্ম্ম যাতনার মধ্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত ঘিরে থেকে আমার মনে এই নিষ্ফল বিবাহজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, উপেক্ষা, অনাদর, সহ্য করার অসীম ক্ষমতা এনে দেয়। বাবা! বাবা! তুমি এখন ওপারে। অপর পাঁচজনে আমার সেই নীরব বিদায়ের যেরূপ অর্থই করে থাক, তুমি ত আর আমার ভুল বোঝনি! তোমারই অযাচিত আদরে, তোমারই অপরিসীম স্নেহেই ত আমার এই তীব্র অভি-মানের জন্ম। তুমি আমার সেই অভিমানের জন্য ক্ষমা নিশ্চয়ই করেছিলে।

তার পর সারাদিনব্যাপী রেলযাত্রার কষ্টে ও একমাত্র স্নেহের অবলম্বন পিতার বিচ্ছেদে কাতর মন প্রাণ নিয়ে যখন প্রথম শ্বশুর গৃহে পদার্পন করলুম, তখনকার সে আদর অভ্যর্থনা মনে পড়লে ক্রোধে ক্ষোভে এখনও শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাড়ীর সামনে গাড়ী হ'তে নামতেই আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের বধূকে বরণ করে ঘরে নেবার জন্তে আগ্রহভরে বরণ-ডালা হাতে করে এগিয়ে এসে আমাকে দেখেই, আনমনে পথ চলতে চলতে সম্মুখে বিভীষিকা দেখে যেমন হতভম্ব হয়ে মধ্য পথে দাঁড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন! পার্শ্বে সম্মুখে ঘিরে অগনিত আত্মীয় কুটুম্বিনীগণও নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে, আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন! ক্ষণপূর্ব্বেই আনন্দকোলাহলমুখরিত পাকাবাড়ীখানা যেন এক অজ্ঞাত অচিন্তনীয় বিভীষিকার ছায়াপাতে নিমেষে নীরব, শব্দহীন হয়ে গেল! কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটত তা বলা যায় না; হঠাৎ সকলের চমক ভাঙ্গিল—আমার ভবিষ্যৎ সকল-গর্ব্বের আধার স্বামী মহাশয়ের আকুল ক্রন্দনে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে গিয়ে, তার মায়ের স্কন্ধের উপর মাথা রেখে, বলে উঠলেন "এই নাও মা তোমার সাধের সুন্দরী ছোট বউ। মা আমি মুর্খ বলে এই করেই কি আমায় সকলে মিলে ষড়-যন্ত্র করে আমাকে ভাসিয়ে দিতে হয়।" আর দেখে কে? এতক্ষণের বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাব কেটে গিয়ে জেগে উঠল সেথায় কল গুঞ্জন হতে আরম্ভ করে ভীষণ গর্জ্জনে তীব্র সমালোচনার রাশি! সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীর মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের কড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত তাদের কঠোর মন্তব্যের হাত এড়াল না। ওদিকে শাশুড়ী তার আদরের দুলালকে বুকে চেপে ধরে পেত্নী বউকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দিয়ে, আবার চাঁদপানা বউ এনে দেবার আশ্বাস দিয়ে, তার ক্রন্দন থামাতে ব্যস্ত! সারাদিনের উপবাসে আমার শরীর আকুল আগ্রহে একটু বিশ্রাম খুঁজছিল, তার বদলে এই বিচিত্র অভ্যর্থনা আমায় এমনই অভিভূত ক'রে দিলে যে, আমার মাথা ঘুরে গেল, সর্ব্ব শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল, আমি আর দাঁড়াতে না পেরে সেই খানে ব'সে পড়লুম। একটু দূরে আমার ভাসুর নিতান্ত অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ আমার রূপের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চক্ষের দৃষ্টিশক্তির ওপরও তীব্র মন্তব্য বর্ষণ হচ্ছিল। তিনই সর্ব্বপ্রথমে আমার এই কাতর ভাব লক্ষ্য করে যখন তার গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন "তোমাদের কি একটু আক্কেল নেই মানুষটা যে মারা যাবার দাখিল হয়েছে। সারাজীবন পড়ে রয়েছে, যত ইচ্ছে গালাগাল দিও, ছেলের আবার বিয়ে দিতে হয় দিও; এখন বরণ করে বউ ঘরে তোল, কিছু খেতে টেতে দাও। নয় ত শেষে কি খুনের দায়ে পড়বে? আচ্ছা যা হোক।" তাঁর এই কথায় ও ধমকে কোনও মতে বরণ সারা হয়ে গেল, আমি আমার ভবিষ্যৎ গৃহে প্রবেশ করলুম। তারপর অষ্টমঙ্গলার কটা দিন যে কি ভাবে কেমন করে কাটিয়েছিলুম, তা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন, আর সকলেই বোধ হয় কতকটা অনুমান করতে পারবেন, কেননা এরূপ ঘটনা যে আমাদের বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নিত্য ঘটে আসছে।

এর কিছুদিন পরেই, বাবা আমায় জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রয়ে রেখে, তাঁর শোকসন্তপ্ত চিত্তের শান্তির আশায় কৌটা কম্বল মাত্র সার করে, এ সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরবেন কিনা, তাও নিশ্চয় ক'রে ব'লে গেলেন না। অভিমানিনী আমি তখন তাকে জানতেও দিইনি যে, যে আশ্রয়ে চিরদিনের জন্তে সঁপে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন ভেবেছেন সে আশ্রয় এই আট দিনেই আমার পক্ষে কি দুর্ব্বিষহ ভয়ানক স্থান ব'লে পরিচিত হয়েছে! ব'ললেই কি ফল হ'ত—কেবল তার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়ান হ'ত কি নয়? তাই তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'য়েই বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ভগবান কাউকে নিরবচ্ছিন্ন সুখও দেন না আর সারাজীবনব্যাপী দুঃখও ভোগ ক'রতে দেন না। তাই বুঝি স্বামী আমার দিন কয়েকের জন্তে আমার উপর অগাধ স্নেহ ভালবাসা দেখিয়ে, আমার মনের

সমস্ত অভিমান, অপমান, মর্ম্মবেদনা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। অভাগিনী আমি তার তখনকার সেই টান এই রূপহানার গুণের জোরেই সম্ভব হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রে মনে একটা অনাবিল শান্তি লাভ করেছিলুম। তাঁর পায়ে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে তাঁর অক্লান্ত সেবা ক'রে, তাঁর সামান্য ইচ্ছাও ইঙ্গিতে বুঝে নেবার চেষ্টা ক'রে, তাঁকে আমি আমার ক'রতে পেরেছি বলে, মনে কতকটা গর্ব্বও অনুভব করেছিলুম। হায়! তখন কি জানতুম যে তার তখনকার সেই মন-প্রাণ-ভোলান ভালবাসা, অপারসীম স্নেহ, কেবল মৌখিক, শুধু দুদিনের জন্য, আমার প্রস্ফুটিত যৌবনই তার কারণ। এই রূপহানার যৌবনের মাদকতাটুকু ফুরিয়ে গেলে যে সে আঘ্রাত কুসুমেরই মত আঘ্রাণকারীর বিরক্তির কারণ হ'য়ে, তাচ্ছিল্যভরে দূরে নিক্ষিপ্তা হ'বে, তা কি তখন অভাগিনী বুঝতে পেরেছিল? ওঃ পুরুষ যে এত খানি বিশ্বাসঘাতক! এতখানি স্বার্থপর, এতখানি নির্ম্মম, পাষাণ-হৃদয় হ'তে পারে, তা কি তখন এই অবলা একান্ত পরনির্ভরশীলা নারী জানত। মাতৃহীনা, পিতার স্নেহ হ'তে বঞ্চিতা হ'য়ে, একমাত্র যাঁকে আশ্রয় ভেবে জড়িয়ে ধরেছিল; সেই তার নারীজীবনের সর্ব্বস্বের দেবোপম সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে এমন তীব্র হলাহলপূর্ণ কঠোর হৃদয় লুক্কায়িত আছে, তার মোহন চটুল বাক্যাবলীর পশ্চাতে যে শুধু অসারতা, ফাঁকা আওয়াজ ধ্বনিত হ'ত, তা ত তখন হতভাগিনী ধরতে পারেনি। সে যে তখন তার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য, তার নারীচিত্তবিমোহন মূর্ত্তিধারী স্বামীর কৃত্রিম আদর যত্নে, তার এই তুচ্ছ হেয় নারীজন্মের সার্থকতার মোহে বিমূঢ়া, আত্মহারা! তখন যে তার সন্দেহ করবার অবসর, তলিয়ে দেখবার শক্তি মাত্র ছিল না। আর তা থাকলেই বা কি হোত? হিন্দুর, বিশেষ বঙ্গের কুলনারী যে পরনির্ভরশীলা লতার ন্যায়; অপরের অবলম্বন ছাড়া যে তার বৃদ্ধি নাই, শোভা নাই! আশ্রয়-তরু উপযুক্তই হ'ক, অনুপযুক্তই হ'ক, যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ যেমন লতা তাকে একান্ত নির্ভর ক'রে আপনার শত বাহুর আলিঙ্গনে, আকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধ'রে বেড়ে ওঠে, নিজের শোভায় গরবে ফুলেও ওঠে, আর অবলম্বনবিহীন হ'লে মুসড়ে, শুকিয়ে, ঝরে রাস্তার ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি দেয়, বঙ্গের কুলনারীরও অবস্থা যে ঠিক সেই রকম! তারও যে স্বামী ছাড়া গতি নেই, শোভা নেই, বৃদ্ধি নেই।

এই সময় ভগবানের আশীর্ব্বাদেই বল, আর আমার কর্ম্মফলের জোরেই বল, আমার এই নিস্ফল নারীজীবন সার্থক করতে, আমার মধুময় জীবনে অমৃত ধারা বর্ষণ ক'রতে, আমার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ ক'রলে। কিন্তু পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভীষণ টাইফয়েড রোগ হ'ল। আহা তখনও পর্য্যন্ত আমার স্বামীর যে আদর যত্ন ছিল, সে কৃত্রিম হ'লেও সে আদর যত্নটুকুও যদি অভাগিনী এখনও পেত, তা হ'লে বুঝি আজকের এই অন্তর-জ্বালা বাইরে প্রকাশ পেত না। তাঁর তখনকার সেবা যত্ন দেখে আমার মনে যদিও বা কখনও কোনও সন্দেহ ছিল তাও একেবারে অপনোদন হ'য়ে গেছল। রোগক্লিষ্ট চক্ষু উন্মীলন করলেই তার সেই পটোলচেরা চোখের সস্নেহ চাহনি, আমার অন্তরে যেন অমৃত নিক্ষেপ করে দিত; রোগের যন্ত্রণাও মধুর লাগত। তাই আমি মরণের দ্বার থেকে অত শীঘ্র ফিরে এলুম; আবার ভাল হলুম। কিন্তু মলেই ছিল ভাল। তা হ'লে তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস দিয়ে, তার ভালবাসা স্নেহ অকৃত্রিম মনে করে, সুখের স্মৃতিটুকুই অপর পারে নিয়ে যেতে পারতেম।

টাইফয়েড থেকে ভাল হলুম বটে কিন্তু চিরদিনের জন্যে কালা হ'য়ে একটা পা খঞ্জ হ'য়ে গেল। গুণের উপর আবার একটা গুণ বাড়ল!

এর পর থেকেই যেন তার সে একান্ত অনুরাগ, সে আদর যত্ন, সে ভালবাসার হ্রাস পেতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলে প্রথম প্রথম হেসে শেষে বিরক্ত হয়ে একই উত্তর দিতেন। বলতেন "বয়স কি আর বাড়ছে না, ছেলের বাপ হ'য়েও কি আবার আগেকার মত আদর সোহাগ দেখান যায়"? তাঁর এই যুক্তিটা সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আমার সামর্থ্য না থাকলেও, প্রথম প্রথম

তাই আমি বেদবাক্য ব'লে মেনে নিয়ে, তার ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত অনুরাগেই সন্তুষ্ট হ'তাম। এতই তাঁকে আমি ভালবেসেছিলাম। মাঝে মাঝে এই নিয়ে স্বামীর আদর সোহাগে গরবিনী বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর এই যুক্তি দেখিয়ে, তর্ক করে, সিদ্ধান্ত করতে চাইতুম, যে আমার স্বামীর আমার প্রতি পূর্ব্বভাব ঠিকই বজায় আছে ; তবে তার বেগটা আর আগেকার মত বাইরে প্রকাশ পায় না ; অন্তঃ সলিলা ফল্গু নদীর মতই অন্তর মাঝে নিবদ্ধ আছে। তারা সে কথার কোনও তীব্র প্রতিবাদ করত না বটে, কিন্তু মুচকি মুচকি হাসত, ও আমাকে বোকা মেয়ে বলে ঠাওা করত। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি এই রকম তর্ক করতুম বটে, কিন্তু তারা চলে গেলে নিভৃতে বসে চিন্তা করতে গেলে, মনের কোণে এক একবার কেমন যেন কিসের সন্দেহ এসে উঁকি ঝুঁকি মারত। সত্যিই কি বয়স হ'লে ভালবাসার বেগ কমে আসে? সত্যি সত্যিই কি? কই আমিও ত ছেলের মা হ'য়েছি। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ ত দিন দিন বাড়ছে কই কমছে না। বন্ধুদের মধ্যে, দু একজন ত আমার চেয়েও বয়সে বড়, তারাও ত পুত্রের জননী, তাদের মুখে ত অন্যরকম কথা শুনতে পাই। তবে কি আমার প্রতি আমার স্বামীর টান বাস্তবিকই কমে আসছে? ভগবান! এই সন্দেহের মীমাংসা যদি পূর্ব্ব থেকেই ক'রে উঠতে পারতুম, যদি নিশ্চয় ক'রে তখন বুঝতে পারতুম, যে বিবাহের পর তার ভালবাসা, তার আদর স্নেহ ; রোগে তার সেবা সবই একেবারে অন্তঃসারশূন্য, কৃত্রিমতায় পূর্ণ, তা হ'লে ত একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম। তাহ'লে এর পরের ঘটনায়, মনের উপর এমন কঠিন ধাক্কা পেতে হ'ত না। এমন ক'রে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব মধ্যে প'ড়ে চিরকাল ধ'রে দগ্ধে মরতে হ'ত না। তার এখানকার কুৎসিৎ অবহেলার মধ্যেও যে, তার সেই পূর্ব্ব অনুরাগ স্মরণ ক'রে এক একবার আশা জেগে ওঠে, যেন আবার তাকে আমি ফিরে পাব, কেবল আমার অদৃষ্টের, আমার কর্ম্মফলের, আমার গুণহীনতার জন্তেই, তিনি আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন।

ক্রমেই আমার স্বামীর এই ভাবান্তরের কারণ, একটু একটু ক'রে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। ক্রমেই জানতে পারলুম, কেন আমার সঙ্গে তর্কের সময় আমার, বন্ধুরদল, কেবল মুচকি মুচকি হাসতেন। ক্রমেই বুঝতে পারলুম যে আমি গৃহ কোণে থেকে স্বামীর উপর অগাধ বিশ্বাসের বশে যে খবর এতদিন পাইনি, ও যাহা আমার নিকট হ'তে অতি সযতনে আমার আত্মীয় আত্মীয়াদের দ্বারা গোপনে রাখা হয়েছিল, তারা সে খবর পেয়েছিল ও তাই ব্যঙ্গচ্ছলে আমায় সাবধান করবার চেষ্টা করত। প্রথমেই তার এক রোগ আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। কয়েকদিন তার গা থেকে এক রকম তীব্র উৎকট গন্ধ পেয়ে, যখন আমি এক দিবস তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি হেসে বলেছিলেন, যে তাকে যে রকম অসম্ভব পরিশ্রম ক'রতে হয়, তাতে ডাক্তারের পরামর্শে, তাকে মধ্যে মধ্যে পোর্ট নামক এক রকম ঔষধ খেতে হয় ; এ নাকি তারি গন্ধ, আর এ রকম গন্ধ নাকি এবার থেকে প্রায়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ ছলনা তার টিকল না। শীঘ্রই এ অভাগিনী বুঝতে পারলে যে এ কেমন ডাক্তারের পরামর্শে শরীর রক্ষার্থে পোর্ট খাওয়া নয়, এ নিজের শরীর ও আমার কপাল নষ্ট করতে ভীষণ সুরা দেবীর আরাধনা মাত্র। এখন থেকে মধ্যে মধ্যে তার গৃহাগমনে রাত্রি হ'তে লাগল, আর তাও মত্তাবস্থায়। কিন্তু এমনই ছলনায় এ পুরুষটি যে আমার ভালবাসার, তার উপর আমার অগাধ বিশ্বাসের জোরে এ বিষয়েও আমায় ভুল বোঝাতে কম চেষ্টা করেননি। মদ খাওয়া যে দোষের নয়। রাস বিহারী ঘোষ প্রভৃতি বড় বড় গণ্য মান্য লোক মাত্রেই যে মদ খায় ; মদ না খেলে বুদ্ধি খোলে না ; মদ খাওয়া যদি পাপই হ'ত তবে কি ইংরাজ মাত্রেই মদ খেত, ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক সে এমনই সরল ওজস্বিনী ভাষায় এই মুগ্ধা সরলা রমণীর কর্ণে ঢেলে দিত, যে তার আর ওজর করবার, অভিমান করবার অবসর পর্য্যন্ত থাকত না। আর ওজর করবার ইচ্ছা থাকলেও

সাহসে কুলাইত না। কারণ প্রবল শক্তি হ্রাস হওয়ার পর হ'তে লোকের বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে আমি বেশী কথাবার্ত্তা কওয়াই এক রকম ছেড়ে দিয়েছি। সময়ে ও অবস্থায় সবই সয়ে যায়, এটাও হয় ত সয়ে যেত, আর সয়েও আসছিল। কেননা এ পর্য্যন্ত সাধারণ মাতালের মত আমার উপর কোনও অত্যাচার আরম্ভ হয়নি, এবং তার এই ছলনার চেষ্টায় এখনও আমার উপর যে তার সামান্য মাত্রও টান এখনও রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু তারপর যে অধঃপতন সুরাদেবীর আনুসঙ্গিক তাই যখন তার আরম্ভ হ'ল তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে, অভাগিনীর কপাল জন্মের মতই পুড়েছে, যৌবন-সৌন্দর্য্যের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর সামান্য টুকু আকর্ষণ ও শিথিল হ'য়ে গেছে। তাই কালোয় তার আর মন ভুলছে না। উপায় কি? তাঁর ভালবাসা আদর যত্ন পাওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত যে আমার নাই। আমি যে শুধু কালো নয় খোঁড়া। এখন সারাজীবনব্যাপী দীর্ঘশ্বাস আর নিস্ফল ক্রন্দনই যে আমার সম্বল। কিন্তু তাও কি বাইরে প্রকাশ করবার যো আছে! তাতে যে তাঁর অকল্যাণ হ'বে। রাক্ষসী, ডাইনী আমি, কুৎসিৎ কাল-পেঁচা আমি, আমার দোষেই আমার শাশুড়ীর সাধের ছোট ছেলে এমন পরমুখী হ'য়ে গেল! ছেলে ত বরাবর আর এমন ছিল না। কেঁদে আবার তার আদরের দুলালের অকল্যাণ টেনে আনা হ'চ্ছে! মরণও হয় না, আপদ তা'হলে চুকে যায়। ভগবান! মৃত্যু ত আমি দিন দু'বেলাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কচ্ছি কিন্তু আমার কোন্ পাপে আমায় তুমি মৃত্যু দিচ্ছ না। আমি বুঝতে পারছি আমি ম'লে এ সংসারের সকলেই নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু নিজের হাতে মরতে যে আমার ভয় হয় প্রভু! একে ত কত জন্মের পাপের ফলে এ জন্মের এই দুর্গতি। আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'য়ে কি আবার শত জন্ম কষ্ট ভোগ ক'রব। কাজেই আমায় বাঁচতে হ'বে, আর সারাজীবন, যতদিন এ হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে না যায়; ততদিন এই দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন হৃদয়ের গোপন স্তরে লুকিয়ে রেখে সব অপমান, সব মর্ম্মজ্বালা নীরবে সহ্য করতে হ'বে। নইলে যে পাপ হ'বে। আমি যে হিন্দু নারী; স্বামীর দোষ গুণ বিচার করবার অধিকার যে আমার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ!

এখন পর্য্যন্ত তবু মত্তাবস্থা হলেও রাত্রে একবার ক'রে তাঁর দর্শন লাভ আমার কপালে জুটেছিল কিন্তু ক্রমেই তাও বন্ধ হ'য়ে গেল। শুনলাম তিনি নাকি এখন আর বাড়ী আসতে পারবেন না। রাত্রে শোবার ব্যবস্থা নাকি তাঁর আলাদা স্থানে ঠিক হয়ে গেছে। হায় ভগবান এও সইতে হবে? এর চেয়ে স্বামী আমায় আর একটা বিবাহ করলেন না কেন? সেও এর চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু আমার কষ্ট হ'লেও তাঁর পিতামাতার কষ্টের অপেক্ষা একটা বরং স্বস্তির ভাবই লক্ষ্য করলাম। এই কালো বউএর উপর তাদের পুত্রের যে একটুও টান ছিল তা যেন তাদের সহ্য হচ্ছিল না। আমি নাকি কোথায় থেকে মাদুলী আনিয়ে তাদের এই রূপকুব পুত্রটীকে আমার এই কালো রঙেই বশীভূত ক'রে ফেলেছিলাম। তাদের এই পুত্রের এই কালো পত্নীর উপর টানটা বরাবরই কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল। এবং সে জন্যে মাঝে মাঝে আমাকে এমন সমস্ত কথা শুনতে হ'ত যার একটা শুনলে কারও এ ঘৃণিত প্রাণ রাখবার আর ইচ্ছা থাকে না! যাই হ'ক এতদিনের পর তাদের পুত্র যে পেত্নীর মায়া কাটিয়াছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। পুরুষ মানুষ বাইরে যায়, এত আর বিশেষ দোষের নয়। স্ত্রৈন হওয়াটা যে তার চেয়ে দোষের। তাই তারা যেন এখন থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন এই ভাবটা বোঝা গেল।

এ স্থান ছেড়ে গিয়ে যে দিন কতক অপর কোনও যায়গায় গিয়ে থাকব তারও উপায় নেই। হিমালয় বদরিকাশ্রম কৈলাস আদি মহাতীর্থে তীর্থে ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে, আজ বছর দুই পূর্ব্বে, বাবা আমার মনে কথঞ্চিৎ শান্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টে যার শান্তি নেই, তার নিজের চেষ্টায় কি হবে? অভাগিনীর দুরদৃষ্টের কথা, শুনে শোকাগুণ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল। আবার তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তার কিছুদিন

গেলেই, একদিন অশনি নির্ঘোষের মত, তাঁর হঠাৎ বিসূচিকা রোগে পরলোক গমনের খবর একেবারে আমায় নির্ব্বাক ক'রে দিলে। সেই যে কথা বন্ধ করেছি, সেই যে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষান্ত দিয়েছি, আশা ছিল এই ভাবেই গোণা দিন কটা কাটিয়ে দেব; এ মর্ম্ম বেদনার গোপন ইতিহাস কাউকে জানতেও দেব না, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ মেনে নিয়ে, নীরবে, সমস্তই সহ্য ক'রে চ'লে যাব। কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। তার মাত্রা অতিক্রম করলে কোনও মানুষেই ঠিক থাকতে পারে না। তাই স্বামীর এই উপেক্ষা, অনাদর, ব্যভিচার, আমার কর্ম্ম ফল ভেবে নিয়ে নীরবে সবই সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এর উপর আবার শাশুড়ীর ননদিনী জায়েদের রূপের খোঁয়ার আর মুখনাড়া পেলে আমার গুরু ভারাতুর হৃদয় মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। তাই মাঝে মাঝে সইতে না পেরে, শেষে দু একটা রূঢ় বাক্য বান আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু তার প্রতিফল যেরূপ গুরুতর ভাবে আমায় ভোগ করতে হত, তা স্বয়ং অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। তা আর লেখনীতে প্রকাশ করে আর গুরুনিন্দার মহাপাপের ভাগী হতে চাই না। রূপ, রূপ, রূপ! কেন, কালো হয়ে জন্মেছি বলেই কি এত অপরাধ করেছি? আমি কালো বলেই কি তাদের আদরের মানুষটি এমন বেয়াড়া হয়ে গেল? এইটেই কি ঠিক। কেন, আমার যতখানি মনে পড়ে, আমার মা কালো ছিলেন। কই, সে জন্যে ত বাবা আমার এক দিনের জন্যেও দুঃখ করেন নি। বরং সেই কালো স্ত্রীর শোকে পাগল হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছলেন। রূপের অভাব কি গুণে পূরণ হয় না? এ পৃথিবীতে সকলেই কি রূপবতী স্ত্রী লাভ করেছে? আর তা না হলে কি সকলেই আমার স্বামীর মত হীন চরিত্র হয়ে পড়ছে? আমি কালো বলে কি আমার কোনও গুণ ছিল না? মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, তাঁর প্রতি আমার দেবতার মত ভক্তি, এ গুলো দিয়ে ত আমি আমার রূপহীনতার অভাব পূরণ করবার জন্যে চেষ্টা করে আসছি। বৃদ্ধা অত্যাচারিণী শাশুড়ীর মন পাবার জন্যে, যে পায়ে লাথি মেরেছে তাঁর সেই পাই আঁকড়ে ধরে, বিনা দোষে দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে আসছি। রূপহীনা বলে অভিমান আবদার দূরে থাক, সামান্য অভাব পর্য্যন্ত কাউকে জানাইনি। কই এততেও ত স্বামী আমার হ'ল না, শ্বশুর শাশুড়ীর মন পেলাম না? এ পৃথিবীতে কি রূপই সব? গুণের আদর কি মোটেই নেই? বাস্তবিকই কি আমি কালো ব'লে আমার স্বামী আমার পর হ'য়ে গেল। বাস্তবিকই কি কালোতে তার মন ভুললো না ব'লে তিনি রূপের সন্ধানে, কৃত্রিমতাপূর্ণ বারাঙ্গনাদের আশ্রয়ে প'ড়ে থাকেন! অথবা এই স্বভাব, এই দুর্ব্বলতা, এই নীচতা, তার মজ্জাগত ছিল, কেবল বাইরে প্রকাশ হবার সময় ও অবসর খুঁজছিল। হাতে অর্থ পেয়ে ও মা বাপের শাসনের অভাবে, তার সেই অপগুণ সমস্ত প্রকাশ হবার সুযোগ পেয়েছিল! ভগবান এর কোনটা ঠিক, তা স্বার্থান্ধ এরা না বুঝুক, তুমি ত জান।

পূর্ব্বেই বলেছি, পিতার মৃত্যু সংবাদের পর থেকে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তবুও এমনি মানুষের মন, একদিন তাঁকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখে, তাঁর দুটি চরণ আঁকড়ে ধরে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে শুধিয়েছিলুম, কেন তিনি আমার উপর এমন বিরূপ হ'লেন! কি করলে তাঁকে আবার ফিরে পাব! কি রকমটি হ'লে আমি তাঁর মনের মতনটি হ'ব! তার উত্তরে; তিনি বিরক্ত হ'য়ে গর্জ্জে উঠে বলেছিলেন "দেখ, ও ঘ্যান ঘ্যানানি অনেক দিন শুনেছি, শুনে শুনে বিরক্ত হ'য়ে গেছি। কেন তোর কিসের অভাব আমি রেখেছি বলত। তোর বাপের যা কিছু ছিল তার এক পয়সাতে আমি হাত দিইনি, আমি ত তোকে তোর যখন যা প্রয়োজন তার কিছুই দিতে বাকী রাখিনি। কাপড়, জামা, গহনা তোর ত কিছুরই অভাব নেই, তবে কি জন্যে এত ঘ্যান ঘ্যানানি বলত?" তাতে

আমি কেঁদে বলেছিলুম "স্বামী! প্রভু! অর্থের অভাব, গহনাগাটীর অভাব, জামা কাপড়ের অভাব না থাকলেই কি স্ত্রীলোকের সব অভাব মিটে যায়? স্বামী তুমি, প্রভু তুমি, আমার সর্ব্বস্ব তুমি, এক তোমার অভাবেই যে আমার সকলই অসার। এ গহনাগাটি সাজ সজ্জা আমার কার জন্যে রাখ, যদি তুমিই আমায় পায়ে ঠেললে। আমার সর্ব্বস্ব নাও প্রভু, তবু তুমি যদি আমায় আগেকার মত দুটো আদর কর, একটু ভালবাস তা হলেই আমি রাজরাজেশ্বরীর অপেক্ষাও নিজেকে গরবিণী মনে করব"। হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠে তিনি ব'লে উঠলেন "বাঃ রে বেশ নভেলি আনা শিখেছিস্ ত! তুই কি এখনও বিয়ের কনেটি আছিস্ না কি, যে আগের মত তোকে আমার আদর দেখাতে হ'বে! তোর আস্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়। তোতে আর আছে কি, তুই ত এখন ছেকরা গাড়ীরও অধম। ছেলে মানুষ করবি ঘর সংসার দেখবি, ব্যস্। প্রাণ্ণিবাদ না করলে কি আর আদর দেখান হয় না বুঝি। সে সব আমার দ্বারা হবে না। ইচ্ছে হয় ত ······ তার পর যে কথা উচ্চারণ করলেন তা আর কাউকে শুনিয়ে পাপে লিপ্ত করাব না। সে কথা শুনে আমি মরমে মরে গেলুম, আমার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। জগৎ সংসার আমার চক্ষে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ভগবান এ কথা শোনবার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন! তোমার বজ্র কি এতই দুর্ম্মূল্য হ'য়েছে, যে তার একটাও তুমি অভাগিনীর উপর নিক্ষেপ করে আমার এ স্বনিত অপমান হ'তে রক্ষা করতে পারলে না প্রভু! অথবা এও আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল! অবশ হস্তের শিথিল মুষ্টি থেকে পা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি যে কখন বেরিয়ে গেছেন তা জানতেই পারি নি। কতক্ষণ যে এই ভাবে আমার কেটে গেছল তাও জানতে পারিনি। যখন একটু সংজ্ঞা ফিরে এল তখন নিম্নতল হতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গর্জন শোনা যাচ্ছিল "বাপ্ আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে যা হ'ক, বুকের পাটা বটে, পুরুষ মানুষকে একটু ভয় ভক্তি নেই গো। এতদিন পরে যদিই বা মানুষটা একবার ঘরে গেল, তা দুটো ভাল করে মিষ্টি কথা বল, হাসি খুসি ক'রে গল্প গাছা করে তাকে কতক্ষণ ভুলিয়ে রাখ্ তা নয় কেবল ফাঁাস ফ্যাঁসানি আর নাকি কান্না! ও সব কি পুরুষ মানুষের ভাল লাগে গা? ওঃ মাগী! আবার বক্তৃতার ভঙ্গী দেখে কে! গেল তেমনি পেঁচা মুখে লাথি মেরে চলে। বেশ হয়েছে! দুখা জুতিয়ে দিয়ে যেত তবে ঠিক হ'ত। বাছার রূপও যেমন ছুতো হাঁড়ির মত, গুণও কি তেমনি ভগবান দিয়েছেন? নিজের ভাল নিজে বোঝে না। আ মর।"

ওধারে শ্বশুর অমনি ব'লে উঠলেন "সাধে কি আর ছেলেটা বিগড়ে গেছে, ওর গুণেই ত! ওর যদি সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকৃত তা হলে কি আর একটা পেত্নী নিয়ে ছেলেটা প'ড়ে থাকে? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ করুক।"

এর পর আর কোনও কথাই চলে না। সুতরাং সেই থেকেই আমি একেবারে চুপ করে গেছি তার পর পাঁচ বছর নীরবে নির্ব্বাক ভাবে সবই সয়ে আছি আজ এতদিন পরে কেন জানি না হঠাৎ আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে গেল। পত্নীত্বের দাবি এ জন্মের মতই ছেড়ে দিয়েছি। এখন বাকী কেবল মাতৃত্বের দাবি। জানিনা বাপের বেটা তার এই কালো কুৎসিৎ মাকে শেষ পর্য্যন্ত এই মাতৃত্বের দাবি টুকুও রাখতে দেবে কি না।

শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু।

প্রভু-ভক্তি ।

ভৃত্যেরে লয়ে চলেছে আমির
উদ্যান পথ বাহি ;
ফল এক তুলি দিলেন খাইতে
স্নেহে তার পানে চাহি ।
দেখিলেন ফিরে খাইছে ভৃত্য
কত নাহি জানি সুখে,
তৃপ্তির গাঢ় মধুর ছবিটি
ফুটেছে তাহার মুখে ।
ভাবিলেন বুঝি এমন মিষ্ট
ফল আর নাহি ভবে,
বাসনা হইল, খাদ তার
নিজে গ্রহণ করিতে হবে ।
খণ্ড তাহার লইয়া
অমনি দন্তে কাটিতে গিয়া
দেখিলেন তাহা গড়েছে
বিধাতা সকল তিক্ত দিয়া ।
বিকৃত করি অমনি বদন
ফেলিয়া দিলেন ফিরে ;

বিস্ময়ে ডাকি ভৃত্যেরে কাছে
কহিলেন তারে ধীরে,
এমন তিক্ত ফল আমি কভু
দেখি নাই এর আগে,
কেমনে তুমি যে খাইতেছ ইহা
কি রসের অনুরাগে ?
আনতশীর্ষ কহিল ভৃত্য
যাঁহার হস্ত হ'তে
চিরদিন কত মিষ্ট দ্রব্য
লভিয়াছি নানা মতে ;
সেই হাতে দেওয়া স্নেহের
এ দান হেলায় ফেলিব যবে,
অকৃতজ্ঞের চির কলঙ্ক
আমারে ঘেরিয়া রবে ।
হৃষ্ট আমির মাজায়ে বচনে
দিলেন তাহারে বর,
ভৃত্যের কাজে আজ হতে
তোমা দিনু চির অবসর ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

পাওনা-গণ্ডা।

সংস্কৃতে একটি বাক্য আছে, তাহার অর্থ এই :—

"আত্মচ্ছিদ্র নাহি জান,
পরচ্ছিদ্র কর অন্বেষণ।"

অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে বলে, "চালনী ছুঁচের বিচার করে"। এই আত্মদোষান্ধতা এবং পরদোষানুসন্ধিৎসা আমাদের সমাজে আজকাল এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, তাহার জ্বালায় তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিতেছে। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা, অর্থাৎ অর্দ্ধাশী ও অর্দ্ধনগ্ন মসীজীবী বাঙ্গালী বাবুরা, প্রায়ই এই বলিয়া ব্যবসায়ীদের নিন্দা করিয়া থাকি যে, ব্যবসাদাররা বড় ছোট লোক, তাহাদের চোখের চামড়া নাই, তাহারা নিতান্ত আত্মীয় লোকের নিকট হইতেও আপনাদের পাওনা গণ্ডা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লয়, সিকি পয়সাও ছাড়ে না, এক পয়সার জন্য আত্মীয়-বন্ধুদের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অথচ অপরের পাওনা সহজে দিতে চাহে না, এক কপর্দ্দকও বাজে খরচ করে না, ইত্যাদি। কথাগুলি আমরা এমনভাবে বলি, যেন আমরা অতি ভদ্রলোক, লোকের সহিত ব্যবহারে পরম সাধু, এবং আদান-প্রদান ব্যাপারে বেজায় মুক্তহস্ত। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমরা 'ব্যবসাদার' বলিয়া যাহাদিগকে এত অবজ্ঞার চোখে দেখি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ব্যবসাদার নহি।

ব্যবসাদাররা অর্থের আয়ব্যয় বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা একটু অধিক সতর্ক, এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাও ত ভাবিয়া দেখিতে হয় যে, যাহারা একটি পয়সা লাভ করিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, অমাক্ষ দু'দশ টাকা মূলধন লইয়া পরে লক্ষপতি কোটি-পতি হইবার বাসনা করে, তাহাদের পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়া কিরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়? তাহারা যদি আমাদের ন্যায় বিলাসী বাবু হইত, তাহা হইলে তাহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করা দূরে থাকুক, ঋণজালে জড়িত হইয়া অধঃপতিত হইত। ইহা অপেক্ষা মিতব্যয়িতার (বাবুদের ভাষায়, কৃপণতার) দুর্নাম ভাল নহে কি? প্রত্যেক বাঙ্গালীই যদি এইরূপ মিতব্যয়ী হইতে পারিত তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালী জাতির অবস্থা আজ অন্যরূপ হইতে পারিত।

সে কথা যাক্‌ এখন আমার বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে, অর্থোপার্জ্জন বা অর্থরক্ষাই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য নহে,—টাকা-আনা-গণ্ডা বা পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের হিসাবে কে কত উদার বা অনুদার, শুধু তাহা দেখিয়া সমাজবাসী মানবের মহত্ত্ব বা নীচত্বের বিচার করিলে চলিবে না। 'দেনা-পাওনা' বলিলে আমরা সাধারণতঃ টাকা কড়ির লেন-দেন বুঝি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ টাকাকড়ি ছাড়া আরও অনেক বড় বড় জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্নেহ দয়া পরোপকার এবং বন্ধুবান্ধব ও সর্ব্বসাধারণের সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার, এই সকল সদ্বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মানব সমাজে সুখশান্তির বিধান করা যায়; পক্ষান্তরে এগুলির অভাবে সমাজ শ্মশানে পরিণত হয়। পয়সা-কড়ির হিসাব নিকাশে ভুলচুক বা দেনা পাওনায় সাধুতার সরলতার অভাব হইলে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে অশান্তির উদ্ভব হয়, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধোচিত সদ্ব্যবহারের অভাবে মানব সমাজে তাহা অপেক্ষা ঘোরতর অশান্তি অনুভূত হয়। সে অশান্তি নিবারণের চেষ্টা করা মানুষ নামধারী জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য নহে কি?

বিধাতার অনন্তরহস্যপূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে একটি প্রধান রহস্য এই যে, মানুষ কতকগুলি প্রকৃতি দত্ত অধিকার

লইয়া পৃথিবীতে আগমন করে। কেহ শিখাইয়া না দিলেও মানুষ জন্মগত সংস্কার বশে সে অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে চাহে। মানব সমাজের সুখশান্তি বিধানের জন্য সমাজের শীর্ষ স্থানীয় মনস্বিগণ অনেক রকম নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সামাজিক জীবমাত্রেই সে সকল নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য। মানুষকে একদিকে যেমন কতকগুলি অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই তাহাদের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্যেরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মানুষ যদি তাহার অধিকার ভোগ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যগুলিও যথাযথরূপে পালন করিতে হইবে। এই (Rights and duties) অধিকার ও কর্ত্তব্যের সমন্বয়ের উপর সমাজযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের একটির অভাবে অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই মানব প্রবর্ত্তিত বিধিনিষেধের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে, যেগুলি বাহ্যতঃ সকল সময়ে অনুভূত না হইলেও তাহাদের কার্য্যকারিতা মানব প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর কার্য্যকারিতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। সেগুলি সর্ব্বদা মানবের বহির্দৃষ্টির গোচর না হইলেও অন্তর্দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। রজোগুণপ্রধান বা তমোগুণসর্ব্বস্ব দৃপ্ত মানবের 'সবল' হৃদয়ে সেগুলি সকল সময়ে স্থান পায় না বটে, কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান ভাবুকের ভাবদর্পণে সেগুলি সর্ব্বদা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিফলিত হয়! সামাজিক বিধিনিষেধের ব্যতিক্রমে যেমন সমাজে দণ্ডিত হইতে হয় এই নিয়মগুলির ব্যতিক্রমে সেইরূপ দণ্ডিত হইতে হয় না বটে, কিন্তু তাহার ফলে মানবের শান্তিময় আগারে এবং তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে দারুণ অশান্তির উদ্ভব বিবেকবুদ্ধিশালী মানবের নিকট তাহার যন্ত্রণা বড় কম নহে। বাহিরের নিয়ম ভাঙ্গিলে শুধু বাহিরের শান্তিই প্রায় নষ্ট হয়, কিন্তু ভিতরের নিয়ম ভাঙ্গিলে ভিতরের ও বাহিরের এই উভয়বিধ শান্তিই নষ্ট হইয়া যায়।

জটিল মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আর পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। এখন দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে বাস করিতে হয়। এই সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পরস্পরের উপর যেমন স্নেহের দাবী আছে, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি অনেক প্রকার কর্ত্তব্যও আছে। সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিলে স্নেহের দাবী রক্ষা হয়, আর সংসারও সুখের হয়, কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে ঐরূপ কর্ত্তব্য পালনের একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে।

বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি পুত্র সে কর্ত্তব্য পালনে বড়ই পরাঙ্মুখ। কখনও বা বিদেশে চাকরীর খাতিরে, কখনও বা 'আবর্জ্জনা' দূর করিবার মানসে, উপযুক্ত পুত্র বৃদ্ধ মাতাপিতাকে পৈত্রিক ভগ্নকুটীরে রাখিয়া 'শীতলা ঘাড়ে করিয়া' প্রবাসে পরম সুখে কালযাপন করিতেছে। কখনও বা দেখিতেছি, পুত্রের অন্যায় দেখিয়া পিতা দুই চারি কথা বলিতে গিয়া প্রত্যুত্তরে প্রহাররূপ পরম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। অথচ এতাদৃশ পুত্রও পিতৃ স্নেহের দাবী করায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে অনর্থ বাধাইতেছে। পক্ষান্তরে, পুত্রের শৈশবে পিতা তাহার সৎশিক্ষা বিধানে মনোযোগী না হইয়া তণ্ডুলতাম্রকূটাদি উপঢৌকনলোলুপ গুরুমহাশয় অথবা দণ্ডপলহিসাবকারী গৃহশিক্ষকের হস্তে তাহার ভার অর্পণ করিয়া মৎস্যধারণ উপন্যাসপাঠ, অথবা ক্রীড়া কৌতুকে অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বালক পুস্তকে পাঠ করিতেছে, "চুরি করা বড় দোষ"; কিন্তু তাহার জননী তাহাকে প্রতিবেশীর ক্ষেত্র হইতে কাঁকুড় তরমুজ এবং বাগান হইতে আম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি অপহরণ করিয়া আনিবার পরামর্শ দিতেছেন। এইরূপে তাহার গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক অনুশীলন হইতেছে!

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ স্থলেও পুত্রের কুশিক্ষা মাতাপিতার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ—তাঁহারা সুশীল সুবোধ মাতৃপিতৃ ভক্ত সন্তানই কামনা করেন!

শিক্ষক অর্দ্ধপক্ক অন্ন ও অর্দ্ধ সিদ্ধ ব্যঞ্জন কোনরূপে গলাধঃকরণ করত মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্রগণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন, অথচ উপযুক্ত ছাত্রগণ অনবহিত হইয়া পাঠাগার মধ্যে অযথা বাক্যালাপ করিয়া শিক্ষকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে, অথবা সুযোগ পাইলে তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে অঙ্গুষ্ঠসহযোগে তাঁহাকে কদলী প্রদর্শন করত ছাত্র জন্ম সার্থক করিতেছে কখনও বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটাইয়া রসনা চরিতার্থ করিতেছে। অথচ এই সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট 'ভদ্রোচিত' ব্যবহারের দাবী করে। পক্ষান্তরে, শিক্ষক মহাশয় শিক্ষা প্রদানচ্ছলে আলস্য ও গল্প গুজবে ঘণ্টাটুকু কাটাইয়া দিয়া যুগপৎ ছাত্রদিগের ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সর্ব্বদাই ছাত্রগণের নিকট হইতে গুরুভক্তি ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মাসের মাস বেতন, এ দুইটী জিনিসের পুরা দাবী করিতেছেন!

সদাশয় প্রভু ভৃত্যকে বিশ্বাস করিয়া তাহার হাতে সমস্ত সংসার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু ভৃত্য সুযোগ পাইয়া সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করত প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই, ভৃত্য নিজের জীবন দিয়াও প্রভুর ইষ্ট সাধন করিতে উৎসুক, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কঠোর প্রকৃতি প্রভুর নিকট অহরহঃ তিরস্কার ও প্রহার লাভ করিয়া তাহার জীবন বিষাদভারাক্রান্ত হইতেছে। ভক্তিমান্ যজমান কুলপুরোহিতকে পারলৌকিক কল্যাণসাধনের নিয়ন্তা মনে করিয়া তাঁহার হাতে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় হয় ত যজমানের পারত্রিক উন্নতি অপেক্ষা তাহার প্রদত্ত সোপকরণ নৈবেদ্যের দিকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন! পক্ষান্তরে, পুরোহিত যজমানের মঙ্গলেচ্ছায় তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে সদুপদেশ দান করিয়া তাহার নিকট অকপট ভক্তির ন্যায্য দাবী করিতেছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তমোগুণসম্পন্ন যজমান পুরোহিতকে কৌলিক ভৃত্যের অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত। পরম পবিত্র যাজনক্রিয়া এইরূপে অতি নীচ ব্যবসাদারীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

পুত্রের মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূ গৃহে আনিয়া বৌমাটিকে পরম যত্নে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দিয়া নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়া বৃদ্ধ বয়সে একটু সুখ শান্তির প্রত্যাশা করিতেছেন, কিন্তু বৌমাটি হয় ত নাটক-নভেল-পাঠে, বয়ন শিল্প চর্চ্চায়, অথবা সমবয়সীদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুক ও গল্প গুজবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া সংসার কর্ম্মে তথা স্নেহময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদেশে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করত তাঁহার মনঃপীড়া উৎপাদন ও সংসারে অশান্তি আনয়ন করিতেছে, অথবা যৌবনে স্বামীর অতিরিক্ত আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়া কথায় ও কাজে সদাসর্ব্বদা গুরুজনের প্রতি দারুণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ও কলহের অবতারণা করিয়া সুখের সংসার ছারখার করিয়া তুলিতেছে। আবার ইহার বিপরীত দৃশ্য দেখুন, সরল হৃদয়া মধুরভাষিনী ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা ভক্তিমতী বধূ দেবতাজ্ঞানে শাশুড়ীর পূজা করিয়া সানন্দচিত্তে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু রুক্ষস্বভাবা শাশুড়ী হয় ত তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, কোথা হইতে একটা রাক্ষসীর বেটী আসিয়া মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার ভাল ছেলেকে বশ করিয়া লইয়া তাঁহাকে তাঁহার পাওনা গণ্ডা (অর্থাৎ পুত্রের [illegible] ভক্তি ও সেবা) হইতে বঞ্চিত করিতেছে এই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বয়ং অশেষবিধ বাক্য যন্ত্রণা দিয়া এবং কখনও বা নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া, এবং তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুত্রের দ্বারা প্রহার করাইয়া নিরপরাধা বধূটির জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে। (এই দৃশ্যটী আধুনিক বাঙ্গালী সমাজে বড় বিরল নহে?)

অধিক কথায় কাজ কি, পরম পবিত্র চিরমধুর দাম্পত্যপ্রণয়ের মধ্যেও অনেক সময়ে সরল আন্তরিকতার অভাব এবং কুটিল স্বার্থপরতার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। স্বামী দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীর হাতে আনিয়া দিতেছে; কিন্তু স্ত্রী হয় ত তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সময়ে অসময়ে নিরীহ স্বামীর উপর গঞ্জনা বৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনের সব সুখ নষ্ট করিয়া দিতেছে। হতভাগ্য স্বামী কায়ক্লেশে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিয়া যথাসর্ব্বস্ব স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিয়া অমায়িক আদর-যত্ন-প্রীতি দ্বারা বাকী অভাবটুকু পূরণ করিয়া একটু সুখের প্রত্যাশা করিতেছে, কিন্তু প্রগল্‌ভা পত্নী অল্পে তুষ্ট না হইয়া উত্তম আহার, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের জন্য কঠোর ভাষায় স্বামীকে তিরস্কার করিতেছে; দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তাহার মন উঠে না, সে দাস দাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া অট্টালিকায় বাস করিতে চাহে। এ স্থলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক ভদ্রলোক শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া কোন রকমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর এই আবদার ছিল যে তাহাকে প্রতি মাসে একখানি করিয়া মোহর দিতে হইবে। অবশ্য ভদ্রলোক যে বেতন পাইতেন তাহাতে সংসারের খরচ চালাইয়া একখানি মোহরের মূল্যের এক চতুর্থাংশও উদ্বৃত্ত হইত না; অগত্যা তাঁহাকে সকাল-সন্ধ্যায় একাধিক ধনী সন্তানের গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া আরও কিছু উপার্জ্জন করিতে হইত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম অর্দ্ধোপবাসী বাঙ্গালীর শরীরে কত দিন সহ্য হয়? ভদ্রলোক অল্পদিনের মধ্যেই কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। স্ত্রীর মোহরের পিপাসাও সেই সঙ্গে মিটিয়াছিল কি না, তাহা জানি না। এরূপ নারী সমাজের কলঙ্ক, ইহারা আর্য্যনারীর উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। কুচরিত্রা নারীর কথা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইলেও তাহা বিবৃত করিয়া কোন লাভ নাই; কেননা, যাহারা স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত ও স্বামীর আদরে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারই বুকের রক্ত শোষণ করিয়া পরিণামে বিশ্বাসঘাতিনী ও ব্যভিচারিণী হইতে পারে, তাহাদের কথা লিখিতে গেলে লেখনী কলুষিত হয় মাত্র।

এই ত গেল একদিক্। কিন্তু ইহার বিপরীত দিক্‌ও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ স্ত্রীই যে সকল ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি অবিচার করে তাহা নহে, স্বামীও অনেক ক্ষেত্রে (এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) নিরাপরাধা সাধ্বী স্ত্রীর উপর দারুণ অবিচার করিয়া থাকে। অধিকাংশ হিন্দু নারীই পার্থিব সুখ সম্পদ চাহে না; স্বামীর সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া স্বামী সেবা করিতে পারিলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করে। তাহারা হৃদয়ভরা ভালবাসা ও প্রাণ ঢালা সেবা স্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া প্রতিদানে ভাল ঘর, ভাল কাপড় অর্থ বা অলঙ্কার, এ সকলের কিছুই চাহে না, শুধু স্বামীর সরল বিশ্বাস ও অণুমাত্র ভালবাসা পাইলেই কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু অনেক স্বামী এমন পিশাচপ্রকৃত যে, তাহারা স্ত্রীর ভক্তি ও ভালবাসা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে চাহে, একটুকু ত্রুটি হইলেই তিলকে তাল করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য আলোড়িত করে; অথচ তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য, তাহার শতাংশের একাংশও দিতে চাহে না। যাহারা বড় গলায় 'সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম' ও আর্য্য সভ্যতার বড়াই করিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই মধ্যে অন্বেষণ করুন, এরূপ 'পতিদেবতা' * লক্ষ লক্ষ মিলিবে। তাহারা সাধ্বী স্ত্রী চাহে, কিন্তু নিজেরা সাধু হইতে পারে না বা চাহে না। তাহাদের মতে নারীর ব্যভিচারই দূষণীয়, পুরুষের ব্যভিচার আদৌ দূষণীয় নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ এই পাষণ্ডগণের দণ্ড [illegible] একান্ত উদাসীন।

আর অধিক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, কি উচ্চ কি নীচ, কি

---

* বহুব্রীহি নহে, কর্ম্মধারয়।

ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্য আদায় করিতে যত উৎসুক, অপরের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে তত উৎসুক নহে। যে ছেলে আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে পারে না, মা-বাপ তাহাকে 'বোকা' 'বর্ব্বর' বলিয়া তিরস্কার করেন, কিন্তু যে ছেলে পরের পাওনা গণ্ডা বুঝাইয়া দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাহাকে ত তিরস্কৃত হইতে দেখি না। এই স্বার্থপরতা, এই দুই দুই ভাব, এই 'অয়ং নিজঃ পরো বেতী' গণনা, আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তের কঠোর সাধনার ফলে যদি আমরা এ ভাবটিকে চিত্ত হইতে দূর করিতে পারি, তবেই আমরা 'মানুষ' নামের যোগ্য হইব, তবেই আমাদের সমাজ আদর্শ সমাজ হইবে। নতুবা, নিজেদের পেটের ভিতর ব্যবসায়-বুদ্ধি লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরের ব্যবসাদারের নিন্দা করিলে চলিবে না।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্তবাণী।

[সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ]

(কবীর সাহেবের চিতাবনী।)

হে কবীর! তুই কিসের অহঙ্কার করিস্? কাল ত তোর চুল ধরিয়াই আছে; ঘরেই হোক্ বা পরদেশেই হোক্ কখন যে সে তোকে মারবে তা কে বল্‌তে পারে?

* * *

আজ হোক্ বা কাল হোক্ তোর ঘর জঙ্গল হয়ে যাবে; তার উপর লাঙ্গল চলবে আর ঘোড়ায় ঘাস খাবে।

* * *

হাড় কয়খানি ঠিক কাঠির মত ও মাথার চুলগুলি ঠিক শুক্‌নো ঘাসের মত জ্বলছে; জগতের সবই এম্‌নি জ্বল্‌ছে দেখে কবীরের মন আজ বড়ই উদাস।

* * *

সংসারের সকলেই পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কাহারও কুশল দেখি না। জরা মৃত্যু ও ভয় যেখানে সেখানে কি কুশল থাক্‌তে পারে?

* * *

মানুষ ত ঠিক জলবুদ্‌বুদের মত, প্রভাতের তারার মত দেখ্‌তে দেখ্‌তেই মানুষ কোথায় মিলিয়ে যায়।

* * *

রাতটি গেল শয়নে, দিনটি ভোজনে। হায়! হায়! হীরার মত এমন অমূল্য যে মনুষ্য জন্ম তা কড়ির বদলে বিকিয়ে গেল!

* * *

এই অবসরে যদি চেতনা না হয় তা হলে ত ঠিক পশুর মত দেহ ধারণ করা হলো! সত্য নাম না জান্‌লে অন্তকালে যে নিশ্চয়ই মুখে ছাই পড়বে!

* * *

আগের দিন পিছনে চলে গেল, তবুও ভগবানের সঙ্গে ভালবাসা কর্‌লি নে। পাখীতে যদি ক্ষেত খেয়ে যায়, পরে পস্তালে কি হবে?

* * *

আজ বলি যে কাল ভগবানের ভজনা কর্‌বো, কাল এলে বলি যে আচ্ছা কাল ভজন কর্‌বো। এমনি করে' আজকাল কর্‌তে কর্‌তে এ অমূল্য সুযোগ চলে যাচ্ছে।

* * *

এক পলকের চার ভাগের এক ভাগে কি হবে তার খবর নাই, অথচ কাল্‌কার জন্য সব আয়োজন করে রাখছি। বাজপাখী যেমন হঠাৎ এসে ছোঁ দিয়ে শিকার নিয়ে যায়, কালও তেমনি হঠাৎ একদিন এসে আমাকে নিয়ে চলে যাবে।

* * *

এক পলকের চার ভাগ ত দূরের কথা; এক পলের চার ভাগের এক ভাগে কি হবে তাও আমরা জানি না।

* * *

আমি মনে করছিলেম অনেক জমি মাল পত্র বেশ করে ভোগ করবো। কিন্তু হায়! হায়! মাল পত্র যেমনটি তেমনই পড়ে রইল, আর মাঝ থেকে কাল এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল।

* * *

হে কবীর তোর দেহ ত থাকবে না চলে যাবে। লক্ষপতি ক্রোড়পতি যে তাকেও খালি হাতে যেতে হচ্ছে। ভবের হাটে যদি কিছু গাঁটিতে বাঁধতে হয়, এই সময় বেঁধে নে; পরে আর হাট করতে পারবি না, যা কিছু নিতে হয় এই সময়েই নিয়ে নে।

* * *

দেহ ধারণের গুণ এই যে কিছু দে। হে কবীর যতক্ষণ তোর দেহ আছে কিছু না কিছু দে।

* * *

দেহ ত ছাই হয়ে যাবে, তখন আর কেহ 'দেহ' বলবে না। কাজেই দেহ থাকতে কিছু না কিছু দে ও পরের উপকার কর্—এই ত মানব জীবনের উৎকৃষ্ট ফল।

* * *

দান করলে তোর ধন কমবে না! নদী থেকে জল নিলে কি নদীর জল কমে যায়? কবীর বলছে এ কথা বিশ্বাস না হয় আপন চোখে দেখে নে।

* * *

এক মহাত্মার অনেক বড় বড় শিষ্য ছিল। তারা প্রায়ই গুরুজীকে ভাল ভাল খাবার ও দামী কাপড় চোপড় উপহার দিত। গুরুজীও সেই ভক্তির উপহার গুলি নিয়ে নিজের ও অন্যের ভোগে লাগিয়ে দিতেন। শিষ্যদের মধ্যে একজন নূতন গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। এই সব দেখে তার মনে বড়ই খট্‌কা লাগ্‌লো।

মনে কত রকম সন্দেহ এসে উপস্থিত হলো শেষে মনের ভাব চেপে না রাখতে পেরে, সে একদিন গুরুজীকে নির্জ্জনে পেয়ে বল্‌লে, 'মহারাজ যদি অপরাধ না নেন তা'হলে আমার একটি নিবেদন আছে।"

গুরুজী তাকে অভয় দিলেন তখন শিষ্যটি বল্‌লে "মহারাজ, আপনি এত ঘি দুধ মালাই সবই ত খান; এতে কি আপনার মনে বিকার হয় না?" মহাত্মাজী বল্‌লেন," তোমার এই কথা! তা বেশ, এর উত্তর তুমি পরে পাবে।" কিছুদিন পর শিষ্যটি গুরুজীর সেবা করবার সময় তাঁকে বড়ই উদাস ও চিন্তাকুল দেখ্‌লো। শিষ্য কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন "দ্যাখ্ আজ ভজন করবার সময় জান্‌লেম যে আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে তোর মৃত্যু হবে। তাই আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।" শিষ্য ত কথা শুনেই ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে বল্‌লে, "মহারাজ, আমার শরীর ত থর্ থর্ করছে। এখন আমার কি উপায় হবে বলুন।" গুরুজী বল্‌লেন, "উপায় আর কি? আচ্ছা, তুই সব সময় আমার কাছেই থাক্, তোর পরকালের যা কিছু করবার তা আমি করবো।" সেই দিন থেকে গুরুজী তাকে ভাল ভাল খাবার খাওয়াতে লাগ্‌লেন, ভাল ভাল পোষাক পরতে দিলেন ও তাকে নানা রকমের সুখভোগ করাতে লাগলেন। শিষ্য ত রোজই দিন গন্‌ছে। এমনি করে ত ত্রিশদিন কেটে গেল। ত্রিশ দিন বাদ শিষ্য গুরুজীকে বল্‌লেন, "মহারাজ ত্রিশদিন ত কেটে গেল; কই, কিছুই ত হলো না। এর মানে কি?" গুরুজী বল্‌লেন আগে আমার কথার জবাব দাও, তারপর তোমার কথার উত্তর পাবে। তুমি এই ত্রিশদিন ধরে কি কি খেলে, কি কি ভোগ বিলাস করলে তা আমাকে সব বল দেখি।" শিষ্য বল্‌লে "আমার সেদিকে কোন খবরই ছিল না।" তখন গুরুজী বল্‌লেন, 'তা হলে

তোমার প্রশ্নের উত্তর ত হয়ে গেল। দিবারাত্রি মৃত্যুর দিকেই তোমার নজর ছিল, তাই সংসারের এত ভোগ বিলাস তোমার মনে কোন বিকারই জন্মাতে পারে নাই। আমারও ঠিক তাই হয়। মৃত্যু যেন সর্ব্বদাই আমার সামনে আছে বলে বোধ হয়।"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পচন।

কবি গাহিয়াছেন—

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?"

জন্মিলেই মরণ অবশ্যম্ভাবী সত্য। এ নশ্বর মর জগতে সকল পদার্থই মরণশীল এবং মরণশীলতা প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থের এক বিশেষ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জড়, জীব, উদ্ভিদ সকলের উপরেই মহামরণের একছত্র অখণ্ড প্রভুত্ব নির্ব্বিশেষে সুবিস্তৃত উহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি মৃত্যুই জগতের ধর্ম্ম তবে পৃথিবী শ্মশানক্ষেত্র নয় কেন?

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে"

শ্রীমান আই, এস্, সি, ক্লাসে ফিজিক্সের লেকচার শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, জিনিসের যদি ধ্বংস নাই তবে জীবও উদ্ভিদ মরিলে, তাহা কোথায় যায়? এবং কি হয়?

আমি দর্শন শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। আধ্যাত্মিক কোন তত্ত্বও অবগত নাই। সুতরাং রামপ্রসাদের কুট প্রশ্নের উত্তর বা দর্শন শাস্ত্রের কোন মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। আমি নিতান্ত স্থূল দর্শী সুতরাং এই স্থূল দেহ মৃত্যুর পর কি পরিবর্ত্তন লাভ করে এবং মৃত্যুর পর কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় স্থূল জ্ঞান দ্বারা তাহাই আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পত্র, পুষ্প, ফল সকল দ্রব্যই মরে ও মরণের কিছুদিন পর অদৃশ্য হইয়া যায়। মনুষ্য উচ্চ জীব বলিয়া তাহার মৃত্যুর পরেই তাহাকে সৎকার করা হয় সুতরাং সে দেহ বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইতে পারে না কিন্তু অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু হইলে কিছুকাল পর দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া রূপান্তর হইতে হইতে জীবও উদ্ভিদের অস্তিত্বের অবসান হয়। সুতরাং কোন একটী জীবের কি উদ্ভিদের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ নিহিত অসংখ্য রূঢ় পদার্থ নিশ্চয়ই কোনরূপে বিমুক্ত হয়। রূঢ় পদার্থের কখনই ধ্বংশ সাধন হয় না কেবল অবস্থান্তর গুপ্ত হয় মাত্র। এবং পুনরায় জীব দেহ গঠিত হইয়া এক অনন্ত জীবন প্রবাহ প্রকৃতির রাজ্যে চলিয়া আসিতেছে। যেমন মৃত্যু তেমনি জন্ম এই জন্ম মৃত্যু ঐ রূঢ় পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিতেছে।

জীবন্ত দেহ যেমন মৃত্যুর অধীন সেইরূপ মৃত দেহ পচনের অধীন। কিন্তু তাই বলিয়া পচন ক্রিয়া কোন পদার্থ বিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। সকল দ্রব্যের পচনই দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে, যখন আমরা চক্ষু নাসিকা জিহ্বা দ্বারা এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি তখনই তাহাকে পচন বলি। সকলেই দেখিয়া আসিবেন বায়ুশূণ্য স্থানে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বা শুষ্ক স্থানে কোন দ্রব্য বিশেষভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে সকল দ্রব্যকেই অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল রাখা যায়। যেমন বায়ুশূণ্য টিন-বদ্ধ অনেক খাদ্য দ্রব্য বিলাত হইতে বহুদিন পর আমাদের হস্তে আসিলেও আমরা তাহা ভাল ভাবে পাই। পাকা হাঁড়িতে মুড়ি দীর্ঘ দিন টাট্‌কা থাকে। বরফ দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে মৎস্য চালান হইয়া টাট্‌কা অবস্থায় বিক্রয় হয়; তৈল, ঘৃত, ঢাকিয়া রাখিলে, অথবা উহার মধ্যে

কোন দ্রব্য রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। মদ্য মধ্যে অনেক ঔষধাদি দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। চিনির মধ্যে আমাদের অনেক খাদ্য দ্রব্য দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। যেমন মোরব্বা। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ অপেক্ষা শীত প্রধান দেশে এবং গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অনেক দ্রব্য দীর্ঘ সময় ভাল থাকে। শুষ্কাবস্থায় অনেক দ্রব্য ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে দীর্ঘ সময় ভাল থাকে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, পচনই মৃতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। পচন কতকগুলি দ্রব্যের সংযোগে মৃতের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন মাত্র। তাহা হইলে এক্ষনে প্রশ্ন হইতে পারে পচন কার্য্য কিরূপে সমাহিত হয়?

(১) বায়ুর অম্লজান (২) আর্দ্রতা (৩) তাপ, (৪) জীবাণু এই গুলিই পচনের প্রধান কারণ।

(১) **বায়ুর অম্লজান**—পৃথিবীতে সকল স্থানে ভূ বায়ু বর্ত্তমান আছে সুতরাং সকল দ্রব্য সর্ব্বদাই বায়ুর সংস্রবে থাকে এই সংস্রব অবস্থায় অঙ্গারক উদজান এবং যবক্ষার জান বায়ু উদ্ভব হইয়া অম্লজান বাষ্প উৎপাদন করে এবং তদ্বারা অম্লাঙ্গারক বাষ্প, য়্যামোনিয়া বাষ্প (জলীয় বাষ্প) (ওজন) প্রস্তুত হয় তাহাই পরোক্ষ ভাবে পচন কার্য্য। কিন্তু অম্লজান সাক্ষাৎ ভাবে পচন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি অম্লজানের রাসায়নিক যৌগিক বাষ্প মধ্যে কোন দ্রব্য মগ্ন রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে। আবার অমিশ্র অম্লজান অথবা ঘনীভূত অম্লজান বাষ্প মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য মুক্ত বায়ুতে পচন অপেক্ষা অল্পক্ষণ মধ্যে পচিয়া যায়। এই জন্যই মৃত দেহ বা যে কোন দ্রব্য মুড়ি চিড়ে, বড়ি বিস্কুট, নানাপ্রকার পথ্য, জমান বা শুষ্ক দুগ্ধ আবদ্ধ বায়ুতে রাখিলে তাহা দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। এবং মাংস প্রভৃতি অম্লজান বিহীন যবক্ষার জানও উদজান বাষ্পে মগ্ন রাখিলে বহুকাল ঠিক অবস্থায় থাকে। এই সকল ঘটনা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয় যে অম্লজান বিশিষ্ট ভূ বায়ুই পচন উৎপাদনের একটী প্রধান কারণ।

(২) **আর্দ্রতা**—কেবল মাত্র আর্দ্রতায় পচন উৎপাদন করিতে পারে না। পচন উৎপাদন করিতে বায়ু এবং আর্দ্রতা এ উভয়ের সংমিশ্রন চাই। শুষ্ক অবস্থায় কোন দ্রব্য রাখিলে দীর্ঘ দিন ভাল থাকে কিন্তু ভিজা অবস্থায় কাঁচা ফল, আর্দ্র দ্রব্য যেমন মাখন (ঘৃত নহে) কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ আর্দ্র কাষ্ঠ অপেক্ষা শুষ্ক কাষ্ঠ, আর্দ্র মৃত দেহ অপেক্ষা শুষ্ক মৃত দেহ অধিক দিন ভাল থাকে এবং এই সকলকে যদি বায়ুহীন স্থানে রাখা যায় তাহা হইলে আরও দীর্ঘ দিন ভাল থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, আর্দ্রতা পচন উৎপাদনের অন্য একটী কারণ।

আবার সকল দ্রব্যকে আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করিলেই যে তাহা পচনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে তাহাও নহে। এমন কতকগুলি পদার্থ জগতে বর্ত্তমান আছে যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক অবস্থায় রাখিলেও তাহারা জল শোষক। সাধারণ বায়ুতে বিশেষতঃ পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ুতে অধিক পরিমাণে জল বাষ্পাকারে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। গঁদ, লবণ, শর্করা, এতদ্ব্যতীত কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ও মিশ্র বায়ু ঐ সকল বাষ্পাকার জল, সর্ব্বদাই শোষণ করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য জগতের প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত সংমিশ্রিত আছেই। সুতরাং তাহারা বায়ু হইতে জল শোষণ করিয়া সকল দ্রব্যে সহজেই আর্দ্রতা আনয়ন করে সুতরাং তাহা শীঘ্র পচিয়া যায়। এতদ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, শুধু আর্দ্রতা পচন উৎপাদন করিতে পারে না তৎসহ বায়ুর অম্লজানেরও সংমিশ্রন চাই। যাহা হউক আর্দ্রতা পচন উৎপাদনের দ্বিতীয় কারণ।

(৩) **উত্তাপ**—সুমিষ্ট খেজুর রস, বা তাল রস অধিকক্ষণ বাহিরে বা রৌদ্রে থাকিলে উহার উপরে এক প্রকার শুভ্র ফেনা জন্মে। ইহার কারণ এই সকল দ্রব্যে এক প্রকার তাপ উৎপন্ন হইয়া অম্লাঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই অম্লাঙ্গারক বাষ্পের উদ্গমন হেতু এই ফেণার উৎপত্তি

হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে এবং গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অনেক দ্রব্য, অনেকক্ষণ ভাল থাকে। বরফের মধ্যে দ্রব্য রাখিলে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত বিকৃত হয় না। শীতকালে "কড়কড়া ভাত সর পড়া ব্যঞ্জন" গরীব বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। তাপ দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ পচনোপযোগী হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যকে যদি সর্ব্বদাই অগ্নির উত্তাপে রাখা যায় তবে তাহা শীঘ্র পচে না। তাহার কারণ অত্যধিক তাপে বায়ুর আর্দ্রতা নষ্ট হওয়ায় ম্লানকারক বায়ুর উদ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর উত্তাপ পচনোৎপাদনের তৃতীয় বলবৎ কারণ।

(৪) পচনোৎপাদক বীজ—পৃথিবীতে একটী জীবের মৃত্যু হইলে, কিছুক্ষণ পর সেই জীব দেহে কোটী কোটী অগণ্য নূতন জীব বা জীবাণুর আবির্ভাব হয়। এই সকল জীবাণু বায়ুর সহিত অমিত পরিমাণে সকল স্থানে মিশিয়া আছে। জীব দেহের মৃত্যু হইলেই আপনাদের আহারীয় সংগ্রহের জন্য তদুপরি পতিত হইয়া তন্মধ্যে অধিষ্ঠান করে ও ক্রমশঃ বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। জীব দেহ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য কিছুদিন রাখিয়া দিলে বায়ু, আর্দ্রতা ও তাপ প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইলেই তন্মধ্যে এই সকল জীবাণুর আবির্ভাব হয়।

দুগ্ধে কণা মাত্র দধি দিলে তাহা শীঘ্র দধি হইয়া যায়। দুগ্ধে ছানার জল দিলে শীঘ্র ছানা কাটে। ভিজা ময়দা গুড়, খেজুর, আখ, বা তালের রসে খামিরা দিলে তাহা শীঘ্র গাঁজিয়া উঠে। ইহার কারণ ঐ সকল দধি, ছানার জল বা খামিরাতে জীবাণু বর্ত্তমান থাকে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র ঐ সকল দ্রব্যের সংযোগে পচনোৎপাদন করে।

এই সকল জীবাণু ব্যতীত বায়ু ও জলে পচনোৎপাদক জীবাণু সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের সংযোগেও দ্রব্য বা মৃত দেহে শীঘ্র পচন জন্মে। এক কলসী পরিষ্কৃত জল রাখিয়া দিলে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দেখা যায়। যে সকল পুষ্করিণী বা ডোবায় রৌদ্র লাগে না তাহাদের জলে কিছুদিন পরে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কীট ঐ সকল জলেই বর্ত্তমান থাকে পরে তাহারা ঐ জলে বর্দ্ধিত হইলে চক্ষুর গোচরীভূত হয়। এইরূপ বায়ুতে এক প্রকার জীবাণু বর্ত্তমান থাকে যেমন—কোন ভিজা দ্রব্য কিছুদিন রাখিয়া দিলে তাহার উপরে এক প্রকার সাদা দ্রব্য পড়ে যাহাকে আমরা সাধারণ কথায় "ছাতাপড়া" বলি। ঐ ছাতা কিছুদিন ঐ ভাবে রাখিয়া দিলে তাহার মধ্যে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বায়ুর কীট। ইহারা ঐ সকল দ্রব্যে বর্দ্ধিত হইলে আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন বায়ু ও জলের কীটাণুর ন্যায় উদ্ভিজ্জেও এক প্রকার কীটাণু সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম "ব্যাকটেরিয়া"।

এই সকল জীবাণু যেমন পচনোৎপাদক সেইরূপ পরিবর্ত্তক এবং পীড়াদায়ক। দদ্রু, বিখাজ, চুলি, প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যাধির একমাত্র হেতু এই জীবাণু সকল।

নির্ম্মল বায়ু, রৌদ্র ও স্রোত দ্বারা ইহারা প্রতিনিয়ত নিধন প্রাপ্ত হয় ও সেই প্রকার প্রতিনিয়ত জন্মিয়া থাকে। ইহারা মৃত জৈবিক পদার্থ হইতে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া জটিল যৌগিক জীব দেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ বিশ্লেষণকালে গন্ধক ফস্‌ফরাস কতিপয় দুর্গন্ধময় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহাতেই পচা দ্রব্য হইতে দুর্গন্ধ জন্মে এবং আমরা আঘ্রাণ দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারি। এই সময় পচন জনিত এক প্রকার উৎসেচন হয়। পরে ক্রমে বিশ্লেষণ হইয়া নানাবিধ রূঢ় পদার্থ এবং সরল যৌগিক পদার্থ বিমুক্ত হয়। ইহাদের কতকগুলি খনিজ ও কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ। খনিজ পদার্থ পৃথিবীর মৃত্তিকার সহিত এবং বায়বীয় পদার্থ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং যে রূঢ় পদার্থ লইয়া যৌগিক জীব শরীর গঠিত হয় মৃত্যুর পরেও সেই রূঢ়

পদার্থ সকল অক্ষুণ্ণ ভাবে পুনরায় মুক্ত হইয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ রাখে। এবং পুনরায় তদ্দারা জীব দেহ, বৃক্ষ, পত্র, ফুল, ফল পরিগঠিত ও পরিপুষ্ট হয়। তাহাতেই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; এক বিন্দুও হ্রাস হয় না। সুতরাং জীব জন্মিলেই মরে এবং মরণের পর তাহাতে পচন ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া তাহার রূঢ় পদার্থ সকল বিযুক্ত হইয়া মুক্ত হয় এবং তদ্দারা পুনরায় জীব দেহ গঠিত হয়। কিন্তু দ্রব্যের পচন না হইলে ঐ সকল রূঢ় পদার্থ বিযুক্ত হইতে পারে না, জৈবিক দেহ গঠিত হয় না। এইরূপে পৃথিবীতে পচন ক্রিয়া সাধিত হয়।

ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী।

সফলতা।

সরসীর হৃদে ছিল প্রফুল্ল কমল,
গোলাপ ফুটিয়াছিল তীর উপবনে;
দু'জনার বুকে ছিল স্নিগ্ধ পরিমল,
দুজনে যাপিল কাল বিরহ শয়নে।
বাতাস পড়িল আসি দোঁহার চরণে,
লুটিছে পরাগ রাশি ভ্রমর পাগল;
নীরবে ঝরিতে চায় বিষাদিত মনে,
না ফুটিতে হ'ল হায় যৌবন নিষ্ফল।
আসিল মালিনী ভোরে ভরি তুলে ডালা,
কমলে পূজার তরে করে সমর্পণ;
যতন করিয়া গাঁথি গোলাপের মালা,
রাজ কুমারীর গলে করিল বন্ধন।
শুষ্ক শতদল লাগি সবে পাতে হাত।
গোলাপের পানে কারো নাহি আঁখি পাত॥

শ্রীভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থান।

একজন অরবিন্দ, একজন গান্ধী, একজন তিলক, একজন মহাত্মা রামকৃষ্ণ, একজন বিবেকানন্দ দেশকে মুক্ত করিতে উন্নত করিতে পারেন না। জাতিই জাতিকে উন্নত করিবে। চাই বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান—চাই বহু কারিগর। আমাদের দেশে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। কিন্তু কে তাঁহাদের সত্যগুলিকে কুটাইয়া বিরাট করিয়া তুলিয়া ধরিবে? বহু কারিগর নাই তাই আমরা বাণিজ্যে এত পশ্চাৎপদ। কিন্তু জাপানে—বহু মুষ্টিমেয় মহাপণ্ডিত তথায় বিরাজমান—কিন্তু কারিগর অসংখ্য—তাহারা আমাদের অনেক ঊর্দ্ধে। জাতি কতটা মুক্তি, কতটা সুখ ভোগ, কতটা উন্নতির উপযুক্ত হইয়াছে—এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তি বিশেষ নহে, ইহার উত্তর দিবে বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩৩০। শ্রীহারাধন বক্সী।

অধ্যাত্ম-গঠন।

অসীম অনন্তকে সীমার বাঁধনে সাজিয়ে আত্মার তৃপ্তি হয় না। ভারতের তপস্যা মনের শান্তিতে, তৃপ্তিতে শেষ করলে চলবে না। অধ্যাত্মকে ফলিয়ে তোলা চাই। * * * ভারতের জাতীয় সাধনা আজ আর কেবল হিন্দুর হলে চলবে না, সমগ্র বিশ্ব যা' বরণ করে নেবে, ভারতীয় মন্দিরে, ভারতের ঋষিকে তারই দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে, তবেই ভারতের মহিমাধ্বজা আকাশ ছেয়ে উড়বে, ভারতের কণ্ঠে নূতন বেদ ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে, ভারতের মন্দিরে মসজিদে গির্জ্জায় আত্মার উদ্দাম একই সুরে একই মহাদেবতার স্তুতিনিনাদে মুখরিত হবে, আগল দিয়ে কেউ কারু ভগবানকে কারু থেকে পৃথক করে রাখবে না। এই মহাসমন্বয় যুগের বার্ত্তা ঘোষণা করতেই নূতনের আগমন, নূতনকে রচনার খনিত্র হস্তে ধ্বংসের মশাল জ্বেলেই এগুতে হবে, যেখানে মানুষ বিশ্বনাথের ভোগ আগলে পৃথিবীকে প্রতারণা করতে উদ্যত; তার সাধের কুঞ্জ আপন আপন জাগিয়ে-দাও দেবতাকে ক্ষুদ্রত্বের আবরণে লুকিয়ে থাকতে দিও না। তিনি ছড়িয়ে আছেন সমান ভাবে, তুমি, আমি, সে, সত্ত্বের রসাস্বাদ বিচিত্র হলেও সবই পরিপূর্ণ সত্তা। এই ঈশ্বরকোটির সাধনা ভারতের আশ্রমে আশ্রমে সফল করে তুলতে হবে। মানুষ স্বাধীন ভাবেই আপনাকে গড়ে তুলবে, কেবল চাই উদার আশ্রয়, দিব্য শক্তিমান আশ্রয়—যাকে অবলম্বন করে মানুষ নিজেকেই পাবে, প্রতিফলিত সত্যের ঝাঁঝে আপনাকে ঝলসে ফেলবে না। তাজা জীবন, স্বাধীন স্বতন্ত্র, প্রদীপ্ত সত্য সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ম্মাত অমল প্রকৃতি গড়ে উঠুক, দিব্য সম্বন্ধে সৃষ্টি সার্থক হোক। কেউ কাউকে গড়ে না, আপন আপন তপঃশক্তি জাগ্রত হলেই আশ্রয় স্বতঃই সৃষ্টি হয়, নিজের পায়ে জোর পেলেই আশ্রয়কে অপসারিত করে সাধক সত্যকে স্পর্শ করে, ইহাই তো শিক্ষার চরম আদর্শ। এই শিক্ষার প্রচলনেই সৃজন শক্তি জেগে ওঠে, স্রষ্টার দল মাটির বুকে অসংখ্য কীর্ত্তি মন্দির স্থাপন করে। নষ্ট কীর্ত্তি ভারত—তোমার জঠরে এইরূপ অসংখ্য দিব্য সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, এই প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করুন।

প্রবর্ত্তক, চৈত্র, ১৩২৯।

চূণ ও স্বাস্থ্য।

ভারতবর্ষে পান খাওয়ার প্রচুর প্রচলন আছে। পানের চুণ শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী তাহা সকলেই যে জানেন এমন নহে। শরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্ত শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। উহা না থাকিলে শরীরপুষ্টির অভাবে রোগ এবং মৃত্যু নিশ্চয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চূণ ও তাহার লবণ, উহার অভাবে পুষ্টি হয় না। * * * চূণ বেশী পরিমাণ না থাকায় শরীরের সকল যন্ত্রে পুষ্টির অভাব ঘটিয়া অনেক রোগ হয়। * * *

চূণ সেবন করিলে রক্ত সঞ্চালন ভাল করিয়া হয় এবং সেইজন্ত হজম শক্তি বাড়ে। চূণ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রাত্রের ঘাম বন্ধ হয়। চূণের অভাবে যেমন স্নায়ু উত্তেজিত হয় তেমনি চূণ সেবনে উত্তেজিত স্নায়ু সকল স্থির হয়। * * * শরীরে চূণের অভাব থাকিলে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ আরাম হইবে না। চূণও সেবন করিতে হইবে। সকল রোগেই শরীর হইতে চূণ বাহির হইয়া যায়। * * * স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে প্রচুর পরিমাণে চূণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

চৈত্র, ১৩২৯। উপাসনা।

লণ্ডনের পথে ঘাটে।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের খারাপ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা আইন বিরুদ্ধে এবং একের অধিক স্ত্রী থাকাও বে-আইনী। কিন্তু লণ্ডনের রাস্তা ঘাটে উক্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই বেশী। প্রতি বৎসর যত শ্রেণীর স্ত্রীলোক ধরা পড়ে আদালতে আসে তাতে মনে হয় যদি একজন দোষী ধরা পড়লে ৫ জনের দোষ অজানা থেকে যায়, তা'হলে বুঝি বা লণ্ডনেই হাজার ৬০।৭০ ঐ জাতীয় লোক আছে। অনুপাতে আরও বেশী হলে অবস্থা আরও শোচনীয়। অথচ ইংরেজ সর্ব্বদা ফ্রেঞ্চ বা ইটালিয়ানকে নৈতিক দোষে দুষ্ট বলে জগতের কাছে প্রচার করছে। একটা আইন করে যদি ভাত খাওয়া বন্ধ করে দি এবং বে-আইনী ভাবে যদি সকলেই ভাত খায়, তা'হলে কি আমাদের ভেতো বাঙ্গালী নাম যাবে?

এ ছাড়া ইংরেজের একের বেশী দুইজনকে বিবাহ করা পাপ। এবং তুর্ক ও হিন্দুরা বড়ই খারাপ কেননা তারা বহু বিবাহ করে ইত্যাদি বলে' ইংরাজরা খুবই কাগজ কালির অপব্যবহার করে। কিন্তু 'আসলে' ইংরেজও বহু স্ত্রীচারী এবং তুর্ক ও হিন্দু ও (যারা বহু বিবাহ করে তারা) তাই। তফাৎ এক পক্ষ চীৎকার করে' বলে যে "আমার "আইনতঃ স্ত্রী একজন" এবং অন্যরা সেটা বলে না। আমি বহু বিবাহ সমর্থন করছি না, বা হিন্দু ও তুর্ককে আদর্শ মানুষ বলেও স্বীকার করি না; কিন্তু ইংরেজের মত বহু বিবাহ ছেড়ে "যথেচ্ছা বিবাহ" সুরু যেন আমরা না করি। নৈতিক দিকে গলাবাজি করে নিজেদের বড় প্রমাণ চেষ্টা আমরা বেশী মাত্রায়ই করি। (ইংরেজের কাছেই হয় ত আমরা ওটা শিখেছি) কিন্তু ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে গলার জোরে বড় করে' দেওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় বান্ধব, চৈত্র, ১৩২৯। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষণিক

(ফরাসী হইতে)

শুন 'হাকেজ' বলছি তোমায়,
আঁধিব জেনো ফুলের সুবাস;
একটি নিশি থাক্‌লে পরে
অপর রাতে রয়না আভাস্;
স্বামীর সাথে বধূর মরম
রয় না তাও অধিক দিবস,
দূর করে দেয় লাজের আবেশ
প্রথম রাতের অধর পরশ!

যোগার বাঙলা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৩০। "সবুজ"
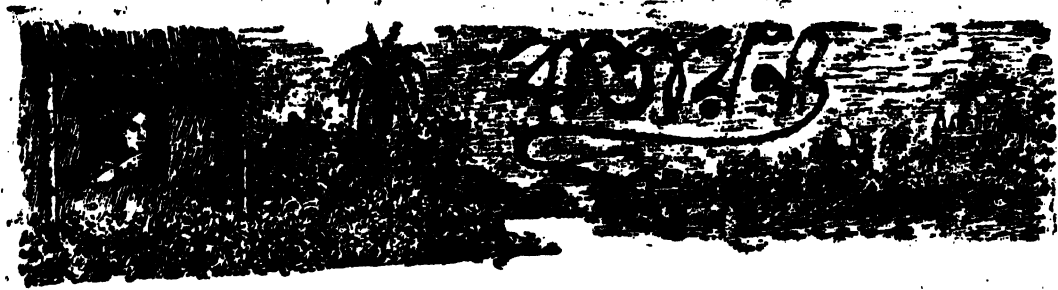
মৃত্যুর পর।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে গ্রীকদিগের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা তদ্বিষয়ে লিখিয়াছি। এক্ষণে ইহুদীগণের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লিখিব। Flavius Josephus ইহুদীগণের মধ্যে একজন সমরকুশল যোদ্ধা ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাহার Discourseএ এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই বিবৃত করিলাম।

অবরলোক (Hades) বিশ্বের মধ্যে একটি স্থান বিশেষ, তাহা রীতিমত সম্পূর্ণ নহে। তাহা পাতাল প্রদেশ (ভূগর্ভস্থ প্রদেশ); সেখানে পৃথিবীর আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হয় না; সুতরাং সেখানে চিরস্থায়ী অন্ধকার বিরাজমান। ইহা আত্মিকগণের রক্ষার স্থান। এইস্থানে দেবদূতগণ তাহাদের রক্ষক স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকের আচরণ ও ব্যবহারের অনুযায়ী সাময়িক দণ্ড বিতরণ করেন।

এই প্রদেশে একটি স্থান আছে তাহা অপ্রশমনীয় অগ্নির হ্রদ স্বরূপে পৃথকভাবে রক্ষিত আছে। এখানে এতাবৎ কেহই বিক্ষিপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে বিনির্দ্দিষ্ট একদিনের ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃজিত হইয়াছে। ঐ দিনে সমস্ত মানবের উপর উপযুক্ত ন্যায় দণ্ড প্রদত্ত হইবে। যাহারা অন্যায়পর, যাহারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে, যাহারা মানবহস্ত বিনির্ম্মিত পুত্তলিকাকে ঈশ্বরের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করে তাহারা কলুষতার কারণ বলিয়া ঐ দিবসে তাহাদিগকে অনন্ত দণ্ড দেওয়া হইবে। যাহারা ন্যায়পরায়ণ তাহারা অক্ষয় অক্ষয় রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও উক্ত লোকে আবদ্ধ আছে কিন্তু যেখানে অন্যায়পর ব্যক্তি আছে সেখানে নহে।

এই প্রদেশে একটি মাত্র প্রবেশমার্গ আছে। প্রবেশদ্বারে একজন প্রধান দেবদূত অসংখ্য পরিজনসহ দণ্ডায়মান আছেন। আত্মিকগণ এই প্রবেশ দ্বার দিয়া লব্ধ প্রবেশ হইলে তাহাদের রক্ষক দেবদূত একপথে সকলকে লইয়া যায় না। যাহারা ন্যায়পরায়ণ তাহারা ডানদিকে গমন করেন; ঐ দিকের ভারপ্রাপ্ত দেবদূতগণ স্তব গান করিতে করিতে তাহাদিগকে এক আলোকময় প্রদেশে লইয়া যায়। ঐ স্থানে ন্যায়পরায়নগণ বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বসবাস করিতেছেন। সেখানে তাহারা যে সকল উত্তম দ্রব্য দর্শন করে তাহা উপভোগ করে এবং প্রত্যেকেই বিশিষ্ট নূতন আমোদ উপভোগের আশায় আহ্লাদে বাস করে। সেখানে ক্লেশের স্থান নাই, দাহকারী উত্তাপ নাই, তীব্র শীতলতা নাই, কোনও কণ্টক নাই। তাহারা সেখানে পিতৃগণের ও অন্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণের হাস্যপূর্ণ বদন সর্ব্বদাই দেখিতে পারে। তাহারা পরবর্ত্তী সময়ে বিলাস এবং অনন্ত নব জীবনের অপেক্ষায় কালযাপন করে। এই স্থানকে এব্রাহামের বক্ষোদেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যাহারা অন্যায়পর তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদানের ভার প্রাপ্ত দেবদূতগণ বন্দীর ন্যায় তাড়না করিতে করিতে বামদিকের পথে লইয়া যায়। তাহাদের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত দেবদূতগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করে, ভীষণরূপ প্রদর্শন করিয়া ভয় দেখাইয়া থাকে এবং ক্রমাগত নীচে

পাতিত করে। ঐ সকল দেবদূতগণ তাহাদিগকে নরকের সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। অন্যায়পর ব্যক্তিগণ যখন উহার খুব নিকটে পৌছে তখন সেখানের শব্দ শুনিতে পায় এবং উত্তপ্ত বাষ্প হইতে পরিত্রাণ পায় না। যখন তাহারা ঐ ভীষণ দুর্দর্শ বৃহৎ অগ্নিকে উত্তমরূপে দেখিতে পায়, তখন তাহারা ভাবী বিচারের ভীষণ অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহারা ঐ স্থান হইতে পিতৃগণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণের অবস্থিতি স্থান ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দণ্ড উপভোগ করে। উভয়ের মধ্যে এক গভীর ও বৃহৎ গহ্বর ব্যবধান আছে। এইজন্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দয়াপরবশ হইলেও অন্যায়পর ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে না এবং অন্যায়পর ব্যক্তি যথেষ্ট সাহসসম্পন্ন হইলেও চেষ্টা স্বত্বেও উক্ত বিষয় অতিক্রম করিতে পারে না!

ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট সময় সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত আত্মাই উক্ত প্রকারে অবরলোক নিরুদ্ধ থাকে। ঐ সময়ে ঈশ্বর মৃত যাবতীয় ব্যক্তিকেই পুনরুত্থিত করেন। তাহারা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করে না, কিন্তু পূর্ব্বতন দেহই পুনরুত্থিত হয়। ঐ দেহ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এই বিষয়ে অবিশ্বাসী হইও না। ঈশ্বর যখন বিভিন্ন উপাদানে গঠিত দেহে নব জীবন সঞ্চার করিতে পারেন তখন তাহাকে অমর করিতে পারেন। কারণ, ঈশ্বর কতক কাজ করিতে পারেন এবং কতক করিতে পারেন না—এরূপ কথা বলা চলে না। এই দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহা ধ্বংস হয় না; পৃথিবী দেহের অবশেষ ধারণ করে এবং রক্ষা করে। তাহা জীবনের ন্যায় উর্ব্বর মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহা উপ্ত হয় তাহা শস্য মাত্র। কিন্তু পরমস্রষ্টা ঈশ্বরের শক্তিযুক্ত আহ্বানে সেই বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া পরিচ্ছদাচ্ছাদিত গৌরব মণ্ডিত অবস্থায় উত্থিত হইবে। যদিও আদিম অবাধ্যতার জন্য দেহ কিয়ৎকালের জন্য প্রনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান থাকে এবং পুনর্গঠন জন্য কুম্ভকারের অগ্নির অভ্যন্তরের ন্যায় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়—তাহা প্রাচীন স্বরূপে পুনরুত্থিত হয় না, কিন্তু পবিত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে কখনও ধ্বংস হয় না। প্রত্যেক দেহ তাহার আত্মা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। আত্মা সেই দেহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইলে আর দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্বয়ং শুদ্ধ স্বভাব হওয়ায় শুদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হয়। কিন্তু যাহারা অন্যায়পরায়ণ তাহারা পূর্ব্বের অপরিবর্ত্তিত দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা গৌরবযুক্ত নহে এবং যে রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল সেই রোগ ও অন্যান্য রোগ দ্বারা ক্লিষ্ট। তাহারা জীবিত অবস্থায় যেরূপ অবিশ্বাসী ছিল সেই অবস্থাতেই চূড়ান্ত বিচারকাল পর্য্যন্ত থাকিবে।

ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়পর সর্ব্ববিধ মনুষ্যই শব্দ স্বরূপ ঈশ্বরের নিকট সমানীত হইবে। তাঁহারই উপর পিতৃরূপ পরমেশ্বর সর্ব্ববিচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনিই পিতার অভিপ্রায় সাধন জন্য বিচারক হইয়া আগমন করিবেন। তাঁহাকেই ঈশ্বর গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি পরম পিতার সর্ব্বসাধারণের প্রতি ধর্ম্ম বিচারানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য স্বকর্ম্মানুসারে ন্যায় দণ্ড বিধান করিয়াছেন। তাঁহার বিচারালয়ের সমীপে সকল মনুষ্য, দেবদূত এবং দৈত্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এক স্বরে চিৎকার করিয়া বলিবেন—"আপনার বিচার ন্যায়ানুগত।" তাহার প্রত্যুত্তরে উভয় পক্ষেই ন্যায় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে—যাহারা সাধু কার্য্য করিয়াছে তাহারা অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইবে, এবং অসাধুকর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ অনন্ত দণ্ড ভোগ করিবে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অনন্তকাল পূর্ব্বোক্ত অপ্রশমনীয় অগ্নি ভোগ করিবে; এক প্রকার অগ্নিময় মৃত্যু বিরহিত কীট তাহাদের শরীরকে ধ্বংস না করিয়া ও অনন্ত ক্লেশ প্রদান করিয়া দেহ হইতে ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকিবে। তাহারা নিদ্রায় শান্তি পাইবে না, রাত্রি আসিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে না, মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে দণ্ড হইতে মুক্ত করিবে না; তাহাদের আত্মীয় স্বজনের কাতর প্রার্থনাতেও তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হইবে না। তাহারা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে আর দেখিতে পাইবে না; ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণও তাহাদিগকে আর

স্মরণ করিবে না, তাহারা কেবল তাহাদের নিজেদের ধর্ম্ম কার্য্যের বিষয় স্মরণ করিতে থাকিবে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, যেখানে নিদ্রা নাই, দুঃখ নাই, মলিনতা নাই, চিন্তা নাই, রাত্রি নাই, কালপরিচ্ছিন্ন দিন নাই, স্বর্গ পথে ভ্রাম্যমাণ সূর্য্য নাই, ঋতু নাই, ক্ষয় বৃদ্ধিযুক্ত চন্দ্র নাই। তখন চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র করিবে না, সূর্য্য পৃথিবীকে দগ্ধ করিবে না, সপ্তর্ষি মণ্ডল ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিবে না, মৃগশিরা নক্ষত্র আর উদিত হইবে না, অগণিত তারাগণ আর পরিভ্রমণ করিবে না। তখন পৃথিবী দুরতিক্রম হইবে না, নন্দন কানন অন্বেষণ করা দুঃসাধ্য হইবে না; সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন থাকিবে না, তাহা হাঁটিয়া অতিক্রম করা যাইবে। তখন স্বর্গ মনুষ্যের আবাসযোগ্য হইবে এবং তথায় আরোহণের পথ নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইবে না। পৃথিবী অকর্ষিত থাকিবে না, তাহার জন্য মনুষ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম আবশ্যক হইবে না; পৃথিবী স্বয়ং ফল প্রসবিনী হইয়া তদ্দারা অলঙ্কৃত হইবে। বন্য পশুর বংশ লোপ হইবে; অন্যান্য প্রাণীর বংশেরও বিস্তার হইবে না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও অভাব হইবে না। তৎসহ ধার্ম্মিক দেবদূতগণ ও আত্মাগণ থাকিবে—অজর ধার্ম্মিক নরনারীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অকলুষিত অবস্থায় ঈশ্বরের স্তোত্র গান করিবে। তাহাদের সহিত সমগ্র সৃষ্ট পদার্থ—কলুষিত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অকলুষিত অবস্থায় উপনীত হইয়া পবিত্র প্রোজ্জ্বল আত্মার দ্বারা গৌরবমণ্ডিত হইয়া—নিরন্তর উচ্চৈঃ স্বরে স্তোত্র গান করিবে। তাহারা প্রয়োজনের বন্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না, কিন্তু স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছাক্রমে গান করিবে এবং দেবদূত আত্মা ও মনুষ্যগণের সহিত পরমস্রষ্টার প্রশংসা করিবে।*

শ্রীমনীষি নাথ বসু সরস্বতী।

* Flavius Josephus's Discourse to the Greeks concerning Hades হইতে অনুদিত

সমালোচনা।

আর্ট ও সাহিত্য—বঙ্গ সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ, বিরচিত এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

আজ কাল সাহিত্যক্ষেত্রে পূতিগন্ধময় উৎকট কাম-ভাবের পঙ্কিল চিত্র সমূহ উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হইয়া অলক্ষিতভাবে সমাজের মধ্যে যে বিকৃত রুচির পরিসর প্রদান করিতেছে এবং সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া গণিকা, ক্ষণিকা, পরকীয়া ও নরকীয়া প্রভৃতির ঝাঁঝালো বীভৎস প্রেমের আস্বাদনে লেখকগণ আর্টের দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে নিজেদের মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রীকে দেহে ও মনে প্রাণে যেরূপ অসতীরূপে গড়িয়া তুলিতেছেন, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সেই তথাকথিত আর্টের স্বরূপ কি এবং সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ এই গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনাই যে আর্টের চরম লক্ষ্য এবং এই তিনটীর কোনটির অভাব হইলে যে আর্ট সম-পরিমাণে ক্ষুণ্ণতা লাভ করে এ সত্য অনেক আর্টিষ্ট স্বীকার করিতে চাহেন না বলিয়া আজকাল সাহিত্যে

এই প্রকার দুর্নীতির প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যে পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমের ভিত্তির উপর গৃহের প্রতিষ্ঠা, সমাজের স্থিতি এবং জাতির অভ্যুদয় নির্ভর করে,—নরনারীর সেই পবিত্র সম্পর্ককে প্রবৃত্তির বশ ও শিক্ষার দোষে বিকৃত করিয়া অবাধ কামোন্মোদের প্রশ্রয় দিলে যে পাতের মধ্য দেশের ও জাতির সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হয়, ইহা আজ ভাল করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে তাই আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে বরণ করিয়া লইতেছি। সাহিত্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আর্টের দোহাই দিয়া যাঁহারা জাতির ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছেন, তাঁহাদিগের চোখে আঙুল দিয়া তাই তিনি যুক্তি ও নীতির সহায়তায় অনেক সদুপদেশই দান করিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ মুক্তাবলী যদি আজ "উলুবনে মুক্তা ছড়ানর" ন্যায় ব্যর্থ না হইয়া গল্পলেখক অথবা ঔপন্যাসিককে সমাজ-কল্যাণের পথে পরিচালিত করে তাহা হইলে গ্রন্থকারের প্রয়াস সার্থক ও সফল হইতে পারে। দাসভাবাপন্ন অনুকরণপ্রিয় চিত্রের চিত্রকরগণ কি এখনও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন না?

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা—৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত এবং ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এই স্বাস্থ্যহীনতার যুগে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এইরূপ একখানি অত্যাবশ্যকীয় সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবের পঞ্জিকা বিতরণ উদ্দেশে প্রচার করিয়া সম্পাদক মহাশয় যে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপ শ্রেণীর পঞ্জিকা বেশীর ভাগ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও অবান্তর বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকে। ব্যক্তিবিশেষের জন্য লিখিত হইলেও ইহা হইতে তাঁহারা অতি অল্প সাহায্যই লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনবিবর্জ্জিত না হইলেও, অনেকাংশে গতানুগতিক পন্থা পরিহার করিয়া অভিনব পদ্ধতিতে রচিত হওয়ায় ইহাতে দিনপঞ্জী ছাড়া স্বাস্থ্যনীতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ সরল চিকিৎসাবিধি সুন্দর মধুর কবিতার আকারে প্রচারিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই পুস্তিকাখানি গৃহস্থমাত্রের মনঃপূত করিবার নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই এইরূপ একখানি পঞ্জিকা স্বীয় উপাধানতলে নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুরূপে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সোনার বাঙ্গলা—সাপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ৩৪ নং মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

'সোনার বাঙ্গলা' মাত্র তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই এই শিশু-পত্রিকা খানি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গলার বিশিষ্ট লেখকগণ "সোনার বাঙ্গলার" সেবক। প্রবন্ধ সম্ভারে, গল্পে, উপন্যাসে ও চটুল রচনায় "সোনার বাঙ্গলা" বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এই কয় সংখ্যা পাঠ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিলাম। সোনা-হারা বাঙ্গলার সোনাটুকু আজ কোথায় ইহা যাঁহারা জানাইয়া বুঝিতে চাহেন—শ্মশান চুল্লীর ভস্ম রাশি সরাইয়া ফেলিয়া যাঁহারা শ্যামা অন্নদার হেমের ঘড়া বাহির করিতে চাহেন—তাঁহারা "সোনার বাঙ্গলা" পাঠে অভ্যস্ত হউন। "সোনার বাঙ্গলা" পাঠে বাঙ্গালী কাচ ফেলিয়া কাঞ্চনের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সত্যানন্দ।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ, ।　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০　　　৯ম সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রাজকার্য্যের গুরুভারে অনবসর প্রযুক্ত মাধবীর সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কার্য্যকুশল কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতে বঞ্চিত হইয়া "মাধবীর" বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ দে মহাশয় কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব "মাধবী" সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র টাকা কড়ি ইত্যাদি তাঁহার নামে পাঠাইবেন।

সম্পাদক

নিয়মাবলী

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র, মফঃস্বলে ৩।৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২।০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ	—প্রতি মাসে	২০৲ টা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রী অশ্বিনী নাথ দে।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মেদিনীপুর শাখার দশম বার্ষিক অধিবেশন।

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

১ম বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। { ৯ম সংখ্যা।

মিলনে।

তৃপ্ত আজিকে প্রাণ;
সকল দৈন্য, চিন্তা, বেদনা,
শোক, তাপ অবসান;
বিষাদের বীণা লভিল বিরতি,
ব্যঙ্গ ভ্রূকুটী যাচিছে প্রণতি,
চরণের তলে সাজায় মিনতি
মর্ম্মের অভিমান;
ছেয়ে দিগন্ত ঝরে অনন্ত
পুণ্য মিলন গান।

মিটেছে সকল সাধ।
ধমনী রন্ধ্রে ছুটিছে অধীর
তৃপ্তির অবসাদ;
আঁখি ভরে দিছে তন্দ্রার ঘোর,
উল্লাস ছুটে বুক ছেপে মোর,
অন্তরে টুটে ভ্রান্তির ডোর,
দূরীভূত পরিবাদ;
আজীবন সাথী তীব্র নিরাশা
সাধিবে না আর বাদ।

সুন্দর এ ভুবন;
কুঞ্জে প্রভাতী ফুলের আরতি
সন্ধ্যার আবাহন;
দহেনিক হৃদি বকুলের মালা,
চাঁদিনী নিশিথে ঝরেনিক জ্বালা,
মধু মালতীর বীথিকা নিরালা
শান্তির নিকেতন;
দুঃখের স্মৃতি এনেছে মিলনে
সুখের প্রস্রবন।

অন্তর টল মল;
কি এক অজানা আবেশের ধারা
প্রাণে বহে অবিরল;
শত জনমের আকুল সাধনা,
ব্যর্থ প্রয়াস, লক্ষ কামনা,
কত অতৃপ্তি, কত সান্ত্বনা
আজিকে সুর সকল
। ঘট করিল পূর্ণ
চির [illegible] জল

চাহি নাগো কিছু আর ;
জনম জনম সে চরণ তলে
সাজাব অর্ঘ্য তার ;
মঞ্জীর রূপে চরণে বেড়িব,
ফুল হার হয়ে বক্ষে দুলিব,
গরবী বাঁশরী হাসিটি চুমিব,
প্রিয়া যে গো আমি তার ;
লাবণীর মত অঙ্গে অঙ্গে
ব্যাপি রব অনিবার।

ভাঙ্গাওনা ঘুম ঘোর ;
বাঞ্ছিত ধনে বক্ষে জড়ায়ে
সুপ্তিতে আছি ভোর ;
ছুটুক বিশ্বে বহ্নি তুফান,
বাজুক গভীরে প্রলয় বিষাণ,
সৃষ্টির লীলা হোক নিরবাণ,
ঝরিবে না আঁখিলোর ;
ধ্বংসের মাঝে প্রিয় বুকে রব
তেমনি গরবে ভোর।

৺সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

শৈলজা-কুরুক্ষেত্রে।

আর একদিন গভীর নিশীথকালে শৈলজা মহর্ষি ব্যাসদেব সহ ভীষ্মের শিবিরে গিয়া উপনীত হইল। ঋষি-শ্রেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর শৈলজাকে বিদায় দিলেন। শৈল ভীষ্মের শিবিরদ্বার হইতে অদূরবর্ত্তী আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই সে দেখিল এক যোগিনী কৌরব শিবিরে অলক্ষিতে যাইতেছে! শৈলজার হৃদয়ে যুগপৎ এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। সে দ্রুতপদে অলক্ষিতে তাহার অনুগমন করিয়া অন্তরালে থাকিয়া যে রোমাঞ্চকর গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিল, তাহাতে তাহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সে সেই নীরব নিদ্রিত চন্দ্রপ্রদীপ্ত প্রান্তরে বসিয়া শোকোন্মত্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—

"বাছা! তুই বারিবিন্দু ত্রিদিবপ্রসূত
পড়েছিলি আসি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে ;
আমার হৃদয় মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
নিতেছে কাড়িয়া হায়! নির্দয় তস্কর—
সহিব কেমনে আর ; হায়! বাছা মোর!"

শৈলজা শুনিল—কৃষ্ণদ্বেষী ঋষি দুর্ব্বাসা পার্থপুত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার নিমিত্ত যোগপ্রভাবে বীরবর কর্ণকে উত্তেজিত করিয়াছেন ; কর্ণ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে তিনি অচিরে কুমারকে ন্যায় কি অন্যায় যুদ্ধে যে করিয়া হউক নিধন করিবেন। প্রতিশ্রুতির প্রধান কারণ কর্ণের প্রতিহিংসা। কর্ণ জানিতেন না যে তিনি "কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র দুর্ব্বাসার!" তিনি বিস্ময়ভরে ভাবিতেন—সূত নন্দন তাঁহার এ রাজ্য লিপ্সা কেন?

"——কেন এই ভুজ বল? কেন হৃদয়েতে
রাজ্য আশা ; এ জিগীষা পিপাসা দারুণ?
এ দারুণ অভিমান?"

কিন্তু আজ যখন দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—

"শিষ্য কুন্তী ভোজ
করেছিল কন্যা কুন্তী আছে আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সেবায়—
পুত্রার্থী। একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজ গৃহে ; পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।
আকর্ষিল মন্ত্র বলে কুন্তী সবিতায়
জনম হইল তোর। পাপীয়সী মাতা
নির্দয়া—সলিলে তোরে করিল নিক্ষেপ ;
শিষ্যা রাধা সযতনে করিল পালন।

ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, সুশাণিত ক্ষত্রিয় কৃপাণ
দেখিলাম যোগ্য বলে হবে প্রয়োজন।
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
ক্ষত্রিয় নন্দন বলি করিনু অর্পণ
শিক্ষার্থে। দুর্ব্বাসা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর নন্দন তুই। মন্ত্র-পুত্র মম।"

—তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তিনি
"কুন্তীর কানীনপুত্র— পুত্র দুর্ব্বাসার।"
দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় ইহাও বুঝিলেন—

"———যে জননী
নিক্ষেপিল জলে সদ্যঃ প্রসূত সন্তান,
মাতা নহে রাক্ষসী সে। তার পুত্রগণ
পিতৃ শত্রু, শত্রু মম, নহে সহোদর।"

সুতরাং তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার তীব্র অনল জ্বলিয়া উঠিল। অধিরথ সুত, পিতা ও গুরু দুর্ব্বাসার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—

"——— অবশ্য করিব রণ!"
"এই চলিলাম মাত! নিক্ষেপিলে জলে
যেই পুত্রে, পুত্র হীন করিয়া তোমায়
ভাসাইবে অকূল মা শোকের সাগরে।
মুদ আঁখি চন্দ্রদেব! তব বংশধর
চলিল নির্ম্মূল বংশ করিতে তোমার!"

দুর্ব্বাসা তাহারে বুঝাইয়া বলিলেন—

"পাণ্ডবের দুই ভুজ— কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,
উন্মত্ত, কটাক্ষে করি ধ্বংস কুরুকুল,
বিশ্বত্রাস বজ্রাগ্নিতে তৃণ রাশি যথা
হইবেক অবসয়। কাটিবে হেলায়
সপাণ্ডব এক ভুজ তুমি পরাক্রমে;
নিক্ষেপিব অন্য ভুজ পশ্চিম সাগরে।
কর্ণের সাম্রাজ্য ধ্বজা উড়িবে উজ্জল।"

বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে পার্থনন্দনকে—

"একা কর্ণ একা দ্রোণ, নাহি পারে যদি
দ্রোণ কর্ণে মিলি তবে করিবে সমর।
নাহি পারে এক রথী সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে; যথা সেই মতে
মৃগেন্দ্রে ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ
আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন।"

শৈলজা এই ভীষণ ষড়যন্ত্র শুনিয়া এই ঘৃণিত ব্যাধবৃত্তির ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। সে এই গুপ্ত মন্ত্রণার কাহিনী শুনিল বটে কিন্তু কি করিলে এই শিশু হত্যা— এই দুঃসহ রক্তপাত নিবারিত হইবে তাহা সহসা স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া এই অনর্থ নিবারণ করিবে কিন্তু।

"————হিমাদ্রির
পদমূলে পিপীলিকা, সিন্ধু পদতলে
বালুকা দুঃখের কথা কহিবে কেমনে?"
এই ষড়যন্ত্র হায়! * * * *
* * * * হইলে প্রকাশ
নাগ রাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাসুকির
ডুবিবে অতল জলে সহ বাসুকির—
থাকিবে না অনার্য্যের একটি আশ্রয়।"

তাহা হইলে ত তাহার অনার্য্য উদ্ধার ব্রত অপূর্ণ রহিয়া যাইবে! যে ব্রত তাহার জীবনের লক্ষ্য, জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার সুখ স্বপ্ন সেই পুণ্য ব্রত সফল না হইলে যে তাহার নারী জন্ম বিফল হইয়া যাইবে! তবে কি শৈল পার্থের কাছে যাইবে? তাই বা কেমন করিয়া হয়? শৈলকে দেখিলে যে পার্থের অনুতাপানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিবে—তিনি যে অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিবেন— সে বেদনা, সে অনুতাপের কারণ শৈল যে প্রাণ থাকিতেও হইতে পারিবে না। শৈল কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিল। একবার মনে হইল কুমারের কাছে যাই। কিন্তু তাহাতেই কি ফল ফলিবে? তাহাকে কি সে এই যুদ্ধে নিবৃত্ত করিতে পারিবে? যে তরুণ [illegible]

দশদিক আলোকিত করিয়া কৃত্রিমাকাশে সমুদিত হইতেছে তাহাকেই বা সে কেমন করিয়া নিবৃত্ত করিবে? মৃগয়ায় প্রবৃত্ত উত্তজনায় নক্ষত্রের মত যাহাকে সে ঘোর বিপদের মুখে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে আজ তাহাকে সে কেমন করিয়া এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে? আবার নিবারণ করিতে না পারিলেও এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া হয় ত সেই বীর শিশুর হৃদয়ে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা জাগিয়া তাহার হৃদয়ের বল হরণ করিতে পারে—বনমাতা হইয়া তাহাই বা সে কেমন করিয়া দেখিবে? শৈলজা আর ভাবিতে পারিল না। সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত অসীম আকাশতলে এক শিলাখণ্ডে বসিয়া সে নিদ্রিত কুরুক্ষেত্রের শোভা দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—

"হায় মা! হায় মা! শিবে শান্তি স্বরূপিণী!
দিবসে তুমি মা গৌরী, মাগো! রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্লভাগে শুভ্রা
জ্যোৎস্নাবরণী মাগো তুমি সরস্বতী
সর্ব্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর!
তবে কেন তব এই জগতে জননী!
এতই অশান্তি আহা! এত বজ্র ঝড়?
সর্ব্বাণী! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
জানি তুমি নিত্যা আর অনিত্য জগৎ।
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া? শান্তিতে জন্মিয়া
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন,
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া।"

শৈলজা ক্ষণেকের নিমিত্ত যেন এই চিন্তার ফলে এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল। তাহার অকূলে কূল মিলিল; সে স্থির করিল—

"না, না, যাব দয়াময়ী সুভদ্রার কাছে।
মায়ের করুণ প্রাণ হইবে কাতর——
করিবে বারণ, আশা হইবে সফল।"

শৈলজা চরিত্রের বিকাশ পরিস্ফুট করিতে গিয়া চরিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত কবির কবিত্ব-কৌশল এখানে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রার সহিত শৈলজার সাক্ষাৎ ঘটাইতে না পারিলে এক দিকে যেমন শৈলজার চরিত্র পরিস্ফুরণের অবসর ঘটে না, অন্য দিকে তেমনই কবির ও কাব্য কলা শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় না পাইয়া আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। কলানিপুণ কবি কিন্তু আমাদিগের সে সাধ মিটাইতে ত্রুটি করেন নাই। যে সুভদ্রা, শৈলজার স্বপ্ন-স্বর্গ অর্জ্জুনের দয়িতা—যাঁহার নিমিত্ত শৈলের বড় সাধের অমিয় সাগর আজ ভাগ্য দোষে গরল ক্ষেত্রে পরিণত—যিনি তাহাকে তাহার নিজ হাতে গড়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া নিরাশার দাবদাহে দগ্ধ করিয়া আজ যৌবনে যোগিনী করিয়া তুলিয়াছেন—সেই সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে শৈলজার হৃদয়ের বল ত বুঝিতেই পারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে কবি কোন্ সূত্রে, কিরূপ কৌশলে, ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত শৈলজার মিলন সঙ্ঘটন করিলেন, তাহাও উপলব্ধি করিয়া আমরা কবির সৃষ্টি কৌশলে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বিশ্বপ্রসাধনা-নিরতা শৈলজা বুঝিতে পারিয়াছিল যে সুভদ্রার সহিত সম্মিলন তাহার হৃদয়ের কঠোর সংযম-পরীক্ষা মাত্র—আর এ পরীক্ষার মূলে তাহার গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসের অভিপ্রায় বিরাজমান; নতুবা এমন অঘটন-ঘটন কখনই হইতে পারিত না। কিন্তু এখন আর শৈলজার পূর্ব্ববৎ সে হৃদয়দৌর্ব্বল্য নাই—সে কলুষিত বাসনা নাই; সুতরাং গুরুর পরীক্ষায় সেও হটিবে কেন?

সে কহিল—

"গুরুদেব! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
পাঠাইলে অপরাহ্নে ভদ্রার শিবিরে?
আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিনু পালন।
ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কঠিন
লইব! হৃদয়! চল যাইব যথায়
নিদ্রিতা পার্থের বক্ষে ত্রিদিবে আমার
প্রেমময়ী ভদ্রাদেবী, নিদ্রিতা এখন
স্থিরা হিরণ্বতী বক্ষে জ্যোৎস্না যেমন।
দেখিব একটি শিরা কাঁপে কি তোমার

পড়ে কিনা অনুমাত্র ছায়া কামনার
তোমার তরল বক্ষে।"

শৈলজা চলিল—তরল সলিলের মত তাহার রমণী হৃদয় আজ নির্ম্মল ও নিশ্চল হইতে পারে কিনা তাহাই দেখিতে পার্থের শিবির পানে সবেগে ছুটিল। দ্বারদেশে দ্বৈপায়ন-শিষ্য দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে দ্বার মুক্ত করিল। শৈলজা শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব যোগিনীবেশ ধারণ করিল। তারপর ধীরে ধীরে পার্থের কক্ষে প্রবেশ করিল।

শৈলজা দেখিল তখনও সুবর্ণ আধারে দীপ জ্বলিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। সুবর্ণ প্রতিমা সুভদ্রা দেবী সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে সুষুপ্তা দক্ষিণে নীলমণিময় নিরুপম বীরমূর্ত্তি ধনঞ্জয় নিদ্রিত। সুভদ্রার অতুল বদন নীলাকাশে পূর্ণ শশধরের ন্যায় অথবা মানসসরসে একটি বিকচ কমলের ন্যায় পতিবক্ষে শোভা পাইতেছে। উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রাগত, যেন জ্যোৎস্না মেঘকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে—সৌন্দর্য্য শৌর্য্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—জাহ্নবী হিমাদ্রিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। উভয়ে নিদ্রিত অথচ নিদ্রাতেও উভয়ের অধরে ঈষৎ হাসির রেখা—যেন উভয় উভয়ধ্যানে মোহিত। শৈলজা দেখিল বটে কিন্তু প্রথম দর্শনে নয়ন ভরিয়া সে রূপরাশি দেখিতে পারিল না। তাহার চক্ষু সে বিষয়ে বাদ সাধিল; যোগিনীর সংযত হৃদয় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কাঁপিয়া উঠিল! তাহার মনে হইল অনন্ত ভূধর ভারে স্থির অবিচল ভূতলও যেন সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল! শৈলজা দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধ মুখে কহিল—

"——————————হা হত হৃদয়!
একি কম্প কামনায়? না না প্রাণনাথ!
করিয়াছি চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার
আরাধনা; দেও শান্তি, শান্তিপূর্ণ বুকে
নিরখিব দেবমূর্ত্তি মম তপস্যার।"

সহৃদয় পাঠক! এই স্থানে ব্যাসদেবের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা মূলক উক্তি টুকু মিলাইয়া দেখিবেন। যাহাহউক, শৈলজার কাতর প্রার্থনা যেন তাহার ইষ্টদেবের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। রমণীর হৃদয় ভক্তিভরে অবিচল হইল। তাহার নীলাব্জবদন শান্ত স্থির; দুনয়ন আনন্দাশ্রুপূর্ণ! মুহূর্ত্ত পরে শৈল স্বীয় নীলোৎপলসম কর দুইখানি ভদ্রার রক্তোৎপলনিভ চরণে অর্পণ করিল। ভদ্রা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া পদপ্রান্তে দৃষ্টি ফিরাইলেন!

তারপর—

"——————————রহিলা চাহিয়া
উভয় উভয় পানে। উভয় মোহিতা
উভয়ের দরশনে, চাহি পরস্পরে—
জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নামাখা সরসী নীলিমা;
জ্যোৎস্না প্রদীপ্তা স্থিরা জাহ্নবী যমুনা;
যোগিনী ও যোগারাধ্যা, শান্তি তপস্যার,
বনদেবী গৃহলক্ষ্মী, দয়া দরিদ্রতা।
চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা কল্পনা।"

সুভদ্রার সহিত শৈলজার এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনে গীতাগ্রন্থ প্রদান কালে শৈল ছদ্মবেশে ভদ্রার শিবিরে গমন করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহার সহিত আমরা এই সাক্ষাৎলাভের আনন্দ তুলনা করিয়া দেখিলেই কবির প্রযোজ্য মধুর উপমাবলীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রথম দর্শনে শৈল সরমসঙ্কোচনতা কুন্দকলি—তাহার সুকুমার অঙ্গে যৌবনের সুমধুর প্রথম স্বপ্ন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! সুতরাং লজ্জা ও বুকভরা উচ্ছ্বাস আসিয়া তাহার দেখার সুখে বাদ সাধিয়াছিল। এই জন্যই সুভদ্রা সখী চতুরা সুলোচনা সেদিন শৈলের ছদ্মবেশ সহজে বুঝিয়া লইয়া তাহার শিবির ত্যাগ কালীন বলিয়াছিলেন—

"——————এর ঋষিপনা বল, ভদ্রা
করি আমি এখনি বাহির।
এ যদি সে শৈল নহে, নহি আমি সুলোচনা।"

কিন্তু আজ আর শৈলজার সে সরম নাই, সঙ্কোচ নাই। যোগিনীর হৃদয়ে আজ আর সে বাসনার প্রবল

তুফান কূল উছলিয়া উঠে না। আজ মহর্ষির কৃপায় তাঁহার হৃদয় ভক্তিভরে অবিচল—আজ সে—

"বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধ অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

আজ তাই সুভদ্রা উঠিয়া বসিতে যোগিনী অধরে অঙ্গুলি সন্নিবেশ পূর্ব্বক সঙ্কেত করিয়া তাহার সহিত বাহিরে আসিবার কামনা করিল। ভদ্রা আদরে তাহাকে বক্ষে লইয়া বাহিরে আসিলেন; এবং জ্যোৎস্না ধবলিত হিরণ্বতী তটে বসিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শৈলও ভদ্রার সেই স্নেহস্বর্গে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল কিন্তু উভয়ের অশ্রুতে কত প্রভেদ!

"———————অশ্রু কত রূপান্তর!
"শোকাশ্রু ভদ্রার, সুখ অশ্রু যোগিনীর।
ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখ খানি
রাখে বুকে চিরদিন। চাহে তপস্বিনী
চিরি বুক সেই বুকে, স্নেহের ত্রিদিবে
পড়ে ঘুমাইয়া সুখে চিরদিন তরে।"

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশে নব হেমন্তের নির্ম্মল শশধর সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিলেন—নিম্নে অশান্তির মহামূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র বিরাট শরীরে যোজন যোজনান্তর ব্যাপিয়া ঝটিকান্তে সুপ্তসমুদ্রের ন্যায় নীরব নিদ্রিত! ভদ্রা শৈলকে বুকে আঁটিয়া লইয়া অদূরে এক বকুলতলায় গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার বাম অংসোপরি শৈলজা মুখখানি স্থাপন করিয়া রহিল! করুণার সিন্ধু ভদ্রার হৃদয় তখন স্মৃতির প্রবল আঘাতে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত; সুতরাং সহসা তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া তিনি উচ্ছ্বাসভরে স্নেহতরঙ্গিত কণ্ঠে কেবল মাত্র কহিলেন—

"————শৈলজে! ভগিনী!
চির অভাগিনি!" তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শৈল ভদ্রার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"————সে কি কথা দেবি!
ভদ্রার ভগিনী, স্নেহভাগিনী পার্থের
অভাগিনী যদি তবে সুভাগিনী আর
কে আছে জগতে দিদি! শৈলজা তোমার
বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধা অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

সত্যই ত! কাননান্তরালের প্রস্ফুটনির্গন্ধ অপরাজিতা যে আজ সত্যই দেবপদাশ্রিতা! আজ শৈলের ন্যায় পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী কে? শৈল ত আজ সে শৈল নহে!

"সে নীলাব্জ কলি আজি ফুটন্ত নলিনী!
সে পঞ্চমী আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী!"

শৈলের হৃদয়ে আজ যে পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি ও সরলতা বিরাজ করিতেছে—শৈলের কোমল প্রাণে, কোমল শরীরে আজ যে প্রাণ কোমলতা উজ্জললাবণ্য শোভা পাইতেছে তাহার তুলনা কোথায় মিলিবে?

ভদ্রা স্নেহভরে সেই অপরাজিতার ক্ষুদ্র মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। চন্দ্রকরতলে দেখিলেন শৈলের যুগল নয়ন আনন্দাশ্রুপ্লাবিত। তাহার অধরে ঈষৎ আনন্দ হাসি ভাসিতেছে।

"সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
চন্দ্রাভ আকাশ খণ্ড হৃদয়ে তাহার।"

ভদ্রা সোহাগভরে ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আহা! সে চুম্বনে কত স্নেহ! কি শীতল সুধাধারা সেই চুম্বনের মধ্য দিয়া দুইটি প্রাণে বহিয়া গেল!

শৈলের আজ কি স্বর্গ সুখ! চুম্বনের এ প্লাবন রুদ্ধ করিয়া—পবিত্রতার এ মন্দাকিনী প্রবাহ ত্যাগ করিয়া সে আজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আর কি বলিবে কি জানাইতে চাহিবে? সে শুধু নীরবে সাশ্রুনয়নে ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রা আত্মহারা ভাবে আবার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহাকে বুকে আঁটিয়া লইয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—

"শৈল! শৈল! বল্ দিদি! থাকিবি এরূপে—
থাকিবি আমার বুকে, ছাড়ি আমাদেরে
আর যাইবি না— ; আমি দিব না যাইতে।

* * * *

চতুর্দ্দশবর্ষ আজি প্রতিমারে তোর
পূজিয়াছি নিরন্তর হৃদয়ে ভুবনে।
স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত
কত বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত।

* * * * * *

বেড়াইয়া বনে বনে হায়। বানবিদ্ধ
বনকুরঙ্গিণী মত, কি দুঃখ দারুণ
না জানি সহিলি বোন! আয় বুকে আয়,
ভদ্রার্জ্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেমধারা
জুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন ; তব পিতৃভূমি
সমদ্ধৃত ; পিতৃপুরী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমান, পার্থের আদেশে
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পি চূড়ামণি।
তব মরকত মূর্ত্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পুরীতে ; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ তুষানল কর নির্ব্বাপিত
অর্জ্জুনের সুভদ্রার! এই যুদ্ধ শেষে
কিম্বা চল ইন্দ্রপ্রস্থে, চল প্রেমময়
অর্জ্জুনের বুকে, এই বুকে সুভদ্রার।"

আবার দুইজন কত কাঁদিল। ভদ্রা শোকভরে কাঁদিলেন—শৈল সুখে আনন্দে কাঁদিল। তারপর সুভদ্রার বক্ষঃস্বর্গ হইতে মুখ তুলিয়া সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"দিদি তোমাদের—
চরণ যুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার।
সফল তপস্যা তার, কিন্তু কহ হায়!
কেবল কি ধনে দুঃখ, গৃহে দিদি! সুখ—
এই কুরুক্ষেত্র হায়! প্রাঙ্গনে যাহার।"

কি কঠোর প্রশ্ন? ভদ্রার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। শৈলজার মুখমণ্ডলে কেন যে শান্তির পবিত্র আভা নিত্য প্রতিফলিত তাহা তিনি সহজে বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল—কোমলতার মূর্ত্তি শৈলের হৃদয় পীড়িত, নিঃসহায় অনার্য্যগণের ব্যথায় উচ্ছ্বসিত! প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ প্রেমের সাধনায় যেন ধীরে ধীরে আপনাকে বিশ্বদেবতার চরণতলে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল! শৈল দেখিল—ভদ্রার মুখে সহসা কি যেন অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া আসিয়া পড়িল—তাঁহার বিস্তৃত নয়ন অলৌকিক প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তিনি তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া শৈল আনন্দে নতমুখে উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া রহিল।—ভদ্রা কহিলেন—

"শৈলজে সুখের তরে আকুল জগত
সুখ-অন্বেষণ—স্থিতি, গতি জগতের।
* * * * অজস্রধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিকায়
গরজে জীমুতমন্দ্রে, বর্ষে বরিষায়
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরুদলে,
ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে।
সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্ব্বময়।
কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
করিতেছে হাহাকার। মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে, বুঝে নাই হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়।"

শৈল প্রশ্ন করিল—

"বল দেবি! কিসে তবে সুখ মানুষের?"

সুভদ্রা। "জগত অনন্তকণ্ঠে দিতেছে উত্তর
একতানে—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে সুখ, পুষ্পত্বে পুষ্পের ;
মনুষ্যত্বে তবে বোন্! সুখ মানুষের।"

শৈল। "কারে বল মনুষ্যত্ব?

সুভদ্রা। চরিতার্থতায়

বিহঙ্গবৃত্তির বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের।
মানুষ কি নিয়া বল মানুষ ভগিনী ?
আত্মা, মন কলেবর। চরিতার্থতার
এ তিনের মনুষ্যত্ব।

*   *   *   *

স্বধর্ম্ম পালনে
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল।
পূর্ণ মনুষ্যত্ব—দুঃখ-মুক্তি নিরবাণ,
বৈকুণ্ঠ পরমসুখ, স্বর্গ ভগবান!

শৈল "ইহা কি বৈদিক ধর্ম্ম ?

সুভদ্রা। বেদ ধর্ম্ম শৈল!
"এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান।

শৈল। "এই মনুষ্যত্ব—এই স্বধর্ম্ম সাধন
হয় না কি বনে দেবি!

সুভদ্রা। ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর
"এ ধর্ম্মের গৃহ দিদি! এ মহাধর্ম্মের
"ভিত্তি লোকহিত ভিত্ত সর্ব্বভূতহিত।

শৈল বুঝিল। তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল! অনার্য্যা রমণী সৌভাগ্যবশে ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া সাধনার যে বীজ লাভ করিয়াছিল—আজ সুভদ্রার শিক্ষায়নে তাহাকে অঙ্কুরিত ও সঞ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরের অন্তরে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল।

সে কাতরকণ্ঠে কহিল—

"চল তবে দিদি! হায়! ধরাতলে
এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর
সাধিবারে লোকহিত! এ ভারতভূমি
যাহাদের পিতৃভূমি, সে অনার্য্যজাতি
আজি কোথা, দেখ আহা! কি দশা তাদের!
রাজ্যহীন, গৃহহীন, আচার বিহীন,
আজি তারা বনে, আজি পশু নির্ব্বিশেষ।
সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, সুখে আজি আর্য্যগণ
দেবোপম; হায়! দেবী! আছে তাহাদের
কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
সাধিতে অজস্র হিত; আছে তাহাদের
পার্থ ভুজাশ্রয়, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়
সুখদাতা, পরিত্রাতা নর-নারায়ণ।
হইয়াছে সূর্য্যোদয় আবির্ভাবে তাঁর
সমুজ্জ্বল আর্য্যভূমি, অমাবস্যা ঘোর
অনার্য্যের হায়! দিদি! রবে কি এমন ?
পতিত পাবন হরি!—এ পতিত জাতি
পাবে না তাঁহার দয়া ? পাবে না তোমার ?"

কি কাতর কণ্ঠ! কি সকরুণ মিনতি! ভদ্রা বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাবে শৈলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন! সহসা কি যেন কি মেঘ তাঁহার নয়ন হইতে সরিয়া গেল—তিনি যেন দিব্যদৃষ্টি সহকারে দেখিলেন শৈলজা—

"————ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যেরে বিলাইয়া হরিনাম সুধা
বাঁচাবে অনার্য্য জাতি ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোনমতে অনার্য্য উদ্ধার।"

তাঁহার দুই নয়নে যুগল শীতলধারা বহিতে লাগিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কিয়ৎপরে কৌতুহলবশে কহিলেন—

"————শৈল! শৈল! এ চৌদ্দ বছর—
কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীরে
কহ দয়া করি।"

শৈল ঈষৎ হাসিল। সে হাসি বর্ষার জোৎস্নার ন্যায় সজল নয়নের হাসি! ম্লানমুখে, নতনেত্রে সুভদ্রার অংসে বদন রাখিয়া সে কহিল—

"বড় সুখে ছিল দিদি! শৈলজা তোমার।"

তারপর ধীরে ধীরে আনুপূর্ব্বিক স্বীয় জীবনের অপূর্ব্ব মধুর কাহিনী বলিয়া গেল। সেই চিরনবীন অদ্ভুত কাহিনী আমরা ইতি পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জানাইয়া রাখিয়াছি।

ভদ্রা এই পুণ্যবতী রমণীর কঠোর আত্মবিসর্জন, পবিত্র স্বার্থত্যাগ, ও অলৌকিক সংযমের কাহিনী সবিশেষ শুনিলেন। বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। শৈল বিহ্বলভাবে তাহার কাহিনী শেষ করিয়া যখন ভদ্রার চরণে আশ্রয় মাগিয়া কহিল—

"দেও স্থান দেবী! আজি চরণে তোমার।"

তখন ভদ্রা দ্রুতবেগে সেই বিহ্বলা বালায় বক্ষে লইয়া কহিলেন—

"শৈল! শৈল! পুণ্যবতী! পদতীর্থ তোর
সুভদ্রার যোগাস্থান।

* * * * * *

আয় দিদি! আয়!
দুইজনে গৃহে বনে গাব কৃষ্ণনাম।
এইরূপে দুইজনে প্রেম-আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য্য আর্য্য। গাহিবে জগত
কৃষ্ণনাম; কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিবে ধরণী।
কুরুক্ষেত্র ঐরাবত ভাসাইয়া বেগে
ছুটিতেছে প্রেম-গঙ্গা পতিতপাবনী—
আর্য্যভূমি, বনভূমি, করিতে উদ্ধার।"

শৈল তখন অশ্রুজলে ভদ্রার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছিল। তাহার উদাস নয়নের স্থির দৃষ্টি যেন দূরে [illegible] নীলসীমির পটে কাহার চরণপ্রান্তে আবদ্ধ [illegible] সে কিছুই উত্তর করিল না। ভদ্রা সোহাগভরে তাহাকে ডাকিতে সে সহসা পাগলিনীর ন্যায় কিয়দ্দূর ছুটিয়া গিয়া কহিল—

"————ওই দেখ! ওই দেখ দিদি!
* * * * বসি চন্দ্রাসনে
কনক জননী মম কি প্রীত বদনে!
প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ? মাতা!
কে মাতা?—সুভদ্রা!"

শৈল দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রার বুকে পড়িয়া আবেগভরে শুধু কহিল—

"————ওমা! মা! আমার
মাতৃহীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃহীনা
নারায়ণ! এতদিনে পাইল জননী।
পতিতপাবনী মাত! পতিতা কন্যার
রাখিস চরণে তোর!"——আর বলিতে পারিল

না—সে সুভদ্রার অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল। কি-যেন-কি ভাবের আবেগ আসিয়া তাহার সংজ্ঞা অপহরণ করিল।

নীরব রজনী। সুভদ্রার অঙ্কে সিক্ত নীলাম্বুজ সম শান্ত সমুজ্জ্বল শৈলের মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া চন্দ্রদেব যেন আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। ভদ্রাদেবী আনন্দে আত্মহারা! তাঁহার সুচারু গণ্ডস্থল বহিয়া আনন্দের পবিত্র ধারা দরদর বহিতে লাগিল। নিশার তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে নব হেমন্তের সুশীতল সমীরণ-সংস্পর্শে শৈলের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। শৈল ভদ্রার উরসে মুখ লুকাইয়া কহিল—

————"রজনী দেবি! অবসানপ্রায়।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মতন
ভাসিতেছে সুখ-তারা অনন্ত আকাশে।
মানবেরো দুঃখ নিশি হতেছে প্রভাত।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাম্বুজে, কর এ প্রতিজ্ঞা—
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে;
রাখিবে বাঁধিয়া মত্ত করি-সুত মত
সুদৃঢ় স্বর্গীয় মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে।"

শৈলের কাতর অনুরোধ সুভদ্রার প্রাণ স্পর্শ করিল; কিন্তু তিনি এই অন্যায় অনুরোধের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন শৈল?

শৈল। শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জ্জয় গাণ্ডীব বল।

সুভদ্রা। অন্ধের সন্তান
হতভাগা কৌরবেরা অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাহি হায়! তারা গাণ্ডীবের বল,
নহে শিশু অভিমন্যু। গাণ্ডীবের বল
জনার্দ্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন
জান শৈল। ধর্ম্ম-যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী—অভিমন্যুর জননী—
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈল এই ধর্ম্ম-যুদ্ধমূলক যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিল না; সে কৌতূহলবশে প্রশ্ন করিল—

"ষোড়শবর্ষীয় শিশু করিবে সমর
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

সুভদ্রা। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কেশরী শিশুর।
ষোড়শবর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি। ষোড়শবর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী। ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্ব্বাণ অঙ্গের ভূষণ।
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ!
কৃষ্ণ সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে
করে অন্ধ কৌরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হবে কুরুকুল।"

সুভদ্রার আশ্বাসবাণীতে শৈলের প্রাণ প্রবোধ মানিল না। তাহার কোমল প্রাণ কুমারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে রুদ্ধশ্বাসে কেবলমাত্র কহিল—

'নরহরি! নারায়ণ! বিপদভঞ্জন!
রক্ষিও বাছার তরে। বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বনমাতার-তাহার
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ; হইবে উদয়
অরুণ উষার সহ আশ্রমে আমার—
আঁধার হৃদয়ে মম। অনাথিনী-নাথ!
এই চির অনাথিনী চাহে নাহি আর—
চাহিবে না—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটী বাসনা কর পূরণ তাহার।

শৈলের নয়ন বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। চির অনাথিনীর ক্ষুদ্র প্রাণের অতুল অপরিমেয় স্নেহের পরিচয় লাভ করিয়া ভদ্রার সংবৃত হৃদয় গলিয়া গেল। শৈলজার এই নৈশ অভিযান কেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। সাশ্রুনয়নে শৈলের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"————অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
বরষিতে স্নেহ-সুধা জনম কি তোর
অভাগিনি! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বুকে!"

শৈল সাশ্রুমুখে ধীরে ধীরে কহিল—

"একটী হিল্লোলে আমি আকুল যাহার,
বহিছে সে স্নেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার
শান্তিময়ী সুধাময়ী! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন! বুঝিলাম হায়
এতদিনে কি কঠিন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
বুঝিলাম এতদিনে লক্ষ্মী অনার্য্যের
কেন আর্য্যপদানতা। বুঝিলাম আর
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার।

সুভদ্রা ধীর-গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন—

"বড়ই কঠিন ধর্ম্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নয়।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নয়, পতি বিশ্বেশ্বর।"

তারপর শৈলজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে বসুন্ধরা পাপে পরিপূর্ণ বলিয়াই মানবসমাজ দুঃখপারাবারে পরিণত হইয়াছে। দুঃখ বিধাতার নির্ম্মম লিপি নহে; জগৎ আনন্দ-রাজ্য—সুখের প্রস্রবণ! মানব নিয়তির পথভ্রষ্ট বলিয়া—অধর্ম্মের সৃজন করে বলিয়াই তাহার অদৃষ্টে এই গভীর দুঃখ। মানবের এই অধর্ম্ম নষ্ট

করিতে কুরুক্ষেত্র সমরের উদ্ভব। এই মহাসমরে সুভদ্রা পতি, পুত্র এমন কি আত্মসমর্পণ করিলে যদি ধরাতলে ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়—যদ মানবের সুখ-পথ চিরতরে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মত ধরাতলে পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী আর কে আছে?

শৈল ম্লানমুখে নিবিষ্টচিত্তে সকল কথা শুনিল। ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া দেখিল জগতমাতার যুগল কপোল বহিয়া মাতৃপ্রেমবিগলিত, সন্তাপহারিণী যুগল ধারা দর-দর-ধারে বহিতেছে! সে উচ্ছ্বাসভরে কহিল—

"পিতৃগণ! দেবগণ! কে আছ কোথায়
দেখ পুণ্যবতীর এ আত্ম বিসর্জ্জন
মানব-উদ্ধার-ব্রতে! এ পুণ্যে মাতার,
করিয়া শৈলের স্নেহে কবচ নির্ম্মাণ,
সমরে করিও রক্ষা বাছারে আমার!"

তারপর নীরবে আকাশপানে চাহিয়া ভদ্রার চরণে বিদায় প্রার্থনা করিল। ভদ্রা সস্নেহে তাহার কর ধরিয়া কহিলেন—

"থাক্ মুহূর্ত্তেক শৈল। মধ্যম পাণ্ডবে
ডেকে আনি, ডেকে আনি নর নারায়ণে
আমার তোমার দেব উপাস্য যুগল!
পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
দুইজনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়
করিতে তুলনা তার। ভগিনীর তোর
রক্ষা কর অনুরোধ, একদিন আর
থাক্ বুকে, লয়ে বুকে অভি-উত্তরায়।"

শৈল নীরবে সেই প্রেমপূর্ণ বুকে মস্তক রাখিয়া অনিমেষ-নয়নে ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নীরব নিষ্পন্দ দৃষ্টি—ভাবহীন, অথচ অনন্তভাবপূর্ণ দৃষ্টি—শিশিরমথিত কমলদলের ন্যায় অশ্রুভারাপ্লুত মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া ভদ্রার অন্তর গলিয়া গেল। তিনি শৈলকে সোহাগভরে বুকে টানিয়া লইলেন। শৈল মধুরকণ্ঠে কহিল—

"না দিদি!——————————
* * * * * * * হয়নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা—সিদ্ধি তপস্যায়,
কৃষ্ণার্জ্জুনপদতীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ! * * * * *
* * * * * * পারিবে যেদিন
নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
দেখিতে পার্থের মুখ; করিতে দর্শন
নারায়ণ পদাম্বুজ শান্তি-নিকেতন—
পারিব যেদিন মিলি ভগিনী দুজনে
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার—
সে মহা প্রয়াগ তীর্থ দেখিব যেদিন—
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি, সুভদ্রা শৈলজা,
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগলা—
সেদিন আসিবে শৈল চরণে তোমার।

কিন্তু যতদিন না তাহার এই স্বপ্ন সার্থক হয়, যতদিন না রমণীর সেই উচ্চ ধর্ম্ম সাধনে সে সফলকামা হয়—যতদিন না নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় তাহার হৃদয়কে সে সংযত করিতে ও স্ববশে আনিতে পারে, ততদিন কৃষ্ণার্জ্জুন-পদতীর্থদর্শনরূপ এই কঠোর প্রলোভন—এই ভীষণ হৃদয়সংযমমূলক অগ্নি-পরীক্ষা হইতে সে আপনাকে দূরে রাখিবে—ততদিন—

"গৃহক্ষেত্র সুভদ্রার, শৈলজার বন।"

শৈল ধীরে ধীরে আকাশের পানে চাহিয়া এই কথা গুলি বলিয়া নীরব হইল। সুভদ্রা নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—

"চন্দ্রদীপ্ত অশ্রুসিক্ত কপোল কমলে
বহিছে সে প্রেমধারা!"

কবি দেখিলেন—

* * * * সিত চন্দ্রালোকে
হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে—স্বর্গে মহিমায়,

মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত
অপার্থিব, প্রেমময়, পবিত্রতাময়।

কবির এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। সেদিনের সেই বিরহিনী উপেক্ষিতা অনার্য্যা রমণী আজ বিশ্বপ্রেমের মাধুরী উপলব্ধি করিয়া যে ভদ্রাদেবীর ন্যায় মানব-উদ্ধার-ব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিতেছে, ইহা ভাবিলে কবি-কল্পনা যে এত উচ্চে উঠিতে পারে তাহা অবশ্য প্রথমটা মনে আনিতে পারি না বটে; কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি যে উদারতার, প্রেমপরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতার ও বিশ্বহিতৈষণার একত্র সমাবেশ রমণীহৃদয়েই সম্ভব, যখন মনে পড়ে নির্ব্বাসিতা সীতা বা উপেক্ষিতা দময়ন্তী অথবা পতিপ্রাণা সাবিত্রী বা মহিয়সী শৈব্যা—যখন দেখিতে পাই গৃহচর্য্যায়, পরিজনসেবায়, পতিপ্রাণতায়, সমবেদনায়, আত্মত্যাগে ও সংযম-সাধনায় ভারতের রমণী কুসুমের ন্যায় কোমলতাময়ী, অথচ কুলিশের ন্যায় কঠোর-প্রকৃতিসম্পন্না—তাঁহাদের হৃদয় বড় উন্নত, বড় কোমল, বড় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বড় ভক্তিপ্রবণ—তখন কবি-কল্পনা-প্রসূত এই চিত্র খানি যে সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ নিরবদ্য হইয়াছে তাহা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। এখন সত্যই যে দেশের সাহিত্যে কুন্তী ও দ্রৌপদীর, শকুন্তলা বা মালবিকার, ঔশীনরী বা কপালকুণ্ডলার, ভাগীরথী বা শ্রোণি-মুদ্রার চিত্র বর্ত্তমান, সে দেশের সাহিত্যে সুভদ্রার পার্শ্বে শৈলজার স্থান দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং আমরা কবির আদর্শ সৃষ্টি চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেই সাহিত্যেরই সেবক বলিয়া মনে মনে একটা অবশ্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

সে যাহা হউক দেখিতে দেখিতে শৈলের নয়ন-যুগল বিস্ফৃত হইল; সে উন্মাদিনীর মত দুই বাহু বাড়াইয়া আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—

"ওই দেখ! ওই দেখ! জনক জননী
আবার বসিয়া ওই শশাঙ্ক মণ্ডলে!
কি হাসি বয়ান, আহা! কি প্রেম নয়নে!
সফল হইবে স্বপ্ন। একি দেখি পুনঃ
হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর

কি মূর্ত্তি ভাসিল ওই—সুভদ্রা অর্জ্জুন!
পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার!
পিত! পিত! মুছে ফেল শোক হৃদয়ের।
এই দেখ শৈল আজি দুহিতা তোমার।
সফল তপস্যা; দেখ হৃদয় তাহার
পিতৃ-প্রেমে অবিচল, স্থির অকম্পিত।
মা আমার! মা আমার! প্রেম-মুখ তোর
কি সুন্দর! কি স্তিমিত! কি দেখি আবার!
এক অঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
কি মূর্ত্তি ধরিল পুনঃ নীলিমা বরণ
উঠিল ভাসিয়া শঙ্খ চক্রকরোজ্জ্বল!
বাসুদেব! নারায়ণ!"————

শৈলের মুখে আর কথা সরিল না। ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া নীরব নিদ্রিত কুরুক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শৈল দুহিতা উভয় তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার শ্রীচরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির আবেগভরে অপূর্ব্ব মহিমার জ্যোতি বিকাশ করিয়া স্বয়ং নারায়ণও যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন!

কি স্বর্গীয় চিত্র! কি সুন্দর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি! কি সূক্ষ্ম কৌশলে কবি শৈলজার এই চিত্র দর্শন অঙ্কিত করিয়াছেন! শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী শৈলজার পূর্ণমাত্রায় যদি কাহারও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে তবে সে তাহার স্বর্গগত পিতা ও স্বর্গগতা জননীর। শৈলের কপালে তেমন স্নেহ ও সোহাগ জীবনে আর কখনও পূর্ণরূপে লাভ করিবার অবসর জুটিয়া উঠে নাই। কৈশোর তাহাকে স্বপ্রকৃতিবশে ভ্রাতা ভগিনীর সংসার হইতে এক অপূর্ব্ব প্রেরণায় বিচ্যুত করিয়াছিল। তারপর যৌবনের প্রথম সঞ্চার হইতে সে চিরদিন নিরাশার তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া আসিয়াছে! প্রেমের স্বপ্ন সে অনেক দেখিয়াছিল, কিন্তু সে স্বপ্নের সফলতা তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই! যৌবন-মধ্যাহ্নে মহর্ষির কৃপাকণা লাভ করিয়া—তাঁহার চরণ প্রান্তে রহিয়া

যোগিনী সাধনার পথে যেটুকু শক্তি লাভ করিয়াছিল—পার্থনন্দন অভিমন্যুর দর্শন লাভ করিয়া যোগিনীর হৃদয়ে স্বীয় ব্রত উদ্যাপনের লালসায় যে সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল আজ সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই শক্তি প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে সুভদ্রা শিবিরে আসিয়াছিল। সৌভাগ্যবশে সুভদ্রার শিক্ষা গুণে তাহার সরস উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে যে বীজ নিহিত ছিল তাহা নিমেষের মধ্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিল। অনাথিনী রমণী ভদ্রার পবিত্র মাতৃ স্নেহ পূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া তাহার বহুদিনের বাঞ্ছিত মাতৃসঙ্গ সুখের আশা পূর্ণ করিয়া আর্য্যলক্ষ্মী পবিত্রতাস্বরূপিনী ভদ্রাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিল। ফলতঃ এই উপলব্ধি তাহার জীবনের চরম উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধির বলেই পার্থের প্রতি তাহার হৃদয় জাত সঙ্কীর্ণ প্রেমের অনুমাত্র ছায়াও তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না এবং সে এক অনাবিল পবিত্র প্রেম সম্পর্কে পার্থের সহিত জড়িত হইল। শৈলের এই আত্মোন্নতি দর্শনে সম্ভবতঃ তাহার পিতামাতা উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে দেখা দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। শৈল যে তাঁহাদের প্রদর্শিত কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হয় নাই বরং সেই পবিত্র পথে চলিয়া সংযম শক্তি বলে অনার্য্যের ধর্ম্মের রাণী হইয়া পতিত জাতির উদ্ধার কল্পে ব্রতী হইয়াছে ইহাতে তাঁহাদের উৎফুল্ল হইবারই কথা। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদ ফলে শৈল সুভদ্রা ও অর্জ্জুনকে আকাশ পটে মাতাপিতারূপে অঙ্কিত দেখিল। তারপর সাধনার বলে উপাসিকা মূর্ত্তিতে ভক্তভাবে 'দুঅঙ্গ এক করিয়া' সে যাহা দেখিল সে অনুপম দেববাঞ্ছিত মূর্ত্তি সকল সাধনার চরম লক্ষ্য সকল ধারণা ও উপাসনার শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। ভক্ত বৈষ্ণব কবি শৈলজাকে তাহার সেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য দেখাইতে গিয়া প্রার্থনার কৌশল কেমন সুক্ষ্ম ভাবে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে ভক্তিভরে ও বিস্ময়ে আমাদের উদ্ধত শির সাধক কবির চরণে স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। ভক্ত কবি তাঁহার ইষ্ট দেব সেই নীরদবরণ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে ভদ্রা শৈলজার মূর্চ্ছিতাবস্থায় যে সকরুণ প্রার্থনা গীতি গাহিয়াছেন আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিলাম। ভরসা করি কবির এই প্রার্থনা গীতিও কেমন পতিতোদ্ধার কামনামূলক তাহা সকলেই সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবেন—

"দাঁড়াইয়া থাক নাথ!
নিরখি নয়ন ভরি,'
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মী!
থাক মা চরণে পড়ি।
অনার্য্য আর্য্য শক্তির
এইরূপ সঙ্ঘর্ষণ—
ভারত নিয়তি যদি
তব ইচ্ছা নারায়ণ!
এইরূপ পদতলে
হয়ে শেষে সম্মিলিত,
উদ্ধারি পতিত নাথ!
হয় যেন প্রবাহিত।
থাক দাঁড়াইয়া নাথ!
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মী!
থাক মা চরণে পড়ি।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস

অসি স্বস্তিক।

(ক)

প্রবল ঝড় বাদলের ন্যায় শত জিহ্বা জ্বালামুখী পৈশাচিক ক্ষুধা লইয়া জাঠ সামন্তের বিরাট বাহিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জনপদ কল্যাণপুরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রদোষের অরুণ আলোকে কল্যাণপুরের পঞ্চ সহস্র খরসান অসি সশব্দ ঝঞ্ঝনায় ঝলসিয়া উঠিল। রাজা রুদ্র তারণ যুবরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

যুবরাজ মণি-দীপ্ত-কক্ষে পত্নী কমলাদেবীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কমলাদেবী কহিলেন "রণভেরির আহ্বান এসেছে—জয়লক্ষ্মীর সন্ধান কর।"

যুবরাজ কমলাদেবীর প্রস্ফুটিত শতদলের মত করতল চুম্বন করিয়া কহিলেন "অঙ্ক লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছি তাই প্রলয় ভেরীর সকল শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে।

কমলা দেবী মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন "ছি! ছি"!

(খ)

যুবরাজ কল্যানাধিপ রুদ্রতারণের পদবন্দনা করিলেন। রুদ্রতারণ এক মুক্তাকাঞ্চনখচিততীক্ষ্ণ অসি সম্মুখে স্থাপন করিয়া কহিলেন "গ্রহণ কর, এই যুদ্ধে তুমিই সেনাপতি, পূর্ব্বপুরুষের দেবদত্ত তরবারির অবমাননা কোরো না। যুবরাজ দ্বিধাকুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের মত্ত মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া প্রকৃতির সেই বসন্ত সম্ভারে কমলা দেবীর অতুলনা রূপ বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিলেন। রুদ্রতারণ হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন "কল্যান্ বংশ কুলাঙ্গার সরে দাঁড়াও, সেনাপতি বিজয়বর্ম্মন সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর। যুদ্ধ জয়ের পর এই তরবারি উপহার পাবে।"

বিজয়বর্ম্মন নীরবে গর্ব্বোন্নত শীর সসম্ভ্রমে ঈষৎ নত করিলেন। যুবরাজ লজ্জাকুণ্ঠিত মুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। আর অপর দিকে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শত সহস্র তরবারি কোষোম্মুক্ত হইয়া আস্ফালন করিয়া উঠিল: "কল্যাণরাজ কি জয়"।

(গ)

"যুদ্ধ থেকে চলে এলে! এর পরিনাম কি হবে"।

"কমলা আমি পরিত্যক্ত হয়েছি রণ যজ্ঞে আমি অস্পৃশ্য।"

কমলা সচকিতা হইয়া উঠিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিলেন "কি লজ্জা। যখন কল্যাণপুরের প্রতি কুটীরের ক্ষুদ্রতম প্রজা তার সুবিশাল বীর হৃদয় আর বজ্রমুষ্টিপীড়িত তীক্ষ্ণ অসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তখন কল্যানপুরের ভবিষ্য অধিপতি———ছিঃ,,।

যুবরাজ তৃষিত নয়নে কমলাদেবীর প্রবালরাগ আরক্ত কুঞ্চিত অধোরোষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু করুণ হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। কমলাদেবী মর্ম্মান্তিক ধীকারে অধোমুখে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ঘ)

সমস্ত রাত্রির ঝঞ্ঝা বর্ষনান্তে প্রাচ্য দিগ্বলয়ের সজল দীপ্ত রাগ কল্যানপুর দুর্গগাত্রে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। দুর্গ তোরণে যুদ্ধ প্রত্যাগত দ্বি-সহস্র সেনার বিজয়োল্লাস ভৈরব হুঙ্কারে ধ্বনিত হইল "কল্যাণরাজ কি জয়।"

বিজয়বর্ম্মন নিবেদন করিলেন "মহারাজ যুদ্ধ জয় হয়েছে"।

রুদ্রতারণ দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন "গ্রহণ কর সেনাপতি" বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত তরবারি হস্তে তুলিয়া লইলেন।

বিনীত সেনাপতি কহিলেন "আমি এ মহৎ সম্মানের অযোগ্য, জেতা আমি নই"।

"সে কি! তবে জেতা কে!"

সেনাপতি ইঙ্গিত করিলেন—সৈনিকগণ সরিয়া দাঁড়াইল—সেই দুর্গতোরণের শ্বেত প্রস্তর রঞ্জিত করিয়া যুবরাজের শোনিত স্নাত দেহ পড়িয়াছিল। দ্বিসহস্র শির সসম্ভ্রমে শির অবনত করিয়া ললাটে তরবারি স্পর্শ করিল।

"মহারাজ, যুবরাজ অন্তিম বাক্যে বলেছিলেন আমার বক্ষশোণিতে বুভুক্ষু দেবদত্ত তরবারির সম্বর্দ্ধনা ক'রো।"

রাজা রুদ্রতারণ অশ্রু জলে শ্বেতশ্মশ্রু প্লাবিত করিয়া সেই কাঞ্চনময় উলঙ্গ তরবারি যুবরাজের ললাটে স্থাপন করিলেন। প্রভাত রৌদ্রে শোণিতাপ্লুত অসি জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল।

প্রদোষের নিবিড় কালিমা যখন ভূমণ্ডলের দিগ্‌দিকে ঘণীভূত হইয়া আসিতেছিল তখন রক্ত পট্টাম্বর কমলাদেবী তার সিন্দুর-অলক্ত-চন্দন চর্চ্চিত ললাটে সেই দেবদত্ত তরবারি স্পর্শ করিয়া প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। আর একবার শত নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "সতী মায়িকি জয়।"

তারপর প্রতি ফাল্গুণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর তামসী রজনী আলোক মালায় প্রজ্জ্বোল করিয়া কল্যাণপুর রাজ্যের বিশাল গম্বুজওয়ালা মন্দিরে উৎসব হইত। শত শত যুবক এক স্বর্ণ বেদীর উপর এক খানা প্রকাণ্ড তরবারির নিকট সসম্ভ্রমে নত জানু হইয়া বর প্রার্থনা করিত "বীর্য্যং দেহি বীর্য্যং দেহি।"

পরদেশী কেহ ব্যস্ত পথচারী কাহাকেও উৎফুল্ল হইয়া উৎসবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "আজ অসি স্বস্তিক উৎসব-সমাধি মন্দিরে যাচ্ছি।"

শ্রীব্রজমাধব রায়।

ব্যাকুলা।

তুমি কি গো এসেছিলে সেই দিন জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায়
তাপ দগ্ধ দীর্ণ শীর্ণ হিয়াখানি মোর স্নিগ্ধ করি জীবন্ত জ্যোৎস্নায়;
মর্ম্মরিত বন পথে,
তোমার চরণ শব্দ পরতে পরতে
বিহঙ্গের কাকলীর সনে
অনুভব করেছিনু এ বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দনে
অতি সংগোপনে;
সেই তুমি চলে গেলে চেয়ে দেখি ঘোর অন্ধকার,
জীবনের মধ্যপথে পড়ে শুধু করে হাহাকার।
তার পর? তার পর যে মাধবী অতুল বিশ্বাসে
সহকারে ছিল আশ্লেষিয়া, নিদাঘের তপ্ত দীর্ঘ শ্বাসে
ঝরিয়া পড়িল হায়!
একবার তার পানে কেহ ফিরিয়া না চায়;
তার পর পোহাল শর্ব্বরী,
কৃষ্ণ যবনিকা দিয়া তপনের সর্ব্বাঙ্গ আবরি
এল বর্ষা রাণী,
ক্ষুধিতা রাক্ষসী সম ধরণীরে বজ্র বাণ হানি।
কত কেকা অসংযত,
কুটজ কদম্ব কত,
ফুটিল শুকায়ে গেল বক্ষে লয়ে স্মৃতি অব্যাহত;
আলিঙ্গন দিয়ে গেল বক্ষে ধরণীর
অশান্ত সমীর;
তবু তুমি আসিলে না তাই অশ্রু ঝরে চির দুঃখিনীর।
তার পর কোৎকের দ্বার খুলি শেফালী মালতী
শরদেরে করিল আরতি;
মেঘ রূপে শিরে শোভে তার
শ্বেত ছত্র, প্রতাপের বৈজয়ন্তী হার;
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে রত্ন সিংহাসন
করে তার আবাহন;
চন্দ্রিকা ছিটায়ে দিল চন্দনের শুভ্র আলিম্পন,
ফিরিল বলাকা শ্রেণী মুক্ত পক্ষে দীর্ঘ পরবাস করিয়া যাপন,
দেখিতে দেখিতে সে শরৎ গেল চলে,
আসিল হেমন্ত এল শীত কুসুমের সৌরভেরে পায়ে পায়ে দলে,
জীবনের পথটুকু মোর ক্ষীণ হয়ে এল পলে পলে,
তবু তুমি ফিরে আর আসিলেনা হায়!
উন্মদ হিয়ায়
কেমনে রাখিব চাপি প্রিয় হারা দুরন্ত নিশায়।

শ্রীভুবন চন্দ্র কাব্যতীর্থ।

ভয়, ব্যাধি ও মৃত্যু।

যে শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ঘটিলে, এই ত্রিবিধ শক্তিরও বিকাশ সাধিত হয় না। যদিও এই শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত জড়িত নয়, বা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহা হইলেও তাহাদিগকেও পরস্পরের সহকারিতায় কার্য্য করিতে, বা একটীকে অন্যের জন্য কার্য্য করিতে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের সকলগুলির একযোগে বিকাশের সাহায্য করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন যে মনের সুস্থ অবস্থা শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করে; সুতরাং মনের সুস্থ অবস্থা দৈহিক নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার বা দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। মানব যেমন চিন্তা করে সে তেমনিই গঠিত হয়—এই ধ্রুব সত্য আমাদের আর্য্য ঋষিগণ উপনিষদাবলীতে ও মহাত্মা বুদ্ধদেব "ধর্ম্মপাদ" নামক গ্রন্থে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং সুস্থ মনই যখন সুস্থ দেহ গঠন করে, তখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে সুস্থ মন গঠিত হইতে পারে?

সাধারণতঃ বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, দৈহিক খাদ্য দ্বারা যেমন স্থূল দেহ গঠিত ও পুষ্ট হয়, সেইরূপ মানসিক খাদ্য দ্বারাও মন প্রধানতঃ গঠিত ও পুষ্ট হয়। কাজেই যে পদ্ধতিতে সুস্থ দেহ গঠন করিতে পারা যায় ও তাহা যেমন সম্ভবপর, ঠিক সেই পদ্ধতিতে মনও গঠিত ও পুষ্ট করা যাইতে পারে ও তাহাও তেমনি সম্ভবপর।

যদি কেহ স্বাস্থ্য ও সত্য বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ, উচ্চ ও শুভ চিন্তার অনুশীলন না করিয়া, তাহার মনকে অসত্য, মিথ্যা, অপবিত্র ও হিংসাপূর্ণ, নীচ ও অশুভ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করে (এবং এইরূপ করিবার জন্য অবশ্য সে সম্পূর্ণ স্বাধীন) তাহা হইলে সে সত্বর মানসিক রোগ গ্রস্ত হইবে ও তৎসাদৃশ্যরূপে দৈহিক পীড়িতও হইবে। কোন ব্যক্তি হয়ত খুব সৎ, বিশুদ্ধ পুণ্যশীল, কিন্তু তাহার মনোমধ্যে অসুস্থ মনের উপাদান থাকিতে পারে। উদ্বেগ তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রবল হানিকারক ও দেহের স্নায়ু, ইন্দ্রিয় ও তন্তু (tissue) সকলকে একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে বিশ্রামের জন্য রাত্রিকালে যখন শয্যায় গমন করা যায়, তখন জীবনের নানাপ্রকার দুরূহ সমস্যাগুলি মনোমধ্যে আন্দোলন করিলে তাহা স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাহারও প্রতি হিংসা ও দ্বেষ পোষণ, ক্রোধাদি রিপুর আশ্রয়, মিথ্যা ও কাল্পনিক অন্যায়ের আলোড়ন—এ সকলই আমাদের মানসিক ও তৎসহ দৈহিক স্বাস্থ্যহানির কারণ। ভয়, ক্রোধ, হিংসা মানবের ধ্বংস কারক, আর সাহস, প্রেম ও সহানুভূতি মানবের গঠন কারক। (১)

ক্রোধ, হিংসাদি কু ভাবাদির অনিষ্টকারিতা পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক এমার গেট্‌স্ (Prof Elmer Gates) এক স্থলে বলিয়াছেন:—

"অপ্রীতিকর ও কু ভাবগুলি শরীর মধ্যে এমন অনিষ্টকারক পদার্থ সৃজন করে, যাহা শরীরের পক্ষে হানিজনক। আবার প্রীতিকর ও সুভাব গুলি শরীরের মধ্যে হিতকর পদার্থ উৎপন্ন করিয়া তাহার হিত সাধন

(১) কিরূপে প্রথমোক্ত গুলি মানবের অনিষ্ট কারক ও শেষোক্ত গুলি স্বাস্থ্য বর্দ্ধক, কৌতূহলী পাঠককে তৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

করে। প্রত্যেক মানবের ঘর্ম আদি দেহ বিনিঃসৃত স্রাব পরীক্ষা করিলে, তাহা ধরিতে পারা যায়। আমি এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক কুভাব দ্বারা দৈহিক তন্তু মধ্যে তৎ সাদৃশ্যভাবে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাহা জীবনী শক্তি নাশক ও বিষাক্ত। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সুভাব দৈহিক তন্তুয় এমন পরিবর্ত্তন সাধন করে যাহা জীবনী শক্তি বর্দ্ধক। প্রত্যেক সৎ কর্ম্ম ("কর্ম্ম" বলিলে এ স্থলে মনোভাবকেও বুঝিতে হইবে) তাহার কর্ত্তাকেও যাহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহারো—উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করে। প্রত্যেক মনোভাব মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে খোদিত হয় ও তৎসহ কোষাণু সকলের (cell) পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন কম বেশী দৈহিক পরিবর্ত্তন। ক্রুদ্ধা মাতার দুগ্ধ পান করিয়া সন্তান পীড়িত এমন কি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, চিকিৎকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। কারণ ঐ দুগ্ধ মাতার ক্রোধ হেতু বিষাক্ত হইয়াছিল।

যে সকল উপাদান মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মানসিক কষ্ট ও দৈহিক অস্বাস্থ্য আনয়ন করে, ভয় তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। অত্যধিক ভয় প্রাপ্তি মাত্র মানুষের পীড়া হয়, এমন কি অনেক লোক সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এমন উদাহরণ ও নিতান্ত বিরল নহে। সে সব অত্যধিক ভয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পীড়ার ভয়, পীড়া আক্রমণের ভয়, মৃত্যুর ভয়, চাকরীর ভয়, গ্রাসাচ্ছাদনের ভয়, ভবিষ্যতের ভয়, অভাবের ভয়, লোক নিন্দার ভয়—এই সকল ভয়ও জীবনীশক্তিকে অবনমিত করিয়া মানবকে অপটু করে ও তাহার ব্যাধিপ্রতিষেধক ক্ষমতার হ্রাস করিয়া কঠিন পীড়াক্রান্ত করে বা তাহাকে সম্পূর্ণ ভগ্ন-স্বাস্থ্য করে। ভয় প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুতগামী করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করে। তখন হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া আক্ষেপিক সঞ্চালনে পরিণত হয়, পাকস্থলীর ঊর্দ্ধ প্রদেশে (epigastric) একটা স্নায়বীয় কম্পন (thrill) উপস্থিত হয়, ডায়েফ্রাম (diaphragm) পেশীর সংকোচন শক্তি ও শিথিল হইয়া যায়। কাজেই শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি-বন্ধকতা ঘটে, রক্তের স্বাভাবিক গতি বিপরীতাভিমুখী হয় ইহাই ভয়ের সদ্যঃ (direct) ফল। তার পর এই ভয় যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে, তাহা হইলে সেই অনুপাতে দেহের পীড়া উৎপন্ন হইবে। দুঃখ, অবসাদ, বিমর্ষতা, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, হতাশ—এ সকলের প্রত্যেকটী এক একটী বিশেষ বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু ভয় তাহাদের মধ্যে প্রধান।

পীড়ার ভয় থাকিলে, যে পীড়ার জন্য ভয় করা যায়, তাহার চিন্তা স্বতঃই মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবল ভাবে উদিত হইতে থাকে, নানাবিধ কাল্পনিক পীড়ারও অনুভূতি হয়। ঔষধ আবিষ্কারকগণের সর্ব্বব্যাধিহর অমোঘ শক্তি-শালী কোন ঔষধের উদ্দীপনাকারী কোন বিজ্ঞাপন পত্র পাঠ করিয়া বা কোন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে স্বাস্থ্য গঠনের নূতন পদ্ধতি পাঠ করিয়া অনেক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ বিজ্ঞাপনের লিখিত, সমস্ত পীড়া না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি পীড়া তাহার হইয়াছে, বা পূর্ব্বে হইয়াছিল ও পুনরায় ভবিষ্যতে হইতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে মাংসপেশীর প্রত্যেক সংকোচনে, উদর-ফুসফুস-যকৃতাদি যন্ত্রের সামান্যমাত্র অস্বচ্ছন্দতায় সে আসন্ন পীড়ার আক্রমণ মনে করে। তখন সে ভীত হইয়া রোগ মুক্তির জন্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়ে ও নানা প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। দিনের মধ্যে দুইটী প্রধান আহার করিবে, কি চারি পাঁচটী সামান্য সামান্য আহার করিবে; আহারীয় দ্রব্য তরল হইবে, কি কঠিন হইবে; ভাত খাইবে, কি রুটী লুচি খাইবে; তাহার পক্ষে কতখানি প্রটিড্ ও কত খানি ফ্যাট্ আবশ্যক—ইত্যাদি চিন্তায় ব্যস্ত হয়, আহারের দোষগুণ লইয়া সমালোচনা করে, পারিবারিক জীবনকে উদ্বিগ্ন করে ও অপরের গলগ্রহ হইয়া পড়ে।

পীড়ার বিশেষতঃ সংক্রামক পীড়ার ভয় করিলে যে, অনেক সময় সেই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়—তাহা চিকিৎসকগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কাইরো নগরে যখন প্লেগ ভীষণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল,

তখন একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত পর্য্যটক তথাকার একজন ঐ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট একজন পীড়াভীত হতভাগ্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যে মুহূর্ত্তে হতভাগ্যের মনে ঐ পীড়ার ভয় জন্মিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনের শান্তি চলিয়া গিয়াছিল। পীড়িত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া পাছে সে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে, সেই ভাবনায় সে কাতর হইয়া পড়িল। সে প্লেগের লক্ষণগুলি এত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণে করিতে লাগিল যে, সেই লক্ষণগুলি একে একে তাহার নিকট আসিতে লাগিল। শুষ্ক মুখ প্লেগের একটী লক্ষণ—তাহার মুখ শুষ্ক হইল। মস্তিষ্কের স্পন্দন প্লেগের একটী লক্ষণ—তাহার মস্তিষ্কের স্পন্দন অনুভূত হইল। বেগবান নাড়ী প্লেগের একটী লক্ষণ—সে নিজেই নাড়ী (অন্যকে নাড়ী দেখাইতে সে সাহস করে না, কারণ সে পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া পাছে সে তাহাকে ত্যাগ করে) নাড়ী বেগবান বুঝিতে পারিল। সমস্ত লক্ষণগুলির একে একে উদয় হইল। এইরূপে প্লেগের কার্য্য সে নিজেই করিয়াছিল ও যখন মৃত্যুর দূত তাহার নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহার এই সুপ্রারব্ধ কর্ম্মের আর যে টুকু বাকী ছিল, তাহা শেষ করিয়াছিল।" অবশ্য যদিও সকল পীড়াভীত ব্যক্তিই পীড়াক্রান্ত হয় না, তথাপি ভয় পীড়া আক্রমণের ও বৃদ্ধির সহায়ক। "London Medical Times" নামক পত্রে একবার বাহির হইয়াছিল, "এক সময় রুসিয়া দেশে কলেরার খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তথাকার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত চারি জন অপরাধীকে কলেরা রোগে সদ্য মৃত চারিজনের শয্যা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ শয্যাগুলি যে মৃত কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত, তাহা তাহারা জানিত না। কিন্তু তাহাদের কাহারও ঐ পীড়া হইল না। তাহার পর তাহাদিগকে আর চারিটী সম্পূর্ণ নূতন ও অব্যবহৃত শয্যা দিয়া বলা হইল যে, ঐ শয্যাগুলি মৃত কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা চারিজনেই কলেরা আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" অবশ্য যদিও সকল সময় সকল পীড়াভীত ব্যক্তিই পীড়াক্রান্ত হয়, তাহা নহে, ভয় অনেক সময় পীড়া আনয়ন করে। ভয় পরিহার করিয়া সাহস ও ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় নিজের শরীরকে যে অনেক সময় সুস্থ রাখিতে পারা যায়, সংক্রামক পীড়ার হাত হইতে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়, এরূপ ঘটনা চিকিৎসা জগতে বিরল নহে। তবে ইহার এরূপ অর্থ নয় যে, স্বাভাবিক কারণে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কেবল সাহস ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সাহস ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া এইটুকু যে, ভয়াতুর হইলে স্বতঃই যেখানে পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সাহস ও ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিলে ততটা ভয় থাকে না। সাহস ও ইচ্ছাশক্তির রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অনেকটা আছে।

রোগ-বীজাণু (germ) ভয়ের একটী প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বীজাণুবাদ (germ-theory) আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বীজাণুই পীড়ার একমাত্র কারণ; দেহ মধ্যে বীজাণু একবার প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই। তাই আমরা আজকাল আত্মরক্ষার জন্য সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে গমন করিতে চাই না ও এমন কি গলক্ষত, সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট গমন করিতে হইলে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ক্রটী করি না। কিন্তু এই সকল রোগ-বীজাণু কোথায় নাই? তাহারা আমাদের আশে পাশে অবস্থিত। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে তাহারা আছে, যে জলপান করি, তাহার মধ্যে আছে, যে বায়ু নাসিকা দ্বারা অনবরত গ্রহণ করিতেছি, তাহার মধ্যে তাহারা আছে। আমরা তাহাদিগকে না চাহিলেও তাহারা আমাদিগকে ছাড়ে না। তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই—নানা প্রকারে তাহারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু সকলেই সকল সময় পীড়ায় আক্রান্ত হয় না কেন? বীজাণুই যে পীড়ার কারণ নহে, তৎসম্বন্ধে স্যার আমরথ রাইট বলিয়াছেন, প্রত্যেক রোগই যে বীজাণু বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া

থাকে, এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণরূপে অলীক (১)। বীজাণু-তত্ত্ববিৎগণ বলিয়াছেন যে, শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকিলে, রক্ত বেশ বিশুদ্ধ ও সতেজ থাকিলে, বীজাণুগণ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াও কিছু করিতে পারে না—জীবনীশক্তির নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। এ তথ্যটী আমরা কিন্তু সকলে জ্ঞাত নই। একজন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "যদিও বীজাণু-তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন যে, দেহের সুস্থ অবস্থা বীজাণুকে বাধা দিতে সক্ষম, কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টী তাঁহাদের ভাবী শিষ্যগণ সকল সময় অবগত নহেন।"(২) এমন কি কলেরা প্রভৃতি গুরুতর পীড়ার বীজাণু সুস্থ দেহীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও নষ্ট হইয়া যায়। তৎ সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "যেমন, কোন সুস্থদেহী কলেরা বীজাণু (জীবন্ত) ধ্বংস করিতে সক্ষম (৩)।" পাকস্থলীর স্বাভাবিক হাইড্রোক্লোরিক এসিডে সকল বীজাণু নষ্ট হইয়া যায় (৪)। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, মন ভয় চিন্তাদি বর্জ্জিত হইলে, সুপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর আহার করিলে, পাকস্থলী হইতে স্বাভাবিক ও যথোপযোগী হাইড্রোক্লোরিক এসিড ক্ষরিত হয়। কিন্তু শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইলে, অস্বাস্থ্যকর আহারাদি করিলে, মনে ভয় চিন্তাদি থাকিলে (ভয় আদি সমস্ত মনোভাবই অন্তাক্ত পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে law of co-relation রসাদি নিঃসরণকারী যন্ত্রের উপর কার্য্য করে) পাকস্থলী হইতে স্বাভাবিক ও যথা পরিমাণে উক্ত এসিড নিঃসৃত হয় না। এই এসিড স্বাভাবিক না হইলে, তাহা প্রবিষ্ট বীজাণু নষ্ট করিতে পারে না। আর যথা পরিমাণে বহির্গত না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের ক্রমিক পচন জন্য শরীর মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়, তৎসহ শরীর পীড়িত ও রক্ত অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই বীজাণুগণ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ আনয়ন করিবার বেশ সুবিধা পায়। এক হিসাবে ধরিতে গেলে, আমরা রোগ বীজাণুকে দেহ মধ্যে আহ্বান করি। প্রকৃতির নিয়মই হইতেছে, যেখানে কোন দূষিত আবর্জ্জনা বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ পতিত হয়, তথায় কি জানি কেমন অলক্ষিতে নানা প্রকার প্রাণী যাইয়া তাহা ভক্ষণ করে। কাজেই দেহ মধ্যে নিজেদের আহার বিহারের ত্রুটী বশতঃ শরীর মধ্যে আবর্জ্জনা জন্মিলে, রোগ বীজাণু স্বতঃই প্রবেশ করিয়া তাহার স্বীয় কার্য্য সাধন করে। যদি কতকগুলি ব্যাধি বীজাণু দ্বারা উৎপন্ন ও বর্দ্ধিতই হয়, তাহা হইলে বীজাণুকে ব্যাধির বীজ বলিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত মৃত্তিকা ব্যতীত বীজ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অস্বাস্থ্যকর আহার বিহার দ্বারা দেহ মধ্যে স্বতঃই এইরূপ মৃত্তিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে জন্য ব্যাধি ও ব্যাধি বীজাণুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আমাদের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে, পাকস্থলী হইতে যাহাতে স্বাভাবিক ও উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রস ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড বহির্গত হয়, তাহা করিতে হইবে। এতদর্থে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে, সুপাচ্য পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে হইবে, মানসিক কুভাবগুলি পরিহার করিতে হইবে। এই শেষোক্ত উপায়গুলি বসন্তের আক্রমণ হইতেও রক্ষা করে, যদিও টীকাই তাহার একমাত্র প্রতিবেধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব পুস্তকপ্রণেতা বলিয়া-

(১) ১৯২৩।১০ই মার্চ্চ তারিখের বঙ্গবাণী" দ্রষ্টব্য।

(২) And although bacteriologists know that a healthy state will resist germs, this important point is not always included in the knowledge of their would-be followers" —Health Physical and Mental by C. W. Johnson. Page 48.

(৩) "In the case of cholera, for instance, the body of any healthy animal is able to kill and dissolve living cholera germs"—Ibid-p. 57.

(৪) "Healthy gastric juice destroys germs"—I bid P. 5.

ছেন, "যদিও বসন্তের চিকিৎসায় অনেক কৃতকার্য্যতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও মনের স্বভাব ও স্বাস্থ্যোন্নতির ফলকে একবারে অস্বীকার করিয়া টীকাকেই তাহার একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে না (১)।" পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, অনেক সময় বিশেষতঃ মনের কোন ভয় না থাকিলে পীড়াগ্রস্ত হইতে হয় না (২)। এমন কি মানসিক কারণকেই পীড়ার কারণ বলিয়া হুইপল্ বলিয়াছেন (৩)।

আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম জানি না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্যবিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিলে, বীজাণু দ্বারাই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক পীড়ার সঞ্চার হয়। তখনই আমরা বলিয়া উঠি, "কেন পীড়া হইল?" বা "হঠাৎ পীড়া হইল।" কিন্তু জগতে বিনা কারণে কিছু হয় না, বা "হঠাৎ" বলিয়া জগতে কিছু নাই। সকলই কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। আজ যিনি যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, হয়ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বের এক রাত্রির জাগরণ। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ জন্য হঠাৎ যিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন, তাহার কারণ হয়ত যৌবন কালের যথেচ্ছচারিতা। সুতরাং কোন পীড়া বিনা কারণে বা হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পীড়া মাত্রই আমাদের বাঞ্ছনীয় বা প্রীতিকর না হইলেও, তাহা আমাদের হিতকর। কেননা, অস্বাস্থ্যকর আহার বিহার দ্বারা দেহ মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে, শারীরিক যন্ত্রাদির তন্তুগুলা ক্ষয় বা বিকৃতি হইলে, প্রকৃতি দেহ হইতে সেই দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিতে, শারীরিক যন্ত্রাদির ক্ষয় পূরণ করিতে চেষ্টা করেন। সেই দূষিত পদার্থ বহির্গত হইবার কালে আমাদের দেহ মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় ও তৎসহ আমরা যে যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ পীড়া বলিয়া থাকি। ঐ দূষিত পদার্থ যদি আমাদের দেহ মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দেহ ধারণ করা অসম্ভব হইত। যখনই ঐ প্রকার দূষিত পদার্থ দেহ যন্ত্রে সঞ্চিত হইয়া কল কব্জা বন্ধ করিবার উপক্রম করে, তখনই কোন না কোন ব্যাধি আগমন করিয়া তাহা দূর করিয়া দিয়া দেহ যন্ত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়।

এইরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা প্রকৃতির অনুসরণ করিলে সত্বর সুন্দর ফল পাওয়া যায়। পীড়া কালে কোন ঔষধ সেবন না করিয়া যথোপযুক্ত উপবাস, যথেষ্ট জলপান, মুক্ত বায়ু সেবন, পরিমিত পরিশ্রম, স্নান, অঙ্গমর্দ্দনাদি করিলে আরোগ্য লাভ করিতে কখনও কখনও দেরী হইতে পারে সত্য, এমন কি রোগীও নিতান্ত শীর্ণকায় হইয়া পড়িতে পারেন সত্য, কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক চিকিৎসা দ্বারা তাহার দেহ ও মন এমন পরিশুদ্ধ হইবে, দৈহিক ক্ষয় এমন ভাবে পূর্ণ হইবে যে, পরিণামে কোন কুফল বা অবসাদ আসিবে না। প্রকৃতির আরোগ্য সাধনের কতকগুলি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ঔষধাদি সেবন করিয়া জ্বরের বেগ হ্রাস করিতে, দৈহিক স্রাব বন্ধ করিতে, দেহমধ্যস্থ রোগ বীজাণু ধ্বংস করিতে আমরা যতই চেষ্টা করি, ততই আমরা তাঁহার আরোগ্যসাধন কার্য্যে বাধা উৎপাদন করি। অবশ্য এমন ভাবে অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, পীড়িত ব্যক্তি যে আরোগ্য লাভ করে না তাহা নহে; কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসা করিলে যেমন নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য লাভ করে, ইহাতে তেমন হয়

(১) Although the treatment of Small-pox has met with much apparent success, this cannot all be attributed to vaccination, wholly ignoring effects of mental expectation, and hygienic improvements—Ibid-55.

(২) As mentioned above experience proves that when exposed to infection from germ diseases, more people remain well than become sick, especially when free from fear—Ibid-p. 49.

(৩) Where no mental action exists, no disease can take root.

না। কোন গুরুতর পীড়া ভোগের পর শরীর মধ্যে একটা না একটা গলদ রহিয়া যায়, তাহা বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। যেমন আরক্ত জ্বরের পর শ্রবণ শক্তির হীনতা, পরিপাক যন্ত্রের পীড়া ভোগের পর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, ইত্যাদি। এই সমস্ত পরবর্ত্তী পীড়ার জন্য যে মূলপীড়া দায়ী, তাহা নহে; পরন্তু সেই পীড়ার জন্য যে চিকিৎসা চলিয়াছিল, সেই চিকিৎসাই দায়ী।

সাধারণতঃ সকল ঔষধই শরীরের (এমন কি আমাদের সূক্ষ্ম শরীর গুলিরও) অনিষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা পরিহার করাই মঙ্গল। অবশ্য এমন সামান্য কয়েকটা পীড়া আছে, যেখানে সামান্য ঔষধ গ্রহণের আবশ্যকতা হইতে পারে, কিন্তু তেমন পীড়া খুবই কম ও তেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও অভাব। প্রকৃতির উপর বিশ্বাস নির্ভর করিয়া থাকিলে, অনেক সময় শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে একটা রোগের অসংখ্য রকম ঔষধ ত জগতে দেখা যাইতেছে। একটা ঔষধে উপকার না হইলে আর একটা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে উপকার না হইলে আর একটা নূতন ঔষধ বাহির হইতেছে। নূতন নূতন রোগে ও নূতন নূতন চিকিৎসা প্রণালীতে জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। নিত্য নূতন নূতন "প্যাথ", নূতন নূতন "পিবাপি" সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু পীড়ার ত নিবৃত্তি হইতেছে না। ঔষধের অপকারিতা ও পীড়ার বৃদ্ধি সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে সম্পূর্ণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধটী অনাবশ্যক অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সে জন্য এ স্থলে কয়েক জন চিকিৎসকের মতের অনুবাদ উদ্ধৃত করিব। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবারনিথি বলিয়াছেন, "ইদানীং চিকিৎসকের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোগের সংখ্যাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং চিকিৎসকের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই উত্তম, সাধারণ লোকের এ ধারণাটী ভুল"।(১) অধ্যাপক ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন, "উপকার করিবার আগ্রহাতিশয্য দেখাইতে গিয়া চিকিৎসকগণই রোগীর বিশেষ অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছে, হাজার হাজার লোককে তাহারা অকালে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে, সেই সকল লোক প্রাকৃতির উপর নির্ভর করিলে বাঁচিত"।(২) অধ্যাপক ডাক্তার পার্কার বলিয়াছেন, "প্রকৃতির উপর যত অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ও ঔষধের উপর যত কম নির্ভর করিবে, মৃত্যু হার ততই কমিবে"।(৩) ডাক্তার গুড বলিয়াছেন, "মানবের দেহের উপর ঔষধের কার্য্য খুবই অনিশ্চিত, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা ঔষধের দ্বারা মৃত্যু সংখ্যা অনেক বেশী।"(৪) অধ্যাপক ডাক্তার কারথন বলিয়াছেন, "ব্যবহার শাস্ত্রে যেমন অনিশ্চয়তা, চিকিৎসা ব্যাপারেও ঠিক সেইরূপ অনিশ্চয়তা বিদ্যমান; রোগী ঔষধের গুণে আরোগ্য হয়, কিংবা প্রকৃতির গুণে আরোগ্য হয়, তাহা আমরা জানি না।" শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ও অধ্যাপক মেজেণ্ডি বলিয়াছেন, চিকিৎসা ব্যাপারকে লোকে বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া থাকেন। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে উহাতে বিজ্ঞানের কিছুই

---

(1) Doctor Abernethy... ... ... did ont seem to favor the idea of "the more medical men the better." "There has been" he said, "a great increase of medical men of late years, but upon my life, diseases have increased in proportion."

(2) "In their zeal to do good, physiians have done much harm. They have hurried thousands to the grave who wonld have recovered, if left to Nature."

(3) As we place more confidence in Nature and less in the preparations of the apothecary mortality diminishes.

(4) The work of medicine on human body is to the highest degre uncertain except indeed that they have destroyed more lives than war, pestilence and famine combined"

নাই। ওটা একটা প্রকাণ্ড হাবড়াহাটী! চিকিৎসকগণ অধিকাংশ স্থলে হয় অজহাতুড়ে, না-হয় শুধু জ্ঞানান্বেষী পরীক্ষক মাত্র। সাধারণ মানুষ যেমন মূর্খ, আমরাও ঠিক সেইরূপ মূর্খ। ঔষধ বিষয়ে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি কি পরিমাণ অবগত আছেন? আমি স্পষ্টই বলিতেছি যে, ঔষধ তত্ত্বের আমি কিছুই জানি না এবং এমন কোন ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় নাই যিনি তদ্বিষয়ে কিছু জ্ঞাত আছেন, প্রকৃতিই যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য করে, মানসিক শক্তি ও অনেকটা করিয়া থাকে; চিকিৎসক প্রায় কিছুই করেন না, করিলে, অনিষ্টই করিয়া থাকেন। অনেকগুলা ঔষধ না গিলিলে রোগীদের পছন্দই হয় না, এসব মানুষের বোকামি!"(১) স্যার আমরথ রাইটও সে দিন বলিয়াছেন, "অধুনাতন কালে যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা কার্য্য চলিতেছে, তাহা সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক। এখন আমরা রোগের স্বভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। পুরাতন প্রথায় অস্ত্রোপচার হয়ত পনের দিনেই সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু লিষ্টার প্রণালীর অস্ত্রোপচার কোন কালেই আরাম হইবার নয়।"

(১) I know medicine is called a Seience. It is nothing like a Seience. It is a great humbng. Doctors are great empirics when they are not charlatans. We are as ignorant as men can be. Who knows anything in the world about medicine. Gentlemen, you have done me the honor to come here to attend my lectures, and I must tell you frankly in the begining, that I know nothing about medicine nor do I know anyone who knows any-thing about it. Naturė does a great deal, doctors do devilish little when they don't do harm. Sick people always feel they are neglected unless they are well drugged the fools."

(২) বাহুল্য বোধে আর উদ্ধৃত করা হইল না। চিকিৎসা কার্য্যে যিনি যতদিন নিযুক্ত আছেন ও যিনি যত বেশী দিন নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া ঔষধাদি সেবন করিয়াও আরোগ্য লাভে অসমর্থ হইয়াছেন, ঔষধের উপর তাঁহার তত কম বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও প্রকৃতির আরোগ্যকারিণী শক্তির উপর ও মানসিক স্বাস্থ্যনীতির উপর তিনি তত বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন।

ঔষধে যে ফল পাওয়া যায়, তাহার কারণ দুইটী একটী আরোগ্য হইবার ইচ্ছা, আর অপরটী ঔষধের প্রতি বিশ্বাস। আরোগ্য লাভের পক্ষে এই দুইটী বিশেষ আবশ্যক। ডাক্তার ওসলার বলিয়াছেন "ঔষধ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হইতেছে চিকিৎসককে তাঁহার ঔষধে ও তাঁহার চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাস।" প্রকৃতির প্রদর্শিত পথ সে যত অনুসরণ করিতে পারিবে ও নিজের আহার বিহারের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে পারিবে, সে ততই বুঝিবে যে, ঔষধ কোন কাজের নয়, বরং বিশেষ অনিষ্টকারী। যতদিন জীবনীশক্তি বেশ সতেজ থাকে, ততদিন ঔষধের অনিষ্টকারীতা বুঝা যায় না, কিন্তু জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলে, ঔষধের অনিষ্টকারীতা বুঝা যায় ইহা পুরাতন রোগীগণ স্বীকার করিয়াছেন।

পুনশ্চ ডাক্তার ফোর্থ (Forth) বলিয়াছেন, "It can not be demed that the present system of medicine is a burming shame to its professors, if indeed a series of vague and uncertain incongruities deserves do good? How often do they make our patients really worse? I fearlessly assert that in most cases the sufference would be safer without a physician than with one. I have seen enough of mal-practice of my professional brethren to warrant strong language I employ,—I bid P. 34.

(২) "বঙ্গবাসী" ১৯২৩।১০ মার্চ্চ

রোগ হইলে চিকিৎসক ও ঔষধাদির দিকে না তাকাইয়া, গ্রহ-শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির চেষ্টা না করিয়া শরীর ও মনকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। মনকে সর্ব্বদা স্থির ও পবিত্র রাখিতে হইবে। যে সকল পীড়ায় অস্ত্র চিকিৎসা আবশুক, তাহার আরোগ্য সাধনে মনের প্রভাব বড় কম নহে। হুইপল বলিয়াছেন, "ভয়, উদ্বেগ, দুঃখ আদি মানসিক কুভাব দূর করিতে পারিলে, অস্ত্র চিকিৎসাতেও বেশ ফল পাওয়া যায়। মনের স্থায্য ভাবে অস্থি সকল সত্বর দৃঢ়ভাবে সংযোজিত হয়, মাংস শীঘ্র উৎপন্ন হয়, ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়; জ্বর প্রশমিত হয় ও পূযস্রাব নিবারিত হয়, ইত্যাদি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কি স্বাস্থ্যে, কি পীড়ায় মনের প্রভাব খুব বেশী। উভয় অবস্থায়ই আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধিই পালন করিতে হইবে। শারীরিক বিধিগুলি যথেষ্ট নয়, কারণ নির্দ্দোষ পানীয় বিষ বিশ্বাসে পান করিলে মৃত্যু হইতে পারে, আবার মানসিকগুলিও একা যথেষ্ট নয়, কারণ বিষ নির্দ্দোষ পানীয় জ্ঞানে সেবন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।

অনেকে দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "ব্যারামের জন্য এত চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সারিল না।" অবশ্য সে স্থলে রোগ দমনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই চেষ্টার সহিত ঔষধরূপী কতকগুলি বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আরও অবস্থা খারাপ করা হইয়াছে।

পীড়া হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা পীড়া যাহাতে না হয় তাহা করাই যুক্তি সঙ্গত। আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য-বিধি জানিনা বলিয়া পীড়াভোগ করি। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, যখন মানবকে আর পীড়া ভোগ করিতে হইবে না, তখন সকলেই স্বাস্থ্যবিধি জ্ঞাত হইবে। প্রত্যেককে স্ব স্ব শরীর বিবেচনা করিয়া আহার বিহার করিতে হইবে। পথ্যাপথ্য নিজেকেই অবস্থা বুঝিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। পীড়া হইলে পথ্যের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভুল ধারণা। প্রত্যেকেই নিজের চিকিৎসক। চিকিৎসক তোমার অবস্থা শুনিয়া তাঁহাদের কেতাবে লিখিত কতকগুলি পথ্য বলিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা তোমার উপযোগী কিনা তাহা তিনি ঠিক বলিয়া দিতে পারেন না। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি নিজের শরীরের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারেন। পীড়াকালে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই (instinct) আমাদের খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যদি আমাদের ক্ষুধা বিকৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের শরীর কি চায় তাহা ক্ষুধাই বলিয়া দেয়। যদি আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সুশিক্ষিত ও বিশ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সেইই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক ও তাহার "প্রেসক্রপসনের" উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি। অধিকাংশ পীড়ায় আমাদের শরীরের কোন না কোন উপাদানের অভাব হয়। সেই জন্য পীড়িত যন্ত্র বা যন্ত্র সকলের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিক্রাত ঘটে। সেই উপাদানের পূরণ করাই সুবিবেচিত ঔষধ প্রয়োগ ও পথ্য নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য—তা, সেই উপাদান ফসফরস হউক, আইওডিন হউক, অথবা অম্ল বা ক্ষার ঘটিত কোন জিনিস হউক। যে 'প্রেসক্রপসন' ইহা করিতে না পারে, তাহা, একবারে অনিষ্টকারী না হইলেও অকৃতকার্য্য হইবে। শতকরা নব্বই স্থলে রোগীর মনই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পথ্য নির্ব্বাচনের প্রদর্শক। শরীর মধ্যে কোন উপাদানের অভাব হইলে, রোগী স্বভাবতঃ এমন দ্রব্য বা পথ্য আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাতে সেই উপাদানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। কলেরা রোগে দেহমধ্যে জলীয় দ্রব্যের অভাব বশতঃ অত্যধিক তৃষ্ণা হয় ও সে জন্য আজকাল চিকিৎসকগণ তাহাকে যথেষ্ট জলপান করিতে দিয়া থাকেন। আবার শরীর মধ্যে কোন উপাদানের আধিক্য হইলে, রোগী এমন দ্রব্য ও পথ্য আহারে আগ্রহাতিশয় হইবে, যাহাতে সেই উপাদানের আধিক্য কমাইয়া সাম্যাবস্থা আনয়ন করিবে। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতিতে ক্ষারাধিক্য পিত্ত সঞ্চিত হয় বলিয়া রোগী ক্ষারাধিক্য নষ্টকারী অম্ল দ্রব্য সেবন করিতে ইচ্ছা করে। পাকস্থলী মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অভাব হইলে, রোগীর (ঐ এসিডের উপাদান) লবণ খাইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী

হয়। আবার ক্ষার উপাদানের আধিক্য হইলে, নেবু আদি অম্ল রস বিশিষ্ট পদার্থ, ঘোল খাইবার বাসনা হয়। মোট কথা পীড়া হইলে মন সমবেদন স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic System) দ্বারা এমন পথ্যের নির্দ্দেশ করে, যাহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাদান গুলির সাম্যাবস্থা আনয়ন করে। হায় যদি আমরা সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আমরাই আমাদের স্বাস্থ্যের পরিচালক ও চিকিৎসক হইতাম।

ঔষধের অপকারিতা বুঝিয়া আজকাল পাশ্চাত্য জগতে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা :—Fruit cure (ফল খাইয়া রোগ ভাল করা,) Grape cure (কেবল আঙ্গুর খাইয়া রোগ ভাল করা,) Diet cure (কেবল সুপথ্য খাইয়া রোগ আরাম করা,) Water cure (কবল জলের নানাবিধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ ভাল করা,) Fasting cure (কেবল উপযুক্ত উপবাস দ্বারা রোগ সারাণ,) Open air treatment (উন্মুক্ত বায়ু সেবন দ্বারা রোগ আরাম করা,) Sun bath (আতপ স্নান) ইত্যাদি ইত্যাদি।

যান্ত্রিক পীড়ার (Organic) কথা ছাড়িয়া দিলেও স্নায়বীয় পীড়া (Nervous disease) মানসিক এবং ইহা কেবল মনের দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে (১) কিন্তু যান্ত্রিক পীড়া অপেক্ষা স্নায়বীয় পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি বেশী যাতনা ভোগ করে। তথাপি স্নায়বীয় পীড়া মাত্রই বাস্তব, কারণ ইহা মানসিক। সে জন্য ভৌতিক ঔষধ দ্বারা ইহা আরোগ্য হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তি কোন না কোন প্রকার স্নায়বীয় পীড়াগ্রস্ত। স্নায়বীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির যন্ত্রণা বাস্তবিক যে খুব বেশী, তাহা নহে। তাহার যন্ত্রণা খুব সামান্য, কিন্তু সে সাতিশয় তীক্ষ্ণতর অনুভূতিপরায়ণ (Sensitive) বলিয়া সামান্য যন্ত্রণাকে বেশী মনে করে ও লোকের নিকট তাহা অসহ্য বলিয়া প্রকাশ করে। পীড়িত অঙ্গের প্রতি সে যতই মনসংযোগ করে, ততই তাহার যন্ত্রণা বেশী বোধ হইতে থাকে। পীড়ার কাল্পনিক ভয় (morbid fear), পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণগুলির পর্য্যবেক্ষণের প্রবৃত্তি, অনুভূতির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা—এই গুলি তাহার বিদ্যমান পীড়িত অঙ্গের প্রতি যতই মনঃসংযোগ করা যায়, ততই যন্ত্রণা বেশী বোধ হইবার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্বাস প্রশ্বাস, পরিপাক আদি :স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্যাবলী আমাদের ইচ্ছার অনধীন। আমরা ইচ্ছা করি, আর নাই করি, আমাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের কার্য্য অনবরত চলিতেছে। সাধারণতঃ আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে কোন কষ্ট বোধ করি, না, কিন্তু যখনই আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি মন, সংযোগ করি, তখন আমরা কেমন একটা কষ্ট বোধ করি। পীড়িত অঙ্গের প্রতি মনঃ সংযোগ করিলে, এইরূপেই কষ্ট বেশী বোধ হয়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির পরিচালন করিয়া মনকে অন্য বিষয়ে আনয়ন করিতে পারিলে, পীড়িত অঙ্গের কষ্ট আর অনুভূত হয় না। স্নায়বীয় পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির এই কথাগুলি জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধের কলেবর অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এ স্থলে মৃত্যু সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা মনে করি ব্যাধি বশতঃই মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। মৃত্যু ব্যাধির পরিণাম নহে—জীবনীশক্তির অভাবেই মৃত্যু ঘটে। প্রাকৃতির স্বাস্থ্যবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পান ভোজনাদিতে অসংযমী হইলে, পবিত্র দেহ মন্দিরকে অপবিত্র ব্যাধি মন্দিরে পরিণত করিলে, মনকে অশুভ ও নীচ চিন্তায় পূর্ণ করিলে, আমাদের জীবনী শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং সেই জীবনীশক্তি রক্ষার জন্য তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ ও বৃদ্ধি সাধন জন্য আমাদিগকে প্রাকৃতিক নিয়মে আহার বিহার করিতে হইবে বিশুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। এইভাবে জীবন যাপন করা সত্বেও বাহ্যজগত হইতে যদি কোন ঘটনা আসিয়া আমাদিগকে মরণের পথে লইয়া যায়, তাহা

(১) মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

হইলে বুঝিতে হইবে, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমরা মঙ্গলময়ের রাজত্বে বাস করিতেছি, এখানে 'অমঙ্গল' বলিয়া কিছু নাই—কিছু থাকিতে পারে না। জগতে যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, ও তাহা আমাদের চক্ষে যতই অমঙ্গলজনক বোধ হউক না কেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটিতেছে। মৃত্যুকেও ভয় করা আমাদের বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য নয়। ত্রিকালদর্শী কারুণিক কর্ম্মদেবগণ কৃপা করিয়া যে দিন আমাদিগকে দেহ-কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, সে দিন তাহাকে সাহ্লাদে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে হইতেই তাঁহারা আমাদের মৃত্যুর দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আমাদের অকাল মৃত্যু হইতে পারে না। আমাদের এই মাত্র কর্ত্তব্য দেহের সাধ্যমত যত্ন করিব, দীর্ঘ স্থায়িতার জন্য চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহার বশীভূত হইব না। কিন্তু যদি আমরা অসংযত জীবন যাপন দ্বারা অকালে জীবন বৃক্ষের ছিন্নতা সাধন করি (তাহা আমাদের অবশ্য স্বাধীনতা আছে), তাহা হইলে তাহার জন্য আমরাই দায়ী ও তাহার ফলও বড় ভীষণ। কিন্তু যদি আমাদের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত কোন ঘটনা বশতঃ ইহা অকালে কবলিত হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। যে সমস্ত মহাপুরুষগণের উপর আমাদের জীবন মরণের ভার ন্যস্ত আছে, তাহারা আমাদের মঙ্গল হইবে বুঝিতে পারিলে, আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া দিতে পারেন। আমরা দেহ নই—আত্মা। আমাদের প্রকৃত বাসস্থান সেই অমরধাম। এই সংসার শিক্ষাগার এবং আমাদের প্রত্যেকের এক একটি জীবন সেই শিক্ষাগারের এক একটি দিন। এই সংসার শিক্ষাগারে শিক্ষালাভ করিবার জন্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমাদের এক দিনের শিক্ষা সাঙ্গ হইলেই সংসার শিক্ষাগার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বধামে গমন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করি ও শিক্ষিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করি। শিক্ষিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে, ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে শিক্ষালাভ জন্য আবার হেথায় আগমন করি। যত দিন না এখানকার সমস্ত শিক্ষা লাভ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে এখানে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। ইহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। দেহ রক্ষার জন্য আমাদের যে টুকু কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং মৃত্যুর জন্য চিন্তা করা বা তাহার জন্য ভীত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বভয়হারী ভগবানে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপর আত্ম নির্ভরতা ও তাঁহার সঙ্কল্পের অনুকূলে কার্য্য করিবার জন্য আত্ম সমর্পণ—ইহাই মৃত্যু ভয় হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। অসৎ, অন্ধকার ও মৃত্যুর মধ্যে অবস্থিত আছি বলিয়া আমরা সৎ, আলোক ও অমরত্ব দেখিতে পাইতেছি না। যত দিন না তাহা দেখিতে পাইব, ততদিন মৃত্যুভয়ে আমাদিগকে অভিভূত হইতে হইবে, তাই, এস, সকলে মিলিয়া সেই বরাভয়দাতা ভগবানের নিকট উপনিষদের ভাষায় কাতরভাবে প্রার্থনা করি :—

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥

শ্রীঅপর্ণা চরণ সোম।

জুয়া।

(উপন্যাস)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সোমনাথ সিগারেট মুখে করিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল এবং দেবল বাবুর বাটী অভিমুখে হাঁকাইতে আদেশ করিয়া দিল। যতটুকু সময় ট্যাক্সিতে যাইতেছিল ততক্ষণ ইংলিশম্যান কাগজ খানি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিল; বাজারের দরগুলি একখানি নোটবুকে টুকিতেছিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সে অত্যন্ত ব্যস্ত। যথা সময়ে দেবল বাবুর বাটী পৌছিল। দেবল বাবুর বহুপরিবার, পুত্র, পৌত্র, জামাই, নাৎজামাই, দৌহিত্রে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি বৈঠকখানা, বড় মেজো ছোট ন প্রভৃতি বাবুদের আলাহিদা বৈঠকখানা। দেবল বাবু দোতালায় বসেন, তাহার একটা আলাহিদা সিঁড়ি এক-তালার ঘরে যেখানে পৌছিয়াছে সেই খানে একখানি শ্বেত পাথরের গোল টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানি কেদারা। দেখা করিতে আসিলে আগন্তুক ব্যক্তিগণের সেইখানে অপেক্ষা করিতে হয় এবং দেবল বাবুর খাস চাপরাসি সেই খানে অপেক্ষা করে, কার্ড পাঠাইলে একজন করিয়া লোককে ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকেন এবং একটা একটা করিয়া লোক বড় বাবুর সহিত দেখা করিতে পায়। সোমনাথ গিয়া দেখিল হরেকিসন, নগেন দালাল ও মিসেস ডোভার নাম্নী একটা য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে এখন পর্য্যন্ত কাহারও ডাক হয় নাই। সোমনাথ তাহার কার্ড খানিও চাপরাসির হাতে পাঠাইল। প্রথমে হরেকিসনের ডাক পড়িল। দেবল বাবুর স্বাস্থ্য ভাল নহে। দেখিতে খুব রুগ্ন। কিন্তু খুব খাটিতে পারেন। সর্ব্বদিন লোক যাতায়াত করিতেছে তাহাদের সহিত কাজ করিবার বিরাম নাই। দেবল বাবু খুব কম বাহিরে যান। প্রাতে উঠিয়া ছাদে একটু বায়ু সেবন করেন তাহার পর খবরের কাগজ পড়িয়া নিজের চিঠি পত্রাদি সারিয়া বেলা ৮ টার সময় বৈঠক খানায় আসিয়া বসেন এবং বেলা বারোটা পর্য্যন্ত লোক জনের সঙ্গে নানা প্রকার কাজ সারেন। বেলা বারোটার পর স্নান করিয়া একটু মাছের ঝোল ভাত নেবু গুলিয়া খাইয়া থাকেন। আহারান্তে একটু বিশ্রাম আবার বেলা ২ টার সময় বৈঠক খানায় বসেন সে সময় কেবল লোক জন আসা যাওয়া নয় টেলিফোন প্রায় কাণে দিয়াই থাকিতে হয়। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ভিতরে যান, একটু দুধ সাবু খাইয়া শুইয়া পড়েন। কলিকাতার ধন কুবের এইরূপে ত্রিশ বৎসর কাটাইয়াছেন। হরেকিসন দেবল বাবুর প্রধান দালাল পৌছিবা মাত্র কাজের কথা আরম্ভ হইল, স্যাকরাহাটি কেনাইবার জন্য হরেকিসন অনুরোধ করিতে লাগিল। দেবল বাবু কথা কম বলেন প্রায় হ্যাঁ না বলিয়াই তাঁহার উত্তর হয়। প্রথমে দেবল বাবু না বলিলেন। অনেক ধস্তাধস্তির পর পাঁচশত স্যাকরাহাটি কিনিবার আদেশ করিলেন। তাহার পর ইংলিশম্যান কাগজের শেয়ার মার্কেট ক্রোড়পত্রে প্রত্যেক শেয়ারের দাম জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া লইতে লাগিলেন। বাজারের কাজের উপর শেয়ারের দাম নির্দ্দিষ্ট হয় বটে কিন্তু প্রাতে বড় বাজারে মাড়োয়ারীদের মধ্যে বাটীতে বাটীতে অনেক ফাট্‌কা খেলা হইয়া বাজার খুলিবার পূর্ব্বে দরগুলি অনেক ঠিক হইয়া যায়। হরেকিসন এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ খবর রাখে এই জন্য দেবল বাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে হরেকিসনকে আসিতে বলেন। হরেকিসন চলিয়া গেলে নগেন দালালের ডাক পড়িল। নগেন দালাল কতকগুলি শেয়ার ডেলিভারি লইবার জন্য আসিয়াছিল নগেন দালাল বিশেষ জানিত যে এই কাজ-গুলি দেবল বাবুর বড় জামাতা মনোহর বাবু দেখিয়া থাকেন তথাপি যদি দেবল বাবুর দু একটা কাজ পায়, এই আশায় বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধ যাইবা মাত্র মনোহর বাবুর সহিত দেখা করিতে বলিল কিন্তু

নগেন কিছু কাজ কর্ম্মের কথা বলায় তাহাকে বসিতে বলিলেন। বৃদ্ধের দালালদের হাতে রাখিবার বড় ইচ্ছা। নগেন দালালকে বলিলেন হরেকিসন প্রভৃতি দালাল আছে বটে তথাপি কিছু কিছু কাজ দিবেন তবে কবে যে দিবেন এবং কত টাকার যে কাজ দিবেন তাহা কিছু বলিতে পারেন না এবং তাহার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে পারেন না। আর তাঁহার নিকট কাজ পাইতে হইলে প্রতি রোজ হইলেই ভাল হয় তাহা না হইলেও মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দেখা করা চাই। নগেন দালাল চলিয়া গেলে মিসেস ডোভারের ডাক পড়িল। কার্ড দিবামাত্র বৃদ্ধ ১, ২ মার্কা দিয়া ফেলেন এবং মার্কা অনুসারে আগন্তুক ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া থাকেন। তবে যদি সেই রকম কোন বড় লোক আসেন তাহা হইলে আর মার্কার ঠিক থাকে না। মিসেস্ ডোভার কিছু টাকা উত্তরাধিকারের সূত্রে পাইয়াছেন কি করিয়া টাকাগুলি খাটাইবেন—তাহার পরামর্শ লইবার জন্য বৃদ্ধের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বলিবামাত্র বৃদ্ধ ঘণ্টা দিয়া সোমনাথকে ডাক দিলেন এবং মিসেস্ ডোভারকে হরেকিসনের সাহত দেখা করিতে বলিলেন। বৃদ্ধের ইচ্ছা যে রমণীটী আর তাঁহাকে বিরক্ত না করেন কিন্তু মিসেস্ ডোভার নাছোড়বন্দী। হরেকিসন কি রকম লোক তাহার অর্থগুলি নষ্ট হইবে কিনা প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন দেবলাবাবু হ্যাঁ না করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। দেবলাবাবুর একটী মস্ত গুণ যে কাহারও উপর বাহ্যিক বিরক্তির ভাব দেখাইতেন না। অত্যন্ত চটিলেও কোন প্রকার ভাবান্তর প্রকাশ পাইত না। মিসেস্ ডোভার জোরে কথা বলিতেছিলেন বাহিরে সোমনাথ দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল এবং ব্যাপার খানাও বুঝিয়াছিল। মিসেস্ ডোভার বাহির হইবা মাত্র সোমনাথ তাঁহাকে বাহিরে তাঁহার টি ৪২৩ নম্বর ট্যাক্সিতে উঠিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। সোমনাথ দেবলাবাবুর ঘরের ভিতর অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিল।

দেবল বাবু। কি খবর?

সোমনাথ। আমরা একটী ব্যাঙ্ক এবং একটী বীমা অফিস খুলিবার মৎলব করিয়াছি।

দেবলবাবু। বেশ।

সোমনাথ। এ বিষয়ে আপনার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক।

দেবল বাবু। আমার সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

সোমনাথ। আপনাকে বেশী পরিমাণ শেয়ার কিনিতে হইবে।

দেবলবাবু। অসমর্থ।

সোমনাথ। আপনি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন?

দেবলবাবু। না।

সোমনাথ। আপনি আমাদের দেশের ধনকুবের আপনি অসমর্থ বলিলে কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? আপনাকে দশ লাক টাকার শেয়ার কিন্‌তে হবে আপনি আমাদের ডিরেক্টার সভাপতি হোন আপনার ইচ্ছা মত লোক জন রাখুন—আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় যাতে কাজে হোতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিন।

দেবলাবাবু। আমি ঐ পদের অনুপযুক্ত আর আমার দশ লাক টাকার শেয়ার কিনিবার সঙ্গতি নাই।

সোমনাথ। আপনি ত আমার কিরূপ কাজ করিবার শক্তি বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন আমার কি এমন একজন কাজের লোককে কোন সাহায্য করিবেন না?

দেবলবাবু। আপনার দ্বারা এ কাজ হইবে না।

সোমনাথ। কেন?

দেবলবাবু। 'কেন'র উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার বিশ্বাস এইরূপ।

সোমনাথ। আপনার বিশ্বাসের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

দেবলবাবু। আপনার পূর্ব্ব কাজ সংক্রান্ত অনেক জুয়াচুরির কথা শুনা যায়।

সোমনাথ। আপনি জুয়াচুরি বলিতে পারেন না। জুয়া বলিতে পারেন আপনার যে কাজ ইহাও কি জুয়া নহে?

দেবলবাবু। আপনার জুয়া নহে জুয়াচুরি।

সোমনাথ। আপনারও তাহা হইলে জুয়াচুরি। বেশ কথা। আপনি সাহায্য করবেন না তাই বলে আপনার বাটীতে এসেছি বলে আপনার আমাকে অপমান করা কি উচিত। আপনি নিতান্ত কাপুরুষ তাই বাটীতে এসেছি বলে আমাকে অপমান করলেন।

এই বলিয়া সোমনাথ চলিয়া গেল। দেবলবাবু সোমনাথের কথায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া মার্কা অনুসারে আগন্তুক ব্যক্তিগণকে ডাকিতে লাগিলেন। দেবলবাবুর নীচের তলায় তখন বহুলোক গিস্ গিস্ করিতেছিল। সোমনাথ ট্যাক্সিতে উঠিয়া মিসেস্ ডোভারের সহিত আলাপ করিতে করিতে মিসেস্ ডোভারকে তাঁহার বাটী পৌঁছাইয়া দিল। মিসেস্ ডোভারকে পৌঁছাইয়া দিয়া সোমনাথ প্রভাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং দেবলবাবুর সমস্ত কথাবার্ত্তা প্রভাতের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

প্রভাত। দেবল বেটা ভারী পাজী। প্রাতঃকালে নাম করিলেই হাঁড়ী ফাটিয়া যায়।

সোমনাথ। প্রভাত দা দেবলকে জব্দ করতেই হবে।

প্রভাত। অত বড় লোক কি করে পারবেন।

সোমনাথ। প্রভাত দা আপনি সহায় হোলে আমি কিছু ভয় করি না।

প্রভাত। আমিত সোমদা আপনার আজ্ঞাকারী আছি কিন্তু ডিরেক্টার হবে কে? আর ধনী কয়েক জন ডিরেক্টার না পেলেত কর্ম্মের সফলতা লাভ করা যাবে না। দেবলকে যে কাজে পাওয়া গেল না তখন আপনার দাদাকে একবার চেষ্টা করতে হবে।

সোমনাথ। প্রভাতদা আমিত প্রাণ থাক্‌তে দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

প্রভাত। না না আপনি যাবেন কেন? আমি যাব। এ কোম্পানী আমি আপনার বলে মনে করি।

সোমনাথ। তা ত নিশ্চয়।

প্রভাত। আমি আর সময় নষ্ট করব না। কাল প্রাতেই আপনার দাদার সহিত দেখা কোরে যেরূপ কথাবার্ত্তা হয় আপনাকে জানাইয়া আসিব।

সোমনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিল। দিনের বেলাটা খানিক ঘুমাইয়া আসিয়া হেমেশ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল। রাত্রে ক্ষুধা হইল না শরীর ক্লান্ত বোধ হওয়ায় কিছু না খাইয়াই বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ বিছানায় শুইয়া নিদ্রা কিছুতেই আসিল না শয্যাকণ্টকী উপস্থিত হইল। বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রালোকে ঘরটি আলোকিত হইয়াছিল—সোমনাথ উঠিয়া পড়িল—চন্দ্রালোকে বায়ুসেবনের জন্য ছাদে গিয়া উঠিল। একটি সতরঞ্চ ও একটি বালিস বগলে করিয়া সিঁড়িগুলি উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির দরজাটা পার হইবা মাত্র দেখিল যে নির্জ্জন ছাদের উপরে চন্দ্রালোকস্নাতা সুরূপা দেবী স্বর্গের দেব কন্যার ন্যায় শোভা করিতেছেন

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

বিকাশ।

বিশাল বারিধি বক্ষে অন্ধকার মাঝে,
নিষ্ক্রিয় সে নিরাকার পুরুষ প্রধান
ধ্যানরত নির্ব্বিকার যোগীর মতন—
মগ্ন ছিল যোগ নিদ্রা বশে। চঞ্চলতা
নাহি ছিল কোন ভিতে; নীরবতা ছিল
শুধু বিস্তৃত ভুবনে। গভীর গম্ভীর
বেশে দিগন্তের পরতে পরতে ছিল
শুধু সূচীভেদ্য জমাট আঁধার রাশি
অন্ধকার?—বরষার অমাবস্যা সম।
নাহি ছিল, আলো, সূর্য্য, দিবস যামিনী
ধীর স্থির দশদিশি নাহি কোন গতি।
যেন কোন্ মন্ত্র বলে পরশে কাহার
সুপ্তপ্রায় সারা বিশ্ব ছিল মুহ্যমান।
ছিল প্রাণ—নাহি ছিল স্পন্দন তাহার।
অস্তিত্ব বিহীন সব নিস্পন্দ অসাড়
উত্তাল তরঙ্গময় মহাসিন্ধু যেন
প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে রহে অচঞ্চল;
কিম্বা সে কল্পনাতীত নহে বর্ণনীয়।
ইচ্ছাময়রূপী সেই পুরুষ প্রবর
ধ্যানযোগে একদিন ভাবিলেন মনে,
'বহু হব' করিবারে লীলা অভিনয়।
সহসা সে ঘনঘোর অন্ধকার ভেদি
জ্যোতির্ম্ময় রূপে দিক হ'ল উদ্ভাসিত
নিমেষ মাঝারে কোটী কোটী সূর্য্য যেন
হইল উদিত। যেন শত দামিনীর
দীপ্ত রশ্মি জালে, বিশ্ব হ'ল আলোকিত।
ক্ষণমধ্যে বিনাশিল তমসা ভীষণ
প্রাপ্ত হ'য়ে প্রতিঘাত আলোক রেখায়
চঞ্চল হইল তাহে নিথর সলিল
রাশি। মহাকাল সিন্ধু মুহূর্ত্ত মাঝারে
হ'ল সংক্ষোভিত। উদ্ভব হইল তাহে
তরঙ্গের রাশি। ক্ষুদ্র আর সুবৃহৎ
তরঙ্গ সকল প্রান্তহীন অসীম সে
সিন্ধু বক্ষোপরি নাচিল উল্লাস ভরে।
তরঙ্গ তরঙ্গে ডুবি কত না সৃজিল
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মালা। প্রতিভাত হ'ল
জ্যোতিঃ বুদ্বুদ মাঝারে। অসংখ্য বুদ্বুদ
মুহূর্ত্তে পাইল তার রূপরশ্মি আভা।
একরূপ হ'ল বহু। সর্ব্ব ভূতে দিয়া
প্রভু নিজ অংশ রেখা সৃজিলেন এই
ধরাতল। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যিনি দেব
ভগবান নিরাকার নির্ব্বিকার তিনি;
মায়া তাঁর আদরিণী চির প্রণয়িনী
যেই মায়া সেই শক্তি নাহিক সংশয়।
রূপ হ'তে মায়া,—শক্তি লভেছে জনম
রূপ জ্যোতিঃ হ'তে শক্তি হইল বিকাশ
শক্তির স্ফুরণে হ'ল সৃষ্টির প্রকাশ॥

শ্রীচারুচন্দ্র সেন।

তৃষিতা।

"ইন্দু, সত্যই কি তুই নরেনকে বিয়ে করবি?" প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকার এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুই ভগিনীতে কথোপকথন হইতেছিল। ধনবানের দুহিতা গৃহিণী কুন্তলা সাগ্রহে ইন্দুর সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া ওই কথাগুলি বলিল।

ইন্দু কুন্তলার মামাত বোন। শৈশবেই পিতৃমাতৃ-হারা হইয়া ইন্দু কুন্তলাদের বাড়ীতেই প্রতিপালিতা হইয়াছে কুন্তলার মাতা কন্যা নির্ব্বিশেষে ইন্দুকে অতি যত্নে, অতি আদরে মানুষ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যে বিলাসে কুন্তলাও যেমন পরিপুষ্টা ইন্দুও তাই। কুন্তলা এখন ধনবানের গৃহিণী। তাহার স্বামী সিমলা শৈলের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার মাসিক বেতন দ্বাদশ শত মুদ্রা। ইন্দুর সম্বন্ধ হইতেছিল নরেনের সঙ্গে। নরেন পশ্চিমের একজন সব্ ডেপুটী বেতন দুই শত টাকা। কুন্তলা বুঝিতে পারিতেছিলনা এই সামান্য টাকায় বিলাসিনী ইন্দু কেমন করিয়া সংসার চালাইবে!

"কেন দিদি, সে ত দু'শো টাকা বেতন পায়। দু'শ টাকা কি কম?"

"সাধারণ অবস্থায় দু'শো টাকা কম নয় সত্য কিন্তু তোর পক্ষে সে টাকা যে কিছুই নয়। চিরদিন ঐশ্বর্য্য বিলাসে পালিতা হয়েছিস্। অভাব কি তা কখনও জানিস্ নি। হিসেব করে কেমন করে চল্‌তে হয় তা তোর জানা নাই। আজ আঠারো বৎসরের এই অভ্যাস তুই কি সহজে ছাড়্‌তে পারবি? শেষে এই বিবাহ তোর দারুণ মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠ্‌বে।"

"দিদি, জগতে টাকাই কি সব? স্বার্থের বেদীতে প্রেমকে বলি দেওয়া কি নীচতা নয়? আমরা ত জেনে শুনেই এ বিবাহ করছি। জেনে শুনে যে দরিদ্রতাকে বরণ করছি তাকে ভবিষ্যতে মর্ম্মপীড়ার কারণ হ'তে দেব কেন?

"তুই যে খুব নভেলী হয়ে উঠেছিস্, ইন্দু! দেখ্ বইএর পাতায় ও গুলো খুব ভাল মানায় সত্য কিন্তু বাস্তব জীবনে আদৌ তার সঙ্গতি হয় না। প্রতিদিন অতি তুচ্ছ অভাবের জ্বালা জীবনকে বিষময় করে তুলে।"

"না দিদি, তুমি কিছু বলো না। এ বিবাহ আমি করিবই। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, যেন সুখী হ'তে পারি।"

এমন সময় নরেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। নরেনকে দেখিয়া ইন্দুর মুখখান লজ্জায়, আনন্দে লাল হইয়া উঠিল। ইন্দু নরেনকে বলিল, "দিদি বলছিলেন যে দু'শো টাকায় আমাদের কুলোবে না। সত্যই কি আমাদের খুব গরিব ভাবে চল্‌তে হ'বে?"

নরেনের মুখ ম্লান হইয়া গেল। নরেন বলিল, "বড়মানুষী চালে চল্‌তে পার না সত্য তবে সুখে স্বচ্ছন্দে এক রকম চলে যাবে বই কি?"

"আচ্ছা আমরা যেখানে থাক্‌বো, সে যায়গাটা খুব সুন্দর, না? সকলেই বলে পশ্চিম খুব ভাল যায়গা। সেখানে বোধ হয় পথে পথে ফুল ফুটে রয়েছে। বাতাসের সঙ্গে ফুলের গন্ধ, পাখীর গান অবিরত ভেসে যাচ্ছে। কেমন না?

ইন্দু পল্লীগ্রাম কখনও দেখে নাই। নভেল পড়িয়া কবি কল্পনার একটী স্বর্গ সে মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিল। নরেন দেখিল সে মায়াপুরী যেদিন ভাঙ্গিবে সেদিন ইন্দুর কতখানা কষ্ট হইবে। অথচ স্পষ্ট কথায় সে ইন্দুর এই মোহ ভাঙ্গিতে চায় না। তাই একটু ঘুরাইয়া বলিল, "আমি এখন যেখানে আছি সেখানে এ সবের বড় বেশী অসদ্ভাব নাই আর থাকলেই বা কি? আমাদের পরস্পরের প্রতি অগাধ প্রেম নিজেই একটা সুখের স্বর্গ সৃজন করবে।"

প্রেম যখন হৃদয় জুড়িয়া বসে, তখন মানুষ অন্ধ হইয়া যায়। একচক্ষু হরিণের মত সে কেবল সংসারের একটা দিকই দেখিতে পায়। তার কল্পনার স্বর্গ তার চোখের সম্মুখে ফুটন্ত হয়ে অপরূপ শোভা বিস্তার করিতে থাকে সংসারের দুঃখদৈন্যময় যে আর একটা দিক আছে তা সে আদৌ অনুমান করিতে পারে না। ইন্দুরও তাহাই ঘটিয়াছে। নরেনকে দেখিয়া নরেনকে ভাল বাসিয়া সে সব ভুলিয়াছে। কুন্তলার উপদেশ তাহার নিকট এতটুকুও মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল না।

যথা সময়ে শুভদিনে শুভলগ্নে ইন্দুর হৃদয় নরেনের, নরেনের হৃদয় ইন্দুর এবং উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হইয়া গেল।

নরেন ইন্দুকে লইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাইবার দিন কুন্তলা ইন্দুর চিবুক খানি ধরিয়া সস্নেহে বলিল "দেখিস্ ইন্দু, যে প্রেমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেবে আজ সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছিস্, কোন দিন কোন কারণে তাকে মলিন হ'তে দিস্‌নি।" ইন্দু একটা নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা লইয়া স্বামীর সহিত বিদেশে চলিয়াছে। আজ ইন্দু মুক্ত। এতদিন সংসারে তাহার আপনার বলিয়া কিছু ছিল না। এবার তাহার সব হইবে। তাহার গৃহ, তাহার দাস দাসী, তাহার জিনিষ পত্র, সে এবার গৃহকর্ত্রী হইবে। কুন্তলাদের গৃহে অতি যত্নে অতি আদরে প্রতিপালিতা হইয়াও ইন্দুকে সতত কুণ্ঠিতা, সতত সংকুচিতা হইয়া থাকিতে হইত। কুন্তলা যেমন দাস দাসীদিগকে হুকুম করিতে পারিত, ইন্দু তাহা পারিত না। কুন্তলা যেমন ইচ্ছামত জিনিষ পত্র দান বা নষ্ট করিতে পারিত, ইন্দু তাহা পারিত না। ইন্দু জানিত কুন্তলাদের গৃহে তাহার নিজের বলিবার কিছু নাই। এতদিন তাহাকে পরগৃহে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আজ নরেন তাহাকে সেই স্নেহের কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া একটা ভবিষ্যৎ পরিবারের কেন্দ্রস্থলে বসাইতে চলিয়াছে। ইহাতে ইন্দুর আনন্দ না হইয়া থাকিতে পারে না। ইন্দু ট্রেনে বসিয়া বসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর একটা আদর্শ কল্পনা করিতে লাগিল। তাহাদের বাসগৃহটী কেমন হইবে তাহাতে কয়টা কক্ষ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে তাহাতে কি সব আসবাব থাকিবে সারাদিন সে কি করিবে এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিল আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল সে মাঝে মাঝে প্রেমপুলকিত-লোচনে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। নরেন কিন্তু মনে মনে একটা অশান্তি ভোগ করিতেছিল—সে কেবল ভাবিতেছিল সংসারানভিজ্ঞা বালিকা যখন বাস্তব জগতের মধ্যে আপনাকে একা দেখিবে তখন ইন্দু কতটাই না বিব্রত হইয়া পড়িবে! এ সংসারে তাহার এমন কেহ নাই যে ইন্দুর নিকটে আসিয়া বাস করে। সারাদিন তাহাকে রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, তখন ইন্দু একা কি করিয়া সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিবসগুলি কাটাইবে!

নরেনকে বিষণ্ণ দেখিয়া ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবিতেছ?" নরেন উত্তর করিল "এমন কিছু না।"

"তবু বল না কি ভাবিতেছিলে?"

"ভাবিতেছিলাম ইন্দু, সেখানে তোমার খুব কষ্ট হইবে। এতদিন একটা খুব বৃহৎ পরিবারের মধ্যে নিয়ত আমোদ উৎসবের মধ্যে বাস করিতেছিলে, এবার একা নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে হইবে তোমার খুব কষ্ট হইবে না?"

"কিসের! যেখানে তুমি, সেখানে আবার কষ্ট কি?"

পত্নীর এই নির্ভরতা দেখিয়া নরেন চুপ করিল। ইন্দু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—তখন তাহারা সুজলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ছাড়িয়া বিহার অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া ধূসর মাঠ গুলি পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রাম নয়ন গোচর হইতেছে। গ্রামগুলি শ্রীহীন, জীর্ণ খোলার ঘরে পূর্ণ। রৌদ্র দগ্ধ প্রকৃতি যেন তৃষার্ত্ত কণ্ঠে হাহাকার করিতেছে। ইন্দু শিহরিয়া উঠিল—ভাবিল তাহাদিগকেও এমনি একটা দেশে থাকিতে হইবে না কি? ইন্দুর চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

একটা ষ্টেশনে ট্রেন থামিতেই নরেন প্লাটফরমে নামিয়া পড়িল। দু'জন চাপরাশ আঁটা আরদালী নরেনকে সেলাম করিয়া তাহাদের গাড়ীর সম্মুখে ছুটিয়া আসিল। জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া ইন্দুও নরেন একটা অশ্বযানে চড়িল। যানের ও অশ্বের আকৃতি দেখিয়া ইন্দু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এই তীব্র রৌদ্রে এই জীর্ণ দেহ অশ্বগুলি যে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে ইন্দু কোন মতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তারপর যখন একটা অপরিষ্কৃত জীর্ণ বাংলা দেখাইয়া নরেন বলিল "এইটে আমাদের ঘর।" তখন ইন্দু আর ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিল না বলিয়া ফেলিল "সর্ব্বনাশ! এখানে আমাদিগকে থাকিতে হইবে। তা'হলে ত বাঁচিব না দেখিতেছি।" কথাগুলি বলিয়াই ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল—সে যে স্বেচ্ছায় এই দরিদ্রতাকে বরণ করিয়াছে। ইন্দু ভাবিল নরেন তাহার কথা শুনিয়া হয় ত রাগ করিয়াছে। সে সঙ্কুচিত ভাবে নরেনের দিকে চাহিল। নরেন হাসিয়া কহিল "এটা আইবুড়োর ঘর। তাতে আমি আবার একমাস এখানে নাই। চাকর বেটারা ঘরটাকে যেন জঙ্গল করে ফেলেছে। তবে ঘরের লক্ষ্মী তুমি-তুমি যখন এসেছ তখন তোমার চরণরেণু স্পর্শে ঘরের শ্রী ফিরে যাবে আশা করতে পারি।" নরেনের কথাগুলি শুনিয়া ইন্দুর অপ্রসন্ন চিত্ত অনেকটা সরস হইল। ইন্দু মনে মনে বলিল "তাহাই করিব—নিজের মনোমত করিয়া ঘরটাকে সাজাইব। স্বামীকে দেখাইব সত্য সত্যই আমি গৃহলক্ষ্মী।

ইন্দু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহে আসবাব কিছুই নাই। কয়েকটা সামান্য চেয়ার, দুটো টেবিল, দুটা তক্তাপোষ এইমাত্র সম্বল। কক্ষের মধ্যে ধূলি জমিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে।

বিলাসিনী ইন্দুকে এই মরুভূমির মধ্যে আনিয়া নরেনের হৃদয়ে আত্মগ্লানির সীমা ছিল না—নরেন নিজের দোষক্ষালন করিবার জন্যই যেন বলিল" দেখ, আগে হ'তে ঘর দোর সাজিয়ে রেখে যেতে পারি নি। সুতরাং দু'একদিন তোমাকে একটু কষ্ট পেতে হবে। তুমি একটা লিষ্ট কর তোমার কি কি জিনিষ চাই আমি সমস্ত সহর থেকে আনিয়ে দোব। কেমন?

ইন্দু প্রাণপণে আপনার বিদ্রোহী হৃদয়টাকে সংযত করিয়া গৃহ দ্বার সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু শতদিক হইতে শত বাধা আসিয়া ইন্দুকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। ইন্দু কর্ত্তব্যপরায়ণ যোদ্ধার মত অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে কিন্তু ক্রমেই সে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল—জীবনে যে সকল কার্য্য সে কখনও করে নাই যাহাতে তাহার নিপুণতা নাই, অভিজ্ঞতা নাই সে কার্য্য ইন্দু পারিবে কেন? শত রকমে সে আপনাদের বাসগৃহখানি সাজাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতবারেই তাহা মনঃপুত হইল না। এমনি করিয়া সে দাসদাসীগণকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

ইন্দু একদিন তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি আসবাবের তালিকা নরেনকে প্রদান করিল। নরেন দেখিল তাহাদের মূল্য প্রায় সাতশো টাকা। নরেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "এত টাকা ত আমি একবারে দিতে পারবো না, ইন্দু। আমার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল বিবাহে তা সমস্তই নিঃশেষ হয়েছে। আমি মাসে মাসে তোমাকে কিছু কিছু করে দেব। তুমি তাই দিয়ে কতক কতক জিনিষ ক্রয় করিও।" ইন্দু বুঝিল সত্য সত্যই সে প্রেমের সহিত দরিদ্রতাকে বিবাহ করিয়াছে। কুন্তলার কথাগুলো সে মন হইতে কোনমতেই দূর করিতে পারিতেছিলনা। সে কেবল জোর করিয়া তাহার অপ্রসন্ন হৃদয়টাকে নরেনের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে লাগিল।

পতিপত্নীতে যুক্তি হইল নরেনের বেতনের দুই শত টাকার মধ্যে এক শত টাকায় তাহারা সংসার খরচ চালাইবে। পচিশ টাকা আকস্মিক প্রয়োজনের জন্ত রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পঁচাত্তর টাকায় আসবাবাদি ক্রয় করিবে। উভয়ে যথাসম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া চলিতে

বন্ধ পরিষ্কার হইল। কিন্তু এক শত টাকায় একমাস সংসার খরচ চালান ইন্দুর পক্ষে কঠিন। সংসারাভিজ্ঞ ইন্দুকে গৃহকর্ত্রী পাইয়া দাসদাসীগণ তাহাদের উপরি লাভের মাত্রাটা যথাসম্ভব বাড়াইয়া তুলিল। মাসান্তে দেখা গেল স্বামীস্ত্রীর সংসার খরচে দেড় শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইন্দু ভাবিল প্রথম মাসে খরচ একটু বেশী পড়িবেই দ্বিতীয় মাসে সব ঠিক হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসান্তে ফল পূর্ব্বানুরূপই হইল। সুতরাং আসবাব কিনা আর হয় না। ইন্দু ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। নিত্য দাসদাসীগণের সহিত কলহ, তিরস্কার তাহার একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। ইন্দু বুঝিল এমন করিয়া সংসার চালান তাহার পক্ষে অসম্ভব।

নিত্য এই অভাব অশান্তির মধ্যেও ইন্দু যদি নিয়ত স্বামীর সাহচর্য্যসুখ ভোগ করিতে পাইত তাহা হইলেও তাহার হৃদয় অনেকটা শান্ত হইতে পারিত কিন্তু ইন্দুর অদৃষ্টগুণে তাহাও ঘটিয়া উঠে না। নরেনকে প্রায়ই কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হয় অথবা বড় সাহেবের নিকট হাজিরা দিতে হয়। ইন্দু সেই দীর্ঘ অশান্তিময় দিবসগুলো একা কাটাইত আর দুঃখে ক্ষোভে, অশান্তিতে তাহার হৃদয়টা মথিত হইতে থাকিত। ক্রমে ক্রমে ইন্দুর মনে সন্দেহ হইল স্বামী আর তাহাকে ভালবাসে না. যত্ন করে না। যদি সে ইন্দুকে ভালবাসিত, ইন্দুর উপর যদি তাহার এতটুকুও মমতা থাকিত তাহা হইলে কি নরেন এমনই করিয়া ইন্দুকে সেই নির্জ্জন গৃহে একলা ফেলিয়া রাখিয়া অনত্র যাইতে পারিত। অভিমানিনী ইন্দু একটা দারুণ বিষের জ্বালায় অহরহঃ জ্বলিতে লাগিল। লতা শুকাইতে আরম্ভ করিল।

নরেন লক্ষ্য করিল ইন্দু ক্রমে ক্রমে শুকাইতেছে। তাহার লাবণ্যময়ী দেহলতা ক্রমে শীর্ণ হইতেছে। গণ্ডের রক্তিম আভা দূর হইয়া তাহা পীতাভ হইতেছে। নরেন বুঝিল পশ্চিমের জল বায়ু ইন্দুর সহিতেছে না। ইন্দুর স্থান পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়।

এই সময় সিমলাশৈল হইতে কুন্তলা পত্র লিখিল যদি নরেনের সুবিধা হয় তবে সে যেন দিন কয়েক ইন্দুকে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যায়। নরেন ইন্দুকে বলিল "আমি ত গিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি যদি যাও তবে তোমাকে রাখিয়া আসিতে পারি। এ স্থানটা দেখিতেছি তোমাকে সহিতেছে না। শীত পড়লে তোমাকে লইয়া আসিব।

ইন্দু ভাবিল, "স্বামী তাহাকে চায় না, তাড়াইতে পারিলে বাঁচে। অভিমানিনী উত্তর করিল, "তা বেশ মন্দ কি?"

নরেন ইন্দুর উত্তরে সুখী হইল না। ভাবিল ইন্দু কেমন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইতেছে। ইন্দু ব্যতীত নরেন কি করিয়া তাহার এই কথাটা ক্লান্তিময় জীবন বহন করিবে? তথাপি এই পরিবর্ত্তনে ইন্দুর মঙ্গল হইবে ভাবিয়া নরেন ইন্দুকে শিমলায় রাখিয়া আসিতে সঙ্কল্প করিল।

কুন্তলা শিমলা ষ্টেশনে ইন্দুকে লইতে আসিয়াছিল। কুন্তলাকে দেখিয়াই ইন্দু পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গিনীর মত সোল্লাসে কুন্তলার নিকট ছুটিয়া গেল। তাহার ভাবে বোধ হইল যেন একটা দুঃসহ যন্ত্রণার কবল হইতে সে মুক্ত হইল। কুন্তলা ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল কিরে কেমন সংসার করলি! ইন্দু বলিল "তুমি যা বলেছিলে দিদি তা বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। উঃ একটা মাস যে কি কষ্টেই কাটিয়েছি তা আর কি বলব। যেমন দেশ, তেমনি ঘর আর তেমনি দাস দাসী! জ্বালাতন দিদি, জ্বালাতন। আর মাস কয়েক থাকলেই আমাকে মরতে হ'ত।"

ইন্দুর কথাগুলি শুনিয়া নরেনের হৃদয় শেলবিদ্ধ হইতেছিল। ইন্দু স্বামীর মুখে বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কেবল ওর আদরটুকু পাইতাম বলিয়াই বাঁচিয়া ছিলাম।" নরেন বুঝিল, ইন্দু তাহার মন রক্ষার জন্যই ওই কথাগুলি বলিল। সে হাসিয়া বলিল "না, না, আমি ইন্দুর কোন যত্নই করতে পারিনি। আমাকে প্রায়ই মফস্বলে যেতে হ'ত। ইন্দু একলা সেই নির্জ্জন কারাগারে পড়ে থাকত। আপনাদের জিনিষ আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম আপনারা যত্ন করিয়া ওকে আবার সুস্থ সবল করে তুলুন।"

শিমলায় আত্মীয়, স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগকে ফিরিয়া পাইয়া ইন্দু যেন নূতন মানুষ হইয়া গেল তাহার নষ্ট সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসিল। নরেন যখন ইন্দুর নিকট বিদায় লইতে গেল তখন ইন্দুর মুখে আসন্ন বিরহের জন্য এতটুকু ম্লানিমাও দেখ গেল না। নরেন হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করিল। ক্ষুণ্ণমনে সে শূন্য মন্দিরে প্রত্যাগমন করিল।

কুন্তলা পাকা গৃহিণী। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল ইন্দুর মোহ কাটিয়াছে। প্রতিনিয়ত তুচ্ছ অভাবের যন্ত্রণা বিলাসিনী ইন্দু সহিতে পারে নাই। ফলে তাহার স্বামী প্রেমেও ঘুণ ধরিয়াছে। কুন্তলা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—বইপড়া প্রেমের অবস্থাই এইরূপ। কিন্তু ইন্দুর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ভাবিয়া কুন্তলা শিহরিয়া উঠিল। কুন্তলা তীব্রদৃষ্টিতে ইন্দুর গতিবিধি, মনোভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ইন্দুর সিমলায় আসিবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহ ইন্দু অবিরত হাস্য তামাসা আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়াছে। স্বামীর কথা দিনান্তেও একবার তাহার স্মরণপথে পতিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। স্বামিগৃহে গত ছয় মাস অবস্থান যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত তাহার অস্পষ্ট স্মরণ হয় মাত্র। ইন্দু আর সে কথা সাহস করিয়া স্মরণ করিতে চায় না। কুন্তলা দেখিল এই দুই সপ্তাহের মধ্যে ইন্দু একবারও স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। একদিন কুন্তলা স্বয়ং নরেনের কথা তুলিয়া বলিল, "দেখ ইন্দু, তুই এখানে এত আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়েছিস, একবার বেচারা নরেনের কথা ভাব দেখি—সে বেচারা কি কষ্টেই না রয়েছে?" ইন্দু উপেক্ষা ভরে বলিল "তার কষ্ট? একটুও না! তাহার সাহেব আছে—আফিসের কাজ আছে—আর একটা ভাজা তক্তাপোষ আছে। ব্যাস, তাহলেই তার যথেষ্ট। সে আর কিছু চায় না।"

"সে কেমন আছে সংবাদ পেয়েছিস্?"

ইন্দুর মুখটা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল, ভাবিল তাহার কোন অসুখ হয় নাই ত!

"আমি ক'দিন আগে তার একটা পত্র পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাই সে আর পত্র দেয় নাই।"

"সেটা তোমার বড় অন্যায় ইন্দু। বেচারা কত ভাবছে বল দেখি?"

"হাঁ, দিদি, সত্যই আমার অন্যায় হয়েছে। আমি আজই তাকে চিঠি লিখ্‌বো।"

অপরাহ্নে যখন ডাকে পত্র দিবার সময় হইল কুন্তলা ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল "কই নরেনকে পত্র দিবে যে? দাও, ডাকে পাঠাইয়া দি।"

ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "যা! একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি এখনি লিখিয়া দিতেছি।" ইন্দু উঠিয়া ত্বরিত হস্তে দু'ছত্র লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া দিল।

হায় হতভাগ্য নরেন! তুমি কাহার চিন্তায় শূন্য শয্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছ।

এমনি করিয়া আরও একমাস কাটিল ইন্দুকে ফিরিয়া যাইবার জন্য নরেন দু'একখানি চিঠি লিখিয়াছিল কিন্তু ইন্দু উত্তরে সে সম্বন্ধে কোন কথাই লিখে নাই। রুদ্ধ স্রোতস্বিনী একেবারে বাঁধ ভাঙ্গিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে যেমন সমস্তটাকে প্রান্তর মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দেয়; ইন্দুও তেমনি ছয় মাসের কারাবাস পীড়িত হৃদয়টাকে বহির্জগতের আনন্দে মিশাইয়া দিয়াছে।

সিমলায় তখন যতীশচন্দ্র বলিয়া একজন রূপবান ধনী যুবক বাস করিত। এই যতীশচন্দ্রের সহিত ইন্দুর ঘনিষ্টতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। কুন্তলা অতিমাত্র উদ্বেগের সহিত যতীশের সহিত ইন্দুর বন্ধুত্ব লক্ষ্য করিতেছিল। যতীশের স্বভাব বড় ভাল নয় সত্য কিন্তু কুন্তলা ইন্দুর ব্যবহারে এমন কোন দোষ খুঁজিয়া পাইতেছিল না যে জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। একটা দারুণ অশান্তিতে কুন্তলার হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। কুন্তলা কেবল ভাবিতেছিল কি করিয়া ইন্দুকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া দেয়। এমন সময় নরেনের আর একখানি পত্র আসিল। নরেন লিখিয়াছে সেখানে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। সেখানে থাকিতে আর ইন্দুর কষ্ট হইবে

না। এবার ইন্দুর সেখানে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কুন্তলা ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল "যাইবে না কি?" "ইন্দু কুন্তলার মনোভাব বুঝিল। বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর করিল "হাঁ যাইব।"

যতীশ ইতিপূর্ব্বে বহুবার কুন্তলা ও ইন্দুকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল কিন্তু কুন্তলা নানারূপ অছিলায় সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছিল। ইন্দু চলিয়া যাইবে শুনিয়া যতীশ এবার খুব জেদ করিয়া ধরিয়া বসিল। কুন্তলা কোন মতেই সে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। যতীশের বাড়ীতে যাইতে কুন্তলাকে বাধ্য হইয়াই সম্মত হইতে হইল।

ইন্দু আসিবে বলিয়া যতীশ গৃহখানিকে অতি উত্তম-রূপেই সাজাইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পত্র পুষ্প নানাবিধ ভাবে সজ্জিত তাহাদের মধ্যে নানারঙ্গের চাইনীজ লণ্টনে বাতী জ্বলিতেছে। মধুর সুবাসে গৃহখানি ভরপুর। যতীশ অতিমাত্র আগ্রহ সহকারে কুন্তলা ও ইন্দুকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। একটা কক্ষ মধ্যে সকলে বসিয়া গল্প গুজবে নিমগ্ন হইল। যতীশ দেখিল কুন্তলা একজন বর্ষীয়সী মহিলার সহিত কথোপকথনে গভীর ভাবে নিমগ্ন। তাহার পার্শ্বে বসিয়া ইন্দু একজন সমবয়স্কার সহিত গল্প করিতেছে। যতীশ ধীর পদে ইন্দুর নিকট আসিয়া বলিল "আপনি এ গরীবের ঘরটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভাবে দেখেন নাই। চলুন আপনাকে সমস্ত দিক দেখাইয়া আনি।" ইন্দু যতীশের গৃহের সুরুচিসঙ্গত মহার্ঘ আসবাব আদি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে ঐশ্বর্য্যের বিলাসের উপকরণ সমূহ স্তূপীকৃত। ইন্দু সে সকল দেখিতেছিল আর ভাবিতে-ছিল তাহার কি এমন সৌভাগ্য এ জীবনে হইবে। যতীশের কথায় ইন্দু সাগ্রহে সম্মতি দিয়া উঠিল। কুন্তলা সমস্তই দেখিতেছিল কিন্তু বাধা দিতে পারিল না। ইন্দু যতীশের সহিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ইন্দু যতীশের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্তই দেখিল। সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য বিলাসের অফুরন্ত নিদর্শন। ইন্দু মুগ্ধ হইয়া গেল। যতীশ দেখিল ইন্দু তাহার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে তখন একটা নির্জ্জন কক্ষে ইন্দুকে বসাইয়া যতীশ বলিল "ইন্দু কাল তুমি চলিয়া যাইবে, হয় ত এ জীবনে তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না তাই আমার বহুদিনের সংকল্প আজ তোমার নিকট প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদি অপরাধ করি আমাকে ক্ষমা করিও।" ইন্দু বুঝিতে পারিল না যতীশ কি বলিতে চায়—সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। যতীশ আবার বলিতে আরম্ভ করিল "এই কয়দিনের পরিচয়ে তোমার অবিদিত নাই যে আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। নরেনকে বিবাহ করিয়া যে তুমি সুখী হও নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি যদি গ্রহণ কর, আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য তোমার চরণে অঞ্জলি দিতে আমি প্রস্তুত আছি। বল ইন্দু তুমি গ্রহণ করবে। আমায় সুখী করবে আর নিজে সুখী হইবে।"

ভয়ে ইন্দুর মুখ শুকাইল, বুক কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! একি কথা! বন্ধু ভাবে আত্মার জ্ঞানে ইন্দু যতীশের সঙ্গে মিশিয়াছে তাহাকে বিশ্বাস করার ফল কি এই? ইন্দু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। মুখ ফুটিয়া যতীশকে কিছু বলিতে পারিল না। কেবল ত্রস্ত পদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কুন্তলার নিকট ছুটিয়া আসিল। কুন্তলা ভগিনীর আকৃতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই কুন্তলা ইন্দুকে লইয়া গৃহে ফিরিল কিন্তু ইন্দু কোন কথা কুন্তলার নিকট প্রকাশ করিল না।

পরদিন ইন্দু স্বামী গৃহে গমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। নরেনের একটা টেলিগ্রাম আসিল সে ছুটী পায় নাই সুতরাং যাইতে পারিল না। যদি সুবিধা হয় কোন এক বিশ্বস্ত পরিচারিককে সঙ্গে লইয়া ইন্দুকে যাইতে বলিয়াছে। কুন্তলা সে টেলিগ্রাম পড়িয়া বলিল "তা কি হয়! একটা চাকরের উপর নির্ভর করিয়া কি করিয়া তোমাকে যাইতে দিই। তুমি আরও দিন কয়েক এখানে থাক। পূজোর বন্ধে নরেন আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। ইন্দু উত্তেজিত ভাবে বলিল

উঠিল "না, না আর একদিনও আমি এখানে দেরী করিব না। আমি একাই যাইব।"

কুন্তলা বুঝিল সেটা ভাল সুতরাং সে আর বেশী জিদ্ করিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ইন্দু ট্রেনে চড়িল। কুন্তলা তাহাকে ছাড়িতে আসিয়াছিল। ট্রেনে চড়িয়া ইন্দু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ট্রেন ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই এমন সময় যতীশ একটা মোটরে করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত। সে দ্রুত পদে ইন্দুর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল "আমাকে ক্ষমা করিবেন; হয় ত আপনাকে বহু কারণে বিরক্তি করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া গিয়া চিরদিনই আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে রাখিবেন।" গার্ড হুইসিল দিল, ট্রেনের বিশালদেহে সজীবতার লক্ষণ প্রস্ফুট হইল। যতীশ কামরার বাতায়ন ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমি জানি তুমি সেখানে টিকিতে পারিবে না আমি তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। যখনি আহ্বান করিবে আমি তোমাকে সেই নির্জ্জন কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব। "আমি সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় রহিলাম।" ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ইন্দু সিমলা ছাড়িয়া বাঁচিল।

ইন্দু শিমলা ছাড়িল বটে কিন্তু যতীশের কথাগুলো সে কোনমতেই ভুলিতে পারিল না। যতীশ যাহা বলিয়াছে তাহা যে অতি অসম্ভব অতি ভয়ানক তাহাতে ইন্দুর সন্দেহ নাই কিন্তু যতই তাহার স্বামিগৃহের কথা মনে পড়িতে লাগিল, যতই সেই নিত্য অশান্তি, নিত্য অভাব, অভিযোগের কথা তাহার স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল ততই তাহার হৃদয়টা অপ্রসন্ন হইতে লাগিল, অমনি যতীশের কথাগুলো তাহার কর্ণকুহরে বজ্রনিঃস্বনে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। যতীশ যাহাই বলুক কিন্তু একটা সে খুবই সত্যকথা বলিয়াছে। ইন্দু যে স্বামীর নিকট টিকিতে পারিবে না সেটা ঠিক। সেই হতভাগা দেশে সেই অবাধ্য দাসদাসী গুলোকে লইয়া নিত্য অভাব অসুবিধার মধ্যে কি মানুষ বাস করিতে পারে? একটু আমোদ নাই; উৎসব নাই, প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার লোক নাই; হাত করিয়া শুইবার বসিবার কোচ কেদারা নাই এমন ভীষণ স্থানে ইন্দু কি করিয়া বাস করিবে? তবে কি সে যতীশের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবে? না না সে বড় ভয়ানক! ইন্দু কোন মতেই সে কথাটাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যদি যতীশ তাহার স্বামী হইত তাহা হইলে আজ তাহার সুখের অবধি থাকিত না। সেই ইন্দ্রালয়তুল্য প্রাসাদ, সেই মহার্ঘ বসনভূষণ, সেই প্রচুর বিলাসোপকরণ সমস্তই তাহার হইত! সে কতই না সুখী হইত! কিন্তু তাহার অদৃষ্টে ত সে সুখ নাই। সে যে দরিদ্রকে বিবাহ করিয়াছে। প্রেমকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া সে অর্থকে, ভোগকে, বিলাসকে বর্জ্জন করিয়াছে। তবে আবার ঐশ্বর্য্যের, ভোগের, বিলাসের আকাঙ্ক্ষা কেন? তাহার কিছুই না থাক, তাহার নরেন ত আছে। সেই যে তাহার ঐশ্বর্য্য, বিলাস, স্বর্গ। নরেনকে পাইয়া সে সব পরিত্যাগ করিবে, সব সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিবে। ইন্দু স্থির করিল এবার সে বিলাসকে বর্জ্জন করিয়া সামান্যা রমণীর মত থাকিবে। নরেনকে সুখী করিবে সেই সুখে নিজে সুখী হইবে।

(৩)

ইন্দু ষ্টেশনে নামিয়া স্বামীকে দেখিতে পাইল না। দুইজন আরদালী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি চিঠি দিল। ইন্দু কম্পিতহস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। "বিশেষ প্রয়োজনে সাহেব আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিলাম না। আজ দুই মাস পরে তুমি আসিতেছ। আমি তোমাকে ষ্টেসন হইতে লইয়া আসিতে পারিলাম না এ দুঃখ আমার কখনও ঘুচিবে না। তোমার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম। আমি শীঘ্রই ফিরিব।"

ইন্দুর হৃদয়টা হাহাকার করিয়া উঠিল। একমাত্র নরেনকে আশ্রয় করিয়া সে হৃদয়ের সকল জ্বালা দূর করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে আর সেই নরেন কিনা আজ গৃহে নাই। সে ত চিরদিনই এমনি করিয়া বাহিরে কাটাইবে তবে ইন্দু কেমন করিয়া তাহার এই শূন্য জীবন

যাপন করিবে। যতীশের কথাগুলি আবার তাহার কর্ণে প্রবলবেগে বাজিয়া উঠিল—যতীশ ত সত্য কথাই বলিয়াছে যে সে এখানে আদৌ টিকিতে পারিবে না। যাহাকে দেখিয়া সে সকল তুচ্ছ করিতে পারিত সেই যখন তাহার কথা একবার ভাবে না। তখন সে কি করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে শত অভাবের জ্বালা সহ্য করিয়া বাস করিবে!

অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে, অতি অশান্ত হৃদয়ে ইন্দু বাড়ী আসিল। সেই শূন্য ঘরখানা যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। এই নির্জ্জন নিরাভরণ দৈন্যময় গৃহে তাহাকে একা বাস করিতে হইবে! অসম্ভব! অতীত ছয় মাসে সে যত যন্ত্রণা যত জ্বালা, যত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, একটী একটী করিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল—ইন্দুর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

এমনি করিয়া আকুল চিন্তায় বিভোর হইয়া ইন্দু একটা দিন একটা রাত্রি কাটাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতেছিল ইন্দুর যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। যতীশের সেই মহার্ঘ সজ্জা সমুজ্জ্বল ঘরখানা তাহার মানস নয়নে প্রতিফলিত হইতে লাগিল আর তাহার স্বামীর সেই হীন গৃহ সজ্জা তাহার নয়নে, হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। দাসদাসীরা গৃহকর্ম্মের জন্য ইন্দুর নিকট আদেশ প্রার্থনা করিল—ইন্দুর হৃদয় রোষে, ক্ষোভে ঘৃণায় জ্বলিতে লাগিল। সে কি কেবল দাসীবৃত্তি করিবার জন্যই নরেনের নিকট আসিয়াছে? তাহার কি আর কোন মূল্য নাই? ইন্দু সব সহিতে পারিত যদি সে নরেনের স্নেহ, প্রেম ভালবাসায় মগ্ন থাকিত পারিত। নরেন কি এ টুকু বোঝে না।

সেত হৃদয়হীন, সে যদি ভালবাসিত, তবে ইন্দুর এত কষ্ট কিসের, তবে ইন্দু কি করিবে? যতীশের নিকট যাইবে। যতীশ তাহাকে ভালবাসে নিশ্চয়ই। তাহার জন্য সে পাগল। যতীশ তাহাকে কখনই এত উপেক্ষা এত অবজ্ঞা করিবে না। তারপর যতীশের নিকট গেলে, তাহাকে সংসারের এই নিত্য জ্বালা সহিতে হইবে না। একদিকে ঐশ্বর্য্য বিলাস, আদর, অন্যদিকে স্বামী—ইন্দু কি চায়? স্বামী দরিদ্র হোক ক্ষতি নাই কেবল যদি সে ভালবাসিত কেবল তাহার অবচিত প্রেম ধারায় যদি ইন্দুর বুকখানি ভরাইয়া দিতে পারিত তবে ইন্দু স্বামীর নিকট থাকিতে পারিত কিন্তু তাহার স্বামী না, না, আর ইন্দু তাহাকে চাহে না। ইন্দু যতীশের নিকটই যাইবে। লোকে নিন্দা করে করুক দিবারাত্রি অসহ্য যন্ত্রনায় তিল তিল দগ্ধ হওয়ার চেয়ে লোকনিন্দা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। ইন্দু একখানা চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসিল, তোমার কথাই সত্য। আমি এখানে থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে ··· ··· ··· ··· ইন্দুর হাত কাঁপিতে লাগিল, আর লিখিতে পারিল না কি যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। ইন্দু টেবিলের উপর লেখনীটা রাখিয়া দিয়া সম্মুখে চাহিল—দেখিল একখানি ফটো! ফটো খানি নরেনের বাল্যকালের। শৈশবে পিতৃমাতৃহারা বালক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে যেন সে কোন অজানা অচেনা দেশে কোন স্নেহভরা হৃদয়ের সন্ধানে ব্যস্ত! তাহার নয়নে কি কোমলতা কি গভীর স্নেহ! ইন্দু একদৃষ্টে সেই ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিল। ছবিখানি যেন বলিতেছে, ছিঃ ছিঃ ইন্দু আমার দাবদগ্ধ হৃদয় খানি শীতল করিবার জন্য তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি তুমি নিষ্ঠুর সামান্য অভাবের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ! ছিঃ ইন্দু ছিঃ। ইন্দু শিহরিয়া উঠিল—সে ধীরে ধীরে ছবিখানির নিকট গিয়া ছবিখানি পাড়িয়া, সেটাকে বক্ষে চাপিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল—যেন সেই নিঃশ্বাসে তাহার অন্তরের যত কালিমা সব নিঃশেষ হইয়া বহির্গত হইয়া গেল। তারপর ইন্দু ছবিখানি লইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে আপন ওষ্ঠাধর সংযুক্ত করিয়া দিল।

একটা দমকা বাতাস কক্ষে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে সেই অর্দ্ধলিখিত চিঠির কাগজখানা উড়াইয়া লইয়া গেল। ইন্দুর আর সে দিকে দৃষ্টি নাই। ইন্দু আবার সেই ফটো খানি চুম্বন করিতেছে এমন সময় নরেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "ইন্দু, ইন্দু, বল

আমার উপর রাগ কর নাই। "ইন্দু ছুটিয়া গিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। নরেন আদরে তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া শত চুম্বনে তাহার অশ্রুসিক্ত বদনখানি রক্তিম করিয়া দিয়া নিকটস্থ একটা সোফায় ইন্দুকে বসাইয়া ইন্দুর পার্শ্বে গিয়া বসিল। দুই জনে কত কথা হইতেছে এমন সময় আবার একটা দমকা বাতাসে সেই অর্দ্ধলিখিত পত্রখানা ইন্দুর পদতলে উড়িয়া আসিল। ইন্দু ত্রস্ত হস্তে সেটা তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিল।

উন্মত্ত বাতাস হো হো শব্দে হাসিয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

সন্তবাণী।

[সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ সংগ্রহ।]

(কবীর সাহেবের চিতাবনী।)

তোর বাড়ীর চারিদিকে কত দরোয়ান ও পাহারা-ওয়ালা; কিন্তু তাদের কেবল গাল বাজান সার। কোথা থেকে নিষ্ঠুর কাল এসে তোকে অন্দর মহল থেকে নিয়ে চলে গেল!

* * *

যার হাঁকে পর্ব্বত ফাটে। এক গণ্ডুষে যে সমুদ্র শোষণ করে, এমন যে মুনিবর তাকে পর্য্যন্ত কাল গলা ধরে নিয়ে যায়। তবে তুই কি নিয়ে অহঙ্কার করিস্?

* * *

এই সংসারে এসে অহঙ্কার ছেড়ে দে। এই ভবের হাট ত শিগ্‌গির ভেঙ্গে যাবে; যা নেবার হয় তা এই সময় নে।

* * *

এই সংসার ত কেবল দু দিনের জন্য, এতে আসক্ত হয়ো না। ভগবানের চরণে লাগ; তিনিই তোমাকে পূর্ণ সুখ দিবেন।

* * *

এই দেহখানি ঠিক একটি সরাইখানা; কামনা দ্বারা চালিত হয়ে মনরূপ পথিক এখানে কিছু দিনের জন্য বাসা নিয়েছে। আমি সব বেশ করে বাজিয়ে দেখেছি—কেউ কাহারও নয়।

হে কবীর, তোর এই নহবৎ দিন দশেকের জন্য বাজিয়ে নাও; কিছু দিন পর এই যে সুন্দর সহর ও রাস্তা তার কিছুই দেখ্‌তে পাবে না। বড় বড় বাড়ী তৈয়ের কর্‌ছো; কত কত টাকার রাস ও সোণার চাপ যোগাড় করে রাখ্‌ছো। হায়! এক পলকের মধ্যে এ সব ছেড়ে যেতে হবে।

* * *

তুমি ত পাঁচ তত্ত্বের একটা পুতুল মাত্র; চার পাঁচ দিনের জন্য এখানে বাসা করে আছ বই ত নয়।

* * *

তোমার ঘরবাড়ী, হীরামাণিক, জড়োয়া গহনা, লাখ লাখ টাকা—এ সব চার পাঁচ দিনের জন্য দেখে নাও। এ সকলই এক দিন কাল নষ্ট করে ফেল্‌বে।

* * *

কবীর, তুইও মর্‌বি, আর সকলেও মর্‌বে; তখন কেউ আর নাম কর্‌বে না। এমন যে জনকোলাহলপূর্ণ নগর তাও একদিন উজাড় হয়ে যাবে।

* * *

কি আশ্চর্য্য! তুই এত নির্ব্বোধ যে মৃত্যুকে ভুলে আছিস্! আটায় যেমন নুণ মিশে যায়, এ দেহখানিও তেম্‌নি মাটীতে মিশে যাবে।

এই সংসারের জন্মমৃত্যু ও দুঃখের কথা স্মরণ করে অন্য কাজ থেকে নিবৃত্ত হও। যে পথে চলা উচিত এখন থেকে সেই পথই ধর।

* * *

কৃষকের ক্ষেতটি মৃগ এসে সব খেয়ে গেল। ক্ষেতের মালিক যদি বেড়া না দেয়, ক্ষেত বেচারা কি করবে?

* * *

আমি এখানে এসে কিই বা করলেম, আবার এখান থেকে যেয়েই বা কি করবো? এ দিক্ ও দিক্ কোন দিকেই কিছু হলো না। লাভের মধ্যে আমার মূল ধন খোয়া গেল।

* * *

এই যে মনুষ্য জন্ম এ বড়ই দুর্লভ; এ দেহ বার বার পাবে না। গাছের পাতা ঝরে পড়লে, সে পাতা কি আবার ডালে লাগে?

* * *

রাজা, রাণা, ফকীর যেই হও না কেন, এলেই যেতে হবে, চাই সিংহাসনে চড়েই যাও আর শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েই যাও।

* * *

যার ভিতর ভগবৎপ্রেম হলো না, যে রসনায় তাঁর নাম করলো না সে নরপশু পাত্র; বৃথাই তার এ সংসারে জন্ম।

* * *

'আমার' 'তোমার' রূপ দড়ি দিয়ে সমস্ত সংসারটি বাঁধা। হে কবীর, তুই নাম ধরে থাক্; তা হলে তোকে কি কেউ বাঁধতে পারে?

* * *

হে কবীর, নিজে ঠকো সেও ভাল কিন্তু আর কাউকে ঠকিও না। নিজে ঠকলে বরং সুখ আছে, কিন্তু অপরকে ঠকালে বড়ই দুঃখ পেতে হবে।

* * * *

এক রাজা একদিন বিকালে বেড়াতে বেরুলেন। সঙ্গে লোকজন কেউ ছিল না। বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে এসে উপস্থিত। সেখানে দেখেন যে একটি ছোক্‌রা মাটি নিয়ে খেলা করছে। ছোকরাটির বেশ সুশ্রী চেহারা দেখে রাজা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি আর কিছু ভাল খেলবার জিনিষ নাই যে মাটি নিয়ে খেলা করছিস্?" ছোকরাটি বল্‌লে, "কি আর করবো! মাটি দিয়েই আমার শরীরটা তৈয়েরি হয়েছে, আবার এ মাটিতেই মিশে যাব। তাই মাটী দিয়েই খেলা করছি।" এ উত্তর শুনে রাজা ত অবাক্। তাঁর বড়ই ইচ্ছা হলো যে এমন সুন্দর ছেলেটি তিনি কাছে রাখেন। তিনি খুব খুসী হয়ে বল্‌লেন, "দ্যাখ্ তুই আমার সঙ্গে যাবি? তোকে আমার কাছে রাখ্‌তে চাই।" ছোকরাটী বললে, "তোমার সঙ্গে যেয়ে আমি কি করবো?" রাজা বল্‌লেন, "কেন? আমার কাছে থাক্‌বি। আমি তোকে খুব আরামে রাখ্‌বো।" এই কথা শুনে ছোকরাটি একটু ভেবে বললে, "তা বেশ, আমার একটি সর্ত্ত আছে, সেই সর্ত্ত যদি তুমি রাখ্‌তে পার তা হলে তোমার কাছ থাকতে রাজি আছি।" তখন রাজা তার সর্ত্তের কথা জানতে চাইলেন। ছোক্‌রাটি তখন বল্‌লে, "আমার সর্ত্ত এই যে আমি যখন শুয়ে থাকব তখন তুমি জেগে থেকে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, আমাকে খেতে পরতে দেবে কিন্তু তুমি নিজে খাবেও না পরবেও না, আর আমি যেখানেই যাইনা কেন, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" এই কথা শুনে রাজা বল্‌লেন, "তুই কি পাগল? তা কি হতে পারে? বরং আমি এই করতে পারি আমি যা খাব তা তোকে খাওয়াব, আমি যা পরবো তা তোকে পরাব, আর আমি যেখানে যাব সেইখানে তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।" তখন সেই ছোক্‌রা উত্তর করলো, "ওঃ! এই সামান্য বৃত্তি দিয়ে তুমি আমাকে রাখ্‌তে চাও! তা আমি যাব না। তুমি জান না আমি কার সেবক? যিনি আমার স্বামী তিনি কেমন শোন। তিনি আমাকে খাওয়ান কিন্তু নিজে খান না, আমাকে পরতে দেন, নিজে

কিছু পরেন না, আমি যেখানেই থাকি বা যাই না কেন সকল সময়েই তিনি আমার সঙ্গে আছেন, আমি জেগেই থাকি বা ঘুমিয়ে থাকি সব সময়ই তিনি আমাকে রক্ষা কর্‌ছেন। এমন দয়াল স্বামীকে ছেড়ে কি আমি আর কাহারও সেবক হতে পারি?" কথাগুলি শুনে রাজার চক্ষু স্থির। তিনি সবই বুঝ্‌তে পার্‌লেন, আর সেই দিন থেকে ভক্তি পথের পথিক হলেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বুদ্বুদ।

সমুখে অসীম অপার অগাধ
অকূল অতল সিন্ধু,
(তারি) অচল উচ্চ বক্ষের মাঝে
মোরা বুদ্বুদ্ বিন্দু!
হেরি বিস্ময়ে আলোক উজল
অযুত উর্ম্মি চল-চঞ্চল,
ছলছল ছুটে কলকল গায়
হেসে হেসে যায় রঙ্গে,
আমরাও চাহি—আমরাও ভাসি
খর তরঙ্গ ভঙ্গে!
আমরা জানিনা কেন এ সিন্ধু
ঘন দোদুল্যমান,
ক্ষুদ্র মোদের নিয়ে খেলা করে
অবিরাম গাহে গান।
কেন এ তীব্র মত্ত হরষে
কঠিন কঠোর হস্ত পরশে
পলকে জন্ম পলকে মৃত্যু
নিয়ত করিছে দান,
হাসায় কাঁদায় নিমেষেতে একি
পরিহাস—অপমান?

জীবনেরে মোরা ভালবাসি, চাই
হরষ পূর্ণ চিত্ত,
বাঁচিবার লাগি মরণ সাগরে
যুদ্ধ করিছি নিত্য।
কিন্তু হায় রে কি বিধান ভবে
আমাদের সবে মরিতেই হবে
ক্ষুদ্র আমরা ক্ষুদ্র শক্তি
নিমেষে হারাই প্রাণ,
আবার পলকে জীবন লভিয়া
হাসি নাচি গাহি গান।
চঞ্চল মোরা ক্ষণিকের তরে
যতখন বাঁচি হেথা,
সঙ্কুচিত সাগরে নিত্য
জানাই মর্ম্ম ব্যথা!
বধির সে শুধু হাসে ক্রূর হাসি,
মোরা শতচুর দূরে যাই ভাসি,
চক্ষের জলে একবার শুধু
গাহি বিদায়ের গান,
অজ্ঞাতে হতে এসেছি আবার
অজ্ঞাতে অবসান।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ।

আর্ট ও ভাবুকতা।

জগতে যখনি যে কোন দেশে আর্ট কিম্বা লিটেরেচারের উদ্দাম জাগরণ হয়েছে তার হেতু খুঁজলে দেখা যাবে—একটা মহাভাবের বন্যা দেশের লোকের মনের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। যেমন মরা গাঙ্গে বান ঢোকে না, তেমনি প্রাণহীন জাতের মধ্যে শিল্প বা সাহিত্যের বন্যা আসে না। মধ্যযুগের ইয়ুরোপ, প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন ভারত এ সব স্থানে এই রকম একটা প্রবল ভাববন্যা আসে যার ফলে শিল্প বা সাহিত্যের এরূপ জাগরণ হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম বৈষ্ণব সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে শতধা বয়ে গিয়েছিল।

ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে যতদিন না তেমনি একটা ভাবের মহাপ্লাবন আসবে ততদিন সাহিত্য বা শিল্প আবার কল্পনার মুখর হয়ে উঠবে না।

উপাসনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ছিলেন; কিন্তু যে ভাষায় তিনি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহার নামকরণ হইয়াছে, ব্রজবুলি বা ব্রজভাষা। এই দুইটী শব্দের মোটামুটি অর্থ সহজে বুঝিতে বিবেচনা হয় যে ব্রজবাসীরা যে বুলি বলেন তাহাই ব্রজবুলি এবং ব্রজভূমিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহাই ব্রজভাষা। কিন্তু ব্রজবুলি ও ব্রজভাষাকে এক করিতে গেলে মুস্কিল হয়; কেননা, ব্রজভাষা বলিয়া একটা ভাষা আছে; অথচ বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুকরণে অপর কবিগণ যে ভাষায় পদাবলী রচনা করেন, তাহার সঙ্গে ব্রজভাষার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। * * * বিদ্যাপতি ও তাঁহার অনুকরণকারী অপর কবিদিগের পদাবলী ব্রজবুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের নিজেদের মনগড়া মত। বৈষ্ণব কবিতাবলীর কতক অংশ যে ব্রজবুলিতে বিরচিত এই কথাটাই আধুনিক, বিদ্যাপতির কালে ও তাহার কিছুকাল পরেও বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পাঠ করিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহারা অবলীলাক্রমে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা শিখিতেন এবং পদাবলী পাঠে মুগ্ধ হইয়া পদসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। * * * কিন্তু যখন মিথিলার পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী শিষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং মিথিলায় ও বঙ্গদেশে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ উঠিয়া গেল, তখন লোক অল্পদিনে * * বিদ্যাপতি কোন দেশের লোক তাহা * * ভুলিল। অবশেষে এমন এক সময় আসিল যে পদাবলীর ভাষার একটা নাম না দিলে আর চলে না। এ ভাষা হিন্দী নয়, মথুরা বৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে যে ভাষা কহিত ও লিখিত, সে ভাষাও নয়। তবে এই ভাষাকে কি নামে অভিহিত করা যাইবে? সকল পদই ব্রজনায়ক ও ব্রজনায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত সুতরাং ইহাকে ব্রজবুলি নাম দিলেই ইহার যথাযথ নামকরণ হয়। এই নাম কল্পিত নাম মাত্র।

মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

—•(•)•—

স্টুডেন্টস্ ওয়েল্‌ফেয়ার কমিটি কলিকাতার সাতটী কলেজের প্রায় ৬০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে যুবকগণ শতকরা ৭১ জন স্বাস্থ্যহীন। কমিটীর মতে অধিকাংশ যুবকের শরীর ২১ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্টি লাভ করে, অর্থাৎ ২১ বৎসর পরেই জরা জীর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইউরোপে ৩০।৩৫ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ বিবাহ করে না আর আমাদের দেশে ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই জরা আসিয়া দেখা দেয়, মেয়েদের ত কথাই নাই।

কৃষক, বৈশাখ, ১৩৩০।

পাক রহস্য।

—•(•)•—

আমাদের দেশে পাক কার্য্যকে এখন হেয় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। আমাদের বেশ বিন্যাসাদির পারিপাট্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আহারাদির উপকরণ সেই অনুপাতে হ্রাস করা হইয়াছে। আহার কার্য্যটা কোনও রূপে শেষ হইলেই হইল। ইহার উপর আবার সাংসারিক সমস্ত অশান্তিকর ব্যাপারের আলোচনা আহারের সময়ই হইয়া থাকে। ইহাতে মন তিক্ত হয় এবং সেই জন্য ভুক্ত দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না। শাস্ত্রকার বলেন অন্নকে পূজা করিয়া গ্রহণ করিবে। অপূজিত অন্ন গ্রহণে বল বীর্য্য নষ্ট হয়।

পাক কার্য্য হীন কার্য্য নয়। ইহা একটী সাধনা। [illegible] গুণের বিকাশ [illegible] কার্য্যতাপি প্রভৃতি গুণ ইহার দ্বারা [illegible] চরিত্রের এতগুলি মহৎ গুণের বিকাশ হয়, তাহাকে হেয় কার্য্য বলা যাইতে পারে।

* * * * *

ভদ্রাসনের অগ্নিকোণে রন্ধনের ঘর করা উচিত। সেই ঘরে বহুতর ধূমপথ ও গবাক্ষ রাখিতে হইবে এবং মস্তক পর্য্যন্ত ভিত্তি লেপন করিবে। পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখ করিয়া চুল্লী প্রস্তুত করিবে। মাটির হাঁড়ি ধুইয়া রাখিতে হইবে। মৃত্তিকা হাঁড়ির রন্ধন উপকারী; অভাবে লৌহ পাত্রে। লৌহপাত্রের রন্ধনে চক্ষুর বিকার এবং অর্শরোগ ক্ষয় হয়। পিতলের পাত্রের পাক হিতকারী। ইহাতে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাম্র পাত্রের পাকে অরুচি জন্মায় এবং অম্লপিত্ত বৃদ্ধি করে। সোণার এবং রূপার পাত্রের পাকে আনন্দ এবং বীর্য্য বৃদ্ধি করে।

* * * মনোরম থালের মধ্যভাগে অন্ন দিতে হইবে। দাল ঘৃত মাংস শাক পিষ্টক মৎস্য ভোক্তার দক্ষিণে ক্রমে রাখিতে হইবে। ঝোল প্রভৃতি দ্রব্য দুগ্ধ, জল আচার প্রভৃতি ক্রমে ভোক্তার বামে রাখিতে হইবে। পকান্ন, পায়স, দধি, ইক্ষু, গুড়, উপরোক্ত দুই সারির মধ্যে সাজাইতে হইবে।

ভারতী—সঙ্কলন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

চিন্তার স্বাধীনতা।

(ক)

প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। সভ্য ও স্বাধীন দেশে শাসন যন্ত্র :আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে লোকমত অনুসারে চলে। এই সমস্ত দেশেও জনসাধারণ সমর্থন করিলে সরকার পক্ষ অনেক সময় এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু মিল (mill) বলেন গভর্ণমেণ্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এরূপ হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। যদি একজন ব্যতীত সমস্ত বিশ্বের নরনারী কোন বিষয়ে একমত হয় এবং কেবল একটী মাত্র লোক সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে তবুও কেবল একটী মাত্র লোকের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করা মানব জাতির পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না। ব্যক্তি বিশেষের চিন্তার স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করিবার যতটুকু ক্ষমতা জনসাধারণের আছে সেই ব্যক্তিরও তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিবার ঠিক ততটুকুই অধিকার আছে। যদি কোন মতামত জোর করিয়া দমন করা যায় তবে তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই সমাজেরই ক্ষতি সাধন করে। ইহাতে যাহারা ঐ মত পোষণ করে ও যাহারা ঐ মত দমন করে উভয়েরই সমান অনিষ্ট সাধিত হয়। যে মত জোর করিয়া দমন করা যায় তাহা ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত দুইই হইতে পারে। যদি তাহা সত্য ও অভ্রান্ত হয় তবে মানুষ সত্যকে লাঞ্ছনা করিয়া অনৃতের বঞ্চনাকে বরণ করিয়া লয়। আর যদি তাহা ভ্রান্তও হয় তবু ঐ মিথ্যার সংস্পর্শে আসিয়া সত্যের যে স্পষ্ট অনুভূতি জন্মে ও তাহার যে উজ্জ্বল রূপ ফুটিয়া উঠে তাহা হইতে মানুষ বঞ্চিত হয়।

(খ)

যে মত জোর করিয়া দমন করিতে চেষ্টা করা হয় তাহা সত্য হইতে পারে। যাহারা উহা দমন করিতে চায় তাহারা অবশ্য উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু তাহারা যে সংসারের ভুল ভ্রান্তির বাহিরে গিয়া অভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছেন তাহা মানিতে পারা যায় না। জগতের ব্যাপারে কোন মানুষ কখনো সুনিশ্চিত রূপে অভ্রান্ত হইতে পারে না। তর্কের সময় থিয়োরি (theory) হিসাবে মানুষ আপনাকে কখনো অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করে না। কিন্তু কার্য্যকালে মানুষ এই সত্যটি ভুলিয়া যায়। তাই অন্যের বিচার বুদ্ধিকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের মতকে জগতের বলিয়া চালাইতে চায়। জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্ এইখানেই মানুষ আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া ঠিক করিয়া বসে। কোন মতকে অসত্য বলিয়া দমন করিবার সময় তাহারাও যে ভুল করিতে পারে তাহা ভুলিয়া যায়।

সমাজের অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লোকে যে মতামত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মানব মানিয়া লয় ও মনে করে উহা পৃথিবীর জনসাধারণের মত সুতরাং উহা সত্য। ব্যক্তি বিশেষ যাহাদের

John Stuart Mill প্রণীত Liberty গ্রন্থের Liberty of thought and discussion অধ্যায়ের সারাংশ।

সংখ্যার্ধে আগে তাহাকেই সে জনসাধারণ বলিয়া ভুল করিয়া বসে এবং আপনার দল, জাতি, ধর্মসম্প্রদায় বা সম্প্রদায়কেই জগতের জনসাধারণ বলিয়া ভুল । ইহার মধ্যে যিনি সমগ্র মানুষ ও যুগধর্মকে স্বীকার করেন, তিনি স্ব উদারচেতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপে অতীতে কত কত যুগ, দেশ, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখে না। মানুষ কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া কোন মত সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যেতেই এক ব্যক্তি রোমে থাকিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় ধর্মকে জগতের একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছে ও অন্য আর এক ব্যক্তি হিন্দুস্থানের হিন্দু হইয়া পরম গর্ব করিতেছে। কিন্তু ইহারা কেহই ভাবিয়া দেখেন না যে তাহারা অভ্রান্ত নহেন এবং অপরের মতকে খণ্ডন করিবারও ইহাদের কোন অধিকার নাই। অতীত যুগে মানুষ কতগুলি সংস্কার ও ধারণাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল কিন্তু এ যুগে তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্জিত করা হইয়াছে। আবার এ যুগে যাহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে তাহা যে পরযুগে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাজ্য হইবে না তাহা বলা যায় না। সুতরাং কোন যুগে অধিক সংখ্যক লোকে কোন কিছুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা যে সত্য নাও হইতে পারে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

মিলের বিরুদ্ধবাদীরা হয় ত বলিবেন "তাহা হইলে কি মানুষ আপনার মত ভুল হইবার ভয়ে কোন কিছু না করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? চিন্তা করিবার জন্য মানুষকে ঈশ্বর মগজ বলিয়া পদার্থ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভুল করিতে পারে এই ভয়ে কি তাহাকে খাটাইতে হইবে না? ভ্রমপ্রমাদের অধীন হইলেও মানবকে বিবেক বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেই হইবে। আমরা যতদূর সম্ভব সতাই সরল ভাবে (honestly) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি সেই অনুসারেই কাজ করা উচিত। তাহা না হইলে জগৎ চলে না। সর্বাধিক কর্মচক্র অচল হয়। পূর্বপক্ষের [illegible] কি এ যুগে [illegible] যে মতবাদ [illegible] তাহাকে কি ভয়ে সমাজে প্রচারিত হইতে দেওয়া যাইবে? ব্যবহারিক জীবনের জন্য কতকগুলি মতকে সত্য মানিতে হইবে এবং সেই অনুসারে যাহা ভ্রান্ত বা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে।" কিন্তু (mill) বলেন কোন থিয়রিকে (theory) ব্যবহারিক সত্য মানিয়া লওয়া এক কথা আর সেটিকে ধ্রুব সত্য বিবেচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত তর্ক ও সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। যে বিষয়ে তর্ক ও প্রতিবাদ করিবার সুযোগ সকলকে দেওয়া হয় অথচ উহাকে কেহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না কেবল মাত্র তাহাকেই ব্যবহারিক সত্য বলা যাইতে পারে,—কোন বিষয়কে নিরঙ্কুশ সত্য ধরিয়া লইয়া তার বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ করিয়া লয়।

মানব সমাজে যে যুক্তি সঙ্গত সংস্কার ও আচার ব্যবহারের মোটামুটি অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মানুষের নিশিত ক্ষুর ধারের মত বুদ্ধির জন্য নয়। কারণ বড় বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও বিস্তর ভুল করিয়াছেন। সুতরাং তাদের মতে যাহা অন্যায় তাহা ঠিক অন্যায় নাও হইতে পারে। মানুষের ভুল ভ্রান্তি গুলি তাহার অভিজ্ঞতা ও ভুয়োদর্শনের দ্বারা ও তর্ক বিতর্ক সমালোচনার দ্বারা সংশোধন করা যায়। ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। আমরা কতকগুলি মতকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাজ করি কারণ আমরা সর্বদাই বিশ্বাস করি উহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে ত্যাগ করিতে পারিব বা সংশোধন করিয়া লইতে পারি [illegible] সুতরাং এই সংশোধনের যে উপায় স্বাধীন সমালোচনা ও মত প্রকাশ তাহা কোন কালে কোন যুক্তিতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া অনুচিত। কোন থিয়রি বা মতের যত অধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে পারে উহাকে ততই [illegible]

যত প্রকার বিচার করা যাইতে পারে, তাহা হইতে দাওয়া উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায়। পরস্পর বিরুদ্ধ মতের তুলনা মূলক সমালোচনা করিলে মিথ্যাকে ত্যাগ করা যায় ও সত্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। নিউটনের যে বৈজ্ঞানিক সূত্র আজ পৃথিবীতে গৃহীত হইয়াছে তাহা কত স্বাধীন তর্ক আলোচনা ও বাদানুবাদের পর। যে থিয়রিকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত জগৎকে আহ্বান করা হইয়াছে অথচ তাহাকে কেহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছে না—কেবল মাত্র তাহাকেই মানুষের মত অসম্পূর্ণ জীবের সত্য বলিয়া মানিয়া নাওয়া উচিত। যাহা বলিতেছি তাহা যদি আমি বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারি তবে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার কোন অধিকার আমার নাই। মানুষ ভুল করে; সে সত্যকে ঠিক জানিয়াছে কিনা তাহা কখনো বলিতে পারে না। তবু মানুষ জগতের ব্যাপারে যতটুকু নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে তাহা কেবল স্বাধীন চিন্তার দ্বারাই; অন্য রূপে নয়।

সকল মানুষই স্বীকার করে যে সকল জিনিষ এখনো সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয় তাহার সম্বন্ধে রীতিমত স্বাধীন আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেকে বলেন যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সমাজের নিয়ম ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্ত হিতকর; যদিচ তাহা ঠিক সত্য কিনা তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তবু সমাজের উপকারের জন্য এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনা ঠিক নয়। কিন্তু মিল বলেন যে সমস্ত বিষয় সমাজের হিতকর ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক প্রকৃত পক্ষে হিতকর কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আর যাহা সত্য নয়, তাহা মানবের পক্ষে কখনো হিতকর হইতে পারে না।

অথচ মানুষ কখনও এইরূপ হিতকর সামাজিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। মিল বলেন এমন কি ঈশ্বর, ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিশ্বাস সম্বন্ধেও মানুষ এই মনোভাব পোষণ করে। এই সকলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ বা—তর্ক করে সমাজ তাহাকে নাস্তিক বলে ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীব মনে করে। সমাজ বলে এ সব বিষয়গুলি সমাজের উপকারের জন্য তর্ক ও সন্দেহের হাত হইতে রক্ষা করা উচিত নয়? অবশ্য কোন মত সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলে তাহা বিশ্বাস করা খুব কিছু অন্যায় নয় কিন্তু সেজন্য দশজনকে ভাবিবার অবসর না দিয়া তাহাদের হইয়া কোন কিছু চিন্তা করিয়া দিয়া তাহা তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করা অন্যায়। ইহার বিরুদ্ধে ঐ দশজনের কি বলিবার আছে তাহা শুনা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে দেখা যায় প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ বা প্রশ্ন করা এ পর্য্যন্ত মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপে প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপকারিতা রক্ষা করিবার জন্য মানুষ বহু বহু নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে ও নূতন কোন ধর্ম্ম মতকে জোর করিয়া নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

মহাত্মা সক্রেতিস নূতন মত প্রচার করেন। তাহা পরযুগে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি তখন তাহা সমাজের অনিষ্টকারক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল ও সক্রেতিসকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছিল। যিশু নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তিনি আজ জগতের একজন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বর ও পবিত্র বিশ্বাসের নিন্দাকারী বলিয়া ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

রোম সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের মত ও উন্নত চরিত্র, কোমল হৃদয় ও বিদ্বান লোক খুব কমই আছে। অথচ খৃষ্টান ধর্ম্ম যে জগতের পক্ষে হিতকর নয় তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন ও জোর করিয়া তিনি ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিতে দিতেন না। ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তগণ নাস্তিকতা সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করেন, মার্কাস অরেলিয়ানেরও খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুরূপ মত ছিল। বিজ্ঞজন হইলেই যে ভ্রান্ত হইতে পারে না তাহা নয়।

Dr. Johnson বলিয়াছেন যে এই নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করাই খৃষ্ট ধর্ম্মের সত্য পরীক্ষার কষ্টি পাথর

হইয়াছে। যাহা সত্য তাহার এইরূপ পরীক্ষা হওয়াই উচিত ও তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহা শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু যিনি পরম সত্যের আবিষ্কারক তাহাকে যদি সাধারণ অপরাধীর মতো নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় তবে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হয়। কত কত মহাত্মা অতীতে সত্যপথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া অন্ধ ক্রুদ্ধ জনতার ক্রোধে মৃত্যু পথে পতিত হইয়াছেন। যাহারা এখনো সত্যকে এইরূপ ভীষণ নির্য্যাতনের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া লইতে চাহেন তাহারা সত্যের মর্য্যাদা বা উপকারিতা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই এবং মনে করেন ইতিমধ্যেই আমরা জীবন ধারণোপযোগী এতগুলি ব্যবহারিক সত্য লাভ করিয়াছি যে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে উহা আরো বেশী পরিমাণে পাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

জনসন্ বলিয়াছেন সত্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু মিল বলেন অনেক স্থলে অন্যরূপ দেখা গেছে। Martin Luther এর পূর্ব্বেও খৃষ্টধর্ম্মের শুদ্ধিক্রিয়ার আন্দোলন (Reformation) দেখা গিয়াছিল কিন্তু তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যেও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য কতবার এইরূপে থামিয়া গিয়াছে। কতকগুলি সত্য জিনিষ হয়ত বা এইরূপে চিরতরেই নষ্ট হইয়া গেছে! কিন্তু যাহা মিথ্যা তার উপর সত্যের এটুকু সুবিধা আছে যে সত্য একদিন ফুটিয়া প্রকাশ পাইবেই আর মিথ্যা একদিন ডুবিবেই। কিন্তু নির্য্যাতনের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠাকে ও উন্নতিকে পিছাইয়া দেওয়া হয়।

অনেক স্থলে সরকারের আইন কিছু না বলিলেও সমাজের উৎপীড়ন খুব কিছু দুর্লভ নয়। যাহারা ধনী তাহারা সমাজের এই চোখ রাঙানি উপেক্ষা করিতে পারে কিন্তু যাহাদের অপরের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে হয় তাহাদের পক্ষে সমাজেরই হোক্ আর সরকারেরই হোক্ দুইএর নিগ্রহই সমান।

সামাজিক নিন্দার ভয়ে অনেক নাস্তিক হয়ত বা ঈশ্বর বিশ্বাসী সাজিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। ইহাতে এদের মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া আছে। নাস্তিকতা সম্বন্ধে চিন্তার স্বাধীনতা খেলিতে না দেওয়ায় উহার মধ্যে কতটুকু সত্য মিথ্যা আছে তাহা ঠিক হইতেছে না। সুতরাং উহা লোপ পাইতেছে না বরং সমাজের ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতেছে। নাস্তিকদের মধ্যেও নৈতিক আদর্শে, জ্ঞানে, প্রেমে উচু দরের লোক আছেন। কিন্তু সামাজিক নিন্দা তাহাদের বুদ্ধিকে অচল করিয়া দিয়াছে। যদি বিচার-বুদ্ধিকে স্বাধীন ভাবে খেলিতে না দেওয়া হয় তবে তাহাকে খর্ব্ব করিয়া রাখা হয়। এইরূপে জগৎ যে কত তীক্ষ্নবুদ্ধি লোকের (যাহারা সমাজের নিন্দার ভয়ে ভীত) চিন্তার ফল হইতে বঞ্চিত হইতেছে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

(গ)

এইবার mill প্রচলিত বিশ্বাসকে সত্য ও নূতন মতকে মিথ্যা মানিয়া লইয়া স্বাধীন চিন্তার অভাব যে এ স্থলেও কি ক্ষতি করিতে পারে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যদি প্রচলিত বিশ্বাস সত্যও হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ আলোচনা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তবে সেই সত্যের অনুভূতি মিথ্যার মত হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহা প্রাণের জিনিষ তাহা প্রথার জিনিষ হয়। এখানে সত্য শুদ্ধ মাত্র শুষ্ক অনুশাসন বাক্যে (dogma) পরিণত হয়।

অনেকে মনে করেন যাহা সত্য জিনিষ তাহার মূলানুসন্ধান ও কার্য্য কারণ নির্ণয় না করিলেও চলিতে পারে। যাহা সত্য তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা সমাজের অনিষ্ট করিতে পারে। ফলতঃ বিরুদ্ধ তর্কের উত্তরে প্রচলিত সত্য বিশ্বাসের কি বলিবার আছে তাহাও এইরূপ জগৎকে শুনিতে দেওয়া হইতেছে না। এই অবস্থায় সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা একান্ত সত্য হইলেও মানবের কাছে তাহা কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইয়া উঠে। কারণ এ স্থলে তাহার সত্যানুভূতি জন্মে না।

কতকগুলি কথার সমষ্টি তাহার সম্মুখে থাকে ইহার যে কি গভীর অর্থ তাহা কার্য্য কারণের জ্ঞান না থাকায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই মানুষ দেখিয়া শিখিতে পারে না—ঠেকিয়া শিখে।

কোন বিষয়ের কার্য্য কারণ জানিতে ও মূলানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা সেই বিষয়ের সত্যানুভূতির প্রধান উপায়। যে মত সত্য বলিয়া বিবেচনা করি তাহার বিরুদ্ধ-তর্কের উত্তরে কি বলিবার আছে তাহা সকলেরই জানা উচিত। কেবল মাত্র তাহার দিক হইতে কি বলিবার আছে তাহা জানিলেও চলিবে না, বিরুদ্ধ বাদীদের তর্কের ধারা জানাও দরকার। যাহা সে সত্য বলিয়া জানে তাহার পক্ষে তর্ক হয় ত সে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই করিতে পারে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে তাহার পক্ষের যুক্তি গুলি জানা থাকিলেও সে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না বা তাহাদের তর্ক যে মিথ্যা তর্ক তাহাও প্রমাণ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কোন বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা তাহার উচিত নয়। গুরুর নিকট হইতে বিরুদ্ধবাদীদের তর্কের ধারা জানিয়া লইয়া তাহার উত্তর শিক্ষা করিলেও সে বিষয়টিকে ঠিক মত জানা হইল না। যাহারা উহার বিরুদ্ধে সমস্ত মনে প্রাণে লড়িতেছে ও জলন্ত ভাবে উহাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চায় তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিলেই সত্যের পূর্ণ প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতে পারে নতুবা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই অনেক বিষয়ের কারণ না জানিয়া তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে অনেকে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছে হয় ত সে খবরও তাহারা রাখে না।

আমরা যাহা বিশ্বাস করি তাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বলা যাইতে পারে তাহার সব কিছুই যে প্রত্যেককে জানিতে হইবে তাহা অনেকে বিশ্বাস করেন না। সমাজের মধ্যে এমন একজন থাকিলেই হইল যিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। জন সাধারণের এইরূপ ব্যবস্থাই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

সত্য মতের আংশিক জ্ঞানলাভেই যদি জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তবুও স্বাধীন চিন্তার উপকারিতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না—বা তাহার প্রয়োজনীয়তা কমে না। এই ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত হইলেও সকলকে জানিতে হইবে যে বিরুদ্ধ বাদীদের তর্কের রীতিমত ঠিক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আর যাহার উত্তর দিতে হইবে তাহা অপর পক্ষকে খুলিয়া বলিতে হইবে। আবার অন্য পক্ষ যদি সেই উত্তরের প্রতিবাদ না করিতে পারে তবে তাহা আদৌ সন্তোষজনক হইল কিনা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? কিন্তু এরূপ হইতে গেলেই স্বাধীন আলোচনার দরকার। যিনি সমাজের সকলেরই সব কিছু জানিবার প্রয়োজন না থাকে তবু যে দুই একজন অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির তাহা জানিবার দরকার কাছে তাহাদের বাদানুবাদের জন্যও চিন্তার স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক।

কোন সত্য বস্তুকে সকল দিক দিয়া সর্ব্বপ্রকারে সম্যকরূপে না জানিয়া তাহাতে কেবল মাত্র মানিয়া যাওয়াতে মানুষের পক্ষে বুদ্ধির দিক দিয়া দূষণীয় হইলেও নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া তাহা ক্ষতিকর হয় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। স্বাধীন চিন্তার অভাবে—লোকে তাহার মূল কারণ প্রভৃতি ভুলিয়া যায় এবং পরে উহার অর্থ ও বিকৃত হইয়া যায়। তাহা আর জলন্ত বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি রূপে থাকে না—মুখস্ত বুলির মত হইয়া মুখে মুখে ফিরে। যখন কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে সুরু করে তখন প্রচারক ও দীক্ষিতদের মধ্যে তাহার বিশ্বাস জলন্ত ও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যখন তাহা সকলে মানিয়া লয় ও সে সম্বন্ধে সকল তর্ক থামিয়া যায় তখন তাহা কেবল অর্থহীন শুষ্ক নীতি কথায় পর্য্যবসিত হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস যখন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় তখনই এই দুর্দ্দশা হয়। নিষ্ক্রিয় ভাবে কোন কিছু না বুঝিয়া গ্রহণ করা নৈতিকতার লক্ষণ নয়। কিন্তু সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে এই মৃত অর্থহীন মতামতগুলি হৃদয় মনের উপর এমন একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে যে তাহা ভেদ করিয়া কোন নূতন সত্য

বা বিশ্বাস প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অথচ এই মানিয়া লওয়া মতগুলি মনের দুয়ারে পাহারাওয়ালার কাজ করিতেছে মাত্র ; হৃদয় শক্তি বা বিশ্বাস ভরিয়া তুলিতেছে না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই কতগুলি ধর্ম্মমত মানে। কিন্তু আধুনিক যুগে কেহই সেই অনুসারে চলে না। আমাদের স্বার্থ ও লোকাচারই এখানে প্রবল। আমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মমতকে মান্ত ও শ্রদ্ধা করি কিন্তু স্বার্থ ও দেশাচারের সেবা করি। তাই দেখিতে পাই প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নাই। ইহা যে নৈতিক আদর্শ কত খাটো করিয়া দিয়াছে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। এ যুগে তাই আমরা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন প্রসার দেখিতে পাই না। অতীতে যখন এই ধর্ম্ম মতগুলিকে বিরুদ্ধ মতের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে হইত তখন ইহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি মানুষের ছিল। তাই এই ধর্ম্মগুলি প্রসার লাভ করিয়াছিল।

তবে কি মতের অনৈক্য থাকা জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ? এইখানে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। কোন মতকে সত্য বলিয়া যদি সকলেই মানিয়া লয় তবে কি তাহা শক্তি হারাইয়া নিপ্রাণ মত হইয়া দাঁড়ায় ? মিল বলেন "ঠিক তাহা নয়।" জগৎ যত জ্ঞানে বড় হয় ও উন্নতি লাভ করে ততই এইরূপ সুনিশ্চিত রূপে জ্ঞাত সত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সকলেই তাহা বিশ্বাস করে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মিথ্যাকে যদি এইরূপে মানিয়া লওয়া যায় তবে মানুষের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মতের অনৈক যখন কোন বস্তুর সহানুভূতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন তখন তাহা অভাব যে নিরবচ্ছিন্ন রূপে মানবের হিতসাধনই করিবে তাহা নয়। যে সব বিষয়ে মানুষ একমত হইয়াছে ও তর্ক স্বাধীন চিন্তা শেষ হইয়াছে—তাহা সকলকে ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য উহার পরিবর্ত্তে শিক্ষায়তনগুলিতে কোন উপযুক্ত পন্থা বাহির করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই প্লেটো (Plato) সক্রেতিসের উপদেশ গুঁলকে কথপোকথন ও উত্তর প্রত্যুত্তর রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গেছেন।

(ঘ)

আংশিক সত্য দুটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের প্রত্যেকটির মধ্যেই থাকা অসম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস গুলির বেশীর ভাগের মধ্যেই এই আংশিক সত্য আছে। এরূপ অবস্থায় দুটী বিরুদ্ধ মতের তর্ক আলোচনায় তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়া কোন মতের মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা বাছিয়া লইতে হইবে ও এইরূপে পূর্ণ সত্য লাভ করিতে হইবে। মানুষের একটা একচোখা সংস্কার আছে ও অর্দ্ধ সত্য লইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে। এমন কি মানবের যাহা জ্ঞানের উন্নতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা এই এক অর্দ্ধ সত্যকে ত্যাগ করিয়া অন্য এক অর্দ্ধ সত্যকে গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানব মনের এই পক্ষপাতিতা দোষ দূর করিবার জন্য স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনা আবশ্যক খুব বেশী। প্রচলিত মত যেরূপ নির্ভীক ভাবে ও জোরের সহিত প্রচারিত হয় নূতন মত প্রচারেরও ততটুকু সুবিধা দেওয়া উচিত। কারণ এইরূপেই উহার মধ্যে যে অর্দ্ধ সত্য লুকাইত থাকিতে পারে তাহা লোকের চক্ষুগোচর হইতে পারে। এইস্থানে mill যুরুপের অষ্টাদশ শতাব্দীর উদাহরণ লইয়াছেন। ঐ শতাব্দীতে লোকে ভাবিত যে জ্ঞানে দর্শনে মানুষ চরম উন্নতি লাভ করিয়াছে কিন্তু রুসো (Rousseau) তাহাদের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন মত প্রচার করিলেন। রুসোর মতের মধ্যে সত্য বেশী ছিল বলিয়া তাহা জয়ী হইল। পরবর্ত্তী যুগেও রুসোর মতামত মানুষের মন গঠন করিয়াছে ও করিতেছে।

কোন মতের মধ্যে অর্দ্ধ সত্য আছে বলিয়া mill ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলির সমর্থন করিয়াছেন। মিল বলেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মের নীতি শাস্ত্রের গ্রন্থ New Testament ও নীতি ধর্ম্মের পূর্ণ শাস্ত্র নয়। অবশ্য ইহার অনুশাসন উপেক্ষা করিবার জন্য নয় ; কিন্তু ইহার অসম্পূর্ণতাকে অন্য দিক হইতে ভরিয়া তুলিতে হইবে।

মানুষ একচোখা বলিয়া অনেক সময় আপনার মতকে একমাত্র সত্য মনে করিবে। এমন অবস্থায় বিপক্ষের সহিত মারামারি কাটাকাটি হইবার সম্ভাবনা। মিল বলেন নিরপেক্ষ লোকের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহারাই সাধারণতঃ পূর্ণ সত্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং এই কারণে মিল (mill) জগতের উন্নতির জন্য চিন্তার স্বাধীনতার জন্য দাবী করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ। আষাঢ়, ১৩৩০ ১০ম সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রাজকার্য্যের গুরুভারে অনবসর প্রযুক্ত মাধবীর সুযোগ্য কার্য্যাধক্ষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কার্য্যকুশল কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতে বঞ্চিত হইয়া "মাধবীর" বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ দে মহাশয় কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব "মাধবী" সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র টাকা কড়ি ইত্যাদি তাঁহার নামে পাঠাইবেন।

সম্পাদক।

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৵৹ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৹ আনা। নমুনার জন্য ।৵৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥৹ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্ব প্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ „	„	৬৲ টাকা
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ „	„	৪৲ টাকা

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	১২৲ „
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	„	১৮৲ „
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	১০৲ „
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	„	১৬৲ „
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	৮৲ „

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্ণে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতা সত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীনলিনী নাথ দে।

১ম বর্ষ, } আষাঢ় ১৩৩০। { ১০ম সংখ্যা।

চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে

রবীন্দ্রনাথের কথা।

আমি আজকে এই সভাতে আসবার জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম। আপনারা অনেকে জানেন আমি স্বভাবতঃ সভাভীরু লোক; পারতপক্ষে সভায় যেতে স্বীকার করি না। এখন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ক্ষীণ হয়েছে; যেটুকু বাকী আছে, মনে করি সেটুকুর আর অপব্যয় করব না। এই জন্যই সাধারণ সভায় যাওয়া বন্ধ করেছি। আমি তাঁহার আহ্বান দ্বিধার সহিত স্বীকার করেছি। তবে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে যখন সম্মিলন হয়েছে, তখন তাঁহার প্রতি যদি আমার সম্মান-অর্ঘ্য দিতে পারি, তা'র জন্য এসেছি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পূর্ব্বেই অভয় দিয়েছিলেন যে আমাকে বক্তৃতা করতে দিবেন না; কাজে কিন্তু তাহা হল না। আমার যা শিক্ষা হোল ভবিষ্যতে স্মরণ করবো।

আমি কি আর বলবো? আমি অপ্রস্তুত; অনেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। অনেকে বলেছেন, অনেকে বলবেন। তবে এখানে সভ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের চাইতে আমার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা দেশে বাঙ্‌লা সাহিত্যে ও ভাষায়—নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়েছিল, তখন আমি যুবা বা তার চাইতেও কম বয়সের; আমি প্রাণের সেই স্বাদ পেয়েছিলুম। বাঙ্‌লা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ; তখন নিতান্ত অল্প পরিসর ছিল। একলাই তিনি এক দশ ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, সমালোচনা, কথা প্রভৃতি সকল দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যে কত বড় কৃতিত্ব, এখন ভাল করে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। বাঙ্‌লা ভাষা পূর্ব্বে বড় নিস্তেজ ছিল; তিনি একাই একে সতেজ করে গড়ে তুলেছিলেন।

আগে আগে জয়দেব প্রভৃতির এবং বেণীসংহারের ছাঁদে সংস্কৃত ভাষায়ই বিস্তার হয়েছিল। সর্ব্ব ভারতে ভাব দান করতে হলে গ্রাম্য বা প্রাদেশিক ভাষা চলে না, এই বিশ্বাসে প্রাদেশিক বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে তখন সকলে ভাব দানাদান করতেন। ভাব সম্পদ দিতে গেলেই তাঁহারা তখন সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে দিতেন। কিন্তু এই

বাঙ্‌লা ভাষা তখন গ্রামের পরিধিকে অতিক্রম করে নাই ; গ্রামের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি লোকের সেকালে সে পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা না থাকিলেই, উপেক্ষা, দৈন্য ; তখন তাহাই হয়েছিল। আমরা আমাদের ভাষা দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে না পারি, তবে নিজকে বিলুপ্ত করে থাকতে হয়। যতদিন সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ না হয়েছিল, ততদিন আপনার উপলব্ধি কি পরের কাছে পরিচয় দিতে পারি নাই। এখন আমরা তাহা বুঝি না, কিন্তু কি পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে তাহা হয়েছিল—কি প্রতিভার বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেছিলেন, এখন তাহার কল্পনা করা যায় না। সেই প্রথম দিনে তিনি একলা ছিলেন ; পরে আরও ২।৪ জন হয়েছিলেন। ভাষার শুচিতার জন্য তাঁহারা কি করেছিলেন সে ইতিহাস এখন বিলুপ্ত। বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপ কত হয়েছিল ; তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। একাই সব্যসাচী ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নানারূপে বিচিত্রভাবে গড়ে তুলেছিলেন—এটা কম আশ্চর্য্য নহে। আমরা তাঁহার দ্বারা কত উপকৃত তাহা বলে শেষ করা যায় না। আধুনিক যুগের যা কিছু বাণী, সমস্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা বড় সাহস। তখন লোকে তাহা মনেই করতে পারত না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস যে বাঙ্‌লায় হয়; এটা তখন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল ; কাজেই তখনকার কবিতাও ইংরাজীতে হইত। বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জাতি তখন এই ভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র সেই জাতীয় ধ্বংসের প্রতিরোধ করেন। তাঁর সেই কাজটা কত বড়, আপনারা ভেবে দেখ্‌বেন।

তিনি ভাষার প্রথম বন্ধন মোচন করেন এবং ভগীরথের মত বহুদূর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহ প্রবাহিত করেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ এই বর্ত্তমান আকারের ভাষা পেয়েছি। আমি ভাষার জন্য নিজেও যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাও তাঁহারই কৃপায়। আমি যে আজ এসেছি তাহার কারণ আমার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আজ সকলের সম্মুখে জানালাম। আমি যে তাঁহার কাছে কত ঋণী তাহা স্বীকার করলাম। তিনি যে অস্ত্র ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন তাহা বড় কমজোর ছিল ; তখনও ভাষার শক্তিসঞ্চার হয় নাই। তিনি তখন সেই দুর্ব্বল উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেই গুলিকে তিনি খুব বুঝে সুঝে প্রয়োগ করেছিলেন। পথ ও ঘাট তৈয়ারী করার জন্য তাঁহাকে কত খাটতে হয়েছিল। সেই জন্য তাঁহাকে প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-গগনে আজ তিনি থাকলে অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সকলকে লজ্জা দিতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রভাত-গগনে তিনি যে সাহিত্যের প্রাণ এনেছিলেন। প্রাণশক্তি বড় কম শক্তি নয় ; তিনি ভাষাতে সেই শক্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ভাষার ভাবের কাঠামোও ছিল এক, ধারাও ছিল এক—যেমন নাটক লেখা হলে সব বিজয় বসন্তের ছাঁদে— * * * তিনি সেই ভাষায় সেই ভাবে বৈচিত্র্য এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈচিত্র্য নানাভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রাণ সঞ্চারের পরেই নানাপ্রকার রূপসৃষ্টি—আনন্দরূপ সৃষ্টি হয়। তিনি তখন ভাষায় সেই প্রাণে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যখন শুয়ে থাকি, ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সবাই প্রায় এক—জাগলেই বৈচিত্র্যের প্রভেদ হয়। আমাদের ভাষায় প্রাণের নূতন জাগরণে পূর্ব্বের এক রকমের একঘেয়ের আর আবৃত্তি নাই। সকলেই সজাগ হয়ে প্রয়োগ করতে পাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই নূতন প্রাণের জাগরণ দিয়েছেন। প্রাণ ছোট হয়ে আসে ; পরে বাড়ে। তখন এই প্রাণের—এই জাগরণের আয়তনের—আকার ছোট ছিল, এখন সেই প্রাণবীজ বড় হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই তাঁহার প্রতি আজ আমাদের এই নমস্কার নিবেদন। ভাষার প্রাণ সকলের চাইতে বড় ; জাতির প্রাণ অপেক্ষা ভাষার প্রাণ বেশী বড়; কাজেই সেই প্রাণদানকারীকে আজ আমাদের সকলের নমস্কার।

বিদ্যাদিত্য জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

বঙ্কিম স্মরণে। *

খুলেছে আজিকে মন্দির দ্বার,
এস গো তৃষিত তাপিত কেবা—
মায়ের পূজার নব আয়োজনে
কে দিবে অর্ঘ্য, করিবে সেবা?
তোরণ দুয়ারে মঙ্গল ঘট
তীর্থ সলিলে আজিকে ভরি',
পুণ্য ভূমির মাটি দিয়ে সবে
পাদ-পীঠ মা'র তুলেছে গড়ি।
পতিত পাবনী চরণ চুমিয়া
তুলেছে মায়ের মহিমা গান,
স্মৃতির সুরভি কুসুম গন্ধে
মত্ত মধুপ ধরেছে তান।
শ্রেষ্ঠ পূজার কত ইতিহাস
এখনো হেথায় লুকানো আছে,
বঙ্কিম-পূত সাধনার ভূমি
ওই যে ইহারি বুকের কাছে!
তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করি
মুছিয়া ফেলিতে দৈন্য লাজ,
দীনের অর্ঘ্য পুণ্য-তীর্থে
দূর হ'তে বয়ে এনেছি আজ।
দেবতার দেখা পাইনি জীবনে,
শুনেছি মধুর জীবন গাথা;
দাঁড়ায়ে হেথায় সম্ভ্রমে তাই
শতবার আজি নুইছে মাথা।

*   *   *

ত্রিংশ বছর আগেকার কথা—
বাঙ্গালীর দীপ নিভিল যবে,
সেই যে বিরাট আঁধারে ঘিরেছে,
চিরদিন কি গো তেমনি রবে?

নিন্দিত কণ্ঠে আজিকার দিনে
তোমারি অপার মহিমা গাহি,
আবার তোমারে নূতন করিয়া
বাঙ্গালীর মাঝে পাইতে চাহি;
নিরজনে কবে পল্লী মায়ের
নিবিড় স্নেহের কোমল বুকে,
ছায়াঘন ঐ বকুলের আড়ে
সুরভি কুসুম ফুটিলে সুখে;
সৌরভে তব ছাইল ধরণী
আকাশ বাতাস আকুল করি,
কীর্ত্তি তোমার হইল অমর
গর্ব্বে হৃদয় উঠেছে ভরি।
বঙ্গভাষার দীনতা দেখিয়া
নূতন করিয়া গড়িতে তারে,
সরস করিলে ভাব সম্পদে
ভাষার নবীন অমৃত ধারে;
নির্ঝর সম নৃত্য ভঙ্গে
ছুটিল লীলার লহরী তুলি,
বাঙ্গালীর ভাষা গদ্য আবার
জাগিল যুগের জড়তা ভুলি।
অন্ধ "রজনী" বক্ষের ব্যথা
বেজেছিল বড় তোমার প্রাণে,
সফল করিলে জীবন তাহার
"অমর" হিয়ার পরশ দানে।
ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছ পথ
গহন গভীর কানন পারে
ক্লান্তি তাহার হরিয়া লয়েছ
বন-বালিকার প্রীতির দ্বারে।
"নন্দার" নব অলকানন্দা
বহালে বঙ্গ বধূর বুকে,

* নৈহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সাহিত্য শাখায় পঠিত।

প্রীতির সুষমা ফুটালে কত না
বিকচ কমল "কমল" মুখে।
জাগালে "ভ্রমর" গুঞ্জন ধ্বনি
স্বামীর সোহাগ স্বপনে ভরি',
আশ্রয়ে নব "শান্তির" ছায়ে
ত্যাগের মুরতি তুলেছ গড়ি।
সারাটি জীবন লক্ষ্যের লাগি
খুঁজিয়া ফিরেছ কত না দেশ,
জীবনে কি কাজ, জীবন ভরিয়া
ভাবনায় তব ছিল না শেষ।
সংগ্রামে জিনি পেয়েছে খুঁজিয়া
ভক্তির নব পীযুষ ধারা;
সকল সাধনা চরণে তাঁহার
লুটায়ে পড়িলে আত্মহারা।
পল্লীর ঘন শ্যাম ছায়া কোলে
কখন উদাস রয়েছ চাহি
সাগর বেলায় রয়েছ চাহিয়া
আপনা হারায়ে চেতনা নাহি।
বুঝি অসীমের পার হতে ওই
চরণ ফেলিয়া কমল দলে,
উড়ায়ে শ্যামল অঞ্চল খানি
বিজন পল্লী ছায়ার তলে—
জননী তোমার আসিছেন কাছে
আলোকি ভুবন মধুরে হাসি,
ধেয়ান মগ্ন পরাণ ভরিয়া
দেখিছ অরূপ রূপের রাশি!
উল্লাসে তুমি গাহিয়া উঠিলে
মহীয়সী মা'র বিজয় গান,
মায়ের স্বরূপ দেখালে জগতে
জগত ভরিয়া উঠিল তান।

* * *

এই সেই তাঁর স্মৃতির শ্মশান,
চির আদরের জন্মভূমি;
ধন্য যাহার প্রতি ধূলি কণা
অমর তাঁহার চরণ চুমি।
বন্দনা মা'র গেয়ে ওঠ আজি
নব চেতনায় তাঁহারি সুরে;
উঠুক "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি
সারা বাঙ্গলার বক্ষ জুড়ে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা ও বাঙালী। *

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি—বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের শতস্মৃতিস্নাত এই পবিত্র তীর্থভূমে আজ আমরা মায়ের ডাকে মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছি। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজ একটা স্মরণীয় ও বরণীয় দিন। বরেণ্য বিদ্বন্মণ্ডলীর সমীপে আজ তাই সেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষের অঙ্কিত বাঙলার ও বাঙালীর চিত্র-পরিচয় লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। উদ্দেশ্য, বর্ত্তমানের লজ্জা-বিচ্যুতির দিনে অতীতের সাধনা-সম্পদ আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের সিদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভ। অতীতের গৌরব, বর্ত্তমানের হীনতা, ও ভবিষ্যতের কামনা এই ত্রিধারার মন্থনেই মায়ের ভাগবতী তনুর প্রকাশ এবং তাঁহার সন্তানগণের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি। সুখে দুঃখে, উত্থানে পতনে, জয় পরাজয়ে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় আমার দেশমাতৃকা অতীতের 'দেবী'—বর্ত্তমানের 'সাধনা' ও ভবিষ্যতের 'স্বর্গ'। সুতরাং এই ত্রিযুগের ভাব-ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া সোণার বাঙলার অপরূপ স্বরূপ ধ্যান করিতে না পারিলে আমরা মাকে ও তাঁহার সন্তানকে প্রকৃত চিনিতে বা বুঝিতে পারি না। সাধক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সে ধ্যানের মন্ত্র ও সাধন-পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সকল অভাব অন্তরায় দূর করিয়া, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিবলে বাঙালীর বাহু ও বাঙালীর প্রাণ, বাঙলার মাটী ও বাঙলার জলের সাহায্যে কেমন করিয়া শক্তিতে পূর্ণ ও গৌরবে গণ্য হইতে পারে, তিনি তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিতেও ভুলেন নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙলা ও বাঙালী সম্পর্কে তাঁহার সেই অলৌকিক ধ্যান ধারণার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু আপনারা আমার ন্যায় অক্ষমের সেই দুঃসাহসিকতা অনুকম্পার নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে কৃতার্থ হইব।

* নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সাহিত্য শাখায় পঠিত।

বাঙ্গলার রূপ দর্শন মাতৃসাধক বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যানস্থ হইয়া যেদিন এই শস্যশ্যামা পুষ্পবিভূষিতা সহস্র-নির্ঝর-ঝঙ্কৃতা বঙ্গজননীর রূপের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন, সেদিন তাঁহার মানস নয়নে মায়ের এক উদ্ভাসিত রূপশ্রী ফুটিয়া উঠিল। সেই শান্তোজ্জ্বল রূপালোকে ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা যেন নয়নের জড়তা ঘুচিয়া গেল! তিনি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিয়া ত্রিযুগে মায়ের ত্রিরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন।

(১) সর্ব্বপ্রথমে তিনি দেখিলেন—

"এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?"

উত্তর হইল—"মা—যা ছিলেন।"

আবার বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিলেন—"সে কি!"

উত্তর হইল—"ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা সকলঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।"

বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিভরে সেই জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়া গাহিলেন—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

(১) আনন্দমঠ—প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহার মনে হইল মায়ের এই রূপ বাঙলার সুদূর অতীত অবস্থার প্রতিকৃতি মাত্র। নিবিড় অরণ্যময় প্রদেশে যেদিন হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম বসতি করেন তাঁহারা দেশের স্বাভাবিক শস্যসম্পদের প্রাচুর্য্যবশতঃ আর্থিক উন্নতির প্রতিমারূপে মায়ের এই জগদ্ধাত্রী রূপেরই উপাসনা করিয়াছিলেন।

তারপর ভক্ত অপলক নেত্রে যখন সেই মূর্ত্তি দেখিতেছেন, সহসা যেন পট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল! কে যেন তাঁহার কাণে কাণে কহিয়া গেল—"দেখ, মা—যা' হইয়াছেন।

তিনি নয়ন না ফিরাইতে ফিরাইতে দেখিলেন ভীমা ভয়ঙ্করী এক কালিকামূর্ত্তি!

মায়ের এই নরমুণ্ডবিভূষণা মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ভরে তিনি প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন—

(২) "ইনি কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী; হৃতসর্ব্বস্ব এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!"

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাতে খেটক খর্পর কেন"?

উত্তর হইল—"আমরা সন্তান। অস্ত্র মা'র হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।"

ভক্ত প্রণত হইয়া গাহিলেন—

বন্দে মাতরম্।

* * * *

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে;
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ভক্ত বুঝিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্বের অন্তিম দশায় দেশের অবস্থার প্রতিচ্ছবি মায়ের এই বিভীষিকাময়ী কালীমূর্ত্তিতে বিরাজমান। মায়ের এই মূর্ত্তি বাঙ্গলার তদানীন্তন প্রতিরূপ।

বিস্ময়াপ্লুত নেত্রে ভক্ত মায়ের এই প্রতিমা দেখিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রকাশিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষীকুল গাহিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এক মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা এক দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে রাজরাজেশ্বরী জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে সমাসীনা!

কে যেন তাঁহার মনের কাণে বলিয়া গেল—"এই মা যা' হইবেন। দশভুজ—দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত। পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দশভুজা—নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী, ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী, বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। (৩)

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন পুনরুন্নত ও সমৃদ্ধ বঙ্গের প্রতি-কৃতি মায়ের এই দুর্গা প্রতিমায় নিবদ্ধ। এই মূর্ত্তি ভবিষ্যৎ বাঙলার ছবি। তিনি সেই ভুবন মনোমোহিনী প্রতিমার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া গাহিলেন—

বন্দে মাতরম্।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

---

(২) আনন্দমঠ—প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

(৩) আনন্দমঠ—প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

তার পর গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?" উত্তর হইল—যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

রূপদর্শনের মূলমন্ত্র।

ভক্ত বুঝিলেন যে দেশের সকল সন্তানের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া না উঠিলে মা জাগিবেন না। কিন্তু সকল সন্তান 'মা' 'মা' রবে গগন বিদীর্ণ করিলেই কি মায়ের সেবা করা হইবে? প্রকৃষ্ট সেবা ত সেরূপ নহে—সে সেবায় সবার আগে যে চাই শুদ্ধা ভক্তি।

তাই যখন দৈববাণী জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তর হইল—"পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল—"জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি"। (৪)

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন শুদ্ধা ভক্তি বলেই সোণার বাঙলাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাই শুদ্ধা ভক্তিকেই দেশাত্মবোধের মূলমন্ত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। মাতৃসাধক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দেবতা না হইলে ভক্তির প্রগাঢ়তা জন্মে না—মূর্ত্তি না হইলে সাধকের কল্পনা স্থিরতালাভ করে না। তাই তিনি দেশমাতাকে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা সর্ব্বার্থসাধিকা শরণ্যা, ত্র্যম্বকা, গৌরী নারায়ণীর আসনে বসাইলেন। তাঁহার চক্ষে জননী ও জন্মভূমি—মা ও মাটী চিরদিনের জন্য এক হইয়া গেল। তিনি বাঙলার স্বরূপ দর্শনের ফলে এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ভারতবর্ষ ও বাঙলা।

স্বদেশ বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই সোণার বাঙলাকেই বুঝিয়াছিলেন। কি বন্দে মাতরম সঙ্গীতে, কি সত্যানন্দ ঠাকুরের সাধনায়, কি কমলাকান্তের ধ্যানধারণায় তিনি বাঙলার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ প্রীতি কখনও সমগ্র ভারতবর্ষকে আলিঙ্গন করে নাই। স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে বাঙলার ও বাঙলাকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' রচয়িতা শ্রদ্ধেয় সমালোচক অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন—(৫)"বাঙ্গলা যে অংশে ভারতবর্ষের, ভারতবর্ষও সেই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের আপনার; বাঙ্গালী যে অনুপাতে বিশ্বমানবের অংশ, বিশ্বমানবও ঠিক সেই অনুপাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। * * * যে ব্যক্তি পুরাদস্তর বাঙ্গালী ও হিন্দু থাকিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির আলোকে স্বদেশের ও স্বজাতির চিরন্তনী সাধনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়, যে স্বদেশকে ভালবাসে, স্বজাতির গৌরবকাহিনী অনুশীলন করিতে প্রীতি অনুভব করে, যে আপন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্ব্বলতা অন্ধতাটুকু ভালরূপে ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে ইচ্ছা করে, যে আপনাকে নিজ সমাজের অখণ্ড অংশ ভাবিয়া নিজের সর্ব্ববিধ বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নিজের ও পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণসাধন আকাঙ্ক্ষা করে, যে জাতীয় ভাষার অনুশীলন করিতে গৌরববোধ করে, যে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মুখ্যতঃ স্বজাতিকে স্বদেশের ভাষায় শিখাইতে চায় এবং দেশীয় সমাজের মুক্তির পথ দেশীয় আদর্শের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ভালবাসে, যে এই সুমহান্ ও আয়ুষ্মান্ হিন্দুসমাজকে অচল, মৃত বা মৃতপ্রায় ভাবিয়া সুইডেন, ডেনমার্ক বা বেলজিয়মের সাহিত্য-গন্ধমাদনে মৃতসঞ্জীবনী অন্বেষণ না করিয়া এই সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি কোথায় তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া সেই শক্তির পরিপুষ্টি-ধারায় তাহার সকল অঙ্গের দুরীকৃত করিবার বাসনা করে, তাহার পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের * * শিক্ষা ধীরভাবে আলোচনীয়, নিপুণভাবে অনুধাবনীয় এবং অনেক স্থলেই শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণীয় বটে।" সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বাঙালী যতদিন না

(৪) আনন্দমঠ—সূচনা।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র—সূচনা। ২৩-২৪ পৃঃ।

আপনাকে চিনিয়া ও আপনার স্বরূপ বুঝিয়া খাঁটি বাঙালী হইতে পারিতেছে—যতদিন না সে আপনার জাতীয়ত্ব, আপনার বিশেষত্ব প্রকৃষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে—ততদিন তাহার পক্ষে ভারতবর্ষের সেবার ধ্যান-ধারণা সম্ভবপর নহে। 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, এক-পরামর্শী ও একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।" কিন্তু তিনি জানিতেন যে এই একভাবাবলম্বী হইতে হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতিকে জ্ঞানে গুণে ও শক্তিতে উন্নত হইতে হইবে; নতুবা সমগ্র ভারতের সেই একলক্ষ্যাভিমুখী হওয়া দুরাশা মাত্র। সোণার বাঙলার ভক্ত সাধক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর এই ষড়ঋতুবিচিত্রিত চিরস্বপ্নবিজড়িত স্নেহের অঞ্চলই আশ্রয় করিয়া তাই জ্ঞানে গুণে ও শক্তিতে তাহাকে জগতের দ্বারে গরিয়সী ও মহীয়সী প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

দেশমাতৃকার সেবা — স্বদেশ সেবায় সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও অধর্ম্ম বা পাপের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী" (৬) তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে অজ্ঞতাপ্রসূত উৎসাহ বা অজ্ঞানে আত্মদান দেশভক্তির লক্ষণ নহে। মাতৃপূজার আয়োজনে জাতিগত বিদ্বেষ, বিদ্রোহ বা রক্তপাতের স্থান নাই। নরহত্যা বা লুণ্ঠনাদির দ্বারা যে দেশোদ্ধার হইতে পারে এ কল্পনা নেশার ঝোঁকেও তাঁহার অহিফেনসেবী কমলাকান্তের মনে উদিত হয় নাই। যে দিন কমলাকান্ত সপ্তমীর শারদীয়া সুবর্ণ প্রতিমা দেখিয়া সেই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা (এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা) দেবীকে জননী জন্মভূমি বলিয়া চিনিয়াছিলেন সেদিন তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা। এবার সুসন্তান হইব। সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবি, দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব—পরের মঙ্গল সাধিব; অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা!" (৭)

কমলাকান্তের কল্পনানেত্রে সেদিন শুধু যে মায়ের প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল রূপের ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে—তিনি ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বল, ঋদ্ধি ও সিদ্ধির ছবি দেখিয়া মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়াছিলেন। কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন কেবল উত্তেজনায় দেশলক্ষ্মীর জাগরণ অসম্ভব—মাকে জাগাইতে হইলে চাই জ্ঞান গুণ ও শক্তি সঞ্চয়, চাই অটুট ও অহেতুকী ভক্তি আর চাই জাতীয় উন্নতিসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মজীবন গঠনের উৎকট আকাঙ্ক্ষা।

আবার রণাঙ্গন-প্রত্যাগত সত্যানন্দ যখন দেশোদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নিরাশমথিত হৃদয়ে বিষ্ণুমণ্ডপ মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন, তখন তাঁহার গুরুদেব চিকিৎসকরূপে দেখা দিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন—

"সত্যানন্দ! কাতর হইও না। * * * পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না, অতএব তোমরা দেশোদ্ধার করিতে পারিবে না। * * * ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। ত্রেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার; বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। সেই অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। * * * সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই। শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি।

(৬) আনন্দমঠ—সূচনা

(৭) কমলাকান্তে—"আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ।

* * * ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। **যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।** ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে, নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।" (৮)

ফলে দেখা যাইতেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই দেশের উন্নতির স্থায়ী সৌধ নির্ম্মাণ সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কল্পে যে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের অনুশীলন অত্যাবশ্যকীয় এবং সেই জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে জাতি অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান গুণ শক্তি সমন্বিত হইয়া রাষ্ট্রীয় চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে ও ধর্ম্মপ্রাণ হইবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। ভাবের আবেগে বা দাস মনোভাবের ফলে যে তিনি ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা ইংরাজকেই ভারতবর্ষের পরমোপকারী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন তাহা নহে। পরন্তু তিনি দেখিয়াছিলেন—

"ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে যাহা কখনও দেখি নাই শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। রত্ন যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটি * * * স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।" (৯)

এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে—

"আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। * * * অতএব ইহাই বুঝা যায় যে আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা জনিত কিছু সুখ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, **বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।**" (১০)

মোটের উপর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ইংরাজজাতির আগমন ও প্রভুত্ববিস্তার ভারতের ভাগ্যবিধাতার কল্যাণেচ্ছায় ঘটিয়াছে এবং এই ইংরাজশাসিত দেশে হিন্দু যতদিন না আবার জ্ঞানে গরীয়ান, গুণে মহীয়ান্ ও বলে বলীয়ান হয় ততদিন ভারতের তথা বাঙলার কল্যাণ এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত এবং ততদিন ইংরেজই ভারতের পরম মিত্র।

বাঙ্গালীর চরিত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাঙলা যে অংশে ভারতবর্ষের, ভারতবর্ষকেও সেই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বাঙলার কল্যাণসাধনে তাই তিনি বাঙালীকেই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে বদ্ধপরিকর হইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেশের এই নব-জাগরণের যুগে বাঙালী আমরা তাঁহার সে শিক্ষা কতদূর অনুসরণ করিতে পারিয়াছি তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখা উচিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি বাঙালীর চরিত্রগত দোষ দুর্ব্বলতা কেমন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা সকলকে বুঝিতে হইবে। স্বনামখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" প্রবন্ধের

---

(৮) আনন্দমঠ— চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ

(৯) বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম খণ্ড—"ভারত কলঙ্ক" প্রবন্ধ।

(১০) বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম খণ্ড "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধ।

সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে নব্য বাঙালীর চরিত্রের একখানি নিখুঁত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মণ্ডলউজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থ মধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্‌সনস, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মন্ত্রের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ী, তেমনি * * * মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গালা। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—পশু-চরিত্র-সাগর মন্থন করিয়া এই অনিন্দনীয় বাবুচাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি যে আপনিই এই গ্রন্থ মধ্যে গোমাংস ভোজন নিষেধ করিয়াছেন তবে বাঙ্গালীর মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন? গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট? গরুও যেমন উপকারী নব্য বাঙ্গালীও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্র রূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরিলাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবন ক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারকের গাড়ীতে বিলাতী মাল বোঝাই দিয়া রূপের বাজারে চোলাই করিতেছে এবং দেশহিতের ঘানিতে স্বার্থ-সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গরুকে কি বধ করিতে আছে? (১১)

অন্যত্র লিখিতেছেন—(১২) "এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যগণের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। * * * * যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী না হইল তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়?"

* * *

অক্ষম অনুকরণপ্রিয় আমরা ইংরাজের গুণগুলি পরিহার করিয়া দোষসমূহ গ্রহণে চিরাভ্যস্ত এবং ইংরাজের অনুকরণে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সাজিতে চাই দেখিয়া তিনি বলিতেছেন—

"বাঙালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। * * * আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিব না। গিলটী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যা নারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙালী স্পৃহনীয়। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" (১৩)

বাঙালী আমরা কতদূর ঈর্ষ্যাপরবশ ও আত্মোদর পরায়ণ জাতি তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

---

(১১) বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম খণ্ড 'অনুকরণ' প্রবন্ধ।

(১২) বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম খণ্ড "বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা প্রবন্ধ।

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম খণ্ড বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা প্রবন্ধ।

"আমি যখন প্রথম এখানে (বারুপুরে) আসি তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। * * * এখন জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। * * * সেই মহুরার দল আমাদের স্বদেশী, স্বজাতি আমার তুল্যপদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরং'।" (১৪)

নব্য যুবকের কুরুচির দোষে বাঙ্গলায় লোকশিক্ষার প্রকৃষ্ট আকর কথকতার লোপ পাইতে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়াছেন—

"একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য; যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুলকি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরাজীতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশা, অপার, অনালাপ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতার লোপ পাইল। (১৫)

বাঙ্গালী জীবনে সূক্ষ্মশিল্পের অনাদর লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টী বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালীর কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালীর বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালী সুখী হইতে জানে না। স্বীকার করি সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ। * * * কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য। * * * কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ। * * * বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই।" (১৬)

অন্যত্র বলিতেছেন—

"বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীতশিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং অন্য একটী গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে।"

আমাদের সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

"শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা

(১৪) বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক শ্রদ্ধেয় পরলোকগত কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্র। ঢাকা রিভিউ—মে ও জুন, ১৯১৯।

(১৫) বঙ্গদর্শন ১২৮৪, অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

(১৬) বিবিধ প্রবন্ধ—আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প—প্রবন্ধ।

লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল; রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, কি সুখ, তাহা নদের ফটিক চাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন, ইহাঁরা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিক চাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলায় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামার এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাট লক্ষ মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরাজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাটি লক্ষের ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গলার লোক যে শিখিল না!" (১৭)

শৈশবে উপার্জ্জনে অক্ষম পুত্রের বিবাহ দিয়া বংশ বৃদ্ধিরক্ষার প্রয়াসে জাতি যে উত্তরোত্তর ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন—

"ঘরে খাবার থাক বা না থাক আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য, সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য, সে জ্বর প্লীহার সাথী হইবার জন্য, টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে। * * * যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে দিতে না পারিল, তাহার বাঙালী জন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে ছেলে বেচারী বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ—রসদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরীব বিবাহিত তখন ইস্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড়হাত করিয়া ইংরাজের দ্বারে দ্বারে "হা! চাকরি! হা চাকরি!" করিয়া কাতর! হয় ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয়ত, সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির মন্ত্রণায় আর চাকরীর পেষণে—সংসার ধর্ম্মের জ্বালায়—অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা উমেদওয়ারি। আর লোকের কোন উপকার করিবার সম্ভাবনা নাই—কেননা আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের হিত-সাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ। লেখাপড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতে দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনকে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙলার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন ছেলেরও সর্ব্বনাশ, নিজেরও সর্ব্বনাশ"। (১৮)

বাঙলার বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী, চসমা অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে সাতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটার, তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান,

(১৭) বঙ্গদর্শন—১২৮৪, অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

(১৮) বঙ্গদর্শন—১২৮৮, ভাদ্র।

বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিবসাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহার কালে অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা তিনিই বাবু। যাঁহার কেবল যত্ন পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।" (১৯)

রাজপদে যোগ্যতর ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সৌভাগ্যবলে অযোগ্য ব্যক্তির অনুচিত প্রতিষ্ঠালাভ দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুচিরামের জীবনীতে বিমল হাস্যরসের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা এই শ্রেণীর প্রকৃত ও সম্ভাব্য অনেক মুচিরামের চৈতন্যের উদ্রেক করিবে। এই শ্রেণীর হাকিম-পুঙ্গবদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন।—

"দেশী হাকিমেরা কোন ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উচুতে ফলিলেন—নইলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেথানে ইচ্ছা সেথানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুইপ্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে; যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজী জুতা বলে ইহারাও সেইরূপ বিলাতী।" (২০)

অন্যত্র বলিতেছেন—

"(হে গর্দ্দভ!) তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক। হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও, তোমার দয়ার পার নাই।" (২১)

আজকাল রাজদরবারে সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা উৎকট উপাধি লোলুপ হইতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র "রজনী" উপন্যাসে" অমরনাথের মুখ দিয়া এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণের কথা জানাইয়াছেন—

"সংসারে এমন লোক কে আছে যে সে মানিলে সুখী হই? যে দুই চারিজন আছে তাহাদের কাছে আমার মান আছে, অন্যের কাছে মান অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি কেবল আপনার কাছে।" (২২)

নারীগণের দুর্ব্বলতা

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে সমাজের অপরার্দ্ধ নব্যানারীবর্গের দোষ দুর্ব্বলতার সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

নবীনাগণের প্রথম দোষ আলস্য। * * * * ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে। প্রথম শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আধার হইয়া উঠিতেছে। * * * সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে * * এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয় * * * সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে।

স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটী গুরুতর কুফল এই যে সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। * * * * তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। * * * গৃহিনী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নাগৃহিনীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। * * * * পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয়

(১৯) লোকশিক্ষা—'বাবু' প্রবন্ধ।
(২০) কমলাকান্তের দপ্তর।
(২১) লোকরহস্য—'গর্দ্দভ' প্রবন্ধ।
(২২) রজনী—দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এবং কলহ ঘটিয়া উঠে; অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্মসম্বন্ধে। * * যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এখনকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। স্ত্রীলোকগণের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। * * * নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক নিন্দাভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে। দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। * * * হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথি সৎকার। * * * নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইতেছে। * * * ধর্ম্মে যে নবীনাগণ নিকৃষ্ট তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা।" (২৩)

মাতৃস্বরূপিনী মহিলাগণের এই নিদারুণ শিক্ষাভাব দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভ করিয়াছেন—

"আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্ম কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশান লিগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্ম কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে এজন্তও একটি সভা আছে; কিন্তু বাঙ্গলার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্ম বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ-সংসাররূপ পাঠশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি? যায় না, কেন না তাহাতে * * * আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে? (২৪)

বাঙালীর সমাজে ও জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বহুবিধ দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বাঙালীর ভবিষ্যত উন্নতিতে কখনও আস্থা হারান নাই। দেশমাতৃকার সেই ভবিষ্যৎ দুর্গা প্রতিমা ধ্যানে দেখিয়া কমলাকান্তের মুখে তিনি জানাইয়াছেন—"এ মুর্ত্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না—কালি দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।" (২৫) "বাঙলার কলঙ্ক" প্রবন্ধে তিনি বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে বাঙালীর ভীরুতা কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন। (২৬) "বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা"য় তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন—"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙলা জয় করিয়াছিল এ কথা যে বাঙালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।" (২৭) ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কেবল নিন্দাবাদের উদ্দেশ্যে বাঙালীর সমাজের ও জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করেন নাই; পরন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত বহির্ম্মুখ বাঙালীকে অন্তর্ম্মুখ করিবার নিমিত্তই তিনি সেইগুলি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন। মনস্বী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নারায়ণের "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটি State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্য্যায় দেখিইয়াছেন। বাঙালীর প্রকৃতিগত জাতিগত এবং সংস্কারগত দোষ বা চ্যুতির ফলে

(২৩) বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ড—প্রাচীনা ও নবীনা প্রবন্ধ।

(২৪) সাম্য—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(২৫) কমলাকান্ত—"আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ।

(২৬) প্রচার—১২৯১, শ্রাবণ।

(২৭) বঙ্গদর্শন—১২৮৭ অগ্রহায়ণ।

কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না তাহাও তিনি অপূর্ব্ব চরিত্রোন্মেষের সাহায্যে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। "বাঙালীর এই প্রকৃতিগত জাতিগত এবং সংস্কারগত দোষ ক্ষালনের নিমিত্তই বঙ্কিমচন্দ্র আগে মাতৃমণ্ডপের আবর্জ্জনা দূর করিয়া পরে প্রতিমা আনিয়া স্থাপন করিবার জন্য বাঙালীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আজ ত্রিশ বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা ও বাঙালীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কি আমরা বঙ্কিমবর্ণিত দোষ দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া জ্ঞানে গুণে ও শক্তিতে সমাজে ও জীবনে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি। সত্য বলিতে কি বাঙালী আমরা আজিও আত্মস্থ হইতে শিখি নাই। আত্মবিস্মৃত আমরা আজিও যে আমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া দিকভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়াছি! আমাদের এই অন্ধ জীবন প্রবাহের দুর্ব্বার জলতরঙ্গ কে রোধ করিবে?

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের তাহাই লক্ষ্য হউক। তিনি বলিতেছেন—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়। সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি তাহার সত্যাসত্য নিরুপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি অনেক লিখিয়াছি অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্য ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এ টুকু শিখিয়াছি যে **সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি। এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।** জীবন লইয়া কি করিব? এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর আর সকল উত্তর অযথার্থ। (২৮)

অন্যত্র বলিতেছেন—

'শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে ঈশ্বর ভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।" (২৯)

সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভগবদ্ভক্তি—এই সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের ও দেশকল্যাণসাধনার সহায় হউক। সোনার বাঙলায় আবার তাহা হইলে সোনা ফলিতে সুরু করিবে এবং বাঙালীও জ্ঞানে গুণে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া জগতের দ্বারে আপনার অখণ্ড গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইবে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

(২৮) অনুশীলন—একাদশ অধ্যায়।

(২৯) কমলাকান্ত—বুড়ো বয়সের কথা।

মেদিনীপুর—তমলুক।

তমলুকের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধানতম অংশ। এই স্থানটী বহুনামে পরিচিত, মহভারতে তাম্র-লিপ্ত ভারতকোষে তাম্রলিপ্তী, শব্দকল্পদ্রুমে তমোলিপ্তী এতদ্ভিন্ন বেলাকুলং তমালিকা, দামলিপ্তং, তমালিপী, বিষ্ণু গৃহং প্রভৃতি বহুবিধ নাম প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। রত্নাবতী তমোলিপ্তি এবং পালিভাষায় তামলিত্তি সংজ্ঞায় তমলুক আখ্যাত। রত্নপুর বা রত্নাবতী পুরীও তমলুকের নামান্তর।

তমলুক তৎকালে কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী নগর ছিল তাহা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গ্রন্থ সমূহ হইতে জানা যায়। Tamalities, moreover, which has been satisfactorily identified with Tamluk (Indian Antiquities, Vol. XIII, P. 364), Tamalities represents the Sanskrit Tamrapti, the modern Tamluk (Ancient India as described by P'tolemy—J. W. Mc. crindle, P. 169) Fa Hian came to Tamralipti which was then the great sea-port at the mouth of the Ganges. There were 24 Sangharamas in this country (History of civilization in Aucient India— R. C. Dutt. Book IV. Chap VI. P. 511) The Ganges flows through the Tamraliptas (or Tamluk) Asiatic Researches Vol. VIII, P. 331. Tamralipta being on the sea at the month of the Ganges, and corresponding with it in appelation is always considered to be connected with the modern Tamluk (Journal of the Royal Asiatic Society Vol. V., P. 135). Tamralipti country lying to the westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north (General Cunningham's Ancient Geography of India, P. 504). As is proved historically by the mention of Tamralipta, 600 years before our era, as one of the most frequented port of Eastern India (Ancient Indla as described by P'tolemy, P. 73). Pliny mentions a people called Taluctal belonging to this Uart of India, and the similiarity of the name bears little doubt of their identity with the people whose capital was Tamluk (Ancient India as described by P'tolemy., P. 170), বহুপূর্ব্বে রচিত হিন্দুশাস্ত্রসমূহে ইহার যশোগাথা লিপিবদ্ধ আছে। "তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতট পুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি" (বঙ্গবাসী প্রেস—বিষ্ণুপুরাণ, পৃঃ ১৯০)।

"ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে" শুভান্॥

(বায়ুপুরাণ, Vol. I., p. 362 of Asiatic Society.)

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বনিজাশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্তঃ রূপানস্তাঃ সমীপতঃ"॥

(বিশ্বকোষ—৬৯০ পৃঃ)

শেষোক্ত শ্লোক হইতে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ যে তমলুক সন্নিহিত ছিল তাহা জানা যায়।

* * *

তমলুক এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। ইহা কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। (সুপ্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal

নামক গ্রন্থে তমলুকের পরিমাণ ১০১,৯২ বর্গমাইল (৬২২৩৪ একার), রাজস্ব ১২,৭৪১ এবং লোকসংখ্যা ২৬৫৯৫ জন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে ইহার পরিধি প্রায় ১২৫ ক্রোশ ছিল। পূর্ব্বে গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগর তমলুক সন্নিহিত ছিল ক্রমে গঙ্গার মোহনায় পলি পড়ায় সমুদ্র ক্রমে পুরিয়া উভয়ের অবস্থান এক্ষণে দূরবর্ত্তী হইয়াছে। তমলুক সমুদ্র তীরবর্ত্তী মহাঐশ্বর্য্যশালী বন্দর ছিল। তৎকালে ইহাই একমাত্র সমুদ্র যাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। বাঙ্গালীরা এখান হইতে সিংহল, যাভা, সুমাত্রা, প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ও পৃথিবীর অন্যান্ত বহুস্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। সুবিখ্যাত চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ফাহিয়ান ও হয়েন সাং প্রভৃতি পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে তমলুকের বহুপ্রাচীন বিষয় জানা যায়। ধনপতি সওদাগর বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রাকালে ইহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তমলুক দিয়া যাইতে হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন, তিনি তমলুকে দুইবৎসর অবস্থান করিয়া বহুশাস্ত্রাদির প্রতিলিপি ও মুর্ত্তিসমূহের অবয়বাদি লইয়া এখান হইতে সিংহল যাত্রা করেন। তৎপরে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এদেশে আসেন তিনি তমলুকে ১০০০ হাজার বৌদ্ধ উদাসীন ও ১০টি বৌদ্ধমঠ প্রত্যক্ষ করেন। সহরের একপ্রান্তে ভারত সম্রাট অশোক নির্ম্মিত ২০০ ফিট উচ্চ স্তম্ভ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী বিদ্যমান দেখেন। তাহাতে তৎকালীন প্রাচীন বুদ্ধগণ বিচরণ করিতেন। দুর্ল্লভ ও মুল্যবান দ্রব্যসম্ভার সদা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। পোতাধিকারীগণ ও লক্ষপতি বণিক সম্প্রদায়গণ সাধারণতঃ এই সহরের অধিবাসী ছিলেন। বৌদ্ধ মন্দির ব্যতীত ৫০টি হিন্দু দেবমন্দির ছিল। (Elphinstone-History of India Appendix IV; Samuel Beal-'Budhist Records of the Western World" Vol. II) মহাভারতীয় যুগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাম্রলিপ্ত রাজও অন্যান্য রাজাগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসূয় মহাসভায় যোগদান করেন (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সভাপর্ব্ব)। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে পাঞ্চাল দেশের কাম্পিল্য নগরে তাম্রলিপ্তরাজ অন্যান্য রাজাগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন (ঐ আদিপর্ব্ব)। সুতরাং এইরাজ্য যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশের সময় মান্দ্রাজ প্রদেশের "ভেলোর মিউটিনি" দমনার্থ তমলুক হইতে বহু সংখ্যক পদাতি সৈন্য প্রেরিত হয় ইহারা যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয় ছিল। ইংরেজ কোম্পানী সেই জন্য তৎকালে তমলুক অঞ্চল হইতে বাঙ্গালী সৈন্য গ্রহণ করিতেন। আর্কেডিকন সাহেবের চেষ্টায় এ স্থানে লবণোৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ হয়। বৎসরে বিশ লক্ষাধিক মণ লবণ প্রস্তুত হইত। ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে লবণ উৎপাদনের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। গঙ্গাবংশদিগের উৎপত্তি স্থল এই তমলুক প্রদেশ। ইহাঁদিগের রাজত্ব-কালে তমলুক অঞ্চলে জাহাজাদি নির্ম্মিত হইত। তমলুক মহকুমার বাসন মাদুর প্রভৃতি বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এখনও দেশ বিদেশে বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার শস্য জাত দ্রব্যের জন্য তমলুক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এইবার আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া গৌরব অনুভব করিব সেটী অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের তমলুক রাজপ্রাসাদে কৈশোর-জীবন অতিবাহন। (১ম পৃঃ চিত্র দেখুন) মধুসূদনের পিতা স্বর্গগত রাজনারায়ণ দত্তের সহিত রাজা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

তমলুক অতি প্রাচীন স্থান ইহা নানা অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখনও ১০।১২ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে সামুদ্রিক জীব জন্তুর অস্থি লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। গত তমলুক বন্যায় সঙ্করআড়া পুল (১ম পৃষ্ঠা চিত্র দেখুন) জলসাৎ হওয়ায় খালের গর্ভে পুল সন্নিহিত স্থানে জাহাজের কাঠ লোহ আদি পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা ১২৭৫ সালে দীনবন্ধু মিত্র নামে এক ব্যক্তি তমলুকে

একটী "পুরাণ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ এখানে প্রথম কনিষ্কের একটী তাম্রমুদ্রা ও কুমার গুপ্তের একটী সুবর্ণ মুদ্রা তাম্রলিপ্তি বন্দরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (রাখাল বাবুর "বাঙ্গলার ইতিহাস")।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে, সংস্কৃতগ্রন্থে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ইতিহাসে, সাহিত্যে ও কাব্যে এই তাম্রলিপ্তের পবিত্র যশোগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় মহাদেব দক্ষকে নিহত করায় দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তচ্যুত না হওয়ায় দেবতা-গণের পরামর্শে তিনি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াও পাপমুক্ত হন নাই। অবশেষে মহাদেব হিমালয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন। ভগবান বলিলেন যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকালে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সেই স্থানের মাহাত্ম্য বলিতেছি। ভারতবর্ষের দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ়তীর্থ অবস্থিত আছে। সেখানে স্নান করিলে লোক বৈকুণ্ঠ গমন করে। অতএব তীর্থরাজ্যের দর্শনে গমন কর। দেবাদিদেব তাহা শুনিয়া উক্তস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বর্গভীমা ও (১ম পৃঃ চিত্র দেখুন) জিষ্ণুহরি মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরসীনীরে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। সেই অবধি ঐ স্থান কপালমোচন তীর্থ নামে আখ্যাত (তমলুকের ইতিহাস)। তমলুকের বর্গভীমা, জিষ্ণুহরি, রামজী, জগন্নাথজী, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির উল্লেখযোগ্য। বর্গভীমা তন্মধ্যে বিশেষ গৌরবমণ্ডিত।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে সল্ট এজেণ্ট মহাত্মা হ্যামিল্টন সাহেব হ্যামিল্টন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে মিশনারীগণ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তমলুকের সুবিশাল রাজপ্রাসাদ খাটপুখুর, তমলুক ও বঁইচবেড়ে গড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গড়ের চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তি ও রাধাবল্লভজীউর মূর্ত্তি তৎকালের শিল্প নৈপুণ্যের অকাট্য প্রমান দিতেছে। এখনও দুর্গোৎসবে ২টি কামান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ব্যবহার করা হয়।

এখন অতীতের লুপ্তস্মৃতি যৎসামান্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কালের কঠোর নিষ্পেষনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ জানা

বর্ষা আহ্বান।

স্বাগত বরষা সুন্দরী অয়ি
সরস প্লাবন বুকে,
কাতর কণ্ঠে আহ্বানে তোমা
মেদিনী ঊর্দ্ধ মুখে!
নিদাঘের খর তীব্র শাশনে
নেহার কি দশা তার;
দীর্ণ হৃদয়, হৃত লাবণ্য,
শুষ্ক অস্থি সার!
দারুণ তৃষায় ফেটে যায় প্রাণ,
কণ্ঠে কথা না সরে,
গুরু অবসাদে নিশ্বাসে ঘন
আগুন ঠিকরি পড়ে!
অশ্রুবিহীন রক্ত নয়নে
তাই সে চাহিয়া তোমা,
ঘুঘুর বিলাপে ডাকে 'কোথা তুমি
ঋতুরাণী মনোরমা!'
ঘুচাও তাহার দুর্দ্দশা ওগো
করুণা প্রলেপে তব;
মেঘ মৃদঙ্গে করি করাঘাত
আশ্বাসে অভিনব।

বলাকার শ্রেণী সরণী দেখাতে
উড়িয়াছে দলে দলে,
ইন্দ্রধনুরা তোরণ সাজায়
পথে পথে কুতূহলে;
লাজ অঞ্জলি লইয়া বকুল
রয়েছে দাঁড়ায়ে মরি!
চমকি চপলা সুমুখেতে তব
চলিবে মশাল ধরি।
ভাটের মতন বন্দনা গাহি
দধিয়াল গাবে আগে;
পুষ্প চামর দুলাবে কেতকী
তব দেহে অনুরাগে।
এস অনিন্দ্যা পাবনী ধরায়
গুরু গুরু দ্রুত পায়,
সঞ্চরি নব চেতনার ধারা
মূর্চ্ছিত বসুধায়!
হাসিয়া উঠুক নবীন শোভায়
আবার ধরণী রাণী;
এস বাঞ্ছিত পরম মুক্তি
আকুল সর্ব্বপ্রাণী!

শ্রীনলিনী নাথ দে।

মায়ের ছেলে।

(গল্প)

(১)

অনিলের জেঠিমা যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পুত্র অমরনাথকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট অনিলকে কহিলেন "আর একবার অমরকে আমার অসুখের কথা জানিয়ে আস্‌তে লিখ্‌তে পারিস।"

"কেন পারব না জেঠিমা? তবে—"তবে কিরে অনিল?"

অনিল জানিত জেঠিমা কতখানি ব্যথা লইয়া দিন কাটাইতেছেন। কতবার পুত্রকে দেখিতে চাহিয়াছেন, সে আসে নাই, পত্রের উপর পত্র দিয়াও কোন ফল হয় নাই মাতৃদর্শনে আসা তুচ্ছ কথা, চিঠির জবাব দেওয়া পর্য্যন্ত সে পছন্দ করে না তাহাকে একবার মায়ের অসুখ বলিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে আবার দিলেও সে যে আসিবে অনিল যেন বিশ্বাস করিতেছিল না, তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "দাকে পত্র দিয়ে কি আনাতে পারব জেঠিমা?"

"তবে তুই একবার যা না বাবা—আমার যেন মনে হচ্ছে সে এবার আস্‌বে, আমার অসুখ সে কি না এসে থাক্‌তে পারে রে অনিল।"

জেঠিমার এতখানি বিশ্বাস দেখিয়া অনিল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। খানিক মৌন থাকিয়া কহিল "তোমাকে যে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না জেঠিমা।" জেঠিমা শীর্ণ-মলিন মুখে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "ভয় কি বাবা, অমল এসেছে, বড় বৌমা এসেছেন, আর সেবার ভাবনা কি রে অনু, তুই যা বাবা, তাকে আমার অসুখের কথা বল্লেই সে আসবে, বুঝলি।"

"তাই হবে জেঠিমা"—বলিয়া অনিল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(২)

দীননাথ ও প্রিয়নাথ দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দীননাথ, কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ। উভয়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার। অবস্থা বেশ সচ্ছল। জ্যেষ্ঠর একটী পুত্র অমরনাথ, কনিষ্ঠের দুইটী পুত্র, প্রথম অমলচন্দ্র; দ্বিতীয় অনিলচন্দ্র।

অনিলচন্দ্রের বয়স যখন এক বৎসর তখন তাহার মাতা ঠাকুরাণী বড় যায়ের হাতে পঞ্চমবর্ষীয় অমল এবং অনিলচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তার কিছুদিন পরে অনিলের পিতাঠাকুরও পত্নীর পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। অমল ও অনিল উভয়ে জেঠা মহাশয়ের ও জেঠাইমার স্নেহ অঞ্চলে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জেঠাইমাতা ঠাকুরাণী এই পিতৃমাতৃহীন বালক দুইটীকে লইয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্র অমরনাথ যেমন ইহারাও তেমনি আদরে এবং যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারপর কিছুদিন যায় দীননাথ বাবুও জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে যে তিনি কাতর না হইয়াছিলেন এমন নয় কিন্তু কাতর হইয়া হাত পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিলে তিনটী নাবালক সন্তান মানুষ হইবে না, এই ধারণায় তিনি হৃদয়ে বল বাঁধিলেন কিন্তু তাঁহার সারা অন্তরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি স্বামীর শোক নীরবে সহ্য করিয়া পুত্রগুলিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। দেবর পুত্র অমল এম, এ পাশ করিয়া বহরমপুর কলেজে প্রফেসরী করিতেছে। পুত্র অমরনাথ উকীল হইয়া আলীপুরে প্র্যাকটিস করিতেছে, পশার ও মন্দ জমে নাই। আর অনিল বি, এ পাশ করিয়া গ্রামে থাকিয়া কখন স্কুল মাষ্টারী করিয়া কখন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দিন

অতিবাহিত করিতেছে। যখন এই তিন সন্তান চাকুরী করিত না তখন একরূপ সুখেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু যেদিন অমরনাথ কলিকাতায় গিয়া ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করিল সেইদিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর প্রাণে একটু ব্যথার ছাপ পড়িতে লাগিল। অমর আর দেশে ফিরিতে বড় একটা চায় না, যদি বা আসে এক রাত্রি বাস। নিতান্ত জেদাজেদি করিলে বলে "ওরে বাবা পাড়া-গাঁয়ে মানুষ থাকে। এখানে বাস করতে আছে, যারা বাস করে তারা কি মানুষ! ওঃ কি ম্যালেরিয়া ইত্যাদি" বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। ইহাতে মাতা-ঠাকুরাণীর অন্তরে যে কত খানি বেদনা বাজিতে থাকে তা এক অন্তরযামী ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না। তিনি কোন দিন মুখ ফুটিয়া পুত্রকে কিছুই বলিতে পারেন নাই; এবং বলাটা যে নিষ্ফল তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কাজেই তিনি অন্তরের ব্যথা অন্তরে গোপন রাখিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছিলেন, নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা যত শীঘ্র পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন তাহাই তাহার একমাত্র কামনা হইয়াছিল। তিনি যে শরীরের প্রতি অবহেলা করিতেছেন তাহা অনিলের নিকট গোপন ছিল না, সে জেঠিমার নিকট সকল সময়েই রহিয়াছে, জেঠিমাকে সে ত পর ভাবিতে পারিত না, সে ভাবিত মা। যাহার স্নেহে তাহারা মানুষ হইয়াছে, সে মা না হইয়া অন্য কিছু যে হইতে পারে ইহা অনিল আদৌ ভাবিতে পারিত না। সে জেঠাইমার শুষ্ক মলিন মুখখানা দেখিলেই বলিত—"কিছু অসুখ করেছে কি জেঠিমা? কি অসুখ করেছে জেঠিমা"? জেঠিমাতাঠাকুরাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন "না রে পাগলা আমার কোন অসুখই করেনি"। অনুযোগ স্বরে অনিল বলিত "না তুমি বলছ না জেঠিমা" আমাকে লুকোচ্ছ বল না কি অসুখ করেছে?" জেঠিমা জানিতেন ইহার কোন জবাব নাই আর তা ছাড়া তাঁর প্রাণের ব্যথা ত কারো নিকট ব্যক্ত করা যেতে পারে না সুতরাং সেটা গোপন করিয়া অন্য কথার অবতারণা করিতেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর তিনি অসুখে পড়িলেন তার অসুখের লক্ষণ দেখিয়া সকলেই মনে করিল এ যাত্রা বুঝি রক্ষা হয় না। অনিল ভয় পাইয়া বহরমপুরে এবং কলিকাতায় পত্র লিখিল। বহরমপুর হইতে অমল চলিয়া আসিল কিন্তু কলিকাতা হইতে কোন পত্র বা লোক আসিল না।

(৩)

অনিল যখন অমরনাথের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। বৈঠকখানা ঘরে বেশ জটলা চলিতেছে। অনিল একটু থামিল ইচ্ছা হইল দাদার সহিত এখুনি সাক্ষাৎ করে কিন্তু একটু দাঁড়াইতেই যাহা শুনিল তাহাতে তাহার তখনকার ইচ্ছাটা দমন করিতে হইল, দাদা বলিতেছিলেন।—

"দেশের উন্নতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না কেন? এই কথা আপনি জান্‌তে চান, বেশ আমি পরশু দিন সভায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করে শোনাব। তবে মোটামুটি এইটে জেনে রাখুন যে দেশের প্রকৃত উপকার কিসে হবে তা কেউ তলিয়ে দেখছেন না—কল্পনাতে কি দেশের উপকার হয়, তা হয় না—যা হয় না তা নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামান কারণ কল্পনাটাই সব চেয়ে সোজা এবং অনায়াস লভ্য কিন্তু উপকার হয় বাস্তবে, লোককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে সে জাগবে কেন? কাজ করে কাজ বোঝাতে হবে তবে সে কাজ বুঝবে। এই যে আমরা দেশ দেশ করে চীৎকার করি বল ত আমরা দেশকে কতখানি ভালবাসি, এখন আমাদের এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পাশের বাড়ীতে কে আছে, সে পুরুষ না মেয়ে, উপবাস করছে না হেঁসে খেলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে—সে সংবাদ আমরা কি রাখি? রাখিনে। কিন্তু বিলেতে কি হচ্ছে তারা বলনাচে গিয়ে কি রকম আনন্দ করছে সে সংবাদ টুকু আমাদের ঠোঁটস্থ; জিজ্ঞাসা করলেই ফঠ্ করে বলতে পারব।" অনিলচন্দ্র আর দাঁড়াইল না অন্দরে প্রবেশ করিল। দ্বিতলে উঠিতেই সম্মুখে মেজবধূ।

"মেজবধূ সহাস্য মুখে কহিলেন ঠাকুরপো! অসময়ে হঠাৎ, কোত্থেকে এলে?"

"বাড়ী থেকে—জেঠিমার বড্ড অসুখ"।

"কি অসুখ ঠাকুরপো ?"

"কি অসুখ, তা অত বল্‌তে পারব না তবে এ পর্য্যন্ত জেনে রাখ, জেঠিমার এবার রক্ষা নেই। ঔষধ খান না পথ্য করেন না শুধু উপোস শুধু উপোস এতে কি মানুষ বাঁচতে পারে বিছানার সঙ্গে যেন মিশিয়ে গেছেন।"

মেজবধূ মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর করিয়া কহিলেন "কত দিন এমন অসুখ হয়েছে" ? "আজ প্রায় সতর দিন।"

"কই আমাদের জানাও নি ত।"

অনিল আকাশ হইতে পড়িল। কহিল 'বল কি মেজ বৌদি আমি যে চিঠির পর চিঠি, শেষে কোন জবাব না পেয়ে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করেছি।"

মেজবধূ ধীরে ধীরে কহিলেন "কই আমরা ত কিছুই পাইনি ?"

অনিল খানিক মৌন থাকিয়া কহিল 'মেজ দাদা আস্‌বেন কখন ?"

"রাত ১১টার কম নয় ত।"

"কেন এত রাত।"

"আর কেন! যে স্বদেশীর ধুম পড়েছে, সকাল নেই সন্ধ্যা নেই কেবল মিটিং কেবল মিটিং, মিটিং নিয়েই আছে।" বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।

মেজবধূ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "ওমা তাই ত, তুমি যে সেই দশটায় বেরিয়েছ আর এখন রাত দশটা বাজে, আগে মুখে একটু কিছু দাও তারপর সব কথাবার্ত্তা হবে।"

জলযোগ সমাপনান্তে অনিল যখন অমর বাবুর বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখনও বেশ জটলা হইতেছিল। অনিল ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বারেন্দায় দাঁড়াইয়া একটু শুনিল, একটু পায়চারী করিল শেষে বিরক্ত হইয়া বারেন্দার উপর এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর তখন "অমর বলিতেছিল Minor point গুলোর মীমাংসা না করে আমরা বড় বড় point নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। অনেক উকীল যেমন মোকদ্দমা চল্‌বে কিনা তা না দেখে তাঁরা দেখ্‌লেন কিনা কি কাগজে দলিল লেখা হল, কোন মুখো বসে টাকা নেওয়া হল, কত টাকা নগদ, কয়খানা নোট, দলীলের কজন সাক্ষী সই করেছে, এই সব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ফেললেন কিন্তু সে মোকদ্দমা চল্‌তে পারে কিনা তমাদি হয়ে গেছে কি Jurisdiction নেই এদিকে কিন্তু সে সব লক্ষ করলেন না, শেষে মোকদ্দমা হেরে গেলেন। এই রকম হয়েছে আমাদের দেশের অবস্থা, পরশু দিনকার মিটিংএ আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলব, হাকিমরা যেমন মোকদ্দমা বিচার করবার সময় ইস্যু ধার্য্য করেন এবং সেই ইস্যুগুলির বিচার করেন আমিও সেইরূপ কতকগুলি Point নিয়ে Deal করব যাতে লোকে সহজেই বুঝতে পারে—যে আমাদের গলদ কোনখানে, কেন আমাদের সব কাজে Failure হতে হচ্চে।"

একজন ভদ্রলোক কহিলেন "তা'হলে আপনার মত হচ্ছে যে Minor point গুলোর মীমাংসা না করে অন্য কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।" না নিশ্চয়ই না এ আমার একার মত নয় সমস্ত পৃথিবীর এই মত, গোড়া বেঁধে আগায় জল দাও, গোড়া না টিঁকলে গাছ বাঁচবে কেন ? তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি একতা একটা মস্ত জিনিষ, একতা না এলে কোন কাজে সফলতা নেই, যে কাজে হাত দেবে তাতেই ঠক্‌বে। একতা ভারতবর্ষে হওয়া বড় বিষম সমস্যা। এই একতা আনতে হলে সর্ব্বাগ্রে অন্ন সমস্যা দূর করতে হবে ; দেশের দরিদ্রগণের অভাব অভিযোগ শুনতে হবে, আর অভাব অভিযোগ যদি না মোচন করতে পার তা'হলে তারা তোমার কথা শুনবে কেন ? কিন্তু আমরা তা ত করছি নে, করছি কেবল তোমরা জাগো জাগো, তোমরা না জাগলে জন্মভূমির দুঃখ আর ঘুচবে না। দেশ ডুবতে বসেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি—এই সব লম্বা লম্বা কথার বাঁধুনি দিয়ে মস্ত মস্ত বক্তৃতা করছি, কাজেই কোন কাজে সফল হতে পাচ্ছিনে। এই একতা আনা অত্যন্ত শক্ত। তোমাকে বেশী দূর যেতে হবে না, সামান্য একটা পাড়াগাঁয়ের ঘটনা

বললেই যথেষ্ট হবে বোধ হয়, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে একটা না একটা দল আছেই। দুইপক্ষই বিপক্ষ পক্ষকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে, যদি তাতে সফলকাম হয় বাস্ তাদের আনন্দ দেখে কে এ শুধু পাড়াগাঁ নয় প্রতি সহরের ও এই অবস্থা, মিলে মিশে কাজ করা বড় সাংঘাতিক কথা আমাদের তা হয় না, সুতরাং যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

অমরনাথ বাবু থামিলেন। ঘরটা একেবারে স্তব্ধ, কেবল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছিল। খানিক পরেই ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। তারপর একটী ভদ্রলোক চেয়ার টানিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন আজ তা'হলে উঠি অনেক রাত্রি হয়ে গেল। অমর বাবু যেন একটু ক্ষুন্ন হইলেন কহিলেন। তাই ত' ক্রমে ক্রমে ঘর খানি জন শূন্য হইয়া গেল।

অনিল তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমরবাবু তখন ড্রয়ার হইতে ঘড়ী ঘড়ীর চেন এবং একতাড়া কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করিতেছিলেন। অনিলকে দেখিয়া হাস্য মুখে কহিলেন "কিরে, অনু তুই কখন এলি? বাড়ীর সব ভাল ত?"

অনিল দাদার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল "না মেজদাদা, জেঠিমায়ের খুব অসুখ এবার বোধ হয় বাঁচবেন না, তোমাকে দেখতে চেয়েছেন আমার সঙ্গে ভোরের ষ্টীমারে বাড়ী চল।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে অনিলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি বিস্ফারিত নয়নে অনিলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

অনিল ধীরে ধীরে কহিল "কি বলছ কাল আমার সঙ্গে যাচ্ছ ত।"

অমরনাথ আমতা আমতা করিয়া কহিল "হ্যাঁ—না ভাই কাল আমার মোটেই যাওয়া হবে না।''

অনিল বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল "কেন?"

"বিশেষ কাজ আছে তবে পরশুর পর যেতে পারি।"

"কিন্তু মা যে তোমায় বড্ড খুঁজছেন, তিনি কেবলি বল্‌ছেন অমর এসেছে রে এবং তোমায় দেখতে চাচ্ছেন।"

অমর খানিক মৌন থাকিয়া কহিল "আমার যে যাবার উপায় নেই অনিল, নইলে মার অসুখ আমি না গিয়ে থাকৃতে পারি? আমার যাওয়ায় খুবই ইচ্ছা আছে পরশুর পর দিন নিশ্চই যাব।''

দাদার এই না যাওয়াটার কারণ অনিলের বুঝিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হইয়া তাহার প্রাণের ভিতরটা এবং চোক দুটো জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল "পরশুর পরে গেলে কি মা'র সঙ্গে দেখা হবে? আমি আসার সময় মায়ের যা অবস্থা দেখে এসেছি তাতেই এখন তখন।"

কথায় বাধা দিয়া অমরনাথ বলিলেন "সে ত শুনছি কিন্তু কি করব উপায় নেই যে নইলে কি—এখন চল, অনেক রাত হল খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করবি তুই কাল ভোরে যাচ্ছিস ত?"

অনিলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল ভাবিল দাদাকে দু কথা শোনাইয়া দেয় বলে তুমি এখুনি দেশের কথা নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছিলে আজ মায়ের অসুখ তার চেয়ে কি সভা সমিতিটা বড়। কিন্তু কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় হইবে তা ছাড়া জেঠিমা আসিবার সময় নিষেধ করে দিয়াছেন যেন রূঢ় কথা না বলা হয়। কাজেই অনিল অন্তরের কথা অন্তরেই গোপন করিয়া নত মুখে 'আজ্ঞে না' বলিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

এদিকে অনিলের জেঠাইমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইতেছে। ঔষধ পথ্য স্পর্শ করেন না, নিতান্ত জেদাজেদি করিলে ফলমূল একটু দাঁতে কাটেন মাত্র। তিনি অনিলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া অবধি উৎকণ্ঠায় আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দেবর-পুত্র অমল তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার অবস্থা অতি মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। অনিল যাওয়ায় পর সেও যে উদ্বিগ্ন না হইয়াছে এমন নয় তবে জেঠাইমার মত অত কাতর হইয়া পড়ে নাই।

পরদিন প্রাতে অমরের মাতাঠাকুরাণীর অবস্থা একটু ভাল বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্য উদয় হইবা মাত্র কহিলেন "আজ অমর আসবে, নয় বড় বৌমা ?" বড় বৌমা খাশুড়ী ঠাকুরাণীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন কহিলেন "হ্যাঁ মা ? মেজ ঠাকুরপো আজ আসবেন।"

খাশুড়ী ঠাকুরাণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিলেন পারিলেন না—যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল। বড় বধূ ক্ষিপ্র হস্তে কাত করিয়া শয়ন করাইয়া দিল। খাশুড়ী ঠাকুরাণী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন "ঝরকাগুলো খুলে দাও ত বড় বৌমা ? ঘরে রোদ আসুক।" বড় বধূ জানালাগুলি খুলিয়া দিল, প্রাত সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ রাশি ঘরের মেঝেতে আছড়াইয়া পড়িল।

খাশুড়ী ঠাকুরাণী জানালা দিয়া সুনীল শান্ত এবং স্বচ্ছ আকাশের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন পরে ধীরে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি ডাকিলেন "অমল! বড় বৌমা, অমলকে একবার ডেকে দাও ত মা ?"

খানিক পরে অমল আসিয়া উপস্থিত হইল। জেঠাইমাতা তাহার বুকে হাত দিয়া কহিলেন "একটু সরে আয় বাবা!" অমল সরিয়া বসিল। জেঠিমা তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন "এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন বাবা। তোদের খাওয়া দাওয়া ভাল হচ্ছে না বুঝি—কিরে মুখখানা অমন করলি কেন বাবা? কি হয়েছে লক্ষ্মী বাবা আমার ?" অমল কথা কহিতে পারিল না—নত নেত্রে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। জেঠিমা বলিতে লাগিলেন, "আর দোষ বা কি তোরা দিন রাত পরিশ্রম করছিস্ একটু বিশ্রাম নেই আর তা ছাড়া তোদের সাহায্য করবার কেউ নেই"—বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জেঠিমা একটু থামিলেন পরে ধীরে ধীরে কহিলেন "কটা বাজল বাবা ?" "আটটা বোধ হয়" মা—"জেঠাইমা মৃদু ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন" মোটে ৮টা !"

জেঠিমার কথাবার্ত্তার ভঙ্গি দেখিয়া অমলের আশা হইল এ যাত্রা রক্ষা পেতে পারেন। কিন্তু জেঠিমা যাহার জন্য এতখানি উতলা হইয়াছেন সে কি আসিবে ? রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই, কেবলি বলিয়াছেন "রাত পোয়াতে আর দেরী কত বৌমা ? রাত পুইয়েছে কি ?" সে যত জেঠিমার কথা ভাবিতে থাকে ততই তাহার বুকের মধ্যে কে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে তাহার মনে হয় অনিল নিশ্চয়ই বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিবে। যে পাড়াগাঁয়ের নামে চটিয়া যায়, যে পল্লীগ্রামে জন্মভূমি হইলেও ছায়া মাড়াইতে শঙ্কিত হইয়া ওঠে সে কি আসিবে। পর মুহূর্ত্তে মনে হয় মায়ের অসুখ আসিতে পারে বোধ হয়। এই আশা আশঙ্কা তাহার প্রাণের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল।

"অমল"

"কি জেঠাই মা"

"আজ ত দশমী"

"হ্যাঁ"

"তা হলে পুরো জোয়ার—নয় বাবা ?"

জবাব দেবার কিছুই ছিলনা। পুরো জোয়ারে ষ্টিমারের আগে আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইলেও মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত অমরনাথের আসাও যে নিশ্চিত এমন কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। আর যদি অমর না আসে তা হলে জেঠিমার হৃৎপিণ্ডের ক্রীড়া যে হঠাৎ থামিয়া যাইতে পারে ইহাতে অমলের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

অমলের দীর্ঘ নিশ্বাস পতনের শব্দে জেঠাইমা চক্ষু মেলিয়া উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "তোরা বুঝি ভাবছিস, ভাবনা কি রে! মা কি সকলের চিরদিন বেঁচে থাকে, ছিঃ বাবা"—অমল আর সামলাইতে পারিল না বালকের ন্যায় ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় হাত দেখিয়া রোগীর মুখ মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া অমলকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে অমল বিষন্ন মুখে ঘরে প্রবেশ করিল। ক্ষীণকণ্ঠে জেঠাই মা কহিলেন "ওটা ক্লিসের শব্দ বাবা! জাহাজের বাঁশী নয় ?"

অমল নিস্তব্ধ। কি জবাব দেবে। ও বাঁশীটা যে কলকাতার ষ্টিমারের নয় ওটা কালনার ষ্টিমারের বাঁশী। কলকাতার ষ্টিমার আসিতে বেলা দুটো তিনটে বাজিয়া যাইবে। আর ত গোপন করা চলে না, কবিরাজ যে জবাব দিয়া গেল—বলিয়া গেল—গঙ্গাজলী করিবার সময় হইয়াছে। তাহা হইলে অনিলের সঙ্গে ত দেখা হয় না। অমল কোন জবাব করিতে পারিল না। জেঠাই মা উদাস দৃষ্টিতে একবার অমলের পানে চাহিয়া— পরে চারিদিকে কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন অমল বুঝিল—সে স্থির নির্ব্বাক কিন্তু অপলক নেত্রে জেঠাইমার পানে চাহিয়া—চোখে কোঁচার খুট দিয়া অশ্রু জল রোধ করিবার চেষ্টা করিল—জেঠাইমা অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ।"

(৫)

এদিকে অনিল রাত্রি হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ন্যায় ছটফট করিতেছে। পাগলের মত হাটখোলার ঘাট হইতে হাওড়ার পুল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি প্রায় ছুটাছুটি করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে।

পরদিন সকাল হইতে ষ্টীমারের ডেকে পায়চারী করিয়া উন্মত্ত ক্ষত এবং ব্যথিত প্রাণটাকে বৃথা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার প্রাণে অহরহ কে যেন বলিয়া দিতেছিল জেঠাইমার সঙ্গে দেখা হইবেনা।

তারপর যখন দশমীর জোয়ারে ষ্টীমার বেলা ৪টার পরিবর্ত্তে বেলা একটার সময় ঘাটে লাগিল তখন সে ষ্টীমার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রায় চলৎশক্তিহীন পা দুটোকে হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে বাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু দেখিল কি সম্মুখে বোধন বৃক্ষ মুলে কাহাকে শয়ন করান হইয়াছে—জেঠাইমা— অনিলের কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল সে "মা গো" বলিয়া জেঠাইমার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।

* * * *

শ্রাদ্ধ শান্তি হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য অমরনাথ আসে নাই বা চিঠিপত্র লেখে নাই। শ্রাদ্ধের খরচ স্বরূপ একশত টাকা দিয়াছিল মাত্র কিন্তু যথা সময়ে প্রেরকের নিকট তাহা ফেরত গিয়াছে। শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি কিনিতে অনিল কলিকাতায় গিয়াছিল বটে কিন্তু অমরনাথের বাসার রাস্তার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত মাড়ায় নাই।

শ্রাদ্ধের দু তিন দিন পরে অমল কহিল "আমি এবার বহরমপুর যাব আর ত কলেজ কামাই করিতে পারিনে। তুই জমি টমি গুলা একটু আধটু দেখা শোনা করতে পারবি!"

"আমি কি পারব! আমি হাত দিলে হয় ত মেজ দা গোলমাল করবে, একেইত সে আমায় দেখতে পারে না।"

"সে কি মানুষ—তার কথা ধরছিস্ কেন অনিল!"

"না যে মানুষ নয় তাকে ত তুমি ঢের চেন তাকে আমি এক দিনে চিনে এসেছি।"

অমল একটু হাসিল। পরে দেরাজ হইতে দুই খানি সংবাদ পত্র বাহির করিয়া অনিলকে পড়িতে দিল।

লাল পেনসিলে এক স্থানে দাগ দেওয়া, অনিল পড়িল,

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে দেশ-প্রিয় জনপ্রিয় অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুত অমরনাথ গুপ্ত ভায়া মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল। শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ভগবান সান্ত্বনা প্রদান করুন।"

দ্বিতীয় পত্রিকা খানিতে—

"অমরনাথ গুপ্ত ভায়া মহাশয়ের মাতৃ শ্রাদ্ধ কলিকাতা বাসা বাটীতে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলীর শুভাগমন হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক গণ্য মান্য হাকিম ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দরিদ্র নারায়ণ সেবার ত্রুটী হয় নাই। এইরূপ দান সাগর করা মাতৃভক্ত অমরনাথ বাবুর মতন মহাশয় ব্যক্তির শোভা পায়। এইরূপ মাতৃভক্ত না হইলে ঐকান্তিক প্রাণে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করা কি সম্ভবপর! দেশে অনেক মাতৃভক্ত ধনী ব্যক্তি আছেন

তাঁহারা অমরনাথ বাবুর পন্থা কি অনুসরণ করিবেন? ইত্যাদি।”

সংবাদ পত্র খানি অনিলচন্দ্রের হস্তচ্যুত হইয়া মেঝের উপর পড়িল। সে এই নিদারুণ নির্লজ্জতা ও ভণ্ডামীতে স্তব্ধ হইয়া সংবাদ পত্র দুই খানির উপর একটা তীব্র এবং ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপলক চোখে চাহিয়া রহিল।

শ্রীব্রজমাধব রায়।

জুয়া।

(উপন্যাস)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

সুরূপা সোমনাথকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সোমনাথ। আমাকে মাপ করবেন—আমি মনে করেছিলাম ছাদে এখন কেউ নাই—আমি নীচে যাইতেছি।

সুরূপা। না না আমিই যাইতেছি। আপনি থাকুন।

সোমনাথ। আপনি কেন কষ্ট করবেন—আমার নীচে কোন কষ্ট হবে না।

সুরূপা। আমরা স্ত্রীলোক আমরা যত কষ্ট সহ্য করিতে পারি আপনারা ত কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। আজ গরমে ঘরের ভিতর কেউ থাকতে পারে না—আপনি একটু ঠাণ্ডা হ'তে উপরে এসেছেন—আমি কিছুতেই ইহাতে বাধা দিতে পারি না। এই বলিয়া সুরূপা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। সোমনাথ 'আমাকে মাপ করবেন' এই বলিয়াই সিঁড়িতে নামিয়া সিঁড়ির দরজা দ্রুতগতিতে ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

সুরূপা 'এটা বড় অন্যায় হোল' বলিয়া উঠিলেন। আর কি বলিলেন সোমনাথ শুনিতে পাইল না। সোমনাথ দ্রুতপাদবিক্ষেপে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। শুইতে যাইয়া মনে হইল 'যে সিঁড়ির দরজা ত ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলাম- বেচারীর দরকার হইলে নামিবেন কিরূপে? আবার এত গভীর রাত্রে ছাদে একটী যুবতী মহিলা, সেই ছাদের দরজা একজন যুবক খুলিতে যাইবে ইহাও ত ভাল দেখায় না। মনে কোন পাপ না থাকিলেও যদি কাহারও সম্মুখে পড়িতে হয়। বোধ হয় রাত্রে ঘুমাইবেন—সুতরাং প্রাতে দরজা খুলিলেই চলিবে। যদি প্রাতে না উঠিতে পারি? তবে রাত্রে আর ঘুমাইব না।' এই ভাবিয়া সোমনাথ আলোটী জ্বালিয়া কাগজ পেনসিল লইয়া কোম্পানীর বিষয় যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগিল। একটী বিষয় ভাবিতে যায়—অমনি সুরূপার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, যেন সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে—কেন সে ছাদে উঠিতে গেল—কেন বা সুরূপাকে নীচে আসিতে দিল না—বোধ হয় সুরূপা তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া থাকিবে। বোধ হয় তাহার দাদাকে কাজে নামিতে বারণ করিয়া দিবে, বোধ হয় কাল হইতে তাহার সহিত কথা কহিবে না। কাজ করিতে পারিল না—ঘুমাইতে পারিল না—বিষ পান করিয়া যেন বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

* * *

সুরূপা স্বাধীন ব্রাহ্ম মহিলা সোমনাথের দ্বারা বন্দিনী হইয়া প্রথমে বড় চটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল এ ত বড় অন্যায় কথা—তুমি চলিয়া যাইতে পার,

তুমি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিলে কেন? সোমনাথ—একজন চরিত্রহীন বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। আচ্ছা, দরজা বন্ধ করিবার অভিপ্রায় কি? বাস্তবিক কি কোন অসদুদ্দেশ্য আছে? না সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই কাজটী করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে সোমনাথকে সয়তানরূপী মনে হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহাকে ভাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে বোধ হয় আমাকে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে দিবার জন্য না বুঝিয়াই এই কাজটী করিয়া ফেলিয়াছে। সয়তানের ছবি মিলাইয়া গিয়া দেবতার ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইতে লাগিল। আবার দেবতার ছবি মিলাইয়া গিয়া সয়তানের ছবি ফুটিয়া উঠিল। একবার মনে হইতে লাগিল যে সোমনাথ যেন তাহাদের দুই ভাই ভগ্নীকে নষ্ট করিবার জন্য সয়তানরূপে তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছে। আর একবার মনে হইতে লাগিল তাহাদের উদ্ধারকল্পেই স্বর্গের দেবতা সোমনাথরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। চারি দিকে নির্ম্মল বায়ু, মাথার উপর চাঁদিমা হাসিতেছে তথাপি ঘুম আসিল না। অনেকবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল—কিছুতেই সফল মনোরথ হইল না। যদিও মলয় পবন দেহ শীতল করিয়া দিতেছিল মাথার উপর চাঁদিমা নিদ্রার বড়ই বাধা জন্মাইয়া দিল। সুরূপা কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না।

*　　*　　*　　*

সোমনাথের ঘরে বিশেষ হাওয়া ছিল না বিছানাও গরম—কেদারায় বসিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত আঁখি হইয়া আসিল—গরম বিছানায় একটুক্ষণ আলস্য রাখিবে মনে করিয়া গরম বিছানায় শুইল—ঘরে আলো জ্বলিতেছিল হাওয়া নাই গরম বিছানায় শুইয়াও অচিরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িল।

বেলা ৮টা। ঘরের বেশী জানালা না থাকিলেও গ্রীষ্মকালের প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণ সমূহের তীব্রতা চারিদিকে প্রকাশ পাইয়াছে—কেদার আসিয়া সোমনাথকে ডাকিতে লাগিল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'ব্যাপার কি?"

কেদার। হেমেশ বাবুরা আপনাকে চা খাইতে ডাকিতেছেন।

সোমনাথ। শিকল তুমি খুলিয়া দিয়াছিলে?

কেদার শিকলের কথা না বুঝিতে পারিয়া মনে করিল, বাবুর বোধ হয় এখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। বলিল, কি বলিতেছেন?

সোমনাথ সামলাইয়া লইল। আর কোন উত্তর না করিয়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া হেমেশ বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। সুরূপা দেবী চা প্রস্তুত করিতেছেন। সুরূপা বা হেমেশের মুখে কোন অসন্তোষের ভাব দেখা গেল না। বরং হেমেশের মুখে প্রসন্নতার ভাব মাখিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল।

হেমেশ। বোর্ড অফ ডিরেক্টারস্ কি ঠিক করতে পারলেন?

সোমনাথ। আজ প্রভাতকে একটা কাতলা বাগাইবার জন্য পাঠিয়েছি দেখা যাক কি হয়।

হেমেশ। দুএকজনও কি ঠিক হয় নি?

সোমনাথ। একজন বড় সাহেব ঠিক হয়েচে।

হেমেশ। খাঁটি য়ুরোপীয় সাহেব?

সোমনাথ। হ্যাঁ

হেমেশ। বেশ। আর কোন ভাল লোক পেয়েছেন।

সোমনাথ। ২।৩ দিনের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলচি। এখন আমাকে প্রভাতের বাটী যেতে হবে। আমি যদি ঠিক খাবার সময় আসতে না পারি তাহা হইলে আমি খাইয়া আসিব। আর যদি সময়ে জুটতে পারি তা'হলে আপনাদের সঙ্গে খাইব। সোমনাথ চলিয়া গেল।

সুরূপা। দাদা আমি যে সোমনাথ বাবুর উপর একটু সন্দেহ করেছিলাম, তা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, লোকটি সরল প্রকৃতির।

হেমেশ। স্বরু তুমি সোমনাথকে সন্দেহ করায় আমারও মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল। অনেক দিন ভাবছিলাম যে তোমার মতের বিরুদ্ধে এ কাজ করব

কি না। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি—রাত্রে ঠিক করলাম আজ বলব যে আমি আর ওর সঙ্গে কোন কাজ করব না—তবে ও যাতে একলা ঐ কাজ করতে পারে তার সমস্ত উপায় ঠিক করে দেব। এই ত্যাগের ভাবটা মনে হয়ে সকাল বেলা মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। চা এর সময় সোমনাথের তাড়াতাড়ি দেখে আমার কথা গুলো বলবার অবসর পাই নাই—মনে হল ভাত খাবার পর ঐ কথাগুলো বলব। এখন বেকালে সুরু তুমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করে ফেলতে পেরেচ—আমার আর সোমনাথের সঙ্গে যোগ দিতে আপত্তি রইল না।

সুরূপা। সোমনাথ বাবু জীবনে একটা বড় হবেন এমন একটা আশা রাখেন—আর নিজে খুব আশাবাদী লোক বটেন—কিন্তু তাই বলে আমাদের কোন অনিষ্ট করবার মতলবে কিছু করবেন এ সন্দেহ মিথ্যা বলেই মনে হয়।

হেমেশ। ঠিক বলেছ সোমনাথে আর আমাতে এই তফাৎ যে সোমনাথ খুব আশাবাদী—আমি অত আশাবাদী নহি। তবে আমি একেবারে নিরাশাবাদী নহি

সুরূপা। তুমি ত একজন বড় কর্ম্মী। সোমনাথের এই কয়দিনের কাজ দেখিয়া মনে হয় সোমনাথও একজন উত্তম কর্ম্মী। খুব আশাবাদী হওয়ায় সোমনাথের যে দোষ তুমি একাধারে কারণবাদী ও আশাবাদী—তুমি সোমনাথের সে দোষে কাজ নষ্ট করিতে দিবে না এই আমার বিশ্বাস হয়েচে—আমি বরাবর নিরাশাবাদী থাকিলেও কাল থেকে যেন আশাবাদী হয়ে পড়েছি।

সুরূপা এই বলিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল। হেমেশ প্রস্পেকটাস সংশোধন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

বর্ষাগমে।

এলায়ে দিয়েছে ঘন কুন্তল
আকাশ পার,
বলাকা বিথির কুন্দ মালিকা
জড়ায়ে তার।
কদম ফুলের অর্ঘ্য রচিছে
বরিতে বরে,
ঝরা বকুলের আলিপনা আঁকি
বেদীর পরে।
দূর্ব্বাদলের মকমল পাতি
আবেশ ভরা,
বাদল বিন্দু মুকুতা ঝলসে
পাগল করা।
বজ্র শঙ্খ উচ্চে ফুকারি
প্রকৃতি রাণী,
দিকে দিকে ঘোষে, আজি বরিষার
আগম বাণী।
এক মনে আমি নিরখিতেছিনু
ভাবের খেলা;
বিকাইতেছিনু আমার আমারে
গোধূলি বেলা।
সোনার স্বপন হেরেছিল দেশ
একটু আগে,
সহসা আঁধার ঘনায়ে আসিল
অন্ধ রাগে।
চকিতে জাগিল নিভৃত মরমে
স্মিরিতি খানি,
ভুবমাঝ মাঠে কোথা তুমি আজ
হিয়ার রাণি!

তব ভাব ভাষা, আকুল পিয়াসা
প্রেমের রতি,
যুগপৎ আজ দলিছে আমারে
বিরলে মতি।
মনে পড়ে সেই পল্লী কুটীর,
মাধবী তলা,
নিরালা নিশিথে চাঁদের আলোতে
মানের ছলা
'বেলে'র মালাটি দোলায়ে গলায়
সাধিনু কত,
ক্ষণ পরে পুন মিলনে মাধুরী
জাগিল শত।
মাঠের পুকুরে বিকেল বেলায়
যেতে গো জলে,
কক্ষে গাগরী, বুকে আগ্রহ,
সখির দলে;
উড়িত আঁচল রৌদ্র রঙীন
নিশান সম,
ভঙ্গী দোদুল, অলসিত গতি,
মাধুরী কম।
সন্ধ্যা সকাল নিরতা থাকিতে
ঘরের কাজে,
আঙ্গিনায় আমি বসিতাম যবে
সবার মাঝে;
আন কাজ ছলে যেতে পাশ দিয়া
নয়ন ঠারি,
প্রেমের কুহকে বালিকা চতুরা
কি বলিহারী!
মনে পড়ে সেই বিদায় দৃশ্য
বক্ষ ভাঙা,
পাণ্ডুর মুখ, কম্পিত তনু,
চক্ষু রাঙা;
আকুল আবেগে ভুজ বল্লরী
জড়ায়ে গলে,
রুদ্ধ আবেশে বুকেতে আমার
পড়িতে ঢলে।
মেঘলা দিনের বাদল ধারার
গণ্ডী মাঝে,
পরবাসে আমি, পার্শে কই তব
সুরতি রাজে?
দূর যবনিকা পারে তুমি বসি
ভাবিছ কিবা,
অশত্থ তলার পল্লী কুটীরে
ছড়ায়ে বিভা।
ভুলে কি গিয়েছ সুর মূর্চ্ছণা
পিঙল সাঁঝে,
ফেলে কি দিয়েছ সাধের বীণাটী
অরতি মাঝে।
মনে কি জাগে না কান্ত বেদনা
এমন বেলা,
বরিষার আজি প্রথম বাদলে
সুষমা মেলা।

৺সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

বাজে কথা।

[মন্তব্য ঃ—'বাজে কথা'র দুই একটা কাজের কথা হয়ে পড়্তে পারে; কিন্তু সেটা "নিষ্কর্ম্মা" লেখকের দোষ নয়, পাঠকের দোষ বলেই জানবেন। পাঠক মহাশয় নিজে কাজের লোক হলে বাজে কথাও সময়ে সময়ে কাজের কথা হয়ে পড়ে।]

* * *

১৮৭৮, ১৮৭৯, ১৮৯০, ১৮৯২, ১৮৯৭, ১৯০০, ১৯০৮, সালে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে অনেক লোক এদেশে মারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ কয়েক বৎসর খাবার জিনিষের দামও খুব বাড়ে। লণ্ডন সহরের ২৭টি পাড়ার মধ্যে যে যে পাড়ার লোক ভাল খেতে পায় না সেই সেই পাড়ায় মৃত্যু সংখ্যা বেশী। সুতরাং খাবার ব্যবস্থাটাই আগে করা দরকার। শুধু মশা মার্‌লে কি হবে?

* * *

সেদিন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখলুম। এক ভদ্রলোকের কন্যা একটি সন্তান প্রসব করেন। দাই এসে নাড়ী কেটে ছেলেটীর নাভিদেশটি বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যায়। দুই তিন ঘণ্টা পর ব্যাণ্ডেজ খুলেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ ছেলেটির নাই থেকে খুব রক্ত পড়ে ভেসে যেতে লাগলো। তখনই বাড়ীর লোক ডাক্তার আনতে ছুটলো। এর মধ্যে সেখানে আর একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তিনি ব্যাপার কি জান্‌তে পেরে তখনই একটা কলার ডেগো নিয়ে এসে তাকে থেঁতো করে তার আট দশ ফোটা রস ছেলেটির নাইয়ের উপর ঢেলে দিলেন; আর তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। আর একটু পরেই ডাক্তার বাবু এলেন, তাকে আর বেশী কিছু করতে হলো না। আমাদের দেশে ত এখন অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক হয়েছেন। এই কলাগাছের রসের টিংচার বের করে একবার এর গুণ পরীক্ষা করে দেখ্‌লে কি ভাল হয় না?

আমরা ত শুনতে পাই শীতল জলে স্নান এ দেশের লোকের পক্ষে বেশ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও নাকি তাই বলে। কিন্তু Sir Charles Bedford আমাদের ছেলেদের জন্য একখানি বই লিখেছেন, তার নাম Elementary Hygiene for India. Director সাহেব ও Text book Committeeর কল্যাণেই হোক্ বা যে কোন কারণেই হোক্ বই খানির চারটি বড় বড় সংস্করণ হয়েছে। এই বইতে লেখা আছে :—"The whole body should be washed with warm water and soap once a day. Cold baths are too severe for most people in India". প্রত্যহ একবার করে অল্প অল্প গরম জল ও সাবান দিয়ে স্নান করবে; ঠাণ্ডা জলে স্নান এদেশের প্রায় লোকের পক্ষেই অসহ্য। বেশ উপদেশ! ছেলেরা যদি সাবান ও গরম জল ধরে তা হলে মরণের পথ আরও পরিষ্কার হয়ে আসবে! তাছাড়া সাবানের কাট্‌তিও হবে ভাল।

* * *

কিন্তু সাবানের কাট্‌তির জন্য এর চেয়েও ভাল উপায় আছে। এক মেম সাহেব ছিলেন। তাঁর ছেলেদের কেউ যদি কখনো কুকথা বা গালিগালাজ মুখে আনতো তা হলে তিনি তখনই সাবান দিয়ে ছেলেটির মুখ ধুইয়ে দিয়ে বলতেন, "দ্যাখ্ বাছা, এমন কুকথা বলে আর মুখ ময়লা করিস্ নি।" মেম সাহেবের শিক্ষাও বৃথা যায় নি। ছেলেরা আর কখনও খারাপ কথা মুখে আনতো না। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা যদি এই পথ ধরেন তা হলে মন্দ হয় না!

* * *

আমরা গালিগালাজ দেবার সময় মানুষকে "গরু" বলে থাকি। এ হেন গরুকে হিন্দুরা কি করে ভগবতী বলে পূজো করে আসছেন তা বুঝা বড়ই কঠিন। যাই হোক্, সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার বলেছেন যে খাদ্য দ্রব্যে কেবল পুষ্টিকর উপাদান থাকলেই হয় না,

তাতে Vitamin না থাকলে পুষ্টিকর উপাদানে কোন কাজ হয় না; এই Vitamin তিন রকম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে গরুর দুধে এই তিন রকম Vitamin ই বিদ্যমান। এই জন্য দুধের মত আদর্শ খাদ্য আর নাই। আবার Popular Science Journalএ ত এবার দুধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। তাতে লেখা আছে যে আমেরিকার রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করেছেন যে দুধের মত বলকারক খাদ্য আর নাই; তাঁরা বলেন যে প্রত্যেক যুবকের অন্ততঃ এক পোয়া খাঁটী দুধ প্রত্যহ খাওয়া চাই, ছেলেদের দুধের পরিমাণ যে অন্ততঃ এক সের বা তিন পোয়া হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন কথাই হতে পারে না, যাদের পক্ষে দুধ সহ্য হয় না, তাদের পক্ষে খুব অল্প মাত্রায় আরম্ভ করে দুধ খাওয়া অভ্যাস করা উচিত।

* * * *

এখন কথা এই যে খাঁটি দুধ পাবেন কোথায়? দেশের গরু ত এক রকম সাবাড় হয়ে এল, তা রোগেই হোক্ বা মাংস খেয়েই হোক্। গত বৎসর যে রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে হাজার হাজার গরু চালান যেত এবার দেখি সেখান থেকে একটা গরুও চালান যায় না। সর্ব্বগ্রাসী কলিকাতা সহরে কেমন খাঁটী দুধের আমদানি হয় তা একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলেই দেখতে পাবেন। হাঁড়ি হাঁড়ি দুধ গাড়ী হতে নাম্‌ছে; জেল খানার কয়েদিদের গলায় টিকিটের মত প্রত্যেক হাঁড়ির গলায় একটি করে টিকিট বাঁধা আছে, তাতে লেখা আছে "জলমিশ্রিত দুগ্ধ"। একটু নমুনা নিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে "জলমিশ্রিত দুগ্ধ" না লিখে "দুগ্ধ মিশ্রিত জল" লিখলেই ঠিক হ'ত।

* * *

আদর্শ খাদ্যের ত এই অবস্থা। এখন উপায় কি? দ্রোণাচার্য্য এক উপায় বের করেছিলেন, তিনি ছেলেকে পিটালু গুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেগুলো নিতান্ত বেআড়া, তারা এ ব্যবস্থায় রাজি হবে কেন? কাজেই রবিন্সনের পেটেন্ট বার্লি এসে দুধের জায়গা অনেকটা দখল করেছে। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী আর একটি পথ দেখিয়েছেন। তিনি দুধের সঙ্গে একবারে non-co-operation করতে বলেন। তিনি বলেন যে আজকালকার গরুগুলি প্রায়ই অসুস্থ ও রুগ্ন, এদের দুধ খেয়ে অনেকের যক্ষ্মারোগ হতে দেখা গিয়েছে কাজেই দুধের পরিবর্ত্তে তিন চারটা বা আট দশটা বাদাম (যার যেমন সহ্য হয়) বেশ ভাল করে বেঁটে আবশ্যকমত জল মিশিয়ে আগুণে ফুটিয়ে নিয়ে খেলে ভাল হয়; এই জলে ইচ্ছামত চিনি, মিশ্রী, ও সুগন্ধি দ্রব্য দিতে পারেন। মহাত্মা ইহা নিজে পরীক্ষা করে বলেছেন যে এই পানীয় খুব পুষ্টিকারক। দেশের লোকের যদি সাহস থাকে তাহ'লে তাঁরাও এ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বাদামের পরিমাণ একবার ঠিক করে নিতে পারলে পেটের অসুখের কোন ভয় নাই। অন্ততঃ পক্ষে এতে যে Seditionএর ভয় নাই তা আমরা বেশ সাহস করে বলতে পারি।

* * *

নিষ্কর্ম্মা।

গর্ব্ব ও গৌরব।

শুক্তিরে দেখি—দীন, প্রভাহীন
মুক্তা উঠিল হাসি,
ছড়ায়ে চমকি পড়িল চকিতে
চূর্ণ আলোক রাশি।
বেদনা কাতর শুক্তি কহিল,
নয়নে অশ্রু লোর,
তুই বটে আজ রাজার মুকুটে
গর্ব্বে আছিস্ ভোর;
সুন্দর তোরে করিতে যে আমি
সকলি করেছি দান—
হৃদয় রক্ত নিঙারি দিয়াছি,
স্ঁপিয়া দিয়াছি প্রাণ;
এইটুকু শুধু আছে বলিবার
এই মোর যত সুখ,
ক্ষুদ্র জীবনে আশার অধিক
গৌরব এতটুক্।

শ্রীমুরারী মোহন দাস।

সন্তবাণী।

(হাত্রাস নিবাসী মহাত্মা তুলসী সাহেবের বচন)

প্রিয়তমের কাছে যাবার পথ যে কত উঁচু তা জগতের লোক জানে না; সে পথে যেতে যেতে অতি উচ্চ পর্ব্বতশিখররূপী পরমাত্মাকে কেবল সাধু ব্যক্তিই দেখ্তে পায়।

* * *

জগতের এই ধূমধাম চার দিনের খেলা মাত্র—সবই মিথ্যা; যে বিচারপাত ভগবানকে দেখ্তে চেষ্টা না করে তাকে ভব সমুদ্রে গোতা খেয়ে মর্‌তে হয়।

চকোর যেমন চন্দ্রকে ভালবাসে; ভগবান্‌কে তের্মনি ভালবাস। ক্লান্ত হয়ে চঞ্চু ঝুঁকে পড়ে তবুও চকোর চন্দ্রের দিকেই চেয়ে থাকে, আর কোন দিকে চায় না।

* * *

এই সংসারে পাঁচটী রত্ন সার—সাধুসঙ্গ, সদ্‌গুরুশরণ, দয়া, দীনতা ও পরোপকার।

প্রাচীন ভারতে নগর বিন্যাস।

নগর বিন্যাস অতি আধুনিক বিদ্যা এমন কি য়ুরোপেও ইহা আধুনিক। প্রাচীন ভারতে এই নগর বিন্যাস একটা বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন শিল্প শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, নীতি ও অর্থ শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত এবং জ্যোতিষ গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ে বিস্তর নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। মনস্বী হ্যাভেল সাহেবের মতে বৈদিক যুগেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞবেদীর উপর অঙ্কিত জ্যামিতিক চিত্র ও "স্বস্তিক" প্রভৃতি চিত্রের সহিত নগরের পরিকল্পনার (Plan) নাম ও পরিলেখের (Diagram) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার নগর বা গ্রাম প্রতিষ্ঠায় নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। (১) ভূপরীক্ষা (২) স্থান নির্ব্বাচন (ভূমি সংগ্রহ), (৩) দিক্ নির্ণয় (দিক পরিচ্ছেদ) (৪) নির্ব্বাচিত ভূমির পরিভাগ (পদবিন্যাস) (৫) বাস্তু দেবতার অর্চ্চনা (বলিকর্ম্মবিধান), (৬) গ্রাম বিন্যাস বা নগর বিন্যাস, (৭) হর্ম্ম্য গৃহ ও তাহার তলাদি নির্ণয় (ভূমি বিধান) (৮) নগরদ্বার নির্ম্মাণ (গোপুর বিধান), (৯) দেবালয় নির্ম্মাণ (মণ্ডপ বিধান) এবং (১০) রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ (রাজবেশ্ম বিধান), নগর নির্ম্মাণ শাস্ত্রের এই দশ অঙ্গ।

নদী ও সমুদ্রতীর, হ্রদ ও সরোবরতীর অথবা শৈলশিখরই নগর স্থাপনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। নানা বৃক্ষলতাকীর্ণ, পশুপক্ষীগণাবৃত, সুবহূদকধান্য, তৃণকাষ্ঠ সুখপূর্ণ, আসিন্ধুনৌগমাকুল পর্ব্বতের অনতিদূরে সুরম্য সমভূদেশে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের উপদেশ।

ভোজের মতে স্থানটীর মধ্যভাগ উন্নত হওয়া চাই। ময়মতে কচ্ছপোন্নত ভূমি বর্জ্জ্য। উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদিকে ঢালু (ঐন্দ্রোত্তরপ্লব) হইয়া গেলে সেই স্থান শুভ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভূমির দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য একবর্গ হাত আয়ত ও এক হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া আবার তাহাতে সেই মাটী ফেলিয়া দিলে, যদি মাটী বেশী হয় তাহা হইলে সেই ভূমি উত্তম।

ভূমি নির্ব্বাচন শেষ হইলে দেববলি প্রদান, স্বস্তি-বাগ্ ঘোষণ, হালকর্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা স্থপতিকে ভূমি পবিত্র করিতে হয়। তারপর নগরের মান নির্ণয় করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে ৮ যোজন দীর্ঘ ও ৪ যোজন প্রান্ত নগরই প্রশস্ত। অগ্নিপুরাণের মতে নগরের পরিমাণ ৪ কিম্বা ৮০ বর্গমাইল হওয়া বিধেয়।

ইহার পর স্থপতির কাজ প্রাকার ও পরিখা রচনা। কারণ তখন দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। প্রাচীরের বাহিরে এবং অনতিদূরে পরিখা খনন করা হইত। স্থানের প্রয়োজনানুসারে (ভূমিবশাৎ) পরিখার সংখ্যা এক হইতে আট পর্য্যন্ত ছিল। সাধারণতঃ পরিখার অস্থির বা প্রবাহী জলেরই বন্দোবস্ত থাকিত। নগরের জল নির্গম প্রণালীর সহিত এই পরিখা সংযুক্ত থাকিত যাহাতে সহরের জল আসিয়া তাহাতে পড়িতে পারে, এবং নদীস্রোতে মলাবর্জ্জনাদি ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

পরিখার বাহিরে ঘন জঙ্গল রোপণ করিয়া স্থানটি আরও দুর্গম করা হইত। নগরের রক্ষা বিধান ছাড়াও

পরিখার অন্য উপযোগিতা ছিল। খাতের মাটী দিয়া নিম্নস্থান বা জলাভূমিগুলি ভরাট করিয়া নগরকে সমতল অথবা 'ঐন্দ্রোত্তরপ্লব' অথবা 'মধ্যস্থান' সমুন্নত, করা হইত। সেই মাটি দিয়া আবার সহরের চারিধারে চয় বা বপ্র (rampart, কাঁচা মাটির মোটা বাঁধ) তোলা হইত।

প্রত্যেক নগরের দ্বার বা তোরণ ছিল। তাহাকে গোপুর বলে। নগরের উত্তর দ্বারকে ব্রাহ্ম (ব্রহ্মাকে উৎসৃষ্ট) দ্বার, পূর্ব্বদ্বারকে ঐন্দ্র (ইন্দ্র বা উদীয়মান সূর্য্যকে উৎসৃষ্ট দ্বার,) পশ্চিম দ্বারকে সৈনাপত্য এবং দক্ষিণ দ্বারকে যাম্য (যমাধিষ্ঠিত) দ্বার বলা হয়।

[নব্যভারত; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০]

বিদ্যারম্ভ—শিশু বোকাই হউক আর বুদ্ধিমানই হউক, জন্মের সময় তাহার মস্তিষ্কের জ্ঞান পরিণত বয়সের ওজনের এক চতুর্থাংশ মাত্র। এক বৎসর হইতে না হইতেই শিশুর মগজের জ্ঞান পূর্ব্বের চেয়ে আড়াই গুণ বাড়ে। প্রথম বৎসরে শিশুর মস্তিষ্ক খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম বৎসরে শিশুর মাথার ওজন বাড়িবার বিশেষ কিছু বাকী থাকে না, প্রায় শেষ হইয়া যায়। ঠিক ঐ সময়েই বুদ্ধি বৃত্তির আধার Pyramidal cell পূর্ণাবয়বে পরিণত হইতে আরম্ভ করে।

কাহারও মতে পঞ্চম বৎসরের পরে, মানুষের মস্তিষ্কের ওজন অতি ধীরে ধীরে বাড়িয়া সপ্তম বৎসরে পরিণতি লাভ করে। আবার কেহ কেহ বলেন ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের মাথার ওজন অতি সামান্য বৃদ্ধি পায়, তারপর আর বাড়ে না।

যাহা হউক, আমরা মোটামুটি এই টুকু ধরিয়া লইতে পারি যে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কের ওজন বৃদ্ধি পায় যতদিন শিশুর মগজের ওজন বাড়ে, ততদিন শিশুর কোন মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নহে। কারণ বর্দ্ধিষ্ণু মস্তিষ্কের উপর যদি বাহিরের কোন চাপ পড়ে, তবে ইহার ক্রমোন্নতি ও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটে। ইহার ফলে অনেক শিশুর বুদ্ধি বৃত্তির ক্রমোন্নতি অকালে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং মাতাপিতা যদি বাস্তবিক স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণের উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিয়া তুলিতে চান, তবে তাঁহারা যেন পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্বে শিশুগণের বিদ্যারম্ভ না করান। শিক্ষক, ১৩৩০, আষাঢ়।

আহার্য্য ছত্রক—যাহাকে লোকে সাধারণতঃ বেঙের ছাতা বলিয়া থাকে তাহা ছত্রক জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ্। পুরাতন বিচালী গাদায়, গলিত কাষ্ঠে, আস্তাবলে ও আবর্জ্জনা স্তূপে নানা জাতীয় ছত্রক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন কতকগুলি বিষাক্ত তেমনি আর কতকগুলি খুব পুষ্টিকর আহার্য্য। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ 'গুছিয়ান' নামক ছত্রক শুষ্কীকৃত হইয়া উত্তর ভারতের বাজারে ৩।৪ টাকা সের দরেও বিক্রয় হয়। বাঙলায় বর্ষার প্রারম্ভে বেঙের ছাতা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না এবং অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া অনেকেই ইহা খান না। বিলাতে ছত্রক চাষ ও সংরক্ষণ একটী বিশেষ ব্যবসায়। চেষ্টা করিলে এদেশেও উহা প্রবর্ত্তিত করিতে যায়।

কৃষক, ১৩৩০, বৈশাখ।
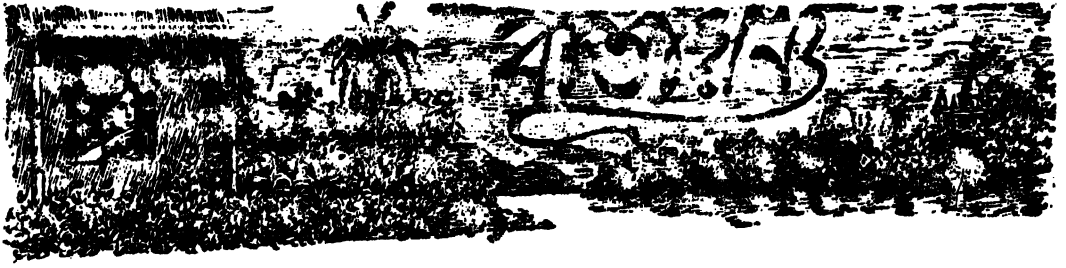
কোহিনূর।

কহিনূরের কত কাহিনী কত পত্রে স্থান পাইয়াছে। কেবল এদেশে নহে, কেবল এ যুগে নহে; কতদেশে কতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের এই অতুলনীয় হীরক খণ্ডের ইতিহাস মণ্ডিত কত কথাই না প্রচরিত হইয়াছে! আমাদিগের কাছে কোহিনূরের কথা বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় বিষাদের ছায়া আনিয়া দেয়। আমাদিগের রূপ-কথায় যাহাকে 'সাত রাজার ধন' বলি, এই হীরকখণ্ড ভারতবাসীর কাছে তাহার চাইতেও বেশী! ইহা সাত রাজার কি ৭০০ সাত শত রাজার, সাত দেশের কি ১৭ সতের দেশের, ৭ সাত শতাব্দীর কি ৭০ শতাব্দীর রাজকুলের যশোভাতি বা কলঙ্ক কালিমা দেহে মাখিয়া কোহিনূর আজ ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। তথাপি কল্পনা-কৌতুকী কবি নানা ভাবে নানা দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিতে বিরত হয়েন না। এমন কি, অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরকের খনিবহুল কোন প্রদেশের কোন লেখকও তথাকার কোন সংবাদপত্রে ইহার আলোচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

কোহিনূর বা "জ্যোতিঃশেখর" যে জগতের শ্রেষ্ঠরত্ন এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। পৃথিবীতে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে যত দেশে যত রত্ন আবির্ভূত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহাদিগের শিরোমণি একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। দুঃখের বিষয়, এই কোহিনূরের প্রথম আবির্ভাব কাল অতি প্রাচীনতার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। তথাপি দেশমধ্যে অনেক স্থলে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কোহিনূর পাঁচ সহস্র বৎসরের ও পূর্ব্বে গোদাবরীর বক্ষে পাওয়া গিয়াছিল। কলিকালের এখন পাঁচ হাজার কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে; সুতরাং সেই হিসাবে কোহিনূর কলির প্রারম্ভেও বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসরের মধ্যেই কোহিনূরের প্রথম আবিষ্কার হয়। এ বিষয় লইয়া এখন বাদবিতণ্ডা করায় বিশেষ কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এই রত্নরাজের আবির্ভাব কাল যখনই হউক না কেন হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাকে অতি সুন্দর ও অতি পবিত্র বলিয়া রক্ষা ও পূজা করিয়া আসিতেছিল। একথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে হিন্দুরা এই মনিটীকে সবিশেষ ঐন্দ্রজালিক গুণ সম্পন্ন দৈবশক্তিময় উপলদল (প্রস্তরখণ্ড) বলিয়া চিরকাল বিশ্বাস করিয়াছেন এবং অমর নরপতি বিক্রমাদিত্যের কোন বংশধরের নিকট হইতে ইহা অপহৃত হইলে উত্তরকালে যে ইহা ভূতাবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও অনেকে মানিয়া থাকেন; এইরূপ প্রবাদ অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর কোহিনূরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সময়ে উহা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। কিন্তু কালক্রমে দিল্লীর সিংহাসন ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পদানত হইলে কোহিনূরও দিল্লীর তোষাখানায় লব্ধ অন্যান্য ধনরত্নাদি

শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়। ইহার পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশীয় পর্য্যটক অনুসন্ধিৎসু টেভারনিয়ার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রক্ষিত রত্নরাজির মধ্যে এই রত্নরাজের অস্তিত্ব স্বয়ং দেখিয়াছিলেন; এবং মোটামুটি ইহার ওজন ১৯৩৳ ক্যারেট বলিয়াও ধার্য্য করিয়াছিলেন। পরে যখন নাদিরসাহ দিল্লী আক্রমণ করে, তখন ঔরঙ্গজেবের হতভাগ্য বংশধর দিল্লীর নাম মাত্র সম্রাট্ মহম্মদসাহ ইহাকে নিজের পাগড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি আততায়ীকে দিতে বাধ্য হয়েন। শেষে কালসহকারে ইহা আফগান বংশের সাহ সুজাউল্ মুল্‌কের হস্তগত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহসুজা দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক কাবুল হইতে বিতাড়িত হয়েন। সুজা পলায়ন করিয়া পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে কোহিনুর তাঁহার সঙ্গেই ছিল। প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড রণজিৎ কেবল মাত্র কোহিনূরের বিনিময়ে সাহসুজাকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হয়েন; অন্যথা নহে। একদিকে প্রাণ, অন্য দিকে প্রাণাদপি প্রিয়তম রত্নরাজ! কোন দিক্ রক্ষা করেন? কাজেই মনস্বী আফগানের পক্ষে পাঞ্জাব-কেশরীর প্রস্তাব তিক্ত বটিকার ন্যায় কোন ক্রমেই সুখ সেব্য বোধ হইল না। তিনি নানা উপায়ে যাহাতে কোহিনুরটী না দিতে হয় যথা শক্তি তাহার চেষ্টা পাইলেন এবং অবশেষে যখন রণজিতের লোক উহা লইবার জন্যই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়, তখন সুজা কোহিনূরের পরিবর্ত্তে মহারাজকে এক বৃহদাকার নকল হীরা পাঠাইয়া দেন। সুচতুর রণজিৎ সিংহ সহজে প্রবঞ্চিত হইবার লোক নহেন; তিনি অবিলম্বে সাহসুজাকে সেই আসল হীরক খণ্ড দিতে বাধ্য করেন; আশ্রিত আফগান অগত্যা কোহিনুর খানি পাঞ্জাবকেশরীর করে সমর্পণ করেন। লাল বর্ণ ভেলভেটের কাজ করা সুরম্য পেটিকার মধ্যে উহা রণজিৎ সিংহের সমীপে আনীত হয়। মহারাজ রণজিৎ উহা পাইয়া তাবিজের মত হস্তে ধারণ করেন। তিনি ইহার দৈব শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন এবং যখন যেখানে যাইতেন, উহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে ভুলিতেন না। পাঞ্জাবকেশরী যে প্রণালীতে এই রত্নরাজকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেন, তাহা এক বিরাট ব্যাপার বলিলেও হয়। ১০০ শত উটের বাহিনী নানা দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া মহারাজের সঙ্গে যাইত। তাহার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট উটের পৃষ্ঠে সুবৃহৎ বাক্সের অভ্যন্তরে কোহিনুর রক্ষিত হইত; কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট রক্ষীরাই ইহা জানিত, অন্যে নহে। পরে কিছুদিনের জন্য মহারাজ ইহা নিজ শিরস্ত্রাণেও ধারণ করিতেন; কিন্তু অচিরেই আবার পূর্ব্ববৎ হস্তে ধারণের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

শিখশিরোমণি রণজিৎ কোহিনূরের দৈবশক্তিতে এতই আস্থাবান ছিলেন যে তিনি এই শক্তি ব্যর্থ করিবার জন্য এক কালে ইহা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবকে উপহার প্রদান করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন বাধা দেওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বস্তুতঃ শেষ ইহা অচিরকাল মধ্যেই পাঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সন্ধিসূত্রে প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। পাঞ্জাবকেশরীর কবল হইতে কোহিনুর ব্রিটিশ কেশরীর করতলগত হওয়া ব্যাপার কম বিচিত্র ও চিত্তস্পর্শী নহে। পাঞ্জাবের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কোহিনুর তথাকার লাহোরের রেসিডেণ্ট স্যার জন লগীনকে দেওয়া হয়। লগীন কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তত্রত্য তোষাখানা বা কোষা-গারের সম্পূর্ণ দখল পাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার "আত্ম চরিত" হইতে জানা যায় যে লাহোরের তোষাখানায় যত রত্ন পাওয়া গিয়াছিল সকলগুলিই বোতামের মত কোন রকমে শ্লথভাবে সুতার গাঁথা ছিল; কিন্তু একমাত্র কোহিনূরটি স্বতন্ত্র ভাবে বাক্‌সে রাখা হইয়াছিল এবং প্রহরীর হেফাজতে থাকিত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে কোহিনুর মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার স্বরূপ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি স্যার জন লগীনকে দেওয়া হইলে, প্রতিনিধিপুঙ্গব নিজ পত্নীকে পত্রদ্বারা

লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—The Kohinoor is far beyond what I imagined," অর্থাৎ "আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম কোহিনুর তাহা অপেক্ষা অনেক সরেশ।" লগীন স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই কোহিনুরের হেপাজতের দায়িত্ব তাঁহার পক্ষে বড়ই বিষম বোধ হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডে প্রেরণের জন্য যখন তিনি এই হীরকখণ্ড তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসীর হস্তে সমর্পণ করেন তখন তিনি ন্যস্তধন প্রত্যার্পণের আহ্লাদে প্রীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র পথে দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া যাইতে যাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহা একটি ক্ষুদ্র চামড়ার ব্যাগে মোড়ক করিয়া রাখা হয়; লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং এই চামড়ার ব্যাগ প্রস্তুত করেন। "চর্ম্মানি দ্বীপিনং বা হরিণং হস্তি" হইয়াছিল কিনা, তাহা ঐতিহাসিক লিখেন না; তবে এতকাল পরে কোহিনুরের ইহাই যে সর্ব্বপ্রথম চর্ম্মপেটিকায় অবরোধ, তাহা নিশ্চয়. আমাদিগের মর্ম্মে লাগে বলিয়াই কথাটা বলা গেল; কবিও বলিয়াছেন—

"কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদ্ আরোহতি সতাংশিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥"

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, এই দুরন্তকলি কালে কি সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যের সফলতা আছে? যেথানে আছে, সেথানে আছে যাহাহউক, সেই চর্ম্ম পেটিকা স্বয়ং ডালহৌসীর কটিদেশে কোমরবন্ধের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং একাংশ তাঁহার গলবিলম্বিত চেন বা শৃঙ্খলের সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সমস্ত জিনিষটা দিবারাত্র তাহার দেহলগ্নই থাকিত; তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও ঐটা পরিত্যাগ করিতেন না। এইরূপ "মিডিয়া" নামক রাজকীয় জাহাজে লর্ড ডালহৌসী সাহেব কয়েক সপ্তাহ ও মাস অতিবাহিত করিয়া বিলাতে পৌঁছেন। ইহা বড় বিস্ময়ের কথা নহে যে লর্ড ডালহৌসী নিজেই লিখিয়াছেন যে তিনি সমুদ্র জানে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া "ভয়ে জড়সড়" ছিলেন; (in a funk) এবং যানারোহনেও অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন—"হা অদৃষ্ট! এইরূপ সমুদ্রজানের অবসান কি সুখ ও সোয়াস্তিকর!"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে রাণী (বলা বাহুল্য, ভিক্টোরিয়া ভারতে 'মহারাণী'; বিলাতে 'রাণী' মাত্র) ভিক্টোরিয়াকে কোহিনুর উপহার প্রদত্ত হয়, এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মহা প্রদর্শনীতে উহা সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের জন্য একজিবিট্ করা হয়। "ন রত্ন মন্বিষ্যতি মৃগ্যতেহিতৎ" কত লোক আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল এই সময়েই কথা উঠে যে কোহিনুর খানির প্রভা ও ছাটকাট ভাল নয়; কাটাইয়া ইহার ধার বাড়াইতে হইবে।

যথাকালে ইহা কাটান হইল। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে তাহাতে কোহিনুরের জ্যোতির ছটার খোলতাই হইল বটে—সুরুচির ধারা স্ফুরিত হইল বটে কিন্তু সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ অমূল্য রত্ন জন্মের মত তাহার পূর্ব্বমূল্য হারাইল। ইহা দ্বিখণ্ডিত করা হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ জহুরী কোম্পানী মেজার্স গ্যাড়ার্ড এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভয়েরসঙ্গর নামক নামজাদা কারিগরকে এই কার্য্যে বাহাল করেন। ইনি ৩১ একত্রিশ দিনে এই দ্বৈধীকরণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন; ইহাতে ৮০০০ পাউণ্ড বা ১২০০০০৲ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়িত হয়।

এইখানে আর একটি কথা আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহ আশৈশব বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি লণ্ডন নগরেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। কোহিনুর বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এই সংবাদ তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; স্যার জন লগিনের সহিত তাঁহার নিতান্ত হৃদ্যতা ছিল; তিনি কথা প্রসঙ্গে লেডি লগিনকে (লগিন পত্নীকে) একদিন বলেন যে আমার বড় ইচ্ছা যে আমাদিগের কুলগৌরব সেই কোহিনুর আমি জন্মের মত আর একবার দেখি; আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন সন্ধিসূত্রে ইহা ব্রিটিশ

কেশরীর করে প্রত্যর্পিত হয়; জ্ঞান হইয়া অবধি আমার ইচ্ছা আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার করে প্রদান করি। লগিনপত্নী এই কথা মহারাণীকে জ্ঞাপন করিলে মহারাণী তদ্দণ্ডেই মহারাজ কুমারের অভীষ্ট পূরণ করিবার সম্মতি প্রদান করেন। দয়াবতা ভিক্টোরিয়া পূর্ব্বতন মালিক বলিয়া কুমার দলীপসিংহকে সেই রত্নশ্রেষ্ঠ স্বহস্তে সাদরে দেখাইবেন এই প্রতিশ্রুতিও দেন। লেডি লগিন এই কোহিনূর প্রদর্শনের দৃশ্য নিতান্ত জাজ্জ্বল্যমান ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যখন দলীপ কোহিনূর স্বহস্তে লইয়া আধঘণ্টা অধিককাল পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে উহার প্রতি নির্নীমেষ লোচনে চাহিয়া ছিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে বিষাদের ঘোর কলঙ্ক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন লগিনপত্নীর অন্তরে নানা বিষম চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল! অবশেষে কুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজহৃদয়ের আবেগ অপসারিত করিবার মানসে ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়ার সমীপবর্ত্তি হইয়া তাঁহার করে কোহিনূর প্রদান করিয়া বলিলেন :—It is to me, Madam, the greatest pleasure to have the opportunity as a loyal subject of myself tendering to my sovereign the Kohi-Noor." অর্থাৎ "বরবর্ণীনি, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য ও সুখের বিষয় যে আমার নিজের ভক্তিমান প্রজা আমি আমার দেশের রাণীকে কোহিনূর স্বহস্তে প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

বলা বাহুল্য, রত্নরাজ কোহিনূর এখন লণ্ডন দুর্গের (Tower) অপরাপর রাজকীয় রত্নমালার সহিত সুসজ্জিত থাকায় সকলেরই দেখিবার সুবিধা আছে।

বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

সমালোচনা।

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাকান্ত দাস প্রণীত ও পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "খেয়া" কাব্যের ভাব-বিশ্লেষণ। প্রবন্ধটী ১৩২৫ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের "সওগাত" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার সম্প্রতি তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার একজন সুলেখক বলিয়া মাসিক পত্রিকার পাঠক মহলে সুপরিচিত; কিন্তু তিনি যে ভাবুক ও রসগ্রাহীও বটেন একমাত্র এই প্রবন্ধ খানি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের "খেয়া" কাব্যের সহিত পরিচিত তাঁহাদের ত কথাই নাই—যাঁহারা সে কাব্যের খণ্ড কবিতা গুলি 'ধোঁয়াটে' বা 'অস্পষ্ট' বলিয়া এতদিন তাহাদের অনাদর করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারাও এই পুস্তিকাখানি পাঠে পরম তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিবেন।

খণ্ড কবিতার সমষ্টি হইলেও রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' রসাত্মক বাক্য হিসাবে কাব্য নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বৈতরণীর তটে বসিয়া শেষ খেয়ার প্রতীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের আকুল আগ্রহভরা দৃষ্টি সেই খেয়া পারের নেয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার শ্রান্ত মনে যে তীব্র ব্যাকুলতার বাণী বহন করিয়াছিল 'খেয়া' সেই বাণীকুসুমরাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ। সৌরকরস্নাত প্রফুল্ল মল্লিকার ন্যায় এই কবিতাকুসুমগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের ভাবের একটী যে প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র আছে ভাবুক গ্রন্থকার কল্পনার চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া মনোজ্ঞভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই নিপুণ বিশ্লেষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। নমুনা স্বরূপ দু'এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"একদিন" তাঁহার (কবির) হৃদয়ের রাজা সোনার রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি কি দেখিলেন? কবির ভাষাতেই তাহা বলি :—

হেন কালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" বলে,
বাড়িয়ে দিলে হাত!

ইহাতে কবি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। রাজাধিরাজ হইয়া ভিক্ষুকের নিকট প্রার্থী হওয়া, এ যে বড় বিচিত্র! কবি তখন কি করেন, ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ কণা তুলিয়া রাজভিক্ষুককে দিলেন। কতকটা বিষণ্ণচিত্তে গৃহ প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন তাঁহার ভিক্ষাপাত্র মধ্যে একটা স্বর্ণ কণিকা রহিয়াছে! তখন কবি আবার বলিতেছেন—

দিলাম যা' রাজ ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটী নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূণ্য করে।

যাঁহাকে উপেক্ষা ভরে ক্ষুদ কণা দান করিলে স্বর্ণ কনিকা পাওয়া যায় তাঁহাকে যে সর্ব্বস্ব দিতে হয়! কবির শেষ আপশোষ বড়ই প্রাণস্পর্শী।"

*　　*　　*

"কবি সংসারের অনেক দেখিয়াছেন; দেখিয়া দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। এখন তিনি সেই যোগিজনবাঞ্ছিত শাশ্বত চিন্ময় বস্তুর ধ্যানে তদ্‌গতচিত্ত।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা;
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।"

কবি নিশিদিন তাঁহার প্রেমময়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে
অঙ্গন মোর চন্দন সৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটি দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে!

*　　*　　*

শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণ তলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভুমে
তোমার এবার সময় হবে কবে!"

"কবির শেষ প্রার্থনা পাঠককে শুনাইয়া আমরা * * * বিদায় গ্রহণ করি।

আমি, বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক সারে।

*　　*　　*　　*　　*

আমি বিশ্ব সাথে রব সহজ বিশ্বাসে।

*　　*　　*　　*　　*

যাহাই আছে নয়ন ভরি,
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গঙ্গা
আনন্দিত মন্ত্ররে!
সবায় দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে।"

সত্যানন্দ।

জনসেবক—সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেশ নাথ বিশী।

দি বুক কোম্পানী, ৪ এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

ইহাতে কোন মৌলিক গল্প উপন্যাস কবিতা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না।

সম্পাদকের উদ্দেশ্য সাধু বলিতে হইবে, কেননা আজকাল গল্প কবিতার যেরূপ কসরৎ চলিতেছে তাহাতে আত্ম সমর্পণ না করিয়া যে ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের লেখার অনুবাদের আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে দেশের জনসমাজের পাশ্চাত্য মনীষিগণের ভাব সম্পদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইবে। বাঙ্গ চিত্র গুলিও দেশের অবস্থার অনুকূল ও রুচিকর। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করিয়া বিপন্ন জনসমাজের মধ্যে ইহাকে অকৃত্রিম জনসেবক রূপেই আহ্বান করিতেছি।

প্রাচী—সচিত্র মাসিক পত্র ৪ কোর্ট হাউস রোড ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৫।৶০

প্রবন্ধ গৌরবে চিত্র বাহুল্যে প্রচ্ছদ পটের বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। প্রথম যাহাকে জনসমাজে বাহির হইতে হইবে তাহার আয়োজনের অসম্পূর্ণতা বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা নবীন সহযোগীকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩৩০ ১১শ সংখ্যা

লেখা-সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী আশ্বিন মাস হইতে মাধবীর দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে প্রবন্ধ সম্ভারে মাধবীর অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে। এ বৎসর যাঁহারা মাধবীর গ্রাহকরূপে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আগামী বৎসরেও আমরা তাঁহাদের সহানুভূতির আশা করি। এখন পর্য্যন্ত যাঁহাদের নিকট মাধবীর চাঁদা আংশিক বা সম্পূর্ণ বাকী আছে, তাঁহারা সত্বর তাহা প্রদান করিলে বাধিত হইব। আগামী ২২শে ভাদ্রর মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারা ২৸৹ টাকায় মাধবী পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৷৶০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৷৶০ আনা। নমুনার জন্য ।৶০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২৷৷০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্ব প্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ ,,	,,	৬৲ টাকা
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ ,,	,,	৪৲ টাকা

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	,,	১২৲ ,,
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ —	,,	১৮৲ ,,
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা —	,,	১০৲ ,,
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ —	,,	১৬৲ ,,
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	,,	৮৲ ,,

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের নুন্য হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতা সত্ত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীনলিনী নাথ দে।

৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নিউ সরস্বতী প্রেস]

[মাধবী—শ্রাবণ সংখ্যা।
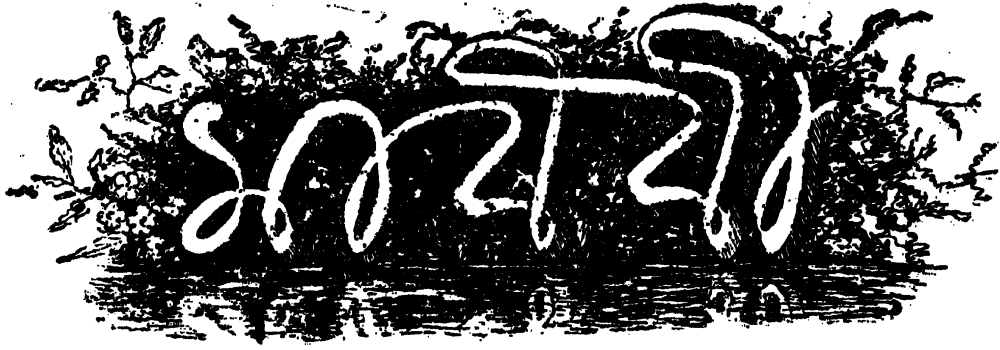
১ম বর্ষ, } শ্রাবণ ১৩৩০। { ১১শ সংখ্যা।

বিদ্যাসাগর। *

তিরিশ বছর আগেকার কথা এমনি শ্রাবণ রাতে,
বাঙ্গলার ঘরে বাঙ্গালীর দীপ নিভিল ঝঞ্ঝাবাতে ;
সেই যে বিরাট আঁধারে বিষাদে ঘিরেছে বাঙ্গালী গেহ,
সে কথা স্মরিয়া কাঁদে না এমন বাঙ্গালী নাহিক কেহ।
বিদেশী প্রবাসী রাজ-প্রতিনিধি যে হেথা বেঁধেছে ঘর,
শুনেছে যাহারা, সবাই কেঁদেছে ভুলিয়া আত্ম পর।
এমনি করিয়া কাঁদায়ে গিয়াছ তাই সে মহিমা গাই ;
স্মৃতি-পূজা করি নূতন করিয়া আবার পাইতে চাই।

বিবাহ-বাসরে বিবিধ সজ্জা শত আলোকের মালা,
তার মাঝে ছিলে মিলন-শিয়রে ঘৃত প্রদীপটী জ্বালা।
ধনীর দুয়ারে রতনে খচিত স্বর্ণ বেদীর প'রে
তুমি ছিলে যেন মাটীর ঠাকুর চারিদিক আলো করে।
কুটীর দুয়ারে তুলসীর মত সুবাসে আঙ্গিনা ভরি
ফুটেছিলে তুমি পারিজাত-শোভা পরাজিত যেন করি।
তাই সে নিভৃত পর্ণকুটীরে পল্লী-মায়ের বুকে,
নিঃস্ব ঠাকুরদাসের ঘরেতে জনম লভিলে সুখে।

চির দরিদ্র বাঙ্গালী সকল যাতনা সহিতে জানে ;
শিশুকাল হতে কত না দুঃখ সয়েছ কোমল প্রাণে।
আট বছরের বালক তাই সে পিতার হস্ত ধরি,
শিক্ষার লাগি কত দূর পথ হেলায় আসিলে তরি।
নিজ হাতে রাঁধি খাওয়ায়ে সকলে কত না রজনী জাগি,
বিদ্যাসাগর হইলে জগতে সবার আশীষ মাগি।
বাঙ্গালীর তুমি চির গৌরব, তোমার পুণ্য কথা
বুকে করে তারা রবে চিরদিন ভুলিবে সকল ব্যথা।

তেত্রিশ-কোটী দেবতার পাশে জনক জননী সম,
সজীব দেবতা বাঙ্গালীর কাছে কেবা আছে অনুপম।
তুমি দেখাইলে কেমন করিয়া তুচ্ছ করিয়া প্রাণ
ভক্তি অর্ঘ্য ও চরণ তলে করিতে হয় গো দান।
মায়ের আহ্বানে দামোদের বুকে ঝাঁপ দিলে নাহি ভয়,
লজ্যি বনানী বন্দিলে মায়ে মরণে করিয়া জয়।
ভগবতী মা'র পুণ্য স্মৃতিটি এখনও বক্ষে ধরি
বিদ্যালয় সে নামটি তাঁহার রেখেছে অমর করি।
ছেলেবেলা হতে লভেছ শিক্ষা পিতার চরণ মূলে,
অনুমতি বিনা একটিও কাজ কর নাই কভু ভুলে।

বঙ্গ ভাষার দীনতা দেখিয়া নূতন করিয়া তারে
সরস করিলে ভাব সম্পদে ভাষার অমৃত ধারে।
নবীন ভঙ্গে তটিনীর মত সাগরে মিশিল আসি ;
বাঙ্গালীর ভাষা গদ্য আবার বহিল জগতে হাসি।
দুখিনী সীতার বনবাস দুখ বেজেছিল তব প্রাণে,
শকুন্তলারে অমর করিলে কণ্বের স্নেহ দানে।
সুকুমারমতি বালক বালিকা বর্ণ শিখিতে গিয়া,
তোমারি নামটি অধিকার করে আগে সে কোমল হিয়া।

বাঙ্গালীর চির সরল বেশের তুমিই রেখেছ মান ;
উচ্চ পদেরে তুচ্ছ করেছ সেই বেশে গরীয়ান।
লাট দরবারে গৌরব তার তুলেছ উচ্চে ধরি,
বিডন সাহেবও হার মানিয়াছে কত না তর্ক করি।

অনুকরণের মোহেতে তোমারে ভুলায়নি কোন দিন।
রাজার বিভব লভিয়াও চির ভেবেছ নিজেকে দীন
সেই রেলী ধুতি, চটিজুতা আর সরল শিশুর বেশ,
সেই রূপে তোমা সকলেই চিনে, পূজা করিয়াছে দেশ।

সবার উপরে বাঙ্গালী মায়ের স্নেহ-দুর্ব্বল হৃদি
দিয়া সে তোমারে দয়ার সাগর করিল দয়াল বিধি।
তাই সে দেখিলে পরের দুঃখ কাঁদিয়া উঠিত প্রাণ,
ঘুচাতে বেদনা রিক্ত করিয়া সকল করিতে দান।
মাদ্রাজবাসী বাঁচিল লভিয়া তোমারি অপার স্নেহ,
অর্থ লভিয়া বহুদিন পরে পাইল-সুখের গেহ।
সাঁওতালও তব করুণ বক্ষে পেয়েছে স্নেহেতে ঠাঁই,
পুরীষে পূরিত বুকে তুলে নেছ যেন সে আপন ভাই।
পতিতা রমণী জগতের হেয়, হিমেতে কাঁপিয়া মরে;
মা বলি তাদেরে অর্থ দানিয়া যাতনা লয়েছ হরে।
অনশনে যবে মেদিনীর বুকে উঠিল আর্ত্তনাদ,
অন্ন বস্ত্রে রক্ষিলে তুমি, পুরালে মায়ের সাধ।
এমনি করিয়া জননীর মত স্নেহের নিঝর দিয়া
সিক্ত করেছ ক্ষুধিত, পীড়িত, অনাথ, আতুর হিয়া।

* * *

এই সেই তব স্মৃতির শ্মশান, পুণ্য জন্মভূমি,
ধন্য যাহার প্রতি ধূলি কণা তোমার চরণ চুমি।
অশ্রুকাতর দেশবাসী ডাকে যেখানেই আজি থাকো
বাঙ্গালীর চির-গৌরব-রবি একবার হৃদে জাগো।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

* মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের ১৩৩০ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখের "বিদ্যাসাগর স্মৃতি সভায়" লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

—:(*):—

শৈলজা—কুরুক্ষেত্রে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইহার পরে কবি শোকক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিহত বীর বালক অভিমন্যুর শরশয্যা পার্শ্বে শৈলজাকে আনিয়াছেন। কবির নিপুণ তুলিকাপাতে হৃদয়-দ্রবকারী এই শোকচিত্র কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা রসপিপাসু পাঠককে "কুরুক্ষেত্র" পাঠে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। কবি শোকমথিত হৃদয়ে এই করুণ দৃশ্য যেরূপ জীবন্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে সেরূপ আদর্শ অঙ্কণনৈপুণ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন ঘটনায় কেমন করিয়া শোকের সংঘাত অনুভূত হয়, স্মৃতির প্রবল উত্তেজনায় সে শোকানল বাড়বানলের ন্যায় কেমন অন্তর-অন্তর দলিত মথিত করিয়া দেয়, মানবহৃদয়বীণার অতি কোমল পরদাগুলি শোকের সেই কঠিন অঙ্গুলিপরশে অলক্ষিতে কেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়—তাহা ধারণা করিতে হইলে কবির এই শোকচিত্র হৃদয়ঙ্গম করুন; বুঝিবেন কবি-কল্পনায় যে মহাশোকের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনের দৈনন্দিন শোক ব্যাপার হইতে অনুমাত্র ভিন্ন নহে বরং অনেক স্থলেই তাহা এত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী অজ্ঞাতে আপনহারা হইয়া কবির বীণার সুরে সুর মিলাইয়া আপনিই বাজিয়া উঠে! হতবৎস শার্দ্দুলের ন্যায় অর্জ্জুনের শোককাতর হৃদয়ের অবস্থা—উন্মাদিনী বালবিধবা উত্তরার মর্ম্মভেদ বিলাপগীতি—বীর জননী ভদ্রাদেবীর কঠোর আত্মসংযম-চিত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বীরকুমার অভিমন্যুর মহিমাময় আত্মদান-কাহিনী—সর্ব্বোপরি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সেই অতুলনীয় শান্তিপ্রদ উপদেশামৃত, আমার পরিস্ফুট করিতে গিয়া কবি যে অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। বাস্তবিকই বঙ্গ-সাহিত্যে 'কুরুক্ষেত্রের' ন্যায় অন্য কোনও কাব্যে লাবণ্যময়ী কবিতার সঙ্গে এরূপ উচ্চাঙ্গের মনোরম দার্শনিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

দিবা অবসানপ্রায়। ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়াক্ষেত্র "কুরুক্ষেত্র" বিকৃত মানব-শবে সমাকীর্ণ। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু হস্তহীন পদহীন ছিন্নশীর্ষ গলিত শবরাশি—শুধু রক্তস্রোত, যেন প্রলয়ের তাণ্ডব নর্ত্তন! ক্রোশ ক্রোশান্তর ব্যাপিয়া ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে, সমরক্ষেত্র আচ্ছন্ন। সায়াহ্ন গগন আহতের আর্ত্তনাদে—ক্ষত গজ তুরঙ্গের ভীষণ চীৎকারে—হিংস্র পশু পক্ষীদের ঘোর কোলাহলে মুখরিত। কোথায় কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটিয়া আকাশের পানে চাহিয়া চির নিদ্রায় আচ্ছন্ন—তাহার নয়ন ঘূর্ণিত—কর মুষ্টিবদ্ধ! কোথায় কাহার অস্ত্র-ক্ষত হইতে এখনও ঝলকে ঝলকে শোণিতস্রাব হইতেছে—যোদ্ধা শোণিত-কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া ম্লানমুখে ভূতল চুম্বন করিয়াছেন! তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রবিদ্ধ! কোথায় কোন যোদ্ধা আহত ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া কাতরকণ্ঠে হাহাকারে গগন পূর্ণ করিতেছে—শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল ও কুক্কুর আসিয়া কখন কখনও তাহাকে জীবন্মৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিতেছে! কুরু-ধনঞ্জয় স্থানে স্থানে আহতের ক্ষতে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন; মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিতেছেন!! সমগ্র সমরপ্রাঙ্গন শোকস্তম্ভিত। আর—

"কেন্দ্র স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইছেন সুখে। * * *
* * * * * *

মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে
আদর্শ বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা।"

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই দুঃসহ শোকের প্রবল আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শোকাপ্লুত কণ্ঠে কহিলেন—

"* * * * হা পুত্র আমার!
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু পুরী
মৃত্যু পুরী স্বর্গ আজি অভাবে তোমার।
জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্ব্বাহ্নে অস্ত! কবিতা জ্যোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের লীলা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে।
প্রকৃতির অতুলিত তুলি বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে?
* * * * * * *
উঠ বৎস! উঠ! না না নাহি মৃত্যু তোর
দেবী পুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের
দেব শিশু তুই ওরে করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। * * * *
নিজে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটেরে তোর।"

শোকোন্মত্ত পার্থের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় ঢলিয়া পড়িতেছিলেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া রহিলেন—সুপবিত্র জ্ঞান বক্ষ পাতিয়া অর্জ্জুনের সেই দুঃসহ শোকাবেগ যেন ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন শুনিলেন নরনারায়ণ গদগদ কণ্ঠে কহিতেছেন—

"এই বিশ্ব লীলাভূমি বিশ্ব নিরন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে নিভিছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য্য গৃহস্থের
আলোক প্রদান পার্থ! নিয়তি দীপের।
আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।
আমি নর মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার
জন্মিতেছি, মরিতেছি নিয়তি আমার
পালিতেছি এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে
নারায়ণ লীলাভূমে ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহালীলা যন্ত্রে, নিয়তি পালন
সুখ মম, ঘোর শোক নিয়তি লঙ্ঘন
* * * * *
কর শোক পরিহার! করি অনুসার
চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে!"

উচ্ছ্বাস কম্পিত কণ্ঠে ভদ্রাকে কহিলেন:—

"সুভদ্রে! * * * নাহি আমাদের শোক
গাও প্রেম পূর্ণ স্বরে মানব মঙ্গল।
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি
কোন জননীর পুত্র লভেছে কখন?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সকল জীবন ব্রত অধর্ম্ম হয়েছে হত
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাইছে মানব জাতি কি মঙ্গল গীত।"

সুভদ্রা শুনিল; যে কর্ণে শত শত শঙ্খের গর্জ্জন প্রবেশ করে নাই আজ সেই কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদু সম্ভাষণ প্রবেশ লাভ করিল। স্নেহময়ী জননীর নয়ন প্রান্ত বহিয়া ভক্তির আবেগে যেন দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। করুণাস্বরূপিনী বিশ্বজননীর হৃদয়তন্ত্রী যেন সেই মৃদু সম্ভাষণে বাজিয়া উঠিল। ভদ্রাদেবী কহিলেন—

"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে!

* * * * * *

ক্ষুদ্র লতা দুর্ব্বল, প্রসবি বৃহৎ ফল
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল;
তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব মঙ্গল—
"লতার ত এই সুখ; পূর্ণ শুভদ্রার বুক
মাতৃপ্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার?
সমগ্র মানব জাতি, আজি অভিমন্যু মম
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক মর পুত্র মম হারাইয়া লভিয়াছি
আজি কি মহান পুত্র অনন্ত অমর।
বড় ভাগ্যবান পুত্র তাহার নিয়তি পূর্ণ!
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার।
অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে শিখাইব নাম নিরমল;
কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব মঙ্গল।"

শ্রীকৃষ্ণ নীরব নিশ্চলভাবে সুভদ্রাদেবীর এই ভক্তি শুনিলেন। শান্ত স্থির বিস্ফারিত নেত্রে শান্তি পূর্ণ আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। অর্জ্জুনের শোক ঝটিকা বিক্ষুব্ধ হৃদয়েতে ধীরে ধীরে যেন শান্তির অনিল সঞ্চার হইল। অর্জ্জুন দূর শূণ্য পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিলেন যেন তাঁহার পুত্র মুখ অনন্ত অমর আকারে বিরাজিত। তাঁহার হৃদয়ে কি এক নবীন প্রীতির নির্ঝর উথলিয়া উঠিল।

সেই মহান সুপবিত্র শোকতীর্থে—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শান্তিস্বরূপিনী শিষ্যা শৈলজা সহ শান্তমূর্ত্তি মহর্ষি ব্যাসদেব সেই সময় উপনীত হইলেন। উভয়ের ঊর্দ্ধনেত্র; উভয়ের বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত। সুপবিত্র হরিনাম গানে উভয়েই আত্মবিহ্বল—উভয়ের নয়ন প্রেমাশ্রুবিগলিত। শোকস্তম্ভিত অশান্ত কুরুক্ষেত্র যেন ক্ষণকাল নীরব নিস্পন্দভাবে শান্ত হৃদয়ে সেই শান্তিমাখা সঙ্গীত সুধা পান করিল। মহর্ষি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ধনঞ্জয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন—

"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার!
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব নিয়ন্তার।

* * * * * *

ছিল কত শত বীর আজি নাহি আর
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিবা মহাকালের হুঙ্কার
উঠিছে পশ্চাতে আর সম্মুখে তোমার।
কালের তরঙ্গ যদি দেয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হতে মানবের নাম,
সর্ব্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন
জগতের নীতি এই মহা-বিবর্ত্তন।
এই বিবর্ত্তন, গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর
কেমনে রহিব স্থির হইয়া অমর?
পুত্র যাবে পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার
এই বিবর্ত্তনে শোক কর পরিহার।

* * * * এই বিবর্ত্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব নয়নে
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব বদনে;
কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি
সকলি তাঁহার ইচ্ছা; এই আমি জানি
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্ত্তন রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি যে মানব-অংশ, পুত্রও আমার
আমি মরি, মরে পুত্র, শোক কি আবার?
মরে পিতা, পুত্র মরে, না মরে মানব

নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ! মিশাইয়া জলে
একে ভাটা অন্যদিকে জোয়ার উছলে।

* * * * * *

নরশোকে পুত্রশোক করি নিমজ্জিত
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত
"তব বীরপুত্র মত হও অগ্রসর
মানব-উন্নতি-পথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি।

* * * * *

চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল
আনন্দে গাইয়া "হরে মুরারে" কেবল।"

উদাসিনী গৈরিকবসনা শৈলজা এতক্ষণ ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আত্মহারা ভাবে মহর্ষির এই সুধা-মাখা উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেছিল। সহসা সেই ভীষণ শোকদৃশ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। যোগিনী শোকোদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে কুমারের শিরোদেশে বসিয়া দুই বিন্দু শোকাশ্রু বর্ষণ করিল। তারপর নীরবে উঠিয়া গিয়া পার্থপদতলে পড়িয়া কহিল—

"* * * * চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তোমার।"

পার্থ উচ্ছ্বাসভরে উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে লইলেন। পার্থবক্ষে সেই নীলাব্জ প্রতিমাখানি যেন শান্ত সুনীল আকাশে সন্ধ্যার নীলিমার ন্যায় শোভা পাইল। পার্থ ডাকিলেন—

"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—

কিন্তু হায়! সেই শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস ছুটিল তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে যে ভাষা নাই—তাহা যে ভাল করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই! পার্থ চিত্রাপিতের ন্যায় অচলভাবে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!

শৈলজা পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের পদতলে পড়িয়া কহিল—

"অজ্ঞানী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া বৃথা
নারায়ণ রূপ, পূজা করি দেবতায়
হয় পূর্ণমনোরথ, দেখে জীবনের পথ
দেখে শান্তিসুধাপূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত, অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর—
তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন
পূজি নর পাইয়াছি নর নারায়ণ।
"পতিত পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজি পুত্র পুণ্যবান দিয়া আত্ম বলিদান
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দ্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ!
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া, মুছাইল সেই ছায়া
পতি, পিতা, পুত্র তুমি আজি শৈলজার;
পুণ্যবতী—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।"

পুণ্যবতীর তপস্যা সফল হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের ব্রত যে এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই তাহা বোধ হয় সেই সময় পুণ্যবতীর প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেননা পতিতোদ্ধারব্রতকামে অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিতে গিয়া পরক্ষণেই কহিল—

"শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার
গেল উড়ি প্রেম পাখী; শূন্য অঙ্কে মুছ আঁখি
বনপুত্রগণে তব দেও অধিকার—
প্রেমময়! পুত্র শোক রবে না তোমার।"

সুভদ্রাদেবীকেও সান্ত্বনা দিতে গিয়া কহিল—

"উঠ মা! উঠ মা! ওই সর্ব্বশোকনিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ
গাই কৃষ্ণনাম মাগো! জুড়াই জীবন!
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর
কাটিলেন বিধি যদি, উধাও উড়িয়া
তুই গৃহে, আমি বনে, বনবিহঙ্গিনী মত
গাব কৃষ্ণনাম মাগো! বিশ্ব জুড়াইয়া।"

উত্তপ্ত শোক মরুভূর মধ্যে শান্তির কি শীতল প্রস্রবণ! কি অপার্থিব প্রাণমোহন দৃশ্য! কি পতিভোক্তারমূলক প্রেমের আদর্শ চিত্র! অর্জ্জুন আত্মবিহ্বলভাবে এক করে পুত্রবধূকে লইয়া গোবিন্দের প্রেমপূর্ণ বক্ষে অর্পণ করিলেন। নরনারায়ণ বীরকুমার ও বিমুক্তকেশী মূর্চ্ছিতা উত্তরাকে বক্ষে লইয়া যোগস্থ দণ্ডায়মান! তাঁহার পদতলে প্রীতির ও শান্তির পবিত্র তিন মূর্ত্তি—শৈল, সুভদ্রা ও পার্থ! ঊর্দ্ধবাহু বৈপায়ন এই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিরাট কুরুক্ষেত্র মুখরিত করিয়া গদগদকণ্ঠে গাহিলেন—"হরে মুরারে"! উদাস নিস্তব্ধ সায়াহ্ন গগন যেন সেই উদাত্ত স্বরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রেমকণ্ঠে গাহিল—"হরে মুরারে"। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

মনোযোগের ইতিহাস।

আমরা যখন যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই ভাববিকাশক স্থান গ্রহণ করে; যথা, ভালবাসার চিন্তা গালে হাত দিয়া, বিদ্যালয়ে পাঠ্য বলিবার চিন্তা মাথা চুলকাইয়া, অর্থের চিন্তা গোঁফের চুল টানিয়া, বিষয়কার্য্যের চিন্তা দাড়ির চুল টানিয়া বা নাক চুলকাইয়া, দুঃখের চিন্তা মাথায় হাত দিয়া বা বিছানায় শুইয়া এবং কোন-কিছু চিন্তা করিব বলিয়া বসিতে হইলে পান ও তামাক খাইয়া ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ভাব প্রকাশিকা চিন্তার বিকাশ সময়ে যদিও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন স্থান গ্রহণ করে; তথাপি অনেক লোকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তার সময়ে হয় ত একই অবস্থায় বিভিন্ন চিন্তা করিয়া থাকে; যথা হয়ত কেহ বা গালে হাত দিয়া সকল প্রকার চিন্তাই করিয়া থাকে, অপর কেহ বা শুইয়াই সকল প্রকার চিন্তা করিতে ভালবাসে ইত্যাদি। এইরূপ বিভিন্ন ভাব-প্রকাশে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন স্থান গ্রহণ করিয়া যে দৈহিক অবস্থান্তর আনয়ন করে, তাহাকে আমরা (Posture) বা আসন বলিতে পারি। এক্ষণে আসন ও ভাবপ্রকাশিকা চিন্তা পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ট, বিচার করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যদি কেহ অন্যমনস্ক হইয়া উপরি-উক্ত কোন ভাবপ্রকাশক আসন গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই ভাববিকাশিকা চিন্তা তাহার স্বতঃই আসে; যথা, রাত্রে শয়নের পর অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করা। অবশ্য যে যেরূপ আসনে সচরাচর চিন্তা করিতে ভালবাসে সে সেইরূপ আসন অন্যমনস্ক হইয়া করিলে প্রায়ই তাহার সেই প্রকার চিন্তা আসিবে।

এক্ষণে যদিও মনের সংযোগ ভিন্ন কোন প্রকার চিন্তা প্রবাহ উত্থিত হইতে পারে না। তথাপি মনোযোগের সাধারণ আসন (natural posture) কিরূপ, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অত্যধিক মনঃসংযোগে যথা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ গল্পের বহি (atractive novel) পড়িবার সময়ে বা অঙ্ক কসিবার সময়ে (১) পা গুটাইয়া বসিয়াছি (২) বাহুদ্বয় দেহের সহিত ঘনিষ্টভাবে রহিয়াছে (৩) মেরুদণ্ড সোজা হইয়াছে এবং শ্বাস স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে পা গুটাইয়া বসা সাধারণতঃ দুই প্রকার; যথা, সাধারণ ও ভদ্রাসন (সাধারণ—পায়ের ভিতর পা দিয়া বসা। ভদ্রাসন—স্থির পায়ের উপর পা দিয়া বসা)। শ্বাস স্থির বলিতে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কিরূপ গতি ও উহার মধ্যে কোন স্থানে স্থিতি হয়, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিবে

বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস উভয়েই ধীরে বহিতেছে এবং প্রশ্বাসের পর স্বাভাবিক যে স্থিতি-কাল আছে—যখন নিশ্বাস গ্রহণ হইতেছে না এবং প্রশ্বাস শেষ হইয়াছে (natural respiratory pause) উহাতেই আমরা অধিকক্ষণ অবস্থান করি।

এক্ষণে মনের ক্রিয়া মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইতেছে অথবা মস্তিষ্কের ক্রিয়া মনে প্রতিফলিত হইতেছে এই লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। এই বাদানুবাদের সার মর্ম্ম এইরূপ যে একের ক্রিয়া হইতে হইলে উভয়ই আবশ্যক; যথা পুস্তকের ভাষা ও পুস্তক হইতে লব্ধ জ্ঞান ভিন্ন হইলেও ভাষা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না; আবার জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই ভাষার সার্থকতা। সেইরূপ মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতিত মানসিক বিকাশ হয় না; সেইরূপ মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানব মানব মধ্যেই গণ্য নহে। সুতরাং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীই (nerve tracts) মানসিক বিকাশের পথ এবং এই পথেই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী মানসিক বৃত্তি বা চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই বৃত্তি দুই প্রকার; বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। বহির্মুখি বৃত্তি স্ফুরণ সময়ে মস্তিষ্ক হইতে স্নায়বিক তড়িৎ প্রবাহ মেরুদণ্ডস্থিত মেরুমজ্জার ভিতর বিভিন্ন স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া অঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই বৃত্তি স্ফুরণ সময়ে তড়িৎপ্রবাহ গমনোযোগী অঙ্গে স্ফুরিত হইলে ঐ অঙ্গে এরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে যাহাতে স্নায়ু সকল (nerves) পরস্পরের চাপ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। অপর দিকে অন্তর্মুখী বৃত্তির স্ফুরণ সময়ে অঙ্গ সমূহ স্বভাবতঃ এরূপ ভাবে সংযোজিত হইয়া থাকে যাহাতে স্নায়ু সকল পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। মনোযোগ সময়ে এই স্নায়ু সকল পরস্পরের চাপে সকল অঙ্গ হইতে এককালে অন্তর্মুখী স্নায়বিক তড়িৎপ্রবাহের উদ্রেক করে। এই পূর্ণ স্নায়বিক তড়িৎপ্রবাহের ঊর্দ্ধ গতির সময়ে মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া মেরুমজ্জামধ্যস্থ পথ সরল করে; অত্যধিক মনোযোগে উহার বেগ এত বেশী হইয়া থাকে যে উহা মেরুমজ্জামধ্যস্থিত সূক্ষ্ম নালীর (central conal of the spinal cord) মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইয়া (floor of the 4 th ventricle) মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত চতুঃকোণযুক্ত একটী বিশেষ স্থানে পৌঁছে। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কালে নাসাভ্যন্তরে যে স্থানে লাগিয়া বায়ু অন্তর ও বহির্গমনকালে ঘূর্ণ্যমান এই স্থানটী উহার প্রায় ১/২-১/৪ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে মস্তিষ্ক মধ্যে অবস্থিত।

আমরা স্বাভাবিক মনোযোগের আসনে বসিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিবার কালে দেখিতে পাই যে বায়ু পূর্ব্বোক্ত স্থানে লাগিয়া বাহির হইবার কালে ঐ স্থান হইতে একটী স্নায়বিক তড়িৎপ্রবাহ উত্থিত হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থান হইতে প্রায় ১/৪ ইঞ্চি পশ্চাতে লাগিতেছে। ঐ তড়িৎপ্রবাহের কতক অংশ মস্তিষ্ক-স্থিত ঐ চতুষ্কোণবিশিষ্ট স্থান হইতে সম্মুখ দিকে সূক্ষ্ম নালীর (Iter) মধ্যে সঞ্চালিত হয় তৎপরে উহার গতি কিরূপ বুঝা যায় না। কিন্তু ঐ তড়িৎপ্রবাহ যে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থান হইতে ১/৪ ইঞ্চি পশ্চাতে লাগিতেছে ইহা স্বাভাবিক মনোযোগের আসনে বসিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিলে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ঐ তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব এবং উহার চতুষ্কোণযুক্ত স্থানের সম্মুখবর্ত্তি নালী (Iter) ছাড়াও যে কতক অংশ বিদ্যমান আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ; এবং ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে মনোযোগে প্রশ্বাসের পর স্থিতিকালে ঐ তড়িৎপ্রবাহ ঐ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে লাগিয়া ঊর্দ্ধে মস্তকের উপর প্রতিফলিত হয় এবং ঐ সময়েই আমরা অতিন্দ্রিয় জ্ঞান পাইয়া থাকি। মনোযোগের বিকাশে এই অতিন্দ্রিয় জ্ঞানলাভই পুরস্কার স্বরূপ।

শ্রীযামিনীকান্ত দত্ত সরকার।

মুক্তি।

ভেঙে গেছে আজি দ্বার,—
বন্দী হৃদয় পেয়েছে মুক্তি ভাঙিয়াছে কারাগার!
ঝলসি নয়ন তীব্র আলোকে এসেছে জ্যোতির্ম্ময়,
বজ্র ঝলকে বিদারি তিমির উদার অভ্যুদয়!
রুদ্র ভোলার তাণ্ডব তালে পরাণের হিন্দোলা—
আজিকে সহসা কোন উন্মাদ দিয়ে গেল ঘন দোলা।
সকল বিধান টুটি—
নিখিল বিশ্ব কর্ম্ম শালার বন্দী পেয়েছে ছুটি!

উন্মাদ সমীরণ!
তারি মত আজি মত্ত হৃদয় ঘুরে মরে ত্রিভুবন!
বিপুল বিশ্বে মোর তরে হায় বিশ্রাম কোথা আজি
ছুটিয়া চলার আনন্দ সুরে চিত্ত উঠেছে বাজি।
উর্দ্ধে উদার নীলিমার মত বাসনার সীমা নাই;
সিন্ধু মেখলা শোভিত ধরণী বক্ষে চাপিতে চাই!
একি নব জাগরণ!
খেয়ালি হৃদয় করেছে ছিন্ন নিয়মের বন্ধন!

সৌরভ সমাকুল
জীর্ণ কোরক দীর্ণ করিয়া ফুটিল কি আজি ফুল?
রুদ্ধ হিয়ার চির সঞ্চিত মধু সৌরভ রাশি
জোছনার মত সহসা বিভাসি বিতরিল সুধা হাসি;
গোপন হিয়ার কন্দরে ছিল ভাবের উৎস যত—
গলিত নীহার গিরি দরী সম ছুটে চলে অবিরত!
বদ্ধ কে আজি র'বে
অন্ধ গুহায়—সিন্ধু ডেকেছে কল্লোল গানে যবে!

মানস বনের পাখী—
ছাড়া পেয়ে আজ উড়ে দিকে দিকে বিস্ময়াকুল আঁখি!
আজি যুগান্ত কল্প-নিশীথ হয়ে গেছে অবসান
উষার দেউলে ভৈরবী সুরে বাজে মুক্তির গান!
তিমিরে সুপ্ত শৃঙ্খলে বাঁধা স্তব্ধ কারার কূপে—
গোলোক বিহারী এলে কি গো আজ নর নারায়ণ রূপে?
চক্র আঘাতে কার
ছিঁড়ে উড়ে যায় লৌহ নিগড়—প্রলয় অন্ধকার!

ওরে ও কোটরবাসী!
মুক্ত স্বাধীন জীবনের সুরে বাজাও হিয়ার বাঁশী!
চূর্ণ আলোক আশার মতন দুলিছে সিন্ধু পরে
ভাসাও তূর্ণ জীবন তরণী বাঞ্ছিত ধন তরে;
আজি মনে হয় যেন দ্বারে দ্বারে কত যুগ যুগ ভরি
গিয়াছে ফিরিয়া আকাশ বাতাস আমার স্মরণ করি।
দুয়ার বদ্ধ প্রাণ
অর্গল ভাঙি পেয়েছে সে আজ অমৃতের সন্ধান।

আজি জল কণিকায়
ইন্দ্র ধনুর বর্ণ মাধুরী ফুটি উঠে সুষমায়!
বিধি নিষিধের বিধান মুক্ত একি এ প্রলয় রোল
ফেনায়ে তুলিল নিঝুম বক্ষে উন্মাদ উতরোল!
ভিন্ন হয়েছে কারার প্রাচীর বিশ্বের আলো হাসি
মুক্তির সুখে বিস্মিত মুখে পড়িছে আজিকে আসি!
কোন বাধা নাহি আর
বিন্দু আজিকে সিন্ধুর মাঝে হয়ে গেছে একাকার!

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সাঙ্খ্য দর্শনে প্রকৃতি রহস্য।

বহিরাকার দ্বারা জাগতিক যাবতীয় দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ করিলে আমরা জড় বা অজৈব, জৈব এবং চৈতন্য এই তিনপ্রকার পদার্থের সত্তা অনুভব করি। গৃহঘট-পটাদি জড়দ্রব্য, বৃক্ষলতাদি জড় নহে ইহাদের প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণের পরিপুষ্টি হয় নাই অথচ সুখদুঃখ জ্ঞান থাকায় ইহারা অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া কথিত। পিপীলিকা মক্ষিকামৎকুণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কুক্কুর মৃগ সিংহাদি পর্য্যন্ত প্রাণীবর্গ অন্তঃসংজ্ঞক ও অল্পাধিক বহিঃসংজ্ঞক অর্থাৎ ইহাদের অল্পাধিক চৈতন্য আছে। মানবের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে এবং অধিকন্তু বিচার বা আত্মবোধ শক্তি আছে। আমি সুখদুঃখ বোধ করি আমার চৈতন্য আছে ইত্যাকার বোধ যাহার আছে অর্থাৎ ঘটনাবৈচিত্র্য ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে নিত্য এবং বোধশীল কোন পুরুষ আছেন যিনি ঘটনা সন্নিবেশ ও অন্যান্য সমূহ পদার্থের দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞান যাহার আছে তাহাই আত্মা। আত্মাই সমূহ বিষয়ের ভোক্তা। আত্মাই দেব ও মনুষ্য শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করেন (এস্থলে আমি জীবাত্মা বলিয়া আত্মার উল্লেখ করিতেছি)। দেব ও মানবশরীরই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোগায়তন। আত্মা তির্য্যগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটপটাদিতেও আছেন। তাহা হইলে জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা চারিটি শ্রেণী আবিষ্কার করিতে পারি সমুদায়ই যাহার অন্তর্ভুক্ত।

১। জড়—Matter
২। জীব—Life
৩। চেতন—Mind
৪। আত্মা—Soul

জড়, জীব বা চেতন ইহারা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতি কার্য্যশীল, আত্মা দ্রষ্টা এবং অক্রিয়। এই জন্যই সাংখ্যকার আত্মাকে পঙ্গু বলিয়াছেন। জড়, জীব বা চেতন ইহারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থাই সৃষ্টি, অব্যক্তা প্রকৃতি আত্মা বা পুরুষের ভোগের নিমিত্তই ব্যক্ত হন। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইলে প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থিত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার আর বিষয়াকার পরিণাম হয় না। তখন এ ব্যক্ত জগৎ থাকে না। তাহা হইলে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইটি যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইল। অব্যক্তাবস্থা হইতে কিরূপ ক্রমে সৃষ্টি হয় তাহা পরে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে প্রকৃতি তিনি ব্যক্তা হন কেন? অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ কি? সৌরজগৎ, জড়-জগৎ, জীবজগৎ এবং চেতনজগৎ ইহাদের সার্থকতা কি? দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে একমত নহেন। দার্শনিক এই শব্দের অর্থ তত্ত্বদ্রষ্টা, যিনি তত্ত্বদর্শন বা সাক্ষাৎকার করিয়া আপ্তের ন্যায় আমাদের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেন। তত্ত্বদ্রষ্টৃগণ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন কাজেই তাঁহাদের মতানৈক্য সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বের স্বরূপ কি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইব। যাহা নির্ণেয় তাহা প্রমেয় বলিয়া কথিত। যাহা নির্ণীত হয় তাহাই তত্ত্ব, দার্শনিক ভাষায় তাহাকে প্রমা বলে। যাহা দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় তাহা প্রমাণ বলিয়া কথিত। অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, মনঃসংযোগের অভাব, ইন্দ্রিয়বৈকল্য সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব এবং সমানাভিহার এই কয়েকটি কারণ বশতঃ আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই প্রমা নির্ণয় করিতে হইলে প্রমার সাধন বা প্রমাণের প্রয়োজন হয়। প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণ যেরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ভূয়োদর্শন,

সেইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন তত্বজ্ঞানের সাধন। দ্রষ্টা ঋষিগণ আপ্ত, নিউটন মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবী ঘুরাইয়াছিলেন ইনিও আপ্ত।

জগৎসৃষ্টির সার্থকতা কি এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমা ও প্রমাণের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন জড়, জীব বা চেতন জগৎ ইহাদের সৃষ্টি মূলে কোন কারণ নাই। জড়ের ক্রমবিকাশই সৃষ্টি। আত্মা জড়ের ক্রমবিকাশের পরাকাষ্ঠা। স্রষ্টা নাই ঈশ্বর নাই, কেবল কতকগুলি উপাদান আছে ইহাকে পরমাণুই বল বা প্রকৃতি বল। ইঁহারা দেহাত্মবাদী। কেহ কেহ বলেন প্রকৃতিই স্রষ্টা, প্রকৃতি পুরুষ সেই এক অদ্বৈত প্রকৃতির বহু হইবার ইচ্ছা হইতে জাগতিক সৃষ্টি, কেহ কেহ বলেন তাহা নহে—যাহা কিছু দেখিতেছ সবই মিথ্যা অসত্য-সৃষ্টি বা জাগতিক পদার্থ সমূহ সবই তোমার ভ্রম—যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া তুমি সর্প বলিয়া মনে কর, সেইরূপ অবিদ্যারূপ অন্ধকারে ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ'। কিন্তু কে ভ্রম করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। ইহাই কঠোর অদ্বৈতবাদ।

কাপিল দর্শন।

মহর্ষি কপিল বলেন, তুমি জীব, তোমার সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে তুমি নিত্যই দুঃখ ভোগ করিতেছ, তুমি স্বতন্ত্র ভাবে দুঃখকে ত্যাগ করিতে পারিতেছ না অতএব তোমাকে এমন কিছু করিতে হইবে যাহা দ্বারা তোমার দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হয় মানব তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদি প্রকোপ জনিত শরীর জ্বরাদি ব্যাধি এবং প্রিয়জনের বিরহাদি জনিত মানস পীড়া। জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ দংশ মশক যুক মৎকুণ মৎস্য মকরাদির সংস্পর্শে যে দুঃখ জাত হয় তাহা আধিভৌতিক। যক্ষরাক্ষসাদির সংস্পর্শে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা আধিদৈবিক, শারীরিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য জীব বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনোজ্ঞ স্ত্রী প্রাপ্তি ভোজন-বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা মানস দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করে। নখী শৃঙ্গী ইত্যাদি জন্তুর এতাবৎ হস্ত প্রমাণ দূরে থাকিবে ইত্যাদি নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে মন্ত্রৌষধাদির দ্বারা আধিদৈবিক বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা জীব মাত্রই করিতেছে। কিন্তু উক্তবিধ উপায় গুলি মনোরম নহে কারণ উহাদের দ্বারা দুঃখের সাময়িক নাশ হয় আত্যন্তিক নাশ হয় না। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও পর্য্যাপ্ত নহে কারণ যাহা কর্ম্মজ তাহা নশ্বর। কর্ম্মের পুণ্য ভোগ শেষ হইলে পুনরায় বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃখ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা হইতে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

কি উপায়ে দুঃখ নাশ হইবে, দুঃখের কারণ কি, দুঃখ কাহাকে বলে? কাহার দুঃখ হয় ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। 'ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ' এই প্রথম সূত্রেই কপিল দর্শন-শাস্ত্রের অভিধেয় ও প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। কপিল বলেন সৃষ্টিতে কয়টী তত্ত্ব তাহা উপলব্ধি কর, কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলেই অর্থাৎ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ তুমি কি করিয়া এই সৃষ্টির মধ্যে লিপ্ত থাকিলে তাহা যদি অবগত হইতে পার অর্থাৎ যদি পঞ্চবিংশতি তত্বের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পার তাহা হইলেই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি তাহাই জীবের পুরুষার্থ। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

সৃষ্টির মূলতত্ব দুইটী পুরুষ এবং প্রকৃতি। প্রকৃতি এক পুরুষ বা আত্মা এক। সাংখ্যের পুরুষ বহু না হইয়া এক এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন না। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। প্রকৃতির বিষয়াকার পরিণাম বা ক্রমবিকাশ ইহাই প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা বা সৃষ্টি। প্রকৃতি হইতে মহতত্ব অর্থাৎ সৃষ্টোন্মুখতা মহৎ হইতে অহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান অহঙ্কার হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় এবং মন সমষ্টিতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রপঞ্চক অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং

পঞ্চতন্মাত্র হইতে মহাভূত পঞ্চক অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুৎ ব্যোম। পুরুষ এবং প্রকৃতি লইয়া এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বোধ বা জ্ঞান হইলে পুরুষের প্রতি সৃষ্টির লোপ বা বিনাশ হয়। পুরুষের প্রতি সৃষ্টি লোপ এই কথাটী বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। জীবই সৃষ্টির কথা ভাবে, জীবই সৃষ্ঠ বিষয়ের ভোগ করে। যে জীব মুক্ত সে জীবের প্রতি সংসারেরও কোন আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে এ যাবৎ কি কেহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন নাই? যদি করিয়া থাকে (যেমন বামদেব জনকাদি) তবে সৃষ্টি লোপ পায় নাই কেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যাহার মোক্ষ হয় তাহারই প্রতি সৃষ্টির বিনাশ হয়। এই স্থলেই কপিলকে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে পুরুষের তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে সৃষ্টি বা প্রকৃতি তাঁহারই প্রতি বিমুখ হয়েন। একজন পুরুষের মুক্তিতে সৃষ্টি লোপের আশঙ্কা নাই, পুরুষ অসংখ্য অতএব সৃষ্টিও অনাদি অনন্ত।

কিন্তু পূর্ব্বেই ত পুরুষ এক, প্রকৃতি এক এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, আবার পুরুষ বহু শুনিয়া কথার সামঞ্জস্যের উপর অনেকেই হয়ত সন্দিহান হইবেন, ঈশ্বর কৃষ্ণের দুইটী কারিকা ও কপিলের কয়েকটী সূত্র হইতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

হেতুমদনিত্য মব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত মব্যক্তম্॥ (১০)

উক্ত কারিকা দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্তের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। ব্যক্ত হেতুমান্ অর্থাৎ ইহার উৎপত্তির কারণ আছে (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া), ব্যক্ত অনিত্য কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ আছে, ব্যক্ত অব্যাপি অর্থাৎ প্রকৃতির ন্যায় মহদাদি সর্ব্বগামী নহে, ইহা সক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশীল (মহান্, অহঙ্কার ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযোগে সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া সংসার কার্য্য করে) ব্যক্ত আশ্রিত—কাহারও অবলম্বন না পাইলে ব্যক্ত থাকিতে পারে না। মহাভূত তন্মাত্রপঞ্চকের আশ্রিত তন্মাত্র অহঙ্কারের অহঙ্কার বুদ্ধির আশ্রিত, বুদ্ধি প্রকৃতির আশ্রিত, ব্যক্ত লিঙ্গ অর্থাৎ মহান্ হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্যক্ত সাবয়ব অর্থাৎ সংঘাত বিশিষ্ট; ইহা পরতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন নহে। ব্যক্ত অনেক অর্থাৎ বহু। ইহার বৈপরীত্য পুরুষে আছে। অর্থাৎ পুরুষ অহেতুমান্ নিত্য ইত্যাদি। ব্যক্ত অনেক অতএব পুরুষ এক। এইরূপে পুরুষের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আবার অষ্টাদশ কারিকায়।

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যায়চ্চৈব।

পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। পুরুষ এক হইলে একজন পুরুষ জন্ম মরণ বা মোক্ষে সকলেরই জন্ম মরণ বা মোক্ষের আশঙ্কা হইতে পারে অতএব পুরুষ এক নহে বহু। এই দুইটীর সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড়ই কঠিন। এই বিষয়ে বলিবার অনেক আছে।

'অহেতুমত্ত্ব নিত্যত্বাদি প্রধানসাধর্ম্ম্যমস্তি পুরুষস্য এবমনেকত্বং ব্যক্ত সাধর্ম্ম্যম্। তত্ত্ববোধিণীকার বাচস্পতিমিশ্র বলেন দশম কারিকাতে ব্যক্তের বিপরীত পুরুষ এই কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকত্ব ঐ ধর্ম্মটী পুরুষের বিপরীত ভাবে না হইয়া অধর্ম্মে থাকিবে অর্থাৎ পুরুষ অহেতুমান্ ইত্যাদি বটে কিন্তু অনেক। ইহা বিশেষ যুক্তি সঙ্গত কিনা সুধীরাই বিবেচনা করুন। অনেকে বলেন, যদি ঐরূপ অর্থ না মান তাহা হইলে কারিকা-কারের ভ্রম বুঝিতে হইবে পুরুষ যে বহু তাহা ত অনায়াস বোধ্য। আমরা উদাসীন ভাবে কথা বলিব।

সূত্রে আছে, 'উপাধিভেদঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্য ঘটাদিভিঃ' এক পুরুষ উপাধিভেদে নানা হন, যেমন একই আকাশ ঘটাদি আধারভেদে ঘটাকাশ নামে অভিহিত হয়। প্রাক্তন কর্ম্মাদিবশেই জীবের জন্ম হয় এই জীবই নানা পরন্তু পুরুষ এক ইহাই বোধ হয় কপিলের মত। কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর কি তাহা তোমার জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। তুমি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের রহস্য অবগত হইলেই ঈশ্বর বা পরমাত্মতত্ত্ব আপনা হইতেই তোমার নিকট প্রতিভাত হইবে। কপিল এই জন্যই ৯১ সূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধে" এই

কথা বলিয়া ঈশ্বরানুসন্ধান লইয়া বৃথা সময়াতিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কর্ম্ম কর ফল পাইবে—কারণানুসন্ধান বা ফলানুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আমি বলিতেছি ঈশ্বর সিদ্ধ হইবেনা অর্থাৎ তোমাদের সহিত তর্ক করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইতে পারিব না, কর্ম্ম কর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটীত হইবে। এতদ্দ্বারা আমার মনে হয় কাপিলের পুরুষ জীব-ব্রহ্ম, জীব-আত্মা নিত্য বুদ্ধ অবিদ্যা দ্বারাই জীবের প্রকৃতির সহিত সংযোগ হয়। অবিদ্যা কেন আসে? কপিল বলেন প্রাক্তন কর্ম্মাদি সংস্কার বশতঃ। প্রাক্তন সংস্কারের কারণ কি আবার তাহার কারণ কি এরূপ প্রশ্ন করিতে পার না তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। সংসার অনাদি ইহার আদি নাই অতএব প্রথম সংস্কার কোথা হইতে উৎপন্ন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বালোন্মত্তাদিবৎ অগ্রাহ্য হইবে। তাহা হইলে প্রকৃতি কি? প্রকৃতির কেন ক্রমপ্রকাশ হয়? পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরাপি সংযোগস্তৎ কৃতঃসর্গঃ। পুরুষ দ্রষ্টা, তিনি কার্য্যে লিপ্ত হন না বা কার্য্য করেন না অতএব তিনি পঙ্গু। প্রকৃতি অন্ধ তিনি দেখেন না—নিজে ভোগ করেন না। পুরুষ তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখাইলে তবে প্রকৃতি কার্য্যক্ষম হন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সৃষ্টি। পুরুষ বা জীবব্রহ্ম বহু। কয়েকজন পুরুষ মুক্তিলাভ করিলে সংযোগাভাবে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ অর্থাৎ সৃষ্টি হানি হইবেনা। কারণ পুরুষ অসংখ্য।

একগর্দ্দভ নিজ স্তন্য দিয়া একটি সিংহশাবককে পালন করিতেছিল, সিংহশাবকটী গর্দ্দভশাবকগুলির সংসর্গে থাকিয়া আহার বিহারাদি করিতে লাগিল। তাহাদেরই কর্কশ শব্দানুকরণ ইত্যাদি দ্বারা সিংহশাবক তাহার সিংহত্ব হারাইল। একদিন আর একটি সিংহ তাহাকে ঐরূপে গর্দ্দভাকার প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া করুণা-বশতঃ প্রতিবিম্বে তাহার রূপ দেখাইয়া বলিল, 'তুমি গর্দ্দভ না সিংহশাবক তাহা নিরীক্ষণ কর' সিংহশাবকের ভ্রম ঘুচিল। সে তাহার পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে পুরুষ ও প্রকৃতিতে নিজের স্বরূপ হারাইয়া ফেলে। যখন পুরুষ আপ্তোপদেশাদির দ্বারা বিহীত ক্রিয়াদি অনুসারে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া ঘুরাইতেছে তখন সে নিজের ও প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারে। প্রকৃতি আর তখন তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জ্ঞান কিরূপে হয়? স্বরূপাবস্থানরূপ চিত্ত বৃত্তিনিরোধাত্মক যোগের দ্বারা এই জ্ঞান হয়। এই স্থল হইতেই সাংখ্যের ঈশ্বর বাদ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কপিল তাঁহার দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন নাই মাত্র তাহার কারণ তর্ক বা প্রমাণের দ্বারা অব্যক্ত অপ্রমেয় সেই পরম পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্য তাঁহার দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত। পাতঞ্জল দর্শনে সেই ঈশ্বর অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। এই জন্য তাহা (সমচয় সাংখ্য 'ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈ বপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ) ঈশ্বরের কখনও সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় প্রকৃতির সহিত লিপ্ত হইয়া থাকার ন্যায় ভান হয় না; এরূপ ভান হইতে পারে জীবের। অতএব সাংখ্যের পুরুষ জীবাত্মা। ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি রহস্য।

শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

—:(*):—

জুয়া।

(উপন্যাস)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

প্রভাত বন্ধুর জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। প্রাতে উঠিয়া দেখিল অনেকগুলি মক্কেল বসিয়া আছে এবং হাইকোর্টের কজলিষ্টেও কয়েকটী মোকর্দ্দমা আছে। জুনিয়ারকে সমস্ত দেখিতে বলিয়া প্রভাত হরিনাথের বাড়ী যাত্রা করিল। হরিনাথ প্রাতে উঠিয়াই জপে বসে এবং জপ সারিয়া নীচে নামিতে প্রায় সাড়ে নয়টা বাজে। যদি কোন ব্যক্তি কোন জরুরী কাজ লইয়া আসে বা বিশেষ কোন বন্ধু বা আত্মীয় আসে তাহা হইলে জপের সময়ও উপরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং হরিনাথ জপ করিতে করিতে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকে। জপের সময় সাধারণতঃ প্রশ্ন করিলে হরিনাথ ঘাড় নাড়িয়া হাঁ কি না উত্তর দেয়। তবে জরুরী বিষয় হইলে ঘাড় নাড়া থেকে কথা পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠে। কাজের খাতিরে ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতির লোককেই জপের সময় উপরে লইয়া যাওয়া হয়। স্পষ্ট কথা জপের সময় প্রায় হয় না। সাঙ্কেতিক ভাবে নীরব আলাপ হয়। হরিনাথ ঘোরতর বর্ণাশ্রমের সেবক হইলেও যীশুখৃষ্টের উপদেশানুযায়ী আলাপন ঘাড় নাড়া দিয়া হাঁ না উত্তরে শেষ করিত। হরিনাথ ঋজুভাবে উপর হইতে নীচের দিকে ঘাড় নাড়িবার পর যদি তাহার মুখে হাসির রেখা উঠে তাহা হইলে ত সোণায় সোহাগা কাজ নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। আর যদি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘাড় নাড়িল তাহা হইলে কাজ হইবে না তাহার উপর যদি পেচকের মত মুখখানি গম্ভীর হয় তাহা হইলে অসন্তুষ্ট হইয়াছে বুঝা যাইত। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে বারান্দায় পশমী আসনের উপর বসিয়া হরিনাথ জপ করিত— ইংরাজ ব্যতীত অপর কেহ আসিলে প্রায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতে হইত। কিন্তু ইংরাজ আসিলে এক খানি কেদারা দেওয়া হইত এবং কেদারায় সাহেব হরিনাথের দিকে পা লম্বা করিয়া বসিতে দ্বিধা করিত না। হরিনাথ বেশ বড় লোক হইলেও যে কোন রকমের ইংরাজ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিত। সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত জপের কার্য্য চলিত। সাড়ে নয়টার পর নীচে নামিয়া আর যে সমস্ত লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহাদের সহিত দেখা করিত। এই দেখা শুনা কথাবার্ত্তার কাজ শেষ হইতে বেলা এগারটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর স্নান আহার কিঞ্চিৎ নিদ্রা শেষ করিয়া প্রায় বেলা আড়াইটার সময় আফিসে বাহির হইত। আহার দু বেলা মাছের ঝোল দিয়া দুমুঠা ভাত আর একটু দুধ। নিজের বাবুগিরি কিছু নেই কেবল একটী সোনার ঘড়ী আর সোণার চেন হাতে একটী হীরার আংটি। চাপকানটী লর্ডক্লাইভের সময় প্রস্তুত বলিয়া তাহার কেরাণীরা কাণাঘুসা করিত। রাত্রে আসিলে আবার হাত মুখ ধুইয়া এক ঘণ্টা জপের কার্য্য চলিত পরে আহার করিয়া রাত্রে আর কোন কাজ করিত না। প্রভাত এ সমস্ত হরিনাথের সময় তালিকা জানিত তবে যাইলেই তাহাকে ঘরে তলব হইয়া থাকে এবং দু পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সারিয়া চলিয়া আসিতে পারিবে। প্রভাত এই ভুল আশায় হরিনাথের বাটী বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যে উপস্থিত হইল। জরুরী খবর আছে বলিয়া হরিনাথের নিকট উপাসনা মন্দিরে খবর পাঠাইল। উত্তর আসিল যে জপ শেষ হইলে দেখা হইবে। সম্মুখে রমানাথ সরকারকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

'বাবু আজকাল উপরে জপের সময় জরুরী কাজ হইলেও লোক যাইতে দেন না?'

রমানাথ আলকাৎরার ন্যায় কালো বয়স পঞ্চাশ একান্ন একটু একটু আফিং খায় খেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে আফিংএর মৌজ করিতেছিল সে প্রভাত

কি বলিল প্রথমে বুঝিতে পারিল না কেবল ঠোঁট নাড়িল বুঝিতে পারিল কোন শব্দ কর্ণে পৌছায় নাই সে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠার মত বলিল,

'কি বলিতেছেন বাবু ?'

প্রভাত তাহার প্রশ্নটী পুনরাবৃত্তি করিল। রমানাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,

'বাবু কি আপনাকে ডাকিয়াছিলেন ?'

'না'।

'তবে সাড়ে নয়টা অবধি বসিতে হইবে।'

'পূর্ব্বে ত আসিলেই ডাক পড়িত।'

'তা আমি কি করিয়া বলিব।'

প্রভাত পনের মিনিট আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ সারিয়া বাড়ীতে গিয়া চা খাইবে ভাবিয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিপাক। চাকরেরা—মাতাল আফিংখোর, গুলিখোর, গাঁজাখোর, চণ্ডুখোরদিগের মত নেশা না পাইলে ছটফট করিয়া থাকে। ভদ্রলোকের বাটী আসিয়া বিব্রত করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ হইলেও প্রাণের দায়ে প্রভাত আর নেশার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। রমানাথকে ডাকিয়া বলিল,

'আমি তাড়াতাড়ি ফিরিতে পারিব মনে করিয়া চা না খাইয়াই বাহির হইয়াছি। আপনাদের বাটীতে চায়ের কোন বন্দবস্ত আছে কি ?'

'বাবু ইংরাজি খাদ্যের উপর হাড়ে চটা। তিনি চায়ের নাম করিলে তেলে বেগুনে চটে উঠবেন।'

'তবে তিনি সাহেবদের সঙ্গে মেশামেশি কি করে করেন ?'

'তিনি ইংরাজ জাতিকে প্রাণের সহিত ভক্তি করেন। নিজে বিশেষ ব্যবহার না করিলেও ইংরাজী খাদ্য ছাড়া অপর সমস্ত ইংরাজি জিনিষ বিশেষ জামা কাপড় সবগুলি বড় ভাল বাসেন। স্বদেশী কাপড় চোপড় যাবতীয় জিনিষ আর স্বদেশী মানুষ দুই চক্ষে দেখতে পারেন না।'

'বাঃ আপনার বাবু ত বেশ রাজভক্ত প্রজা এটা জাহির হলেই যে তাঁকে সরকার বাহাদুর নাইট করে দেবে।'

রমানাথ একটু একটু ইংরাজি জানিত। সে বলিল,

'বাবুকে একেবারে রাত্রি করিয়া দেবে !'

'হাঁ। আমাদের ভারতবাসিগণের পক্ষে নাইট বানান Night, আর রাত্রিই অর্থ বটে। আমাদের এখন সন্ধ্যারাত্রি চলিয়াছে প্রভাত হইতে ঢের দেরী। তবে সাহেবরা নাইট বানান Knight ও করে আর সে নাইট অর্থে মধ্যযুগের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব অশ্বারোহী বীরপুরুষ বলে। আমাদের দেশবাসী যাঁহারা নাইট হইয়াছে তাহারা রাত্রির তিমিরে থাকিলেও মনে মনে বীরপুরুষ হওয়ার আকাশ কুসুম কল্পনা করিয়া থাকে।'

ইতিমধ্যে রমানাথের ভিতরে ডাক পড়িল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি ভদ্রলোক জমায়েত হইয়াছে কতকগুলির উপরে ডাক পড়িয়াছে কতকগুলি বসিয়া আছে। এতগুলি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও প্রভাত নির্জ্জন কারাবাস কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। একে চা খাওয়া হয় নাই তার উপর আবার সমস্ত সকালটা মাটি হোল। মনে হোতে লাগল যেন আট দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হোয়েছে। সাড়ে নয়টা বাজিলে হরিনাথ বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ঘরের দরজায় চাবি পড়িল। চাকর আসিয়া প্রত্যেকের নাম লিখিয়া লইয়া গেল। ৩।৪ টী ভদ্র লোককে ডাকিবার পর প্রভাতের ডাক পড়িল। বৈঠকখানায় লোক ঢুকিলে দরজায় চাবি দেওয়া হইত। বিনা ডাকে কোন লোককে ভিতরে যাইতে দেওয়া হইত না। এক জন চাকর সর্ব্বদা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিত। ঘরের মধ্যে একখানি বহুদিনের পুরান সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর খান চারেক কেদারা। টেবিলের উপর এক দিস্তা বালির কাগজ ও একটা পেনসিল। প্রভাত ঢুকিবামাত্র হরিনাথ বলিল,

'সোমার' কথাবার্ত্তা যদি কইতে এসে থাক ত কোন কথা হবে না। আমি ওর সম্পর্কে কোন কথা কইতে চাই না।'

'দেখুন এত চটছেন কেন ! আমার দুটো কথা শুনবেন তাতে আপনার আপত্তি কি ?'

'মিছে সময় নষ্ট করে ফল কি ?'

'আমি আপনার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নেবনা।'

'উকিলের পাঁচ মিনিট ত।'

'না আপনার বন্ধু পুত্রের পাঁচমিনিট।'

'দেখুন, সোমদা একটা লিমিটেড কোম্পানী খুলতে চায় তাতে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।'

'কি সাহায্য, ওর সঙ্গে জেলে গিয়ে ?'

'জেলে গিয়ে কি রকম ?'

'তুমি উকিল তুমি জাননা—জুয়াচুরি করলে জেলে যেতে হয়।'

'জুয়াচুরি ত আর করচে না।'

'জুয়াচুরি নয়ত কি ? হাতে টাকা নেই—বাজারে কোন পসার প্রতিপত্তি নেই, কতকগুলি নির্ব্বোধ লোককে ঠকিয়ে শেয়ার কিনিয়ে সেই টাকাগুলা উড়িয়ে দেওয়া জুয়াচুরি ছাড়া আর কি বলিতে পারি।'

'আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি কোম্পানীর ডিরেক্টার হন—আর আপনাদের মত ধনীব্যক্তিরা যদি অধিকাংশ শেয়ার খরিদ করেন তা হলে কি আর জুয়াচুরি বলিতে পারেন ?'

'সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি ত ডিরেক্টার হওয়া বা শেয়ার কেনা কিছুই করব না—যে ব্যক্তির একটু বিবেচনা বুদ্ধি আছে সে কিছুতেই ও জুয়াচোরটার কাছে শেয়ার কিনতে যাবো না !'

'ওর কাছে বলছেন কেন ? ধরুন আমার কাছে হতে পারে—আপনার কাছে হতে পারে।'

'তুমিও কি ঐ কোম্পানীতে জুটছ ? তোমার বাপ আমার পরম বন্ধু ছিলেন তুমি কেন ওর সঙ্গে জেলের সাথী হবে ? খবরদার ওর ভিতর কিছুতেই যেও না।'

'আজ্ঞে, আপনি আমার কথাটা সব শুনেন নি।'

'আর হবে না—পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।'

বেহারীকে ডাকিয়া দেবলবাবুর লোকটীকে আসিতে আদেশ হইল। প্রভাত রাগে গরগর করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সংবাদ জানিবার জন্য বসিয়াছিল। আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া বলিল,

'আমি ত পূর্ব্বে বলেছি—যে দাদার কাছে গিয়ে মিছে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

'সোমদা, আপনারা দুই দাদা ভায়ে সময় নষ্টের কথা বলেন—আমি ত কিছু বুঝতে পারি না।'

'প্রভাতদা বুঝবেন। কিছুদিন অপেক্ষা করুন। যাই হোক আপনি আমার জন্য যা খাটচেন তার ধার আমি কখনই শোধ করতে পারব—এ আশা নাই। তবে ভগবান যদি একবার মুখ তুলে চান ত দাদা দেখতে পাবেন আমি কত শক্তি রাখি যাই হোক articles আর memorandum এর কি হোল ?'

'দেবলবাবুর আর আপনার দাদার এই কথা শুনে এখনও কোম্পানী করবার আশা ছাড়েন নি ?'

'নিশ্চয়ই না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। যদি বেঁচে থাকি ত নিশ্চয়ই কোম্পানী করব আর সেই কোম্পানী সহরের সেরা কোম্পানী হবে। আমার memorandum আর articles শীঘ্র চাই ?'

'কাল প্রাতে পাবেন। আজ রাত্রে যেমন করেই হোক শেষ করব।"

"প্রভাতদা নমস্কার।"

"সোমদা নমস্কার।" সোমনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিল।

'হেমেশ বাবু, সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলেছি ?'

'ডিরেক্টার কাহাকে কাহাকে করলেন।'

'আপনি সভাপতি—আমি সম্পাদক এবং মিঃ ডোভার বলে একজন ইংরাজ, রামরাম বাবু একজন মাড়োয়ারী আর আমার দাদা হরিনাথ বাবুকে ডিরেক্টার—প্রভাতদাকে উকিল—রয়্যাল ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক ও নগেন দত্তকে দালাল করিচি। আর্টিকেল্‌স ও মেমোরাণ্ডম ছাপা হয়েচে—আজ বৈকালে তার কাপি পাবেন।'

'তা ত বুঝলাম টাকার যোগাড়ের কি হ'ল ?'

'আপাততঃ এক লাক টাকা হাতে এসেচে আপনাকে উপস্থিত পাঁচশ টাকা মাইনের বর্ম্মা পাঠিয়ে দিচ্ছি—আপনি সেখানে কাজ আরম্ভ করে দিন।'

'লাক টাকার শেয়ার কে কে কিনেচে?'

'বহু টাকার শেয়ার বিক্রী হয়েচে—কিনেচেও অনেক লোক।'

'বেশ কথা'।

'কাল কোম্পানীটী রেজেষ্টারী করব। আপনি রেজেষ্ট্রী হোলেই পরশু বর্ম্মা বেরিয়ে পড়ুন। খবর নিয়েচি পরশু ষ্টীমার পাবেন। আমি সেক্রেটারী স্বরূপে এখানকার সমস্ত কাজ চালাব—আর আপনি বর্ম্মার কাজ দেখবেন। এখন আমার অনেকগুলি কাজ রয়েচে। আপনি ইতি মধ্যে ভেবে চিন্তে রাখুন—আমি আবার বৈকালে আর্টিকেল্‌স মেমোরাণ্ডাম নিয়ে আসব।'

এই বলিয়া সোমনাথ নিজের ঘরের ভিতর গিয়া একটী আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই সুরূপা সোমনাথের ঘরে ঢুকিল।

'দাদার ত ইহাতে কোন অনিষ্ট হবে না?'

'অনিষ্ট কিসে?'

'যে কাজ আপনারা কত্তে যাচ্ছেন তাতে।'

'না না ও রকম অমঙ্গলের কথা কেন বলছেন।'

'আমার মনে বড় ভয় হয়।'

'আপনি মহিলা—আপনার বিনা কারণে ভয় হতে পারে। কিন্তু আমি ত ভয়ের অণুমাত্র কারণ দেখি না। আপনার দাদা বর্ম্মায় কাজ দেখবেন আর আমি এখানকার কাজ দেখব এতে আর ভয়ের কথা কি আছে আমরা ত কাহারও হাতে যাচ্ছি না।'

'সব কাজ ত আপনারা নিজে কত্তে পারবেন না কারুর না কারুর হাতে যেতেই হবে।'

'সে কিছুই নয়। আমরা আমাদের সকল কর্ম্মচারীরই কাজ দেখা শুনা করব। আপনার দাদা উপস্থিত পাঁচশ টাকা করে মাইনে নেবেন—ঘুরিয়া বেড়াবার জন্য ডবল সেকেণ্ড ক্লাস ও খোরাকী পাবেন—পরে যেমন যেমন কাজের উন্নতি হবে অমনি মাইনে বেড়ে যাবে। চার পাঁচ হাজার টাকা মাসে মাসে রোজগার যে শিগ্‌গির হবে তা আমি খুব জোর গলা করে বলতে পারি।'

'এ সমস্ত পরের টাকা খরচ করে ফেল্লে পরে কি যাদের টাকা নিচ্ছেন তারা কি কোন জবাবদিহি করবে না?'

'আপনি কি বুঝচেন না—টাকা যা উঠবে তার কিছু অংশ খাটালেই শেয়ার হোল্ডারদের সুদ পুষিয়ে যাবে—বাকী টাকা কোম্পানীর উন্নতিকল্পে খরচ করব। কোম্পানীর উন্নতি হলে খরচের চতুর্গুণ সহজে উঠে আসবে। আপনি শিক্ষিতা মহিলা—আপনি সহজেই এ কথা বুঝতে পারবেন—যে আমরা শেয়ার হোল্ডারদের যে ডিভিডেণ্ড দেব তার চেয়ে অনেক বেশী সুদে কতক টাকা মাত্র খাটিয়ে নিলেই হবে। কাজেই শেয়ার হোল্ডারদের যা কিছু প্রাপ্য তা সুদের টাকাতেই হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের জবাবদিহি—'

কথা শেষ হতে না হতেই নীচে 'সোমদা' 'সোমদা' করিয়া প্রভাতের চীৎকার শুনিতে পাইল। সোমনাথ ব্যস্ত হইয়া সুরূপাকে তাহার ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। সুরূপা চলিয়া গেলে প্রভাত ও হরিনাথ সোমনাথের ঘরে প্রবেশ করিল।

হরিনাথ। তুই ত নিজে মরবি তার সঙ্গে আমাকে মেরে ফেলচিস কেন?

সোমনাথ। কৈ আমি ত আপনার সম্বন্ধে কিছু করিনি।

হরিনাথ। আরে লক্ষীছাড়া তোর জোচ্চুরি কোম্পানীতে আমার ওয়েল্‌থ কাগজে কি বলে ছাপিয়ে দিয়েচিস?

সোমনাথ। আজ্ঞে, সে ত আপনি নন। সে একজন অপর হরিনাথ সরকার—তিনি এখানে উপস্থিত আছেন।

এই কথা বলিয়াই ঘরের বাইরে এসে 'এস' বলে ডেকে নিয়ে ভিতরে গিয়া বলিল,

'ইনি হরিনাথ সরকার। ইনি আমাদের ডিরেক্টার।' পরস্পর চোখ চাওয়াচায়ি হইল, কেহ কাহাকেও অভিবাদন করিল না।

হরিনাথ। (নবাগতের প্রতি) আপনার কি করা হয়?

সোমনাথ। ইনি একজন গালার বড় ব্যাসাদার।

হরিনাথ। (সোমনাথের প্রতি) আচ্ছা, পঞ্চাশ লাক টাকার শেয়ার বিক্রী হয়ে গেছে বলে মিছে কথা ছাপালি কেন?

সোমনাথ। আজ্ঞে খাতা দেখুন। এই বলিয়াই একখানা খাতা হরিনাথের সামনে ফেলে দিল। হরিনাথ খাতাখানি বেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলিল, 'ভাল হোলেই ভাল।'

প্রভাত। দাদা, সোমদাকে যতটা খারাপ মনে করেন ততটা নন।

হরিনাথ। আর কথায় কাজ নেই ভাই, আমি এখন চল্লুম। হরিনাথ প্রস্থান করিল।

প্রভাত। সোমদা আপনার বুদ্ধির বলিহারী যাই কি করে যে আপনি কেদারটাকে হরিনাথ সরকার বলে হাজির করে দিলেন তা ত আমি ভেবে কুল কিনারা পাই না।

সোমনাথ। অনেকগুলি টাকা হাতে এসে পড়েচে। আমার ও কেদারের ভাল ভাল কতকগুলো কাপড় চোপড় কিনে এনেচি। কেদার বেশ ধুতি কামিজ পরে বাইরে বসেছিল—সেটা আমার মনে হোতেই মাথায় আইডিয়াটা এসে গেল।

এই সময় চারিটি ভদ্রলোক সোমনাথের সহিত দেখা করিবে বলিয়া চারিখানি কার্ড পাঠাইল। প্রথম ভদ্রলোকের তলব হইল। ঘরের মাঝে একটী পর্দ্দা টাঙাইয়া দুইটী অংশ করা হইয়াছিল। প্রভাত যে দিকে ছিল তাহার অপরদিকে টেবিল, চেয়ার দিয়া একটী ছোট আফিস করা হইয়াছিল। সেইদিকে উঠিয়া গিয়া সোমনাথ কি লিখিল এমন সময়ে একজন নূতন নিযুক্ত চাপরাসি ১ম ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সোমনাথ লিখিতে লিখিতে বলিল,

"আমি বড়ই ব্যস্ত, আপনাকে আমি ৫ মিনিট সময় দিতে পারি।" এই বলিয়া হাতে বাঁধা সোনার হাত ঘড়ি দেখিয়া লইল।

ভদ্রলোক। আপনার ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর কিছু শেয়ার কিনতে চাই। আমি ওয়েল্‌থ কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে এই কোম্পানী দুইটীর বিষয় জানতে পেরেছি!

সোমনাথ। আমাদের শেয়ার ত সব বিক্রী হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক। আজ্ঞে, তাত শুনেছি। আপনি যদি আপনার নিজের শেয়ার থেকে আমাকে কিছু দেন।

সোমনাথ। আমার অনেক বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার দিতে হবে। কি করি বলুন?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে আমি আপনার নাম শুনেই এসেছি, যদি দয়া করে কিছু দেন।

সোমনাথ। আপনারা দেখছি ছাড়বেন না। কিন্তু একশ এক লটে নিতে হবে, আর প্রিনিয়ম হয়েছে। এখন দশটাকা শেয়ারের দাম কুড়ি টাকা। এই প্রিমিয়মের দরে নিতে হবে। যদি রাজি হন দুহাজার টাকা রেখে যেতে পারেন, আমি চেষ্টা করে দেখব।

ভদ্রলোক। আচ্ছা আমি একখানা ক্রশচেক রেখে যাচ্ছি। চেক রাখিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেল। সোমনাথ উঠতে যাচ্ছিল—চাপরাশি বালল আর তিনটী ভদ্রলোক অপেক্ষা কচ্চে।

সোমনাথ। আচ্ছা জ্বালাতন—বেলা ১টা বাজতে যায় আমি কি খাওয়া দাওয়া করব না। বলে দাও কোটষ্ট্রীট আমার নূতন আফিসে যেন বেলা ৪টার সময় দেখা করবে।

চাপরাশি। আচ্ছা।

সোমনাথ। (প্রভাতের প্রতি) প্রভাতদা— আপনি আজ এখানে খেয়ে যাবেন।

প্রভাত। বেশ কথা।

* * * *

প্রভাত। সোমদা ব্যাপার কি বলুন ত? এমন সুগন্ধি ফুলেল তেল ত কোথাও পায়নি, স্নানের জন্য সমস্ত গোলাপ—সাবান যতবার চাই ততবার নূতন রকমারি গন্ধের, খাওয়া দেখে ত অবাক হোয়ে গিয়েছি, চিরকাল শুনতাম পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোমদা আপনার দাদা যাট যোত্তর ব্যঞ্জন হবে আর যেটা মুখে দিই সেটাই অমৃত, কোনটা ফেলে কোনটা খাব ঠিক করতে পারি না।

সোমনাথ। এ আর বেশী কি দেখলেন প্রভাতদা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

বধূ-বরণ।

মঞ্জীর-ধ্বনি-কুণ্ঠা ধরণী—
মন্থরালস চরণে,
মঞ্জুল প্রেম-লালিমা মাখানো
হেম উজ্জ্বল বরণে,
তুমি এস,—
সদয়া হৃদয় কমলা;
ললাটে আঁকিয়া সিন্দুর টিপ,
জ্বালাও কুটীরে কল্যাণ দীপ;
তরুলতা আজি হউক সজীব
হোক্ কুসুমিত সফলা।
মিটুক তৃষ্ণা জীবন-মরুর
অমিয় হাস্য ক্ষরণে;
এস আজি মোর গেহের লক্ষ্মী
লাজ-বিজড়িত চরণে!

সারা জীবনের সকল অগীত
সঙ্গীত মন-উদাসী,
তব অঙ্গুলি পরশে সেগুলি
উঠুক হরষে প্রকাশি'।
তুমি এস,—
এস গো করুণা রূপিণী;
যুদ্ধের ক্ষত ধুয়ে মুছে নিতে,
ঝঞ্ঝার দিনে বক্ষে টানিতে,
আবেগে ছুটিতে বাঁশরী ধ্বনিতে
এস গো কুলের গোপিনী।
দোঁহার জীবনে এক আশা প্রেম
উঠে যেন নিতি বিকাশি।
শুভ দিনে আজি বধূ বেশে সাজি'
এস গো মানস বিলাসী!

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

ভৌতিক-দর্পণ।

(১)

কিছুদিন হইল কলিকাতার কোন সমৃদ্ধ উপকণ্ঠে একটী লোম-হর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনাটী এইরূপ :—

নীলমাধব বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ধনী। ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও মনে শান্তি ছিল না। স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটিত। কলহ ক্রমশঃ এরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে স্বামী স্ত্রীতে একত্র বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্ত্রী জিদ ধরিলেন তিনি পিত্রালয়ে যাইবেন। নীলমাধব বাবু তাহাতে বাধা দিলেন না। উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক হইয়া গেল। যে দিন স্ত্রী পিত্রালয়ে যাইবেন তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা বেলা কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য বশতঃ নীলমাধব বাবুকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তিনি মোটরে গিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় মোটর ফিরিয়া আসিল। মোটর চালক একখানি পত্র নীলমাধব বাবুর স্ত্রীর হস্তে প্রদান করে। তাহাতে লিখিত ছিল যে সে রাত্রিতে নীলমাধব বাবু ফিরিবেন না। ভোরে যেন মোটরে করিয়া তাঁহার স্ত্রী ষ্টেশনে যান, সেইখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। নীলমাধব বাবুর স্ত্রী এই কথাটায় বড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। তিনি ভাবিলেন যাইবার সময় স্বামী আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি যাহা হউক আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। যাত্রার সমস্ত আয়োজন আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাহার সঙ্গে লোকজন বেশী যাইবে না। কেবল একজন বিশ্বস্তা দাসী সঙ্গে যাইবে।

ভোর পাঁচটার সময় দাসী কর্ত্রীকে জাগাইতে গেল কিন্তু ঠাকুরাণীর ঘুম ভাঙ্গিল না। দরজা ঠেলার শব্দে বাড়ী শুদ্ধ সকলে জাগিয়া উঠিল। কেবল জাগিল না কর্ত্রী ঠাকুরাণী। তখন সকলের সন্দেহ হইল হয় ত কর্ত্রী দুঃখে অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। পরামর্শ করিয়া দরজা ভাঙ্গা হইল। সকলে দেখিল কক্ষাভ্যন্তরে এক ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য। কক্ষতল রক্তে ভাসমান আর সেই রক্তের উপর কর্ত্রীর দেহখানি রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার গলদেশ শাণিত অস্ত্রে দ্বিখণ্ড-প্রায়। দাসদাসীগণ এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। যথাসময়ে পুলিশে সংবাদ প্রেরিত হইল।

ইতিমধ্যে নীলমাধব বাবু ষ্টেশনে পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বাড়ীতে আসিয়া এই শোচনীয় কাণ্ড অবগত হন। তখন পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।

তদন্তে প্রকাশ পাইল শুধু কর্ত্রী নিহত হন নাই তাঁহার অলঙ্কার গুলি ও প্রায় হাজার টাকার নোট চুরী গিয়াছে। তাঁহারই চাবি দিয়া বাক্স খোলা হইয়াছে। রক্তমাখা চাবি তখনও বাক্সের গায়ে লাগান আছে। একটা ক্ষুর দিয়া এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। ক্ষুর-খানি নীলমাধব বাবুর। নীলমাধব বাবু তাহা স্বীকার করিলেন। একটা জানালার গরাদ ভাঙ্গা। সেই জানালায় রক্তাক্ত পদচিহ্ন। কিন্তু হত্যাকারী তাহা মুছিয়া দিয়াছে। অপহৃত নোটগুলির মধ্যে কতকগুলি নম্বরী নোট ছিল। তাহার নম্বর নীলমাধব বাবুর নিকট আছে। পুলিশ আশা করিল সেই সুত্র ধরিয়া হত্যা-কারীর অনুসন্ধান করিবে।

পুলিশ প্রথমতঃ দাসদাসীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিল কিন্তু তাহারা কোনই সন্ধান দিতে পারিল না। নীলমাধব বাবুকেও সন্দেহ করিতে ছাড়িল না কিন্তু সে রাত্রিতে যে তিনি কর্ম্মস্থলেই ছিলেন তাহার সন্তোষ-জনক প্রমান পাওয়া গেল। দাসদাসীগণের গতিবিধির উপরও পুলিশ নজর রাখিল কিন্তু কোনও ফল হইল না। এমনি করিয়া ছয়মাস কাটীয়া গেল সন্ধান পাওয়া গেল না। নম্বরি নোটগুলিও বাজারে কেহ ভাঙ্গায় নাই।

এই ঘটনার আলোচনায় কলিকাতা সহর দিন কয়েক বেশ সরগরম ছিল। ক্রমে সকলে ভুলিতে আরম্ভ করিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ ঘটনা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। আমার বন্ধু শরৎ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাহার মোটর আছে। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যানও আছে। লোকটা সৌখীনও খুব। পছন্দসই মূল্যবান আসবাবে তাহার গৃহখানি পূর্ণ। শরৎ নূতন জিনিষ খুবই কম কিনিত। প্রায়ই সস্তা দরে ভাল ভাল পুরাতন জিনিষ ক্রয় করা তাহার একটা সখ ছিল। জিনিষগুলি নামে পুরাতন দেখিলে নূতন না বলিয়া থাকা যায় না।

একদিন রাত্রি প্রায় ১০॥০ টার সময় বেড়াইয়া ফিরিতেছি হঠাৎ শরৎ বলিয়া উঠিল, "আরে, তোকে একটা জিনিষ দেখান হয় নাই। চল, চল দেখবি চল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি জিনিষ"? শরৎ বলিল আরে খুব সস্তায় একটা ভাল আয়না কিনেছি। জিনিষের মত জিনিষ। চল তোকে আজই দেখতে হবে। আমি দু একবার আপত্তি করিয়া শেষে শরতের সঙ্গে চলিলাম।

শরতের বসিবার ঘরে আয়না খানি রহিয়াছে। বাস্তবিকই অতি মূল্যবান জিনিষ। আয়নার সম্মুখে বসিয়া আমরা দুই বন্ধুতে গল্প করিতে লাগিলাম। শরৎ অনর্গল বকিতে পারিত। অথচ তাহা শুনিতে আদৌ বিরক্তি বোধ হইত না। এইটুকু তাহার বিশেষত্ব! কথায় কথায় প্রায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল আমাদের জ্ঞান নাই। ঘড়ীর শব্দে আমাদের চমক ভাঙ্গিল। আমি উঠিয়া আসিতেছি এমন সময় শরৎ জিজ্ঞাসা করিল "এ আয়নাটা কার বলতে পারিস্?" আমি বলিলাম "কেমন করিয়া বলিব, তবে নিশ্চয়ই কোন সাহেবের।" শরৎ হাসিয়া বলিল, "দূর মূর্খ! কেন বাঙ্গালীরা কি ভাল জিনিষ কেনে না! এটা নীলমাধব বাবুর স্ত্রীর। জানিস্ নীলমাধব বাবুকে। যাঁর স্ত্রী আজ দু'মাস খুন হয়ে গেছে।" কথাটা শুনিয়া মন বড়ই অপ্রসন্ন হইল। খুনে ঘরের জিনিষ বাড়ীতে না রাখাই ভাল। যখনই জিনিষটার উপর নজর পড়িবে তখনই সেই অশুভ কথাটা মনে পড়িবে! সেটা কি ভাল?

শরতের একটা ছোট কুকুর ছিল। সেটা শরতের পাশে বসিয়া ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ কুকুরটা লাফ দিয়া আয়নার উপর পড়িল। তাহার বিকট চীৎকারে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুকুরটার কাণ্ড দেখিয়া আমাদের বড় আমোদ হইল। আমরা মনে করিলাম হয় ত দর্পণের ভিতর প্রতিবিম্ব দেখিয়া কুকুরটা এত আস্ফালন করিতেছে। আমরাও কৌতূহলী হইয়া আয়নাটার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সহসা কি জানি কেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। সর্ব্ব শরীরে যেন একটা মৃদু মন্দ বৈদ্যুতিক কম্পন অনুভব করিলাম। শরৎ অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমায় আয়নার দিকে চাহিতে বলিল। আমি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিলাম—সেই স্বচ্ছ দর্পণ প্রদীপ্ত দীপালোকেও অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে আমাদের বা কুকুরটার প্রতিবিম্ব আর দেখা যাইতেছে না। কেবল মনে হইল সেই অন্ধকারের ভিতর কি যেন একটা ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! একটা অনৈসর্গিক ভয়ে শরীরটা কম্পিত হইয়া উঠিল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া চাহিলাম—দেখিলাম সেই স্বচ্ছ দর্পণ প্রদীপ্ত দীপালোকে তেমনি সমুজ্জ্বল—তন্মধ্যে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি ও একটী সারমেয় মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ প্রতিফলিত। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম! তবে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কি দেখিলাম! একি মনের ভ্রম না কোন অলৌকিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম কুকুরটা আয়নার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া তাহার অভ্যস্ত স্থানে শয়ন করিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিলে?" শরতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সেও আমার মত বিচলিত হইয়াছে। তাহারও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে।

আমি উত্তর করিলাম, "দেখিলাম আয়নাটা হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল আর সেই অন্ধকারের ভিতর কি যেন একটা নড়িতেছে।"

"আমিও ঠিক তাহাই দেখিয়াছি। ব্যাপারটা কি বল দেখি! এ ত দেখছি ভৌতিক কাণ্ড!"

শরৎ বলিল, বেশ মজার আয়না কিনেছি। একটা দাঁও মারা গেছে বল। Theosophical Society কে দিয়া রহস্য ভেদ করা যাইবে। নিশ্চয়ই এ কোন প্রেতাত্মার কীর্ত্তি! কি বল?"

আমি আর কিছু উত্তর দিলাম না। চলিয়া আসিলাম। মনে মনে কিন্তু ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল।

(২)

দুইদিন পরে আমি আবার শরতের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম শরৎ নিজের বৈঠকখানাতেই দর্পণটা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। একটা চেয়ার টানিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া আয়নাখানি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই অতি সুন্দর আয়না। কিয়ৎক্ষণ দেখিবার পর লক্ষ্য করিলাম আয়নার মধ্যে পাঁচ ছয় স্থানে সূক্ষ্ম বিন্দুর মত দাগ রহিয়াছে। মনে হইল বুঝি পশ্চাতের পারদস্তর উঠিয়া গিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখিলাম তাহা নহে আয়নার উপরেই এই দাগ। আরও দেখিলাম ফ্রেমের উপরেও এক স্থানে রেখাকারে এমনই একটা দাগ রহিয়াছে। খুঁটিতে খুঁটিতে তাহা উঠিয়া গেল। লোহার উপর মরচের মত লাল গুঁড়ি হাতে লাগিল তাহা যে কি নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

শরৎ আমার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কিহে আবার ভূতের সন্ধানে লেগেছ নাকি? আমি ত ভাই এ দু'দিন আর কিছুই দেখতে পাই নি কুকুরটাও আর তেমন আয়নার কাছে যায় না। দু'একবার জোর করে নিয়ে গিছলুম তাতে যেন বিরক্ত হয়। আমার ত বোধ হয় সেদিন আমাদের দেখার ভুল হয়েছিল।"

শরতের কথা মানিয়া লইতে পারিলাম না। দুই-জনের ঠিক একই সময়ে একই প্রকার দেখার ভুল হইতে পারে এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বলিবারও কিছু নাই। এ দুই দিন ধরিয়া কত কি ভাবিয়াছি কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই।

শরত আমার পরদিন সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ করিল। তাহার জনকতক আত্মীয় আসিবেন তাই এ নিমন্ত্রণ।

পরদিন আহারাদির পর নিমন্ত্রিতগণকে বিদায় করিতে প্রায় সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। আমরা দুজনে বসিয়া গল্প করিতেছি। গল্পের বিষয় সেই আয়না। গল্প করিতে করিতে আবার পূর্ব্ববৎ অস্বস্তি বোধ করিলাম। মন যেন বলিয়া দিল আবার সেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইবে। কুকুরটাও ঠিক সময় বুঝিয়া চীৎকার করিতে করিতে দর্পণের নিকট ছুটিয়া গেল। আমি শরতের দিকে একবার চাহিলাম দেখিলাম শরৎ উদ্বেগ ও শঙ্কাকুল চিত্তে দর্পণের দিকে চাহিয়া আছে। আমিও স্থির দৃষ্টিতে দর্পণের দিকে চাহিলাম। দেখিতে দেখিতে দর্পণ ম্লান হইয়া আসিল। দর্পণের মধ্যে দেখিলাম একটা দৃশ্য প্রতিফলিত হইয়াছে। দৃশ্যটা একটা কক্ষের—কক্ষের পশ্চাতে একটী বাতায়ন। সেই বাতায়ন দিয়া এক ক্ষীণ দীপরশ্মি কক্ষ মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কক্ষের মধ্যে একটা লোকের হাতে একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছে। লোকটা লণ্ঠন হাতে করিয়া অতি সতর্ক পাদবিক্ষেপে একটা বিছানার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। শয্যায় কে ঘুমাইতে ছিল। সহসা সে উঠিয়া বসিল। সেই অস্পষ্ট দীপালোকে আমি লোকটার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম।

আর দেখিতে পারিলাম না। ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। স্থির হইবার জন্য চক্ষু মুদিলাম। তারপর চক্ষু খুলিয়া দেখি সে দৃশ্য আর নাই। দীপালোকে দর্পণখানি যেন আমাদিগকে উপহাস করিয়া হাসিতেছে।

কিন্তু একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলাম। স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। গভীর নিশীথে নিদ্রিতের পার্শ্বে লণ্ঠনধারী একটা লোক—লোকটার মুখে একটা পৈশাচিক ভাব! সে কি বীভৎস!

শরৎ ও আমি দু'জনেই এই দৃশ্য দেখিয়াছি। তবে আমি লণ্ঠনধারীর মুখ দেখিয়াছি শরৎ তৎপরিবর্ত্তে শয্যা-শায়িত ব্যক্তিকে দেখিয়াছে। সে এক রমণী। শুধু তাহাই নহে লণ্ঠনধারীর হস্তে সে একটা শাণিত অস্ত্রও দেখিয়াছে। তাহা হইলে এ ত একটা হত্যাকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। নীলমাধব বাবুর স্ত্রীর কক্ষে এই আয়না ছিল। গভীর নিশীথে শাণিত অস্ত্রে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। সে রজনীর সমস্ত ঘটনাই ত এই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই কি দর্পণ প্রতি রজনীতে তেমনি সময়ে তাহার পুনরাভিনয় করিতেছে! আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম প্রথম দিনও ঠিক বারোটার সময়ে এই ছায়ার আবির্ভাব হইয়াছিল।

শরত ও আমি যুক্তি করিলাম পরদিন রাত্রি ১২টার সময় আমরা এই ছায়ামূর্ত্তির লক্ষ্য করিব। তদনুসারে আমি রাত্রি ১১ টার সময় শরতের গৃহে আসিলাম। শুনিলাম শরৎ বাড়ীতে নাই। আমার জন্য একটা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। চিঠিতে লেখা আছে সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। যদি না আসিতে পারে তা'হলে আমি যেন শয্যাশায়িত রমণী মূর্ত্তিটী ভাল করিয়া লক্ষ্য করি।

আমি একাই আয়নার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। শরতের কুকুরটাও আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আমি একখানা কাগজ পড়িতে লাগিলাম ও মাঝে মাঝে আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া খানিকটা সময় কাটিল সহসা কুকুরটা চীৎকার করিয়া আয়নার সম্মুখে গেল। একটা দারুণ ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি আমি মন দৃঢ় করিয়া আয়নার দিকে চাহিলাম। আজ সংকল্প করিয়াছি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিব। দেখিতে দেখিতে দর্পণখানি তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ দূর-নিসৃত দীপালোকে কক্ষটী ঈষদ্ উদ্ভাসিত হইল। কক্ষে মহার্ঘ সাজ সজ্জা। বাম পার্শ্বের দেয়ালের দিকে খাটের উপর একটী শয্যা বিস্তৃত। দক্ষিণ পার্শ্বে একটী দরজা; তাহা বন্ধ। সম্মুখের দেওয়ালে একটী দর্পণ লম্বিত, দর্পণটী ঠিক আমাদেরই দর্পণের মত।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা খুলিয়া গেল। লণ্ঠন হস্তে একটা লোক ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। লণ্ঠনটী উঠাইয়া সে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল। তার পর অতি সতর্ক পাদসঞ্চারে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইল। সহসা শয্যা শায়িতা রমণী উঠিয়া বসিল। লণ্ঠনের আলোক তাহার ভীত বিবর্ণ মুখের উপর ক্ষণেকের জন্য পড়িল। আমি মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে লোকটা ব্যাঘ্রবৎ লম্ফনে রমণীর উপর পড়িল এবং একটা বালিশ তাহার মুখে চাপিয়া ধরিল। দুইজনে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। খাট ছাড়িয়া তাহারা কক্ষতলে পড়িল। তারপর সেই লোকটা রমণীর গলদেশে অস্ত্র প্রহার করিল। রক্তে সমস্ত কক্ষ প্লাবিত হইল। আমি আর দেখিতে পারিলাম না। চক্ষু বন্ধ করিলাম।

চক্ষু মেলিয়া দেখি দর্পণে জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিয়াছে। দর্পণের বক্ষ হইতে সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বক্ষ হইতে তখনও কম্পন দূর হয় নাই। মনে হইতে লাগিল এই লণ্ঠনধারী লোকটা যেন আমার পরিচিত। কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিলাম না কে সে। এমন সময়ে শরত তাহার মোটর চালককে সঙ্গে করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। মোটর চালককে দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম—এ ত সেই লোক! কি সর্ব্বনাশ!

পরদিন আমরা নীলাম্বর বাবুর স্ত্রীর ফটোর সন্ধানে বাহির হইলাম। ফটো দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম যে দর্পণদৃষ্টা রমণীই নীলমাধব বাবুর স্ত্রী। অনুসন্ধানে আরও জানিলাম যে এই মোটর চালকই তৎকালে নীলমাধব বাবুর চাকরী করিত। স্ত্রীর হত্যার পর তিনি যাবতীয় দাসদাসীকে জবাব দেন। তখন আমাদের আর কোন সন্দেহই রহিল না যে এই মোটর চালকই নীলমাধব বাবুর স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আবার আমরা মিলিত হইলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শরৎ তাহার মোটর চালককে ডাকিয়া পাঠাইল। শরৎ মোটর চালকের সহিত কথা বলিতে লাগিল, আমি সতৃষ্ণ নয়নে দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দর্পণ মধ্যে ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব হইলেই আমি শরতকে সঙ্কেত করিলাম। শরৎ সহসা কঠোর স্বরে আদেশ করিল "কিষণলাল, জেরা সীসাঠো দেখিয়ে ত?" কিষণলাল অবাক হইয়া দর্পণের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি আর ফিরিল না। আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম কিষণলালের সর্ব্ব শরীর যেন অতর্কিত তড়িতাঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল তাহার মুখে একটা অমানুষিক বিবর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্ষুর তারা দুইটা যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিষণলাল ঘামিতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল সহসা একটা মর্ম্মভেদী করুণ চীৎকার করিয়া কিষণলাল মাটীতে পড়িয়া গেল। অমনি শরতের সঙ্কেতে পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া কিষণলালকে মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করিল।

পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া কিষণলালের গৃহ হইতে কয়েক খানা নম্বরী নোট ও অলঙ্কার বাহির করিল তাহা নীলমাধব বাবুর স্ত্রীর বলিয়া সনাক্ত হইল। বিচারে হতভাগোর দ্বীপান্তরের হুকুম হইল।

ইহার পর আমরা কিন্তু দর্পণ মধ্যে আর ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখি নাই।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

বাজে কথা।

কাগজীলেবু আজকাল ঘরে ঘরে চলে; এ যে খুব উপকারী তাও শুনতে পাই। কিন্তু কি উপকার তা হয়ত অনেকে নাও জানতে পারেন। সম্প্রতি লণ্ডন সহরের এক বড় ডাক্তার কাগজীলেবুর গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি বলেন যে ইহার রক্ত পরিষ্কারক গুণ ত আছেই, তা ছাড়া ইহার আরও অনেক গুণ আছে। লেবুর রস হইতে প্রস্তুত পানীয় সুস্থ অসুস্থ সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ। চর্ম্মরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। আবার প্রত্যহ দাঁতের মাড়িতে লেবু ঘসিলে মাড়িতে কোনরূপ অসুখ হইতে পারে না। ঐরূপে লেবুর রস দিয়া দাঁত ঘসিলেও দাঁতে ময়লা বা পাথুরি জমিতে পারে না। প্রত্যহ নিয়মিত রূপে দাঁত পরিষ্কার করিবার পর খাঁটি লেবুর রসে ব্রাস বা দাঁতন ডুবাইয়া উহা দ্বারা দাঁত ঘসিতে হয়। ব্রাস বা দাঁতন দাঁতের আড়াআড়ি ভাবে না ঘসিয়া লম্বালম্বি ভাবে ঘসা উচিত। এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত চায়ের এক চামচ লেবুর রস মিশাইলে সেই জলে নখ ও হাত বেশ পরিষ্কৃত হয়। ধৈর্য্যের সহিত বার বার লেবুর রস লাগাইলে হাতের ও পায়ের কড়া ও আঁচিল ভাল হইয়া যায়। স্নায়বিক কারণে মাথা ধরিলে বা দাঁতে বেদনা হইলে আক্রান্ত স্থানে এক টুকরা লেবু ঘসিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। তার পর লেবুর কোয়া মাথায় ঘসিলে খুস্কি ও মরামাস সহজেই ভাল হইয়া যায়। অনেকে খুস্কির জ্বালায় অস্থির হন; তাঁহারা রাশি রাশি কিউটিকেরিয়া ও সালফার সাবান ব্যবহার না করিয়া এই সহজ উপায়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

* * * *

আজকাল auto-vaccine therapy বলে এক রকম নূতন চিকিৎসা প্রণালীর কথা শুনতে পাই। এই চিকিৎসায় নাকি রোগীর রস বা রক্ত হতে সিরাম তৈয়ের করে রোগীর শরীরে injection করা হয়; তাতে অনেক কঠিন কঠিন রোগ ভাল হয়ে যায়। এ কিছু

আশ্চর্য্য নয়। আমরাও দেখ্‌তে পাই গরু ও কুকুর নিজের ঘা নিজে চেটেই ভাল করে, ডাক্তারের কাছে তাকে যেতে হয় না। ছেলেরাও অনেক সময়ে ব্লটিং কাগজে নিজের থুথু লাগিয়ে তাহা ছোট ছোট ঘায়ের উপর পটির মত বসিয়ে দেয়, এতেই ঘা ভাল হইয়া যায়। সে দিন এইরূপ ধরণের একটি চিকিৎসার ফল দেখে বিস্মিত হলেম। একদিন এক ষ্টেশনে বসে আছি, এমন সময়ে এক পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত, তাঁর হাতখানি কাপড়ে জড়ান ও মুখখানি বড়ই যন্ত্রণায় কাতর। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন, "এই গাড়ীতেই সহরে যাচ্ছি; হাতের ফোড়াটি কাটাতে হবে, তিন দিন হ'ল পেকেছে, কিন্তু কিছুতেই ফেটে পুঁয বের হয় না। যন্ত্রণাও আর সহ্য করতে পারি না।" ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এ কথা শুনেই বল্‌লেন, "আপনাকে সহরে যেতে হবে না, ঘরে ফিরে যান। ঘরে যেয়ে কালকাসিন্দার পাতার সোজা পিঠে আপনার নিজের থুথু দিয়ে ফোড়ার উপর বসিয়ে দিন; থুথু শুকিয়ে গেলেই আবার নূতন করে পাতা বসাবেন। ধৈর্য্য ধরে ৩।৪ ঘণ্টা আপনাকে এইরূপ করতে হবে।" ভদ্রলোকটিও বাড়ী ফিরে যেয়ে তাই কর্‌লেন। বিকাল বেলা হাসিমুখে তিনি ষ্টেশনে এসে উপস্থিত; দেখলেম যেখানে পাতা লাগান হয়েছিল সেখান দিয়ে খুব পুঁয বের হয়ে যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়েছে। ফোড়া পেকে উঠ্‌লেই এই ব্যবস্থা। এ কে auto-vaccine therapyই বলুন বা যাই বলুন যাঁরা ছুরী ও ড্রেসিংএর ঘাঁটাঘাটিকে ভয় করেন তাঁদের পক্ষে এ ব্যবস্থা বেশ উপযোগী।

* * *

'হিন্দু ডুবিল,' 'হিন্দু ডুবিল'—এই কথাটি আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু ডুবে মর্‌বার আগে লোকে হাত পা ছুড়েই মরে। কিন্তু বাঙ্গালী এমনই নির্জ্জীব যে হাত পা ছোড়ার শক্তিও নাই। বাঙ্গালীরা যদি বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত একটু নিয়মিত ভাবে হাত পা ছুড়্‌তে পারতো, তা হ'লে তাদের এমন দুর্দ্দশা হতো না। Lord Kitchener একদিন খুব বড় রকমের একটা ফুটবল ম্যাচ্ দেখ্‌তে গিয়েছিলেন; চারিদিক লোকে লোকারণ্য। খেলা শেষ হতেই Kitchener বেরিয়ে আসছিলেন। এমন সময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কেমন খেলা দেখ্‌লেন?" Kitchener উত্তর কর্‌লেন, "খেলা দেখলুম ভালই; কিন্তু ২২ জনের খেলা ২২০০০ লোক দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। তা না হয়ে যদি ২২০০০ লোকের খেলা ২২ জন দেখ্‌তো তা হ'লে আমি খুবই খুসী হতেম আর দেশেরও খুব মঙ্গল হতো।"

নিষ্কর্ম্মা।

—:(*):—

কমলার বিবাহ।

(গল্প)

তিন বৎসরের শিশুকন্যা কমলাকে মাতৃহীন করিয়া রমাসুন্দরী যখন আর এক লোকে চলিয়া গেলেন, তখন কালবৈশাখীর মেঘে সমস্ত আকাশটা ঢাকিয়া যাইবার মত প্রসন্নকুমারের চোখের সামনেও এই পৃথিবীর বর্ণ যেন কালো হইয়া উঠিল! তিনি প্রথমটা বিশ্বাসই করিতে পারিয়াছিলেন না যে রমা নাই! মনে করিয়াছিলেন, রোগের যন্ত্রণায় রমা অনেক সময় যেমন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, এখনও হয়ত তেমনি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রমা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে এরূপ কল্পনাও যে তাঁহার পক্ষে মর্ম্মন্তুদ! যে রমার চরিত্র মাধুর্য্যে তাঁহার আলয় শান্তি নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল; যাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইতেন, কোন্ পাপে তাঁহার সেই সোনার প্রদীপটি বিধাতা এত শীঘ্র নিভাইয়া দিবেন। তাই প্রসন্নকুমার বার বার পত্নীর প্রকোষ্ঠে হাত রাখিয়া ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন, মনে হইল ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে সুতার মত যেন কি একটু নড়িতেছে! বক্ষে কর্ণ স্থাপন করিলেও যে হৃদস্পন্দন অনুভব হয়! কিন্তু হায় রে, তৃণগুচ্ছ অবলম্বনে মহাসমুদ্রে ভাসিয়া থাকিবার প্রয়াসের মত আশার ছলনায় মানুষ কতক্ষণ আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে! তাই মর্ম্মভেদী হরিবোল ধ্বনি করিয়া শ্মশানযাত্রীরা রমাকে শ্মশানে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন তাহার শবের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া প্রসন্নকুমার একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রমার মৃতদেহের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

*　　　*　　　*　　　*

কমলার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে পাষাণে বুক বাঁধিয়া প্রসন্নকুমারকে আবার সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হইল। তাঁহাকে অশ্রু মোচন করিতে দেখিলে কমলা যে কাঁদিয়া আকুল হয়। তাঁহার অমনোযোগীতায় একটুকু ছিদ্র পাইয়া শিশুর সরল অন্তরে যদি একবার অভাবের তীক্ষ্ণ হুল প্রবিষ্ট হইতে পায় তাহা হইলে নিদাঘের খররৌদ্রে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির ঝলসাইয়া যাইবার মত, তাঁহার প্রিয়তমার সেই অমূল্য নিদর্শনীটিও যে নিমেষে নিমেষে শুখাইয়া উঠিবে! রমা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেও এখনও যে সুদূরের ঐ ক্ষুদ্র তারাটির মত আকাশের একপ্রান্তে বসিয়া অনিমেষ নয়নে সকল সময় তাহাদের পানে চাহিয়া রহিয়াছে! কন্যার প্রতি এতটুকু অবহেলায় সেখানে বসিয়াও যে তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে! রমা যে পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়. তাহার আদরের কমলাকে তাঁহার কোলে তুলিয়া দিয়া কি মিনতিভরা দৃষ্টিতে নীরবে সযত্নে তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে অনুরোধ করিয়া শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিল, এখনও যে তাহা ঝড়ের মত শব্দ করিয়া প্রসন্নকুমারের কাণের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে! পত্নীর জন্য শোকাশ্রু ফেলিবার তাঁহার অবসর কই? তাই কমলার মাতুল রাধানাথ বাবু আসিয়া ভাগিনেয়ীকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব যখন প্রসন্নকুমারের কাছে করিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না! প্রাণপণ যত্নে অনন্যচিত্তে কন্যাকে লালন করাই যে এখন পৃথিবীতে তাঁহার স্বর্গীয়া প্রিয়তমার প্রতি একটি মাত্র পরম করণীয়! এই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই ত তিনি সংসারে রহিয়াছেন! তাহা না হইলে রমাশূন্য ভবনে এবং অরণ্যে তাঁহার নিকট ত কোন প্রভেদ নাই। রাধানাথ বাবু অনেক বুঝাইলেন—তাঁহাঃ রমণীসম্পর্কশূন্য গৃহে শিশুপালন করিবার বহুল বিঘ্নের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু প্রসন্নকুমার কোন যুক্তিতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তিনি একাধারে পিতা ও জননীর স্নেহে দুহিতাকে মানুষ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হইলেন।

(২)

রমাসুন্দরীর মৃত্যুর পর দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেদিনকার সেই শিশু কমলা এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী। মুঞ্জরিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অশোকের পাতায় পাতায় একটা চিক্কণ শ্রী ফুটিয়া উঠিবার মত, যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কমলারও অঙ্গে অঙ্গে একটা অনবদ্য লাবণ্যের আভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহাকে পাত্রস্থা না করিলে নয়! এখনি এতখানি বয়স অবধি কমলাকে অবিবাহিতা রাখিবার জন্য সমাজপতিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন! তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেছেন 'ধুবড়ো মেয়ে' ঘরে রাখিয়া কমলার মাতুল রাধানাথ মুখে অন্নের গ্রাস তুলিতেছেন কেমন করিয়া? ঘোর কলা কলি বোধ হয় পূর্ণ হইয়াছে;—তাহা না হইলে মাতা বসুমতী এখনও রসাতলে গমন না করিয়া, এত বড় অন্যায় সহিতেছেন কিরূপে? হায় অধঃপতিত সমাজ, তুমি অনাচারের জন্য কেবল রসনার বিষই উদ্গিরণ কর; কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পার কি? তোমার দৃষ্টি শুধু সহায় সম্পদ হীন দুর্ব্বলের উপরই অগ্নি বর্ষণ করে! তাহা না হইলে কমলার ভাগ্যবান পিতা প্রসন্নকুমার কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আবার বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে তোমার বুকের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার নিকট তোমার রক্ত চক্ষু প্রকাশ না করিয়া তাঁহার জন্য দায়গ্রস্থ মহৎ হৃদয় দরিদ্র রাধানাথকে তুমি শাসন করিবে কেন? রাধানাথ বাবু ভাগিনেয়ীর বিবাহের জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। তিনি তাহাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন! কিন্তু তাঁহার সম্বলের মধ্যে ত কয়েক বিঘা জমি এবং পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কয়েক শত টাকা মাত্র!

রাধানাথ বাবুর হিতৈষী বন্ধু বান্ধবগণ, এমন কি তাঁহার মনিব জমিদার রমাপ্রসন্ন চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যে তাঁহার যতদূর সাধ্য তিনি কমলার জন্য তাহা করিয়াছেন এখন তাহাকে তাহার পিতার কাছে পাঠানই তাহাদের উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। রাধানাথের কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন মনে হয় নাই। কমলা যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী রমার আদরের স্মৃতি! শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীন রমাকে তিনিই যে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন! তাঁহার সন্তান হীন শুষ্ক হৃদয়ে রমা যে অপত্য রসের উৎস ছুটাইয়া একদিন তাহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভগ্নী রমার কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার পাষণ্ড স্বামীর সাহায্য প্রার্থী হইতে ঘৃণায় তাঁহার অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল! তবুও সকলের অনুরোধে পড়িয়া রাধানাথ বাবু কমলার বিবাহের কথা জানাইয়া তাহার পিতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রসন্নকুমার সেই চিঠির কোন উত্তর দেন নাই। প্রসন্নকুমারের আচরণের বিষয় মনে করিয়া রাধানাথ অবাক হইয়া ভাবিতেন, মানুষ কেমন করিয়া এমন পশুতে পরিণত হয়! হায় এই কি সেই প্রসন্নকুমার যাঁহার পত্নীর পতি প্রগাঢ় প্রীতি দর্শন করিয়া একদিন পল্লীরমণীগণ রমার উপর অন্তরে অন্তরে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিত! রমার মৃত্যুর পর যে প্রসন্নকুমারের কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞান দেশের মধ্যে একটা প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল! কিসের মোহে সে আজ এমন করিয়া তাহা বিস্মৃত হইয়াছে?

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর রাধানাথ বাবু গৌরীপুরের রমেশ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লকুমারের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্র দুইবার F. A. ফেল করিয়া এক্ষণে আদালতে শিক্ষা নবিসীতে নিযুক্ত রহিয়াছে। রমেশবাবু দীর্ঘকাল সেরেস্তাদারী করিয়া আপনার অবস্থা বেশ একটু গুছাইয়া লইয়াছেন। দরিদ্র রাধানাথের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাগিনেয়ীকে সুপাত্রে অর্পণ করিবার আশা করা যে বামনের চন্দ্র ধরিবার মতই বিড়ম্বনা মাত্র!

(৩)

আজ কমলার বিবাহ। অরুণোদয়ের ক্ষণপূর্ব্বে আকাশের অন্ধকার বুকে একটু স্বচ্ছ আভা ফুটিয়া

উঠিবার মত, রাধানাথ বাবুর মুখ খানিও এক্ষণে একটি প্রসন্ন হাস্তে মণ্ডিত; কেবল রমার স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁহার স্মরণ পথে উদয় হইয়া শরতের চলন্ত মেঘে এক একবার সোণার রৌদ্রকে পাণ্ডুর করিবার মত, তাঁহার সেই আনন্দের উচ্ছ্বসকেও ঈষৎ ম্লান করিয়া তুলিতেছিল।

এই মাসে আর দিন ছিল না বলিয়া, আজ এক দিনেই গাত্র হরিদ্রা এবং বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল। রাধানাথ বাবু আকুল আগ্রহে প্রভূত হইতেই 'গায়ে হলুদ' আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় এক বার দুই হাত এক হইলে একটা মহান কর্ত্তব্যের দায় হইতে যে তিনি অব্যাহতি পান! এই পৃথিবী হইতে যে তাঁহার কাজের ছুটি হইয়া যায়!

মানুষ ভাবিয়া রাখে এক, আর ভগবান তাহার জন্য করিয়া থাকেন অন্যরূপ। তাই রাধানাথ বাবু যখন সম্ভাবিত মুক্তির পরম ক্ষণটির জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছিলেন, তখন বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া তাহার ভাগ্যসূত্রের গ্রন্থিটিকে আরো জটিলতর করিয়া রাখিতে ছিলেন! গায়ে হলুদ আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ভাবী বৈবাহিক ভবনে লোক পাঠাইয়া রাধানাথ বাবু যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তাঁহার পায়ের নীচের মাটি বাসুকীর ফণা আন্দোলনে ভূকম্পনের মতনই নড়িয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন, রমেশবাবু অন্য এক স্থানে আরো কিছু বেশী পণের প্রতিশ্রুতি পাইয়া, সেইখানেই পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন; তবে রাধানাথ বাবু যদি সেই বেশীটা ধরিয়া দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে—তাঁহার সহিত যখন প্রথমে পুত্রের 'সওদা পাকা' হইয়াছে তখন তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া অপর স্থানে তিনি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

কথাটা শুনিয়া বিবাহ বাড়ীতে সমাগত অনেক লোকই নানা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাধানাথ বাবুকে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। বিপদের সময় ধৈর্য্যই যে মানুষের পরম অবলম্বন এই সত্যটা তাঁহারা ভাল করিয়া রাধানাথ বাবুর হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু শুষ্ক সহানুভূতি ভিন্ন যথার্থ হিতৈষীর ন্যায় তাঁহার এই বিপদের অংশ গ্রহণ করিবার এতটুকু ক্ষীণ প্রবৃত্তি কি তাঁহাদের কাহারও মনে জাগিয়াছিল? তাঁহারা অনেকেই ত সুপুত্রের জনক—তাঁহারা ইচ্ছা করিলে রাধানাথের এই আকাশ ভাঙা বিপদ এখনইত দেবতার আশীর্ব্বাদে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়! ডিটেকটিভ উপন্যাসের উপসংহার পাঠের কৌতূহলের মত তাঁহারা যে রাধানাথের আলয়ে পান তামাকের সহিত তাঁহার এই দুর্দ্দিনের পরিণাম দেখিবার জন্য মনে মনে উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন! তাই রাধানাথ বাবু কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রথম খানিকটা হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া ভাবী বৈবাহিক আলয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

(৪)

উজ্জ্বল আলোকমালা পরিশোভিত বিবাহ সভা। রাধানাথ বাবু কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার মুখ বর্ষার নিবিড় আকাশের মতই গম্ভীর—চক্ষু হইতে একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! পুরোহিত মন্ত্র বলিতেছেন—রাধানাথ বাবু তাহা আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে তখন যে প্রলয়ের ঝটিকা বহিয়া যাইতেছিল! ভাগিনেয়ীর বিবাহের জন্য তাঁহাকে যে আজ শয়তানের দাস হইতে হইয়াছে! দরিদ্র রাধানাথের কিছু না থাকিলেও সুনাম ছিল। আজ কমলাকে পাত্রস্থ করিতে যাইয়া তাঁহাকে সেই সুনাম বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। তিনি চোর হইয়াছেন।

ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের চরণে ধরিয়া করুণা ভিক্ষা করিয়াও যখন তিনি তাহাকে 'নরম' করিতে পারিলেন না, তখন রমেশ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া তাঁহার আর উপায় ছিল না। রাধানাথ বাবু ভাবিয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে তিনি বৈবাহিকের ঋণ পরিশোধ করিবেন; কিন্তু হায় রে মরুভূমিতে সলিলের বৃথা

অম্বেষণের ন্যায় বাঙলা দেশের বরের ভাগ্যবান জনকদের কাছে অতটুকু অনুগ্রহের আশাও যে বিড়ম্বনা!

রমেশ বাবু রাধানাথ বাবুকে সে অবসর না দিয়া প্রস্তাবিত 'পুত্রমূল্য' তখনই চাহিয়া বসিলেন। রাধানাথ বাবু বৈবাহিক মহাশয়কে টাকাটা কিস্তিতে কিস্তিতে লইয়া অনুগৃহীত করিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন; কিন্তু পাষাণ ত দ্রব হইবার নয়! রমেশ বাবু তাঁহাকে বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার অনুনয় অকারণ। তিনি টাকা অগ্রিম হাতে না পাইলে কমলার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন না। হায় তবে কি তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়া যাইবে? আজই কমলাকে পাত্রস্থা না করিলে যে তাহার সমস্ত জীবনটা অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে! অনন্তপূর্ব্বা কন্যা যে বিধবারই প্রকার ভেদ মাত্র। যে মাতৃহীন পিতৃস্নেহ বঞ্চিত এতটুকু শিশুকে তিনি তাঁহার বক্ষের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছিলেন আজ তিনি কি করিয়া তাহাকে চক্ষের সম্মুখে আগুনের বিছানায় শয়ন করিতে দেখিবেন? ইহা অপেক্ষা পিতৃ ভবনে বাপের অবহেলায়, বিমাতার পীড়নে অমলিন সেফালি ফুলটীর মতই যে তাহার ঝরিয়া পড়া ছিল ভাল। না না কিছুতেই তিনি কমলাকে এমন দুষ্কৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না। তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন তাঁহার সেই বড় আদরের ভগ্নী রমা কন্যার জন্য করুণা ভিক্ষা করিয়া মিনতি ভরা ছল ছল নয়নে স্বর্গ হইতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে! স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন জমিদারের তহবিল হইতে টাকা ভাঙিয়া তিনি রমেশ বাবুকে তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিবেন। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই একটা তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর টন টন করিয়া উঠিল। সহস্র প্রলোভন জয় করিয়া আসিয়া জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার সহিত অদৃষ্টের একি পরিহাস! তিনি টাকা ভাঙিয়াছেন এই সংবাদটা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে—না তাঁহার আর দ্বিধা করিলে চলিবে না। ঘরে আগুন লাগিলে কি আর বিচার বুদ্ধি থাকে? রাধানাথের সম্মুখে জমিদারের তহবিল ভিন্ন এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় যে নাই! ভাবিতে ভাবিতে রণজয়ী আহত সেনানীর উল্লাসের মত একটা হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাড়ী ফিরিয়াই রমেশ বাবুকে তাঁহার 'পণের' টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

* * * * * *

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। রাধানাথ বাবু এতক্ষণ যে তীব্র উত্তেজনায় আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে দারুণ অবসাদে তাহা ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তিনি হৃদয় মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল পাঞ্জাব মেলের অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের এই দ্রুত স্পন্দন বুঝি তখনই থামিয়া যাইবে! তাই মধ্যে মধ্যে তিনি দুই হস্তে আপনার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া শুভ কার্য্য শেষ হইবার পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন! মন্ত্র পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথ বাবু কমলার এক খানি হাত প্রফুল্লকুমারের হাতে রাখিয়া উভয়কে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া যখন মস্তক চুম্বন করিতে নত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া কয়েকটি অস্ফুট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। সকলে হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—বক্ষ স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। দেহ তুষার শীতল; মুক্তির বিমল হাস্যটুকু কেবল অধর কোণে ফুটিয়া আছে।

শ্রীনলিনী নাথ দে।

সন্তবাণী।

(হাত্রাস নিবাসী মহাত্মা তুলসী সাহেবের বচন)

সাধুর চরণ আশ্রয় করে অনেক নীচ লোক উদ্ধার হয়ে যায়; কিন্তু অনেক কুলীন জাত্যাভিমান নিয়ে ডুবে মরে।

* * *

যেমন তেমন করে সাধুর আশ্রয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে গাঁইট বাঁধ; তাঁর দোষগুণ বিচার করবার কোন দরকার নাই।

* * *

সোনাতে কখন কাই লাগে না, লোহায় কখন ঘুণ ধরে না। তেম্‌নি গুরুভক্ত ভাল হোক্ মন্দ হোক্, সে কখনও নরকে যায় না।

* * *

সাধুসন্তই ভগবানের দরবারের দ্বার স্বরূপ। তাঁর সঙ্গে মিল্‌লেই শীঘ্র ভগবানের নামও মিলে যায়।

* * *

শরীর নিয়েই হোক্ বা মন নিয়েই হোক্ সকলেরই একটা না একটা দুঃখ লেগে আছে; কেবল যে সন্তের দাস সেই সুখী। মনের ভিতর যতক্ষণ কাম ক্রোধ মদ লোভ আছে, ততক্ষণ পণ্ডিত মূর্খে কোন ভেদ নাই—ছোট বড় সব এক সমান।

* * *

ঘরে উপপত্নী রেখে কেউ কেউ মনে বৈরাগ্য আন্‌তে চায়। তা কি হতে পারে? নিমগাছের পোকা কি কখনও চিনির আস্বাদ পায়?

* * *

পরের ধন হরণ করায় বা পরের মন বশ করায় বিশেষ কিছু বাহাদুরী নাই; এ কাজ বেশ্যা সব চেয়ে ভালরূপেই পারে। কিন্তু যে নিজ মন বশ করে ভগবানের চরণে লীন হতে পারে সেই বাহাদুর—সেই প্রকৃত চতুর।

একমাত্র ভগবানই আশা ভরসা ও বল; তুলসী পাপিয়া পাখী আর ভগবচ্চরণ তার স্বাতী নক্ষত্রের জল।

* * *

এক বাদসাহের বড় কঠিন পীড়া হয়। রাজ্যের যত হাকিম ডাক্তার এসে চিকিৎসা করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তখন নিরুপায় হয়ে সব হাকীম ডাক্তার পরামর্শ করতে লাগলো। শেষে ঠিক হলো যে একজন বেশ সুস্থ ছেলের পিত্ত দিয়ে ঔষধ তয়ের করে খাওয়ালে বাদসাহ ভাল হতে পারেন। তখন হাজার হাজার লোক বেশ একটি নীরোগ সুস্থ ছেলের সন্ধানে ছুটলো। অনেক খোঁজের পর এক কৃষকের একটি পনর ষোল বছরের ছেলেকে ধরে নিয়ে হাকীমদের সাম্‌নে আনা হলো। তারা ছেলেটিকে পছন্দ করলো। তখন তাকে মেরে তার পিত্ত দিয়ে ঔষধ তয়ের করা হবে ঠিক হলো। সেই ছেলের বাপ মা অনেক টাকা পেয়ে ছেলের প্রাণ নিতে কোন আপত্তি করলো না; কাজী সাহেবও ফতোয়া দিলেন যে বাদসাহের জীবন রক্ষার জন্য একজন প্রজার প্রাণ লওয়ায় কিছু অন্যায় হয় না। তার পর যখন জল্লাদ ছেলেটাকে কাটবার জন্য খড়্গ তুললে তখন ছেলেটা আকাশের দিকে চেয়ে হেসে উঠ্‌লো। বাদসাহ কাছেই বসে ছিলেন, তিনি ছেলেটিকে বললেন, "বা! তুমি হাসছো যে, এই কি তোমার হাসবার সময়?" ছেলেটি তখন বল্লে, "হুজুর! ছেলের ভরসা মা বাপের উপর, ফরিয়াদীর ভরসা কাজীর উপর কেন না কাজীর কাছেই সে বিচারের জন্য যেয়ে থাকে আর আমাদের শেষ ভরসা বাদসাহ; কারণ তিনি ন্যায় ও দয়ার ভাণ্ডার। কিন্তু দেখুন আমার কি দুর্ভাগ্য যে সেই পিতা মাতা কিছু সাংসারিক লাভের প্রত্যাশায় আমার প্রাণ বধে

স্বীকার, হলেন কাজী, সাহেবও একজন নিরপরাধী বালককে বধ করবার ব্যবস্থা দিলেন আর যে বাদসাহ ন্যায় ও দয়ার ভাণ্ডার ও প্রজার রক্ষাকর্ত্তা তিনিও অল্প করেক দিন বাঁচবার জন্য যে বালকটীর অনেক দিন বাঁচবার আশা আছে তাঁর প্রাণ নওয়া উচিত বোধ করলেন। এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য ব্যাপার কি আছে? কাজেই আমি না হেসে থাকতে পারি নাই; আর বুঝতে পারলেম যে এক সর্ব্ব সমর্থ ভগবান ভিন্ন আর আমার কোন সহায় নাই, তাই আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম।" বাদসাহ এই সব কথা শুনে একবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। কথাগুলি তাঁর অন্তরে এমনিই আঘাত করলো যে তিনি তখনই বলে উঠলেন, "ছেলেটিকে ছেড়ে দাও; আমি মরি সেও ভাল, তবু এ বালকটিকে বধ করে আমি মহাপাপী হতে চাই না।" তারপর তিনি ছেলেটিকে খুব আদর যত্ন করে ও অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। সেই দিন যেন তাঁর মনের গতি একবারে ফিরে গেল, ভগবানের কৃপায় বিনা ঔষধে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হলেন ও যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি ধর্ম্ম পথেই জীবন কাটিয়ে ছিলেন, কোন প্রজার প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করেন নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কামনা।

রোগে অচেতন তুই জনে যবে,
নাহিক শকতি ফিরিয়া চাই;
বুক ফাটা সে যে শত হাহারব
কয়ে গেল কাণে তুমি গো নাই!
অশ্রু বন্যা এল আঁখি ভরে,
হৃদয়ে বহিল প্রলয় বায়ু;
শত বার যুঝি উঠিতে নারিনু,
ফুরাল'না শুধু আমারি আয়ু!
শিথিল হস্ত বৃথাই খুঁজিল
শূন্য তোমার শয্যাতল;
এমনি শ্রাবণে আকাশ ঘিরিয়া
নামিল কেবল বর্ষাজল!
মূর্চ্ছিত দেহ কতদিন পরে
জাগিল যখন জীবন রাগে;
গৃহ ছায়ে বসি দেখিনু বিশ্বে
কিছু যেন আর ভাল না লাগে!
মিলন উজল প্রমোদ বিতানে
ঘিরিল তিমির বিরহ ভার;
প্রাণ-মনোরমা মাধবীর শোভা
লুকালে সে কোন সুদূর পার!

বর্ষা কতই এল গেল ফিরে,
ব'সে আছি যদি তোমারে পাই;
আছ বুঝি দূর মেঘের আড়ালে,
অথবা ধরার সে কোন ঠাঁই!

* * *

সন্ধান তব এতদিন পরে
পেয়েছি, কোথায় লুকাবে আর?
রজনীগন্ধা মালতীর বুকে,
জাগিছে তোমার সুষমা ভার।
বর্ষণ শেষে চাঁদিমার গায়,
ফুটেছে তোমার মধুর হাসি;
কাজল মেঘেতে ছড়ায়ে পড়েছে
কৃষ্ণ মোহন চিকুর রাশি।
অশ্রু তোমার বাদল ধারায়
নেমেছে আজিকে জগৎ ছেয়ে;
তটিনী তাহাই বুকেতে ধরিয়া
দয়িত চরণে চলেছে ধেয়ে।
তিল তিল করি হিয়ার অর্ঘ্য
রাখিব গোপনে যতন করি;
দিব উপহার মিলনে আবার,
তোমারে আকুল বুকেতে ধরি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতে নগর বিন্যাস।

(২)

পথবিন্যাস স্থপতির অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম। পথের প্রয়োজন দ্বিবিধ। প্রথমতঃ তাহাতে লোকজন বা যানবাহনাদি চলাচল করে, দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা বসতিভূমি (building of residential block) নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। পথগুলি আবার বায়ুপ্রবাহের প্রণালী স্বরূপ। পথে কিম্বা পথের মোড়ে (crossing) যাহাতে পথিক সম্ভব কিম্বা বিপরীত গামী যানাদির সজ্ঘট্ট না হয় পথ বিন্যাসের সময় তাহাতেও লক্ষ্য রাখিতে হয়।

প্রাচীন ভারতে রথ্যাবিন্যাস, পদ বিন্যাস, জন স্থাপনা, রাজগৃহ, রাজসভাদি বিন্যাসের সুকৌশলে প্রাগুক্ত বিধিনিচয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। পথে যানাদির সংঘর্ষ না হয় এ নিয়ম পুরনির্ম্মাণবিদ্‌গণ বেশ বুঝিতেন। দেবী পুরাণে আছে রাজপথ চল্লিশ হাত বিস্তৃত করিবে। এই জন্য বড় বড় সহরে ক্ষুদ্র বীথি কিংবা (foot way) স্থাপন করা শুক্রাচার্য্য পছন্দ করেন নাই। প্রাচীন ভারতে পথভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্য দুর্গনিবেশ প্রকরণে, 'রথপথ' 'পশুপথ' 'ক্ষুদ্র পশু মনুষ্যপথ' এবং তাহাদের বিস্তৃতি পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে মাহিষ্মতিপুরীর বিন্যাসের কথায় লেখা আছে, রথ্যা (Vehcular Street), বীথি (avenue), নৃমার্গ, বন ও চত্বর স্থাপন করা হইল।

দেবীপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, রাজপথ চল্লিশ হাত, শাখা রথ্যা ষোল হাত, উপরথ্যা (গলি) তিন হাত, উপরথ্যিকা (ছোট গলি, bye lane) দুই হাত, গৃহান্তর (দুই বাড়ীর মাঝ খানে ফাঁক) দুই হাত, নালা বা নর্দ্দমা অবকাশপরীবাহ ১ ফুট করা উচিত। নগরের আয়তন অনুসারে কম বেশী পথের বিন্যাস করা বিধেয়। নগরের লম্বালম্বি তিন হইতে সতরটি, প্রস্থের দিকে প্রায় তত সংখ্যক রাজমার্গ বিন্যাসের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন ভাবে রাস্তা ফেলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত সহরটা "সুবিভক্ত" (Symmetrically divided) হয়। পথবিন্যাসের পদ্ধতি সতরঞ্চের চকের মত। জয়পুরের পথবিন্যাস এই পদ্ধতিরই রকমভেদ অনুসারেই হইয়াছে, উহার পারিভাষিক নাম প্রস্তরা। পথের সংখ্যা এবং পথি পার্শ্বস্থিত গৃহ পঙক্তি রচনার বিভিন্নতা অনুসারে ভারতীয় নগরবৃন্দের পৃথক পৃথক নাম করণ হইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ময়মুনি—দণ্ডক, কর্ত্তরী—দণ্ডক, কুটকামুখ—দণ্ডক, কলকাবদ্ধ দণ্ডক, বেদীভদ্রক, মহাভদ্র, সুভদ্র জয়াঙ্গ, বিজয় এবং সর্ব্বতোভদ্র এই কয় রকম সহরের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রত্যেক গলি বা রাস্তার মাথায় কবাট সহ তোরণ (গোপুর) নির্ম্মিত হইত। কাশী, জয়পুর, আহম্মেদাবাদে নিদর্শন আছে।

মানসারের মতে গ্রাম বা নগরকে (প্রাচীরের ভিতরে) বেষ্টন করিয়া যে মহা মার্গ বিন্যস্ত হয়, তাহাকে মঙ্গলবীথি (boulevard) বলে, পূর্ব্ব পশ্চিম করিয়া বিন্যস্ত পথকে রাজপথ বলে, যাহার দুই প্রান্ত ভাগে দুই দ্বার আছে তাহাকে রাজবীথি বলে; যাহার সন্ধি আছে তাহাকে সন্ধিবীথি বলে, যাহা উত্তর দক্ষিণে বিন্যস্ত তাহাকে মহাকাল বা বামন পথ বলে।

(কোণাকুণি বিদিক্‌স্থা) রাস্তা ফেলা নিষেধ ছিল। দুই বা ততোধিক পথের সঙ্গম স্থলকে বিশিষ্টাকার যথা—ত্রিকোণাকৃতি (ত্রিক), চতুষ্পথকে (চত্বর), এবং বহু পথকে (crosss section of many roads) বৃত্তাকৃতি করা হইত। বড় বড় রাস্তার দুই ধারে সারি দিয়া বৃক্ষরোপণ করার কথাও আছে। অনেক রাস্তার

দুই ধারে দেওয়াল থাকিত। রাজপথ সমূহ বিন্যস্ত হইলে সমস্ত সহরটী কতকগুলি মহল্লায় (wards সংস্কৃত পরিভাষায় 'গ্রাম' বলা হয়) নগর বিন্যাসে জাতিভেদ প্রথা উপলক্ষিত হয়। ইহাকে জাতি বিন্যাস Folk-planning) বলা যায়। নগরের উন্নতি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থাও যে ছিল না, তাহা নহে। স্থাপনার্হ. গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্ব্বদেশজ্ঞ, বেদপুরাণেতিহাসবিদ্ এবং বাস্তু বিদ্যাব্ধিপারগ স্থপতি (civic Architect) তন্মধ্যে প্রধান। স্থপতির অধীনে সূত্রগ্রাহী—ইনি জরিপ এবং পরিকল্পনায় পারদর্শী (রেখাজ্ঞ)। স্থূল, সূক্ষ্ম, তক্ষণ কার্য্যে দক্ষ তক্ষক সূত্রগ্রাহীর আজ্ঞানুসারী ছিলেন। তাঁহার অধীনে ছিলেন বর্দ্ধকি—ইনি (Joinery work) নিপুণ। এতদতিরিক্ত আরাম কৃত্রিমবনকারী, দুর্গকারী, মার্গকারক প্রভৃতিও ছিল। এই সমস্ত কর্ম্মচারীগণ রাজার গৃহাধিপতি নামক অন্যতম অমাত্যের (Minister with the Portfolio of civics) অধীনে ছিল। ইহাঁরই (Improvement Trust) এর কার্য্য করিতেন। নগরে প্রপা (পানীয় শালা) আরাম, উদ্যানাদি রচনা করিতে হইত। বাপী তড়াগাদিরও অভাব ছিল না।

নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩৩০।

শিক্ষায় কথোপকথন।

সঙ্গীতের ন্যায় কথোপকথনেও মানুষকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। আপনার মনের সহিত—বিবেকের সহিত—অন্যের অগোচরে আমরা যে কথাবার্ত্তা কহি, তাহাও ইহার অন্তর্গত।

রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মকথোপকথন অতীব উপভোগ্য। সক্রেটিস তাঁহার স্বদেশবাসীগণের শিক্ষা-বিধানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি নিজের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া সত্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে না পারে; তাহার জীবনে সার্থকতাই নাই। তাই তিনি একমাত্র কথোপকথোনের সাহায্যেই স্বদেশবাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তারপর ইতিহাসে দেখা যায়, জাতীয় সাহিত্যে এমন এক একটা যুগের প্রবর্ত্তন হয়, যখন কথোপকথনের সাহায্যেই সাহিত্য ও জীবনের সরসতার সঞ্চার হইয়া থাকে। কাফি হাউস হইতেই ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হইতে দেখা যায়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বৈদিক ভারতে এইরূপ কথোপকথনই সাহিত্যের বাহন ছিল। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসেও দেখা যায়, সিসিরো, ডিমস্থিনিস প্রভৃতি কথার দ্বারাই মানব মন জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও ভুলিলে চলিবে না যে, রসনা যেমন মানব হৃদয় জ্ঞান ও আনন্দের সহস্র ধারায় সিক্ত ও মধুর করিতে পারে, তেমনি ইহার তীব্র হলাহলও মানবের হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিতে পারে।

শিক্ষক, শ্রাবণ।

হিন্দু জ্যোতিষে মেষাদি বিন্দু।

রাশি চক্রের যে বিন্দুতে সূর্য্য আসিলে বর্ষারম্ভ হয়, তাহার নাম মেষাদি বিন্দু। প্রাচীন সিদ্ধান্ত সমূহে যে বর্ষমান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত বর্ষমান ব্যবহার করার ফলে বর্ষারম্ভ প্রতিবৎসর প্রায় তিন মিনিট করিয়া আগাইয়া যাইতেছে, এবং বর্ত্তমান কালে ইহার ফলে প্রকৃত সময়ের প্রায় ৪ দিন পরে বর্ষারম্ভ ঘটিতেছে।

এই ভ্রান্ত বর্ষমান হইতে যে অয়নমান উদ্ভূত হয়, তাহার পরিমাণ ৫″৬৮। ইহার সাহায্যে গণনা করিলে ১৮৪৫ শকের তথা কথিত অয়নাংশ দাঁড়ায় ২৩০।১২′ বর্ষমান ও বর্ষারম্ভ ভ্রান্ত বলিয়া ইহা প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ অয়নাংশ নয়; ইহাকে বলা উচিত, সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষারম্ভের সায়ন সূর্য্যস্ফুট। বর্ষমানের সংশোধন করিলেই এই ভ্রম দুরীভূত হইতে পারে।

কিন্তু এখানে আবার আর একটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। গণনা না করিয়া যদি সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষারম্ভ সময়ে কোন বেধ যন্ত্র সাহায্যে তৎকালিক সায়ন সূর্য্যস্ফুট নির্ণয় করা যায়, তবে তাহার ফল অন্যরূপ হয়।

১৮৪৫ শকের সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষারম্ভে ইহার পরিমাণ ২২০।৩৯′। এই সংখ্যাকেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় ১৮৪৫ শকের অয়নাংশ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই সংখ্যা লইয়া এবং অয়নমান ৫৮″৬৮ সাহায্যে গণনা করিলে অয়নাংশশূন্য শক ৪৫৫ দাঁড়ায়। এখন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকার বলিতে পারেন, তাঁহার অয়নাংশশূন্য শক ৪৫৫। মুঞ্জাল, ভাস্কর, গণেশ প্রভৃতি জ্যোতিষীগণও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারা এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন শককে অয়নাংশশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই গোলের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহার মীমাংসা সহজ সাধ্য।

অয়নাংশশূন্য শক শব্দের অর্থ যে শকে বর্ষারম্ভ সময়ের সায়ন সূর্য্যস্ফুটের পরিমাণ ০।০।০ প্রাচীন আচার্য্যগণ যে একথা বুঝিতেন না, তাহা নয়। এবং যখন তাঁহারা বলিয়াছেন ৪২১ শক অয়নাংশশূন্য শক, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের অভিপ্রায় ৪২১ শকের বর্ষারম্ভ সময়ে সায়ন সূর্য্যস্ফুট ০।০।০ ছিল। অর্থাৎ যখন তৎকালিক বিসবহিন্দুতে সূর্য্যের বিম্বার্দ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই বর্ষারম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সূর্য্য মধ্যে ও মন্দেচ্চ সংস্কার প্রক্রিয়ার ভ্রান্তি থাকায় ৪২১ শকীয় বর্ষারম্ভ সময়ের সূর্য্যস্ফুটে কিছু (প্রায় ৩৩) ভ্রম সংক্রামিত হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তগত গণনায় এখন ইহা স্থায়ী ভ্রান্তি রূপে রহিয়া গিয়াছে। এই ভ্রমটির সংস্কার সাধন করিলে সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষারম্ভের সায়ন সূর্য্যস্ফুটের গণনামূলক ও পর্য্যবেক্ষণমূলক পরিমাণে কোন পার্থক্য থাকিবে না। ভারতবর্ষ—শ্রাবণ ১৩৩০

বৌদ্ধ যুগে ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা।

ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা দৃষ্টে আমরা কোন জাতির সভ্যতার নিদর্শন পাই। জাতক পাঠে যে তৎকালীন ভারতবাসী সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। অপন্নক জাতকে একটী আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব কালীন, বোধিসত্ব জনৈক বণিকের গৃহে জন্মলাভ করিয়া পাঁচশত শকট সহ ব্যবসায় করিতেন। কি করিয়া বণিকেরা মরুভূমি মধ্যে গমনাগমন করিতেন এই জাতকে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। তাঁহারা সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ পাত্র পরিপূর্ণ পানীয় জল লইতেন। প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে প্রধান বণিকগণ সকলের অগ্রে গমন করিতেন। অনুকূল বায়ু হইলে তাঁহারা পশ্চাদ্দেশে গমন করিতেন। দিনান্তে শকটের পশু শকট হইতে উন্মোচন করিয়া তাঁহারা শিবির সন্নিবেশ করিতেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক সহকারীসহ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাত্রির প্রথম তিন প্রহরে প্রহরীর কার্য্য করিতেন। রাত্রি প্রভাতে বলীবর্দ্দ গুলিকে আহার্য্য প্রদান করতঃ গন্তব্যস্থানে গমন করা হইত ও তথায় নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় করা হইত। কেবল যে স্থলপথে এইরূপ ব্যবসায় করা হইত তাহা নহে; জলপথেও বণিকগণ নিজ নিজ পণ্যাদি সহ জাহাজে গমন করিত। মহাবণিক জাতকপাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল কারণ বিভিন্ন রাজ্য হইতে বণিকগণ একত্রিত হইয়া একজনকে নায়কপদে বরণ করিয়া তাঁহার অধীনে ধনান্বেষণে যাত্রা করিতেন। এই সকল আখ্যান হইতে আমরা তৎকালে যে বৃহৎ বৃহৎ জলযান নির্ম্মিত হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। যদিও তখন বিনিময় প্রচলিত ছিল তথাপি মুদ্রারও অভাব ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ-গণক দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করেন, অন্যতম ব্রাহ্মণ গণক নিজ স্ত্রীকে অশীতি ক্রোড় মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া ছিলেন এই সকল মুদ্রা কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা না লিখিত হইলেও বণিকগণ যে ধনকুবের ছিলেন একথা নিঃসঙ্কোচে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৩০।
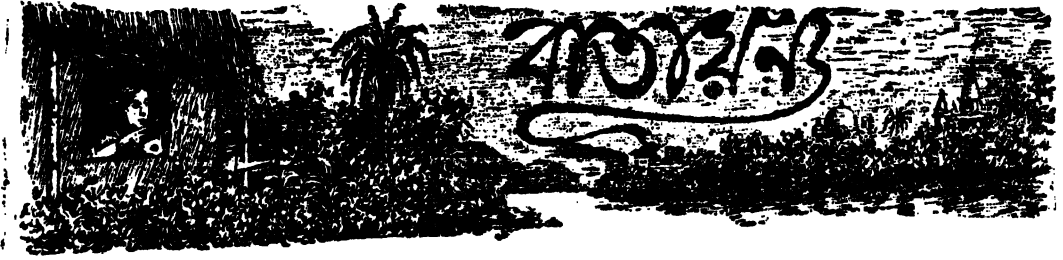
ভাবসিদ্ধি। *

মানুষের এমন এক একটা সময় আসে যখন বিপদের বেড়াজালে তাকে চারিদিকেই ঘিরে ফেলে—সংসারে সবাই তার শত্রু হয়ে ওঠে এবং টিকে থাকবার আশায় যা'কিছু সে ধরতে চায় তাই তার হাত ফস্‌কে সরে পড়ে। বরাত দোষে সে দিন তার পোড়া শোল মাছ জলে পলায়—জীবনের অনেকদিন ধরে সাজান বাগান যেন এক লহমার মাঝে নিঃশেষে শুকিয়ে যায়!

সংসারে এমনি একটা দুর্দ্দিনের সাথে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ঘটে। আমরা ঠিক কি ধাতুতে গড়া—সোনা কিরাং—সেদিনই তা জগৎ বুঝতে পারে। কেউ বা ঠেকে শিখে আবার কেউবা দেখে শিখে। এবার আমরা 'ভাবসিদ্ধি' 'সম্পর্কে কয়েকটা তেমনি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দিলাম।

* * * *

এক একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠলেই মনে হয় যেন বুকটা ভেঙ্গে গেছে—শরীরটা আদৌ ভাল নয়—মেজাজটা খিটখিটে হয়ে পড়েছে—কিছুই ভাল লাগে না—কেমন যেন একটা ভয়, একটা সন্দেহ, একটা নিরাশার ভাব মনটাকে তোলপাড় করে তুলেছে! সেদিন যদি কোন কাজ করবার আগে বিছানায় শুয়েই আমরা খুব দৃঢ় ইচ্ছাবলে এইটে ভাবতে পারি যে দেহমন যতই খারাপ হোক না—যেমনি বাধা হোক না কেন—আমি আজকের দিনটাকে আমার জীবনের একটা জয়ের দিন করে গড়ে তুলব, তাহ'লে দেখা গেছে যে সেদিনটা দেহমনের দিক থেকে বা লাভ ক্ষতির হিসাবে যতখানা মন্দ হবে বলে প্রথমটা আশঙ্কা হয়েছিল, আসলে তা' হয়নি।

* * * *

এক এক সময় দুঃখ কষ্টের কথা ভাবতে কিম্বা রোগের বোঝা বইতে বইতে জীবনটা দুর্ব্বহ হয়ে পড়ে। মনে হয় এমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল। সে সময় অবসাদ ও দুশ্চিন্তায় মনটা যেন একেবারে ভেঙে পড়ে। কেউ ভাল ভেবে দুটো হিত কথা শোনাতে এলেও তা কানে তেতো লাগে। বুকের মধ্যে রাতদিন নিজের দুরদৃষ্টের বিষয় নিয়ে গুমরাতে থাকি—যতই তা' নিয়ে তোলাপাড়া করি, ততই যেন ভাবনার আর কূল কিনারা থাকে না। এমনি ধারা যখন একটা অবস্থা আসে তখন আমাদের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সেই দুঃখ দুর্দ্দশা বা রোগজ্বালার কথা একদম ছেড়ে দিয়ে পূর্ব্ব সুখের দিন বা স্বাস্থ্যের অবস্থা স্মরণ করে মনটাকে সুস্থ করবার চেষ্টা করা। এ সময় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করলে, মুক্ত প্রকৃতির মাঝে বেড়ালে, হাওয়া বদলালে অথবা ভাল ভাল ছবি দেখা বা আঁকার চেষ্টা করলেও মনের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেন যে এমন অবস্থায় দুঃখ বা রোগ ভোগ আমার হতে পারে না বা হচ্ছে না এরূপ একটা বিশ্বাসের ভাবে অভ্যস্ত হলেও মনটা অচিরে তাজা হয়ে পড়ে, চাইকি ক্লেশ ভোগের পরিমাণও কমে আসে।

* * * *

কুড়ের ওষুধ যেমন কাজ করা—রোগীর ওষুধ যেমন ত্যাগ করতে শেখা—ভীরুর ওষুধ যেমন দুঃসাহসিক

* Ernest Raymond Holmes এর "Might in Mind Mastery" পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া—নাস্তিকের ওষুধ যেমন ভগবানের বাণী পরখ করে দেখা—তেমনি কু-ভাবীর সব চেয়ে সেরা ওষুধ হচ্ছে সু-ভাবে মনটাকে ভরে তোলা। আমাদের সব দুর্দ্দশার মূলে রয়েছে দুর্ভাবনা। ভাবনার বদল করতে পারলে দশার ফেরও ঘটে। মনের মাঝে কুভাব বড় বেড়ে উঠেছে বা প্রলোভনের ধাক্কা সামলাতে পারছি না মনে হলে নিত্য ভাবতে হবে "এগুলো আসলে কিছু নয়। দয়াল ভগবান কখনো আমায় এহেন প্রলোভনে ফেলতে পারেন না। আমার মধ্যে যে দেবভাব রয়েছে এগুলো তার ছায়াও ছুঁতে পারবে না।" এমনি ভাবে দুঃখের সময় সুখের, বিফলতার সময় সাফল্যের, অবসাদের সময় উত্তেজনার, বিষাদের সময় হর্ষের, স্মৃতি বা ভাবনা, জাগাতে অভ্যাস করলে মনের দুর্ব্বলতা ক্রমেই একে একে সেরে যায় এবং অভ্যাসের মাত্রা অনুসারে ভাবসিদ্ধি ঘটে।

* * * *

ভাবসিদ্ধির পথে এগুতে হলে প্রথম সদসৎ জ্ঞানটা অর্জ্জন করতে হবে। তারপর যেটা মন্দ বুঝতে পারব হাজার ইচ্ছা হলেও সেটা করব না এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। গোড়ায় এটা খুব শক্ত বোধ হবে—দু'চার বার পা ফস্‌কাবে—কিন্তু চেষ্টা জাগিয়ে রাখলে, পা ফস্‌কালেও বিফল হলাম ভাবলে চলবে না। যতক্ষণ চেষ্টা ততক্ষণ বিফলতা নেই। হাল ছেড়ে দেওয়ার নামই বিফলতা। দিনের পর দিন সব সময় 'আমি অজর' 'আমি অমর' এই ভাব-সাধনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে "আমি দুর্ব্বল" "আমি অক্ষম" এ ভাব পরিহার করতে হবে। বেশী নয়, কিছুদিন করলেই দেহমনের একটা রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।

* * * *

ব্যারামের সময় ডাক্তার, ওষুধের চেয়ে যে ডাক্তার, ওষুধের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসটাই রোগ সারাবার পক্ষে বেশী সাহায্য করে এটা পরীক্ষিত সত্য। যে ডাক্তার বা ওষুধের উপর আমাদের বিশ্বাস থাকে না, তাদের সাহায্যে আমাদের রোগ বাড়ে বই কমে না। যেখানে বিশ্বাস থাকে, সেখানে ফলের পরিমাণ দেখলে অবাক হতে হয়। আসল কথা বিশ্বাসই রুগ্ন দেহের মাঝে একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন এনে দেয়—রক্ত চলাচল বাড়িয়ে তোলে। ফলে স্নায়ুমণ্ডলী অবাধে আপন আপন ক্রিয়া করতে থাকে ও রোগীও শীঘ্র নিরাময় হয়ে ওঠে। এই যে বিশ্বাস—এর মূলে ভাবাভ্যাস বই কিছুই নেই। বিশ্বাস থাকলে শুধু জলেও অনেক অসাধ্য সাধন হয়।

* * * *

যত কিছু ভাব আছে সবার চেয়ে ভয়ের ভাবটাই বেশী মারাত্মক। এই ভয়ের ভাব করতে পারে না এমন কিছু ক্ষতি নাই বললেও চলে। এটা প্রাণে ত মারতে পারেই, তাহা ছাড়া স্বভাব নষ্ট করতে পারে—রোগ ঘটাতে পারে—উন্নতির অন্তরায় হতে পারে। ডাক্তারগণ বলেন ভয়ের ফলে রক্তের হ্রাস ঘটে—ক্ষুধামান্দ্য হয়—ভয় জীবনকে খাটো করে তুলে। ভয় যৌবন সুখের অন্তরায়—বার্দ্ধক্যের চির সহচর। এর দ্বারা নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনও ঘটতে পারে। কিন্তু জল, আগুণ, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এরূপ কত শত ভয় ত আছেই; তা ছাড়া নিত্য নানা জুজুর ভয়ে ছেলে বুড়ো আমরা অস্থির! ভয়ের ভাবনায় জীবনটা সবারই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ হেন ভয়কে জয় করতে হলে—তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে—আমাদের সাহসের ভাবাভ্যাস করতে হবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত মন্দ আশঙ্কার ফলেই ভয়ের উৎপত্তি; এটা চিত্তের দুর্ব্বলতা বই কিছু নয়। কাজেই তেমন কোন আশঙ্কা মনে জাগলেই অমনি সেই মুহূর্ত্তে সেটাকে তলিয়ে বুঝে দেখে সাহসের ভাব আনতে আনতে ক্রমেই নির্ভয় হতে পারা যায়।

* * * *

ভাবাভ্যাস ভাল; কিন্তু ভাবের অসংযত উচ্ছ্বাস ভাল নয়। অনেক সময় দেখা গেছে দুঃখ শোকেও মানুষ যেমন আত্মঘাতী হয়েছে; আবার আহ্লাদে আটখানা হয়েও তেমনি তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। খুব বেশী রাগলে রাগের মাত্রা অনুসারে কয়েকদিন

ধরে ক্ষুধার হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য অথবা একটা কিছু না কিছু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা অঙ্গ বিকৃতি ঘটে। ক্রুদ্ধা মায়ের দুধ খেয়ে কোলের ছেলে মারা গেছে এমনও ঘটেছে। শঙ্কার প্রকোপ বাড়তে অনেকের স্রাবা ও বমন রোগ সুরু হয়েছে। কামের বশে মানুষের মাথায় যে খুন চাপে এটা ত জানা কথা। এ সব অবস্থায় পড়লে মনটাকে অল্পে অল্পে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রেখে যাতে অনিষ্টকর কোন ভাব এসে না জুড়ে বসে, সে বিষয়ে সজাগ থাকলে মনের ক্রমেই ক্ষতিকর ভাব রোধ করবার শক্তি বাড়ে।

* * *

ভবিষ্যতের ভাবনা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। অনেক সময় আমরা এই রকম ভাবনায় মজগুল হয়ে থাকি বলেই এগুলো আমাদের পেয়ে বসে। যার যেমন ভাব তার তেমন দশা। আমরা যদি ভবিষ্যতে সুখ স্বাস্থ্য ও শান্তি চাইতে জানি ও পারি তাহলে কোন শক্তি আমাদের ইচ্ছাবলকে হটিয়ে দিয়ে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। ইচ্ছা শক্তি বলে অসাধ্য সাধন করতে পারা যায়। সম্প্রতি জাপানের এক ডাক্তার পরীক্ষার ফলে জানতে পেরেছেন যে গর্ভবতী হবার পর দু'টো মাস পোয়াতি মেয়েদের নিত্য শোবার আগে 'আমার পুত্র হোক' এই প্রার্থনা ১৫ মিনিট ধরে করানর ফলে ১৯৪২ জন পোয়াতির মধ্যে ১৯০৮ জনের পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে। এটা যদি সম্ভব হয়, আমরা নিত্য নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য সুখ ও শান্তির প্রার্থনা করলে যে ভবিষ্যৎ আমাদের ভালই হবে তাতে অবিশ্বাসের কারণ নেই। প্রতিদিন ঘুমুতে যাবার ও ঘুম ভাঙার সময় আত্মকল্যাণ চিন্তা করলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই কল্যাণকর হয়।

* * *

ভাবসিদ্ধির পথে চিত্তকে সব সময় প্রফুল্ল রাখবার অভ্যাস করতে হবে। মনই আমাদের সব সুখ দুঃখের কারণ। মনটাকে প্রফুল্ল করবার জন্য গান বাজনা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ, ভ্রমণ, ব্যায়াম ও কাব্যালাপ প্রশস্ত। আনন্দময়ের সন্তান আমি—অমৃতের পুত্র আমি—আনন্দ ও অমৃত আমরই, এমনি ভাব নিত্য স্মরণ করলে গ্লানি দুঃখ বা অবসাদ এসে আমাদের মনটাকে বিগড়ে দিতে পারে না। অপরের সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করলেও মনের অনেক মলা কেটে যায় এবং দিনের পর দিন মনটা হালকা ও প্রফুল্ল হয়ে উঠে। অনেক সময় আর্ত্ত, দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবায় ও মনের প্রফুল্লতা জন্মে।

* * *

কারও দোষ, ত্রুটি, খুঁত বা ভুল ভ্রান্তি—কারও বা নিন্দা, অখ্যাতি, কলঙ্ক ও অধঃপতনের কথা খুঁজে বাহির করবার চেষ্টা করলে চলবে না। মানুষ মাত্রেই দোষগুণে জড়িত—কারও বা বেশী, কারও কম। গুণ ছেড়ে দোষ গুলো খুঁটি নাটি করে দেখতে অভ্যাস করলে মনটা আমাদের ক্রমেই বিকৃত হয়ে পড়ে এবং ভালোর দিকটা ক্রমেই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অপরের গ্লানি বা কুৎসা করার অভ্যাসটা আমাদের এমনি সহজ হয়ে গেছে, যে তার ফলে কারও ভাল ভাব থাকলেও তা আমরা বিকৃত করে দেখি। ভাব সাধনার সময় এদিকটা নজর রাখা চাই। এই বদভ্যাসটা ছাড়তে হলে প্রধান উপায় হচ্ছে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখা। নিত্য আপনার ভুলভ্রান্তি দোষ ত্রুটি, পরাজয় পদস্খলনগুলো দিনের শেষে তন্ন তন্ন করে দেখলে অপরের কুৎসাগ্লানি করার প্রবৃত্তি স্বতঃই কমে আসে। মনের অগোচর পাপ কাহারও নাই। কাজেই আপনার দিকে ঠিকমত তাকাতে শিখলে, অপরের প্রতি প্রীতি ও অনুকম্পা দেখান ছাড়া নিন্দাবাদের অবসরই থাকে না।

* * * *

ভাবের অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করতে হলে গোড়া থেকে বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে। সর্ব্বশক্তিমানের অংশ আমি—তিনি আমারই হৃদয়গুহায় রয়েছেন—আমাকে নিত্য চালাচ্ছেন। তাঁর শক্তি বলে যা' করছি তা' কখনও নিষ্ফল হতে পারে না—এমনি একটা অটুট বিশ্বাস

থাকা চাই। তাঁর কাজ, তাঁর শক্তিতে করছি—তাঁর নামের জয় হোক, এ বিশ্বাসে যে কাজে হাত দেওয়া যায় সে কাজ ত ভাল ভাবে ধসিল হয়ই—চাই কি জীবনটার গতি বদলে গিয়ে, সময়ে মানুষ আপন অদৃষ্টের আপনি নিয়ামক হয়ে পড়ে।

সত্যানন্দ।

সাহিত্য সংবাদ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

বিগত ৫ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যায়, বেলীহলে মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। "মাধবীর" সম্পাদক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রারম্ভে শাখা পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় মহাশয়ের রচিত একটী গান অন্যতম গায়ক সদস্য শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র কর্ত্তৃক গীত হইলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় স্বরচিত "শৈলজা-প্রভাসে" শীর্ষক প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শাখা পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, মহাশয় 'সাধ্বী' নামক তাঁহার একটী কবিতা (গাথা) পাঠ করেন। প্রবন্ধ ও কবিতা উভয়ই অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহোদয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা।

১৩ই শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় শাখা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও বেলীহলে পরলোকগত পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত বি-এ, মহাশয়। সভার প্রথমে ও শেষে শাখা পরিষৎ সম্পাদক মহাশয় রচিত দুইটী সময়োপযোগী গান গোষ্ঠবাবু কর্ত্তৃক গীত হয়। তৎপরে নিম্নোক্ত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়:—

১। সাগর তর্পণ (প্রবন্ধ) শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।
২। বাঙ্গালী ঈশ্বরচন্দ্র (প্রবন্ধ) শ্রীচারুচন্দ্র সেন।
৩। বিদ্যাসাগর (কবিতা)—
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল।
৪। বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগরের আদর্শ (প্রবন্ধ)—
শ্রীঈশান চন্দ্র মহাপাত্র বি-এল।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে স্থানীয় উকীলত্রয় শ্রীযুক্ত যামিনীজীবন ঘোষ বি-এল, শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত বি-এল এবং শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বসু বি-এল, মহাশয়গণ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার গুণাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। কালীপদ বাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্থায়ী কোন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলে শাখা পরিষৎ সম্পাদক ক্ষিতীশ বাবু সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তদুদ্দেশ্যে শাখা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে একটী শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ক্ষিতীশ বাবু নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেন—

"যেহেতু ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতা বাদুড় বাগানের বাটী—বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর স্মৃতিমাখা গৌরবভূমি—দেনার দায়ে নিলাম হইতে দেখিয়া, বাঙ্গালী পরিচালিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ কোম্পানী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া দেশের লোককে প্রত্যর্পণ জন্য আপাততঃ নিজেরা ক্রয় করিয়া সেই বাসবাটী রক্ষা করিয়াছেন: এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে এক দুরপনেয় কলঙ্কের দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমার বিনীত প্রস্তাব

যে সমগ্র মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ হইতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের এই মহানুভবতার নিমিত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হউক এবং তাঁহাদের প্রদত্ত টাকা পরিশোধের গুরুভার বহন মেদিনীপুরবাসীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব সচেষ্ট হইবার নিমিত্ত বাঙ্গালী মাত্রকেই অনুরোধ করা হউক।"

প্রস্তাবটী সকলেই একবাক্যে সমর্থন করিলে গৃহীত হয়। সমবেত সকলের অভিপ্রায়মত প্রস্তাবটীর একখণ্ড প্রতিলিপি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করণের এবং ইনসিওরান্স কোম্পানীর সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় স্বর্গীয় মহাপুরুষের গুণাবলী সম্পর্কে একটী সরস ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

মাধবী।

প্রথম বর্ষ। ভাদ্র, ১৩৩০ ১২শ সংখ্যা।

লেখা-সূচী।

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩৶৹ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶৹ আনা। নমুনার জন্য ।৶৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥৹ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের মধ্যে বাহির হইবে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মাধবী" না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্ব প্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ:—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ „	৬৲ টাকা
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ „	৪৲ টাকা

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ:—

৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲	টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	১২৲	„
২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	„	১৮৲	„
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	১০৲	„
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	„	১৬৲	„
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	„	৮৲	„

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের নূন্য হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতা সত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীনলিনী নাথ দে।

OGI.

NAGARI.

১ম বর্ষ, | ভাদ্র ১৩৩০। | ১২শ সংখ্যা।

অভিসার।

যমুনা-কূলে ঐ বেজেছে বাঁশী,
রাগিণী আসে তার সমীরে ভাসি;
এবে গো আনি সখি
বলনা করিব কি ?
সকলে চোখো চোখি রেখেছে শাসি।
বাদর সমীরণ
বহিছে স্বন স্বন ;
ডাকিছে ঘন ঘন কালার বাঁশী ;
কলসি সাব ভরা, কি ছলে আসি।

বসিয়া আছে সে ত কদম তলে,
জানে সে আমি সেথা যাইব বলে ;
নিশুতি নিশিথিনী,
যদিও পথ চিনি
তবু এ একাকিনী কেমনে চলে।
এ দিকে বাঁশী সাধা
না মেনে কোন বাধা
ডাকিছে রাধা রাধা গানেরি ছলে,
যেতে যে হল রাতে যমুনা জলে।

নিচোল ঘন নীলে চলিব সেজে,
নূপুর রুনু রুনু উঠিবে বেজে ;
ননদী দেবে গালি,
ভয় কি তাহে আলি
সুচির কুল ডালি রাধার সে যে !
এমন ভরা মেঘে
কি ছার কুল লেগে
চাপি এ হিয়া বেগে বিফল তেজে,
কেমনে রব ঘরে প্রমোদ ত্যেজে।

নিসাড় রাজবাটে তমসা ছুটে,
আজি না তারাকুল গগনে ফুটে ;
কুটজ সুরভিত,
দাদুর মুখরিত,
দামিনী পুলাকত কানন পুটে।
ঢাকি এ দেহটিরে
চলিতে ধীরে ধীরে
আঁচল ঘিরে ঘিরে চরণে লুটে
এ কালে যত বাধা আসিল জুটে।

আঁধার ঘন বন পিছল তাঁয়,
চরণ দুটি রাধা হল যে দায় ;
এ দিকে ডালে ডালে
নীপেরা দীপ জ্বালে,

কেতকী-মধু ঢালে উতরা বায়।
এমন পথ মাঝে,
বিসরি লোক লাজে,
সাধিতে নিজ কাজে মানস চায়;
উতলা হয়ে তাই কাননে ধায়।

ঐ যে দেখা যায় কানন তল,
অবাকি চেয়ে আছে চমূরু দল;
শিখরী শত শত
শিখরে করি নত
নাচিছে অবিরত বাজায়ে মল।
ঐ যে কালশশী
ওখানে আছে বসি,
কি ছলে এবে পশি কদম তল,
ক্রমে যে কমে এল মনের বল।

শ্রীভুবনচন্দ্র আর্য্যশিরোমণি।

শৈলজা—কুরুক্ষেত্রে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিবিড় তমসাবৃত রজনী; তৃতীয় যাম অতীত। আকাশ ও ধরাতল গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। শৈলজা শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিতা বিষাদ প্রতিমা উত্তরার সেবায় নিযুক্ত। তাহার অঙ্কে মূর্চ্ছিতা রমণী নিশীথিনী কোলে বিশুষ্ক কুসুমহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে! রমণীর—

"শোকে শুভ্র অর্দ্ধকেশ, নয়ন গিয়াছে বসি;
শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী।
বিশুষ্ক আরক্তাধর; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস;
নিদ্রা যাইতেছে যেন ছিন্ন-বীণা-শোকচ্ছাস।"

বহুক্ষণ পরে রমণীর একটু সংজ্ঞা হইল; সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে আমি?"

শৈলজা। "তুমি উত্তরা মা! আদরিণী!"

রমণী। "উত্তরা কে?"

শৈলজা। "উত্তরা মা! বিরাট রাজনন্দিনী।"

রমণী যেন বিস্মিত হইল। শিবির প্রাচীরে এক দীর্ঘ প্রশান্ত দর্পণ আলম্বিত ছিল; সে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—

"কারা বসি ওইখানে?"

আত্মহারা বালিকার ভগ্নকণ্ঠে শৈলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে সজল নয়নে উত্তর করিল—

"কেহ নহে দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা! তোমার
দেখিতেছ—দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা! আমার"

উত্তর শুনিয়া উত্তরার বিস্ময় যেন শত গুণ বাড়িয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"উত্তরা! উত্তরা আমি! প্রতিবিম্ব উত্তরার!
উত্তরার শুষ্ককেশ! ওই মুখ—চোখ আর?"
কে তুমি?"

তপস্বিনী শৈলজা আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। গদগদকণ্ঠে উত্তর করিল—"শৈলজা আমি বনবালা উদাসিনী।"

হেমন্তের শিশিরমথিতা কমলিনীর ন্যায় বিষাদক্লিষ্টা উত্তরার শোককাতর মুখখানি দেখিয়া শৈলের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। নিদারুণ পতিশোক ছয়দিনের মধ্যেই বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে! শৈলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া রমণী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কহিল—

"না তুমি মা! স্বপ্নদেবী! স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি
পূর্ণচন্দ্র বক্ষ হ'তে হায় মা! পড়িনু আমি
আঁধার পাতালে, শৈলে—কি কঠিন শিলাখানি!
চূর্ণিত করিয়া দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক
আসিলেন নারায়ণ—কি করুণাপূর্ণ মুখ!

* * * *

চুম্বিয়া ললাট কার সঞ্জীবনী সুধা দান!
পবিত্রা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান।
তুমি কি সে স্বপ্নদেবী? এরা কোন্ পুণ্যভূমি?
স্বপ্নরাজ্য? দেবরাজ্য?"

শৈল ধীরে ধীরে এই স্বপ্নের কাহিনী শুনিল; সঙ্গে সঙ্গে মহিমাময় নারায়ণের অপূর্ব্ব মহিমা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয়ে ভক্তিসাগর উছলিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর করিল—

"তোমার শিবিরে তুমি!"

বালিকার আবার বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল—"শিবিরে! শিবির কোথা?"

বাষ্পগদগদকণ্ঠে শৈল উত্তর করিল—

"কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে!"

বালিকা তাহা শুনিয়া স্থিরনেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্ররেখা যেমন ধীরে ধীরে ধরাতলে দেখা দেয় সেইরূপ স্মৃতির ক্ষীণালোক অল্পে অল্পে তাঁহার আঁধার মনোরাজ্যে ভাসিতে লাগিল। সুদূরবিস্মৃত সঙ্গীতের ন্যায় সুখপূর্ণ শোকপূর্ণ কত শত জীবন ঘটনা ধীরে ধীরে যেন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। শৈল তন্ময়ভাবে বালিকার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিল।

সহসা যেন সে ভাব পালটিয়া গেল। বালিকার অভিনীত জীবনরঙ্গমঞ্চে কে যেন যবনিকা টানিয়া দিল—সেই রুদ্ধনাট্য গৃহদ্বার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! বালিকা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না—অশ্রু কোথায়? শোকের তীব্র সন্তাপে সে নয়নের নির্ঝর শুকাইয়া গিয়াছে। বিশুষ্ক ইন্দীবরসম ক্ষুদ্র মুখখানি শৈলজার বক্ষে লুকাইয়া সে নীরবে পড়িয়া রহিল। শৈলজার কাতরপ্রাণ সে দুঃসহ অবস্থা অনুভব করিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। সে সস্নেহে বালিকার মুখে চুম্বনদান করিতে গেল; কিন্তু হায়!

"উষ্ণ দুই অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া মুখে
উত্তরার বিমলিন, শুষ্ক শতদল বুকে
নিশির শিশির যথা!

বিস্ময়ে বালিকা প্রশ্ন করিল—

"কেন মা কাঁদিস তুই? তোর বুকে এই জ্বালা
কে জ্বালিল? বনমাতা তুই কি অভির হায়?"

শৈলের অশ্রুধারা তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল—সে কাতর স্বরে কহিল—

"আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী।"

বালিকা ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করিল—

"হায় মা! হায় মা! তোমো এ অমৃত প্রস্রবণে
জ্বালিলা বাড়বানল বিধি অকরুণ মনে!"

যুগল-হৃদয়বীণার তন্ত্রী সহানুভূতির সমান সুরে বাঁধা—শোকের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত। সুতরাং একটার অনুরণনে অপরটা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। শৈল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—

"না মা!— * * * মরুভূমে অভাগীর
দিয়া আত্মপ্রাণ বাছা ঢালিয়াছে প্রেম নীর
বরিষার মেঘমত নাহি বুকে বজ্রাঘাত
ধর্ম্মরাজ্যতরে করি এইরূপে প্রাণপাত।
বনমাতা হয় যেন হায়! যোগ্য মাতা তার।
স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার।"

বালিকার মানসপটে পূর্ব্বসুখের স্মৃতি উদিত হইল—সে কাতরকণ্ঠে কহিল—

"বড়সাধ ছিল মনে যুদ্ধঅন্তে অভাগীরে
নিয়ে যাবে বনে তোর, মা গো! তোর স্নেহনীড়ে।
ভাবে নাই—ভাবি নাই—হায়! হেন অনাথিনী
আসিব মা অঙ্কে তোর!"—

আর বলিতে হইল না—রুদ্ধশোক নির্ঝরিণী শৈলজার নয়ন প্রান্ত দিয়া দর দর বহিতে লাগিল—বালিকা আর কোন কথা কহিল না।

ক্ষণেক পরে শৈল সেই প্রবল শোক চাপিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা প্রদান মানসে কহিল—

"রেখে গেছে অভিমন্যু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি ওর—
মাগো পুণ্যগর্ভে তোর।
পুত্র কোলে করি তুই যাইবি আমার বনে।
এ অভির বনখেলা নিরখিব দুই জনে।
গৃহভূমি, বনভূমি, বাঁধিয়া প্রেম বন্ধনে
নির্ম্মাইব ধর্ম্মরাজ্য বসাইব সিংহাসনে
পুত্রে তোর, রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার
পুত্রসুখে, প্রজাসুখে রহিবে না শোক আর!"

বালিকা শুনিল—তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল! শোকভগ্নস্বরে সে কহিল—

"রবি অস্ত গেলে হায় দিবা কি থাকিতে পারে!
অস্ত গেলে শশধর লয়ে যায় জোৎস্নারে!
পাদপ হইলে ভস্ম ছায়া কি থাকে কখন?
নির্ঝর হইলে শুষ্ক ধারা হয় অদর্শন।
প্রদীপ হইলে ভগ্ন শিখা কি কখনো রয়?
বাঁচে কি নলিনী যদি শুষ্ক হয় জলাশয়?
কুরুক্ষেত্র মহাঝড়ে, তরু উত্তরার হায়।
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
আশীর্ব্বাদ কর মাগো! সমর্পিয়া কল তার
করে মাতা সুভদ্রার, সুলোচনা, শৈলজার,
তরু পদমূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ,
আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান।
তৃতীয়ার চন্দ্র যদি হলো অস্তমিত হায়!
অস্ফুট জোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায়।"

তারপর উভয়ে শোকাবেগে নীরবে বসিয়া রহিল। বালিকা সেই শোকক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ভীষণ শোকদৃশ্য দেখিতে দেখিতে কি জানি কেন সহসা কেমন কাতর হইয়া পড়িল! তাহার মনে হইল এই নির্ম্মম যুদ্ধ আরও না জানি কত বালিকাকে তাহার ন্যায় হৃতসর্ব্বস্ব করিয়াছে—এই ভীষণ শোক পারাবার আরও কত 'উত্তরা'কে পথের ভিখারিণীরূপে গড়িয়া তুলিবে। বালিকার কোমল হৃদয় তন্ত্রী পর দুঃখস্পর্শে বাজিয়া উঠিল! সে কহিল—

"নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক পারাবার
ভাঙ্গিবে কপাল মাগো! আরো কত উত্তরার।"

শৈল তাহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিল—"হইয়াছে যুদ্ধশেষ।"

'শেষ'!—বালিকা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তবে কি সত্য সত্যই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।—এই মর্ম্মভেদী শোকানল নিভিয়াছে।—জগতের এই মহাজ্বালা জুড়াইয়াছে!

শৈল গদগদ স্বরে উত্তর করিল—"শেষ!—
"————ভস্মিয়া ক্ষত্রিয় বন
নিবিয়াছে অধর্ম্মের যুগব্যাপী হুতাশন।
ছিল যেই স্নেহে সিক্ত অর্জ্জুনের বীর্য্যানল
হরিলে কৌরব সেই অভিমন্যু স্নেহজল
উদ্গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন
দুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পরাক্রম;
দুই দিনে কর্ণ আর—কর্ণ করে নাহি রণ,
শিশুহত্যা পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জ্জন।
এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুর্যোধন।
কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান
অধর্ম্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান!
কৃপ, কৃতবর্ম্মা, আর দ্রোণপুত্র দুরাশয়—
আছে মাত্র কৌরবের এই মহারথীত্রয়।"

অধীর আগ্রহভরে বালিকা সকল সংবাদ লইল। সে যেন অনেকটা আশ্বস্তি বোধ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সহসা পাণ্ডব পক্ষের কুশল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল! সে জিজ্ঞাসা করিল—

"পাণ্ডব ও নারায়ণ?"

শৈল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"আছেন মঙ্গলে সব।

পরিণামে ধর্ম্মের মা! নাহি হয় পরাভব।"
উত্তরা। "মা সুভদ্রা?"
শৈল। "দেবী তিনি তাঁর অমঙ্গল নয়
সম্ভব মা।"

উত্তরা কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। তারপর আবার প্রশ্ন করিল—

"কুশলে ত আছে বল পিতা ভ্রাতা মা আমার?"

কি কঠিন প্রশ্ন? প্রশ্ন শুনিবা মাত্র শৈলের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার নয়ন বিনির্গত অবিরল অশ্রু ধারায় ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল!

বালিকা শৈলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া নিমেষের মধ্যে স্বীয় প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়া লইল। শৈলের সেই নীরব সমাচার তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের পরতে পশিয়া এক তুমুল হাহাকার সৃজন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বালিকার আর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তাহার স্তিমিত নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল না—মুখের একটী মাত্র রেখাও রূপান্তরিত হইল না। আর হইবেই বা কেন?

"হায়! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার
শত বিষধরে দংশি কি করিবে তার?
হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ?"

বালিকা ব্যাকুল ভাবে কেবল জিজ্ঞাসা করিল—

"সকলে মা! গেল চলি— * * *
তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক!
ছয়দিন মৃতপ্রায় ছিলাম মূর্চ্ছিতা আমি;
তবু নাহি মরিলাম—আমি কি পাষাণখানি!"

শৈল তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহার বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না; নরনারায়ণ যোগস্থ হইবা তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। বাঁচাইবার কারণ নির্দ্দেশ [করি]য়া বলিল—

"তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা গর্ভে তোমার
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশা তরু, ধর্ম্ম রাজ্য ভিত্তি ভূমি
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্ম রাজ্যলক্ষ্মী তুমি!"

বালিকা বিষণ্ণ বদনে নত মস্তকে তাহা শুনিল—তারপর তাহার পঞ্চ দেবরের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শৈল তাহাকে বলিল যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ জীবিত নাই—অশ্বত্থামা মেষশালায় শার্দ্দূলের মত প্রবেশ করিয়া পঞ্চ শিশুকে বিনষ্ট করিয়াছে। অধর্ম্মের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে—কুরুক্ষেত্র আজ শ্মশানে পরিণত। এই মহা শ্মশানে পাপ ও অধর্ম্মের করাল কবল হইতে মানবকে মুক্ত করিতে তাহাকে মুক্তির মধুর পবিত্র পন্থা দেখাইতে গিয়া মহাপ্রাণ পুত্র অভিমন্যু স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে; সুতরাং তুচ্ছ পত্নীপ্রেম ভুলিয়া পবিত্র মাতৃপ্রেমে হৃদয় [পূ]র্ণ করিতে পারিলে আমাদের এই মহা শোকে জগত সুখ লাভ করিবে।

বালিকা বিস্মিত ভাবে স্তম্ভিত হৃদয়ে শৈলের কথাগুলি শুনিল। সহসা শীতের মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় তাহার বদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব স্থিরভাবে থাকিয়া সে কহিল—

"————————মা! চল যাই।"

শৈল বিস্ময় নয়নে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়?"
উত্তরা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—
"মা! উত্তরার এক ভিন্ন স্থান নাই—
পতির জ্বলন্ত চিতা।

শৈলের বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে অশ্রুপূর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল—

"পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর
নাহি কি রমণীব্রত উচ্চতম মা! আমার?

বালিকা ধীরে ধীরে কুতল ত্যাগ করিয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল—

"আছে।—
পালিব তা' মাখিয়া মা! পতিপদ ভস্মশিরে।"

তারপর নীরবে দুইজনে সেই গভীর নিশীথে শিবির হইতে বাহির হইল। কুরুক্ষেত্র বক্ষে তখনো অগনিত

চিতা নিবিড় সূচিকাবিদ্ধ অমাবস্যা অন্ধকারে জলিতেছিল। যোজনান্তর ব্যাপিয়া সংখ্যাতীত রথীবর্গের চিতালোক নদীনীরে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল—যেন অনন্ত রবি এক স্রোতহীন নদীগর্ভে অস্ত যাইতেছে। অনন্ত শ্মশানধূমে শীতের আকাশ সমাচ্ছন্ন—একটিও যেন নক্ষত্র নাই, অথবা সকল নক্ষত্রই যেন ধরাতলে খসিয়া পড়িয়া চিতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বিরাট সমরভূমি যুড়িয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার, চারিধারে ভগ্নকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ। নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া শকুনী গৃধিনীর দল যেন সেই চীৎকারের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। কতশত বিভীষিকা যেন থাকিয়া থাকিয়া আঁধারে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বালিকার বক্ষ সেই ভীষণ শোকদৃশ্য দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে শৈলের গলা জড়াইয়া শোকবিহ্বল কণ্ঠে কহিল—

"হায় মাতঃ! ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ
আমাদের বক্ষচিতা এরূপে কি নির্ব্বাপন
হইবে মা? হইবে মা! এইরূপে অবসান
আমাদের শোকনিশি, হায়! জুড়াইবে প্রাণ?"

শৈল সাশ্রুচক্ষে কহিল—

"কয় চিতা আমাদের? ———
দেখ মা অনন্ত চিতা ভারত মাতার বক্ষে!"
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম্ম চিতার রাশি,
নব ধর্ম্ম ঊষা ঐ আনন্দে উঠিছে ভাসি।
ঐ কাকলীর কলে উঠিছে মা! কৃষ্ণ নাম
জুড়াতে জগত প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ।"

তারপর উত্তরাকে বক্ষে লইয়া সে অভিমন্যু-চিতাপার্শ্বে গেল। দূরে হিরণ্বতীতীরে অশোক পাদপ-মূলে সেই পবিত্র তীর্থধাম দেখিবামাত্র উভয়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রণাম করিল। নারায়ণ ক্ষীণালোকে অন্তরালে দাঁড়াইয়া অনিমিষনেত্রে উত্তরার সেই বিমলীন শোকছবি দেখিলেন। কি দেখিলেন?

দেখিলেন—"গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার
ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার
নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ রঙ্গালয়
করিতেছে প্রৌঢ় তায় কি দারুণ অভিনয়।
বিশুষ্ক অস্ফুট ফুল, নিবিয়াছে আলোরাশি
ফুটন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে শোক উঠিয়াছে ভাসি।
হাসিভরা ক্রীড়াভরা সে চঞ্চলা সৌদামিনী
হয়েছে গাম্ভীর্য্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী।
জোৎস্নাপ্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুম লতা
এবে শুষ্কা, অর্দ্ধদগ্ধা হায়! বজ্রাঘাতে যথা।"

শুনিলেন উত্তরা আকুল কণ্ঠে বলিতেছে—

"কোথায় রহিলে পদ্মপলাশলোচন হরি।
এই শোক পারাবারে দেও নাথ! পদতরী!
তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়
ছিল তব রূপ সম যে রূপ মাধুর্য্যময়,
মাতা সুভদ্রার ছবি সেই মুখ মনোরম
তোমার দেবত্বে মাখা পার্থবীর্য্যে হুতাশন,
বিধাতার পূর্ণদৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার
এরূপে কি হল ভস্ম? চিহ্ন রহিল না আর।
অর্জ্জুনের প্রাণপুত্র, প্রাণপুত্র সুভদ্রার,
গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য—না, না নাহি মৃত্যু তার।"

বিয়োগবিধুরা পতি পাগলিনীর মর্ম্মভেদী বিলাপ শুনিতে শুনিতে নারায়ণ শোকের আবেগে প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্পভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! শৈল এতক্ষণ আকাশে চন্দ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন কি এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। সহসা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বীরবালকের চিতাভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উভয় ললাটে মাখিয়া উচ্ছ্বাসভরে কহিল—

"কর আশীর্ব্বাদ বৎস! তব বনমাতা ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ।"

দেখিতে দেখিতে পার্থ সুভদ্রাসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝটিকান্তে সুপ্ত জলধির ন্যায় পার্থের হৃদয়ে শোকের সেই উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ যেন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে—তাঁহার মুখে শান্তির ছায় বিরাজিত। বীরজননীর অনন্ত অতলস্পর্শ শোকসিন্ধু ধীর স্থির। পুত্রের শ্মশান ছায়া দেখিতে দেখিতে

উভয়ের হৃদয় মুহূর্তের নিমিত্ত একবার মাত্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় ব্যাকুল কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয়!"

ভদ্রাদেবী স্থিরচিত্তে ও স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"না-না নাথ!—
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ
জুড়াতে জগত প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণনাম।

*　　*　　*　　*

সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্ম্মব্রত শ্রেষ্ঠতর
মাখি পুত্রভস্ম বুকে, হও কর্ম্মে অগ্রসর।
পুত্রের সুযোগ্যা মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্ম্মামৃতে; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখশান্তি পারাবার।
শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্বকণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতিপত্নী নিরবান!"

তারপর উভয়ে চিতার ভস্ম বুকে মাখিয়া যোগী যোগিনীর বেশে শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। শৈল ও উত্তরা ধীরে ধীরে তাহাদের অনুগামিনী হইল।

নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে এই শোকচ্ছবি দেখিতেছিলেন। এইবার শোকোদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বীরকুমারের সেই পবিত্র চিতাভস্ম মাখিলেন। তারপর উষার আকাশপানে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—

"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি; মানবের মুক্তিপথ
রক্তসিন্ধুগর্ভে যদি শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শশ্মানে মাত্র করি নাথ! প্রজ্জলিত
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত পারাবার কৃষ্ণের তপ্ত শোণিত
প্রতিবিন্দু সে সিন্ধুর; হা নাথ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।

*　　*　　*　　*

দিলাম অনলে ঝাঁপ হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্তধারা অষ্টাদশ দিন ধরি
তথাপিও প্রাণাধিক কুমারের এ শ্মশান
জ্বালালে কৃষ্ণের প্রাণে হায়! নাথ! অনির্ব্বাণ।
নিষ্পাপ মানবপুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ?
নাহি দুঃখ, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
তুমি সহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান
পাইবে না শোক; কর পূর্ণ তব মনস্কাম!—
কর এবে ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য নিরমাণ!
ও কি দৃশ্য!

তাইত। ওকি পবিত্র মহিমাময় অপার্থিব দৃশ্য! যোগস্থ নরনারায়ণ দেখিলেন যেন বীরকুমারের চিতা পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। সে পবিত্র চিতাগ্নির লোলশিখা যেন প্রভাতের নভঃমণ্ডল স্পর্শ করিল। সমগ্র সমরক্ষেত্র যেন চিতানলে ছাইয়া গেল। আর সেই পবিত্র পাবক মধ্য হইতে ত্রিভুবন রূপে আলো করিয়া প্রকট হইলেন এক অতুল প্রতিভান্বিতা মহিয়সী মাতৃমূর্ত্তি! রক্তাম্বর পরিধানা কিরীটার্দ্ধেন্দুশেখরা সেই অনিন্দ্যসুন্দরী নারী যেন "মহাভারতের" মূর্ত্তি—যেন "রাজ রাজেশ্বরী" আনন্দময়ী জননী! তাহার বেদিমূল পবিত্র নিষ্কামধর্ম্মে গঠিত—তাঁহার চারিভুজে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর চারিদিকে শোভমান—তাঁহার ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান বিরাজিত। সেই সুপবিত্র বেদীমূল বেষ্টন করিয়া আর্য্য অনার্য্যের দেবতাগণ ধ্যাননিমগ্ন। ধর্ম্ম-সাম্রাজ্ঞীর মুখ অনন্ত-মহিমা মণ্ডিত—যেন প্রভাতের আকাশে শান্ত বালরবি উদ্ভাসিত। অনন্ত মানব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গান করিতেছে। আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নয়নে নারায়ণ এই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মানব-প্রেমে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া কুমারের চিতাপার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিরাট

কুরুক্ষেত্র ব্যাপিয়া যেন সহসা কি অনন্ত মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল!—ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল।

সেই শুভলগ্নে—সেই ত্রিদিব বাঞ্ছিত মহেন্দ্রক্ষণে ধর্ম্মের জয় গানে উদ্বুদ্ধ ও বিভোর হইয়া ভদ্রার্জ্জুন এবং শৈল সহ দ্বৈপায়ন ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"অগ্রে কুমারের চিতা পূরব গগন পানে
চাহি স্থির নারায়ণ নিমগ্ন যোগধ্যানে।
পার্শ্বে স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে
উভয়ের—তিন যুগ ভাসে প্রেম অশ্রু জলে।
তিনের গৈরিক বেশ, বুক চিতাভস্মে মাখা
ভদ্রার গৈরিক আলুলায়িত কুন্তল ঢাকা।
চিতার অপর পার্শ্বে জানু পাতি ধরাতলে
বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল-ধারা-যুগলে।"

দেবর্ষি দ্বৈপায়ন প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে এক অপার্থিব ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তর ভূমানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধীর গম্ভীর স্বরে দেব-নর-ঋষিকে আহ্বান করিয়া তিনি কহিলেন—

"কি ত্রিমূর্ত্তি অপার্থিব! ভারত-জগত-বাসি!
দেবগণ! ঋষিগণ! একবার দেখ আসি!
জ্ঞানদেব নারায়ণ; বলদেব ধনঞ্জয়;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা; সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্ম বিসর্জ্জন; জ্ঞান, বল, আত্মদান
ভক্তির বিকাশসূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।
এই চতুর্ব্বর্গ, এই মানবের মোক্ষধাম—
দ্বাপরের অবতার পূর্ণ তব মনস্কাম।

* * * *

নারায়ণ! জগন্নাথ! দেও শক্তি ধৃতি ধ্যান,
আনন্দে গাইব তব এ মহাভারত গান।
শুনিয়া সে গীত করি কৃষ্ণনামামৃত পান
মানব লভিবে মুক্তি ধরা হবে স্বর্গধাম।"

শৈল এতক্ষণ এই মহান্ তীর্থধামে বসিয়া বিশ্বপ্রেমে আকুল হইয়া তাহার নিদ্রার স্বপ্ন—জাগরণের ধ্যান—সেই অনার্য্যোদ্ধাররূপ ব্রত উদযাপনের আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল। এইবার গুরুদেবের পদরজঃ শিরে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে আকুল হইয়া কহিল—

"হে গুরো! কৃপায় তব, হা পুত্র! স্নেহেতে তোর
অনার্য্য মাতার তোর আজি নারীজন্ম ভোর।
জগন্নাথ! জগৎপতে! আর্য্য-অনার্য্যের হরি!
হে নীলমাধব! দেও পদাম্বুজ দয়া করি
পতিত অনার্য্যগণে, পতিত পাবন নাম
দেও বনপুত্র মুখে, ধর্ম্মরাজ্যে দেও স্থান।"

কুরুক্ষেত্রে শৈলজার এই শেষ প্রার্থনা। পতিতোদ্ধার-ব্রতনিরতা প্রেমিকার এই প্রেমপূর্ণ ছত্রে ছত্রে তাহার নিষ্কাম ভাব কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে রসজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। অতঃপর আমরা শৈলকে এই পুণ্যব্রত উদযাপনের নিমিত্ত "প্রভাসে" দেখিতে পাইব। কিন্তু তাহাকে তাহার সেই পবিত্র রঙ্গভূমে—সেই আর্য্য ও অনার্য্যের মহা-সম্মিলনরূপ তীর্থধামে দেখিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গকে তাহার রৈবতকমূর্ত্তির সহিত একবার এই 'কুরুক্ষেত্রের' মহিয়সী সেবিকা নারীমূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন রৈবতকের সেই মানবী-শৈলজা কুরুক্ষেত্রে কর্ম্মবলে ও জ্ঞান বলে কিরূপ গরিয়সী নারীমহিমায় মণ্ডিতা। কুরুক্ষেত্রে শৈলজার মহান স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব্ব আত্মসংযম অলৌকিক বিশ্বপ্রেম বাস্তবিকই তাহাকে পতিতা অনার্য্যনারীর আসন হইতে আর্য্যের আদর্শরূপা রমণী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের শৈলজা কবির অদ্ভুত সৃষ্টি হইলেও—শিক্ষা-গুণে কর্ম্মগুণে যে মানব মহত্বের আসন অধিকার করিতে পারে, তাহার জীবন্ত সাক্ষ্যলাভ করিয়া আমরা কবির এই সৃষ্টিকে একবারে অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

তড়িৎ।

"তুমি বজ্র পড়ে মর!" "তোমার মাথায় বাজ পড়ুক।" "তোমার যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।" বাঙ্গালী পুরুষ কি মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া লাগিলে ঐরূপ অভি-সম্পাত দিয়ে থাকে। "তার কথা শুনে আমি বজ্রাহত হলেম।" * * "অনেকক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় ছিলাম" ইত্যাদি অনেক কথা অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাঠ করা গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সিরাজদ্দৌলার অভি-সম্পাতে মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, যে মহাপাপী, অথবা যে ব্রহ্মশাপগ্রস্থ তারই মাথায় "বাজ" পড়ে। পাপী না হইলে তাহার ঘরে বজ্রপাত হয় না। যে বৃক্ষে বজ্রপাত হয়, তাহা দোষযুক্ত, তাহার কাষ্ঠ কোন কাজে লাগাইলে অমঙ্গল হয় ইত্যাদি অনেক কথাই এদেশে প্রচলিত আছে।

দিদিমা গল্প করিতেন, "আকাশে মেঘের আড়ালে বিদ্যুল্লতা নামে এক পরম রূপবতী দেবকন্যা থাকেন। তাঁহার এরূপ রূপ যে, তাহার কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখাইলেই বিদ্যুৎ হয়। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে মোহিত করার জন্য মেঘের আড়াল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখান, আর বিদ্যুৎ চমকে। দেবরাজ তাঁহাকে ধরিবার জন্য বজ্র প্রহার করেন, তাহাতেই শব্দ হয়; তাহাই "মেঘের ডাক বা "মেঘ ডাকে"। যথন খুব মেঘ হয় এবং বিদ্যুৎ চমকে ও "মেঘ ডাকে" তথন তিনি ঘটি, বাটী, থালা, গ্লাস প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত বাসনগুলি তাড়াতাড়ি ঘরে তোলার জন্য সকলকে "তাড়াহুড়া" করেন। বাড়ীতে একটা তাল গাছ হইলে তিনি তাহা শীঘ্র কাটিয়া ফেলিতে বলেন। কারণ তাল গাছের ব্রহ্ম শাপ আছে তাহাতে বজ্র পড়ে ও হঠাৎ সেখানে কেহ গেলে তাহার মাথায় তাল পড়ে মৃত্যু হতে পারে।"

দাদা বাবু বলিতেন, মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ এক দেবকন্যার রূপ লাবণ্য মাত্র। পৃথিবীতে যত প্রকার সুন্দর দ্রব্য আছে তন্মধ্যে বিদ্যুৎই প্রধান এবং যাবতীয় দ্রব্য অপেক্ষা ইহা কঠিন। বজ্র ইন্দ্রের আগ্নেয় অস্ত্র। সে অস্ত্র অব্যর্থ। ইন্দ্র বিশেষ কোন কারণ না হইলে তাহা নিক্ষেপ করেন না। নিক্ষেপ করিলেও দিবসে একবার মাত্র নিক্ষেপ করিতে পারেন এবং যাহাতে নিক্ষেপ করেন তাহা অবশ্যই নষ্ট হইবে।" মনুসংহিতায় নাকি বজ্র সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা আছে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যেও বিদ্যুৎ ও বজ্র সম্বন্ধে এরূপ কল্পনার কথা অনেক রূপে জানিতে পারা যায়। তাদের মধ্যে সংস্কার ছিল, বৃহস্পতি গ্রহ পাপীদিগকে দমন করার জন্য পৃথিবীতে বিদ্যুৎ প্রেরণ করিত তাহারা বজ্রাহত ব্যক্তিকে মহাপাপী ও অপবিত্র মনে করিয়া তাহাকে আহত স্থানেই ফেলিয়া রাখিত, অথবা ঐ স্থানেই গোর দিয়া সে স্থান উত্তম রূপে ঘিরিয়া রাখিত। যেন কেহ ঐ স্থানে আসিয়া অপবিত্র না হয়।

"বজ্র দেখিতে লাঙ্গলের "ফালের" মত। মাটীতে পড়িলে তখনই উপরে উঠিয়া যায়। পড়িবার সময় তাহার তেজ যেখানে লাগে সে স্থান পুড়িয়া যায়। এই বজ্র কলাগাছ, শেওড়া গাছ কিম্বা সার কুড়ে (গোবরের গাদা) পড়িলেই আটকাইয়া যায়।" এরূপ অনেক কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বজ্র কি? বিদ্যুৎ কি? তাহা কেহই দেখিতে পান নাই। কারণ, স্বভাবের যে সকল শক্তি যত প্রবল তাহা তত গভীর। মনুষ্যগণ বহুকালাবধি এই বিদ্যুৎ ও বজ্র সম্বন্ধে কোনই তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই এবং তদ্বিষয়ে নানারূপ-রূপক গল্প কল্পনা করিয়াছে মাত্র। যাহাহউক একদিন যে তড়িৎ এই প্রকারে মানব হৃদয়ের ভীতিপ্রদ ছিল

কালক্রমে আজ সেই তাড়িত, জগতে এক অমুনভবনীয় বিস্ময়োৎপন্ন করিয়া জগতের মহদুপকার সাধন করিতেছে। এই তাড়িত বর্ত্তমান সময়ে, যে সকল অসম্ভব ও অমানুষিক কার্য্য সাধন করিয়া বিজ্ঞের আদরের ও গৌরবের ধন হইয়াছে তাহা অবগত হইতে কত কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবীতে যতপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য অতি অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হইতেছে তাহার অধিকাংশই তড়িৎ দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই তাড়িত বলেই ঘোর অন্ধকার রাত্রও দিনের ন্যায় হয়। এই তড়িৎ বলেই এক স্থানের কথা বহু যোজনান্তর স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এক স্থানের সংবাদ অল্পক্ষণ মধ্যে বহুদূর গমন করিয়া থাকে। এই তড়িৎ বলেই সমুদ্রের অতল অন্ধকারময় জলরাশি আলোকিত হইয়া তথা হইতে রত্নাদি উদ্ধার হইতেছে। এই তাড়িত বলেই ভূতত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবতত্ব বিষয়ে বিবিধ নূতন জ্ঞান প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই তড়িৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাস যন্ত্র ও রক্তাধার অবসন্ন হইয়া যম দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাড়িতের "সঞ্জীবনী" শক্তি প্রভাবে তথা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বা কয়েক ঘণ্টা কিম্বা নিতান্ত পক্ষে কয়েক মিনিটের জন্যেও যমের অধিকার হইতে অন্তরে রাখিতে সমর্থ হইতে পারা যাইতেছে। অনাবৃষ্টিতে দেশ উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইলে, তড়িৎ প্রভাবে মেঘ উৎপাদন ও বারি বর্ষণ করিয়া দেশ রক্ষা করা যাইতেছে। মনুষ্যগণ শূন্য পথে উড়িতে গভীর সমুদ্র জল মধ্যে গমনাগমন করিতে পারিতেছে। যে বিদ্যুৎ আমরা ক্ষণেকের জন্য দর্শন করিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হই, তাহা দ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় অসম্ভব কার্য্য সকল সম্ভব করা যাইতেছে। ইহা দ্বারা এত কার্য্য সাধন হইলেও ইহার আর কত প্রকার গুণ যে, মানব চক্ষুর অগোচর আছে তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত কালক্রমে কোন মহানুভব ব্যক্তি দ্বারা ইহার লুকান গুণাবলী প্রকাশ হইয়া আরো কত কার্য্য সাধিত হইবে। যে মহামারি কলেরা ও ম্যালেরিয়া এদেশ উচ্ছন্ন করিয়া মানবগণ ক্রমে ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাও এককালে তাড়িতের মহাশক্তি প্রভাবে দূরীভূত হইতে পারিবে।

তড়িৎ কি, বহুকালাবধি তাহা অজ্ঞাত ছিল। খৃষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে 'থেলিস" নামক গ্রন্থকর্ত্তা তাহার পুস্তকে লিখিয়া যান যে, এম্বর নামক এক প্রকার রজন ঘর্ষণ করিলে, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক দ্রব্য আকর্ষণ করিবার গুণ প্রাপ্ত হয়। ১৬০০ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থেলিসের লিখিত তড়িৎ বিষয়ে ঐ টুকু মাত্রই জানা ছিল। ১৬০০ খৃঃ মধ্যে গিলবার্ট নামক এক ব্যক্তি হীরক কাচ, গন্ধক রুমি মস্তকী গালা রজন প্রভৃতি বহুতর বস্তু ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা এম্বরের ন্যায় লঘু বস্তু আকর্ষিত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি আরো পরীক্ষা করিয়াছিলেন যে, এই সকল ঘর্ষিত দ্রব্য যে কেবল লঘু ও শুষ্ক বস্তু আকর্ষণ করে এমন নহে ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় কঠিন ও বিবিধ প্রকার তরল দ্রব্য আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। এ ভিন্ন তিনি আরও প্রমান করেন যে, মুক্তা, প্রবাল মার্ব্বেল, চকমকি অস্থি, হাস্তি দন্ত, কঠিন কাষ্ঠ ও ধাতু সকল ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যে লঘু বস্তু আকর্ষণ করিবার গুণ বর্ত্তেনা। এই গিলবার্ট সর্ব্বপ্রথমে প্রমান করেন যে, বায়ু শুষ্ক থাকিলেই তড়িৎ উৎপন্ন হয়। ভিজা থাকিলে হয় না। ১৬২৭ খৃঃ বয়ল নামক ব্যক্তি বহুবিধ পরীক্ষার দ্বারা গিলবার্ট প্রদর্শিত পথ কিছু পরিষ্কার করেন মাত্র। যাহা হউক ১৬০০ খৃঃ মধ্যে গিলবার্ট কর্ত্তৃক যে তড়িৎ বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয় তিনিই এম্বরের গ্রীক নাম ইলেক্‌ট্রোন হইতে তাড়িতের নাম ইলেক্‌ট্রিসিটি (Electricity) রাখেন।

১৭২৮ খৃঃ অটোভনগেরিকি নামক এক ব্যক্তি গন্ধকের গোলা হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া বিদ্যুতের আলোক ও শব্দ উৎপন্ন করেন। তিনি একটী তড়িৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা তাড়িতের আলো ও শব্দ প্রত্যক্ষ করেন।

কোন বস্তু তড়িৎযুক্ত হইলে তাহাকে স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত তাহার তড়িৎ নষ্ট হয় না এবং তড়িৎযুক্ত দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দূরে কোন বস্তু লইয়া গেলে ঐ বস্তু তড়িৎ শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই দুইটী বিষয়ও তিনি প্রথমে আবিষ্কার করেন

১৬৫০ খৃঃ সার আইজ্যাক্ নিউটন নামক জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কাচ গোলক দ্বারা তড়িৎ বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। এই কাচ নির্ম্মিত যন্ত্র হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই তাহা হইতে তড়িৎ উৎপন্ন হইত।

১৭২০ খৃঃ ষ্টিফেন গ্রে নামক এক ব্যক্তি পালক, চুল, রেসম, পশম, কাগজ, চর্ম্ম ও কাষ্ঠ প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন। তিনি একটী হস্তি দন্ত নির্ম্মিত বর্ত্তুল শণ ও ধাতুর তারে ঝুলাইয়া ও রেশম সূতায় ঝুলাইয়া বিদ্যুতের পরিচালক ও অপরিচালক দ্রব্য সকল নির্ণয় করেন। শন সূতা ও ধাতু তার দ্বারা ঐ বর্ত্তুল ঝুলাইলে মুহূর্ত্ত কালও বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে নাই এবং রেশম তারে ঝুলাইয়া ৫৯০ হাত দূরে গেলেও তার বিদ্যুৎ নষ্ট হয় নাই। তরল পদার্থ ও মনুষ্য দেহ যে বিদ্যুতের উত্তম পরিচালক প্রথমে তিনিই তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন।

১৭৪৫ খৃঃ মধ্যে ডিউকে নামক একব্যক্তি বিদ্যুতের প্রবল ও ক্ষীণ এই দুইটী অবস্থার বিষয় পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, বহুমূল্য প্রস্তর চুল, পশম ও কাচ প্রভৃতি ঘর্ষণ করিলে একজাতীয় বিদ্যুৎ হয় তিনি তাহার নাম পজেটিভ (Positive) প্রবল তড়িৎ এবং রজন, গালা, রেশম প্রভৃতি ঘর্ষনে এক জাতীয় বিদ্যুৎ হয় তিনি তাহার নাম নেগেটিভ (Negative) ক্ষীণ তড়িৎ রাখেন। এই দুই প্রকারের মধ্যে সমজাতীয় তড়িৎযুক্ত দ্রব্য একত্র করিলে উভয়ে উভয়কে বিক্ষেপ এবং বিষম জাতীয় তড়িৎযুক্ত দ্রব্য একত্র করিলে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে।

১৭৪৬ খৃঃ জর্ম্মনি ও ডেনমার্ক দেশীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ অধিক পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদন করিবার উপায় বাহির করেন।

১৭৪৬ খৃঃ মধ্যে ক্লিষ্ট নামক পণ্ডিত ও লেইডেন নগর নিবাসী মস্চেন ব্রয়েক নামক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রাখার বোতল প্রস্তুত করেন। লেইডেন নগরের নাম অনুসারে ঐ বোতল লেইডেন জার (Lyden Jar) নামে অভিহিত হয়।

১৭৪৭ খৃঃ সার উইলিয়ম ওয়াট্সন প্রথমে তড়িৎ দ্বারা বাতি জ্বালা ও বারুদে অগ্নি প্রদান করা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। তিনি এক ফোটা জল কিম্বা এক টুকরা বরফ দিয়ে জলজান বাস্প ও স্পিরিটের বাতিজ্বালা পরীক্ষায় সফল কাম হন।

তৎপর একজন ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তাড়িতের গতি পরীক্ষা করেন। তিনি ৮০০০ হাত পরিমাণ স্থান পর্য্যন্ত তড়িৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে গমন করার বিষয় পরীক্ষা করেন।

তৎপর কয়েকজন ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত একত্র হইয়া পরীক্ষা করেন যে, কোন কোন ধাতুর তারে বিদ্যুৎ চালাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যতদূর ইচ্ছা তড়িৎ যাইতে পারে। এবং মাটী অপেক্ষা শুষ্ক খুটির উপর তার রাখিলে তাড়িৎ কম নষ্ট হয়।

১৮০০ খৃঃ এবিমেনস্ নামক এক ব্যক্তি পরীক্ষা করেন যে, যে কোন বস্তু তড়িৎযুক্ত করিয়া অনেকক্ষণ রাখিলে তাহার ওজন কম হয়। এই পরীক্ষা মনুষ্য দেহে উত্তম রূপে বুঝিতে পারা যায়।

জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই প্রকৃত পক্ষে তড়িৎ বিজ্ঞানের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি তড়িৎ বিষয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেন তন্মধ্যে মেঘের তড়িৎ ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন তড়িৎ যে একই পদার্থ তাঁহার সর্ব্বোচ পরীক্ষা। তিনি একটী রেশমের রুমালে দুইটী কাঠি বাঁধিয়া একটী ঘুড়ী তৈয়ারী করেন এবং তাহার ছেলেকে আহ্লাদ ও আমোদ দেওয়ার ছলায় ঐ ঘুড়ি মেঘের মধ্যে উড়াইয়া দেন। ঘুড়ির সূতা একটী খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখেন। যতক্ষণ ঐ সূতা শুষ্ক ছিল ততক্ষণ মেঘের তড়িৎ ভালরূপ আসিতে পারে নাই। দুই চারি ফোটা বৃষ্টির জল পড়িয়া [illegible]

ভিজিয়া গেল অমনি মেঘ হইতে বিদ্যুৎ আসিতে লাগিল। তখন তিনি ঐ খুঁটির কাছে তাঁর চাবিকাটি ধরিবামাত্র তাহাতে বিদ্যুতাগ্নি হইতে আরম্ভ হইল। তিনি ঐ বিদ্যুৎ দ্বারা অনেক প্রকার পরীক্ষ দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত করেন যে, মেঘের বিদ্যুত ও যন্ত্র চালিত কৃত্রিম প্রস্তুত তড়িত একই পদার্থ। মেঘের বিদ্যুৎ বজ্রাকারে ঘরে পড়িতে না পারে তজ্জন্য এক প্রকার ধাতু শলাকা বাহির করেন। আজ পর্য্যন্ত সেইরূপ শলাকা ঘরে দেওয়ার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। শুধু এই কারণেই ফ্রাঙ্কলিন জগতে চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত মেঘের বিদ্যুৎ ধাতুশলাকা দ্বারা আকর্ষণ করিবার উপায় বাহির করিবার পর সেণ্টপিটসবর্গের বিচ্‌ম্যান নামক একব্যক্তি ঐ শলাকা পরীক্ষাকালে মেঘের বিদ্যুতের এত প্রবল ভাবে আইসে যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এই ঘটনা ১৭৫৩ খৃঃ সংঘটিত হয়।

১৭৬০ খৃঃ রাম্‌ডেনস্ নামক একব্যক্তি কাচ নির্ম্মিত চক্রাকার এক বৃহৎ তড়িৎ যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ইহা দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করা যায়।

১৭৭৫ খৃঃ ভলটা নামক একব্যক্তি ইলেকট্রো ফোরাস নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র একবার মাত্র ঘর্ষণ দ্বারা অতি সহজে তড়িৎ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

১৭০০ খৃঃ এপিন্স নামক একব্যক্তি লবণ ও প্রস্তর হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা আবিষ্কার করেন।

১৭০০ খৃঃ শেষভাগে বিখ্যাত রসায়ন বেত্তা পণ্ডিত কেভেণ্ডিস্ বিদ্যুৎ দ্বারা জল বিছিন্ন করিয়া উহাকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করেন।

১৭৮৭ খৃঃ কলম্বো বিদ্যুতের আকর্ষণ ও বিযোজন ধর্ম্ম প্রমান করেন।

১৭৯০ খৃঃ গেলবেনিক বা ভলটাইক নামক বিদ্যুতের এক প্রধান শাখা গেলবেনিক নামক একব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এই প্রকার বিদ্যুৎ তিনি প্রত্যেক জীবের শরীরে বর্ত্তমান আছে প্রমান করেন। তিনি একটি মৃত ভেকের নৃত্য দেখিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করেন যে জগতের সমুদায় জন্তু দেহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবার বিশেষ প্রকার যন্ত্র আছে শিরা (স্নায়ু) ও মাংসের যোগস্থানে উভয় প্রকার বিদ্যুতের মিলন স্থান। ঐ স্থানে তড়িৎ বিছিন্ন হইয়া স্নায়ু দ্বারা প্রবল তড়িৎ চালিত হয় ও মাংস দিয়া ক্ষাণ তড়িৎ গমনাগমন করে। তাড়িতের যে শাখাদ্বারা আমাদের অধিক উপকার হইতেছে, যাহার বলে দূরশ্রবণ, দূরলেখন, অনুশ্রবণ, বৈদ্যুতিক আলো, গিলটি করা, কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করা, বহুতর মূল পদার্থ আবিষ্কার করা, দূর হইতে বারুদ রাশীতে অগ্নি প্রদান তড়িৎ দ্বারা গাড়ী চালান, পাখা চালান ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার বিশেষ হিতকর বিষয় সকল সম্পন্ন হইতেছে। গেলবেনিই তাহা প্রকাশ করিবার আদি পুরুষ।

গেলবেনির পর বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ভল্টা গেলবেনির মত ভুল বলিয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধাতুর সংযোগ দ্বারা তাহাদের মিলনস্থান হইতেই তাড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ভল্টা ১৮০০ খৃঃ তাম্র ও দস্তার চাক্তিদ্বারা একটি স্তম্ভ (ভল্টার পাইপ) প্রস্তুত করেন। এক নিকল্‌সন নামক ব্যক্তি তদ্দ্বারা জল বিছিন্ন করেন। গন্ধক দ্রাবকে লৌহ দ্রব করিলে তাহা হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন হওয়ার বিষয়ও ভল্টা আবিষ্কার করেন। ভল্টার প্রচারিত মতই আজ পর্য্যন্ত লোকে সত্য বলিয়া আদর করিতেছে।

১৮২৩ খৃঃ ওয়ারেষ্টেড্ নামক একব্যক্তি চুম্বকের সূচি তাড়িৎ চালিত শলাকার নিকট ধরিলে বিশেষ প্রকার গতিবিশিষ্ট হওয়া আবিষ্কার করেন। ইহার পর হইতেই ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সূচনা হয়। এম্পীয়ার নামক একব্যক্তি বিদ্যুতের সহিত চুম্বকের বিশেষ সম্বন্ধ প্রমাণ করেন।

১৮২০ খৃঃ এরেগোও ডেভী বিদ্যুতের দ্বারা লোহাকে চুম্বক করেন।

ঐ খৃঃ মেক্সওয়েল সাহেব তাপ দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের বিষয় প্রকাশ করেন।

ফারাডে ও হুইটষ্টোন নামক দুইব্যক্তি টেলিগ্রাফের বিশেষ প্রকার উন্নতি করেন। ফারাডে তড়িৎকে উত্তাপ লব্ধ, চুম্বকলব্ধ, ঘর্ষণ লব্ধ, প্রাণীজন্য রাসায়নিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

জেনকিন নামক একব্যক্তি ১৮৫৭ খৃঃ প্রথম টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৬ খৃঃ গ্রোভ, স্মী, ডেনিয়েল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ নামে তড়িৎ কোষ প্রস্তুত করেন। ১৮১০ খৃঃ হইতে ১৮৪০ খৃঃ মধ্যে নানাপ্রকার তড়িত যন্ত্র (বেটারী) প্রস্তুত হয়।

তড়িত প্রস্তুত বিষয়ে আরো অনেক বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করা হইল না।

তড়িৎ এক প্রকার তেজ বা তরল পদার্থ ইহা অত্যন্ত সুন্দর, ক্ষণস্থায়ী ও আলোকময়। ইহা বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, ক্ষণপ্রভা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। তাড়িত প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় না। উহার ক্রিয়া দ্বারা ইহা এক প্রকার তেজ বা তরল পদার্থ বিবেচনা করা যায়। অধিক পরিমাণে তাড়িত উৎপন্ন না হইলে আলোক কিম্বা শব্দ উৎপন্ন হয় না। অথচ পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যেই অল্প বিস্তর তাড়িত বর্ত্তমান আছে। বায়ু যেমন পৃথিবীর সকল স্থানে সকল পদার্থে এমন কি গভীর জল মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। তাহাকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ তাহার কার্য্য দেখিয়া তাহাকে অনুভব করা যায়। তড়িৎ ও সেই প্রকার পৃথিবীর সমুদায় ছোট বড়, তরল কঠিন, বাষ্পীয়, চেতন, অচেতন উদ্ভিদ সকল দ্রব্যেই বর্ত্তমান থাকার প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। দুগ্ধে ছানা বর্ত্তমান থাকাও দেখা যায় না কিন্তু তাতে একটু অম্ল যোগ করিলেই ছানা পৃথক হইয়া যায়। সেইরূপ সকল দ্রব্যেই তড়িতের ক্ষীণ ও প্রবল (পজেটিভ ও নেগেটিভ) এই দুই প্রকার অবস্থা একত্রে মিলিত হইয়া তাড়িতের বর্ত্তমানতা বুঝিতে পায়া যায় না। তাড়িতের এই দুইটি অবস্থা (Positive ও Negative) সর্ব্বদাই একত্র হইতে বা থাকিতে ভালবাসে। কোন কারণে এই দুইটী বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই উহাকে অস্থির আকারে বা উহার কোন ক্রিয়া দেখিয়া তড়িৎ বলিয়া চিনিতে পায়া যায়। সকল দ্রব্য হইতেই এইরূপ ক্ষমতার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিলেই তড়িৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই প্রকারে প্রত্যেক দ্রব্যের শীতল অবস্থা হইতে উত্তপ্ত অথবা উত্তপ্ত হইতে শীতল। বিরাম অবস্থা হইতে গতিপ্রাপ্ত অথবা গতিপ্রাপ্ত অবস্থা হইতে বিরাম। কঠিন অথবা বাষ্প হইতে তরল বা কঠিন অথবা রাসায়নিক শক্তিতে অপর দ্রব্যেতে পরিবর্ত্তন হইলেই তড়িৎ সুপ্ত অবস্থায় আইসে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে তাড়িতের দুইটী অবস্থা (প্রবল ও ক্ষীণ) একত্রে পূর্ণাঙ্গভাবে থাকিতে ভালবাসে কোন কারণে উহাদের বিচ্ছেদ ঘটিলে একত্রে মিলিবার জন্য প্রবল ভাবে চেষ্টা করে। ভূমণ্ডলের কোন দ্রব্যই এই মিলনের বাধা জন্মাইতে সক্ষম হয় না। রবার, লাবাক্ষি, গন্ধক, রজন, প্রভৃতি কতকগুলি তড়িৎ অপরিচালক দ্রব্যের ঘর্ষণে তড়িৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘর্ষিত দ্রব্যে যায়। এই জগতের সকল দ্রব্যই পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং সকল দ্রব্য হইতেই অনবরত কম বেশী পরিমাণে নিয়ত তড়িৎ উৎপন্ন হইতেছে। দ্রব্য বিশেষে তাড়িতের মুক্তাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। যে সকল দ্রব্য হইতে অতি সহজে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া দীর্ঘকাল মুক্তাবস্থায় রাখা যাইতে পারে সচারাচর সেই সকল দ্রব্যই তড়িৎ উৎপাদন জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমান করিয়াছেন যে, ঘর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, চুম্বক, তাপ, ও সংযোগ বা স্পর্শন দ্বারা সচরাচর তড়িৎ উৎপাদন করা যায়। এতদ্ব্যতীত তড়িৎ বাহক মৎস্যও ভেক প্রভৃতি জন্তু দ্বারাও তড়িৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই সকল উপায়ের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ও চুম্বক দ্বারা প্রাপ্ত তড়িৎ দ্বারাই অধিক কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তড়িৎ উৎপানন "গেলভেনিয়" ও "ভলটায়" আবিষ্কৃত।

রাসায়নিক তড়িৎ উৎপাদন করিতে ধাতু, অঙ্গার প্রভৃতি তাড়িতের উত্তম পরিচালক দ্রব্যই উপযোগী। দুই প্রকার ধাতু একত্র স্পর্শ করিলে, উহাদের মুক্ত অন্ত দুইটীর একটী হইতে ক্ষীণ ও অপরটী হইতে প্রবল তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় পিতলের কব্জার যে স্থান আটা থাকে সেই স্থানেই অধিক মরিচা ধরে। ইহার কারণ দুই ধাতুর যোগে অদৃশ্যভাবে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া ঐ প্রকারে ধাতু ক্ষয় করিয়া মরিচা উৎপাদন করে। যদি এই মরিচা ধরিবার অন্য কোন কারণ থাকিত তাহা হইলে কব্জার সকল স্থানেই সমানভাবে মরিচা ধরিত। ইস্পাতের মধ্যে অঙ্গার থাকাতে লৌহ অপেক্ষা ইস্পাতের দ্রব্যে তাড়িত স্রোত চালাইলে তাহা আর মিশ্র থাকিতে পারেনা। ঐ মিশ্র দ্রব্য পৃথক হইয়া তাহাতে যে যে অমিশ্র দ্রব্য থাকে তাহা পৃথক হইয়া যায়। এ জন্য জলের মধ্যে দিয়া তাড়িত স্রোত চালাইলে উহার অম্লজান ও জলজান পৃথক হইয়া যায়। ঐ প্রকার তামা, রূপা, সোনা, অঙ্গার, লোহা ও দস্তা একত্র করিলেই উহা হইতে তাড়িত শক্তি উৎপন্ন হয়। এই কারণে ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা তাড়িত কোষ নির্ম্মিত হইয়া নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইলেই বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট ধাতুর গুণ ধর্ম্ম যত বিভিন্ন হয় তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত তাড়িত কোষও তত উৎকৃষ্ট হয়। তাড়িত কোষই তাড়িত সংগ্রহ ও পরিচালনের প্রধান উপায়। তাড়িত কোষ দ্বারাই ঘণ্টাবাদন, টেলিগ্রাফ, আলোক প্রদান, চিকিৎসা কলাদি পরিচালন প্রভৃতি অনেক প্রকার কার্য্য বর্ত্তমান সময়ে সহজ সাধ্য হইয়াছে। তাড়িত কোষ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করা যাইবে। এবং এই তাড়িত দ্বারা ঐশী শক্তি ও চিকিৎসা বিষয়ক ভিন্ন প্রবন্ধ নিবদ্ধ করার ইচ্ছা রহিল। ইতি

ডাক্তার :—শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী।

চরকা।

কল্পনা বলে কাষ্ঠের মাঝে জনম লভেছি কবে,
জানিনা সে কোন শিল্পী আমায় টানিয়া আনিল ভবে ;
সুদর্শনের আঘাতে যখন,
দৈত্যে নাশিল দেব নারায়ণ,
বুঝি সেই ক্ষণে গড়িল আমারে—সেই বলে বলীয়ান্।
স্বেচ্ছায় পরি রজ্জুর ফাঁস সঁপেছি আপন প্রাণ ॥

সেই হ'তে আছি মানব সমাজে কনক আসন পাতি,
কর্ম্মের ফলে আদর লভেছি, উঠেছে গরব ভাতি ;
অলসতাহীণ কর্ম্ম মগনা,
শক্তিরূপিণী বঙ্গ ললনা,
চিনিল আমারে, বুঝিল আমারে, লইল আমার ভার।
সোহাগে দুলিয়া দ্রুত পদে চলি, নাহি ধারি কারো ধার ॥

চক্রের পথে আপন কেন্দ্রে ফিরি সদা নিজ কাজে,
ঘর্ঘর রবে নবীন মন্ত্রে নূতন রাগিণী বাজে ;
ব্যোম্ পথে উঠি সে রাগিণী তান,
জাগা'ল মাতা'ল মানব পরাণ,
আমারে বরিল শঙ্খ ধ্বনিতে পূজিল দেবতা জ্ঞানে।
রক্ষা কবচ হইনু সবার হৃদয় শোণিত দানে ॥

আমার সেবায় দীন অশরণ ফিরাল জীবন ধারা,
হইনু সবার আদরের ধন বোয়ামী পুতের বাড়া ;
জাহাজ ভরিয়া কত সুতা আসে,
সোণার স্বপন নিমেষে বিনাশে,
চিক্কণ মোহে আমারে তেয়াগি পরিল নূতন সাজ।
দুঃখ দৈন্য ভরিয়া উঠিল শান্তির গৃহ মাঝ ॥

কত না বরষ নীরবে কেটেছে নিরালা গৃহের কোণে,
পঙ্গুর মত ভগ্ন পরাণে কেঁদেছি আপন মনে ;
অন্ধকারায় কীট সহবাসে,
যাপিনু জীবন মরণ হুতাশে,
যারেকের তরে কেহ না ভাবিল দারুণ দুঃখ ভার।
অভিশাপে মোর সোণার বাঙ্গালা হ'য়ে গেল ছারখার॥

সহসা সে কোন পুণ্য লগনে গরীয়ান মহীয়ান্,
ঘোষিল বার্ত্তা অমৃত কাহিনী মূর্ত্ত আশার গান ;
কুহেলি ভেদিয়া নবীন আলোকে,
পন্থা দেখায়ে মোহন পুলকে,
যুগের জড়তা ঘুচিল আবার জাগিল জীবন লেখা।
ক্লিষ্ট মলিন বদনে আবার ফুটিল হাসির রেখা॥

ছুটিয়া চলেছি গভীর মন্ত্রে শঙ্কা বিহীন প্রাণ,
কর্কশ আর নহে মোর স্বর ঢালিছে মধুর তান ;
নূতন জীবনে নব চেতনায়,
জাগায়েছি সবে বাঁধি একতায়,
দুঃখ দহনে মানবতা শিখা উর্দ্ধে উঠেছে জাগি।
শিখিয়াছে সবে বরিতে দৈন্যে অমর আশীষ মাগি॥

মানস নয়নে হের ঐ হোথা পূরব গগন ভাগে,
জাগিয়াছে চির সাধনার ছবি অরুণ কিরণ রাগে ;
কমলার হেম আসন ঘিরিয়া,
সোণার কমল উঠেছে ফুটিয়া,
শস্য শ্যামলা বাঙ্গলা সুখেতে হয়ে গেছে ভরপুর।
জাগরণ প্রাতে উঠেছে ধ্বনিয়া নব জীবনের সুর॥

শ্রীচারু চন্দ্র সেন।

মানব।

(ইংরেজীর ছায়াবলম্বনে)

এক

এক যে ছিল মা, তার ছিল এক ছেলে। ছেলেটী তার মাকে খুব ভালবাসত। তারা ছিল কৃষক। ছেলেটীর নাম ছিল মানব।

মানব সারাদিন মাঠে কাজ করে, দুপুরে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সে গাছের নীচে বসে, পাখীর গান শোনে, আর তার সুরে সুর মিলিয়ে বাঁশী বাজায়। নদীতে পাল তুলিয়ে কত দেশ বিদেশের নৌকা আসা যাওয়া করে সে তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যায়। চুপ করে চেয়ে চেয়ে সে আপন মনে কি ভাবে সে নিজেই জানে না। তারপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন দিগন্তের কোলে দীর্ঘনত আঁখি পল্লবের মতো ঝিমিয়ে আসে, সে বাড়ী ফিরে। মা তার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে ; সে এলেই বলে, "মানব এলি বাবা ?" ছেলেকে আদর ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে খেতে দেয়। খাওয়া হলে দু'জনে এক জায়গায় বসে গল্প করে। কোনও দিন বা মানব প্রদীপের আলোতে বসে বই পড়ে আর মা চুপ করে শোনে।

তারপর রাত যখন গভীর হয়ে আসে, পল্লীর কল-কোলাহল নীরব হয়ে যায়, মা তাঁর ছেলেকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুই

মানবরা যে পাড়ায় থাকতো সে পাড়ায় আর একজন ভদ্রলোক থাকতেন। তা'দের সঙ্গে মানবদের খুব ভাব ছিল। সে ভদ্রলোকের একটী মেয়ে ছিল। শরতের এক মুঠো সোণালি রৌদ্রকে জমিয়ে যেন বিধাতা

এই মেয়েটাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার মুখের হাসি খানি সকাল বেলাকার শিশিরে ধোয়া শিউলি ফুলের মতই স্নিগ্ধ ও মিষ্টি ছিল। ওর ওই হাসিটুকু মনকে মুগ্ধ করতো। এই মেয়েটার সঙ্গে মানবের বিয়ের কথা হচ্ছিল। মেয়েটার নাম ছিল কল্যাণী। সে খুব লক্ষ্মী মেয়ে ছিল; কত কাজ করতো, কিন্তু সবই নীরবে।

* * *

তিন বার—রাত্ত বার!

একদিন মানব মাঠ থেকে সন্ধ্যায় ফিরছে, একটা লোক তার কাছে তার বাড়ীতে থাকতে চাইল, বল্লে "আমার নাম উচ্চাশা।" মানব তাকে নিয়ে বাড়ী গেল।

মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, কত আদর করে উচ্চাশাকে ঘরে নিয়ে গেল। সে রাত্রি উচ্চাশা মানবদের বাড়ী থাকবে ঠিক হোলো। মানবের সঙ্গে গল্প করে তার বুদ্ধি দেখে উচ্চাশা বল্লে, "তুমি এমন বুদ্ধিমান, অথচ এখানে কেন? চল আমার সঙ্গে সহরে; সেখানে বেশী উপার্জ্জনের অনেক উপায় আছে—আর তুমি উপার্জ্জন করতে পারবেও।"

মানবের চোখে নতুন জগত খুলে গেল। মানবের ইচ্ছে হলো সহরে যাবার। মাকে বল্লে মা তুমি বলতো আমি সহরে যাই।" মা কত করে বারণ করলেন, বল্লেন "আমি তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো?—আমি পারবো না বাবা!" অনেক বুঝিয়ে মায়ের মত হ'ল। সকালে মাকে ছেড়ে মানব চল্ল সহরে। মাও যত কাঁদে, ছেলেও তত কাঁদে। কল্যাণী এল তার জলভরা করুণ চোখে কি এক মিনতি ভরে নিয়ে। কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বল্লে না মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তিন

বিদায় নিয়ে মানব উচ্চাশার সঙ্গে সহরে গেল। যাবার পথে উচ্চাশা মানবের সঙ্গে আর একটা ভদ্র লোকের পরিচয় করিয়ে দিলে—তার নাম অভিজ্ঞতা।

সহরে গিয়ে উচ্চাশা এক ভদ্র লোকের বাড়ী মানবের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলো। ভদ্র লোকের নাম ছিল সংসার।

সেখানে মানব থাকে; বেশ আরামেই থাকে। সে ভদ্র লোকের একটী মেয়ে ছিল; সে দেখতে কল্যাণীর চেয়ে অনেক সুন্দর। কিন্তু তার রূপ ছিল আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল, কি যেন একটা তীব্রতা তার ঐ লীলায়িত দেহ ভঙ্গীর মধ্যে ছিল। তাতে মন অভিভূত হয়ে যেত, কিন্তু মুগ্ধ হতো না। তার নাম ছিল মোহিনী। তার সঙ্গে মানবের শীঘ্রই ভাব হয়ে গেল। মানব তার সঙ্গে খুব হাসি গল্প সুরু করে দিল।

একদিন তারা ঝরা ফুলে বিছানো কচি ঘাসের গালিচার উপর বসে বাগানে গল্প করছে, এমন সময় উচ্চাশা এসে বল্লে "তোমার কাজের সুবিধার জন্য একটী ভদ্রলোক দেখা কোরতে এসেছেন। তার নাম হচ্ছে সুযোগ।" মানব বল্লে, "একটু অপেক্ষা কোরতে বল।" কিন্তু সুযোগ সে কথা শুনলো না। সে বল্ল, "সুযোগ কারো জন্যই অপেক্ষা করে না।" সুযোগ চলে গেল।

একদিন মোহিনীর এক বন্ধু এলো। তার নাম মায়া। এই মায়া মেয়েটার রূপ ছিল আফিম ফুলের মতোই টুকটুকে ও অপ্রিরসের মাদকতায় ভরপুর।

সে সহরে এমনি নিয়ম ছিল যে প্রতি ঋতুতে একটা করে আনন্দ উৎসব প্রায় ঘরে ঘরেই হতো। তাই মায়া তার বন্ধুকে উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ কোরতে এসেছিল। সে তার নতুন বন্ধু মানব ও পুরনো বন্ধু মোহিনীকে নিমন্ত্রণ কোরে চলে গেল।

চার।

সন্ধ্যা হোলো, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্‌লো, প্রতি ঘরে আনন্দ কোলাহল শোনা গেল। এটা ছিল বসন্তোৎসব।

ফুলে চারিদিক যেন ঢাকা। মেয়েরা সবাই ফুলের অলংকার পরেছে—গলায় লাল-করবীর মালা, চূড়ায়

কুরুবক, কাণে শিরীষ ফুল, হাতে লীলা পদ্ম, মুখে মেখেছে লোধ্ররেণু। তা'দের কলকণ্ঠের গুঞ্জন-ধ্বনিতে রাস্তাগুলোও আনন্দমুখর হোয়ে উঠ্‌লো, তা'দের শিথিল অঞ্চল হোতে খসে পড়া চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, আমের মঞ্জরীতে পথ ঢেকে গেল। তা'দের ভীড়ে রাস্তা চলা কষ্টকর, কারণ উৎসবটা তারাই বেশী উপভোগ কোর্‌তে চায়। পথে পথে মেলা বসেছে, ছোট মেয়েটীও আজ তা'র মায়েরই মতো মাধবী, কনকচাঁপায় ছোট্ট দেহখানি ঢেকে ফুলরাণী সেজে পথে বেরিয়েছে।

মোহিনীও আজ সব চেয়ে সুন্দর আভরণে সেজে মানবকে নিয়ে উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। উৎসব বাড়ীতে মানব ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় একটী লোক তা'কে বল্লে, "আমাকে কি মনে আছে? আমি সেই অভিজ্ঞতা। তুমি যখন সহরে আস্‌ছিলে তখন উচ্চাশা আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।" মানবের মনে হোলো, "তাইতো! এতদিন তো এর কথা ভুলেই গিয়েছিলুম; একদিনও তো এর কথা মনে হয় নাই।" নতুন প্রবাস-যাত্রা কালে এর সঙ্গে তা'র যতটুকু পরিচয় হোয়েছিল সেটুকু অল্প সময়ের মধ্যে এই নতুন বন্ধুটীকে তা'র খুবই ভাল লেগেছিল।

অভিজ্ঞতা বল্লে, "দেখ, এই সব কি ভালো, প্রতিদিন এম্নি আমোদ করা?"

মানব বল্লে, "তা'তে আর কিইবা হোয়েচে? এই একটা ছুটো রঙীন সন্ধ্যা যদি এম্নি ভাবে আমোদ কোরে, বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দি, তবে হয়তো কিছু হয় না।"

অভিজ্ঞতা একটু ক্ষুণ্ণ হোয়ে বল্লে, "থাক্ তবে এখন যাই, আবার দেখা হ'বে।"

পাঁচ।

এ দিকে বাড়ীতে সেই মায়ের অবস্থা বড় শোচনীয়, মা বড় গরীব হোয়ে পড়েছে। তার ওপর আবার ছেলেকে ছেড়ে মা কোনও দিনও থাকতে পারে না—এম্নি দুর্ব্বল স্নেহে ভরা ছিল তা'র মন! মা ছেলের জন্য ভেবে ভেবে অসুখে পড়্‌লো।

কল্যাণী এলো মায়ের সেবা কোর্‌তে। মা বল্লে, "কল্যাণী তুমি মানবকে আস্‌তে চিঠি লেখ।"

মায়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে চল্লো।

কল্যাণী নতমুখে সেবানিপুণ হস্তে তা'কে শুশ্রূষা কোরে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু কল্যাণীর মঙ্গল হস্ত রুগ্না মায়ের উত্তপ্ত ললাটে সুধাস্পর্শের মতো বোধ হ'লেও তা'র প্রাণের ক্ষত বেড়েই চল্লো। তারপর এক সন্ধ্যায় মা তা'র ছেলেকে জন্মের মত না দেখেই কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে চ'লে গেল!

কল্যাণী তা'র বড় বড় দু'টী চোখে জল ভরে নিয়ে চিতার আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে উদাস হোয়ে গেল। তারপর বাড়ী ফিরে সমস্ত দিন জানালার ধারে বসে চুপ কোরে চেয়ে রইল।

কল্যাণী এক দূতকে সহরে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলে, লিখ্‌লে, "মানব, তোমার মা তোমায় না দেখার কষ্ট সহ্য কোর্‌তে না পেরে স্বর্গে চ'লে গেছেন। তুমি শিগ্‌গিরি এসো।"

দূত চল্লো চিঠি নিয়ে মানবের কাছে সহরে।

ছয়।

মানব সেই উৎসব বাড়ীতে বোসে মায়ার সঙ্গে গল্প কোর্‌ছে, আর সুখের উচ্ছ্বাস মদের মতো তা'কে মাতাল কোরে তুলেছে। এমন সময় দূত এলো চিঠি নিয়ে। চিঠি দিতে গেল, কিন্তু মায়া লুকিয়ে সে চিঠি নিজে নিলে, আর তা' নিজেই লুকিয়ে রাখ্‌লে। উৎসবে আরো কত লোক এসেছিল;—লোভ, অহঙ্কার, ক্রোধ, রূপ সবাই আমোদে মত্ত। তা'দের কত বিচিত্র রকমের রঙীন সজ্জা, কত নানা রকমের হাবভাব, কত নতুন নতুন বিলাস-লীলা।

উৎসব শেষ হোলো, যে যার ঘরে ফিরে গেল।

*   *   *

এম্নি কোরে দিন যায়।

বছর প্রায় ঘুরে এলো; মানবের অবস্থা বদ্‌লে গেল। সে কোন কাজ কোর্‌তো না, অথচ সারা বেলা হেলা ফেলা কোরে আমোদ কোর্‌তো। তা'তে এই

হোলো, মানব যে অর্থ বাড়ী থেকে এনেছিল তা' সব ফুরিয়ে গেল।

সংসার বল্লে, "তোমার কাজ খুঁজ্‌তে হ'বে।"

মানব তা'র দামী জামা কাপড় বিক্রী কোরে ফেল্লে।

* * * *

আবার সহরে বর্ষার উৎসব। এবারও মানব গেল মায়ার বাড়ী। দেখে সেই মানুষরা আবার তেম্নি ভাবে নানারকম রঙীন ফুলের আভরণে সেজে এসেছে; কিন্তু এবার তারা গরীব মানবের দিকে চাইলেও না। মোহিনী তার দিকে করুণার দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল, মায়া অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে; আর রূপ ঠাট্টার চোখে চেয়ে দূর থেকে সরে গেল। কেউ তাকে উৎসবে যোগ দিতে ডাক্‌ল না।

মানব দুখিঃত হয়ে বাড়ী ফির্‌ছে, দেখ্‌ল, অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে। সে বল্লে "বাড়ী যাবে?"

মানব দ্বিধাভরে বল্লে "না।"

মানব পথ দিয়ে ছুটে চল্‌লো, দেখ্‌ল, তাকে এক কঙ্কালসার মানুষ তাড়া কোরে আসছে, তাকে যেন ধরবে। তার কোটরগত চোখের মধ্যে একটা যেন ক্ষুধা চিতাগ্নির মতো লক্ লক্ করে জ্বল্‌ছিল। তার নাম দরিদ্রতা।

মানব দৌড়তে দৌড়তে দরিদ্রতার তাড়ায় এক মস্ত বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে পড়লো। দেখ্‌ল, এক মস্ত বলবান মানুষ বসে আছে, মুখে তার নিষ্ঠুর হাসি, চক্ষে তার ক্রূর দৃষ্টি। দেখ্‌লে তাকে ভয় হয়। সে কিন্তু বেশ সদয় হয়েই তাকে কাছে বসা'ল, তার সব কথা শুন্‌ল, তারপর মানবকে কত পরামর্শ দিতে লাগ্‌লো। মানবকে বল্লে "আমি তোমায় বড়লোক করে দিতে পারি।"

মানব আবার সে কথায় মেতে উঠলো, বল্লে "হ্যাঁ তাই করে দাও।"

সেই লোকটীর নাম ছিল পাপ। পাপ এবার বল্লে সহরে যে বড় লোকরা আছে তাঁদের বাড়ী সিঁদ কাটবে, তারপর টাকা যেখানে থাকে সেখান থেকে চুপি চুপি নিয়ে পালিয়ে আসবে।"

মানব বল্লে "যদি কেউ দেখে ফেলে?"

পাপ তখন ঝক্‌ঝকে এক খানা ছোরা তাকে দিয়ে বল্লে, "এইটি তখন তার বুকে বসিয়ে দেবে।"

হঠাৎ মানব ভয় পেয়ে ছুটে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। পাপ তাকে আট্‌কাতে চাইল, পার্‌ল না। মানব যেন প্রাণ ভয়ে দৌড়তে লাগ্‌লো। ক্লান্ত হয়ে থাম্‌তেই অভিজ্ঞতা আবার দেখা দিলে, বল্লে, "চল আমার সঙ্গে।"

মানব উত্তর দিলে "হ্যাঁ চল, আমাকে রক্ষা কর।"

সাত।

তখন অভিজ্ঞতা মানবকে একটী লোকের কাছে নিয়ে গেল। সে দেখ্‌তে সুন্দর আর বেশ বলিষ্ঠ। লম্বা চুল তাঁর কপোল বেয়ে পড়েছে; বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তাঁর ললাটে মুক্তা ফলের মত শোভা পাচ্ছে, তাঁর নাম কর্ম্ম।

সে তখন একটা লোহাকে পিটিয়ে সোজা কর্‌ছিল। অভিজ্ঞতা তাঁকে বল্লে, "একে একটা কাজ দিতে পার?"

কর্ম্ম একটু ভেবে উত্তর দিলে, "আমার বন্ধুর এক সরাই আছে। সেখানে একটী লোকের দরকার।"

মানব সেখানে কাজ কর্‌তে গেল।

সেই লোকটীর নাম ব্যবসা। লোকটী তার কর্ম্মচারীদের রক্ত শুষে নিত আর নিদারুণ অত্যাচার কর্‌তো। মানব ছাড়াও অনেক পুরুষ ও মেয়ে সরাইতে কাজ কর্‌তো। তার মধ্যে একটী মেয়ের সঙ্গে মানবের খুব ভাব হলো; কারণ, তার উপরে আর মানবের উপরে একই রকম অত্যাচার হ'ত। মেয়েটীর ব্যথায় ভরা চোখের চাহনি সর্ব্বদাই চোখের জলে ভর ভর; ছেঁড়া গোলাপটী হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন করুণ হাসি হাসে, তার মুখের হাসিটী তেম্নি সুন্দর ও বিধুর। মেয়েটীর নাম অনুতাপ—সে কিন্তু বড় শান্ত আর খুব ভাল।

এম্নি অত্যাচার সয়ে মানব আর কাজ কর্‌তে পার্‌লো না। সে কাজ ছেড়ে দেবে একথা তার

মনিবকে বলতে গেল। ব্যবসা তাকে খুব লাঞ্ছনা ক'রে তাড়িয়ে দিলে, একটি পয়সাও দিলে না।

সে চলে এলো, অনুতাপও তার সঙ্গে এলো। অনুতাপ বল্লে, "তুমি আমায় ভুলবে না?"

মানব বল্লে, "না।"

তখন আবার অনুতাপ একটু চিন্তা করে বল্লে, "একটা কথা বলব?" মানব উত্তর করলে "বল।"

অনুতাপ তখন হেসে বল্লে, "আমায় তুমি ছোট বোন্‌টীর মতো ভালবাস্‌বে?"

মানব অনুতাপের মাথায় হাত দিয়ে, তাকে আদর করে উত্তর কোর্‌ল, "বাস্‌বো।"

অনুতাপ তখন বিদায় নিয়ে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

মানব পথের ধারে বসে তার অতীত জীবনের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লো। এমি সময় একটী মেয়ে সেখানে এল। মানবকে দেখে বল্লে, "তুমি আমায় চিন্‌তে পার?"

মানব তখন চম্‌কে উঠে বল্লে, "না, না, আমি তোমায় চিনবো না, তুমি যাও।" এ মেয়েটী আর কেউ নয়, মায়া।

হঠাৎ এরূপ ভাবে তাকে বিদায় দেওয়ায় সে অপমান বোধ করলে। একটা প্রতিহিংসার দীপ্তি তার চোখে ফুটে বেরুল। বসন্তোৎসবের রাতে সে যে চিঠিখানি লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানি মানবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

চিঠি পড়ে মানব চম্‌কে কেঁদে উঠ্‌ল, "মা, মাগো আমার!"

অভিজ্ঞতা আবার এলো, বল্লে "বাড়ী যাবে?"

মানব অমি তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "আমায় নিয়ে চল বাড়ী।"

অভিজ্ঞতা তাকে নিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো।

মানবকে পেয়ে কল্যাণী আর তার বাবা খুব খুসী হোলেন।

আট।

তারপর?

তারপর আবার হাসি দেখা দিল; আবার মানবের ক্ষেতে সোনার ঢেউ বয়ে যেতে লাগ্‌লো। মানব কল্যাণীকে বিয়ে করে বাড়ী ঘর দোর পরিষ্কার করে সুখে থাকতে লাগলো।

একদিন কল্যাণী বল্লে, "সহরে যাও, টাকা উপার্জ্জন কোরবে।"

মানব চম্‌কে উঠে বলে "না, মা, সে থাক্‌। আর তা ছাড়া উচ্চাশা মরে গেছে; কেই বা নিয়ে যাবে?"

অভিজ্ঞতা দেখা কোর্‌তে এলো, বল্লে "উচ্চাশা মরেনি, কাল তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসবে।"

মানব বল্লে, "কিন্তু"—

কল্যাণী তখন মানবকে বল্লে, "এবার আর তোমার ভয় নেই। বোন্ অনুতাপের বাড়ী থাক্‌বে, আর বন্ধু অভিজ্ঞতার পরামর্শে চল্‌বে।"

পরদিন উচ্চাশা এলো। মানব সহরে গেল। কত টাকা কড়ি নিয়ে এলো। কল্যাণী জগতে কল্যাণ ছড়াতে লাগ্‌ল। মানবের মিনতিতে অভিজ্ঞতা আর অনুতাপ এসে মানবের বাড়ীতে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো।

তারপর? —— তারপর?

আমার কথাটী ফুরুলো,
নটে গাছটী মুড়ুলো।

কুমারী শান্তিসুধা সেন।

জুয়া।

(উপন্যাস)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

শেয়ার মার্কেটে বড় হুলুস্থূল পড়িল। ভারত ব্যাঙ্ক আর ভারত বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ভাগ্যধর বলিল, দেখ্‌লি ভোলানাথ সোমনাথের শেয়ার যে ত্রিশ টাকা প্রিমিয়ম হোতে বসেছে।

ভোলানাথ। ওরে যখন পড়বে তখন এমন আছাড় খাবে, একেবারে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে থাকবে।

ভাগ্যধর। তোর চিরকালই এই এক কথা।

ভোলানাথ। দেবল বাবু খুব 'বেয়ার' করচেন শুনিচিস।

ভাগ্যধর। এবার দেবল বাবু কাত। স্বাকরাহাটি ত গেল। দর যেরূপ কমচে এবার বুঝি বা ডিস্কাউণ্ট হয়।

যেখানে ভাগ্যধর ভোলানাথে কথা হইতেছিল সেইখানে হরেকিসন আসিয়া দাঁড়াইল।

হরেকিসন। ভাগ্যি! তুই আমার কাছে 'সোমনাথ' কিছু কিনবি?

ভাগ্যধর। দর কত?

হরেকিসন। নয়।

ভাগ্যধর। নয় প্রিমিয়ম?

হরেকিসন। না—না—নয় ডিস্কাউণ্ট। দেবল বাবু সেলার।

ভাগ্যধর। আচ্ছা, দশহাজার শেয়ার দেও। ডিলিভারি কিন্তু পরশু দিতে হবে।

হরেকিসন। তাই হবে।

এমন সময়ে একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী শেয়ার মার্কেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ পর্য্যন্ত অত বড় মোটর শেয়ার মার্কেটে কখন আসে নাই। তাহার উপর মোটর গাড়ীর সোয়ারির কিবা পোষাকের কায়দা—কিবা ঘড়ি—কিবা চেন—সমস্তই বাহারের চরম। যখন সোয়ারি নাবিল তখন মনে হইল যেন লাট সাহেব আজ শেয়ারের খেলা খেলতে মার্কেটে আসিয়া নাবিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিটীকে অনেকেই চিনিত।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, বাবা অদৃষ্ট দেখ।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, লোকের সর্ব্বনাশ করবার জন্যই বুঝিবা সোমনাথের জন্ম হোয়েচে।

সোমনাথ গাড়ী হইতে নাবিয়াই কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্থিরনেত্রে সিগারেট খাইতে খাইতে নগেন দত্তের আফিসে ঢুকিল। নগেন দত্তের আফিসের ভিতর সোমনাথের জন্য একটা আলাহিদা ঘর ঠিক ছিল। বেশ সাজানো। আলাহিদা বাহার। সোমনাথ ঢুকিয়াই ঘণ্টা বাজাইয়া চাপরাসিকে ডাকিল। চাপরাসি আসিবামাত্র সোমনাথ বলিল, স্যাম্পেন লেয়াও। বরফে ডুবিয়ে রেখেছিলি ত?

চাপরাসি। আজ্ঞে হুজুর।

অনেক দালাল প্রায় সকলে একে একে সোমনাথের সঙ্গে দেখা করে গেল। সোমনাথ সর্ব্বদা হাসি মুখ। স্যাম্পেন এক এক চুমুক খেতে খেতে তাদের সঙ্গে বিনীত ভাবে কথা কহিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভিড় কমিলে ভাগ্যধর আসিয়া উপস্থিত হইল।

সোমনাথ। ভাগ্যি! এক চুমুক স্যাম্পেন খাবি?

ভাগ্যধর। আপনার পেসাদ ত চিরকালই পেয়ে আসচি। চাপরাসির তলব হইল। ভাগ্যধরের জন্য অন্য গ্লাসে স্যাম্পেন আসিল।

ভাগ্যধর একচুমুক খাইলে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাগ্যি মার্কেটে আমার কি কেহ শত্রু আছে?

ভাগ্যধর। দু বেটা আছে—এক বেটা হরেকিশন—আর এক বেটা ভোলানাথ। ভোলানাথটা উনপঞ্চাশ। আর হরেকিশন দেবলের লোক—খোঁটার জোরে ম্যাড়া লড়চে।

সোমনাথ। তাইত, দেবলা বেটাকে জব্দ কর্ত্তে পারবি নি ?

ভাগ্যধর। পরশু শুনতে পাবেন। আমি আপনার জন্য কি না কচ্চি।

সোমনাথ। ধন্যবাদ।

বেলা ৫টার সময় বৈকালিক চা আসিল। চাএর সঙ্গে যতরকম ক্রিমরোল—আর ভাল ভাল কেক যা কিছু হোতে পারে সব কিছু আসিল। খাইতে বসিলও অনেকগুলি লোক। তার মধ্যে একটি যুবতী মেম সাহেব ছিলেন। চা খাওয়া হোলে সোমনাথ আর মেমটী মোটর গাড়ীতে উঠিয়া হেষ্টিংস বায়োস্কোপের দিকে প্রস্থান করিল।

* * * *

রাত্রি এগারটার সময় বাসায় ফিরিয়া সোমনাথ দেখিল যে সুরূপা একখানি চেয়ারে ঠেস দিয়া মার্ব্বেল টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। চুলগুলি সাদা মার্ব্বেল টেবিলের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে। সোমনাথ সুরূপার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল—তার পায়ের শব্দে সুরূপা জাগিয়া উঠিল।

সুরূপা। চলুন খেতে যাওয়া যাক।

সোমনাথ। আমি ত খেয়ে এসেচি।

সুরূপা। আপনি কি একদিনও রাতে বাটীতে খাবেন না ?

সোমনাথ। মাপ করবেন। আমি রাত্রিতে রোজ বায়স্কোপ দেখে ক্যালুট হোটেলে ডিনার খাবার বন্দোবস্ত করেছে। আপনি আমার জন্যে না খেয়ে আর থাকবেন না। আপনার এ বাটীতে কোন কষ্ট হচ্ছে না ত ?

সুরূপা। একে দাদা এখানে নেই—তার উপর আবার সাহেব পাড়ায় বাড়ী—প্রাণটা হু হু করে—ছিলাম একরকম—সে একটা বাঙ্গালীপাড়ার মনোরম গোলমাল তা আর শুনতে পাইনা—সর্ব্বদা যেন নির্জ্জন কারাবাসের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

সোমনাথ। চলুন না একদিন বায়োস্কোপে যাওয়া যাক।

সুরূপা। আচ্ছা।

সোমনাথ। আপনার সাহেবী হোটেলে খেতে কোন আপত্তি আছে কি ?

সুরূপা। বাবুর্চ্চিদের হাতে ত অনেক খেয়েচি আপত্তি আবার কি ?

সোমনাথ। আচ্ছা আপনি খেয়ে আসুন। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।

সুরূপা। আজ আর রাত্রিতে কোন কথা কেন ? কাল দিনের বেলায় হবে।

সোমনাথ একটু চিন্তিত হোয়ে উত্তর করিল আচ্ছা।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

নারী

উল্লাসে তুমি মধুর হাস্য,
বিষাদে শান্তি বারি ;
সন্তাপে চির সান্ত্বনা তুমি,
কল্যাণময়ী নারী !

মন্দিরে তুমি প্রার্থনা শুভ,
জীবনে আশার ছবি ;
প্রেমের মধুর কবিতা তুমি গো
মানব তোমার কবি।

শ্রীচণ্ডী চরণ ঘোষ।

সন্তবাণী।

(কবীর সাহেবের বচন—'সেবক' সম্বন্ধে)

ব্যাধের বাঁশী শুনে মৃগ যেমন আপনাকে ভুলে যায় তেমনি আপনাকে ভুলে দেহ মন সমর্পণ কর্‌তে পারে এমন সেবক ত দেখ্‌তে পাই না।

* * * *

যে (ভগবানের) সেবায় লেগে থাকে সেই ত সেবক। সেবা না করে কি কেউ প্রকৃত সেবক হতে পারে ?

* * * *

চতুরতায় ভগবান্ প্রসন্ন হন না ; তিনি খুসী হন অন্তরের ভাব দেখে।

* * * *

খাঁটি সেবক দিন রাত তাঁর সেবার্তেই থাকে ; কু-সেবক কখনও সেবার পথে টিকে থাকৃতে পারে না।

* * * *

মনের বাসনা ত্যাগ না কর্‌তে পেরে যে ফলের জন্য সেবা করে সে প্রকৃত সেবক হ'তে পারে না ; সে সেবার বদলে চারগুণ দাম চায়।

* * * *

যে ভগবানের দাস সে নির্ববন্ধন হয়েও (সেবার) বন্ধনযুক্ত আবার বন্ধনযুক্ত হয়েও নির্ববন্ধন ; সে কর্ম্ম করে, কিন্তু আপনাকে কর্ত্তা বলে মনে করে না।

* * * *

'আমি' 'আমার' ত কিছুই নাই, সবই 'তুমি' ও 'তোমার'। তোমার তা তোমাকে (ভগবানকে) দেব তাতে আর আমার দুঃখ কি ?

* * * *

'তোমার কিছুই নাই, সবই আমি ও আমার'—এইরূপ যদি মনে করি তা'হলে আমার তা তোমাকে দিতে প্রাণ ত ছট্‌ফট্ করবেই।

* * * *

ভগবান সবকেই চান, কিন্তু তাঁকে কেউ বড় একটা চায় না। যতদিন দেহের প্রতি আসক্তি ততদিন কি কেউ তাঁর দাস হতে পারে ?

* * * *

যে প্রকৃত দাস সে সুখদুঃখ মাথা পেতে সয়ে যায় ও অন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁরই সেবা করে। হর্ষ ও শোক, সুখ ও দুঃখ তার কাছে সবই সমান।

* * * *

দাসের দুঃখ হ'লে ভগবানেরও দুঃখ ; এক পলক মধ্যে তিনি প্রকাশিত হয়ে তাঁর দাসকে তিনি শান্ত করেন।

* * * *

দাস জানে যে সর্ব্বসমর্থ ভগবানের হাত তার মাথার উপরে। এমন সমর্থ পুরুষের সেবক হ'য়ে তার কি কখনও অকাজ হতে পারে ?—ভাল মন্দ সকল অবস্থাতেই তার মঙ্গল ছাড়া কখনও অমঙ্গল হ'তে পারে না।

* * * *

এক সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। অনেক লোক তাঁর সেবা কর্‌তো। তার মধ্যে একজন সেবক ছিল, সে একটু কাঁচা রকমের। কাঁচা হলেও তার মন্‌টা ছিল খাঁটি। যা মনে হতো সব স্পষ্ট বলে ফেল্‌ত। মহাত্মাজীর সেবা কর্‌তে কর্‌তে তার মনে অনেক রকম খট্‌কা লাগ্‌তো। মহাত্মাজী যে সব কাজ কর্ম্ম কর্‌তেন বা হুকুম দিতেন তার অনেক গুলির কারণ কি বা উদ্দেশ্য কি তা সে বুঝতে পারৃত না। যাকে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তো, কিন্তু সেবকদের মধ্যে কারোও কাছে সদুত্তর না পেয়ে সে বড়ই অস্থির হয়ে পড়্‌তো। দিন রাত তার মনে নানারূপ সংশয় হতো অথচ মহাত্মাজীকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস পেতো না। মহাত্মাজী

তার মনের অবস্থা বেশ জান্‌তেন। এ সেবকটি কাঁচা হলেও প্রকৃত খোজী—তত্ত্বজিজ্ঞাসু। কাজেই তিনি একদিন সেবকটিকে বল্‌লেন, "দ্যাখ্‌ আমি যার কাছে যেতে বল্‌বো, তার কাছে যেতে পার্‌বি? তা'হলে তোর এত খট্‌কা সন্দেহ কিছুই থাক্‌বে না; ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝতে পার্‌বি আর মনে শান্তি ও পাবি।" তখন সেবকটি উত্তর করলো, "হাঁ খুব পারবো। আপ্‌নি যা বল্‌লেন, আমি তাই কর্‌তে রাজি আছি। আপনার কাজ কর্ম্ম দেখে আমার মনে বড়ই গোলমাল হয়, কিন্তু সাহস করে আপনাকে বল্‌তে পারি না।" মহাত্মাজী বল্‌লেন "আচ্ছা কোন চিন্তা নাই, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি সেই সেবকটিকে তাঁহার একজন ভক্তের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই ভক্ত তাঁর একজন গুরু-মুখ শিষ্য—তিনিও মহাত্মাজীর কৃপায় সিদ্ধ। তাঁর কাছে সেই সেবক উপস্থিত হয়ে তার মনের ভাব সমস্ত প্রকাশ করে বল্‌লে, "আপনার গুরুজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন; যাতে মনে শান্তি পাই তার একটা উপায় আপনাকে কর্‌তেই হবে।" তখন সেই ভক্ত বল্‌লেন, "তা বেশ, মনের কপটতা যখন খুলে ফেলেছ তখন কোন ভয় নাই। এখানে ছয় মাস গুরু ভাইদের সৎসঙ্গ কর, আর যা বল্‌বো তাই করে যাবে, কারণ টারণ কিছুই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বে না; ছয় মাস পূর্ণ হলে যা তোমার ইচ্ছা হয় কর্‌বে। দেখ, এ ব্যবস্থায় রাজি আছ?" সেবক তাতেই রাজি হয়ে সে ভক্তের কাছে রয়ে গেল ও তাঁর সঙ্গ কর্‌তে লাগলো। কিছুদিন পর একদিন সেই ভক্ত সেবককে বল্‌লেন, "দেখ কিছু বাঁশ দড়ি, জ্বালানি কাঠ ও একখানি নূতন কাপড় কিনে এনে একটা ঘরে ভাল করে বন্ধ করে রেখে দাও। এই নাও টাকা নিয়ে যাও।" সেবক দ্বিরুক্তি না করে তাই কর্‌লে; কিন্তু কেন তিনি এরূপ আদেশ দিলেন তা না জান্‌তে পেরে তার মনে অনেক তর্ক বিতর্ক উঠলো। তারপর ছয় মাস যায় যায় এমন সময় একদিন সেই ভক্ত বল্‌লেন, "দেখ, আমার ছেলের বে, এই টাকা নাও জিনিষ পত্র যা কিছু সব কিনে ঠিক করে রেখো।" সেবকটি তাই কর্‌লে। শেষে এক পাষণ্ড নাস্তিকের মেয়ের সঙ্গে সেই ভক্ত মহাত্মার ছেলের বে হলো। বিয়েতে খাওয়া, দাওয়া, আমোদ প্রমোদ খুব হলো। কিন্তু বে'র রাত্রিতে বরকনে বাসর ঘরে শুয়ে আছে, এমন সময় একটি সাপ এসে বরকে কাম্‌ড়ালে। বর তৎক্ষণাৎ মরে গেল। বাড়ীতে কান্নাকাটি। তখন সেই ভক্ত মহাত্মা সেবককে বল্‌লেন, দেখ, ঘরে যে বাঁশ দড়ি ও কাপড় আছে বের কর আর এই মৃত দেহটিকে নদীর ধারে নিয়ে পুড়িয়ে এস।" সেবক এই সব ব্যাপার দেখে রেগে আগুণ। সে বল্‌লে "আপনি আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি, গুরুজী আপনার মত লোকের কাছে কেন আমাকে পাঠিয়েছেন বুঝতে পারলুম না। আপনি সব জেনে শুনে এই নিরপরাধ মেয়েটিকে বিধবা করে চিরজীবন দুঃখে ফেল্‌লেন। আপনার এখানে আমি আর মুহূর্ত্ত ও থাক্‌ব না।" এই বলেই সে প্রস্থান কর্‌তে উদ্যত। তখন সে ভক্ত তাকে বল্‌লেন, "থামো, থামো, অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন? তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ছয় মাস চুপ করে থাক্‌বে? কাল তোমার ছয় মাস পূর্ণ হবে, তখন সব জান্‌তে পার্‌বে। এখন আমি যা বল্‌লেম তাই কর।" সেবকটি রাগের মাথায় নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিল,; এখন সে একটু লজ্জিত হয়ে চুপ কর্‌লো, তারপর কয়েকজন গুরু ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মৃত দেহটির সৎকার করে ঘরে ফিরে এল। কিন্তু মনের অবস্থা বড়ই খারাপ; অন্তরে যেন একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরদিন সেবকটি বড়ই বিষণ্ণ মনে এক কোণে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় সেই ভক্ত মহাপুরুষ তাকে কাছে ডেকে একান্তে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "দেখ এ ছেলেটি আমার নয়; ভগবান একে কিছু দিনের জন্য আমার কাছে আমানত রেখেছিলেন। আমানতের মেয়াদও শেষ হলো, আমিও যাঁর ছেলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। আর এই যে মেয়েটি যার জন্য তুমি এত দুঃখ কর্‌ছো—সে সংস্কারী জীব—পূর্বজন্ম হ'তেই ভগবান্‌কে পাবার জন্য অনেক সাধনা করেছিল।

পাষণ্ড বাপের ঘরে থাক্‌লে তার সাধন ভজন হবে না, তাই তার সাধন ভজনের সুবিধার জন্যই তাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ও সেই সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর বাঁধনও কেটে দিলেন।" সেবক এই সব কথা শুনে একবারে অবাক্; তার দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল পড়্‌তে লাগলো। সে এখন বুঝ্‌তে পারলো যে সুখে দুঃখে সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায় মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।

তারপর সে প্রশান্ত মনে গুরুজীর চরণে ফিরে এলো ও তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হলো।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হারানিধি।

(গল্প)

চারিদিকে ছোট বড় শালবনে ঘেরা সবুজ রঙের মাঠ। তার মাঝখানে ঝরঝরে তক্‌তকে ছবিটির মতোই বাঙ্গলা খানি। বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় গৃহস্বামী সুরেন বাঁড়ুয্যে ওরফে এস, এন, ব্যানার্জ্জী হেলান দিয়ে সিগারেট পানে রত। সাম্‌নে টেবিলে মদের বোতল ও ডিক্যাণ্টার। মুখ নিঃসৃত সিগারেটের ধূম কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে উপর দিকে উঠছে, খানিক স্থির হ'য়ে চক্রাকারে ঘুরছে, তারপর তরল হ'য়ে বায়ুভরে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে কোথায় যেন মিশিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখতে দেখতে তাঁর মনে হ'ল যেন সেই ধূমপুঞ্জের মাঝখান থেকে কার একখানি সুন্দর কোমল মুখ ভেসে উঠল। সে যেন কত দিনের আগেকার দেখা কিন্তু যেন চির নূতন। তাই ত! ওই পাতলা ঠোঁটের মধুমাখা হাসি ও আবেগভরা চোখের সোহাগের চাহনি যে তার চিরপরিচিত। মর্ম্মের পরতে পরতে অঙ্কিত; যাকে ভোলবার জন্যে সে আজ এই সুদূর ছোটনাগপুরে জঙ্গলাবৃত প্রান্তরের মাঝে নির্জ্জন কুটিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে; যার স্মৃতির দহনে অস্থির হ'য়ে সে তার নির্ম্মল দেবোপম চরিত্র কলুষিত করেছে, চিরঘৃণ্য সুরাকে প্রধান সুহৃৎ ব'লে আলিঙ্গন করেছে! কই কিছুতেই ত কিছু হ'ল না। সে মুখের ছবি অন্তর থেকে মুছে যাওয়া দূরে থাক দিন দিন সে যে আরও স্পষ্ট ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে তার নয়ন সমক্ষে ভেসে উঠে যেন তার এই বৃথা চেষ্টাকে ব্যঙ্গ ক'রে হেসে নেচে বেড়াচ্ছে। ভগবান কি পাপে তার এই শাস্তি! যাকে পাবার নয়, যাকে চিন্তা করা দূরে থাক্, যার ছায়া স্পর্শ করাও তার পক্ষে মহাপাপ ব'লে যার আশা সে চিরজীবনের মত ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে তার স্মৃতির হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না? এ কি কঠিন শাস্তি দয়াময়!

হঠাৎ নিজেকে সজোরে নাড়া দিয়ে সে টেবিলের উপর থেকে ডিক্যাণ্টারটা নিয়ে নিঃশেষে শূন্য ক'রে ফেললে। পরে নির্ব্বাপিত সিগারেট খণ্ডটির বদলে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলে। আয়ারল্যাণ্ডের ডি, ভেলেরার কার্য্যি, লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা, রুড় অঞ্চলে জার্ম্মানদের প্রতি ফ্রান্সের ব্যবহার, তুরস্কের কামাল পাশার বিবাহের খবর পড়্‌তে পড়্‌তে অলক্ষ্যে কখন যে তার মন সুদূর অতীতের দিকে চলে গিয়েছে তার খেয়ালই ছিল না।

২

সে আজ দশ বৎসরের কথা। কামাল পাশার মতোই সে তার আকাঙ্ক্ষিতা প্রেমাস্পদার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বিবাহের আগে থেকেই পরস্পর প্রতিবেশী তাদের মন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাদের কৈশোরের সে প্রেমে কোনও বাধা ঘটেনি। দুটো বছর কি একটানা সুখের স্রোতের মধ্যেই না তাদের কেটে গেছলো। হাসিখেলা, অফুরন্ত গল্প, আদর সোহাগ, মান অভিমানের মধ্যে কেমন ক'রে যে দিন কেটে যেত তা তারা যেন বুঝ্‌তেই পার্‌ত না। তাদের উভয়ের এই প্রেমের বাঁধন দৃঢ়তর কর্‌বার জন্যেই যেন ভগবান আবার সেই সময় মোহিনীর কোলে একটি খোকা দিলেন।

বিধাতা বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনও কাউকে ভোগ ক'রতে দেন না, তাই খোকার জন্মের পর ছ'মাস না যেতে যেতেই তার পিতা তাকে একরাশ দেনার ওয়ারিশ রেখে পরপারে চ'লে গেলেন। মা অতি শৈশবেই ছেড়ে গেছলেন। মোহিনীর পিতা মাতাও দুই মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। প্রেমের মোহের সোনালী স্বপন কেটে গিয়ে সংসারের কুটিলতা ও নির্ম্মমতার কঠোর মূর্ত্তি তার চোখের সম্মুখে ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে নেচে উঠল সে দিন, যে দিন তার পিতার দেনার দায়ে তাদের কল্‌কাতার বাড়ীখানা মায় আসবাব পত্র শুদ্ধ বিক্রি হ'য়ে গেল, আর সে পথের ভিখারীর মত মোহিনীর হাত ধ'রে, শিশু পুত্রকে কোলে ক'রে, সহরের চিরপরিচিত বাড়ী খানা থেকে বেরিয়ে তার পল্লীগ্রামের জীর্ণ কুটীরে এসে আশ্রয় নিলে।

তারপর একদিন দুঃখের তাড়নায়, বুভুক্ষু শিশু-পুত্রের করুন ক্রন্দনে ব্যথিত হৃদয়ে মোহিনীর শত আপত্তি, অভিমান, চোখের জল অগ্রাহ্য ক'রে এক দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের হস্তে মোহিনীর ও শিশু পুত্রের ভার দিয়ে সে অর্থের সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে আজ সাত বছরের কথা। অদৃষ্ট গুণে সে একজন কণ্ট্রাক্টরের সুনজরে পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে শূন্য বখরাদার হ'য়ে ব্যবসা আরম্ভ ক'রে ছ বছরের মধ্যেই কিছু অর্থের সংস্থান কর্‌লে। এমন সময় তার সহযোগী কণ্ট্রাক্টরের হঠাৎ মৃত্যুতে, সমস্ত বড় বড় কণ্ট্রাক্ট তার হাতে এসে পড়্‌ল। এ কণ্ট্রাক্টগুলি শেষ করতে আরও একটা বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হ'বে। তাহা হইলেই সে একজন বড়লোক হ'য়ে যাবে। তারপর সে কাষ ছেড়ে দেবে, মোহিনীকে আর জীবনে কখনও ছেড়ে যাবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে, অর্থ সঞ্চয় না করে গৃহে ফিরবে না প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে এসেছিল, তাই এই দীর্ঘ ছুই বৎসর সে শত ইচ্ছা সত্বেও বাটীর দিকে মুখ করে নি। মাঝে মাঝে সে যথা সম্ভব টাকা তার আত্মীয়ের নিকট পাঠিয়েছে মাত্র। বাসস্থানের ভালরূপ যোগাড় করতে পারে নিই ব'লে মোহিনীকে কাছেও আনতে পারেনি। মোহিনীকে আর একটা বছর যেমন ক'রে হোক মন বেঁধে থাকতে বারবার ক'রে চিঠি দিয়েছে, নূতন কণ্ট্রাক্ট সমাধা ক'রতে তাকে বোম্বাই আমেদনগর প্রভৃতি নানা সহরে ঘুরে বেড়াতে হ'বে। এখন থেকে সে চিঠি ও টাকা সমানে পাঠাবে কিন্তু মোহিনীর চিঠি দেবার সুবিধে হ'বে না। একটা বছর, তার পরেই বাস্।

তিন বছর কঠিন পরিশ্রমের পর প্রভূত ধনের মালিক এস্, এন, ব্যানার্জ্জী তার পল্লী ভবনে আদরিণী মোহিনী ও শিশুপুত্রকে দেখতে গেল। সঙ্গে খোকার ও মোহিনীর জন্য অসংখ্য গহনা, খেলনা, জামা, কাপড়। কিন্তু হায় যাদের জন্যে এ সব তারা কোথায়? যে আত্মীয়ের উপর তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেছল সে আজ এক বৎসর পূর্ব্বে ইহধাম ত্যাগ ক'রে গেছে। তার কিছুদিন পরেই মোহিনী ও তার ছেলেকে কে একজন চসমাধারী, সাহেবী পোষাকপরা যুবক একদিন হঠাৎ এসে তার জীর্ণ বাড়ী থেকে কোথায় নিয়ে চ'লে গেছে। গ্রামের যে সকল ব্যক্তি তার দুঃসময়ে এক-দিনের জন্যেও তার ছায়া মাড়ায়নি, আজ তারাই শতমুখ হ'য়ে তারই মোহিনীর কুৎসা রটনা ক'রতে ও তার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতে ছুটে এল। ভাঙ্গাঘরের দাওয়াটায় হতভম্বের মত খানিক ব'সে ব'সে সে এই

শ্রুতিকটু বাক্যবানগুলো নীরবে শুনে গেল। তারপর যখন কে একজন সেই গ্রামের হলধর মুখুজ্যের বয়স্থা কন্যার পাণিপীড়ন ক'রে সেই হতভাগীর কথা ভুলে গিয়ে, নূতন সংসার পত্তন ক'রতে উপদেশ দিলে, তখন সে আর সহ্য ক'রতে পারলে না। পরিত্যক্ত ব্যাগটী হাতে তুলে নিয়ে কুলির মাথায় ট্রাঙ্কটি চাপিয়ে দিয়ে সে পাগলের মত সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

তারপর আজ সুদীর্ঘ চার বছর ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরে শেষে ছোটনাগপুরের জঙ্গলের মধ্যে নিভৃতে এই বাঙ্গলাখানি তৈরী ক'রে আজ কয়েক মাস হ'ল বাস ক'রছে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে আজ কিন্তু এক একবার মনে হচ্ছিল যে সে হয়ত ভুল ক'রেছে। কেন সে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে না যে, সে যুবক মোহিনীর কোনও আত্মীয় কি না? হতেও ত পারে। যদি তাই হয়, ভগবান! তবে ত তার পাপের সীমা নেই। না, এ-রকম আত্মীয়ের কথা ত সে কখনও শোনেনি। মোহিনীর পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহার আর পৃথিবীতে সে ছাড়া কেউ আপনার বলতে আছে বলে ত সে জানত না। তবে এ যুবক কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই মোহিনী তাকে ভুলে গেছলো; নিশ্চয়ই মোহিনী তাকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু তাই যদি হবে তবে এত-দিনের চেষ্টাতেও তার মন থেকে সেই কলুষিতার মোহিনীমূর্ত্তি দূর হ'চ্ছে না কেন? সেই হাসি, সেই চাহনি কি পাপিষ্ঠার সম্ভব। না না তার ভুল, মস্ত ভুল। একবার অন্ততঃ মোহিনীর খোঁজ নেওয়া তার উচিত ছিল। হায়, এখন কি আর সন্ধান করলে পাওয়া যাবে?

৩

"এই হো কোন্ ফুল লেতা রে পাকড়ো পাকড়ো।" মালীর চীৎকারে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অভ্যাসমত ডিক্যাণ্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখলে সেটাতে এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নাই। "দূর ছাই আর খাবনা" বলে সে উঠে পড়লো। দূরে দরওয়ানের রুক্ষ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একটি বালকের তেজপূর্ণ সুমিষ্ট স্বর বাতাসে ভেসে এসে তাকে যেন তার অনিচ্ছা সত্বেও ব্যাপার কি দেখবার জন্য সেই দিকে টেনে নিয়ে গেল। একটী নয় দশ বৎসরের বালক। এক হাতে তীর ধনুক, আর এক হাতে দুটি সদ্যজাত গোলাপ ফুল নিয়ে, বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দরওয়ানের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে বালকটি বলে উঠল "হাঁ মশায়, আপনার বাগানে কত ফুল মাটিতে প'ড়ে নষ্ট হচ্ছে, আর পূজোর জন্য দুটো ফুল তুললে আপনার দরওয়ান মারতে আসে। আপনি কিছু বলতে পারেন না।" ন'বছরের বালকের মুখে এমন কথা শোনবার আশা সে করে নি। আর তার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতার দরুণ এতক্ষণ বালকের দিকে সে ভাল ক'রে তাকিয়েও দেখে নি। বালকের ধুলাকাদামাখা শরীরে যেন রূপ উথলে পড়ছে মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখ দুটোতে কি মিষ্টভাব। তার প্রানটা কেমন ক'রে উঠল। কেন কে জানে আজ এই বালকের চোখ দুটো ও পাতলা পাতলা ঠোঁট দুখানি তার মনে এতক্ষণের চেষ্টায় ঝেড়ে ফেলা মুখখানির ছবি আবার যেন জাগিয়ে দিলে।

"ফুলগুলো তবে কি নিয়ে যেতে দেবেন না? কিন্তু আজ যে আর কোথাও ফুল পেলাম না?" বলে, বালকটি কাতর নয়নে তার দিকে চাইলে। তার চমক ভাঙ্গল। "না বাবা, ও ফুল তুমি নিয়ে যাও। আরও যদি দরকার থাকে ত নাও। আমাকে ব'লে নিলেই আর কোনও গোল হ'ত না। "পূজোর জন্যে ফুল নিতে এলেও ব'লে নিতে হয়, তা ত জানতুম না, যাক, এবার থেকে আপনাকে বলেই নোব।"

কতক্ষণ যে বালক চলে গেছে তার হুঁস ছিল না। সেই খানেই তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে কেবলই বারবার এই কথাটাই সে ভাবছিল যে কেন, কোথা হ'তে বালকের চোখে মুখে আর একজনকার সাদৃশ্য এল। তার শিশুপুত্র যদি বেঁচে থাকে তা হলে ত এমনিটিই হয়েছে। কিন্তু এই দূর বন্য দেশে তারাই বা কেমন ক'রে আসবে! অসম্ভব! অসম্ভব! এ কেবল তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের অদ্ভুত খেয়াল মাত্র।

কিন্তু যতই অসম্ভব হোক না কেন, সে দিন সারা দিন রাত্তি কেবল ঘুরে ফিরে ঐ চিন্তাই তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলিলে এবং পরের দিন সকাল থেকেই তার চোখ দুটো খবরের কাগজে নিবিষ্ট না হয়ে কেবলই বাগানের ফটকের দিকে ছুটে যেতে লাগল। এখনি সে আসবে, পূজোর ফুল নিতে। আজ তাকে কাছে ডেকে তার পরিচয় জানতে তার প্রাণটা যেন আকুল হ'য়ে উঠছিল।

তার অল্পক্ষণের অন্যমনস্কতার মাঝখানে বালক যে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে'ছিল তা সে জানতেই পারেনি। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই তাই সে যেন চমকে উঠে ব'লল "এসেছ বাবা, বস বস।"

"না বসব না। আজ দেরী হ'য়ে গেছে মায়ের পূজোর দেরী হ'য়ে যাবে।"

"তোমার মা কি ঠাকুরের পূজো করেন ?"

"ঠিক ঠাকুর নয়, একখানা ফটো। সেটা নাকি আমার বাবার ফটো। মা বলেন তাঁকে পূজো ক'রলে নাকি ঠাকুর পূজোর দরকার হয় না।"

"তোমার বাবার ফটো ? তোমার বাবা তবে কি" ... ... সুরেন বাবুর কথা বাধিয়া গেল। "আমার বাবা অনেক দিন হ'ল চাকরী ক'রতে গেছেন অনেক টাকা না হ'লে তিনি ফিরে আসবেন না। বাবা অনেক টাকা নিয়ে এলে আমাদের কেমন নিজেদের বাগান হ'বে। তখন আর আমায় এতদূর কষ্ট ক'রে ফুল তুলতে আসতে হবে না। ওঃ তখন কি মজাই হবে। ইচ্ছামত কত ফুল তুলব, মালা গাথব হাঃ হাঃ হাঃ।"

জোরে কম্পিত বুকটাকে দুহাতে চেপে ধ'রে সুরেন বাবু জিজ্ঞাসা ক'রলে "আচ্ছা বাবা তোমরা কোথা থাক !"

"কেন—গ্রামে আমার মামার কাছে।"

"তোমাদের বাড়ী নেই ?"

"কেন থাকবে না তবে সেখানে আমরা যাইনা। সেখানের লোকরা নাকি বড় দুষ্টু। মাকে খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন যাই, মা আবার বকবে" বলে ছুটে বালক বাগানের মধ্যে চ'লে গেল।

তাইত একি ! এ যে সব গোলমাল হয়ে গেল। মোহিনীর ত ভাই কেউ ছিল না। আর সে খেতেই বা পাবে না কেন। মাসে মাসে যে সে মোহিনীকে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাত। হা ভগবান ! একটা হতাশার চাপা দীর্ঘশ্বাসে তার বুকটা যেন ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হ'ল। তার উত্তপ্ত মাথাটাকে সজোরে দু হাত দিয়ে চেপে ধ'রে সে অসাড় নিস্পন্দ ভাবে প'ড়ে রইল।

ছোটনাগপুর রেল লাইনের একটি ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ গৃহের দরজায় একটী রমণী গ্রাম্য রাস্তার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে কার আগমন প্রতীক্ষা ক'রছে।

পার্শ্বস্থিত গৃহ মধ্য হতে একটি পুরুষ জিজ্ঞাসা ক'রলে "মোহিনী খোকা এল কি ?"

রমণী "কই দাদা, খোকা ত এখনও এল না।

"এত দেরী ত তার হয় না। একবার দেখবে কি ভাই "

"কোথায় আর যাবে। তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়েছে বোধ হয়. রাস্তার কোনও ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে গিয়েছে।"

"না দাদা, সে ত আমার তেমন ছেলে নয়। সে খেলায় মাতবার ছেলে ত নয় দাদা, দাদা ! শীগ্‌গির বেরিয়ে এস কে একজন লোক খোকাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে আসছে, দেখবে এস।"

"কইরে, কৈরে, কই দেখি" বলিয়া একটি চশমা পরিহিত সুশ্রী পুরুষ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বললে "তাই ত এ ছোকরা দেখছি কার সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছে। ওঃ বেটা কেমন নবাবের মত ঘোড়ায় চড়ে আসছে দেখ, যেন ওরই ঘোড়া, আর ও লোকটা যেন সহিস্। মোহিনী ঘরের ভেতর যা ও কি মোহিনী ! তুই অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস্ ?"

মোহিনী "দাদা, দাদা, ও কে? ও কে? ভগবান, এত দিনে কি মুখ তুলে চাইলে, দাদা! দাদা আমায় ধর, ধর আমি প'ড়ে যাব"—

"এ্যাঁ তাই ত? তুই কি মুচ্ছো গেলি না কি? ওরে ও কে আছিস্ এই………"

সুরেন বাবু খোকাকে নিমেষে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়েই দৌড়ে গিয়ে মোহিনীর নিস্পন্দ দেহটাকে তার দাদার হাত থেকে ছিনিয়ে মাটির ওপর কোলে ক'রে ব'সে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন "মোহিনী! মোহিনী! চেয়ে দেখ' আমি এসেছি। আর আমি তোমায় একলা রেখে কোথাও যাব না মোহিনী, মোহিনী।"

মোহিনী কষ্টে চোখ মেলে ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললে, "আঃ ভগবান, এত দিন পরে! পায়ের ধূলো দাও আমার পূজো আজ সার্থক হ'ল। ভগবান তোমার অসীম দয়া।" সুরেন বাবু "মশায় শীগগির ডাক্তার আনুন, লক্ষ টাকা দেব, আমার সর্ব্বস্ব দেব, আমার মোহিণীকে বাঁচান" বলিয়া শিশুর মত্যো কেঁদে উঠলেন। ভদ্রলোকটি হেসে বললেন "কিছু ভয় নেই ভাই। তুমি কে আমি এখন বুঝতে পেরেছি। ওতে ভয় করবার কিছু নেই। ভেবে ভেবে কাহিল হ'য়েছে তাই এত বড় সুখের বেগটা হঠাৎ সহ্য করতে পারছে না। এখনই ভাল হ'বে। চল এখন ঘরের মধ্যে নিয়ে যাই।

পালঙ্কের উপর মোহিনীকে শোয়াইয়া সুরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "ঠিক বলছ ত ভাই ভয়ের কারণ নেই? জানো আমার টাকার অভাব নেই, আর মোহিনীর জন্যে যা খরচ করতেও আমি কাতর নই।"

ভদ্রলোক "পাগল! তা কি আর জানিনা। কোন ভয় নেই। মোহিনী আমারও বোন ত বটে।"

সুরেন "মাপ করবেন মশায়, আমার মাথার ঠিক নাই। মশায়ের নাম জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক, আমার নাম শ্রীমন্মথকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আমার বাবা আর মোহিনীর বাবা দুই সহোদর, কিন্তু বহুদিন থেকে পৃথক। বাবা এখানে কাঠের ব্যবসা করতেন। দেশে কখনও যেতেনও না, আমাকেও যেতে দিতেন না। মোহিনীর বিয়ের সময় কত ক'রে বাবাকে সাধলুম কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। হঠাৎ একদিন মোহিনীর চিঠি পেলাম যে সে অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। মনটা বড় চঞ্চল হল। বংশের একমাত্র কন্যা সে অন্নাভাবে মরবে। ছুটে গেলুম। তার অবস্থা শুনে গ্রামের লোকের উপর বড্ড রাগ হ'ল। কারও সঙ্গে দেখা না ক'রে মোহিনীকে সেই দিনই সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলুম।"

সুরেন "মোহিনী খেতে পেত না। সে কি? আমি যে তাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতুম।"

মন্মথ "হ্যাঁ, পরে তোমার সন্ধান নিতে বছর দুই আগে একবার দেশে গেছলুম। যেয়ে তোমার ফিরে আসার কথা ও আবার দেশত্যাগের কথা শুনলুম আরও তদন্ত ক'রে জানলুম যে, যার ওপর তুমি মোহিনীর ভার দিয়ে এসেছিল সে আর গ্রামের হলধর মুখুজ্যে দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে তোমার পাঠান টাকা গুলো আত্মসাৎ করত, আর তোমার চিঠিগুলও নষ্ট ক'রে দিত।"

সুরেন "ওঃ কি সর্ব্বনাশ! আমার স্ত্রী পুত্র অনাহারে, আর আমি তখন লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখ্‌ছলুম ওঃ নরাধমগুলোকে জেলে দিলে না।"—এমন সময় মোহিনীর জ্ঞান হতেই সে সুরেনের দুই পা জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল "তুমি এসেছ। সত্যিই তুমি এসেছ! বল এ আমার স্বপ্ন নয়?"

সুরেন "হাঁ মোহিনী সত্যিই এসেছি। কিন্তু যে অপরাধের বোঝা ঘাড়ে করে এসেছি তা কি তুমি ক্ষমা করে এ অভাগাকে আবার পূর্ব্বের মত ভালবাসতে পারবে?"

মোহিনী "তুমি অপরাধী! তোমায় যে দিন অপরাধী ভাবব সে দিন যেন আমার মৃত্যু হয়। এখন বল আমার অপরাধ ক্ষমা করে তুমি আমায় তোমার পায়ের তলায় স্থান দেবে?"

"তোমার অপরাধ? আশ্চর্য্য তোমার আবার অপরাধ কি?"

"আমার অপরাধ নয়। আমার যত দুঃখের, যত কষ্টের হোক, স্বামীর বাস্ত ভিটে যদি আমি কামড়ে থেকে আর কটা মাস কাটাতে পারতুম ত'াহলে আর তোমাকে অমন ক'রে দাগা পেতে হ'ত না। সবই শুনেছি। যে জ্বালায় অস্থির হয়ে তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়িয়েছ তা দাদার মুখে শুনেছি, বল আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রবে?"

"মোহিনী। মোহিনী তোমরা নারীর জাত মানবী না দেবী? অথবা তাই কেন? তোমরা মহা স্বার্থপর জাত, আগে নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে চাও। এখন আমার ক্ষমাটা কি আমায় জোর ক'রে আদায় করে নিতে হবে?" বলে সোহাগ ভরে মোহিনীকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই মন্মথ বাবু ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

খোকা ইতি মধ্যে তার মামার ক্ষুরের বাক্স এনে হাজির। বাক্সটা মায়ের হাতে দিয়ে ব'ললে "মা বাবাকে বল না ঐ দাড়ি গোঁপ গুলো কামিয়ে ফেলতে, তা হলেই বাবার ঠিক সেই ফটোর মত চেহারা হবে।"

সুরেন বাবু ও মোহিনী উভয়েই হেসে উঠলেন। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে সুরেন বাবু বললেন "হুঁ। বাবা শুধু এগুলো কেন, আরও অনেকগুলো জিনিষই ত্যাগ ক'রতে হবে, তবে তোমার মায়ের পূজো করা ফটোর মত হ'ব।"

কৃত্রিম কোপের সহিত মোহিনী বলে উঠল "যাও কি যে বল তার ঠিক নেই।"

শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু।

বাজে কথা।

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য মশক-ব্রিগেড্ আছেন, কুইনাইন আছেন, জারজিন, এজারিন প্রভৃতি অসংখ্য পেটেণ্ট ঔষধরূপ 'জিন' দৈত্য আছেন; তা ছাড়া স্বয়ং লাট ও মন্ত্রী আছেন। কিন্তু কৈ, ম্যালেরিয়া তাড়াতে পার্‌ছেন কৈ? সম্প্রতি আসাম গৌরীপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখ্‌ছেন যে তিনি বেশ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একটি করে কালো তুলসী পাতা খেলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া জ্বর হ'তে পারে না। একটি পাতা কেন, আমরা দশটি করে পাতা খেতে রাজি আছি। 'মাধবী'র পাঠকগণ একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌বেন কি?

* * *

গতবারে কাগজি লেবুর কিছু গুণগান করেছিলেম। কিন্তু আরও কিছু গুণ গাইবার আছে। সকাল বেলা পেটভার, ভুটভাট্ বা বদ্‌হজম বোধ হ'লে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলে একটা লেবুর রস মিশিয়ে খেলে সব ভাল হয়ে যায়। যাঁদের হাতের বা পায়ের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়, তাঁরা যদি নিয়মমত কিছু দিন আঙ্গুলে লেবুর রস ঘসেন তাহ'লে ব্যথা ফোলা কিছুই থাকে না। তাছাড়া লেবুর বিশেষ গুণ এই যে কিছুদিন নিয়মমত লেবুর রস হাতে, পায়ে, গায়ে মুখে লাগালে রং ফর্সা হয় ও চামড়া কোমল হয়ে উঠে।

এ বিষয়টা আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা যেন বেশ করে জেনে রাখুন। সেই সঙ্গে ৺ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "রাঙ্গা বউ দিদি" (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের সুশিক্ষিতা ভার্য্যা শ্রীমতী মোহিনী দেবী) তাঁর শাশুড়ী ঠাকুরাণী সম্বন্ধে যে দুই একটা কথা লিখেছেন তাও শুনে রাখুন:—

"মায়ের মুখনিসৃত অমৃতোপম মধুর কাহিনী আজ ২৮ বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে, তবু মনে হয় যেন কাল শুনিয়াছি। মা সাদরে আমার মুখ তুলিয়া বলিলেন—'কেন, আমার বউমাকে কে বলেছে ফর্সা নয়? আমি এমন যত্ন করব যে তিন দিনে ফর্সা হয়ে যাবে। হিন্দুস্থানী খোট্টা মা ছেলে মেয়ের কি করে যত্ন করতে হয় তাতো জানে না; তাই এমন সব ছেলেমেয়ের রং পুড়ে গেছে।'... এখনকার দিনে সাবানের শ্রাদ্ধ না করিলে লোকে ফর্সা হয় না; আমার কৃষ্ণনগরের মা কিন্তু আমায় হলুদ, সর-ময়দা ও সরষের তেল—এই চারটি জিনিষেই ফর্সা করেছিলেন।"

এখন গায়ে দেবার এত লেবুর রস পাই কোথা? এ কথার মীমাংসা বড় কিছু কঠিন নয়। সরষের তেলের সঙ্গে দুই একটা লেবুর রস মিশিয়ে নিলেই চলবে।

* * *

সেদিন কলকাতায় একজন বড় লোকের ছোট ছেলেটির বড় জ্বর ও তড়্কা হচ্ছিল। বড় সহরের বড় ডাক্তারের ওষুধ ত চল্ছিলই, তবুও তড়্কা বন্ধ হয় না। শেষে বন্ধুদের মধ্যে একজন বল্লেন যে লজ্জাবতী লতার শিকড় ছেলেটির গলায় বেঁধে দিলে তড়্কা সেরে যাবে। কিন্তু কল্কাতার মত লজ্জাহীন সহরে লজ্জাবতী লতা মেলে কোথায়? এখন বিজ্ঞানের টানেই হোক্ বা অল্প বই পড়ে পাশ করার সুবিধার জন্যই হোক, Intermediate Science ক্লাসে আর ছেলে ধরে না; বোধ হয় তাঁদের কাহারও কল্যাণে জান্তে পারা গেল যে ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু লজ্জাবতী লতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা করছেন, তাঁর laboatoryতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তখন একজন সেইখানে ছুটে গিয়ে লজ্জাবতীর শিকড় এনে ছেলেটির গলায় বেঁধে দিলেন। তারপর থেকে তার আর তড়্কা হয় নাই। আমাদের মা লক্ষ্মীরা ছেলের তড়্কা নিয়ে অনেক সময়ে বড় কাতর হয়ে পড়েন; তাঁরা যেন এই সহজ উপায়টি পরীক্ষা করে দেখেন। আজকাল ডাক্তারেরা অনেক দেশী গাছ গাছড়ার গুণ পরীক্ষা করছেন। এই গাছটি Convulsion বা আক্ষেপের ভাল ওষুধ হ'তে পারে কি না একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

* * *

"চিনি খেতে ভালবাসি, কিন্তু চিনি হ'তে চাই নি"—বৈষ্ণব সাধকের এ কথাটি বড়ই ঠিক। সকলেই চিনি খেয়ে থাকেন; কিন্তু চিনি বাইরে লাগালে কি হয় তার খবরটা অনেকে না জান্তেও পারেন। শরীরের কোন জায়গা কেটে গেলে আমরা তখনি রক্ত বন্ধ করবার জন্য চিনি দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেই। উপকার দেখ্তে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সব সময় এরূপ করা ঠিক নয়। বাজারের সাধারণ ময়লা চিনিতে কত ধূলামাটি থাকে তা সকলেই জানেন; তার মধ্যে যে কত কুষ্ঠ রোগীর পদরজ আছে তাই বা কে বল্তে পারে? কাজেই ময়লা চিনিতে বিপরীত ফল ফলে। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ ডাক্তারেরা চিনির বেশ পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা অনেক আহত সৈনিকদের পরিষ্কার ক্ষত কেবল চিনি বেঁধেই ভাল করেছেন, ড্রেসিং ইত্যাদির কিছুই দরকার হয় নাই। দুই তিন দিন অন্তর পটি বদ্লে পরিষ্কার দানাদার চিনি বসিয়ে দিলেই হলো। তাঁরা বলেন রক্ত বন্ধ হবার পর চিনি ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু সাবধান চিনি যেন ময়লা না হয়।

* * *

হিন্দুর সংখ্যা কমে গেছে, আর মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে। বেশ ভাল কথা। কিন্তু যখনই হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তখনই হিন্দুরাই মার খান বেশী। মপ্‌লা মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর যে কি পাশবিক অত্যাচার করলে তা সকলেই জানেন। কাজেই বলশালী হবার বড় দরকার হয়েছে। দুর্ব্বল সবলে কি একতা হয়? যখন বাণ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন সাপ ও মানুষ এক গাছে উঠেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। এখনকার হিন্দুমুসলমানের একতা নাকি অনেকটা এইরূপ ধরণের শুনতে পাই। কথাটা ঠিক কি না জানি না, তবে এটা ভাব্বার বিষয় বটে। একথা কিন্তু ঠিক যে উভয় পক্ষ সমান বলশালী না হ'লে ভালরূপ একতা হতেই পারে না।

হিন্দুরা এতদিনে নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরেছেন; তাই হিন্দু মহাসভায় খুব সাড়া পড়ে গেছে। মালব্যজী বলছেন, পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া খুলতে হবে, এ ত ভাল কথা। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে দুই একটা কথা বলছেন তা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। তিনি বলেন আমাদের স্বাস্থ্যহীনতাই দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। আর এই স্বাস্থ্যহীনতার ছোট বড় অনেক কারণ থাকতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে আমাদের বিলাসিতা ও ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার যে প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের চিনি—যত রকম রাস্তা ও মাঠের ধুলায় পরিপূর্ণ; এত সখের ফাইন ময়দা—তাতে পাথর ও হাড়ের গুঁড়া; আটা—তাতেও জনার, ডাল প্রভৃতি মিশান; দুধে—খানা ডোবার জল ও নানাবিধ বিষাক্ত গাছের ষ্টার্চ্চ (মনেও করবেন না যে দুধওয়ালা আপনার জন্য ভাল জল এনে দেয়;) ঘি—কেবল চর্ব্বি, বাদাম তেল ও কত কি; মাখন—তাতে নানাবিধ কচু; ময়রা দোকানের খাবার না হলে আমাদের এক বেলাও চলে না তার বর্ণনাই নিষ্প্রয়োজন। যাকে সাগু বলেন সেও ক্যাসাভার শিকড়; মোক্তারের খুচরা বার্লি এরারুট অনেক সময়ে জনারের গুঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব খেয়ে কি লোকের দেহ বিষাক্ত না হয়ে পারে? শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন যে তাঁর পিতামহের (৺ভুদেব বাবু) গৃহে বরাবর জেলখানার খাঁটি তেল আসতো।

একদিন হঠাৎ তাঁদের বাড়ী শুদ্ধ প্রায় ৮।১০ জনের ভেদবমি হতে লাগলো। ডাক্তার এসে বল্লেন, "ঠিক এমনি কেস্ আরও কয়েকটি বাড়ীতে হয়েছে; দুটি মেয়ে মারা গেছে। আপনাদের ভাগ্য ভাল যে আপনারা রক্ষা পেলেন। খুব সম্ভব তেলে ভেজাল আছে।" তখন অনুসন্ধানে জানা গেল সেদিন সকালে নূতন চাকরটা দূরে যাওয়ার পরিশ্রম এড়াবার জন্য চুপি চুপি বাজারের তেলই কিনে এনেছিল। এই সব পুরাণো কথা বটে, তা'হলেও আবার নূতন করে বলবার দরকার হয়েছে।

নিষ্কর্ম্মা।

।

যে ফুল ফুটেছিল আজিকে ঝরে গেল,
নিমেষে নিভে গেল প্রদীপ হীন-প্রাণ;
পাখী যে মনোসুখে
কত না আশা বুকে
যে নীড় রচেছিল, হল যে শত খান।

যে মেলা বসেছিল পুলক কোলাহলে,
ভেঙ্গে সে গেল যে গো ব্যথিত আঁখি জলে;
মোহের মরীচিকা
আনিছে বিভীষিকা
আঘাতি বারবার মরমে শত ছলে।

আজিকে যতবার হৃদয়ে বাঁধি বল,
পলকে তার মাঝে কে কাঁদে অবিরল;
পবন নিস্বনে
মুরছি পড়ে তীরে তটিনী চঞ্চল।

নয়ন সম্মুখে যেন গো বারবার,
চকিতে নিভে জল আলোক আলেয়ার;
পরাণ কেন হায়,
তোমার পথ চায়
পিছনে আসে কেন ছায়া সে আঁধিয়ার।

তুমি কি আসিবে গো দিবে কি দরশন,
এ মধু লগনেতে পাব কি পরশন;
তোমারি স্নেহ বুকে
লুটায়ে পড়ি সুখে
জীবনে সব কাজ হবে কি সমাপন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব কি? তিনি আজীবন কি এনে দিয়েছেন আমাদের সামনে? বাল্যকাল আমাদের পার হয়ে গেলে সেই যৌবনের বার্ত্তাটি এসে পৌছল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তার আগে আমরা সকলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ছিলাম ইস্কুলের ছেলে। বঙ্কিম বললেন তোমরা ইস্কুলের ছেলে নও তোমাদের বয়স হয়েছে। যেই তিনি খবর দিলেন সকলে চমকে উঠে পড়লো, বললে আমাদের যৌবন এসেছে। দেশ শুদ্ধ লোককে এই বলানো এবং ভাবানো এইটেই আমার কাছে মনে হয় বঙ্কিমের সকলের চেয়ে বড় কীর্ত্তি। একেই বলে সোনার কাঠি ছোঁওয়ানো। কোন বাহ্য সামগ্রী দেওয়ার চেয়ে বড় দান হচ্চে জাগরণ দান।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর] [নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩৩০।

মগধ।

বুদ্ধদেবের সময়ে বর্ত্তমান পাটনা ও গয়াই মগধ ছিল। তৎকালে মগধে অশীতি সহস্র গ্রাম ছিল। বিম্বিসারের সময়েই মগধ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃহন্তা অজাতশত্রু নিকটবর্ত্তী কৌশল ও বৈশালী রাজ্যদ্বয় জয় করিয়া মগধের বিস্তৃতি সাধন করেন। কথিত হয় যে প্রবল পরাক্রান্ত অজাতশত্রু হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লিচ্ছবিদের যুদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং লিচ্ছবিপতন হইতেই মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়। অমরজল বিলাপিগতে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদার] [বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩০

ভারতের প্রাচীন বিচার পদ্ধতি।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভকালে মিতাক্ষরা শাসিত প্রদেশ সমূহে হিন্দুগণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত নয়টির মধ্যে কোন একটি উপায় অবলম্বনে ফৌজদারী অভিযোগের বিচার হইত ;—

(১) তৈল-পরীক্ষা (২) অগ্নি-পরীক্ষা (৩) জল-পরীক্ষা (৪) বিষ-পরীক্ষা (৫) কোষ-পরীক্ষা (৬) তণ্ডুল-পরীক্ষা (৭) উত্তপ্ত তৈল-পরীক্ষা (৮) উত্তপ্ত লৌহ-পরীক্ষা (৯) মূর্ত্তি-পরীক্ষা।

(১) তৈল-পরীক্ষা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি ও পুরোহিতকে এক দিবস উপবাসী থাকিতে হইত। পরদিবসে গঙ্গাজলে স্নান, হোমাদি যজ্ঞ ও দেবদেবীর পূজার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওজন করা হইত। তৎপরে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ একখানি কাগজে অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দিতেন। কিয়ৎক্ষণপরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ওজন করা হইত। দ্বিতীয়বারের ওজনে সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হইলে দোষী, ওজনে কম হইলে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইত।

(২) অগ্নি-পরীক্ষা।—নয় হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রশস্ত ও অর্দ্ধ হস্ত গভীর খাদ খনন করিয়া পিপল কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা পূরণ করা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি নগ্নপদে উহার উপর দিয়া বেড়াইত। পদতল দগ্ধ হইলে অপরাধী না হইলে নির্দ্দোষী।

(৩) জল-পরীক্ষা।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান

করাইয়া এক ব্রাহ্মণ যষ্টি হস্তে জলে নামিত। তৎপরে একব্যক্তি তিনটি শর নিক্ষেপ করিত। সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যে শর পড়িত তাহা আনিতে লোক প্রেরিত হইত। সেটি উঠাইয়া লইলে আর এক ব্যক্তি শর উঠাইবার জন্য প্রেরিত হইত। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি আনয়নকারী ব্রাহ্মণের যষ্টি বা পদ স্পর্শ করিয়া জলে ডুব দিত। শর ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বে জল হইতে উঠিলেই অপরাধ সাব্যস্থ হইত।

(৪) বিষ পরীক্ষা :—

(ক) হোম যজ্ঞের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া ২॥০ রতি পরিমাণ বিষ নাগ শিকড় অথবা সেঁকো বিষ ৫৪ রতি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইত। শরীরে বিষক্রিয়া দৃষ্ট না হইলেই নির্দ্দোষী অন্যথায় দোষী।

(খ) একটি গোক্ষুর অথবা কেউটিয়া সর্প একটি মৃন্ময় কলসীর মধ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে একটি অঙ্গুরীয় অথবা মুদ্রা নিক্ষিপ্ত হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহাকে হস্ত দ্বারা তুলিতে হইত। তুলিতে গিয়া সর্পদষ্ট হইলে দোষী নতুবা নির্দ্দোষী।

(৫) কোষ পরীক্ষা—দেবদেবীর মূর্ত্তি ধৌত করিয়া সেই জলের তিন কোষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পান করাইলে, চৌদ্দদিবসের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা হইলে দোষী নতুবা নহে।

(৬) তণ্ডুল পরীক্ষা—কতিপয় ব্যক্তিকে চৌর্য্য অপরাধের সন্দেহ স্থলে একটি শালগ্রাম শিলা দ্বারা তণ্ডুল ওজন করিয়া তাহাদিগকে চর্ব্বন করিতে বলা হইত। চর্ব্বিত তণ্ডুল পিপল পত্রে ফেলিলে যে ব্যক্তির মুখ হইতে শুষ্ক চাউল বাহির হইত সেই দোষী।

(৭) উত্তপ্ত তৈল পরীক্ষা—উত্তপ্ত তৈলে হস্ত নিমজ্জিত করিয়া দগ্ধ না হইলে নির্দ্দোষী।

(৮) উত্তপ্ত লৌহ পরীক্ষা—লৌহ নির্ম্মিত বর্ত্তুল অগ্নিতে লাল করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দিলে হস্ত দগ্ধ হইলে দোষী।

(৯) মূর্ত্তি পরীক্ষা—রৌপ্য নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি, লৌহ নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি একটী মৃন্ময় কলসীর মধ্যে রাখিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে না দেখিয়া উহার একটী তুলিতে বলা হইত। রৌপ্যমূর্ত্তি তুলিলে নির্দ্দোষী; লৌহমূর্ত্তি তুলিলেই দোষী।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কালে ইব্রাহিম আলি খাঁ বেনারসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তপ্ত লৌহ বর্ত্তুলের সাহায্যে একটী, উত্তপ্ত তৈল পরীক্ষা দ্বারা আর একটী ফৌজদারী অভিযোগের বিচার করিয়াছিলেন। প্রথমটীতে আসামী নির্দ্দোষী; দ্বিতীয়টিতে আসামী দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ] [প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩০

শকাব্দ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে শক রাজন্য-বর্গ কাটীহার ও উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন এবং ইহাঁরাই এই যুগের প্রচলন করেন। এই সমুদয় নৃপতিগণ তাঁহাদের মুদ্রায় শকাব্দ ব্যবহার করিতেন এবং মুদ্রাগুলিও বহু পুরাতন। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শকাব্দ শকরাজবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রচর্লিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ও মুদ্রাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় যে ৭৮ খৃষ্টাব্দে অথবা ঐ সময়ের দুই এক বৎসর পূর্ব্বেই শকাব্দের উৎপত্তি হয়। বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক শকাব্দ স্থাপিত হওয়া মতটি গ্রাহ্য হইতে পারেনা।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ] [যমুনা, ভাদ্র, ১৩৩০।
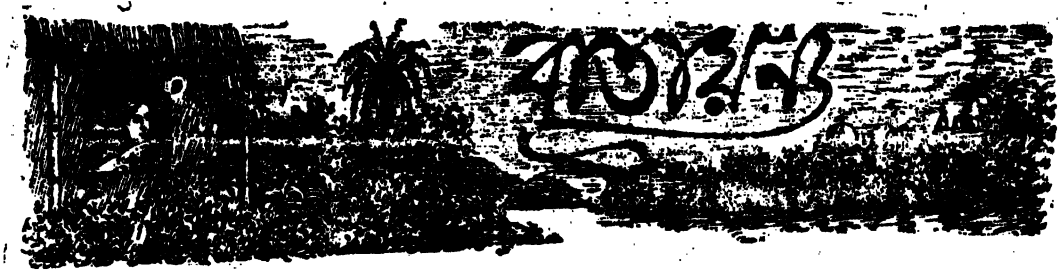
পারিবারিক জীবনে ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যা মানব জীবনমার্গের পরিচালিকা। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, জীবনের প্রত্যেক বৃত্তিতে ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের সমীপবর্ত্তিনী—এই তথ্যের মধ্যে জীবন পরিচালনা তত্ত্বরূপে ব্রহ্মবিদ্যার তাৎপর্য্য নিহিত আছে। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল যে জীবনের দুরূহ প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত, তাহা নহে—প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ বিষয় গুলিরও সম্বন্ধে কতকগুলি সার্ব্বজনীন ভাস্বর সত্য প্রকাশিত করিয়া আমাদের সকল সন্দেহ, সকল ভ্রান্তি অপনোদন করেন। মানব ব্রহ্মবিদ্যার মৌলিক তথ্যগুলি যদি একবার মনে মনেও ধারণা করে, তাহা হইলেও সে গুলি তাহাকে আর কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ক্রমোন্নতির সত্যগুলি যেমন প্রকৃতির প্রত্যেক গ্রন্থনের সহিত অনুস্যূত, এই তথ্যগুলিও সেইরূপ মানব জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থনের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে অনুস্যূত। মানব সে গুলিকে না মানিয়া চলিতে পারে, কিন্তু সে কখনও তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। সে গুলি তাহার কি পারিবারিক জীবনে, কি শিক্ষক জীবনে, কি ব্যবসায়ী জীবনে, কি আমোদ-আহ্লাদে, কি শিল্পে, কি বিজ্ঞানে—সকল অবস্থায় তাহার পদচিহ্নের অনুধাবন করিতেছে; সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহার সকলেরই তৎক্ষণাৎ একটা অর্থ করিয়া লয়।

মানবজীবন সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা আমাদিগকে তিনটী চির সত্য শিক্ষা দেন। তাহা এই :—

(১) মানব অমর আত্মা। যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া সে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

(২) ক্রমোন্নতি ঈশ্বরের সংকল্প। সেই সংকল্পের সহকারিতায় কার্য্য করিতে শিখিলে, আত্মার বিকাশ সাধিত হয়।

(৩) কিরূপে তাহার স্বজাতীয়কে সাহায্য করিতে হয়, তাহা প্রথমে শিক্ষা করিলে, মানব সেই ঐশ সংকল্পের সহকারিতায় কার্য্য করিতে শিক্ষা করে।

প্রথম সত্যটী আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, মানব দেহ নহে—আত্মা। দেহ আত্মার উপাধি মাত্র। যখন এই দেহ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযোগী হয়, তখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন। এই দেহ পরিত্যাগ ব্যাপারকে আমরা মৃত্যু বলি। ইহা আরও শিক্ষা দেয় যে, মানব পুনর্জন্মশীল; মানব পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে ও তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানে, শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে গরীয়ান হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় সত্যটী শিক্ষা দেয় যে, জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম—নিদিধ্যাসন নহে; মানব জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করিতে হইবে, যেন তাহা ক্রমোন্নতির—ঐশ সংকল্পের—সুসঙ্গত রূপে উপযোগী হয়। মানব যতই ঐশ সংকল্পের অনুসন্ধানে কার্য্য করে, ততই সে সুখী, বিজ্ঞ ও মহীয়ান হইয়া উঠে।

তৃতীয় সত্যটী শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মানব তাহার স্বজাতীয়গণের সহিত অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ; তাহাদের সহিত তাহার ও তাহার সহিত তাহাদের উন্নতি ও পতন সাধিত হয়। মানব বিশ্ব জীবনের একটী অংশ; কাজেই সে যখন সমষ্টির সাহায্য করে, তখন সে

বাস্তবিকই নিজেরই সাহায্য করে। সুতরাং স্বজাতি প্রেম ও উচ্চতর জন্য ঐক্যবিত্ত আত্মার বিকাশ সাধনের পক্ষে অতি আবশ্যকীয় গুণ।

উপরোক্ত মৌলিক সত্য তিনটী জীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রযোজ্য ও যিনি তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার্থী। এখন দেখা যাক্, মানবের পারিবারিক জীবনে এই সত্য তিনটী কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

"পরিবার" বলিলে কি বুঝায়? "পরিবার" শব্দ 'বৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'বৃ' ধাতুর অর্থ 'আবরণ করা'। সুতরাং 'পরিবার' বলিলে যাহারা পরস্পরকে আবরণ করে, তাহাদিগকে বুঝায়। মাতা পিতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্রকন্যা, দাসদাসী প্রভৃতি পোষ্যবর্গ দ্বারা আবৃত বা পরিবেষ্টিত বলিয়াই পরিবারের নাম পরিবার। সুতরাং পরিবার একটী মিলনক্ষেত্র—যেখানে কতকগুলি আত্মা মিলিত হইয়া পূর্ণত্ব লাভের জন্য পরস্পরের সাহায্য করে। পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তিই "হঠাৎ" আসিয়া মিলিত হয় নাই। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, প্রভু ও ভৃত্য, অতিথি ও অভ্যাগত, এমন কি গৃহপালিত পশুগুলি পর্য্যন্তও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রত্যেককে পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে ও প্রত্যেককে পরস্পরের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ঐশ সংকল্পের মধ্যে "হঠাৎ" বলিয়া কিছু নাই—কিছু হইতে পারে না। পরিবারের মধ্যে যাতায়াতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সেই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সাহায্য ও উন্নতির জন্য কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে কমবেশী কিছুকালের জন্য অভিনেতারূপে সেই পরিবার মধ্যে বাস করেন। সেই পরিবার মধ্যে অভিনয় করিবার তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা আছে ও তাহার সামর্থ্যের পূর্ণতা অনুসারে সেই ভূমিকার অভিনয় করিলে আত্মারূপে তাহার বিকাশ সাধিত হয়। পরিবার—গৃহ—একটী বিকাশের স্থান। সেই পরিবারই আদর্শ পরিবার, যেখানে পরিবারস্থ সকল ব্যক্তি আপনা ভুলিয়া লক্ষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য পরস্পরের সাহায্য করে।

পারিবারিক জীবনের আবার কয়েকটী বিভাগ আছে। এবং প্রত্যেক বিভাগই পূর্ব্বকথিত তিনটী সত্য দ্বারা নিয়মিত। মাতাপিতা ও শিশু, স্বামী ও স্ত্রী, প্রভু ও ভৃত্য, প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা কি বলেন?

প্রথমে মাতাপিতা ও শিশুর সম্পর্কই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। শিশুর দুইটী প্রকৃতি আছে—একটী আত্মারূপে, অপরটী দেহরূপে। পিতামাতা দেহটী সংগ্রহ করিয়া দেন মাত্র। আত্মা দেহ সাহায্যে উন্নতি লাভ করিবার আশা করেন; তাই আত্মা শিশুর দেহে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনভাবে কিছুকাল বাস করেন ও দেহের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। কেবল দেহের হিসাবে মাতাপিতা তাহাদের শিশু অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, কিন্তু আত্মা হিসাবে অনেক সময় শিশু পিতামাতার সমান, এমন কি কখন কখন তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, পারদর্শী ও উন্নত।

সুতরাং শিশু পিতামাতার অধিকৃত সম্পত্তি নয়। শৈশবকালে ও যতদিন না শিশু স্বয়ং স্বীয় দেহ পরিচালিত করিতে পারে, ততদিনের জন্য মাতাপিতা তাহার দেহের অভিভাবক মাত্র। আমাদের সুপ্রচলিত "আমার ছেলে" কথাটী একটী সহযোগী আত্মার ক্রমোন্নতির সহায়তাসূচক অর্থ প্রকাশ ভিন্ন শিশুর ভাগ্যের উপর কোন অধিকার বা স্বত্ব স্থাপন করিতে পারে না। স্বজাতীয় মানবের সাহায্য করিতে শিখিয়া মাতাপিতা যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন একটী স্বজাতীয়কে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য—শিশুরূপে সে তাহাদের নিকট প্রেরিত হয়।

আত্মার উদ্দেশ্য সাধন জন্য দেহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সাহায্য করাই শিশুর শৈশবাবস্থায় পিতামাতার কর্ত্তব্য। অতীত জীবন সমূহের অনেক অভিজ্ঞতা লইয়া আত্মা শিশুরূপে আগমন করিয়াছে ও সুদূর ভবিষ্যতের সুবিরাট কর্ম্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে। তাই সে একটী বিশেষ পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, কারণ সে সেই পরিবারেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযুক্ত ও তাহার বিকাশের জন্য সেই জন্মের

যে অভিজ্ঞতার আবশ্যক, তাহা সে সেই পরিবারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শিশুকে সাহায্য করা মাতাপিতার কর্ত্তব্য।

এতদর্থে শিশু যাহাতে স্বাস্থ্যবান ও নিরাময় থাকে, মাতাপিতাকে অগ্রে তাহাই করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য মাতাপিতাকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিধিগুলি পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। তাহার পর যে প্রকার কামপৃক্ত ও মানসিক বেষ্টনী মধ্যে স্থাপিত হইলে তাহার সাহায্য হইতে পারে, তাহার বেষ্টনীটাকে সেই প্রকার কামপৃক্ত ও মানসিক উপাদানে পূর্ণ রাখিতে হইবে। শিশুর আত্মা পূর্ণ নহে—অতীত জীবনে সে ঋষি তুল্য থাকে নাই। হয় ত আমাদেরই মত ভাল মন্দে মিশান ছিল। কতকগুলি প্রবৃত্তি ভাল ছিল, কতকগুলি প্রবৃত্তি মন্দ ছিল। নূতন জন্মগ্রহণ করিবার সময় অতীত জন্মের সেই সকল ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার প্রকৃতির কতকগুলি বীজ লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শিশুর বাল্যকালে তাহার স্মৃতিতে মাতাপিতা কেবল ভাল ও সহায়ক অভিজ্ঞতা গুলির প্রত্যানয়ন ও মন্দ এবং বাধাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলির প্রত্যাহার করিয়া শিশুর বিকাশের সাহায্য করিতে পারেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, আত্মা নিজেই নিজের কার্য্য দ্বারা মন্দ প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে। কিন্তু অপরে তাহার জন্য তাহা সহজসাধ্য করিতে পারেন, বিশেষতঃ শৈশব অবস্থায় শিশু যখন নব জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে।

সুতরাং মনোভাব ও চিন্তার অদৃশ্য শক্তি কিরূপে শিশুর গমনীয় সূক্ষ্ম দেহের—প্রাণময় কোষ মনোময় কোষের—উপর কার্য্য করে, তাহা প্রত্যেক মাতাপিতাকে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কিরূপে ক্রোধ, দ্বেষ ও হিংসার চিন্তা—তা তাহারা বাহ্যিক হউক বা আন্তরিকই হউক—শিশুর পূর্ব্ব জন্মের আনীত ক্রোধ, দ্বেষ ও হিংসার সুপ্ত বীজ গুলিকে জল দান করিয়া অঙ্কুরিত করে, আবার কিরূপেই বা ভালবাসা, স্নেহ ও সহানুভূতির চিন্তা শিশুর ঐ সকল অসৎ বীজ গুলিকে শুষ্ক করিয়া সব বীজগুলিকে পুষ্ট করে, তাহা বুঝিতে হইবে। মাতাপিতা যদি স্বয়ং অসৎ মনোভাব ও চিন্তার পোষণ না করিয়া বিশুদ্ধ মনোভাব ও চিন্তার পোষণ করেন, তাহা হইলে শিশু—যাহার মধ্যে তাহার গত জন্মের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি বীজগুলি সুপ্তভাবে বিদ্যমান আছে—মন্দ না হইয়া সৎ জীবন লাভ করিতে পারিবে।

তাহা হইলে শিশুকে সৎস্বভাবাপন্ন করিবার জন্য তাহার পরিবেষ্টনীটা বেশ সৎ, বিশুদ্ধ মনোভাব ও চিন্তায় পূর্ণ রাখিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিশু যদি সৎ হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহা মাতাপিতার দোষে নহে। তখন বুঝিতে হইবে যে, শিশুর মধ্যে তাহার পূর্ব্ব জন্মের যে অসতের বীজগুলি নিহিত আছে, তাহারা এত প্রবল যে, শিশু সেগুলিকে দমন করিতে পারে না। এমত অবস্থায় মাতাপিতা তাহাকে সৎভাবে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিবেন; কিন্তু শিশু যদি পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে সে অবশ্য তাহার অভীপ্সিত পথে গমন করিবে। অসৎ স্বভাব হেতু পরিণামে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ও তৎসহ তাহার নানা প্রকার ভুল বুঝিতে পারিয়া ক্রমশঃ সে শিক্ষা লাভ করিবে। যদি মাতাপিতা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে ঐশ সংকল্প তাহাদের নিকট যাহা প্রত্যাশা করেন তাহারা তাহাই করিয়াছেন। তাহারা কোন আত্মার স্বভাব গঠন বা ভগ্ন করিতে পারেন না, কারণ আত্মাকে নিজে চেষ্টা করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে। যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মার কেবল একটী জন্ম নয় যে ইহার মধ্যেই তাহার সমস্ত দোষ সংশোধন করিতে হইবে—পরন্তু তাহার ভাবী এমন অনেক জন্ম আছে যাহাদের মধ্যে তাহার দোষ গুলি সংশোধিত হইবে, তখন আমাদের দুঃখের কোন কারণ থাকিতে পারে না, যতদিন না শিশু চরমে পূর্ণ শক্তিশালী ও পুণ্যশীল হয়, ততদিন তাহাকে সেই উদ্দেশ্যের সাধন জন্য তাহার যতগুলি সুযোগ আবশ্যক, ঐশ সংকল্প ততদিন তাহাকে ততগুলি সুযোগই দান করেন। সুতরাং পিতামাতা যদি তাঁহাদের শিশুর জন্য

সাধ্যমত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও শিশুকে ভাল করিতে না পারেন, তাহা হইলে মাতাপিতার নিজেদিগকে দোষী মনে করা উচিত নয়। কারণ তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের শিশু সৎগুণের আদর্শে সাড়া দিতে পারে না। ঐশ সংকল্প শিশুকে যে সকল সুযোগ দিয়াছিলেন, শিশু তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে—কিন্তু পরিণামে যদিও দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া সে শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলেও ঐশ সংকল্প পুনরায় তাহাকে নানা প্রকার সুযোগ দান করেন—তা' সে সে সব গ্রহণ করুক বা না করুক। এমন অবস্থায় মাতা পিতা সন্তানের অকৃতকার্য্যতার জন্য শিশুর বিষয় চিন্তা করিবেন না, কারণ তাহাতে শিশুর দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; বরং তাহাকে সবল করিবার জন্য তাহার আত্মার অসীম শক্তিশালিতার বিষয় দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবেন।

কিরূপে শিশুগণকে অসৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সত্যে অনুরক্ত করিতে পারা যায়, ইহা শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত একটী গুরুতর প্রশ্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শারীরিক দণ্ড প্রদান শিশুশিক্ষার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিশুশিক্ষা যখন মাতাপিতার একটী কর্ত্তব্য, তখন তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। শিশুর শিক্ষার জন্য যে দৈহিক দণ্ডপ্রদান আবশ্যক—এই যুক্তি সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃত পক্ষে প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক শিশুই সৎ, কারণ আত্মা কখনও অসৎ হইতে পারেন না। তিনি সতত সৎ ও নিষ্কলঙ্ক। তবে যে আমরা নরজগতে অনেক শিশু বা মানবকে অসৎ, বদমায়েস বা পাপী দেখি, তাহার কারণ ঐ আত্মা এখনও ঐ সকল অসতের বিপরীত গুণগুলির বিকাশ সাধন করিতে পারে নাই, তাহার সূক্ষ্ম উপাদানগুলি এখনও উপযুক্তভাবে বিকশিত হয় নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদেহ অতিশয় পাশব প্রকৃতি সম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে আত্মার প্রকৃতি কিছু থাকে না—তখন আত্মার প্রকৃতি পাশব প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ শিশুর কার্য্যকারিতার আত্মার সহিত কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না বলিলেই হয়। কিন্তু যে পানাহার করে বা ক্রন্দন করে, সে শিশুর আত্মা নয়; বা তাহার আত্মা যে খিটখিটে, একগুঁয়ে, তাহাও নয়; অথবা খেলা না পাইয়া যে খুসী হয়, কাতুকুতু দিলে যে হাস্য করে, তাহাও শিশুর আত্মা নয়। ইহা শিশুর পাশব প্রকৃতি। এই পাশব প্রকৃতিকে সকল সময় সংযত করিবার জন্য বাস্তবিক পক্ষে চেষ্টার আবশ্যক হয় না। কিন্তু শারীরিক দণ্ডাদি দ্বারা কোন প্রকার বাহ্য চাপ প্রদান করিলে অভীপ্সিত ফল লাভ করিলেও, শিশুর উপাধিগুলি এমন স্থূল উপাদানবিশিষ্ট হইয়া পড়ে যে, উচ্চতর জগত হইতে আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি আগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

শিশুর উচ্চতর প্রকৃতি—যাহা প্রচ্ছন্ন মনোভাব ও চিন্তা দ্বারা প্রকাশিত হয়—শৈশব অবস্থায় অতিশয় অনুভূতিপরায়ণ থাকে। সেই সময় যথোচিত চেষ্টা করিলে শিশু উত্তর কালে উত্তম বাসনা, প্রকৃতি ও সহজ মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। সকল প্রকার রূঢ় ব্যবহার স্থূলদেহের অপরিপক্কতা অস্থায়ী ভাবে যতই দমন করুক না কেন, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম দেহগুলির উপাদানগুলি স্থূলীভূত হইয়া পড়ে। এবং এই প্রকার পৌনঃপুনিক রূঢ় ব্যবহার দ্বারা সূক্ষ্মদেহের স্থূল উপাদানের ভাগ খুবই বেশী হয় ও তখন উচ্চতর অনুভূতি পরায়ণতা—যাহা মানবজাতির প্রকৃতিগত ধর্ম্মরূপে প্রত্যেক নরনারী মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকা উচিত—তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে মানব অহঙ্কার করিয়া বলেন যে, শৈশবকালে শাসন ও দণ্ডভোগ করিয়া তিনি সৎ হইয়াছিলেন, হায়! তিনি বুঝেন না যে, তাহার নমনীয় শিশুদেহের বিকাশের ভার শৈশব কালে যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা যদি দণ্ডদ্বারা তাঁহাকে শিক্ষিত না করিয়া প্রাকৃতিক বিধি দ্বারা শিক্ষা দান করিতেন, তাহা হইলে তিনি আরও সৎ হইতে পারিতেন।

যখন মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ বুঝিবেন যে, মানবজীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাগুলি কয়েক বর্ষ পরিমিত এক

জীবনাবকাশ মধ্যে কখনও অর্জ্জিত হইতে পারে না; যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, প্রত্যেক আত্মার সম্মুখে তাহার বিকাশের নিত্যতা বিদ্যমান আছে; যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, প্রত্যেক আত্মার জীবনকাল মধ্যে নিজের পরীক্ষা সহকারে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে (যতদিন সে অপরের বিকাশের বাধা উৎপাদন না করে); যখন তাঁহারা আরও বুঝিবেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের জন্ম নিজে দায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তি কেবল তাহার স্বজাতীয় মানব ও ভ্রাতৃরূপে তাহার জন্য দায়ী, তখন শিশুর শিক্ষার ও শিশুর মঙ্গলের এই সকল গুরুতর বিষয়ের উপর তাঁহাদের সাবহিত দৃষ্টি পড়িবে এবং তখন এমন সুব্যবস্থিত শিশু শিক্ষা প্রথা প্রচলিত হইবে যে, তাহা শিশুর পাশব প্রকৃতিকে সংযত করিবে, অথচ তাহার উচ্চতর প্রকৃতিকে এখনকারের মত নষ্ট করিবে না।

শিশুর সহিত মাতাপিতার সম্পর্ক কি ও শিশুর প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য কি, তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা কি বলেন দেখিব।

ব্রহ্মবিদ্যা বলেন যে, পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রী যে সকল দায়িত্ব বা সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার উভয়ের জন্য তাঁহারা উভয়ে সমভাবে দায়ী। অলঙ্ঘনীয় কর্ম্মবিধি অনুসারে তাঁহারা একই পরিবার মধ্যে একত্র আনীত হইয়াছেন। এই জন্মেই যে তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীরূপে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহা নহে—পূর্ব্বে অনেকবার নানাপ্রকার সম্পর্কসূত্রে পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল ও হয়ত এখনও ভবিষ্যতে হইবে। তাঁহাদের অতীত জীবনের দেখা সাক্ষাতের ফলে এমন একটী অচ্ছেদ্য কর্ম্মসূত্র রচিত হইয়াছে যে, যাহা তাঁহাদিগকে একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। কেবল তাঁহারাই যে এইরূপ উভয়ে কর্ম্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাও নহে—তাঁহারা উভয়ে এমন কতক-গুলি আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্মসূত্র রচনা করিয়াছেন যে, সেই সকল আত্মা তাঁহাদের পুত্রকন্যাদি পোষ্য ও আত্মীয়রূপে তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়াছে বা ভবিষ্যতে করিবে। এই কর্ম্মই দুইটী আত্মাকে স্বামী স্ত্রীরূপে একত্র আনয়ন করেন।

এই কর্ম্ম সাধারণতঃ স্নেহ ও সহানুভূতির মুকুল সহ তাহাদিগকে একত্রে আনয়ন করেন। সেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনই আদর্শ মিলন—যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু এমনও ঘটে যে, দুইটী আত্মা একত্র আনীত হইবার পর, তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে অশান্তি ও মনোমালিন্য উৎপন্ন করে। এই উভয় স্থলেই ইহাই ঐশ সংকল্প যে, তাঁহারা পরস্পরকে তাঁহাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে জানিয়া তাঁহাদের সেই সাধারণ কর্ম্মের অনুসন্ধান করুক—যে কর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে সেই সুবিরাট ঐশ্বরিক কর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আত্মা সকল প্রেমের মধ্য দিয়াই পরস্পরকে বুঝিতে পারে; কিন্তু যেখানে তাহারা প্রেমের মধ্য দিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করে না, সেখানে বিদ্বেষের মধ্য দিয়া পরস্পরকে বুঝিবার ও জানিবার জন্য ঐশ বিধি তাহাদিগকে বাধ্য করেন। কারণ বিদ্বেষ প্রথমে অনুসরণ করিয়া বিচ্ছেদ আনয়ন করিলেও অন্তিমে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের মিলন করে; [illegible] স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যতীত [illegible] সকল রহস্য বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই এই রহস্য বুঝিবার পক্ষে একটী বিশিষ্ট পন্থা রূপে নির্দ্দিষ্ট। এই সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্কে অপরের ও নিজের আত্মাকে জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে পুরুষ বা যে স্ত্রী কর্ম্ম কর্ত্তৃক এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সৎ ব্যবহার করে, সে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া সেই "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষান্তরাত্মাকে" জানিতে সত্বর সমর্থ হয়।

পারিবারিক জীবনের অন্তর্নিহিত এই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যটী একবার বুঝিতে পারিলে, পারিবারিক দায়িত্ব ও সুবিধাগুলি নব আলোকে প্রকাশিত হইবে; গার্হস্থ্য জীবনের তুচ্ছ কর্ত্তব্যগুলি নিত্যতার স্বচ্ছ আলোকে

উদ্ভাসিত হইবে। পুত্র লাভ বা পুত্র নাশ, সন্তান পালন ও শিক্ষার জন্য পরিশ্রম ও উদ্বেগ, সন্তান মাতাপিতাকে যে সকল সুখ বা দুঃখ দেয়—এ সকল অভিজ্ঞতাই সেই সুমহান আবিষ্কারের—সেই অন্তরাত্মাকে খুঁজিবার—পন্থা। পরিবার বা গৃহ পথিকগণের কেবল মিলন ক্ষেত্র নয়—যেখানে পথিকগণ কয়েক বৎসর একত্র বসবাস করিয়া নিত্যতার মধ্যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে। ইহা একটী রঙ্গালয় বা কনসার্ট প্রাঙ্গন—যেখানে কতকগুলি আত্মা স্ব স্ব কর্ম্মসূত্র অনুসারে একত্র সমবেত হইয়া ভগবান ও মানবের প্রীতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব ভূমিকা গৌরবের সহিত সুন্দরভাবে ভবিষ্যতে অভিনয় করিবার জন্য এখন মহালা দিতেছে।

তারপর পারিবারিক জীবনে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক বড় সামান্য সম্পর্ক নয়—প্রভু ভৃত্যের মধ্যে ভৃত্য প্রভু অপেক্ষা কম উন্নত। তাই সে উন্নত আত্মার সাহচর্য্যে নিজে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে—এই জন্যই সে পরিবার মধ্যে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ভৃত্য নিযুক্ত করিতে পারি, কিন্তু আমাদের নিকট তাহার আগমন "আকস্মিক ব্যাপার" নয়। আমরা তাহাকে বেতন দিই বটে, কিন্তু সেই বেতনের সহিত আমাদের "কর্ম্ম বন্ধন" কখনও শেষ হইতে পারে না। ভৃত্য প্রভুর সহযোগী আত্মার (brother soul); সাধারণতঃ সে প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু এই মহান্ সত্যকে অর্থ ঘটিত সম্বন্ধ দ্বারা কদাপি খর্ব্ব করিতে দেওয়া উচিত নয়।

জীবনের উচ্চতর আদর্শ সত্বর দেখিতে পাইবার জন্য ভৃত্য আমাদের নিকট আগমন করে। কিন্তু যদি সে এইরূপে আনীত না হইত, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বা সাধারণ উপায়ে ঐ সকল আদর্শ দেখিবার জন্য তাহার অনেক দেরী হইত। পরিচ্ছন্নতা, সুবিন্যাস, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, বদান্যতা, সৌজন্য, সরল ব্যবহার ও সদনুশীলন—এই সকল সদাচারের লক্ষণ। প্রভুকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার—তাহার তথাকথিত চাকরের—সম্মুখে এই সকল গুণগুলি প্রদর্শন করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমরা তাহার নিকট আমাদের এই সকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিব, তখন তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ সে আমাদের কনিষ্ঠভ্রাতা কার্য্য সম্পাদনের ধরজা। স্বেচ্ছাপ্রসূত সহকারিতার মধ্য দিয়া যখন আমরা আমাদের ভৃত্যের সৎবৃত্তিগুলি পরিস্ফুটিত করি, তখন আমাদের প্রভু স্বরূপে সহিষ্ণু ও বিবেচক হওয়া উচিত। ভৃত্য স্বরূপে এমন কতকগুলি সৎবৃত্তি শিক্ষা করিতে পারা যায়, যাহা ভাবী উচ্চতর জীবনের মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমাদের মধ্যে যাহারা প্রভু, যাহারা এই সকল সৎবৃত্তি এখনও অর্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে সেই সকল বৃত্তি অর্জ্জন করিবার জন্য ভৃত্যরূপে পৃথিবীতে পুনরাগমন করা আবশ্যক হইবে, কারণ :—

প্রভুভক্তি, সদাচার গুণে ক্রীতদাস
জনমিতে পারে পুনঃ রাজপুত্র হ'য়ে;
কৃতাকৃত কর্ম্মফলে পুনঃ নরপতি
জনম লভয়ে হায়! ভিখারীর গেহে।

এখন গৃহপালিত পশুগণের সহিত সম্পর্কটা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গৃহপালিত প্রাণীগুলিকে আমরা পরিবারের নগণ্য সভ্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাও ততদূর নগণ্য নয়—তাহারাও পরিবারের একটী অঙ্গ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতোঃ সনাতনঃ।"

সুতরাং মানব মধ্যে যে ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যেও সেই ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। তবে ক্রমোন্নতির নিম্নতর সোপানে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অপেক্ষা ঈষৎ অনুন্নত কিন্তু তাহাদিগকে মানবের সহবাসে উন্নত হইতে হইবে। তাহাদের পাশব প্রকৃতিকে দ্রবীভূত করিয়া তাহাদের মধ্যে মানবীয় চিন্তা, অনুরাগ ও স্নেহাদি বৃত্তি প্রোথিত করা মানুষের কর্ত্তব্য। শুধু তাহাদের ভোগের সুব্যবস্থা করিলে হইবে না। তাহারা যখন আমাদের সেবায় তাহাদের শক্তি নিয়োগ করে, তখন তাহাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশের জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়া

কর্ত্তব্য। কারণ তাহারাও এক দিন মনুষ্যরূপে অবশ্য পরিণত হইবে। যখন আমরা শিক্ষা দিয়া কোন কুকুরের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করি, তখন শিকার, জীবহিংসা প্রভৃতি জঘন্য কর্ম্মের জন্য তাহাদের পাশব বৃত্তির শিক্ষা দান করিয়া তাহাদের উন্নতির হন্তারক হওয়া উচিত নয়। কোন গৃহপালিত বিড়াল অবশ্য ইন্দুর শিকারী হইতে পারে; কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে ভগবান তাহাকে মানব পরিবার মধ্যে পরিচালিত করেন নাই। যখন আমরা কোন ঘোড়াকে শিক্ষিত করি, তখন আমাদের আত্মসুখকর ঘোড়দৌড় বা শিকারের উদ্দেশ্যে তাহার ক্রূরতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাদান করা উচিত নয়। সে আমাদের যে সেবা করে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহার ক্রূরতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা না করিয়া তাহার মানবোচিত গুণগুলির বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গৃহপালিত প্রাণীর প্রতি আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মূল উদ্দেশ্য এই যে, যতদূর সম্ভব তাহাদের পাশবগুণ গুলি অপসারিত করিয়া তাহার স্থলে তাহাদের মধ্যে মানবীয় বৃত্তি প্রোথিত হইবার জন্য তাহারা আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কারণ মানব যেমন একদিন দেবতা হইবে, তাহারাও একদিন সেইরূপ মানব হইবে। এবং যিনি ঐশ্বরিক জীবনকে ক্রমোন্নতির ঊর্দ্ধদিকে সত্বর চালিত করিবার জন্য সাহায্য করেন, তিনিই ক্রমোন্নতির যথার্থ সেবক।

শ্রীঅপর্ণা চরণ সোম।

ঝরাফুল।

ঝরাফুল ওরে ঝরাফুল তুই কি কাজে লাগিবি আজ,
শুকায়ে গিয়াছে পাপড়ি যে তোর পড়েছিস্ ধূলি মাঝ!
অঙ্গে ত নাই সুষমা সে আর,
বাতাস লুটেছে সৌরভ সার,
বুকের শোণিত চুষে গেছে আজ নিঠুর কীটেরা যত,
কি দিয়ে তুষিবি? শিশির আঘাতে প্রাণে যে বেদনা হত!

ওরে অসহায় সম্পদহীন আজিকে সঙ্গ তোর
ছেড়ে চ'লে গেছে জনমের তরে ভৃঙ্গ পরাগ চোর;
গন্ধ আকুল বায়ু ধীরি ধীরি,
সদা যে বহিত তোরে ঘিরি ঘিরি,
সেই আজি যেন টিটকারি দিয়ে ফিরে যায় বারেবার,
হায় অসহায় এ জগতে তোর স্থান কোথা জুড়াবার?

ভেবোনা বন্ধু, মরুর জ্বালায় হয়ে গেছি বলে ছাই
বিশ্বের যত ব্যথিত বেদনা জানিতে পেরেছি তাই;
আমারি মতন অশ্রু-আতুর,
ভেঙ্গে গেছে প্রাণ যার শতচুর,
আমি ঝরাফুল হ'য়ে রব তার দরদী সঙ্গী-সাথী,
কণ্টক পথে যেতে পদে তার এ বুক দিবগো পাতি;

ভেবনা বন্ধু নিষ্ফল শুধু জীর্ণ জীবন মম,
খুঁজিবে শান্তি তোমাদেরি সুখ মিলনেতে মনোরম!
রচি তোমাদের বিরাম শয়ন,
ভুলে যাব সব ব্যথিত বেদন,
সম্ভাষি মোরে কেও যদি কভু 'কিসে সুখী হবি বল';
বলিব শুধুই কেল যদি ওগো দু'ফোটা অশ্রু জল।"

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ।

মাধবী।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ।

(আশ্বিন ১৩২৯—ভাদ্র ১৩৩০)

সম্পাদক—

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম, এ, বি, এল।

মাধবী কার্য্যালয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর শাখা হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী।

মাধবীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ৩৲ টাকা মাত্র; মফঃস্বলে ৩।৵০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইলে মাত্র ২॥০ টাকায় গ্রাহক হইতে পারিবেন।

২। আশ্বিন মাস হইতে 'মাধবী'র বর্ষ গণনা করা হয়। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, বৎসরের প্রথম বা আশ্বিন মাস হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

৩। মাধবী প্রতি মাসের ১লা বাহির হইবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মাধবী না পাইলে গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদিগকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা জানাইয়া রচনা সহ এক আনার ডাক টিকিট পাঠইবেন।

৬। কোনও পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা কেহ প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইবেন না। কোনও রচনা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন রচনার অনুবাদ, অনুলিপি বা অনুকরণ যেন না হয়। রচনা মাত্রই লেখকের নাম ধাম সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৭। রচনা পাঠাইয়া তিন মাসের মধ্যে অথবা নির্ব্বাচন ফল না জানিয়া কেহ অন্যত্র সেই রচনা প্রকাশ করিবেন না। নির্ব্বাচন ফল জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আদি সম্পূর্ণ লিখিয়া না পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। মাধবীতে রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিদ্বেষ-মূলক কোনও প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে না। রচনায় কুরুচি, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা প্রকাশ পাইলে তাহা মনোনীত হইবে না। প্রেরিত রচনার নিমিত্ত লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

৯। মাধবীতে প্রকাশযোগ্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোন স্থান বা বস্তুর চিত্র প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হয়না। সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের হার এইরূপ :—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা ২ কলম	প্রতি মাসে	১০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম	"	৬৲ "
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲ "

কভারের বিজ্ঞাপন এইরূপ :—

২য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	প্রতি মাসে	২০৲ টাকা
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১২৲ "
৩য় পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৮৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	১০৲ "
৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—	"	১৬৲ "
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	"	৮৲ "

সাধারণ বিজ্ঞাপনের হার অর্দ্ধ কলমের ন্যূন হইলে পত্রের দ্বারা বন্দোবস্ত করিবেন। বিজ্ঞাপনের চুক্তির মাস শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্নে মূল্য না পাইলে পর মাসে তাহা বাহির হইবে না। সতর্কতাসত্বেও ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে বা নষ্ট হইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না।

১১। অধিক দিনের জন্য গ্রাহকবর্গের কেহ কোনও ঠিকানা পরিবর্ত্তণ করিলে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন। প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য যাবতীয় চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস।

তমলুক তীর্থের ঘাট।
OLYMPIA PRESS,

শিল্পী-সুধাংশুভূষণ ঘোষ] কংসাবতী [মেদিনীপুর আর্টডেন

Bharatvarsha Ptg. Works.